শাইখ ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি

ফিকহুস সিরাহ

নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ

অনুবাদ

ইবনু আফির

পিডিএফ, আরিফ বিল্লাহ

ফিকহুস সিরাহ

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

ফিকহুস সিরাহ (প্রথম খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

রচনা

শাইখ ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি

মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ

অনুবাদ

মুসা আমান

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

ভাষা সম্পাদনা

জাবির মুহাম্মাদ হাবীব

ইহদিনা

ফিকহুস সিরাহ (প্রথম খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

গ্রন্থস্বত্ব © ইহদিনা পাবলিকেশন

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

মুফতি হাবীবুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া, যায়েদ মুহাম্মাদ, আম্মার আবদুল্লাহ, কাজী আকরাম, রুহুল আমিন, উবাইদ উসমান ও অন্যান্য

প্রকাশকাল

প্রথম বাংলা সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

অনলাইন পরিবেশক

বইকেন্দ্র, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, ইহদিনা, মানজিল, বইফেরী, বইসদাই

প্রচ্ছদ ডিজাইন

ফয়সাল মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা

মানজিল গ্রাফিক্স

ISBN : 978-984-34-7806-1

মুদ্রিত মূল্য : ৬০০ টাকা

প্রকাশনায়

ইহদিনা পাবলিকেশন

দোকান নং-২১, ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭০৭-৭৫২০৪৪

অর্পণ—

পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে, অনেক কিছুই ঘটবে; কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলছি—প্রাণপ্রিয় রাসুল, পৃথিবীতে আপনার আগমনের চেয়ে বড়ো কোনো ঘটনা নেই।

আমরা আপনার অক্ষম উম্মত। প্রিয় হাবিব, আমাদের সকল কিছুর চেয়ে আপনার সম্মান ও ইজ্জত আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। তাই আমাদের এই বই আমরা সযতনে অর্পণ করছি আপনার ইজ্জত ও সম্মানের তরে। এই বইয়ের সাওয়াব তাদের প্রতিও অর্পিত, যারা আপনার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট ছিল, আছে এবং থাকবে। কারণ, আমরা তো আপনাকেই জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসি, প্রিয় রাসুল!

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর অশেষ কৃপা, বইটি অবশেষে আপনাদের জন্য প্রস্তুত করা গেল। এ শুধুই আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানি। আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই; আল্লাহ তায়ালার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল।

'ফিকহুস সিরাহ' ছিল ইহদিনা পাবলিকেশনের স্বপ্ন পূরণ প্রজেক্ট। আল্লাহ তায়ালা তা পূরণ করেছেন। এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা হৃদয় নিংড়ে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিবেদন করতে চাই—হে আল্লাহ, আপনার প্রিয় হাবিবের জীবনীর ওপর আমাদের এই আন্তরিক কাজের বদলা হিসেবে আপনি আমাদের জান্নাত দান করবেন। এটিই আমাদের জীবনের প্রধান চাওয়া। এই দুআ প্রজেক্ট-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তির জন্য। লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ এই বইয়ের বিভিন্ন অংশে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, এই দুআ তাদের প্রত্যেকের জন্য।

বইয়ের টীকা ও হাদিসের নম্বরবিষয়ক একটি কথা আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখতে চাই—এগুলোর অধিকাংশ মূল বইয়ে থাকা রেফারেন্সের অনুগামী। কয়েকটির ক্ষেত্রে অবশ্য অনলাইন সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। বেশ অনেক টীকাই আবার আমাদের সম্মানিত অনুবাদক ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে এগুলো শতভাগ অকাট্য নয়। অকাট্য নয়, এর মানে হলো—রেফারেন্সে দেওয়া বইটি ঠিক কোন প্রকাশনীর, কোন সালের এবং কততম সংস্করণের—তা নির্দিষ্ট নয়। যে কারণে এই সংশ্লিষ্ট বিভ্রান্তি এড়াতে আমরা আশা করব, কেউ এগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের আগে এই বিষয়ে যথাসম্ভব মুদ্রিত কোনো কিতাবের সাথে মিলিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে খোঁজখবর নিয়ে নেওয়া এবং তারপর রেফারেন্স

হিসেবে ব্যবহার করা ভালো হবে। এমনিতে বইয়ে পরিবেশিত তথ্য শুদ্ধ ও যথার্থ রাখার শতভাগ চেষ্টা আমরা করেছি—এটুকু আমরা দাবি করতেই পারি। তবুও স্রেফ সতর্কতার জন্যই কথাগুলো বলে রাখা।

দ্বিতীয় আরেকটি কথা আমরা নোট হিসেবে বলে রাখতে চাই। তা হলো—লেখকের ইলমি যোগ্যতা পুরো দুনিয়াব্যাপী স্বীকৃত। দেশখ্যাত প্রতিষ্ঠান লালবাগ মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মুফতি ফজলুল হক আমিনি রহ.-সহ আমাদের এই বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত আলিমও লেখককে খুব চিনতেন ও পছন্দ করতেন। তারা তার লেখা রচনাবলি ও বয়ানের মুগ্ধ পাঠক ও শ্রোতা ছিলেন। তা ছাড়া সম্মানিত লেখক ছিলেন সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফকিহ আলিম; কিন্তু তারপরও কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নন। অন্য সকলের মতো তিনিও একজন মানুষ ছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে এক-দুটি বিষয়ে তার ইজতিহাদি ইলমি অবস্থান ছিল সমকালীন আলিমগণের চেয়ে ভিন্ন। ফলত তিনি কিছুটা নীরব সমালোচনার শিকার ছিলেন।

তবে এই বই যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সমালোচনার বাইরে একেবারে ক্লিন ইমেজের একজন আলিম ছিলেন। এ ছাড়া আলাদা করে বলতে হয়, বিশেষভাবে এই বইটি, সিরাহ বিষয়ে বা ইলমি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইয়ের বিচ্যুতি বা সমালোচনা নেই। উপরন্তু বইটি নবিজির সিরাতে আলোচনায় নতুন এক দিগন্ত পৃথিবীকে দেখিয়েছিল। যে কারণে পুরো আরব বিশ্বে বইটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা আশা করি, এই বিষয়ে সম্মানিত ও বিদগ্ধ কোনো পাঠকের আপত্তি থাকলে তা নিরসনে আমাদের ছোট্ট স্বীকারোক্তিটুকু দারুণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে কথা হলো—আমাদের ভুল হতে পারে, সেই সম্ভাবনা ও শঙ্কা থেকে বলে রাখি, কোনো হৃদয়বান পাঠক যদি বইটিতে কোনো বিচ্যুতি লক্ষ করেন এবং এরপর তিনি মেইলে বা কোনো মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমাদের জানালে, আমরা তা সংশোধনে আন্তরিক থাকব বলে আশাবাদী। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, আমিন।

বিনয়বত
প্রকাশক, ইহদিনা পাবলিকেশ

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টির কারিগর; যিনি সকল কিছুর প্রতিপালক। সালাত ও সালাম প্রেরিত হোক আমার প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

ফিকহুস সিরাহ। ত্রিশ কোটিরও বেশি মানুষের মুখের ভাষা 'বাংলায়' এমন একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে, যা আরও অনেক আগেই হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। পরে হলেও 'হচ্ছে তো' বিবেচনায় অন্তরের গহিন থেকে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি—আলহামদুলিল্লাহ।

ফিকহুস সিরাহ আসলে কী? এটি কি নিছক নবিজির জীবনী? না, জীবনী বাদ দিয়ে জীবন থেকে পাওয়া শুধু শরয়ি মাসয়ালার সংকলন? যদি তা-ই না হয়, অসংখ্য জীবনীর ভিড়ে তাহলে নতুন এই বইয়ের প্রয়োজনীয়তাই-বা কী? আর আমি কেন এবং কীসের আশায় পড়ব বইটি?

প্রশ্নগুলো যেকোনো সচেতন পাঠকেরই মনে আসতে পারে। বইটির কাজ করতে গিয়ে আমার কাছে যা মনে হয়েছে, আমি তাহলে সেই কথাগুলো বলি; *ফিকহুস সিরাহ* হলো সেই বই—যে বইয়ে নবিজির জীবনী জানার পাশাপাশি আমরা জানব, তাঁর জীবন থেকে আমাদের মতো সাধারণ উম্মতের শেখার কী আছে। আমরা দেখব, আল্লাহ তায়ালা আমাদের আদর্শ হিসেবে যাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর জীবনে আমাদের জন্য কী কী আদর্শ রয়েছে। কী কী শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন থেকে গ্রহণ করব।

ফিকহুস সিরাহ নিছক কোনো সিরাতগ্রন্থ নয়, আবার নয় কোনো মাসয়ালার কিতাব; বরং ফিকহুস সিরাহ হলো—নবিজির নির্ভরযোগ্য জীবনীর অসাধারণ বিন্যাসের অসামান্য সঙ্কলন। এখানে বর্ণিত হয়েছে নবিজির জীবন ঠিক কেন এমন ছিল। ঠিক কেন নবিজিকে আল্লাহ তায়ালা এইভাবে প্রতিপালন করেছেন। কেন তার জীবন ছিল উম্মাহর সকলের জন্য আদর্শ। নবিজির জীবনী জানা এবং তার সুরভিত জীবন থেকে

প্রাপ্ত শিক্ষার এত বড়ো ও সুন্দর আয়োজন; প্রিয় পাঠক, আমি বলতে পারি—এর আগে আপনি পাননি।

বইটির মান রক্ষা করে, বলতে গেলে সত্যিকার অর্থে আমার মতো অযোগ্য মানুষের চেয়ে সম্পাদকের স্থানে শ্রাস্ত্রজ্ঞ কোনো ভাষাবিদ হলেই ভালো হতো। কিন্তু আল্লাহর কী দয়া, এই ক্ষুদ্র মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবিবের জীবনীর সামান্য খিদমাত করার তাওফিক দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—আলহামদু লিল্লাহ।

ফিকহুস সিরাহ দুই খণ্ডে মোটামুটি বৃহৎ কলেবরের বই। তাই বইটি পাঠকের কাছে পাঠবান্ধব করার লক্ষ্যে কয়েকটি কাজ করেছি—

- মূল আরবি বইয়ে শিরোনাম খুবই কম ছিল। তাই মূল আরবির চেয়ে সহজে বোঝার জন্য, অনূদিত বইয়ে আমরা অসংখ্য শিরোনাম যুক্ত করেছি, যাতে করে বইটির কোনো অংশ পড়া শেষে আমরা মূলত কী পড়লাম, তা মাথায় রাখা সহজ হয়ে ওঠে।
- আলোচনাগুলো আমরা পয়েন্ট আকারে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। তাতে করে বইটি অনেক বেশি পাঠকবান্ধব হয়ে উঠেছে।
- বইয়ের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য টীকা যুক্ত করেছি। যা বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের পরিচয়, ব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচিতির ক্ষেত্রে পাঠককে দারুণভাবে সহযোগিতা করবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা ধারণা করছি, বইটি আপনাদের ভালো লাগবে। নবিজির জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের জীবন সাজাতে বইটি আপনাকে সহযোগিতা করবে।

আমরা সকলেই মানুষমাত্র। ভুল আমাদের জীবনের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। আমরা সকল কাজেই প্রায় ভুল করি। বিশেষত আমি নিজে ভুল একটু বেশিই করি। তাই এই বইয়ে বিজ্ঞ পাঠকের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমার মেইল বরাবর জানালে, পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়ার ইচ্ছে রাখি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জিন্দেগি তাঁর রাসুলের দেখানো পথে যাপনের তাওফিক দান করেন, আমিন!

বিনয়বত—

জাবির মুহাম্মদ হাবীব

৪ অক্টোবর, মধ্যরাত, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে লেখকের কথা

০১.

নবিজির জীবনী যারা ভালো করে বুঝতে চান, সিরাতু মুস্তফা থেকে মণি-মুক্তা লাভের সবিশেষ আগ্রহ যাদের রয়েছে, তাদের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণের এই ভূমিকা। এ সংস্করণে অতিরিক্ত কিছু আলোচনা যুক্ত করেছি। কোনো কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে ঘষামাজা এবং পরিমার্জনের কাজটাও হয়েছে। আমার প্রত্যাশা—এতে করে বইটির গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা আরও বাড়বে। তবে গ্রহণযোগ্যতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছা কোনো দিনও সম্ভব নয়। কারণ, অবশ্যই এতে ভুলচুক হয়ে থাকবে। ভুলভ্রান্তির ওপরে থাকতে পারাটা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

তবে এক্ষেত্রে নবি-রাসুলগণের ব্যাপারটা ভিন্ন। আল্লাহর বিশেষ কৃপায় তারা ভ্রান্তি-বিভ্রাট থেকে বেঁচে থাকতে পারেন; যেটা কেবল তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের সাথে নবিগণের এই পার্থক্যরেখা শুধু 'বিভাজনের' জন্য। বিভিন্ন বিষয়ে যারা নিজেদের ইজতিহাদ[১] ও চিন্তাকে মানদণ্ড বানায়, তাদের এবং নবি-রাসুলগণের মাঝে যেন পার্থক্য হয়', সেজন্য আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসুলগণকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেন, যা সাধারণ মানুষের মাঝে পাওয়া যায় না।

০২.

বইটি ছাপার অক্ষরে আসার পর বিভিন্ন আরবরাষ্ট্রে তা এতটা পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে, স্বল্পসময়ের ভেতর এভাবে ফুরিয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। আমার এ বইটি নতুন কিছু—নতুন রঙের, নতুন আঙ্গিকের—এ হয়তো অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা।

---

১. ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রয়াস।

২. তাদের এই পার্থক্য হলো তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর চিন্তা, বোধ ও সূদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে যাদের নিকট ওহি অবতীর্ণ হওয়া এবং ইলহাম হওয়া—এগুলো।

আমি এতে নবি-জীবনকে যেভাবে উপস্থাপন করেছি, বইয়ের পাতায় নবি-জীবন নিয়ে আমার চিন্তাকে যেভাবে সাজিয়েছি, হয়তো-বা এটি নতুন কোনো আন্দোলন; যার প্রধান চরিত্র হলো নবি-জীবন নিয়ে এ কালে রচিত রচনাগুলোর ভুল ধরিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন লেখক ও প্রাচ্যবিদ নিরন্তর যেসব ভুল করে চলছেন এবং উনিশ শতকে বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব ভুলের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলছে—যেগুলোর প্রভাব আজও বিরাজমান—সেসব ভুলের আবরণ সরিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

০৩.

আমার এই মেহনতকে কেন্দ্র করে পাঠকগণ যেই প্রশংসা উপহার দিয়েছেন, এ থেকে বুঝতে পারলাম[৩], (তারা এই বইটি পেয়ে বেশ খুশি হয়েছেন। এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সেইসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে) বাস্তবে খুব বেশি মানুষকে প্রতারিত করা যায়নি। কারণ, নবি-জীবনের শাশ্বত বাস্তবতাগুলো সদা দেদীপ্যমান, উজ্জ্বল। কোনো তাবিল ও তাহলিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) ছাড়াই নিরপেক্ষ, স্বাধীন চিন্তা[৪] তার দিকে ঝুঁকবে, তাকে বিশ্বাস করবে।

০৪.

ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষকরা মনে করছেন, ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো—জ্ঞানবিজ্ঞান; চোখ ঝলসানো ইউরোপীয় জাগরণ, যা বিপুলসংখ্যক আরবকে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপের সেই চোখ ঝলসানো রূপে তাদের এতটাই ভ্রম হয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল—ইউরোপের মতো মুসলিমদের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে চাইলে ইসলামকে ইউরোপের আয়নাতেই দেখতে হবে। ইউরোপ যেভাবে ইসলামকে বোঝে, মুসলিমদেরও সেভাবেই ইসলাম বুঝতে হবে। ইসলামের অদৃশ্য (গায়েবি) শাশ্বত বিষয়াবলিকে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বুঝতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞান যেহেতু অদৃশ্য বিষয়াবলিকে অস্বীকার করে, তাই সেগুলো মানা যাবে না। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার যদি মুজিজা (নবি-রাসুলগণের সত্যায়নে ঘটা অলৌকিক সব বিষয়)'র ব্যাপারে সত্যায়ন না করে, তাহলে সেটা অগ্রহণযোগ্য। পুরোপুরি ইউরোপীয় আদলে যদি কেউ ইসলামকে বিচার করতে পারে, তাহলে জ্ঞানবিজ্ঞান, উন্নতি-অগ্রগতি সবকিছুতেই ইউরোপীয়

---

৩. উনিশ শতকে বেড়ে ওঠা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো মূলত প্রাচ্যবিদদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিল এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের প্রোপাগান্ডায় খুব বেশি মানুষকে প্রতারিত করা যায়নি।

৪. তবে শর্ত হলো, নবি-জীবন নিয়ে অমূলক চিন্তা ও প্রচারণা বাদ দিয়ে বাস্তব অর্থেই ঠিকভাবে চিন্তা করতে হবে।

জাগরণের মতো জাগরণ-স্ফুরণ ঘটাতে পারবে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা স্কলাররাই পরবর্তী সময়ে তথাকথিত 'ধর্মীয় সংস্কার' আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন; অথচ এই দ্বীন তার বিশুদ্ধ আদলে টিকে আছে, আদৌ যার সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে না।

তো, তাদের এই ধর্মীয় সংস্কারের প্রথম অপারেশন হলো—ইউরোপীয় মানদণ্ডে নবি-জীবনকে বিশ্লেষণ। অর্থাৎ নবিজির জীবনকে ইউরোপীয় চিন্তা ও কাঠামোতে, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করা। সুতরাং ইউরোপের বিশেষ এই কাঠামোতে বিশ্লেষিত নবি-জীবন লেখায় কেউ বলতেই পারে, সে বিজ্ঞানের সমর্থন ছাড়া নবি-জীবনকে বুঝতে পারে না। তাই মুজিজার ব্যাপারগুলো থাকবে নবি-জীবনে অনুপস্থিত; যেহেতু তা বিজ্ঞান সমর্থন করছে না। আর সেই মুজিজাটি হচ্ছে—কুরআন, কুরআন এবং শুধুই কুরআন।

বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শাইখুল আজহার শাইখ মুহাম্মাদ মুস্তফা আল মারাগি (১৮৮১-১৯৯৫) এ দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং বইয়ের প্রশংসা করে ধন্য করেছেন। আর মুহাম্মাদ ফরিদ; তিনি বইটির সমালোচনা করে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করছিলেন। তার প্রবন্ধে তিনি ইসলাম ও নবি-জীবনকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বোঝার আহ্বান করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যদি কুরআন-সুন্নাহয় প্রমাণিত সত্য থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে তিনি তার বিজ্ঞানসমৃদ্ধ এই বক্তব্যে বলতে চাচ্ছেন—মুজিজা ও অদৃশ্যের বিষয়াবলি, যদিও তা মুতাওয়াতির (পারম্পরিক সনদ সুদৃঢ়) পর্যায়ে বর্ণিত হয়ে আসুক; যেহেতু যুক্তির গণ্ডির বাইরে, তাই সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, যা আপনার বোধগম্য, সেটা মানতে অসুবিধে নেই। কিন্তু যখনই যুক্তিবহির্ভূত কোনো বিষয় হবে, তখন তা মানা যাবে না।

০৫.

সবার জানা আছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৎকালীন মিশরে কেমন সুযোগ কাজে লাগিয়েছে! ইসলামের ব্যাপারে কিছুসংখ্যক চিন্তাবিদ ও লেখকের নতুন এই বোধ, নতুন এই বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে তারা মুসলিমদের হৃদয়ে থাকা নিয়ন্ত্রণশক্তিকে[৫] পঙ্গু করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক বিষয় 'মুজিজা'-কে 'না' বলে, তার অন্তরে আবার নিয়ন্ত্রণশক্তি থাকবে কী করে? মুজিজার মাঝেই তো দ্বীনের মূল অস্তিত্ব; কারণ ওহি, কুরআন, সবই তো মুজিজা। এভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম

৫. যে শক্তি প্রত্যেক মুসলিমকে অমূলক চিন্তা অপারেশন করে মূল চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে।

উম্মাহকে তাদের মূল আদর্শ থেকে দূরে সরাতে থাকে এবং নতুন আদর্শের—যা ইউরোপের জয়গানে মুখর—আমদানি করে।

০৬.

এভাবে দিনরাতের পালা বদল হতে থাকল। বছরের পর বছর কাটতে লাগল। এরপর গবেষক লেখকরা বুঝতে পারলেন—ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনোই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তার ধারক-বাহক ছিল না, জ্ঞানগত নিরেট গবেষণার জন্য ওইসব প্রতিষ্ঠান ছিল না; ভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ওগুলোর জন্ম।

ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ছিল—সেখানে ইউরোপীয় জীবন, ইউরোপীয় চাকচিক্য ও ভোগ-উপভোগের জৌলুসকে মানুষের সামনে মেলে ধরা হবে; যেটাকে তারা জীবনের চূড়ান্ত চাওয়া-পাওয়া মনে করবে। এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে সেটাকেই তাদের চিন্তা, বোধ, বিবেকের প্রভু ও নিয়ন্ত্রণকারী মেনে নেবে।

এ ছাড়া এর মাধ্যমেই তারা ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আরও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে; যার বাহ্যিক প্রকাশ 'ধর্মীয় সংস্কার' আর অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা—পশ্চিমের জাগরণের সামনে মানসিক দাসত্ব এবং চিন্তার দৈন্য।

প্রত্যেক চিন্তকের কাছে এটাও প্রতিভাত হলো, তথাকথিত ইউরোপীয় জাগরণের মতো ওইসব প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের জাগরণ-স্ফুরণ ঘটাতে পারেনি। এই 'ধর্মীয় সংস্কারের' পাল্লায় যারা পড়েছে, তারা দুটি বাস্তবতাকে একই সঙ্গে বিসর্জন দিয়েছে—

- **এক.** তারা ধর্মের প্রকৃত ও বিশুদ্ধরূপে থাকেনি।
- **দুই.** জ্ঞানের জাগরণেও স্বাক্ষর রাখতে পারেনি।[৬]

০৭.

সুতরাং আমার আগ্রহ হয়েছে—এ বইয়ে আমি ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষের শেষ পঙ্কিলতাটুকুও দূর করার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব দেবো।

'নবিজি একজন বিশাল প্রতিভাবান, দুঃসাহসী সেনাপতি, অভিজ্ঞ কুশলী'—এভাবে নবি-জীবনকে চিত্রায়ণ করা একজন মুসলিমের জন্য আদৌ ঠিক নয়; এটা একপ্রকার প্রকৃত বাস্তবতাবর্জিত বিষয়; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমৃদ্ধ জীবনের সাথে যা যায় না; বরং নবিজির সমৃদ্ধ জীবনকে অনেকটা হেয় করে। শাশ্বত

৬. এই সংস্করণে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে বিস্তর কথা বলেছি। সামনে পাবেন।

বাস্তবতা এই যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সব ধরনের পূর্ণতায় (নৈতিক, জ্ঞানগত, মানসিক) পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ মানব।

আর এ সবগুলো পূর্ণতাই একই বাস্তবতা থেকে উৎসারিত—তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি। এটাই সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গতার মূল চিত্র। এ যেন 'আসল' (মূল) বাদ দিয়ে ফুরু' (শাখাগত ও প্রাসঙ্গিক)-কে ধরা। অথচ আসলের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অসচেতন থাকা এক চরম অযথার্থ ব্যাপার; এ ধরনের 'অযথার্থ' কাজ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের স্রেফ আসলের দিকে ফিরতে হবে।

একজন মুসলিম যতক্ষণ সিরাত থেকে নবি-জীবন বোঝার ব্যাপারটা মানবে, ততক্ষণ সে 'কুরআনই নবি-জীবনের একমাত্র মুজিজা'—এটা বলতে পারে না। কেউ যদি সিরাতের এই দিকের (কুরআন ব্যতীত অন্যান্য মুজিজা) অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কুরআনের মুজিজাকেও অস্বীকার করতে হবে। কারণ, অন্যান্য মুজিজা যেই পদ্ধতিতে এসেছে, কুরআনের মুজিজা সেই একই পদ্ধতিতে এসেছে।

এই ধরনের তাবিল (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) করতে যাওয়া, এবং তা মেনে নেওয়া মানে প্রবৃত্তির অনুসরণ। জ্ঞান-গবেষণা ও বোধের ক্ষেত্রে চরমভাবে নিচে নেমে আসা; যার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ আছে, সে এই কাজে কখনো অগ্রসর হবে না।

০৮.

আমার সামান্য এই কাজটুকুর ফলে আমি যেই পাঠকপ্রিয়তা, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি পেয়েছি—এ থেকে বোঝা যায়, প্রাচ্যবিদ, পশ্চিমাবাদে বিশ্বাসী আগ্রাসী চিন্তাবিদ ও ইউরোপীয় দায়িরা (প্রচারকরা) যতই চেষ্টা করুক, যত বিপুল সময় ও শ্রম ব্যয় করুক; তারা যতই সমৃদ্ধ রচনা লিখুক, সবকিছুর পরও তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারবে না। বাস্তব ও সত্য চিন্তাকে কখনো নিঃশেষ করে দেওয়া যায় না। যদি ধোঁকা ও প্রতারণা অথবা অন্য কোনো ছলচাতুরীতে সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলা সম্ভবও হয়, তবুও এর স্থায়িত্ব নেই; কেবল তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর ধোঁকা, প্রতারণা ও সংশয়ের আবরণ দূর হয়ে যাবে। নিরেট সত্য ও বাস্তবতা তখন নতুন করে প্রকাশ পাবে। এতে গবেষকদেরও উপকার হবে। তারা সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

মানুষ যতই বলুক, মুসলিমরা এই শেষ যুগে এসে তাদের প্রকৃত আদর্শ থেকে সটকে পড়েছে। এরপরও আমি বিশ্বাস করি—মুসলিম উম্মাহর একটি দল আজ ইসলাম বিষয়ে সচেতনতা ও সূক্ষ্ম চিন্তায় যতটা অগ্রসর হয়েছে, ইতঃপূর্বে কোনো সময়ে তা

ছিল না। আমার বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে (ইনশাআল্লাহ) তা একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করবে; যা সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ করবে।

০৯.

এ বইয়ের সুন্দর আরেকটি দিক এই যে, এখানে আমি 'অ্যাকাডেমিক ধারা'য় আলোচনা করেছি; যা কাওয়ায়িদ ও আহকামের (মূলনীতি-বিধিবিধান) ইসতিনবাতের (উদঘাটন) ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্রেফ 'বিশ্লেষণমূলক সাহিত্যের ধারা'য় আলোচনা করিনি। যদিও এরও আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য তার আপন জায়গায় ঠিক। আমার এই ধারা (অ্যাকাডেমিক ধারা) প্রথম ধারার (সাহিত্যের বিশ্লেষণধর্মী ধারা) সাথে অসাংঘর্ষিক।

এই অনন্য ধারায় লেখার ফলে আমার বই যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে, এটা আমাকে আরেকটু বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রয়াসী করে তুলেছে। যদিও আমার বিশ্বাস—আমি এতে যথাযথ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তুলে ধরতে পারিনি। সব সংকটের সমাধান করতে পারিনি। আর না পারার প্রথম কারণ হলো আমার নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা।

দ্বিতীয়ত, আমি এখানে মাসাইল ও আহকাম সবিস্তারে—যা পাঠকের জন্য কষ্টকর—বর্ণনা করার ইচ্ছে করিনি। অন্যথায় এটা একদম সহজলভ্য ও নিত্যসঙ্গী কোনো বই হওয়ার পরিবর্তে একটা 'মারজি' (উৎসগ্রন্থ) কিতাব হয়ে যাবে; স্রেফ প্রয়োজনের সময়ই যার শরণাপন্ন হয় মানুষ।

তবে আবার কিছু মহোদয় এমনও আছেন, যাদের আমার নতুন ধারার এই কাজ আকৃষ্ট করতে পারেনি; বরং তাদের কেউ কেউ নিরপেক্ষ জ্ঞানগর্ভ আলোচনার (সমালোচনা) পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষে কলুষিত সমালোচনা করেছেন। আমি আমার বইয়ের আলোচনায় যদি কোনো ভুল করে থাকি, অসচেতনতার কারণে কোনো হুকুম বা দলিল বলার সময় যদি কোনো বিভ্রমের শিকার হই এবং শুভাকাঙ্ক্ষী কোনো মুখলিস ভাই তা ধরিয়ে দেন, তাহলে আমি তাকে কৃতজ্ঞতাপাশে রাখব, তার জন্য কল্যাণের দুআ করব; কিন্তু বাস্তবতাবিবর্জিত একরৈখিক কোনো কথা (সমালোচনা) শুনব, সে প্রস্তুতি আমার নেই।

১১.

নবিজির আদর্শ ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের দিকে লক্ষ রাখতে গিয়ে একটা অস্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে। তা হলো, নবিজি—জীবিত হন বা মৃত—তাঁকে 'ওসিলা' (মাধ্যম ও অবলম্বন) বানানো জায়িজ আছে। সুতরাং শক্তিশালী

দলিলের ভিত্তিতে আমি সেই ওসিলা বানানোর বৈধতাকে স্বীকৃতি দিলাম। নবিজির সিরাত বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ও পষ্ট হয়েছে, তা হলো—আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়িজ আছে। এর সব দলিল আমি উল্লেখ করেছি। 'আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো এবং বসা ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো'—এই দুটোর মাঝে আলিমগণ যেই পার্থক্য করেন, তা আমি স্পষ্ট করেছি। এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হওয়া হাদিসগুলোও উল্লেখ করেছি। সহিহ হাদিসে বর্ণিত শর্তাবলি যখন পাওয়া যাবে, উসুল (নীতিমালা) যখন ঠিক থাকবে, তখন এ ধরনের কিয়াম জায়িজ বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ছুটে যাওয়া সালাতের—ভুলে বা ইচ্ছায়—কাজার ব্যাপারটাও এখানে সুস্পষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে আমি বিভিন্ন দলিল এনে সে আলোকে হুকুম নির্ধারণ করেছি।

আমার মতের বিপরীত যদি বিভিন্ন দলিল পাওয়া যায়, তাহলে আমি বিপরীতই বলব। দলিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সব সময় আমি বদ্ধপরিকর; কিন্তু আমি কিছু মানুষের—যারা আয়িম্মা (মহান ইমামগণ) ও জুমহুর উলামার বিপরীতে নতুন মাজহাব সৃষ্টিতে প্রয়াসী, যাদের অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কিরামের মর্যাদা হ্রাস করতে, এমনকি জনসম্মুখে তাদের কটু কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কোনো অবস্থাতেই সত্য ও সত্যের দলিল থেকে মুখ ফেরাতে পারব না। জ্ঞানগত আলোচনা-পর্যালোচনাটা এ ধরনের একরৈখিক আগ্রাসী বিষয়ে পরিণত হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১২.

আল্লাহর শপথ! এসব সম্প্রদায় যদি বিচ্ছিন্ন ইজতিহাদি বিষয়ে মানুষকে জড়ানোর ব্যস্ততায় না থেকে, এসব ব্যাপারে অনর্থক ঝগড়া না করে, বিদ্বেষ না ছড়িয়ে উম্মাহর অন্যান্য আরও বড়ো বড়ো সংকট নিয়ে মাথা ঘামাত, উম্মাহর সমূহ সংকট নিরসনে প্রচুর শ্রম ব্যয় করত, তাহলে কতই-না ভালো হতো! কিন্তু চরম আশ্চর্যের বিষয়, তারা যুগের এসব দুর্বিপাক, দ্বীন ও ঈমান বিধ্বংসী ভয়ংকর তুফান সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞ।

তাদের এই কাজের (ইজতিহাদি বিষয়ে ডুবে থাকা) উদ্দেশ্য যদি থাকত আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাহলে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি হতো। নিজেদের কাছে যেই মতকে ঠিক মনে হয়, সেটাকে তারা গ্রহণ করত। আর অন্যরা যেটাকে যেটাকে ঠিক মনে করে, অন্যরা যেই মাজহাব গ্রহণ করে, সেটাকে তারা তাদের আপন অবস্থায়

ছেড়ে দিত। মানুষকে নিজেদের অক্টোপাসে জড়িয়ে ফেলার যেই অদম্য স্পৃহা, তা নিষ্ক্রিয় থাকত।

আমাদের পূর্ববর্তী জুমহুর মুসলিম উম্মাহও ইজতিহাদি বিষয়ে ইখতেলাফ করতেন; কিন্তু এর ধরন ছিল ভিন্ন, যথার্থ। তারা 'কাতয়ি'-ভাবে (নিশ্চিত) প্রমাণিত বিষয়গুলোকে (আকিদাসংক্রান্ত হোক বা আমলসংক্রান্ত) আঁকড়ে ধরতেন। এগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন এবং এসবের প্রতিরক্ষা করতেন। এরপর ইজতিহাদি বিষয়ে (যা জন্নি) অনুমাননির্ভর আলোচনা-পর্যালোচনার সময় একই বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন মাজহাবের সৃষ্টি হলে তাদের নিকট ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। কেউ অন্য কারও ওপর জবরদখলের চেষ্টা করতেন না। নিজের সিদ্ধান্তকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাতেন না। অন্যথায় (আগ্রাসী মনোভাব থাকলে) শিকড়েই ইসলামি ঐক্য নস্যাৎ করে দিতেন। আমাদের এই সমৃদ্ধ ইতিহাস—মুসলিম সভ্যতা, গৌরব ও মর্যাদা—গড়ে উঠত না।

১৩.

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে পাঠককে অনুরোধ করব, যেসব মাসয়ালায় তাদের (ওই সকল কট্টর ইজতিহাদকারী) সাথে বিরোধ উল্লেখ করেছি এবং এর মোকাবিলায় জুমহুরের মাজহাবকে তুলে ধরেছি, সেসব মাসয়ালার ক্ষেত্রে ভালো রকম দলিল ও দলিলের প্রয়োগ স্পষ্ট হওয়ার পর, আপনি দলিলের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা যাচাই করে দেখবেন। এইটুকুর পর আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি যেটা গ্রহণযোগ্য—যাতে একরৈখিক মনোভাব ও চিন্তার কোনো ছাপ থাকবে না—সেটিই গ্রহণ করবেন। একটি মাসয়ালায় (যথেষ্ট দলিল হাতে থাকার শর্তে) ইখতিলাফ বা মতানৈক্য বিপজ্জনক নয়; বিপদ তখনই হবে, যখন নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একরৈখিক মনোভাব থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সত্যের পথে নিয়ে আসেন। আমাদের সবাইকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। শুধু তাঁর জন্যই আমাদের যাবতীয় আমলকে কবুল করেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবার ডাকেই জবাব দেন।

মুহাম্মাদ সায়িদ ইবনে রামাদান আল বুতি

দিমাশক, সিরিয়া

১৭ জুমাদাল উলা, ১৩৮৮ হি.

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ খ্রি.

সূচিপত্র

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	ইসলাম বুঝতে সিরাহর গুরুত্ব	২৫
	সিরাহ অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমানে সিরাহ বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি	২৮
	আরবকে ইসলাম উদ্ভবের উৎসভূমি বানানোর রহস্য	৫৪
	নবিজির দাওয়াতের সাথে পূর্ববর্তী দাওয়াতের মিল-অমিল	৬৪
	জাহিলি সমাজ : নিভুনিভু সত্যের প্রদীপ	৭১
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	নবিজির বংশ, জন্ম ও দুধ পান	৮৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৮৭
	শামের প্রথম সফর : জীবিকার প্রয়োজনে কাজ	৯৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৯৬
	খাদিজা রা.-এর মূলধন, নবিজির ব্যবসা ও বিয়ে	১০১

	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১০৩
	কাবা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ	১০৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১১০
	হেরা গুহায় নির্জনবাস	১১৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১১৯
	ওহির সূচনা	১২৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১২৭
	তৃতীয় অধ্যায়	
	নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর	১৩৬
	প্রথম প্রকার : গোপন দাওয়াত	১৩৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৩৯
	দ্বিতীয় প্রকার : প্রকাশ্য দাওয়াত	১৪৬
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৫০
	কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন	১৫৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৬১
	আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা	১৬৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭৪
	অর্থনৈতিক বয়কট	১৮৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৮৭
	ইসলামে প্রথম হিজরত	১৯৬
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২০১
	প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন	২০৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২০৯
	শোকের বছর	২১৩

	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২১৫
	তায়েফ যাত্রা	২২০
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২২৫
	ইসরা ও মিরাজ	২৩৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৪৩
	প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা	২৫১
	বাইয়াতে আকাবায়ে উলা	২৫৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৫৭
	বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়া	২৬৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭০
	মদিনায় হিজরতের অনুমতি	২৭৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭৯
	মদিনার পথপানে	২৮৩
	কুবায় আগমন	২৮৯
	আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে	২৯১
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৯৩
	চতুর্থ অধ্যায়	
	প্রথম বুনিয়াদ : মসজিদ নির্মাণ	৩০৪
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩০৭
	দ্বিতীয় বুনিয়াদ : মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা	৩১৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩১৫
	তৃতীয় বুনিয়াদ : মুসলিম ও অন্যদের মাঝে চুক্তিপত্র প্রণয়ন	৩২০
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩২৩

পঞ্চম অধ্যায়

	প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বকথা	৩২৯
	গাজওয়াতু বাদরিল কুবরা	৩৩১
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৩৫
	বনু কাইনুকা : ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা	৩৫৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৫৭
	গাজওয়ায়ে উহুদ	৩৬৮
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৮১
	ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা	৩৯৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০০
	বনু নাজিরের দেশান্তর	৪০৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০৯
	অনুবাদক পরিচিত	৪১৫





প্রথম অধ্যায়

- ইসলাম বোঝায় 'সিরাতুন নবি'র গুরুত্ব
- সিরাতুন নবি : নবি-জীবন অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ ও বর্তমানে তা বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি
- নবিজিকে জাজিরাতুল আরবে প্রেরণের রহস্য
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : খাতামুন নাবিয়্যিন
- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত এবং পূর্ববর্তী আসমানি দাওয়াতের সম্পর্ক
- জাহিলি যুগে টিকে থাকা একনিষ্ঠ ব্যক্তিরা

ইসলাম বুঝতে সিরাহর গুরুত্ব

সিরাতে নববি অধ্যয়ন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্য স্রেফ ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাবলি জানা, ইতিহাসের কিছু চমকপ্রদ কাহিনি সম্পর্কে অবগত হওয়, এবং এসবের খুঁটিনাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছ—একজন মুসলিম সিরাতে রাসুলের মাধ্যমে এর মূলনীতি আর বিধিবিধান মাথায় রেখে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম জীবনচরিতে ইসলামের বাস্তব রূপ তার মূল আকৃতিতে খুঁজে নেবে।

এজন্যই সিরাতে রাসুলকে অন্যান্য ইতিহাসের পাল্লায় মাপা উচিত হবে না। কারণ এমন হলে সিরাতে রাসুল হয়ে যাবে নিছক কোনো শাসকের জীবনচরিত অথবা অন্য কোনো ঐতিহাসিক গালগল্পের মতো—যা সিরাতের উদ্দেশ্য পরিপন্থি।

মোটকথা, সিরাতে রাসুল অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর আমলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাকিকতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ, যার সর্বোৎকৃষ্ট উপমা হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যদি আমরা এই উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিক লিখিত আকারে সংকলন করার ইচ্ছে করি, তাহলে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত পয়েন্টে এর বিস্তারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করতে পারি—

এক.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে এবং যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি জীবনযাপন করেছেন, এথেকে তাঁর নববি পরিচয় জানা—নিশ্চিতভাবেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একজন নেতাই ছিলেন না, যার নেতৃত্বের প্রতিভা তাঁকে স্বজাতির মধ্যে উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে; বরং তিনি সবকিছুর আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত একজন রাসুল।

দুই.

মানুষ উত্তম জীবনের প্রতিটি বিষয়ে একটি উত্তম নমুনা পাবে, যাতে সে এর থেকে নিজের জন্য একটি নিয়ম তৈরি করে তার ওপর চলতে পারে। মানুষ যদি তার জীবনের যেকোনো শাখায় উত্তম আদর্শের সন্ধান করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে পাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় বানিয়েছেন। যেমন : আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [১]

তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।

তিন.

মানুষ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত অধ্যয়ন করে এমন দিকনির্দেশনা পাবে, যা তার জন্য আল্লাহ তায়ালার কিতাব বোঝা এবং এর মর্মোদ্ধার করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। কারণ, পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলো ব্যাখ্যা করেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলি।

চার.

সিরাতে নববি অধ্যয়নকালে মুসলিমের সামনে আসবে বিশুদ্ধ ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপুল অংশ, সেটা হতে পারে আকিদা বা বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট অথবা বিধিবিধান ও আখলাক সম্পর্কিত। আর নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন ইসলামের সকল মূলনীতি ও বিধিবিধানের আলোকিত প্রতিবিম্ব।

পাঁচ.

শিক্ষক ও মুসলিম দায়ির (প্রচারকের) নিকট থাকবে শিক্ষাদীক্ষা পদ্ধতির এক জীবন্ত নমুনা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন উত্তম কল্যাণকামী শিক্ষক। দাওয়াতের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদীক্ষার অধিকতর উপযোগী পদ্ধতির তালাশে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

---

১. সূরা আহজাব, আয়াত : ২১

উল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের পূর্ণতা দেয়, তন্মধ্যে সবচেয়ে' গুরুত্বপূর্ণ হলো—রাসুলের পবিত্র জীবন মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক-জীবনের যাবতীয় বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। চাই সে একক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি হোক কিংবা সমাজের কার্যকর কোনো অংশ হোক।

রাসুলের জীবন নিজ কর্মধারায় অবিচল যুবকের জন্য উন্নত নমুনা; যে নিজ জাতি ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রতি আমানতদার ও বিশ্বস্ত। তেমনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির জন্যও রয়েছে উত্তম নমুনা—যিনি নিজের ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেহনত করেন। একজন প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রধানের আদর্শ সামনে আসে, যিনি নিজ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সকল কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

সামনে আসে একজন আদর্শবান স্বামীর নমুনা; যিনি নিজের পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করেন। সামনে আসে একজন আদর্শ পিতার নমুনা; যিনি নিজ স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু, তিনি তাদের হক যথাযথ আদায় করেন। একজন দক্ষ সেনাপতি ও সত্যবাদী অভিজ্ঞ রাজনীতিকের নমুনা সামনে আসে। এমন একজন মুসলিমের নমুনা সামনে আসে; যিনি ন্যায়সংগত এবং যথার্থভাবেই একদিকে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্ত থাকেন অপরদিকে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মনোরম সুন্দর জীবনযাপন করেন। তাহলে নিঃসন্দেহে সিরাতে রাসুলের উদ্দেশ্য হচ্ছে—মানবীয় এ সকল বিষয়কে উত্তম আকৃতিতে সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা।

* * *

সিরাহ অধ্যয়নের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমানে সিরাহ বোঝার অপরিহার্য পদ্ধতি

সিরাতে নববি এবং ইতিহাস

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ইতিহাসের মহান গতিপথ তৈরিতে এক অনন্য বুনিয়াদ স্থাপন করেছে, যদ্দ্বারা বিশ্ব মুসলিম নিজেদের দেশ-ভাষা-সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও বিশ্ব দরবারে- অসামান্য মর্যাদায় আসীন হয়েছে। আর এই সিরাতের গতিপথ ধরেই মুসলিমরা ইতিহাস রচনা করেছে। কারণ, মুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখক-সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম ইতিহাসের যেসব ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা ছিল সিরাতে নববি সম্পর্কিত ঘটনাবলি। পরবর্তী সময়ে এই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য ইতিহাস সংকলন শুরু হয়, যা বর্তমানে আমাদের সামনে দৃশ্যমান।

এমনকি ইসলামি সীমান্ত ছাড়িয়ে আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জাহিলি যুগের ইতিহাসকেও মুসলিমরা অন্যান্য আরব-অনারবদের থেকে জেনেছেন এবং ইসলামের আলোকে এগুলো সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাক-ইসলামি ইতিহাসকে 'জাহিলি যুগের ইতিহাস' নামে নামকরণ করেছেন। আর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন এবং তাঁর সিরাত ও হায়াতকে 'ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়' সাব্যস্ত করেছেন।

সেক্ষেত্রে সিরাতে নববি কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে—যার চারপাশে ইসলামের ইতিহাস সংকলন আবর্তিত হয়। সিরাতের এই সংকলন এমন এক মহান কীর্তি, যা প্রথমে আরব উপদ্বীপে প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তী সময়ে তামাম ইসলামি জগৎকে নিজের প্রভাববলয়ে নিয়ে আসে।

আরব ও মুসলিমদের হাতে বর্ণনা সাহিত্য ইতিহাসের শুদ্ধ-অশুদ্ধ যাচাই এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এমন একটি জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্ম কারিকুলাম লাভ করেছে, যা অন্য কোনো জাতি লাভ করেনি।

তবে কথা হচ্ছে—যদি সিরাতে নববি সংরক্ষণের দ্বীনি জরুরত তাদের এমন বিশুদ্ধভাবে সিরাত সংকলনের জন্য উৎসাহিত না করত, যাতে মিথ্যা ও ছলচাতুরী এবং গোঁজামিলের লেশমাত্র থাকবে না, তাহলে তারা এই কারিকুলাম রচনায় ব্রতী হতেন না। কারণ, তাদের জানা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত ও তাঁর সুন্নাহ হচ্ছে কিতাবুল্লাহ বোঝার অন্যতম ও প্রথম চাবিকাঠি। অতঃপর তা কুরআনের বিধান অনুশীলন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতর নমুনা।

তাদের এ কাজে উৎসাহিত করেছে তাদের এ দৃঢ় বিশ্বাস—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তারা এ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, আল্লাহ এ ব্যাপারে তাদের কঠিন হিসাব নেবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে এমন একটি জ্ঞানগর্ভ পদ্ধতিতে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে সিরাতে রাসুল ও পবিত্র সুন্নাতে নববির বাস্তব রূপ অবিকল সংরক্ষিত থাকবে।

জ্ঞানগর্ভ কারিকুলাম ও নীতিমালা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাদিসশাস্ত্রের পারিভাষিক নিয়মনীতি এবং ইলমে জারহ তাদিল ইত্যাদি। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এসব বিষয় সৃষ্টি হয়েছে সুন্নাতে নববির খেদমতের জন্য; সিরাতে নববি ছিল যার মূল ভিত্তি। অতঃপর তা সাধারণভাবে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা বা বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করার নীতিমালা ও মানদণ্ডে পরিগণিত হয়।

এটা সুস্পষ্ট কথা—সিরাত সংকলনের কাজটি একটি সুবিস্তৃত সুবিশাল অধ্যায়, যার মাধ্যমে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ব্যাপক আকারে অন্যান্য ইতিহাস অধ্যয়ন ও সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। আর ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা যেসব মূলনীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তা হচ্ছে খোদ ওই সকল নীতিমালা—যা মুসলিম বিদ্যানগণ ইসলামের মূল উৎসধারা তথা কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রণয়ন করেছেন; যাতে কোনো অনুপ্রবেশকারী সেখানে জলঘোলা না করতে পারে।

সিরাত রচনার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

যুগ হিসেবে সুন্নাতে নববির তুলনায় সিরাতে নববি রচনা শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে। নিঃসন্দেহে সুন্নাহ তথা হাদিসে নববিই সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়, তারপর ব্যাপক আকারে সিরাত রচনা শুরু হয়। আর এটা সবার জানা যে, হাদিস লেখার কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই আরম্ভ হয়েছিল, এ ব্যাপারে শুধু তাঁর অনুমতি নয় বরং নির্দেশ ছিল! যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন—তাঁর সাহাবিগণ কুরআনের অলৌকিক বাকরীতি এবং হাদিসে নববির অলংকারপূর্ণ বক্তব্যের মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান করতে পারছে, এ দুটি বিষয়ে তারা আর তালগোল পাকিয়ে ফেলবে না, তখন তিনি তাদের এ নির্দেশ দেন।

সুন্নাহ সংকলনের পরেই ব্যাপকভাবে সিরাত ও মাগাজি সংকলন শুরু হয়। যদিও সাহাবায়ে কিরাম মৌখিকভাবে সিরাত ও মাগাজি বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

সম্ভবত প্রথম বিস্তৃত পরিসরে সিরাত রচনার উদ্যোগ নেন উরওয়া ইবনেজ জুবাইর (মৃত্যু : ৯২ হিজরি), এরপর আবান ইবনে উসমান (মৃত্যু : ১০৫ হিজরি), তারপর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃত্যু : ১১০ হিজরি), অতঃপর শুরাহবিল ইবনে সাআদ (মৃত্যু : ১২৩ হিজরি), এরপর ইবনে শিহাব জুহরি (মৃত্যু : ১২৪)

সিরাত রচনায় সর্বপ্রথম যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন, এরাই তাদের অগ্রগণ্য। তেমনি এদের রচনাবলিও এই মহান ইলমি কাজের প্রাথমিক সূচনাকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা যায় বিস্তৃত পরিসরে সিরাত রচনার প্রথম পদক্ষেপ এটাই, যেমনটি আমরা পূর্বেও বলে আসছি।

এই বিবেচনা বাদ দিয়ে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সিরাত তো কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; বিশেষত শরিয়তের বিভিন্ন বিধান-সংশ্লিষ্ট সিরাতের ঘটনাবলি। নতুবা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সিরাতশাস্ত্র হাদিসশাস্ত্রের পরেই সংকলিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত সিরাত বিশেষজ্ঞগণ যা কিছু সংকলন করেছিলেন, সেগুলো যুগের বিবর্তনের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি। যা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলোও

বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ছিল। সেগুলো থেকে কিছু ইমাম তাবারি রহ.[২] (২২৪-৩১০ হি.) সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আর কথিত আছে, আরও কিছু জার্মানির বিখ্যাত হাইডেলবার্গ শহরে[৩] সংরক্ষিত আছে। সেগুলো ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.[৪] (৩৪-১১৪ হি.)-এর লিখিত আংশিক বর্ণনা।

তবে তাদের পরে এমন একদল সিরাত বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে, যারা প্রথম সারির বর্ণিত বর্ণনাগুলোকে নিজ নিজ কিতাবে উত্তম পদ্ধতিতে এবং চমৎকার বিন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। সেগুলো আলহামদুলিল্লাহ, অতি উত্তম পদ্ধতি ও বিন্যাসের সাথে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এই পরবর্তী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম আসে ইবনে ইসহাক রহ.[৫] (মৃত্যু ১৫২ হি.)-এর। বিশ্লেষক উলামায়ে কিরামের সবাই একমত, ইবনে ইসহাক সিরাতশাস্ত্রে যা কিছু লিখেছেন, সেগুলো সে যুগে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়েছে।

---

২. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারির আমুলি তাবারি। কাজবিন সাগরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত পাহাড়-পর্বতঘেরা তাবারিস্তানের রাজধানী আমুলে তার জন্ম। তিনি একাধারে মুজতাহিদ ইমাম। মুফাসসির। হাফিজে হাদিস। ফকিহ। ইতিহাসবিদ। ভাষাবিজ্ঞানী। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী। বিশিষ্ট ক্বারি ছিলেন। তার এতগুলো উপাধিই তার মর্যাদা ও বিদ্যাসাগর হওয়া প্রমাণ করে।

৩. হাইডেলবার্গ (Heidelberg)। জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিমে নেকার নদীর তীরে অবস্থিত বাডেন-ভুর্টেমবার্গ-এর একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহর। হাইডেলবার্গ ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এর ৭৮ কি.মি. (৪৮ মাইল) দক্ষিণে অবস্থিত। হাইডেলবার্গ বাডেন-ভুর্টেমবার্গের পঞ্চম বৃহত্তম শহর। এটি জনবহুল রাইন-নেকার মেট্রোপলিটন অঞ্চল-এর একটি অংশ। ২০১৬ সালের আদমশুমারিতে এর জনসংখ্যা ছিল ১,৫৯,৯১৪ জন। যার মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশই ছাত্র।
হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এটি জার্মানির প্রাচীনতম এবং ইউরোপের অন্যতম নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়। হাইডেলবার্গ জার্মানির একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র এবং এর বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন গবেষণামূলক সুবিশাল ইউরোপীয় অণুবিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং চারটি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের আবাসস্থল।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৪. আবু আবদুল্লাহ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ আবনাবি ইয়ামানি। তৃতীয় খলিফায়ে রাশিদ উসমান ইবনে আফফান রা.-এর খিলাফতকালে ইয়ামানে তার জন্ম। তিনিও একাধারে বিদগ্ধ পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও ইমাম ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদিস সংগ্রহের সৌভাগ্য তার হয়েছে। তার ইন্তেকাল কারও মতে ১১০, আবার কারও মতে ১১৩ হিজরি।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৫. আবু বকর বা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক কুরাইশি মুত্তালিবি মাদানি। বিখ্যাত তাবিয়ি। বিদগ্ধ পণ্ডিত। প্রখ্যাত হাফিজে হাদিস। ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। সিরাত ও মাগাজিশাস্ত্রজ্ঞ। কোনো কোনো বর্ণনায় তার জন্ম ৮০ হিজরি ও মৃত্যু ১৫১ হিজরিতে।

যদিও তার গ্রন্থ 'আল মাগাজি' ধারাবাহিক সূত্রে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি; কিন্তু তার পরবর্তী সিরাত লেখক ইবনে হিশাম রহ.[৬] (মৃত্যু ২১৩ হি.) সিরাতশাস্ত্রের ওপর একটি দলিলভিত্তিক গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। এই গ্রন্থটি ইবনে ইসহাকের 'আল মাগাজি'-এর ৫০ বছর পর সংকলন করা হয়।

ইবনে খাল্লিকান বলেন—

> ইবনে হিশাম হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইবনে ইসহাকের *আল মাগাজি* ও *আস-সিয়ার* কিতাব দুটি থেকে বর্ণনাগুলো সংগ্রহ ও একত্রীকরণের কাজ করেছেন। যিনি সেই সকল বর্ণনা একত্র করে সেগুলোকে সুন্দরভাবে বিন্যাস দিয়েছেন। আর এটিই আজকের সেই কিতাব, যাকে *সিরাতে ইবনে হিশাম* নামে মানুষের হাতে দেখা যায়।[৭]

যাহোক, সিরাত-রচনায় যে সকল উৎসের ওপর রচয়িতাগণ নির্ভর করেছেন, তা এমন—

এক. কুরআনে কারিম।

এটিই সিরাতে নববি রচনার অন্যতম ও প্রধান ভিত্তি বা উৎসমূল। কুরআনে কারিমেই নবিজির পবিত্র জীবনের প্রাথমিক, সংক্ষিপ্ত ও প্রধান পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দুই. হাদিসুন নবি।

হাদিস সংকলনকারী উলামায়ে কিরাম। তারা যেগুলো সংকলন করেছেন নবিজির জীবনীর ব্যাপারে, এগুলো হলো সিরাত রচনার দ্বিতীয় উৎসমূল। আর হাদিস সংকলনকারী উলামায়ে ইসলামের দ্বীনদারি, তাদের একনিষ্ঠতার ব্যাপারে সকলেরই জানা আছে। এর মধ্যে তাদের লিখিত সংকলনের তালিকায় আছে *মুআত্তা ইমাম মালিক*, *মুসনাদু ইমাম আহমাদ* ও অন্যান্য। যদিও এই সংকলনগুলো এ উদ্দেশ্যে করা হয়নি যে, এগুলো নবি-জীবনের ইতিহাস রচনা করবে; বরং এই সংকলনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল, নবিজির আমল, তাঁর বাণী

---

৬. আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম মাআফিরি হিময়ারি বসরি মিসরি। তার জন্ম বসরায় হলেও মৃত্যু মিশরে। তিনিও একাধারে সিরাত-শাস্ত্রজ্ঞ। বংশবিশারদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ভাষাবিদ। আরবের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল তার নখদর্পণে। কোনো বর্ণনায় তার মৃত্যু ২১৮ হিজরি।

৭. *ওয়াফায়াতুল আইয়ান*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯০, মিসরি সংস্করণ।

নির্দেশনাগুলো সংরক্ষণ করা। এজন্য দেখা যাবে, এখানে ইতিহাস সংরক্ষণের কোনো ধারাকে অনুসরণ করা হয়নি। এখানে শুধু নবিজির কথা-কাজ এবং আহকামগুলোর বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া এগুলো সাজানোও হয়েছে ফিকহি অধ্যায় হিসেবে। আবার কখনো দেখা যাবে—যে হাদিস যে সাহাবি বর্ণনা করেছেন, সেই সাহাবির নামেই বর্ণনাটি এসেছে। কারণ ওই একটিই, এখানে নবিজির জীবনী বর্ণনা উদ্দেশ্য ছিল না।

তিন. সেই সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনা, যেগুলো বর্ণনাকারীগণ নবিজির জীবনী হিসেবেই বর্ণনা করেছেন।

বেশ কয়েকজন সাহাবি রয়েছেন, যারা নবিজির আশেপাশে হয়তো বিশেষ কোনো সময়, বিশেষ কোনো ঘটনা অথবা কথা বলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কথা বা বর্ণনা অপর কোনো সাহাবির কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে কোনো সাহাবি সকল বর্ণনা একত্র করার ব্যাপারে, বা সেগুলো সংকলনের ব্যাপারে মনোযোগ দেননি। আর এখানেই মূলত আমি আপনাদের সেই পার্থক্যটা দেখাতে চাই যে, সাধারণভাবে রচিত নবিজির সিরাত রচনা এবং বিশেষভাবে নবিজির সিরাত রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত সিরাতের কী পার্থক্য।

সিরাতুন্নবি বা নবি-জীবনী বর্ণনার তাত্ত্বিক পদ্ধতি

সিরাত রচনা যে আংশিক ইতিহাস রচনা, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট ও পরিষ্কার। সিরাত সংকলন ইসলামি ইতিহাস রচনার ভিত্তি এবং এই শাস্ত্রই নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির আগে-পরের সকল ঘটনা ও খবরাখবর সংকলন ও বিন্যাসের চালিকাশক্তি; কিন্তু তাই বলে সিরাতশাস্ত্রজ্ঞগণ নবি-জীবনের ঘটনাপ্রবাহ সংকলন ও গ্রন্থ রচনায় কি লাগামহীনভাবে কাজ করেছেন নাকি বিশেষ কোনো পদ্ধতি ও নীতিমালার ওপর নির্ভর করেছেন, তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তারা জ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তারা তাত্ত্বিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আজকের ইতিহাস রচনাকারীরা সেই পদ্ধতিকে 'সাবজেক্টিভ তরিকা বা বিষয়কেন্দ্রিক পদ্ধতি' পরিভাষায় আখ্যায়িত করেছে।

এর অর্থ—সিরাত সংকলক ও শাস্ত্রজ্ঞগণ নবি-জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে নির্ধারিত মূলনীতি ও নিয়মকানুনের কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করেছেন। তাদের এই কষ্টিপাথর

সনদ-মতন (ঘটনার বর্ণনাসূত্র ও মূল ঘটনা), জারহ-তাদিল (বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও পরিমার্জন) এবং বর্ণনাকারীদের জীবনী জানার ওপর প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি ও নিয়মকানুন অর্থাৎ হাদিসশাস্ত্রেরই যাবতীয় নিয়মনীতি দিয়ে গঠিত ও প্রণীত।

তারা সিরাতের কোনো ঘটনা বা সংবাদ পেলে সেটাকে এসব মূলনীতি ও নিয়মকানুনের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন এবং এই যাচাই-বাছাইয়ের ওপর নির্ভর করেই তথ্য-উপাত্ত সংকলন ও নথিবদ্ধ করতেন। সংকলন করতে গিয়ে তারা নিজেদের চিন্তাগত কোনো দিক, মানসিক প্রবৃত্তির কোনো ছাপ এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ঝোঁক কোনোভাবেই সংকলনে স্থান দিতেন না।

তারা মনে করতেন, এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সূক্ষ্ম ও জ্ঞানভিত্তিক মূলনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাইয়ের পরে যেই ঐতিহাসিক ঘটনার দেখা মিলেছে, তা একটি পবিত্র বাস্তবতা ও আমানত। একে তার মূল অবস্থা ও আকৃতিতেই মানুষের সামনে পেশ করা উচিত ও কর্তব্য।

তারা আরও মনে করতেন, অধিকাংশ সময় পরিবেশের প্রভাব এবং গোঁড়ামির কুফলস্বরূপ ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ ও মনের কুপ্রবৃত্তিকে নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে ইচ্ছেমতো লেখা এবং ইচ্ছেমতো মুছে ফেলা অধার্মিকতা ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এসব ইলমি কায়দাকানুন ও ইতিহাসের 'অবজেক্টিভ তরিকা বা দৃশ্যমান বস্তুকেন্দ্রিক পদ্ধতি'-এর ভিত্তিতে নবিজির জীবনী আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তাঁর জীবনচরিতের সূচনা তাঁর বরকতময় জন্ম থেকে। সিরাতের আলোচ্য বিষয়ে রয়েছে তার বংশধারা, শৈশব, বাল্যকাল ও যৌবনের বর্ণিত ঘটনাসমূহ। পাশাপাশি তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির আগপর্যন্ত এই সময়গুলোতে যেসব অলৌকিক ঘটনা নবুয়তের পূর্বলক্ষণরূপে দেখা গেছে, সেগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সর্বোত্তম চরিত্র-অভ্যাস, সততা ও আমানতদারির আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এভাবে নবুয়ত লাভের ঘোষণা দেওয়ার পর আল্লাহপাক সময়ে সময়ে তাঁর হাতে যেসব অলৌকিক ঘটনা ও মুজিজা প্রকাশ করেছেন, সেগুলোও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে দাওয়াতের যেসব ধাপ তিনি অতিক্রম করেছেন এবং সেই সময়ে সন্ধি, প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা, জিহাদ এবং দাওয়াতি পথে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন, সেগুলোর বর্ণনাও রয়েছে । এসব কিছুই কুরআন ও কুরআনের ব্যাখ্যা হাদিসের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।

নবি-জীবনের এই ধারাবাহিকতার সম্পর্ক ঐতিহাসিক সংরক্ষিত আমলের মাধ্যম ও মধ্যস্থতায় আমরা পেয়েছি। এবং সকল তথ্যই একটি নিবিড় পরিচর্যাগত পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংকলন ও গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। তাই যতক্ষণ এসব ঘটনাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে এগুলো থেকে সারাংশ ও ফলাফল, আমলি জিন্দেগির বিধিবিধান, আকিদা-সংশ্লিষ্ট মূলনীতি ও গভীর অর্থ উদ্ভাবনের সম্পর্ক রয়েছে , ততক্ষণ এটি একটি ইলমি কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কীর্তি। এর সাথে সাধারণ ইতিহাসশাস্ত্রের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। এতে এক অবস্থাকে আরেক অবস্থার সাথে মেলানো যাবে না।

চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ঘটনাপ্রবাহ থেকে ফলাফল ও শিক্ষা, মূলনীতি ও নীতিমালা উদ্ভাবন করে এবং সেগুলোকে এক বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করে সন্দেহ ও মনের কুপ্রবৃত্তি মুক্ত রাখায় উইলিয়াম জেমস[৮]-এর মতো ব্যক্তিরা এগুলোকে 'ইরাদাতুল ইতিকাদ'[৯] নামে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন।

সেসব নিয়ম ও নীতিমালায় আছে কিয়াসে ইসতিকরায়ি (অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি), বিভিন্ন রকম কানুনে ইলতিজাম (বাধ্যতামূলক আইন) ও নানা ধরনের দালালাত (বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনা)।

এগুলো মূলত সেই ইলমি অনুসন্ধানের গুপ্তধন—যা ইলমি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের চার দেওয়ালের সীমারেখায় মুকুলিত। ইতিহাস ও ইতিহাস সংকলন এবং এর মর্মার্থ ও বিষয়বস্তু থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা।

ইতিহাস রচনার নতুন পদ্ধতির বিচারে সিরাতের অবস্থান

উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস রচনা ও সংকলনের নানামুখী পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি অবজেক্টিভ পদ্ধতি আছে, যেটাকে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'-ও বলা হয়। উদ্ভাবিত সবগুলো পদ্ধতির মধ্যে অভিন্ন বিষয়টিকে 'ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি/অভিমত' বলে নাম দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো বড়ো দাবিদারের

---

৮. উইলিয়াম জেমস (William James, 1842-1920)। জন্ম-মৃত্যু আমেরিকায়। একাধারে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও মনোবিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানের কোর্স তিনিই প্রথম চালু করেন। তাই তাকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানের জনক' বলে গণ্য করা হয়।—অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।

৯. ইংরেজি মূল সংস্করণের নাম হলো—The will to believe.

মধ্যে সিগমুন্ড শ্লোমো ফ্রয়েড[১০]-কে সবার উর্ধ্বে গণ্য করা হয়। এই অঙ্গনে তিনি খুবই প্রসিদ্ধ ও মশহুর ব্যক্তিত্ব।

এই দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো বড়ো দাবিদাররা ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আড়ালে নিজস্ব চিন্তাচেতনা, নিজ ধর্মের প্রতি আহ্বান এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণকে দোষের কিছু মনে করে না; বরং একে তারা ইতিহাস লেখকের দায়িত্ব-কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। তাদের ধারণা, ঐতিহাসিকদের কাজ শুধু গতানুগতিক অতীতের সংবাদ প্রদান এবং ঘটনাপ্রবাহ সংকলনেই সীমাবদ্ধ নয়। (বরং নিজের একটা অভিমত বা সিদ্ধান্ত দেওয়াও তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।)

এই পদ্ধতি ইতিহাস সংকলনকে কেবল একটি শাস্ত্রীয় বিষয়ে পরিণত করে যেটাতে এর ইলমি ও তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম কাজ সমাধিস্থ হয়ে যায়। এখানে সেসব পদ্ধতি এবং সেগুলোর সমালোচনার ব্যাপারে কিছু বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং আফসোস হচ্ছে, আজকের যুগে বৈজ্ঞানিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনকে খুবই মূল্যায়ন ও বিবেচনার চোখে দেখা হয়। অথচ এ যুগেও সেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের দাবিদারও আছে। আবার সেই দাবি গ্রহণ করার মতো পাবলিকও আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন সেই সকল বাস্তবতা ও ঘটনাকে একেবারে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দেয়, যেগুলোকে সময় তার পরতে পরতে ভাঁজ করে রেখেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম চর্চার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে আসছে।

এই নব আবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক ওইসব সংরক্ষিত ঘটনায় ব্যক্তিগত চাহিদা, গোঁড়ামি এবং চিন্তাগত ধ্যানধারণাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফলে এ ধরনের ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত এবং অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনা করে না-জানি কত বাস্তব বিষয়কে বিকৃত করা হয়েছে, কত শতসহস্র ঘটনাকে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে, কত সম্মানিত লোকের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং না জানি কত নিরপরাধ মানুষের ওপর অন্যায় জুলুম করা হয়েছে!

এবার কথা হলো—সিরাতশাস্ত্রেও কি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ফেলা হয়েছে?

---

১০. সিগমুন্ড শ্লোমো ফ্রয়েড Sigmund Shlomo Freud, 1856-1939। জন্ম অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে, মৃত্যু যুক্তরাজ্যে। অস্ট্রিয়ান নিউরোলজিস্ট ও সাইকোয়ানেলিসিস (মনোব্যাধির চিকিৎসাপদ্ধতি)-এর প্রতিষ্ঠাতা।

হ্যাঁ, হয়েছে। ইতিহাস রচনার এই নতুন পদ্ধতি একদল মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের মতে, সিরাত অধ্যয়নের একটি নতুন প্ল্যাটফরম বা নতুন চিন্তাকেন্দ্র রয়েছে; কিন্তু এই চিন্তাকেন্দ্রের সূত্রপাতের প্রেক্ষাপট, কারণ এবং আজকের যুগে এর সুফল-কুফল ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকাও প্রয়োজন।

এই চিন্তাকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় মিশরে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে। যেমন : আমরা জানি, সে সময় মিশর ছিল গোটা মুসলিমবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র ও মারকাজ। ইসলামের কোনো ব্যাপারে মুসলিমদের জানার প্রয়োজন পড়লে মিশরি আলিমদের চিন্তা ও জ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হতো। ঠিক হজের উদ্দেশ্যে বের হলে বা সালাতে দাঁড়ালে যেমন খানায়ে কাবার দিকে মুখ করা হয়, তেমনই।

মিশরের দিকে গোটা মুসলিমবিশ্বের তাকিয়ে থাকার সুযোগটিকে কাজে লাগানোর চিন্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নীরবে ও শান্তিতে বসে থাকতে দেয়নি। ব্রিটিশরা যদিও আগুন-লোহার বলে জোরপূর্বক মিশরের বুকে তাদের শাসনদণ্ড দাঁড় করিয়েছিল; কিন্তু এটা ছিল তাদের সাময়িক দখল। ফলে এতটুকুতেই তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না। কারণ, যতক্ষণ জামে আল আজহার[১১]-এর জীবন্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আছে, ততক্ষণ তারা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বলতে গেলে বিফল। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দুটি সমাধানের যেকোনো একটি অবলম্বন করা অপরিহার্য ও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়—

> **এক.** জামিয়া আজহারের সাথে মুসলিমবিশ্বের সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাহলে মুসলিম উম্মাহর ওপর এর কোনো প্রভাব ও কর্তৃত্ব বাকি থাকবে না।
>
> **দুই.** স্বয়ং আজহারের কার্যগত কেন্দ্র একেবারে মাঠে-ময়দানে নেতৃত্বদান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং নেতৃত্বের বাগডোর সেদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, যেদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ লাভে পুরোপুরি সফলতা অর্জিত হয়। তাহলে পরিশেষে এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতাও থাকবে না।

ব্রিটিশরা দ্বিতীয় পথটি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বেছে নেয়। কারণ, এ পথে গন্তব্যে পৌঁছা ছিল অতি সহজ এবং এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল একেবারে ক্ষীণ।

---

১১. পৃথিবীর প্রাচীন ও বিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ জামে আল আজহার, মিশর।

১২. 'আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন: কিসসাতুল জিহাদিল মাসলুল' গ্রন্থের।

জামে আল আজহারের ইলমি ও ফিকরি নেতৃত্বের মস্তিষ্কে ঢোকার একটি রাস্তা ছিল মুসলিম উম্মাহর দুর্বল ও মর্মান্তিক বিষয়গুলোকে চর্চার রূপ দেওয়া। ফলে মিশরের মধ্যস্থতায় গোটা মুসলিমবিশ্বের অনুভূতি ও উপলব্ধি হবে ক্ষতবিক্ষত।

সেই অনুভূতি ছিল, মুসলিম উম্মাহ একদিকে দুর্বল, শতধা বিভক্ত ও অনৈক্যের শিকার আরেক দিকে পশ্চিমা ও ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও কৃষ্টিকালচারের বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সফলতা দৃশ্যমান। এসব দেখে মুসলিম জাতিও সেই দিনের অপেক্ষার প্রহর গনা শুরু করে, যেদিন তারাও পিঠের ওপর চাপানো বোঝা থেকে হালকা হবে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে চলবে। (কিন্তু সেদিন কবে?)

ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই চিন্তা ও স্বপ্নটাই মিশরের কয়েকজন চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী নেতার মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই চিন্তার কথা বলে তাদের বোঝানো হয়—পশ্চিমা বিশ্বও আজকের মুসলিমদের মতো একসময় হাত-পায়ে শিকল বাঁধা ছিল; কিন্তু যখন তারা ধর্মকে বিজ্ঞানের অনুগামী করতে পেরেছে, ঠিক তখনই তারা তাদের শিকল ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, ধর্ম এক বিষয়, বিজ্ঞান আরেক বিষয়। তবে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অনুগামী করা গেলেই দুটির মাঝে সামঞ্জস্য ও আনুকূল্য হতে পারে। সুতরাং মুসলিমবিশ্ব বাস্তবে এবং সত্যিই যদি এ ধরনের স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রত্যাশী হয়ে থাকে, তাহলে তাকেও একই পথে চলতে হবে। মুসলিম উম্মাহকেও ঠিক সেভাবে ইসলাম বুঝতে হবে যেভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ঈসায়ি ধর্ম অনুধাবন করেছে; কিন্তু ইসলামি চিন্তাকে অবোধগম্য অদৃশ্য[১৩]-বিষয়ক আকিদা-বিশ্বাস থেকে আলাদা করা অথবা সেগুলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠি ও মানদণ্ডের অধীন না করা পর্যন্ত এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। বাস্তবে এবং কার্যগতভাবে এর প্রতিফলন ঘটবে না।

এই কানাঘুষা বিদ্যুৎগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি মুক্তচিন্তার রূপ নেয়। চিন্তাটি ইউরোপের অগ্রগতির সামনে অন্ধ চিন্তাবিদদের খুবই মনে ধরে। তারা একে সাদরে বরণ করে নেয়। এরা এমন সব মুসলিম বুদ্ধিজীবী, যাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান তখনও দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়নি। আবার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানও তাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তারা আধুনিক বিজ্ঞানের যাচাইয়ের উর্ধ্বে বা

১৩. 'গাইব-বিষয়ক বিশ্বাস', যা শুধু আল্লাহ তায়ালা অথবা নবিজির কোনো বর্ণনা শুনে 'না দেখে'-ই মুসলিমগণ বিশ্বাস করে থাকেন।

মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের আওতার বাইরের সব আকিদা-বিশ্বাস মন থেকে বের করে দেয়। এ ব্যাপারে তারা যতটুকু সামনে অগ্রসর হয়, সেটাকে 'ধর্মীয় সংস্কার'-এর নাম দিয়ে সমাজে প্রচার করে। বিভিন্ন বিষয়ে সংশোধনের নামে হাজার রকমের সংস্কারের কাজ তারা করে। সিরাত রচনা এবং সিরাত বোঝার সহায়ক শাখা-প্রশাখাও তাদের এই সংস্কার নামক হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি পায়নি। এ শাখায় তারা সিরাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ ও উপযোগী একটি চমকপ্রদ ও সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। তারা মূলনীতি বানায়, অদৃশ্য বিশ্বাস বা গাইব-সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যদি অভ্যাস পরিপন্থি হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিকূল এবং মানবিক চিন্তার উর্ধ্বে থাকে, তাহলে সেটাই পরিত্যক্ত ও বর্জিত। তা গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়ার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই।

এসব দুর্বল ঈমানদারদের জন্য ইতিহাস রচনার উক্ত আধুনিক পদ্ধতি অর্থাৎ 'ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি/অভিমত' অতি উত্তম একটি আশ্রয়স্থলের রূপ নেয়। এভাবে তারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী ইতিহাসশাস্ত্র তো বটেই, নবিজির পবিত্র সিরাতকেও বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার আওতাভুক্ত করে নেয়।

ধীরে ধীরে সিরাতশাস্ত্রের ওপর এমন সব গ্রন্থ আসতে থাকে, যেগুলোতে রেওয়ায়াত, সূত্র, নীতিমালা ও হাদিস যাচাইয়ের শর্তাবলি দৃঢ়করণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-পদ্ধতি ও মানসিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণকেই ভিত্তি করা হয়। ফলে এভাবে লেখকের ব্যক্তিগত আকর্ষণ, বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার ধর্মীয় ঝোঁকের প্রতিচ্ছবিও লেখায় ঢুকে পড়ে। আর পরিণতি হিসেবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে একসময় সেসব ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা নবি-জীবনের সাধারণ অভ্যাস-পরিপন্থি অস্বাভাবিক ঘটনা এবং জাগতিক পর্যবেক্ষণবিরোধী মুজিজাগুলোকে মেনে এবং স্বীকার করে নিতে বেঁকে বসে।

তারা নবিজির অসাধারণ তীক্ষ্ণতা, মাহাত্ম্য, অসম্ভব সাহসিকতা এবং এ ধরনের হাজারো গুণের কথা চমৎকার সব শব্দ-বাক্যে লিখতে গিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করে ফেলে। অথচ তার নববি সত্তার আলোচনায় একফোঁটা কালিও খরচা করেনি। উদ্দেশ্য, পাঠকের মনোযোগকে নবিজির এসব বাহ্যিক গুণাবলিতেই ব্যস্ত ও মশগুল রাখা আর নবিজির মানবসত্তার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত বিশেষ গুণ নবুয়ত, রিসালাত এবং নবুয়ত-সংশ্লিষ্ট এ ধরনের বহু গুণের দিক থেকে পাঠকের চোখ ফিরিয়ে রাখা।

সিরাত লেখার এই প্রকৃতি ও প্রবণতার সর্বোত্তম নমুনা হুসাইন হাইকাল[১৪]-এর 'হায়াতে মুহাম্মাদ' গ্রন্থ। লেখক তার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ও অনুরাগের কথা গর্বের সাথে বলতে গিয়ে লেখেন—

> নিঃসন্দেহে সিরাত ও হাদিসের কিতাবাদিতে যা কিছু লেখা আছে, আমি সেখান থেকে কিছুই নিইনি; বরং এই আলোচনা ইলমি (বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক) পদ্ধতিতে উল্লেখ করাকেই আমি প্রাধান্য দিয়েছি।

সিরাত বোঝার এই নতুন পদ্ধতির একটি নমুনা *নুরুল ইসলাম* পত্রিকায় 'বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ' শিরোনামে প্রকাশিত মরহুম মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজদি[১৫]-এর ধারাবাহিক প্রবন্ধ। ধারাবাহিক প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লেখেন—

> আমাদের পাঠকসমাজ খেয়াল করলে দেখে থাকবেন, সিরাত রচনায় আমাদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা নবিজির অলৌকিক ঘটনা ও মুজিজা বর্ণনায় অনেক বেশি দীর্ঘ আলোচনা করি না। যতক্ষণ সেটার কারণ বর্ণনা সাধারণ উপায়-উপকরণ দিয়ে সম্ভব, শুধু ততক্ষণই করি। কৃত্রিম বিষয় দিয়ে কোনো ব্যাখ্যা আমরা করি না। (বরং তখন আমরা ব্যাখ্যা ছাড়াই বিশ্বাস করতে বলে থাকি।)[১৬]

নব আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিতে সিরাতচর্চার নমুনায় প্রাচ্যবিদদের অসংখ্য গ্রন্থ আছে। তাদের যাবতীয় রচনা সেই 'ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমত'-সংবলিত ইতিহাসগ্রন্থের চেয়ে বেশি মূল্যের কিছু নয়।

প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি খুললেই দেখা যায়, নবিজির বড়োত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় কোনো কমতি নেই। তাঁর মান-মর্যাদা ও উত্তম গুণাবলি আলোচনায় সামান্য ঘাটতি নেই; কিন্তু তাঁর পবিত্র জীবনে ওহি ও নবুয়ত বলে যে একটা কিছু ছিল, তা আর তাদের রচনায় হারিকেন জ্বালিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবন যে কুরআন নামক সংবিধানমাফিক পরিচালিত হয়েছে, তার হদিস আর তাদের লেখা রচনায়

---

১৪. মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল (১৮৮৮-১৯৫৬)। জন্ম-মৃত্যু মিশরে। কবি। সাহিত্যিক। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। ১৯১২ সালে তিনি ফ্রান্সের সোরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৫. মুহাম্মাদ ফরিদ ওয়াজদি (১৮৭৮-১৯৫৪)। জন্ম : আলেকজান্দ্রিয়া, মৃত্যু : কায়রো। তিনি প্রায় এক যুগ *আল আজহার* পত্রিকার محرر ছিলেন। বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক। তার একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। *বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ* তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১৬. *নুরুল ইসলাম*, 'বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে সিরাতে মুহাম্মাদ' শিরোনামে প্রকাশিত রচনা।

মেলে না। তো এভাবে নবুয়তবিহীন জীবনালেখ্য লেখার উদ্দেশ্য—পাঠকের মনোযোগ ও খেয়াল যেন তাঁর নববি সত্তা থেকে সরে যায়।

অনুরূপ এরা তথ্য পরিবেশনে সূত্র ও বর্ণনার নিয়ম অনুসরণ করে না। ফলে যেসব ঘটনার ওপর নির্ভর করা বা যেগুলো বর্ণনার গুরুত্বদানে পাঠকের তেমন কোনো লাভ নেই, সেগুলোও পাঠককে মেনে নিতে এবং বিশ্বাস করতে হবে। এভাবে এই নতুন চিন্তাকেন্দ্রের ইতিহাস রচনায় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিমতের অনুসরণে একটি প্রশস্ত ময়দান তৈরি হয়; যেখানে তারা নবি-জীবনে তাদের অপছন্দনীয় বাস্তবতাগুলো অনায়াসেই ছাঁটাই করে দিতে পারে। সেসব বাস্তবতা জ্ঞান ও বিশ্বাসের যতই শক্তিশালী ও মজবুত দলিল হোক না কেন; তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ঝোঁক, মনের কুপ্রবৃত্তি ও বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ইতিহাসের স্বরূপ এবং এর আড়ালে নিহিত কারণসমূহের অধীনে মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর বানিয়ে নেয়। আর কোনো বর্ণনাকে গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদের মনের চাহিদাকেই সাধারণ ফয়সালাকারী নির্ধারণ করে।

এ ব্যাপারে আমরা দেখেছি, তারা কুরআন বা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত অভ্যাস পরিপন্থি ঘটনাগুলোর এমন অপব্যাখ্যা করেছে, যার ফলে এসব ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ও অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেসব ঘটনার ব্যাখ্যায় তারা অত্যন্ত কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা ফিলের 'আবাবিল' (ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি)-'এর অর্থ আয়াতে কারিমা থেকে একেবারে সুস্পষ্ট। তবুও তারা একে 'বসন্ত রোগ' বলে এর অপব্যাখ্যা করেছে।

ইসরা ও মিরাজের ঘটনা কুরআনে কারিমের সূরা বনি ইসরাইলে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। অথচ এর অপব্যাখ্যাও তারা করেছে 'আধ্যাত্মিক ভ্রমণ এবং স্বপ্ন দেখা' বলে। অনুরূপ বদরের প্রান্তরে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের মাধ্যমে চাক্ষুষ যেই সাহায্য করেছেন, সেটার বিকৃত ব্যাখ্যাও তারা করেছে আল্লাহ তায়ালার 'অদৃশ্য বা অর্থগত সাহায্য' বলে।

তাদের এ ধরনের আজগুবি ও হাস্যকর শতসহস্র অপব্যাখ্যার মধ্যে আরেকটি হলো—নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তি; তাঁর ওপর সাহাবায়ে কিরামের ঈমান আনয়ন এবং দিগ্বিদিক জয়ের রহস্য ও ব্যাখ্যা। তাদের বক্তব্য, এই সবকিছুই নাকি অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সচ্ছলতা লাভের প্ররোচনায় ডানপন্থিদের

মোকাবিলায় বামপন্থিদের অভ্যুত্থান। এবং ধনিক শ্রেণির প্রতি হিংসার অনলে প্রজ্বলিত গরিবদের বিরোধিতা।

সিরাত অধ্যয়নের বিবেচনায় 'বিশেষ করে' এবং ইসলামি ইতিহাসের বিবেচনায় 'সাধারণভাবে' এই নতুন পদ্ধতি একটি মারাত্মক ও গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। বিষয়টি সাধারণ মুসলিমদের কাছে আরও ঘোলাটে ও ঝামেলার হয়ে দাঁড়ায় যখন তাদের চোখের সামনেই মুনাফিক ও প্রবৃত্তিপূজারি কিছু নামধারী মুসলিম একে পছন্দ করে এবং সাদরে বরণ করে নেয়।

এসব সরলমনা লোকদের কাছে গোপন থেকে যায়, 'ইসলামি আকিদার সংস্কারমূলক আন্দোলন' আখ্যা দিয়ে মুসলিমদের যেই দিকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তা একটি ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার নীলনকশা। যেটার হীন উদ্দেশ্য—ইসলামি আকিদার মূলোৎপাটন। তাদের কাছে গোপন থেকে যায়, ইসলামকে যদি তার গায়েবি মৌলিকত্ব থেকে খালি করে ফেলা যায়, তাহলে এই শূন্যতা পূরণে এমন কিছু বিষয় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে, যেগুলো একে ধ্বংস ও বরবাদ করে ছাড়বে।

এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালার ওহিই হলো ইসলামের উৎস ও ফোয়ারা এবং এই ওহিই সকল অভ্যাস-পরিপন্থি অলৌকিক ঘটনা ও যাবতীয় অদৃশ্য বাস্তবতার প্রধান ও প্রথম বিষয়। এখন যে ব্যক্তি নবি-জীবনের অভ্যাস পরিপন্থি কাজ ও অলৌকিক ঘটনাগুলোকে শুধু জগতের স্বাভাবিক রীতিনীতির বিপরীত এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিকূল হওয়ার কারণ দেখিয়েই অস্বীকার করবে, সে এই একই দলিলের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালার ওহি এবং ওহির সংবাদ-সংশ্লিষ্ট হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতিকেও একবাক্যে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করবে।

তাদের থেকে আরও লুকানো হয়েছে, যেই ধর্ম আপাদমস্তক কল্যাণকর, কোনো যুগেই তার কোনো সংস্কারক বা সংশোধনকারীর প্রয়োজন নেই। (বরং সংস্কারের প্রয়োজন হবে সেই ধর্ম পালনকারীদের।)

এই সবকিছুই তাদের থেকে লুকানো ও গোপন করা হয়েছে। অথচ সেসব চিন্তাবিদের এই বিষয়গুলো বোঝা ও অনুধাবন করা বিজ্ঞানেরই একটি দাবি ও চাহিদা। এই শর্তে যে, সাধারণ মুসলিমরাও তাদের থেকে এসবের বাস্তবতা ও যুক্তি সম্পর্কে অবগত হবে; কিন্তু তাদের নিজেদের চোখ ও দৃষ্টিই ইউরোপীয় নব উন্নতি ও দ্বিতীয় পুনর্জাগরণের ব্যাপারে রাতকানা হয়ে ছিল এবং বৈজ্ঞানিক ও শাব্দিক জাদুতে তারা ছিল বিকারগ্রস্ত। তাই জ্ঞান ও যুক্তির বাহ্যিক শিরোনাম ও অনুভূতি

ছাড়া সেগুলোর ভেতর ও বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছতে তারা সক্ষম হয়নি। অথচ তাদের তীব্র প্রয়োজন ছিল—শুধু শিরোনাম নয়; বরং সেগুলোর বাস্তবতার পুরোপুরি বোধ পর্যন্ত তারা পৌঁছবে এবং সেগুলোর অনুভূতিকে সঠিক পন্থায় হজম করবে।

এ থেকে তো তারা প্রভাবিত হয়ইনি; বরং উলটো ইউরোপে ঈসায়ি মতবাদে আগুন ধরানোর মতো ইসলামেও যেন বিশৃঙ্খলা ঘটে, এমন একটি কুসংস্কারমূলক আন্দোলনের ধারণা তাদের মাথায় ঢুকে যায়।

এভাবে এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের চিন্তাকেন্দ্র মূলত একটি আবেগী প্রজ্বলন ছিল—যা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের কোনো ছটা ছিল না; যা বিবেককে আকৃষ্ট করতে পারে।

এই চিন্তা-মতাদর্শের বর্তমান পরিণতি

বাস্তবতা ও আসল কথা হলো, সিরাত রচনা ও বোঝার ব্যাপারে এই নতুন মতাদর্শের পক্ষ থেকে যেই গুরুত্ব পাওয়া গেছে এবং কেউ কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে এই চিন্তাকেন্দ্রের যেই পৃষ্ঠপোষকতা ও সমাদর করেছিলেন, তা ছিল একটি ঐতিহাসিক বাঁক মাত্র; যার সময়কাল পেরিয়ে গেছে।

এই বাঁকের সাথে নিজেরাও ঘুরে যাওয়া মূলত তাদের অপারগতা ছিল। যেমন : পেছনে আলোচনা হয়েছে—এসব বুদ্ধিজীবী তাদের দীর্ঘ উদাসীনতা ও অলসতার পর যখন চোখ খোলে, তখন তাদের সামনে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতির চিত্র ছিল। আর এটি একটি স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক বিষয়—আলোর ওপর যখন চোখের প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তখন চোখে ধাঁধা লেগে যায় এবং বস্তুসামগ্রীর স্বরূপ ও বাস্তবতা উন্মোচিত হয় না। এমনকি সমজাতীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিসের মাঝে তফাত ও পার্থক্য করাটাও মুশকিল হয়ে পড়ে। তবে ধীরে ধীরে কিছু সময় গেলে এবং চোখের সাথে আলো খাপ খেয়ে গেলে চোখ দৃশ্যমান জিনিসের মাঝে পার্থক্য ও তফাত করতে পারে এবং বস্তুর স্বরূপ ও বাস্তবতা পুরোপুরি উন্মোচিত হয়। যার মধ্যে সামান্য লুকোচুরি বা সন্দেহ পর্যন্ত আর থাকে না।

উপর্যুক্ত ব্যাপারেও হুবহু তা-ই হয়েছে। আজকের আধুনিক যুগের সচেতন ও শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের সামনে থেকে এ ধরনের সকল পর্দা ও আবরণ সরে গেছে এবং সবকিছুই নিজের স্বরূপ ও বাস্তবতা তার আসল বিষয়ের সাথে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অতীতের লোকেরা শুধু শব্দই আঁকড়ে ধরে ছিল এবং এর বাহ্যিক অনুভূতির ধোঁকায় পড়ে ছিল অথচ বর্তমান অবস্থা ও যুগ অনেক পরিবর্তিত। এ ছাড়া আজকের যুগে

তারা প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্লেষক ও স্বাধীন চিন্তার গবেষকদের অন্তর্দৃষ্টির ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রেখে মেনে নিয়েছে, অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ও মুজিজার মধ্যে কোনো কিছুই তার মূল বিষয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ও নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী নয়।

জগতে সচরাচর ঘটিত ঘটনার বিপরীত কাজকে সাধারণ অভ্যাস পরিপন্থি নাম দেওয়ার কারণ হলো, সেগুলো সাধারণত এবং প্রতিনিয়ত মানুষের চোখে পড়ে না। কিন্তু তাই বলে 'প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ঘটে চলা বৈশ্বিক কাজকারবার' এমন কোনো মানদণ্ড নয়, যার ভিত্তিতে আরেকটি বিষয়কে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য বলে নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা যায়। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—মানুষের চোখ সাধারণত যেগুলো দেখে অভ্যস্ত এবং যেসব কর্মকাণ্ড তাদের কাছে পরিচিত, শুধু সেগুলোই ঘটতে পারে আর যেগুলো দৃশ্যমান ও দৃষ্টিগোচর নয় এবং মানুষের কাছে পরিচিত নয়, সেগুলো আসলে ঘটতেই পারে না—এটি একটি ভুল ধারণা। বিজ্ঞান এমন কোনো বৃথা দাবির পক্ষাবলম্বন করে না। বর্তমান যুগের প্রত্যেক মুহাক্কিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন বিশ্লেষণ ও গবেষণা হলো—'কারণ' ও 'ঘটনা'-এর মাঝে যেই সম্পর্ক আমরা দেখি, তা ধারাবাহিক ও লাগাতার অবলোকন ও প্রত্যক্ষ দর্শনে আগমনকারী সম্পর্ক; যা থেকে বিশ্লেষণ ও কারণ বর্ণনার সীমা পেরিয়ে একটি কানুন উদ্ভাবন করা হয়। আর এই কানুনটি ওই সম্পর্ক প্রকাশের অনুগামী হয়, বিরোধী নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, অভ্যাস পরিপন্থি কাজ ও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত মুজিজার ব্যাপারে তোমার কী মত? তাহলে সে বর্তমানের ভাষায় যেই জবাব দেবে, তা প্রত্যেক জ্ঞানী বরং যেকোনো সভ্য ব্যক্তিই বুঝতে পারবে। সে বলবে—অভ্যাস পরিপন্থি ও অলৌকিক বিষয় আমার বিষয়বস্তু ও বিশেষ জ্ঞানের কোনো কিছু নয়। আমি এসবের ওপর কোনো বিধান আরোপ করতে পারি না। (কারণ, আমার বিষয়বস্তু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ।) তবে এ ধরনের কোনো ঘটনা যদি আমার সামনে পেশ করা হয়, তাহলে তখন এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হবে। যেটা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে হবে, বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে হবে। তারপর এই ঘটনা থেকে একটি কানুন বের করতে হবে।"[১৭]

---

১৭. *কুবরাল ইয়াকিনিয়্যাতিল কাওনিয়্যাহ*, আল বুতি রাহিমাহুল্লাহ : ৩২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিশ্চয়তার সাথে বলা যায়—সেই যুগের অবসান অবশ্যই ঘটেছে, যেই যুগের কোনো বিজ্ঞানী ধারণা করতে পারত—

> এই প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব তার সংঘটিত ঘটনার ওপর চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কাজেই এখন আর এতে কোনো পরিবর্তন বা বদল হতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আসল ও বাস্তবিক কথা সে সময়েই পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যখন উলামায়ে কিরাম মাঠে নামেন এবং বিশেষ করে ইমাম গাজালি রহ.[১৮]-এর মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক এর মোকাবিলায় বলেন—

> কারণ ও ঘটনার মধ্যবর্তী সম্পর্ক কেবল বস্তুহীন সম্পর্ক থেকে মোটেও বেশি কিছু নয়। এর হুকুম-আহকাম ও নীতিমালার মাঝখানে জ্ঞান একটি প্রাচীর তুল্য, যা এই বস্তুহীন সম্পর্কের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বস্তুহীন সম্পর্কের রহস্য বা ভেদ কী?

তো এর জ্ঞান সেই মহান আল্লাহর কাছে, যিনি নিখিল বিশ্বের অণু-পরমাণু সৃষ্টি করেছেন এবং সবাইকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আমরা দেখেছি, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ডেভিড হিউম[১৯] কতটা স্পষ্ট করে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

হ্যাঁ, প্রত্যেক বিবেকবান ও বাস্তববাদীই নৈমিত্তিক স্বাভাবিক ঘটিত বা অভ্যাস পরিপন্থি যেকোনো ঘটনার সংবাদ গ্রহণে একটি শর্ত রেখে দেন। তা হলো, সংবাদ প্রদানকারী পর্যন্ত পৌঁছার সংরক্ষিত কোনো ইলমি রাস্তা থাকা, যেই পথ বর্ণনা ও সূত্রের নীতিমালা; যাচাই-বাছাই এবং এর সকল চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করতে পারে। এভাবে যে—এর দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হবে। এই মর্যাদা

---

১৮. আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল গাজালি তুসি নিশাপুরি (৪৫০-৫০৫ হি.)। জন্ম-মৃত্যু তুস নগরীতেই। একাধারে ফকিহ। সুফি। উসুলবিদ। দার্শনিক ও মৌলিক চিন্তাবিদ। দার্শনিক হিসেবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ। অধিবিদ্য, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও সুফিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে চারশোর অধিক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো—'তুহফাতুল ফালাসিফা', 'ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দিন', 'মাকসিদুল ফালাসিফা'। এগুলোর মধ্যে 'ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দিন' সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেক পণ্ডিতের মতে—যদি সকল মুসলিম চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয় এবং উক্ত গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকে, তবে ইসলামের পক্ষে সে ক্ষতি সামান্য মাত্র। সুফিরা এ গ্রন্থকে কুরআনের পরে অন্যতম দ্বিতীয় গ্রন্থের মর্যদা দান করেন।

১৯. ডেভিড হিউম (David Hume, 1711-1776)। স্কটিশ সংস্কারক। দর্শনের শিক্ষক। ঐতিহাসিক। অর্থনীতিবিদ। লাইব্রেরিয়ান ও প্রাবন্ধিক। বর্তমানে তিনি তার দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদ, সংশয়বাদ ও প্রকৃতিবাদ সম্পর্কীয় উচ্চ মানের প্রভাবশালী মতামতের জন্য খুবই পরিচিত।

ও গুরুত্বপূর্ণ ইলমি মাপকাঠির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন, এখানে তা উল্লেখ সমীচীন নয়।

নিঃসন্দেহে আজ যেকোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই হুসাইন হাইকালের মতো ব্যক্তির লেখাটি পড়ে বিস্ময়ের সাথে দুঃখও বোধ করবেন। তিনি তার 'হায়াতে মুহাম্মাদ' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন—

> আমি আমার এই গ্রন্থে সিরাত ও হাদিসের কোনো কিতাব থেকে সহায়তা নিইনি; বরং ইলমি (বৈজ্ঞানিক) পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্ত পরিবেশনকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

অর্থাৎ, তিনি পাঠককে বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি ইলমের এত কদর করেছেন এবং এত মর্যাদা দিয়েছেন যে, *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এর মতো প্রমাণিত বিশুদ্ধ হাদিস নেওয়ারও দরকার পড়েনি। ভাবখানা এমন যে, ইমাম বুখারি রহ. নবিজির হাদিস ও সাহাবায়ে কিরামের বাণী সংগ্রহ ও সংকলনে যেই অতুলনীয় ও বে-নজির ইলমি সতর্কতা অবলম্বন করে বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় মূলনীতি ও শর্তাবলি আরোপ করেছেন, তাদের সেসব কীর্তি যেন ইলমি তরিকাকে বিকৃত করারই নামান্তর। ইমাম বুখারি ও মুসলিমের যুগে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অনুমান, নিরূপণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমগুলো কাজে লাগানোর কারণে ইলমের মাহাত্ম্য, মনোযোগ এবং এর পদ্ধতি ও মানদণ্ডের চাহিদা বেড়ে গেছে। সুতরাং আজকের যুগেও যদি সেগুলো গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এটা ইলমের জন্য মারাত্মক হুমকি এবং মস্ত বড়ো বিপদ নয় কি?

আমরা কীভাবে সিরাত পড়ব

এই কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট, আরব উপদ্বীপে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নববি সত্তার আবির্ভাব ঘটে, তখন তিনি নিজেকে গোটা মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি ও রাসুলরূপেই প্রকাশ করেন। যেন অতীতের নবি-রাসুলগণ যেই সত্য ও বাস্তবতা নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা তিনি মানবজাতির সামনে পরিষ্কার করতে পারেন এবং বোঝাতে পারেন—পূর্ববর্তী নবিগণ নিজ নিজ উম্মত ও সম্প্রদায়ের ওপর যেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন, এটি সেই আদিম কাজ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে পরিষ্কার করে দেন—তিনি নবি-রাসুলগণের সেই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ প্রেরিতজন। তিনি নিজের আরও পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনিও আর সবার মতো একজন মানুষই। মানবীয় সব ধরনের বিষয়-আশয় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। তবে

আল্লাহ তায়ালা সবার বিপরীতে তাঁর ওপর দয়া করে তাকে ওহির মাধ্যমে বিশেষ গুণে গুণান্বিত ও বিশেষিত করেছেন। গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম ও বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ও আমানত তাঁর কাঁধে অর্পণ করেছেন। যেন তারা নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তার দ্বারা পরিচিত ও অবগত হয় এবং জানতে পারে, আল্লাহর সাম্রাজ্যের মানচিত্রে কাল ও স্থানের বিবেচনায় এই পার্থিব জীবন-জগতের অবস্থান বা মূল্যায়ন কতটুকু? আর মৃত্যুর পর তাদের পরিণতি কী হবে? অনুরূপভাবে সেদিকেও যেন তাদের খেয়াল ও দৃষ্টি থাকে যে, তাদের ব্যক্তিসত্তার সাথে ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডের মিল থাকাও জরুরি। যা থেকে কেউই পালাতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ, তাদের জন্য আবশ্যক—তারা ঈমান-ইয়াকিন এবং ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও দাসরূপেই নিজেকে প্রকাশ করবে; যেভাবে দাস ও বান্দারূপেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন।

তারপর তিনি সার্বিকভাবে তাদের কাছে পরিষ্কার করে দেন, গোটা মানবজাতির কাছে আল্লাহ তায়ালার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার যেই দায়িত্ব তিনি তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছেন, তাতে কমবেশি বা রদবদল করার সুযোগ বা ক্ষমতা তাঁর নেই। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বাণীই তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ▫

> সে যদি আমার নামে কোনো কথা বানিয়ে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তাঁর জীবন-ধমনি। তোমাদের কেউ তাঁকে আমার থেকে বাঁচাতে পারতে না।"

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবজাতির সামনে নিজেকে রাজনৈতিক লিডার, জাতীয় নেতা, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বা সমাজসংস্কারক হিসেবে প্রকাশ করেননি। এমনকি তার গোটা জীবনের কোনো পর্বেই এমন কোনো দিক বা দাবির প্রকাশ ঘটেনি, যা থেকে অন্তত ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি এসবের কোনো কিছু অর্জন ও হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা করেছেন।

---

২০. সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ৪৪-৪৭

অতএব, আমাদের কাছে বিবেক ও যুক্তির দাবি, এমন ব্যক্তির জীবনী অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সাধারণ জীবন অধ্যয়নের সময় তাঁর সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখব, যার ভিত্তিতে তিনি নিজেকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। যেন তাঁর সত্যবাদিতা বা মিথ্যাবাদিতার দলিল তাঁর কথা ও বক্তব্য মাফিক যাচাই-বাছাই করতে পারি।

তাই আমাদের জন্য আবশ্যক, সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে তার জীবনের সকল মানবিক দিক ও ব্যক্তিসত্তা অধ্যয়ন করব। তবে শর্ত থাকবে অধ্যয়ন থেকে যেন এমন কিছু মূলনীতি আমাদের অর্জিত হয়, যেগুলোর মাধ্যমে ইলমি ও অবজেক্টিভ দলিল-প্রমাণের সাথে তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটে।

হ্যাঁ, তাঁর ব্যক্তিসত্তা সংশ্লিষ্ট নবুয়ত-রিসালাতের যেসব গূঢ় অর্থের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা তিনি করেছেন, আমাদের চিন্তাশক্তি ও মস্তিষ্ককে সেগুলো উদঘাটনে এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকিরে ব্যতিব্যস্ত করে রাখার কথা আসত না, যদি তাঁর বিষয়টি আমাদের শেষ পরিণতির সাথে এবং আমাদের স্বাধীনতা ও আমলি জিন্দেগির সাথে সম্পৃক্ত না হতো; কিন্তু ব্যাপারটি যেহেতু আমাদের ব্যক্তিসত্তার সাথে গভীর ঘনিষ্ঠ এবং এ থেকে ইলম, জ্ঞান ও আমলের বিবেচনায় আমাদের ওপর কিছু দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়, তাই এর জন্য আমরা যদি সামান্য চেষ্টাও না করি, তাহলে আমাদের কপালে দুর্ভাগ্য, বঞ্চনা ও বরবাদিই চেপে বসবে। এমতাবস্থায় এ বিষয়কে আমাদের সত্তার সাথে যুক্ত মনে না করা বা দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাওয়া খুবই মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

তাঁর জীবনের উদ্দিষ্ট সত্তাগত অংশ অধ্যয়ন বাদ দিয়ে যেই দিকগুলোর সাথে আমাদের জীবনেরও কোনো সম্পর্ক নেই এবং তিনি নিজেও তার পরিচিতি প্রদানে সেগুলো বিবেচনা করেননি, সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকা আমাদের আহমকি, বোকামি ও পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে, এক লোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন—

আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।

তারপর পরিপূর্ণ ইয়াকিন ও অকাট্য বিশ্বাসের সাথে সংবাদ দিয়ে বলছেন—

আল্লাহর কসম! তোমরা দিন শেষে রাতে যেমন ঘুমাও, ঠিক সেভাবে হায়াত শেষে একদিন মারাও যাবে। এবং ঘুম শেষে তোমরা যেভাবে জেগে ওঠো ঠিক সেভাবেই তোমাদের মৃত্যুর পর আবার তোমরা জীবিত হবে। আল্লাহর কসম! তারপরের জীবনের কোনো পরিসমাপ্তি ঘটবে না। হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম।

কিন্তু আমরা তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর কথার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর তীক্ষ্ণতা, কথার মাধুর্য, বাগ্মিতা, অলংকার ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ফিকিরে লেগে গেলাম?

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কেউ চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় আরেকজন তার কাছে গিয়ে তার উদ্দিষ্ট গন্তব্যের পথ দেখিয়ে দিলো। পাশাপাশি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর পথের ব্যাপারেও সতর্ক করল; কিন্তু এই লোক তার পথনির্দেশনার দিকে মনোযোগ না দিয়ে তার দৈহিক আকার-আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদের রং-ডিজাইন এবং তার কথা বলার ধরন ও ভঙ্গিমার দিকেই বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল এবং তারপর সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিচার-বিশ্লেষণেই ডুবে থাকল।

বিবেক ও যুক্তির দাবি, আমরা নবিজির জীবনী থেকে তাঁর আবির্ভাব, সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি, তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তাঁর ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতা এবং সংগ্রাম ও সাধনা, লড়াই ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, শত্রু-মিত্রের সাথে আচার-ব্যবহার, দুনিয়া এবং এর ভোগবিলাস ও স্বাদ গ্রহণে তাঁর অবস্থান-সংশ্লিষ্ট জীবনের নানা দিকে চিন্তা-ফিকির করে এমনভাবে অধ্যয়ন করব, যা সততা ও তীক্ষ্ণতার ভিত্তিতে ইলমি মূলনীতির আলোকে হবে। যেই অধ্যয়নে বর্ণনা ও বর্ণনার সূত্রধারার নির্ধারিত কায়দাকানুন ও মূলনীতি এবং শর্তাবলির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি ও লক্ষ থাকবে।

এ ব্যাপারে আমার অভিমত, নিঃসন্দেহে বিবেক ও যুক্তির দাবি তো হলো—আমরা এ সবকিছুই অধ্যয়ন করব। তবে আমাদের সকল গবেষণা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় শর্ত থাকবে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ফলাফলে পৌঁছা। যেন নবিজির নবুয়ত এবং তাঁর জীবনে ওহির স্বরূপ ও বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতি লাভ করা যায়। এমনকি প্রবৃত্তির তাড়না বা গোঁড়ামির আশ্রয় না নিয়ে আমরা যখন নিরপেক্ষভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ফলাফলে পৌঁছব, তখন আমাদের সামনে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাবে, যেই শরিয়ত ও

সংবিধান তিনি আমাদের দিয়েছেন, তা তিনি নিজ থেকে রচনা বা উদ্ভাবন করেন, নি; বরং তা তিনি পূর্ণ আমানতদারির সাথে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর ইচ্ছা ও চাহিদা মোতাবেক আমাদের পর্যন্ত কেবল পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর নিশ্চয়তা ও অকাট্য বিশ্বাসের সাথে এ কথা আমাদের জানা হলে অবশ্যই আমাদের বুঝে আসবে—শরিয়ত ও হুকুম-আহকামের হিফাজত এবং সেগুলো বাস্তবায়নে কত দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর চেপে আছে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নবি-জীবনের শুধু মানবিক দিকগুলোর যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাঁর জীবনের সেই উদ্দিষ্ট দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, সে নিজের সামনে এমন সব কঠিন-জটিল বিষয় ও ঝামেলার সমাবেশ দেখতে পাবে, যেগুলোর সমাধান বের করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামি বিজয়গাথা দেখে পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে যে, পারস্পরিক খুনখারাবি, সংঘাত ও সহিংসতায় ব্যবহৃত সেই পুরোনো কয়েকটি তরবারিই পরে কীভাবে জাদুর মতো ইরানি সংস্কৃতির প্রাসাদের পর প্রাসাদ এবং রোমীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপটকে মুহূর্তেই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে!

অনুরূপ তৎকালীন সময়ে আরব উপদ্বীপে সর্বপ্রথম পূর্ণতাপ্রাপ্ত সংবিধানের শাসনব্যবস্থা দেখেও তারা হতবাক হয়ে যাবে। কারণ, আরব উপদ্বীপ ঠিক ওই সময় একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান লাভ করে, যখন সে জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ঝামেলায় জর্জরিত সামাজিক জীবনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার নার্সারির ছাত্র ছিল। ইতঃপূর্বে তার বুকে প্রকৃত কোনো সভ্যতা বিকশিত হয়নি, কোনো সংস্কৃতিও তার পর্যন্ত পৌঁছেনি।

ভাবা যায়—এসব কীভাবে সম্ভব হয়েছে? অথচ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, চাক্ষুষ ও সুস্পষ্ট থিওরি হলো—কোনো জাতির মধ্যে পরিপূর্ণ সংবিধান ঠিক তখনই অস্তিত্ব লাভ করে, যখন তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরম্পরায় চলতে চলতে সমাজে পাকাপোক্ত ও সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং তাদের সামাজিক কাঠামো ও আদর্শ উন্নতির ধাপগুলো একে একে অতিক্রম করে।

এগুলো এমনই প্যাঁচানো ও ঝামেলাপূর্ণ মন্তব্য ও অভিব্যক্তি, যেগুলোর সমাধান নবিজির নবুয়তের বিষয়ের বিবেচনা ও চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল সাধারণ কারণ-ইস্যু

এবং ঘটনা বোঝার চার দেওয়ালে আবদ্ধ থেকে কেউই কোনোভাবেই সমাধান করতে পারবে না।

এই শ্রেণির একাধিক বিশ্লেষক চোখে পড়েছে, যারা এসব ঝামেলার নিরসন করতে গিয়ে উলটো নিজের চিন্তা-ফিকিরের মধ্যেই এদিক-সেদিক, ডান-বামে ফেঁসে গেছে। পরিশেষে পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার শিকার হয়েছে। অথচ এই পেরেশানি থেকে নিষ্কৃতির পথ কিন্তু অতি সহজ। আমরা নবি-জীবনী অধ্যয়নে যৌক্তিক ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করব এবং তার সাধারণ জীবন অধ্যয়ন করতে তাঁর ওই ব্যক্তিসত্তাকে দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু ও মেরুদণ্ড বানাব, যেই পৃথক বিবেচনায় তিনি নিজ সত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ব্যস, তাহলেই সব ঝামেলা শেষ!

এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করায় আমাদের অকাট্য ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি। তাঁর নবুয়ত-রিসালাত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার দ্বারা সেসব পেরেশানি ও ঝামেলাপূর্ণ বিষয় থেকে মুক্তির রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে। কারণ, তিনি যেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন, সেই মহামহিম সত্তার পূর্ণ সমর্থন তাঁর হাসিল হওয়া এবং তাঁর থেকেই তার ওপর কুরআন নাজিল হওয়া আবশ্যক ও জরুরি। এই ধারাবাহিকতায় তাঁর প্রচারিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধানও সেই পবিত্র সত্তা ও স্রষ্টার পক্ষ থেকেই আগত ও আনীত বলে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক। বুঝতে হবে, কুরআন কোনো অক্ষরজ্ঞানহীন সম্প্রদায়ের রচিত বা লিখিত কিতাব নয়।

কাজেই এই গ্রন্থের ব্যাপারে অবাক বা পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ কথাটিই আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে বলেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝

তোমরা হীনম্মন্যতায় পড়ো না এবং দুঃখ করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে; যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হয়ে থাকো।[২১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

২১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ.

আমি চাইলাম দেশে (মিশরে) দুর্বল করে রাখা লোকদের ওপর দয়া করতে, তাদের নেতা বানাতে এবং তাদের উত্তরাধিকার বানাতে।[২২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ▫

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে। তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন—আমি অবশ্যই তোমাদের পরপর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করব।[২৩]

তিনি আরও বলেন—

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ▫

আল্লাহ এমনটি করেছেন কেবল সুসংবাদ প্রদানের জন্য। এবং যেন তোমাদের অন্তরগুলো প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।[২৪]

এসব সুস্পষ্ট আয়াতে কারিমাকে চোখের সামনে রাখলে মুহূর্তেই সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে; বরং সমাধান বেরিয়ে আসে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। আবার বিষয়টিও তার স্বাভাবিক গতিতে চলে যে, সেই মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী সত্তার যেই মুমিন বান্দা তাঁর দেখানো ও নির্দেশিত পথ ও রাস্তা

২২. সূরা কাসাস, আয়াত : ৫
২৩. সূরা আনফাল, আয়াত : ৯
২৪. সূরা আনফাল, আয়াত : ১০

মজবুতি ও দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরে, তিনি তার সকল প্রয়োজন ও চাহিদা অবশ্যই পূরণ করেন। আর স্রষ্টা ও মালিক যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয়ী ও সাহায্য করতে পারেন; বরং পেরেশানির কথা তো তখন, রাসুল যখন তাঁর দায়িত্বপালন সত্ত্বেও এবং মুমিন বান্দারা তাঁর নির্দেশিত পথে চলার পরও সেই পরম সত্তা তাঁর রাসুলকে দেওয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং মুমিন বান্দাদের দেওয়া সহযোগিতার ওয়াদা মুজিজারূপে পূরণ না করবেন।

* * *

আরবকে ইসলাম উদ্ভবের উৎসভূমি বানানোর রহস্য

নবিজির বরকতময় জন্ম জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপে[২৫]। তার গোটা জীবন এখানেই কাটে। তিনি আরবেরই কুরাইশ বংশের সন্তান।

এ পর্যায়ে তাঁর পবিত্র জীবনীর ওপর আলোচনা শুরু করা এবং পৃথিবীতে তাঁর আগমন, নবুয়ত-রিসালাত প্রাপ্তিস্থল আরব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার আগে পৃথিবীর সকল ভূখণ্ড বাদ দিয়ে আরব ভূমিকে আল্লাহ তায়ালার বেছে নেওয়া এবং দুনিয়ার অন্য সব সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীর মোকাবিলায় আরব জাতিকে ইসলামের প্রথম পতাকাবাহী বানানোর রহস্য কী, তা জানা খুবই জরুরি মনে করছি।

---

২৫. **আরব উপদ্বীপ** : সরলীকৃত আরব (আরবি : شِبْهُ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّة *Shibhu L-jazĭrati L-'arabiyyah,* 'আরব দ্বীপ' বা আরবি : جَزِيرَةُ الْعَرَب *Jazĭratu L-'arab,* 'আরব দ্বীপ'), আফ্রিকা উত্তর-পূর্ব আরব প্লেটের ওপর অবস্থিত পশ্চিম এশিয়ার একটি উপদ্বীপ। ভূতাত্ত্বিক আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এশিয়া উপমহাদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এটি পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপ, ৩,২৩৭,৫০০ কি.মি. (১,২৫০,০০০ বর্গমাইল)। আরব উপদ্বীপে ইয়েমেন, ওমান, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জর্ডান ও ইরাকের কিছু অংশ রয়েছে। ৫৬ থেকে ২৩ মিলিয়ন বছর আগে লোহিত সাগরে যাত্রা শুরু হওয়ার পর এই উপদ্বীপটি পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে লাল সাগরের সীমান্তে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পারস্য উপসাগর, উত্তরে লেভান্ট এবং ভারত মহাসাগরের সীমানা দক্ষিণ পূর্ব থেকে আরব উপদ্বীপের মধ্যপ্রাচ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক ভূমিকায় এবং আরব বিশ্বে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল ভান্ডারের কারণে এটির ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক যুগের আগে এটি চারটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত : হিজাজ (তিহামা), নাজদ (আল ইয়ামামা), দক্ষিণ আরব এবং পূর্ব আরব হিজাজ এবং নাজদ সৌদি আরবের বেশির ভাগ সদস্য। দক্ষিণ আরব ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের কিছু অংশ (নাজরান, জিজান, আসির) এবং ওমান গঠিত।

অবশ্য এই রহস্য খুলে বলার আগে ইসলামপূর্ব আরবদের স্বভাব-প্রকৃতি ও চারিত্রিক গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কেমন ছিল, তাও জানা জরুরি মনে করছি। পাশাপাশি তার আবাসভূমি এবং সেই ভূখণ্ডের আশপাশের অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান কী, তাও জানা আবশ্যক। তা ছাড়া আরব উপদ্বীপের পার্শ্ববর্তী এলাকার জাতিগোষ্ঠী যেমন : ইরান, রোম ও হিন্দুস্থান প্রভৃতি ভূখণ্ডের বসবাসরত সম্প্রদায়ের স্বভাব-প্রকৃতি, চালচলন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার এবং ধর্মীয় রীতিনীতি কেমন ছিল, সে সম্পর্কেও ধারণা থাকা অপরিহার্য।

প্রথমে পার্শ্ববর্তী এলাকার জাতিগোষ্ঠীর আলোচনা দিয়ে শুরু করা হচ্ছে; যাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ইসলামি সভ্যতার উত্থানের কিছু আগপর্যন্ত নিজ নিজ অঞ্চলে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

তৎসময়ের প্রধান দুটি সাম্রাজ্য

তৎসময়ের গোটা পৃথিবীতে প্রধানত দুটি সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল। সুসভ্য ও উন্নত সংস্কৃতির ধারক-বাহক বলতে তাদেরই বোঝাত। একটি অগ্নিপূজারি পারস্য সাম্রাজ্য[২৬], দ্বিতীয়টি ঈসায়ি ধর্মাবলম্বী রোম সাম্রাজ্য[২৭]। এদের পরের স্তরে ছিল তুলনামূলক অনালোচিত ইউনান বা গ্রিস[২৮] ও হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ।

---

২৬. পারস্য ইরানের প্রাচীন নাম। ১৯৩৫ সাল পর্যন্তও বহির্বিশ্বে ইরান 'পারস্য' নামে পরিচিত ছিল, যদিও ইরানিরা বহু যুগ ধরে নিজেদের দেশকে ইরান নামেই ডেকে এসেছে।

আর্যজাতির বিভিন্ন গোত্র খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে ইরানীয় মালভূমিতে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেদেস ও পারসিক গোত্রদ্বয়। পারসিকদের প্রথম বড়ো নেতার নাম ছিল হাখমানেশ; এক যুদ্ধবাজ সেনাপতি। হাখ'মানেশ ৬৮১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ জীবিত ছিলেন। ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কুরোশ পারসিকদের রাজা হন। কুরোশ মেদেসীয় বা মেদীয়দের পরাজিত করেন, ৫৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ লিদিয়া রাজ্য এবং ৯৩৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন জয় করেন।

মূলত কুরোশের অধীনেই পারস্য এশিয়ার অন্যতম মহাশক্তিতে বা সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কুরোশের পুত্র ২য় কামবুজিয়েহ ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশর বিজয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ৫২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট ১ম দরিয়ুশ ক্ষমতায় আসার পর সিন্ধু নদ পর্যন্ত পারস্যের পূর্ব সীমানা প্রসারিত করেন। ৬০২ সালে বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের সাথে তাদের এক দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হয়। ৬১৯ সাল নাগাদ তারা এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ এবং মিশর দখল করতে সক্ষম হয়; কিন্তু বাইজেন্টীয় সম্রাট হেরাক্লিউস এসে তার গতিরোধ করেন এবং ৬২২ থেকে ৬২৭ সালের মধ্যেই পারসিকেরা তাদের পুরোনো সীমান্তে ফেরত যেতে বাধ্য হয়। এবং এরপর সর্বশেষ মুসলিমদের কাছে পরাজিত হওয়ার মাধ্যমে পারস্যশক্তির বিলুপ্তি ঘটে।

২৭. রোমান সাম্রাজ্য (লাতিন : Imperium RŌmĀnum) প্রাচীন রোমান সভ্যতার একটি অংশ। রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০-৪০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম নগরী ছিল, এবং রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ৫০-৯০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল; যা তৎকালীন পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ২০% ছিল। রোমান সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক,

ইরান : ইরানের পারস্য সাম্রাজ্য সে সময় পারস্পরিক সংঘাত, বিভিন্ন দর্শন মিশ্রিত ধর্মীয় মতবাদের নিশানাস্থল হয়ে ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি জরথুষ্টবাদ। এটি ছিল পারস্য সম্রাট ও শাসকদের ধর্ম। এই ধর্মের দর্শন মোতাবেক (নাউজুবিল্লাহ) নিজের মা, মেয়ে, বোনকে বিয়ে করা সম্মান ও মর্যাদার বিষয় বলে মনে করা হতো। এমনকি ঈসায়ি পঞ্চম শতাব্দীর শাসক সম্রাট দ্বিতীয় ইয়াজদিগার্দ[২৯] তার আপন মেয়েকে বিয়ে করে। এ ছাড়াও আরও বহু ও অসংখ্য কুকীর্তি ও নিকৃষ্ট চরিত্রের কাণ্ড এখানে প্রচলিত ছিল যেগুলো সবিস্তারে বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই।

এই অঞ্চলে দ্বিতীয় ধর্ম ছিল মুজাক্কিয়া। ইমাম শাহরাস্তানি রহ.[৩০] বলেন—

> এই ধর্মে 'দোসর' দর্শন ছিল। এর ব্যাখ্যা হলো—এই দর্শন অনুযায়ী নারী এবং অন্যান্য মালিকানাধীন সহায়সম্পত্তিতে পরস্পরের এমন সমানাধিকার ও শরিকানা ছিল, যেমনই প্রাকৃতিক আগুন-পানি-বাতাস ও চারণভূমিতে একজন আরেকজনের অংশীদার ও হকদার থাকে। এই

সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সেই সময়কার সব থেকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহের অন্যতম ছিল। এটি ছিল প্রাচীনকালের এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যসমূহের একটি।

রোমান প্রজাতন্ত্র প্রায় ১৪০০ বছর ধরে টিকে ছিল। এর প্রথম দুই শতক রাজনৈতিক সুস্থরতা এবং সমৃদ্ধির কারণে এদের 'রোমান শান্তি'র যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২৮. গ্রিস (গ্রিক : Ελλάδα এলাদা বা Ελλάς এলাস) ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের একটি রাষ্ট্র—যা বলকান উপদ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এর সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে উত্তরে বুলগেরিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া ও আলবেনিয়া; পূর্বে তুরস্ক। গ্রিসের মূল ভূমির পূর্বে ও দক্ষিণে এজিয়ান সাগর অবস্থিত, আর পশ্চিমে রয়েছে আইওনিয়ান সাগর। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উভয় অংশে গ্রিসের অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে। গ্রিস ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মিলন স্থলে অবস্থিত। বর্তমান গ্রিকদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে একসময়ের পৃথিবী বিজয়ী প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং প্রায় চার শতাব্দীর অটোমান সাম্রাজ্য। এই দেশ পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের সূতিকাগার এবং গণতন্ত্রের জন্মদায়ক স্থান হিসেবে সুপরিচিত।

বর্তমানে গ্রিস একটি উন্নত দেশ এবং ১৯৮১ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। এ ছাড়া এটি ২০০১ সাল থেকে ইকোনমিক অ্যান্ড মনিটারি ইউনিয়ন অব দ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ১৯৫১ সাল থেকে ন্যাটো এবং ১৯৬০ সাল থেকে ওইসিডি-এর সদস্য হিসেবে আছে।

২৯. **ইয়াজদিগার্দ** (ফারসি : یزدگرد سوم) (ইয়াজদিগার্দ শব্দের অর্থ 'দেবতার সৃষ্টি') ছিলেন পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্যের অষ্টাত্রিংশ ও শেষ জরথুষ্ট্রীয় সম্রাট (ইরানের সর্বশেষ সম্রাট হচ্ছেন মুহাম্মাদ রেজা শাহ পাহলভি)। ইয়াজদিগার্দ দ্বিতীয়। সম্রাট বাহরামজোরের ছেলে। উপাধি—বাহরাম নরম ও বাহরাম সিপাহ। শাসনকাল ৪৩৮-৪৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। তার সময়ে সাম্রাজ্য ছিল বড়ো বড়ো সমস্যা, অস্থিরতা, অনৈক্য ও নৈরাজ্যের শিকার। এ সময়ে আর্মেনিয়ায় খ্রিষ্টানদের সাথে সাসানিদের যুদ্ধ হয়। খ্রিষ্টানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কারকুকে কয়েক হাজার খ্রিষ্টান সৈন্য জবাই করা হয়।

৩০. আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল করিম শাহরাস্তানি (৪৭৯-৫৪৮ হি.)। বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত অতীতের খুরাসানের শাহরাস্তানে জন্ম। এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে ধর্মতত্ত্ববিদ। দার্শনিক। ফকিহ। প্রতিষ্ঠিত লেখক। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মিলাল ওয়ান নিহাল'।

ধর্মটি প্রবৃত্তিপূজারি ও যৌনোন্মাদদের খুবই পছন্দ হয়। তারা একে সানন্দে গ্রহণ করে।[৩১]

রোম : রোমের মাথায় সে সময় ঔপনিবেশিক ভূত চেপে বসেছিল। এর একদিকে অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় মতানৈক্যের ঘনঘটা বাজছিল, আরেক দিকে শাম ও মিশরের ঈসায়িদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। এই সাম্রাজ্য তখন সীমাহীন মনোবৃত্তি, নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ এবং টার্গেট অনুযায়ী খ্রিষ্টবাদ প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে নিজের সামরিক শক্তি ও ঔপনিবেশিক ধান্দার ওপর নির্ভর করছিল।

এই সাম্রাজ্যও চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা ও নষ্টামিতে কোনো দিক দিয়ে ইরানের চেয়ে কম ছিল না। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও আরোপিত কর ও ট্যাক্সের কারণে প্রজা ও জনগণ অর্থনৈতিক জুলুম ও অধঃপতনের শিকার ছিল।

ইউনান (গ্রিস) : এই ভূখণ্ড তখন দার্শনিক অনর্থক কথাবার্তা ও তর্কের খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যেই ডুবে ছিল। যা দ্বারা না হচ্ছিল মানুষের কোনো উন্নতি-অগ্রগতি, আর ছিল না কারও কোনো উপকার লাভের ক্ষীণ আশা।

হিন্দুস্থান (ভারতবর্ষ) : হিন্দুস্থান সম্পর্কে বলার মত যতটুকু আছে, তা আল্লামা আবুল হাসান আলি নদভি রহ.[৩২] (১৯১৪-১৯৯৯ ঈসায়ি)-এর ভাষায় নিম্নরূপ—

> হিন্দুস্তানের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য রয়েছে, ঈসায়ি ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে এই সাম্রাজ্য ধর্মীয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি দিক থেকে অবনতি ও অধঃপতনের শিকার ছিল। এবং পার্শ্ববর্তী ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে সামাজিক, চারিত্রিক যেই অধঃপতন ছিল, হিন্দুস্তানেও তার কোনো কমতি বা ঘাটতি ছিল না।[৩৩]

এখানে এ-ও জেনে রাখা উচিত, ইতিহাসে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় প্রাপ্ত দুর্ভাগ্য, দুর্ভাবনা ও পথ না পাওয়ার মাঝে অভিন্ন কারণ ও বুনিয়াদি হেতু ছিল

---

৩১. আল মিলাল ওয়ান নিহাল, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬-৮৭

৩২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলি হাসানি নাদাবি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাতি হাসান রা.-এর অধস্তন বংশধর। ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে তার জন্ম ও মৃত্যু। তিনি দারুল উলুম নদওয়ার ছাত্র ও রেক্টর ছিলেন। একজন সিদ্ধহস্ত লেখক। ঐতিহাসিক। গবেষক। ইসলামি চিন্তাবিদ। দায়ি ও সুবক্তা। তার সবগুলো বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার 'মা জা খাসিরাল আলামু বিইনহিতাতিল মুসলিমিন' গ্রন্থটি আরব জাহানে সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

৩৩. মানবেতিহাসে মুসলিম জাতির উত্থানের ফল : ২৮

তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচার। এই সভ্যতা ও কৃষ্টি-কালচারের ভিত্তি ছিল শুধুই জাগতিক বস্তুর মূল্যায়নের ওপর। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোনো আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল না। যাতে তারা বস্তুকে ছুড়ে ফেলে সেই আদর্শে আদর্শবান হতে পারে, অথবা সেই সত্তার অনুকরণ করতে পারে।

এর কারণ, সাংস্কৃতিক উপাদান ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পৃথিবীতে চলার জন্য শুধু ওসিলা ও কারণ হয়ে থাকে। তাই কোনো জাতি ও সম্প্রদায় যদি বিশুদ্ধ চিন্তা ও সর্বোচ্চ আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সংস্কৃতিই তাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভাবনার গভীর গর্ত ও খাদে ফেলে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে সেই জাতিই যদি ধর্মীয় সঠিক অনুশাসন এবং আল্লাহ তায়ালার ওহির দ্বারাই অর্জিত সুস্থ বিবেকের সর্বোচ্চ মানদণ্ড বহন করতে পারে, তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল্যায়ন পূর্ণাঙ্গ সফলতা ও সৌভাগ্যের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকাশস্থলে পৌঁছানোর অতি উত্তম ও সহজ উপায়ে পরিণত হয়। আর তৎকালীন সময়ে এই সঠিক ধর্ম ও সুস্থ বিবেকই ছিল অস্তিত্বহীন।

জাজিরাতুল আরব : এই ভূখণ্ড তখন উপর্যুক্ত অঞ্চলগুলোর সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় পুরোপুরি সুস্থির ও শান্তিপূর্ণ ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাক থেকে দূরে বরং একেবারে পৃথক মেরুতে ছিল। এখানকার বাসিন্দারা ইরানিদের মতো (ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে) অসভ্যতা ও নিকৃষ্টতা এবং তাদের আয়েশি ও বিলাসী জীবনের মতো জীবনযাপন করত না। ফলে তারাও তাদের মতো অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা করত না এবং অবাধ যৌনতা ও চারিত্রিক অধঃপতনের দর্শনকে ধর্মের রূপ দেয়নি।

অনুরূপ রোমকদের মতো শক্তি-সামর্থ্যও তাদের ছিল না; যা দিয়ে তারা আশপাশের ও পার্শ্ববর্তী সব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তাদের কাছে ছিল না গ্রিক দর্শন ও যুক্তিতর্কও; যার আলোকে তারা অনর্থক কথাবার্তা ও রূপকথার অনিষ্ট ও মন্দত্বকে নিজেদের অভ্যাস বানাতে পারে।

তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ছিল একেবারে কাঁচা পদার্থের মতো; যাকে এখনও কোনো ফর্মায় ঢালা হয়নি। তাদের স্বভাব-চরিত্রে একেবারে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মানবিক স্বভাব পরিলক্ষিত হতো এবং উচ্চ পর্যায়ের মানবিক গুণ, যেমন—বিশ্বাস, সহমর্মিতা, বদান্যতা ও দানশীলতা, আত্মসম্মানবোধ, চারিত্রিক স্বচ্ছতা ও

পবিত্রতা ইত্যাদির প্রতি তাদের স্বভাবগত ঝোঁক ছিল; কিন্তু তাদের কাছে সেই জ্ঞান ও পথনির্দেশনা ছিল না—যা তাদের গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা পরিষ্কার দেখিয়ে দিতে পারে।

এরা স্পষ্ট অজ্ঞতা ও আদিম স্বভাব-প্রকৃতির জীবনযাপন করছিল। এ কারণেই তারা সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যায়ন পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা হারিয়ে ফেলে।

যে কারণে এরা নিজ বংশীয় মর্যাদা এবং নিজের ব্যক্তিগত সম্মান ও অবস্থান বজায় রাখতে আপন সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যাসন্তানকে পর্যন্ত জীবন্ত পুঁতে ফেলত। বদান্যতা ও দানশীলতার আগ্রহ-উদ্দীপনায় নিজের প্রয়োজনীয় ও জরুরি সহায়সম্বলও খুইয়ে দিত এবং নিজের ইমেজ ও আত্মসম্মানবোধ এবং গোত্রীয় সহযোগিতা-মিত্রতা চুক্তি অটুট রাখতে পরস্পরের মধ্যে দিনের পর দিন খুনখারাবি লাগিয়েই রাখত।

এই দুটি অবস্থাকেই আল্লাহ তায়ালা তাদের পথ হারানো ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন—

وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ▫

আর ইতঃপূর্বে তো তোমরা ছিলে পথহারা।[৩৪]

এই অবস্থাকে যদি অন্যান্য জাতির সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার থেকে দূরে থাকার কারণে আরবজাতিকে অপারগ ও নিরুপায় মনে হবে। সেসব সম্প্রদায় উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের আলো পাওয়া সত্ত্বেও বিকৃতি ও গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল। তারা যেন বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তা-ফিকির ও পরিকল্পনা-গ্রহণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নষ্টামির জালে আটকে ছিল।

আল্লামা মুহাম্মাদ আল মুবারক রহ.[৩৫] লেখেন—

> যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আজকের যুগেও পর্যালোচনা করে দেখতে পারে—আরব উপদ্বীপ কীভাবে দুটি সভ্যতার মাঝ বরাবর অবস্থিত। একদিকে বস্তুনির্ভর পশ্চিমা সভ্যতা—যা মানুষের মনুষ্যত্বের একটি বাস্তববিরোধী ত্রুটিপূর্ণ চিত্র পেশ করে; অপরদিকে আছে কাল্পনিক ও

---

৩৪. সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৮

৩৫. আল্লামা মুহাম্মাদ মুবারক (১৯১২-১৯৮১)। জন্ম দিমাশককে, ইনতিকাল মদিনায়। আরবি ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জন করেন। আদিব (আরবি ভাষার খ্যাতিমান সাহিত্যিক) হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ।

আধ্যাত্মিক সভ্যতা—যা ভারতবর্ষ, চীন এবং এগুলোর আশপাশের সভ্যতার মতোই।"

ইসলামপূর্ব আরব অধিবাসী এবং তার পার্শ্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর চিত্র তুলে ধরলেই আরবভূমিকে নবিজির জন্ম ও তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তিস্থলের মর্যাদায় ভূষিতকরণে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের ইচ্ছা ও দাবি কী ছিল, তা খুব সহজেই বুঝে আসবে। সাথে জানা যাবে, কেন আরবজাতিকেই গোটা দুনিয়ায় ইসলামি দাওয়াতের প্রথম পতাকাবাহী বানানো হয়েছে; যার ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত এক বিশাল ও বৃহৎ মানবগোষ্ঠী আল্লাহ তায়ালারই ইবাদতে মশগুল।

কারও কারও ধারণা, আল্লাহ তায়ালার হিকমত ছিল বাতিল ধর্ম ও পচা সংস্কৃতি লালনকারী জাতির চিকিৎসা এবং তাদের হিদায়াত করা বড়ো কঠিন ও কষ্টকর। কারণ, তাদের সমাজে প্রচলিত নষ্টামি ও বিকৃতিগুলো গর্ব ও অহংকারের বিষয় হয়ে থাকে। এর কারণ, তারা সেগুলোকে ভালো মনে করে। বিপরীতে যারা এখনও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মানুষের কাছে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হওয়ার মতো স্তর অতিক্রম করেনি এবং তারা নিজেদের অজ্ঞতাও স্বীকার করে আবার নিজেদের জ্ঞান-গরিমা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দাবিদারও নয়, তারা নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির সমাধান করতে এবং হিদায়াত লাভ করতে বেশি আগ্রহী ও উদ্‌গ্রীব থাকে। (ঠিক এ কারণেই আরব উপদ্বীপকে বেছে নেওয়া হয়েছে।)

কিন্তু এই ধারণা কতটুকু ঠিক? বরং সঠিক উত্তর হলো—আল্লাহ তায়ালার হিকমত কখনো এমন ছিলই না। এ ধরনের ব্যাখ্যা ও কারণ বর্ণনা তাদের ব্যাপারে করা যায়, যাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সীমিত এবং শক্তি-সামর্থ্য সাধারণ এবং তারা সহজ-কঠিনের মধ্যে পার্থক্য করে নিজেদের আরাম-আয়েশের দিক বিবেচনা করে সহজটিকে বেছে নেওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত হয়। আর ঝামেলা মনে করে কঠিনকে ছেড়ে দেয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি প্রশ্ন করা হয় ইরান, রোম বা হিন্দুস্তানের মাটিতে আল্লাহ তায়ালা কেন ইসলামের আবির্ভাব ঘটালেন না এবং যেভাবে তিনি আরব ভূমিকে ইসলামি দাওয়াতের সফলতার স্থান বানাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি এসবের

---

৩৬. *আল উম্মাতুল আরাবিয়্যাহ ফি মারিকাতি তাহকিকিজ জাত* : ১৪৭

কোনোটিকে কেন করলেন না? অথচ এ কাজ তার পক্ষে মোটেও কঠিন ছিল না। কারণ, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রতিটি উপায়-উপকরণের অস্তিত্ব দানকারী।

এর উত্তর—এ কাজও ঠিক সেই হিকমত ও রহস্যরেই অংশ, যেই রহস্য বলে তিনি তার প্রিয়নবিকে নিরক্ষর ও অক্ষর জ্ঞানহীন রেখেছেন। তাঁর নবিকে তিনি দুনিয়ার কোনো কিতাব পড়তে দেননি এবং কোনো অক্ষরও তাঁর হাত দিয়ে লেখাননি। যেমন : এর কারণ তিনি নিজেই বলেছেন—

إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ▫

নইলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করত।[৩৭]

অর্থাৎ তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে যেন কারও কোনো সন্দেহ না থাকে এবং তাঁর দাওয়াতের সত্যতায় কারও কোনো দ্বিধা ও সংশয়ের অবকাশ না থাকে।

এই হিকমতের শেষ কথা বা সারাংশ হলো—তাঁর আগমনের পরিবেশ-প্রকৃতিও যেন তাঁর মতো আশপাশের জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় উম্মি হয়। অর্থাৎ, আশপাশের কোনো সংস্কৃতির প্রভাব যেন সেখানে না থাকে। এতে করে তাদের চৈন্তিক মাপকাঠি ও মানদণ্ড আশপাশের বাতিল দর্শনের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকবে।

যেমন : মানুষের মনে সন্দেহের উদয় হতো, যদি তারা দেখত—তিনি লিখতে জানেন, পূর্ববর্তী কিতাবের জ্ঞান তাঁর আছে, প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত এবং আশপাশের কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে জানাশোনা আছে। ঠিক তেমনি তাদের মনে সন্দেহ জাগত যদি দেখত—ইসলামি দাওয়াত প্রচারিত হচ্ছে এমন সম্প্রদায় থেকে, যারা কৃষ্টি-কালচার, দর্শন-ইতিহাস ইত্যাদির মোটামুটি একটি পর্যায়ে আছে। ইরান, রোম ও গ্রিসের অবস্থা যেমন ছিল আরকি। এমতাবস্থায় যেকোনো ফিতনাবাজ মিথ্যুকের জন্য এই ধারণার সুযোগ থাকত যে, এ তো সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও দার্শনিক চিন্তা-ফিকিরের প্রস্রবণ। যার সূত্র ধরেই এই বেনজির সভ্যতা-সংস্কৃতি ও পূর্ণাঙ্গ শরিয়তের জন্ম হয়েছে। কাজেই এটা আহামরি কোনো কিছু নয়।

---

৩৭. সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৮

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ[৩৮]

তিনি ওই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদের থেকেই একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেই রাসুল তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা অবশ্যই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।"

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার দাবি ছিল, তাঁর নবি এবং নবির জাতিও যেন উম্মি হয়। যাতে করে নবুয়তের মুজিজা এবং ইসলামি শরিয়ত মন-মস্তিষ্কে পুরোপুরি স্পষ্টরূপে বসে যায়। ফলে এই দাওয়াত এবং জাগতিক অন্যান্য দাওয়াতের মাঝে কোনো সাদৃশ্য বা মিল না থাকে। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, এটা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল।

আরব উপদ্বীপকে ইসলামের মারকাজ ও প্রাণকেন্দ্র বানানোর আরও কিছু হিকমত ও রহস্য আছে, যেগুলো মুহাক্কিক গবেষক ও বিশ্লেষকদের কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার। সেগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো—

এক.

এ কথা সবার জানা, আল্লাহ তায়ালা মসজিদে হারামকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। ইবাদত ও ধর্মীয় কাজকর্ম পালনের লক্ষ্যে এটিই পৃথিবীর বুকে প্রথম নির্মিত ঘর। মক্কার এই উপত্যকা থেকেই অসংখ্য নবি-রাসুলের আদি পিতা ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত প্রচার হয়েছে। ফলে এর আবশ্যকীয় দাবি ও চাহিদা ছিল—মিল্লাতে ইবরাহিমির আকৃতিতেই ইসলামের কেন্দ্র ও সেন্টার এই পুণ্য ও বরকতময় ভূমিতেই সর্বশেষ নবি ও রাসুলের আবির্ভাব হোক। আর এটা কীভাবে না হয়ে পারে, যেখানে তিনি তাঁরই ঔরসজাত অধস্তন সন্তান!

দুই.

আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থানও এমন গুরুত্বপূর্ণ, দাওয়াত প্রচারের ভারী বোঝা বইতে পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। কারণ, এই ভূখণ্ড আশপাশের বিভিন্ন জাতি ও

---

৩৮. সূরা জুমুআ, আয়াত : ২

গোষ্ঠীর একেবারে মধ্যমণি। এ কারণেই এখানে উদিত ইসলামি দাওয়াতের কিরণ দিগ্বিদিক সকল জাতির কাছে এবং প্রতিটি রাজ্য ও এলাকায় অতি সহজেই পৌঁছে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সময়কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এর শতভাগ সত্যতা প্রমাণিত হয়।

তিন.

আল্লাহ তায়ালার হিকমত এ-ও ছিল, আরবি ভাষাই যেন ইসলাম প্রচার-প্রসারের ভাষা হয়। এই আরবিভাষাই যেন কুরআনে কারিমের প্রথম সারির মুখপাত্রদের এবং আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হয়।

পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা হয় এবং একটির সাথে অন্যটির তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে—আরবি ভাষার এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে , যেগুলো অন্য কোনো ভাষায় নেই। ঠিক এ কারণেই এই ভাষারই অধিকার ও হক ছিল, সেটিই হবে বিভিন্ন এলাকা ও অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মুসলিমদের দ্বীনচর্চার প্রথম বাকরীতি।

* * *

নবিজির দাওয়াতের সাথে পূর্ববর্তী দাওয়াতের মিল-অমিল

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে কোনো নবি প্রেরিত না হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবি হওয়ার বিশ্বাসটি 'জরুরাতুত দ্বীন'-এর (অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় বিষয়াদি) অন্তর্ভুক্ত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবিদের মাঝে দৃষ্টান্তটা এ রকম যে, এক ব্যক্তি খুব চমৎকার করে একটা ভবন বানিয়েছে; কিন্তু কোনো এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। মানুষ যখন তাতে ঘুরতে আসে, তখন ভবনের চমৎকারত্ব দেখে আশ্চর্য প্রকাশ করে। আর তারা (পরস্পরে) বলাবলি করে—এই যে, এখানে ইটটা কেন বসানো হলো না?
>
> আমি হলাম সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবি। (অর্থাৎ আমার মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি। আমাকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে নবুয়তের ধারাবাহিকতা পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে।)[৩৯]

নবিজির দাওয়াতের মূল প্রকৃতি কী? পূর্ববর্তী নবিদের দাওয়াতের সাথে তাঁর দাওয়াতের মিল কেমন? এসব বিষয় আমরা স্পষ্টভাবে এ হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ তাঁর এই দাওয়াতি মিশন পূর্ববর্তী নবিদের দাওয়াতি মিশনের

---

৩৯ *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*। শব্দচয়ন করা হয়েছে *সহিহ মুসলিম* থেকে।

পূর্ণাঙ্গতা বহন করে; এবং একে আরও সমৃদ্ধ করে। বিষয়টা একটু স্পষ্ট করি। প্রত্যেক নবির দাওয়াতই দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

- ✓ ১. আকিদা (বিশ্বাস)
- ✓ ২. তাশরি' ও আখলাখ (প্রণীত বিধান ও নৈতিকতার শিক্ষা)

আকিদার ব্যাপারটা অপরিবর্তনশীল। আদম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবিই একই রকম আকিদা লালন করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। সেই আকায়িদ বা বিশ্বাসগুলো কী কী? আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস, আল্লাহর উপযোগী নয়—এমন সব গুণাবলি থেকে তাঁকে উর্ধ্বে রাখার বিশ্বাস, আখিরাতের হিসাব ও জান্নাত-জাহান্নামের বিশ্বাস। প্রত্যেক নবিই তাঁর জাতিকে এই মৌলিক বিশ্বাসগুলো লালনের দাওয়াত দিতেন। প্রত্যেক নবি তাঁর পূর্ববর্তী নবির (আকিদার) দাওয়াতকে স্বীকৃতি দিতেন এবং পরবর্তী নবির সুসংবাদ দিতেন।

নবি-রাসুলগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিতে প্রেরিত হলেও সবাই একই ধরনের মৌলিক কিছু বিশ্বাস লালনে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এসব বিশ্বাস মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও এসবের প্রতি মানুষজনকে ডাকা ছিল তাঁদের দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারটা কুরআনে কারিমে স্পষ্ট করেছেন—

شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ما وَصّىٰ بِهِ نوحًا وَالَّذى أَوحَينا إِلَيكَ وَما وَصَّينا بِهِ إِبرٰهيمَ وَموسىٰ وَعيسىٰ ۖ أَن أَقيمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرَّقوا فيهِ ۚ

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।[৪০]

আকিদার বিষয়ে নবিদের দাওয়াতের ভিন্নতার কথা ভাবাই যায় না। কারণ, আকিদাসংক্রান্ত বিষয়াবলি একটা 'ইখবারের' (সংবাদ) সমষ্টি। সকল নবি একই সংবাদ দিয়েছেন। এখন মনে করেন, দুজন একই বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিলো।

---

৪০ সূরা শূরা, আয়াত : ১৩

আর আপনার দাবি—তারা দুজনই সত্যবাদী। তাহলে এখানে আপনার দাবি বাস্তব হতে হলে দুজনের সংবাদের মাঝে বৈপরীত্য থাকতে পারবে না। একই হতে হবে। এখানেও ব্যাপারটা এমনই।

সুতরাং এটা অসম্ভব যে, এক নবিকে 'আল্লাহ তায়ালা তিনের একজন' (খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস)—এই দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করা হবে। তাঁর পরে আরেক নবিকে 'আল্লাহ তায়ালা এক, তাঁর কোনো শরিক নেই'—এ দাওয়াত দিয়ে পাঠানো হবে। যেহেতু তাঁরা দুজনই একই বিষয়ে অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন।

এ তো গেল আকিদা সম্পর্কে কথা। আর 'তাশরি'; এটা ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবনঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনব্যবস্থা। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এটা ভিন্ন হতে পারে। এক নবির তাশরিয়ের সাথে আরেক নবির তাশরি মিলবে না। কারণ, তাশরিয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে ইনশা (সৃজনশীল); ইখবার নয়। কাল ও জাতিভেদে তাশরিয়ের রূপ-রঙে ভিন্নতা আসতে পারে। কারণ, তাশরিয়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে উভয় জগতে মানুষের কল্যাণসাধন। সুতরাং সেই কল্যাণের খাতিরে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর প্রণীত রূপ ভিন্ন হতে পারে।

এজন্য আমরা দেখি—পূর্ববর্তী নবিদের দাওয়াতের গন্ডি ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁদের দাওয়াতি মিশন ছিল নির্দিষ্ট একটা পরিমণ্ডলজুড়ে। এতে ব্যাপকতা ছিল না। ফলত ওই নির্দিষ্ট জাতি ও পরিমণ্ডলের সাথে সংগতিপূর্ণ করে তাঁদের তাশরির ব্যাপারটা হতো।

বনি ইসরাইলের কথা ধরি, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের শরিয়ত কঠিন হওয়াটাই কাম্য ছিল। সেজন্য তাদের শরিয়ত ছিল কঠিন প্রকৃতির। ঈসা আ. যে সময় এসেছিলেন, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর শরিয়ত সহজ হওয়া কাম্য ছিল। তাই ঈসা আ.-এর শরিয়ত মুসা আ.-এর শরিয়ত থেকে অনেকটা সহজ ছিল। কুরআনের বর্ণনায় ঈসা আ.-এর ভাষায় এ সহজতার রূপটা দেখুন—

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ

আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন—তাওরাত। আর তা এজন্য, যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দিই কোনো কোনো বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।[৪১]

এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে, তাওরাতে আকিদাসংক্রান্ত যতসব বিষয় রয়েছে, এর সবগুলোইকেই ঈসা আ.-এর শরিয়ত স্বীকৃতি দেয়। শুধু স্বীকৃতিই নয়; বরং ওইসব আকিদা-বিশ্বাসকে তা আরও পরিপুষ্ট করে এবং এতে নতুন জাগরণ তৈরি করে।

কিন্তু তাশরি বিষয়ে—হালাল-হারামের ব্যাপারে—এর রূপ ভিন্ন। এখানে অনেকটাই সহজ করা হয়েছে। অনেক কঠোর বিধানে পরিবর্তন করে সহজ করা হয়েছে।

এ থেকে থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, প্রত্যেক নবিকে 'আকিদা ও তাশরি'—এ দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আকিদার বিষয়ে এক নবি আরেক নবিকে সমর্থন করেন। একজন নবিকে তাঁর পূর্ববর্তী নবি যেসব আকিদার দাওয়াত দিতেন, সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া আরও দৃঢ়তার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রত্যেক নতুন শরিয়ত তাঁর পূর্ববর্তী শরিয়তকে নসখ (বিলুপ্ত) করে দেয়। তবে পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো ক্ষেত্রে যদি নতুন শরিয়ত মৌন অবলম্বন করে, তাহলে বুঝতে হবে—এটা তাঁর স্বীকৃতি। সে ওই বিষয়টিকে নিজের মাঝেও ধারণ করছে; বরং অনেক ক্ষেত্রে শুধু ধারণ ও স্বীকৃতিই না; বরং পূর্ববর্তী শরিয়তের ওই বিষয়টাকে আরও তাকিদ (দৃঢ়) করে। এটা তাদের মাজহাবের সাথে সংগতিপূর্ণ যারা বলেন—

شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يرد ما يخالفها ▫

পূর্ববর্তী শরিয়তই আমাদের শরিয়ত; যতক্ষণ পর্যন্ত ওই শরিয়তের সাথে তার বিরোধ না হয়।'

আসমানি ধর্মসমূহ মূলত একাধিক না। একাধিক যা, তা হলো—শরিয়ত। এই সবগুলো শরিয়তে মাঝে সর্বশেষ শরিয়ত, যা শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন। আর, আসমানি ধর্ম মূলত একটিই। আদম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবিই সে ধর্মের (দ্বীন)

---

৪১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫০

প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। সকল নবিই মানুষদের একই ধর্মের প্রতি ডেকেছেন। সে ধর্মের নাম হলো ইসলাম।

এ ধর্ম দিয়েই ইবরাহিম আ., ইসমাইল আ. ও ইয়াকুব আ. প্রেরিত হয়েছেন—

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

ইবরাহিমের ধর্ম থেকে শুধু সেই ব্যক্তিই মুখ ফেরায়, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাঁকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

স্মরণ করো, যখন তাঁকে তাঁর পালনকর্তা বললেন—'অনুগত হও'। সে বলল—'আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।'

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

এরই অসিয়ত করেছেন ইবরাহিম তাঁর সন্তানদের এবং ইয়াকুবও; যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যুবরণ করো না।[৪২]

এ ধর্ম দিয়েই মুসা আ.-কে বনি ইসরাইলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ফেরাউনের জাদুকরদের সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা—

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾

তারা বলল—'আমাদের তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে।'

---

৪২ সূরা বাকারা, আয়াত : ১৩০-১৩২

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

বস্তুত আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদিগারের নিদর্শনসমূহের প্রতি, যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের জন্য ধৈর্যের দ্বার খুলে দেন এবং আমাদের মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করেন।[৪৩]

এ ধর্ম দিয়েই ঈসা আ. কে প্রেরণ করা হয়েছে—

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

অতঃপর ঈসা যখন বনি ইসরাইলের কুফরি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন—কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গীসাথিরা বলল—'আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকেন যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি।'[৪৪]

এখন প্রশ্ন জাগে—যদি ব্যাপারটা এমনই হয়ে থাকে, তাহলে যারা নিজেদের ঈসা আ.-এর অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের (বিশেষ) আকিদা অন্যসব নবির তাওহিদের আকিদার চেয়ে ভিন্ন কেন?

মুসা আ.-এর অনুসারী দাবি করা মানুষদের (বিশেষ) আকিদা অন্যদের আকিদার চেয়ে ভিন্ন কেন? কেন এই বৈপরীত্য? কুআন থেকে এর জবাব নিই—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা

---

৪৩ সূরা আরাফ, আয়াত : ১২৫-১২৬

৪৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫২

মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরি করে, তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।[৪৫]

شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ما وَصّىٰ بِهِ نوحًا وَالَّذى أَوحَينا إِلَيكَ وَما وَصَّينا بِهِ إِبرٰهيمَ وَموسىٰ وَعيسىٰ ۖ أَن أَقيمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرَّقوا فيهِ ۚ

এ অংশটুকুর পর বলেন—

وَما تَفَرَّقوا إِلّا مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ العِلمُ بَغيًا بَينَهُم ۚ وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَت مِن رَبِّكَ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِىَ بَينَهُم ۚ وَإِنَّ الَّذينَ أورِثُوا الكِتٰبَ مِن بَعدِهِم لَفى شَكٍّ مِنهُ مُريبٍ ۚ

তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে।[৪৬]

সুতরাং বুঝতে পারলাম, প্রত্যেক নবিকেই আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আহলে কিতাবরা জানে, দ্বীন (ধর্ম) একটাই এবং তাদের এটাও জানা আছে, সে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নবিই একে অপরকে সমর্থন ও দৃঢ় করতে এসেছেন।

মূলত নবিদের আনীত ধর্মের আকিদা-বিশ্বাসে কোনো ভিন্নতা ছিল না; কিন্তু যেই ভিন্নতা দেখা যায়, তা অনুসারীরা নিজেরা সৃষ্টি করেছে। তারা আকাইদে (বিশ্বাসসমূহ) কোনো ভিন্নতা নেই—এ বাস্তবতা জেনেও পরস্পরে শুধু বিদ্বেষ ও হিংসাবশত (কুরআন যেমন বলেছে) নিজেরা বাস্তব সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে।

* * *

৪৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯

৪৬ সূরা শূরা, আয়াত : ১৪

জাহিলি সমাজ : নিভুনিভু সত্যের প্রদীপ

মিল্লাতে ইবরাহিম

এই পর্যায়ে, জাহিলি সমাজসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত যে আলোচনাটুকু আমরা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, এটুকুও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানেও আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে ।

নবিজির সিরাত নিয়ে বিশদ আলোচনা এবং এ থেকে আমাদের যে সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের মতো বিষয় রয়েছে , সে সম্পর্কে কথা বলার আগে ভূমিকাস্বরূপ এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলব আমরা। এই আলোচনায় এমন সব বাস্তবতার বিষয়াশয় আসবে, শত্রুরা যাকে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসবোধে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলছে।

আর সেই বাস্তবতার সারকথা হলো—সকল নবির পিতা ইবরাহিম আ. যে দ্বীন ও আদর্শের ওপর ছিলেন, ইসলাম তারই সমৃদ্ধ একটি রূপ। শাশ্বত এ বাস্তবতা কুরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াতে ফুটে উঠেছে—

وَجٰهِدوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ ۚ هُوَ اجتَبىٰكُم وَما جَعَلَ عَلَيكُم فِى الدّينِ مِن حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبيكُم إِبرٰهيمَ ۚ هُوَ سَمّىٰكُمُ المُسلِمينَ مِن قَبلُ وَفى هٰذا لِيَكونَ الرَّسولُ شَهيدًا عَلَيكُم وَتَكونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ ۚ فَأَقيمُوا الصَّلوٰةَ وَءاتُوا الزَّكوٰةَ وَاعتَصِموا بِاللَّهِ هُوَ مَولىٰكُم ۖ فَنِعمَ المَولىٰ وَنِعمَ النَّصيرُ ۝

তোমরা আল্লাহর জন্য পরিশ্রম করো, যেভাবে পরিশ্রম করা উচিত। তিনি তোমাদের পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মে কায়েম থাকো। তিনিই তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব, তিনি কতই-না উত্তম মালিক এবং কতই-না উত্তম সাহায্যকারী![৪৭]

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন। এখন সবাই ইবরাহিমের ধর্মের অনুগত হয়ে যাও; যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভাবে সত্যধর্মের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৪৮]

আমরা জানি, আরবরা ইসমাইল আ.-এর বংশধর। এরই সুবাদে আরবরা জাতির পিতা ইবরাহিম আ.-এর মিল্লাত (ধর্ম) ও মানহাজের (পথ ও পদ্ধতি) অনুসারী ছিল। আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ইবাদত, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ঘোষিত নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা, হুরুমাতকে (আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদার বিষয়াবলি) পবিত্রজ্ঞান করা—তাদের মাঝে এ বিষয়গুলোর উপস্থিতি ছিল। তারা হুরুমাতকে যে পবিত্রজ্ঞান করত, এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো—বাইতুল্লাহকে তাদের মর্যাদা প্রদর্শন, তার প্রতীক-নিদর্শনকে সমীহ করা, বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, এর তত্ত্বাবধান, খেদমত—এসব পবিত্র কাবাকে তাদের পবিত্রজ্ঞান এবং এর প্রতি তাদের সম্মানপ্রদর্শের অন্যতম পরিচায়ক।

কিন্তু কালের আবর্তনে তারাই একসময় সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায়। তাদের মাঝে নানান ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের সংক্রমণ ঘটে। এটাই প্রত্যেক জাতির চিরাচরিত নিয়ম। কালের আবর্তে মূর্খতা তাদের পেয়ে বসে, ভ্রান্ত ও পথহারাদের মাধ্যমে তাদের মাঝে পঙ্কিলতার ছড়ায়; আর তখন তাদের মাঝে ঘটে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ।

---

৪৭ সূরা হজ, আয়াত : ৭৮

৪৮ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৫

এসব সংক্রমণ থেকে আরবরাও বাঁচতে পারেনি। কালের বিবর্তনে তাদের মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। তারা মূর্তি-প্রতিমাপূজায় মত্ত হয়। ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়, মন্দাচার ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটে। এর ফলে তারা তাওহিদের (একত্ববাদ) আলো থেকে দূরে থাকে, মানহাজুল হানাফি (ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় ধারা ও রীতিনীতি) থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে জাহালাত (অজ্ঞতা) ছড়ায়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এভাবেই চলছিল। অবশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তির মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

আরবে মূর্তিপূজার সূচনা

আরবদের মাঝে সর্বপ্রথম যে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটায়, তাদের মূর্তিপূজায় অনুপ্রাণিত করে, তার নাম আমর ইবনে লুহাই। ইবনে ইসহাক আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি আকসাম ইবনে জাউন আল খুজায়িকে বলছেন—

> আমি আমর ইবনে লুহাই (ইবনে কামকা ইবনে হানিফ)-কে দেখেছি, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে টেনে জাহান্নামে চলছে। তোমার মতো তার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউক দেখিনি, এবং তার মতো তোমার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।
>
> আকসাম তখন বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, (আমার সাথে) তার এই সাদৃশ্য তাহলে তো মনে হয় আমার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে!
>
> নবিজি বললেন—না, এমনটা হবে না। তুমি তো মুমিন, আর সে হচ্ছে কাফির। সে-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে দ্বীনে ইসমাইলে পরিবর্তন ঘটায়। সে মূর্তি স্থাপন করে, সে-ই প্রথম 'বাহিরা', 'সায়িবা', 'ওসিলা' ও 'হাম'—এগুলোর প্রচলন শুরু করে।[৪৯]

---

৪৯ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬;
ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম, দুজনেরই বর্ণনা আবু হুরায়রা রা. থেকে প্রায় কাছাকাছি শব্দেই—
رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قصبه فى النار

> আমি আমর ইবনে লুহাই (ইবনে কামকা ইবনে হানিফ)-কে দেখেছি, সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে টেনে জাহান্নামে চলছে।

বাহিরা : এমন উট, যাকে প্রতিমাদের জন্য কান কেটে ছেড়ে দেওয়া হতো। এ ধরনের উটের দুধ দোহন নিষেধ ছিল।

আমর ইবনে লুহাই কীভাবে আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়? এ ব্যাপারে ইবনে হিশাম লিখেছেন—

> কোনো এক প্রয়োজনে আমর ইবনে লুহাই মক্কা থেকে শামের উদ্দেশে বের হলো। সে বালকার মা'বে৯ পৌঁছে দেখতে পেল, সেখানকার অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করছে। সে তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছ, এগুলো তোমাদের কী উপকার করে? তারা জবাব দিলো, আমরা যে মূর্তিগুলোর ইবাদত করছি, বৃষ্টি চাইলে এসব মূর্তি আমাদের বৃষ্টি দেয়। তাদের কাছে সাহায্যা চাইলে তারা সাহায্য করে।
>
> এরপর সে তাদের বলল, তোমরা কি তাহলে আমাকে একটি মূর্তি দেবে? আমি এটা আরব দেশে নিয়ে যাব, সেখানকার অধিবাসীরা তাকে পূজা করবে? তারা তাকে 'হুবল' নামের একটি মূর্তি দিলো। সে মূর্তি নিয়ে মক্কায় এলো। এরপর মূর্তি স্থাপন করে মানুষকে তার ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শনের আদেশ করল।৯১

মূর্খতা—সকল ভ্রান্তির মূল

এবার জাজিরাতুল আরবে শুরু হলো মূর্তিপূজা। মানুষের মাঝে শিরক ছড়াল। একত্ববাদের বিশ্বাস এখন তাদের ভেতর থেকে উধাও। দ্বীনে ইবরাহিম ও ইসমাইল থেকে তারা এখন বিচ্যুত। তার এখন অন্যন্য ভ্রান্ত জাতির মতোই। যাদের বিশ্বাস ও কাজ এখন ভ্রান্ততা ও মন্দত্বে ভরপুর।

ভ্রান্তির এই অতল গহ্বরে তাদের সহজেই যা নিক্ষেপ করতে পেরেছিল, তা হলো—অজ্ঞতা, মূর্খতা, নিরক্ষরতা। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রভাবেও তারা আক্রান্ত হয়েছিল। আশপাশের বিভিন্ন জাতির প্রভাব তাদের ওপর পড়েছিল।

সায়িবা : এমন উট, জাহিলি যুগে কোনো কাজে খুশি হয়ে যাকে প্রতিমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো।

ওসিলা : যে উট পরপর দুটি নারী উট জন্ম দিয়েছে, তাকে প্রতিমাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো।

হামি : বৃদ্ধ পুরুষ উট, যার নর সন্তান বাচ্চা জন্ম দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। সেই বৃদ্ধ উটের ওপর সওয়ার হতো না, তার ওপর কোনো কিছু বহনও করত না।

৫০ সে সময় আমালিকারা সেখানে ববাস করত, যারা আমলাক এর বংশধর। যার বংশধারাটা এ রকম বলা হয়—আমলিক ইবনে লাউজ ইবনি সাম ইবনি নুহ।

৫১ *ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৭; দেখুন—كتاب أصنام لابن الكلبي

তবে এসব কিছুর মাঝে নিভুনিভু কিছু প্রদীপ জ্বলছিল। কিছু মানুষ—কালের বিবর্তনে যাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য—তারা নির্জলা তাওহিদের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিল। যা ছিল মানহাজুল হানাফিয়্যাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশের বিশ্বাস সক্রিয় ছিল। যেখানে আনুগত্যকে আল্লাহর প্রতিদান ও পাপিষ্ঠকে আল্লাহর শাস্তি দেওয়ার বিশ্বাস গুরত্বের সাথেই লালন করা হতো। যা আরবদের মূর্তিপূজা, তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসকে অপছন্দ করত। এ দুঃসময়েও সত্য বিশ্বাসের ওপর অটল অবিচল থেকেছেন—এ রকম অনেকের নাম পাওয়া যায়। যেমন : কিস ইবনে সাইদা আল ইয়াদি, রিয়াব আশ-শিন্নি, বুহাইরা আর-রাহিব।

তাদের আচার-অভ্যাসে ইবরাহিমি আদর্শ ও দ্বীনে হানিফের কিছুটা বাকি ছিল। তাদের জাহিলি সময়টা ছিল সত্যের রঙে কিছুটা রঙিন। কালের আবর্তনে যদিও তা ছিল খুবই ক্ষীণ। যদিও এসব শাআয়িরের (ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় নিদর্শন) মাঝে তারা ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল।

যেমন—বাইতুল্লাহর তাজিম (সম্মান প্রদর্শন), তাওয়াফ, হজ, উমরাহ, উকুফে আরাফা (হজের সময় আরাফার ময়দানে বিশেষ পদ্ধতিতে অবস্থান) উটকে হাদি (হজ-উমরাহর সময় যে পশুকে আল্লাহর জন্য জবাই করা হয়) হিসেবে প্রেরণ করা ইত্যাদি এগুলো তাদের মাঝে ছিল। ইবরাহিম আ.-এর সময় থেকে এসব তাদের মাঝে পরম্পরায় চলে এসেছে; কিন্তু সমস্যা হলো—তারা এগুলো ঠিকঠাক যেভাবে পালনের কথা, সেভাবে করত না। তারা তাতে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করত। তারা এতে যা ছিল না, এমন অনেক কিছুরও অনুপ্রবেশ ঘটাত। যেমন—তারা হজ-উমরাহর সময় তালবিয়া[৫২] ও তাহলিলের[৫৩] ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ—ইবনে হিশাম যেমনটা বলেছেন—এর স্বীকার করত। এরপর তারা এর সাথে তাদের মূর্তিদের কথাও আনত। আবার তাদের মালিকানা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করত। কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের লোকেরা তালবিয়া পাঠ করত এ রকম :

لبيك اللّٰهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك إلا شريك هو لك، تملكه و ما ملك

৫২ 'লাব্বায়িক, আল্লাহুম্মা...' বলে হজের সময় হাজিরা যেমন পাঠ করে থাকেন।
৫৩ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করা।

> আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, হে আল্লাহ, আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছি, সাড়া দিয়েছি এমন সত্তার ডাকে, যার কোনো শরিক নেই। তবে একজন শরিক আছে, যে আপনার জন্য, আপনি তার মালিক এবং আপনি, সে যার মালিক, তারও মালিক।[৫৪]

মোটকথা, আরব জাতির ইতিহাসে ইবরাহিম আ.-এর (ধর্ম) 'আদ-দ্বীনুল হানিফ'-এর বিশাল উপস্থিতি রয়েছে । ফলে ঈমান ও তাওহিদের আলোয় তাদের জীবন ছিল আলোকোজ্জ্বল; কিন্তু কালের আবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে ধীরে ধীরে তাদের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তারা কুফর-শিরকে লিপ্ত হয়, অজ্ঞতা-ভ্রান্তির অতল গহব্বরে নিমজ্জিত হয়। তবে এসব কিছুর পরও তাদের মাঝে দ্বীনে ইবরাহিমের ছিটেফোঁটা বাকি ছিল—যা দিনদিন দুর্বল হতে চলছিল।

এরপর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এলেন, তখন তাঁর নবুয়তের মাধ্যমে নতুন করে আবার দ্বীনে হানিফের আলো জ্বলে উঠল। নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ছেয়ে যাওয়া সেই অন্ধকারকে ঈমান, তাওহিদ, সত্য ও আদালতের (সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা) আলোয় আলোকিত করলেন।

কালের আবর্তনে ইবরাহিমি আদর্শের ছিটেফোঁটা যা বাকি ছিল, তা তিনি আরও আলোকোজ্জ্বল করে তুললেন। তাকে তিনি আরও পরিপুষ্ট করলেন। নতুন করে এর দাওয়াত দিলেন।

* * *

ইতিহাসের পাঠকের কাছে এ বিষয়গুলো যে স্পষ্ট, সে কথা বলাই বাহুল্য। যিনি ইসলামকে সামান্যও পাঠ করেছেন, তার কাছেও বিষয়টা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। এরপরও এ রকম স্পষ্ট একটা বিষয়ের স্পষ্টকরণে অযথা সময় নষ্ট করার কারণ হলো—আমি দেখলাম, কিছু মানুষ শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় অকাতরে তাদের আকিদা বা বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিচ্ছেন!

হ্যাঁ, এ ধরনের অনেক মানুষ পৃথিবীতে জীবিত আছেন। তারা এটুকু বোঝার সুযোগ পাননি যে, তাদের চিন্তাগত দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা হচ্ছে। আপনার বিশ্বাসের

---

৫৪ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৭

পেছনে আপনার প্রবৃত্তি আর আপনার প্রবৃত্তির পেছনে আপনার বিশ্বাস—এ দুটোর মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে । একটা হলো উন্নত, আরেকটা নিম্ন। একটাতে সম্মান, আরেকটাতে অধঃপতন!...

এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কাউকে কাউকে বলতে শুনবেন—নবিজি প্রেরিত হওয়ার কিছু পূর্বে সত্যের পরিবেশ ও আবহ গড়ে উঠেছিল। শিরক-মূর্তিপূজাসহ যেসব কুসংস্কার সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল, এসবের বিরুদ্ধে সে সময়ের আরব চিন্তা রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আর নবিজিকে প্রেরণের মাধ্যমে এবং তাঁর দাওয়াতের কল্যাণে এ জাগরূক চিন্তা অনন্য রূপ ধারণ করে।

এর মানে হলো—আরবরা কালের বিবর্তনে তাওহিদ ও সত্যের আলোয় আলোকিত হতে চলছিল। অর্থাৎ ইবরাহিম আ.-এর যুগ থেকে সময় যত গড়াচ্ছিল, আরবরা নবিজির আদর্শ ও দাওয়াতের তত নিকটবর্তী হচ্ছিল। অবশেষে নবিজিকে প্রেরণের মধ্য দিয়ে এটা সম্পূর্ণতার রূপ পায়।...

বিশুদ্ধ ইতিহাস কি এমনটাই বলে? নাকি বাস্তব ইতিহাস সম্পূর্ণ এর বিপরীত?

প্রত্যেক স্বাধীন চিন্তকই এ কথা জেনে থাকবেন—নবিজিকে জাহিলি যুগের যে সময়টাতে প্রেরণ করা হয়েছিল, এটা ছিল জাহিলিয়াতের সর্বোচ্চ যুগ। ইবরাহিমি আদর্শের ছিটেফোঁটা যা বাকি ছিল, যেমন : মূর্তিপূজাকে অপছন্দ, মূর্তিপূজা পরিহার এবং তাদের মাঝে থাকা ইতিবাচক কিছু বৈশিষ্ট্য (যেগুলোকে ইসলাম সমর্থন করেছে)—এগুলো কয়েক শতাব্দী পূর্বে যতটা ছিল, সে যুগটাতে এর দশ ভাগও ছিল না। যদি তাদের কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে নবিজি যে সময় প্রেরিত হয়েছিলেন, এর আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল।

আবার কেউ কেউ মনে করেন—নবিজি যখন আরবে প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাস, প্রথা, কুসংস্কার ইত্যাদির মোকাবিলা করতে অক্ষম হলেন, তখন তিনি এগুলোকে দিয়ানাতের (ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইবাদত) পোশাকে সাজালেন। এবং এগুলোকে আত-তাকলিফাতুল ইলাহিয়্যাহ (বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আবশ্যক করে দেওয়া বিষয়)-এর রূপ দিলেন। অন্য কথায়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়ে আরবের গায়েবি বিশ্বাসগুলো নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিবর্তে এগুলোতে এমন এক সত্তার স্বীকৃতি দেন, যিনি সব ক্ষমতার অধিকারী, যিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন।

তাই দেখা যায়—ইসলাম গ্রহণের পরও তারা জাদুটোনা জিন-ভূত এ জাতীয় আরও অনেক বিশ্বাসে তারা বিশ্বাস রাখত। যেভাবে তারা ইসলাম আসার আগে কাবার তাওয়াফ করত, কাবাকে পবিত্রজ্ঞান করত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মানসিক (হজে পালনীয় কাজ) আদায় করত।

তাদের এসব বক্তব্য থেকে দুটি ভুল মেসেজ পাওয়া যায়। যেগুলোকে তারা ভুল হিসেবে কখনো স্বীকার করবে না। প্রথম মেসেজটা হলো—

☞ মুহাম্মাদ[৫৫] নবিই নন।

দ্বিতীয় মেসেজটা হলো—

☞ আরবদের মাঝে ইবরাহিমি আদর্শের যে ছিটেফোঁটা বাকি থাকার কথা বলেছি, এগুলো মূলত ইবরাহিমি আদর্শ না; এগুলো কালের বিবর্তনে আরবদের উদ্ভাবন করা। সুতরাং কাবার তাজিম এবং একে পবিত্রজ্ঞান করা এটা ইবরাহিমি আদর্শের কোনো অংশ নয়; বরং এটা আরব সংস্কৃতির উদ্ভাবন করা একটা বিষয়।

তাদের এই লালিত বিশ্বাস থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তারা বিশুদ্ধ সব দলিল-প্রমাণ ঐতিহাসিক সব প্রামাণ্যতা—যা তাদের এই লালিত বিশ্বাসের স্বরূপ উন্মোচন করে ছাড়বে—সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

এটা স্পষ্ট বিষয়, কেউ যখন পূর্ব থেকে কোনো একটা চিন্তা নির্দিষ্ট করে রেখে তাহকিক[৫৬] করতে বসে, তখন তার পক্ষে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। আর এ ধরনের তাহকিক হাস্যকর তো বটেই।

ঐতিহাসিক দলিল, যুক্তিনির্ভর দলিল—এর কিছুকেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা যদি বাস্তবতায় পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমরা দলিল-প্রমাণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারি না। আমরা শুধু মুক্তচিন্তার নামে, তাআস্সুবের[৫৭] ভিত্তিতে মিথ্যাচার করতে পারি না, অন্যদের আমার নির্দিষ্ট কোনো একটি চিন্তার—যার বাস্তবতা থাকুক বা না-ই থাকুক—ওপর বাধ্য করার প্রবণতা রাখতে পারি না।

---

৫৫ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৫৬ কোনো বিষয়ে ভালোরকম অনুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাঁটি করা।

৫৭ দলপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি ও গোঁড়ামি।

আমাদের পক্ষে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না যে, আমরা 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবি নন'—শুধু এই দাবি পূরণ করতে গিয়ে আমরা দালাইলুন নুবুওয়াহ[৫৮], ওহি নাজিল হওয়া, কুরআনের মুজিজা, পূর্ববর্তী নবিদের সাথে তাঁর দাওয়াতের মিল হওয়া, তাঁর মাঝে নবি হওয়ার সমস্ত আলামত বিদ্যমান থাকা, তাঁর উন্নত চরিত্রমাধুরী—এগুলোকে পাশ কেটে যাব। তেমনি 'আরবদের মাঝে বিদ্যমান থাকা ইবরাহিমি আদর্শের যে ছিটেফোঁটা বাকি ছিল, সেগুলো আরবদের উদ্ভাবন করা'[৫৯]—এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের জন্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা অস্বীকার করাও সম্ভব না। এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুমে ইবরাহিম আ.-এর কাবা নির্মাণ করার কথা অস্বীকার করতে পারি না। শুধু এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে সকল নবির একত্ববাদ, আল্লাহর প্রতি, নিরঙ্কুশ বিশ্বাস, আখিরাত, হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসে মানুষকে ডাকা—যেগুলোর বর্ণনা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে রয়েছে, যেগুলো ঐতিহাসিকভাবেও স্বীকৃত—এসব আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারব না।

কিন্তু মনে রাখবেন, তারা যেসব দাবি করেন, এসব তাদের উড়োকথা; এর কোনো প্রামাণ্যতা নেই। সবই কথাই ফুলঝুরি! এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিতে আপনি ইংরেজ প্রাচ্যবিদ H.A.R. Gibb-এর লেখা بنية الفكر الديني বইটি পড়ুন। আপনি বুঝতে পারবেন, কী পরিমাণ অন্ধ আসাবিয়্যাতে ভদ্রলোক প্রভাবিত। যে আসাবিয়্যাত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে কালিমা লেপন করে। বইটি পড়লে আপনার কাছে বিষয়টা প্রকাশ পাবে, তিনি শুধু নিজের দাবি পূরণ করতে গিয়ে সত্যের সব দলিল পাশ কাটিয়ে গেছেন।

ইংরেজ এ প্রাচ্যবিদ[৬০] তিনি মনে করেন—

> ইসলামের চিন্তা ও বিশ্বাসের মূলভিত্তি হলো, আরবদের মাঝে প্রচলিত গায়েবি বিশ্বাস চিন্তাচেতনা। আর এসব বিশ্বাস ও চিন্তায় নবিজি চিন্তা করে যতটুকু পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন, ততটুকু পরিবর্তন করেছেন। আর যেটুকুতে তিনি সক্ষম হননি, সেটুকুকে ইসলাম ও দ্বীনের

---

৫৮ নবি হওয়ার দলিল-প্রমাণ।

৫৯ যেগুলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে অনুমোদন দিয়েছেন।

৬০ এইচ.এ.আর. গিব নামে পরিচিত এই ভদ্রলোক হলেন স্যার হ্যামিল্টন আলেকজান্ডার রসকিন গিব। এফবিএ, প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কিত স্কটিশ ইতিহাসবিদ ছিলেন। জন্ম : ২ জানুয়ারি, ১৮৯৫; আলেকজান্দ্রা, মিশরে। আর ২২ অক্টোবর, ১৯৭১ সালে যুক্তরাজ্যে মারা যান।

পোশাক পরিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে তিনি অন্যান্য কিছু চিন্তা ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রবেশ ঘটান। সংকটটা আরও গভীর হয়েছে, যখন তিনি সেটাকে আরবের বাইরের অন্য সব জাতির জন্যও চিন্তা করেছেন এবং তিনি এটাকে কুরআনের রঙে প্রকাশ করেছেন।'

তিনি সারা বইয়ে যে চিন্তা তুলে ধরেছেন, এ হচ্ছে তার সেই চিন্তার মূলকথা। আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেও তার চিন্তার কোথাও কোনো দলিল খুঁজে পাবেন না। একটু গভীরভাবে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, তিনি তার চিন্তার চৌহদ্দিকে সত্য ও বাস্তবতা থেকে কতটা দূরে রেখেছেন। তিনি তার চিন্তাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করেননি। এখানে তিনি স্রেফ অনুমাননির্ভর কথা বলেছেন এবং এর আলোকে তিনি তার চিন্তার বিন্যাস করেছেন।

তিনি যখন তার বইয়ের আরবি অনুবাদের মুকাদ্দিমা লিখতে বসেন, তখন বুঝতে পারছিলেন, মুসলিমরা তার এই অসুস্থ চিন্তাকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। তখন তিনি ওজর পেশ করা শুরু করলেন—

ان الأفكار التي أسست عليها هذه الفصول ليست بنات دماغ هذا المؤلف بل سبقني عليها ودلني إليها جماعة من المفكرين ومن أقطاب المسلمين و قد يطول إحصاهم فسأكتفي علي ذكر أحدهم بسبيل المثال هو الشيخ الكبير شاه ولي الله الدهلوي ¤

এসব আলোচনায় যেসব চিন্তা ফুটে উঠেছে, সেসব লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; বরং মুসলিমদের বড়ো বড়ো স্কলার ও চিন্তাবিদদের একটি দলের চিন্তা আমাকে এসব চিন্তা শিখিয়েছে। তাদের ফিরিস্তি বিশাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজনের কথাই এখানে আনব। তিনি হচ্ছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দিহলাবি।

এরপর তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর কিতাব *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২২ থেকে একটা নস (টেক্সট বা মূল পাঠ) নকল করেন। তিনি ভাবলেন—তার এই নকল করা নস কে ঘাঁটতে যাবে? কে শুধু শুধু কষ্ট স্বীকার করবে? তিনি নিশ্চিন্তে নিজের মতো করে নিজের চিন্তার সাথে সংগতিপূর্ণ করে উপস্থাপন করেন এবং ওয়ালিউল্লাহর ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেন, যা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ যেভাবে নকল করেছেন—

إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثة تتضمن بعثة أخرى فالأولي إنما كانت الى بني إسماعيل...

وهذه البعثة تستوجب أن يكون مادة شريعته ماعندهم من الشعائر وسنن العبادات و وجوه الارتفاقات، إذ الشرع إنما هو إصلاح ما عندهم لا تكليفهم بما لا يعرفونه أصلا[৬১]

নবিজির যে 'প্রেরণ', এটি অন্য আরেকটি 'প্রেরণ'-কে শামিল রাখে (অর্থাৎ দুটি প্রেরণ)। প্রথমটি ছিল বনু ইসমাইলে...

এ প্রেরণের কামনা হলো—তার শরিয়তের মূল উপাদান হবে, তাদের নিকট থাকা শাআইর, ইবাদতের রীতি-পদ্ধতি ও আচার-পদ্ধতি। যেহেতু শরিয়তের মূলকথা হলো, তাদের নিকট যা রয়েছে—(ইবাদত ও এর রীতি পদ্ধতি, আচার)—তা সংশোধন করা। তারা মূলতই যা জানে না অর্থাৎ, একদম অপরিচিত বিষয়ে তাদের বাধ্য করা নয়।

অথচ *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়* সম্পূর্ণ ইবারত এ রকম—

واعلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفيه الإسماعيلية لإقامة عوجها وإزالة تحريفها وإشاعة نورها وذلك قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم ولما كان الأمر علي ذالك وجب أن أصول تلك الملة مسلمة وسنتها مقررة

إذ النبي إذا بعث إلي قوم فيهم بقية السنة الراشدة فلا معني بتغييرها و تبديلها بل الواجب تقريرها لأنه أطوع لنفوسهم و أثبت عند الاحتجاج عليهم وكان بنو إسماعيل ثوارثو ا منهاج أبيهم إسماعيل فكانوا علي تلك الشريعة إلي أن وجد عمرو بن لحي فأدخل فيها أشياء

---

৬১ দেখুন—بنية الفكر الديني لجيب :٥٨

برأيه الكاسد فضل و أضل وشرع عبادةالأوثان و سيب السوائب و بحر البحائر فهناك بطل الدين واختلط الصحيح بالفاسد

و غلب عليهم الجهل والشرك والكفر فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مقيما لعوجهم و مصلحا لفسادهم فنظر في شريعتهم فما كان منها موافقا لمنهاج إسماعيل عليه السلام أو من شعائر الله أبقاه و ما كان منها تحريفا أو فسادا أو من شعائر الشرك أو الكفر أبطله و سجل علي إبطاله¤

জেনে রাখার বিষয়—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল হানাফিয়্যাতুল ইসমাইলিয়্যাহ (ইবরাহিম ইসমাইল আ.-এর ধর্মীয় ধারা) দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যেন তিনি এতে সৃষ্ট বক্রতার সংশোধন ও বিকৃতি দূর করে তাঁর আলো ছড়াতে পারেন। এ বিষয়টাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—ملة أبيكم إبراهيم বিষয়টা যেহেতু এমনই, তাই ওই মিল্লাতের উসুল ও নিয়মরীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া আবশ্যক।

কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের মাঝে সুন্নতে রাশেদার ছিটেফোঁটা হলেও বাকি রয়েছে। তাই সেটাকে পরিবর্তনের কোনো মানে নেই; বরং আবশ্যক হলো, একে স্বীকারোক্তি দেওয়া। কারণ, তা তাদের মনের সাথে বেশি সংগতিপূর্ণ। দলিল হিসেবে অধিক দৃঢ়।

বনু ইসমাইল; তারা তাদের পিতা ইসমাইল আ.-এর মানহাজের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। আমর ইবনে লুহাই পর্যন্ত তারা তারা এ শরিয়তের ওপর অটল ছিল; কিন্তু সে তার ভ্রান্ত চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাল। নিজেও গোমরাহ হলো, অন্যদেরও গোমরাহ করল। মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটাল। 'সায়িবা-বাহিরার'র প্রচলন ঘটাল। এভাবে সে ধর্মকে ভ্রান্ত করল। সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটাল। তাদের ওপর জাহালত-শিরক, কুফরি চেপে বসল। তাই আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বক্রতা ঠিক করতে, তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া ফ্যাসাদ-বিপর্যয়ের সংশোধন করতে পাঠালেন।

এরপর তিনি তাদের শরিয়তে দৃষ্টি দিয়ে যা মিনহাজু ইসমাইল (ইসমাইলি ধর্মীয় ধারা ও রীতি) অথবা আল্লাহর শাআইরের মুওয়াফিক (সংগতিপূর্ণ) ছিল, তা বাকি রাখলেন। যাতে বিকৃতি ঘটেছিল, যাতে ফ্যাসাদ ঢুকেছিল, অথবা যা ছিল শিরকের শাআইর, অথবা যা ছিল কুফর—এসবকে তিনি বাতিল করেন এবং তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন।

আমরা এসব গবেষকদের গবেষণা ও বিকৃতির নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে আমরা বসিনি। আমরা এটুকু বুঝাতে চাচ্ছি—কী পরিমাণ আসাবিয়্যাত তার ওপর জেঁকে বসেছে!

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা এটাও আমাদের উদ্দেশ্য—যারা পশ্চিমা চিন্তাবিদদের জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার প্রশংসায় বুঁদ হয়ে থাকেন, তারা এর বাস্তবতা একটু জানবেন। এবং এটাও স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য—পশ্চিমাদের এই অন্ধানুসরণ মুসলিমদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

* * *

আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম—ইসলাম ও ইসলাম পূর্ববর্তী জাহিলি চিন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক। একইভাবে আমরা জাহিলি যুগ ও ইবরাহিম আ.-এর মিল্লাতে হানাফিয়্যাহ (ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় ধারা)—এ দুটোর পারস্পরিক যোগসূত্রও আমরা বুঝতে পারলাম।

এখান থেকে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, নবিজি কেন আরবে প্রচলিত সব (ভ্রান্ত) প্রথা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও কিছু আচার-অভ্যাস ও আদর্শকে সায় দিয়েছেন?

এতক্ষণের আলোচনার মাধ্যমে আমরা নবিজির সিরাত এবং তা থেকে আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ-নির্দেশনা বোঝার জন্য যে ভূমিকা টানার প্রয়োজন ছিল, এর পাঠ চুকিয়ে ফেলেছি।

আমাদের সামনের আলোচনায় এখানে করা আলোচনার অনেক দলিল পাবেন। সেসব আলোচনা এখানে আমরা যা স্পষ্ট করেছি, এর দৃঢ় সমর্থন করবে এবং এর বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলবে।

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে প্রধানত নবিজির জন্ম থেকে নিয়ে নবুয়ত পর্যন্ত ঘটনাবলি ও তার শিক্ষা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো এমন—

- নবিজির বংশধারা, জন্মসাল, দুধ পান, বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব, এতিম হওয়ার ইলাহি হিকমত, নবিজির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও নবুয়তের নিদর্শন।
- শামের সফর, জীবিকার জন্য পরিশ্রম, পূর্ববর্তী কিতাবে নবিজির সংবাদ, তাওরাত-ইনজিলের বিকৃতি বিষয়ে আলোচনা।
- শামের বাজারে ব্যবসা, বিয়ে, খাদিজা রা.-এর বৈশিষ্ট্য; মুদারাবা চুক্তি ও এসবের পেছনে আল্লাহর তায়ালার কী হিকমত, তার আলোচনা। এরপরই প্রাচ্যবিদদের অপপ্রচার ও তাদের মুখে চপেটাঘাত; নবিজি কি লোলুপ ছিলেন? নবিজির বিয়ে কি নারীসম্ভোগ ছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তর এসেছে।
- কাবা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ, কাবা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য, কাবার ইতিবৃত্ত বিষয়ে আলোচনা এসেছে।
- হেরা গুহায় নবিজির নির্জনবাস, মুহাসাবা, ওহির সূচনা, ওহি নিয়ে ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য উন্মোচন এবং কিছু গুরুতর প্রশ্ন ও তার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করে এই অধ্যায় শেষ করা হয়েছে।

নবিজির বংশ, জন্ম ও দুধ পান

নবিজির বংশধারা

নবিজির বংশধারা এ রকম—

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নজর ইবনে কিনানা ইবনে খুজাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়াস নজর ইবনে মুদার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

এতটুকু পর্যন্ত সবাই একমত। এর ওপরে গিয়ে মতানৈক্য হয়েছে। যাতে নিশ্চিত ভরসা রাখা যায় না। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত—আদনান; তিনি ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আ.-এর বংশের। আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবিজিকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশে, সবচেয়ে পবিত্র-নির্মল ঔরসে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর বংশে জাহিলিয়াতের কোনো পঙ্কিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি।

ইমাম মুসলিম তার সনদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> আল্লাহ তায়ালা কিনানাকে ইসমাইলের বংশধর বানিয়েছেন। কুরাইশকে কিনানার বংশধর বানিয়েছেন। হাশিমকে কুরাইশের বংশধর বানিয়েছেন। আর, আমাকে বানিয়েছেন হাশিমের বংশধর।

নবিজির জন্মসাল

নবিজির জন্ম হয়েছে আমুল ফিল (হস্তীবর্ষ)-এ। অর্থাৎ যে বছর বাদশাহ আবরাহা আল আশরাম মক্কায় অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেছিল, সে বছর। সে পবিত্র কাবা ভেঙে ফেলার মতো দুঃসাহস করে বসেছিল; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের চরমভাবে ধ্বংস করে দেন। কুরআনে এর বিবরণ রয়েছে । প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত অনুযায়ী সে দিনটা ছিল রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ, সোমবার।

নবিজির দুধ পান

তিনি এতিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মা যখন দু-মাসের গর্ভবতী, তখন তার বাবা আবদুল্লাহ মারা যান। জন্মের পর তিনি দাদার তত্ত্বাবধানে থাকেন। আরব সংস্কৃতি অনুযায়ী তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য বনু সাদ ইবনে বাকারের এক নারীকে নির্বাচন করেন। নাম হালিমা বিনতে আবু জুআইব।

সিরাতবিশারদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত, যে বছর হালিমা নবিজিকে নিতে এসেছিলেন, সে বছর বনু সাদ গোত্রের ভীষণ দুর্দিন যাচ্ছিল। এ বছর ফসলের ছিল বড়োই অকাল। দুধেরও বড়ো অকাল ছিল; কিন্তু হালিমার ঘরে নবিজির আগমনের পর, নবিজি হালিমার কোলে ওঠার পর এ ঘরে সবকিছুতে সচ্ছলতার হিড়িক পড়ে। সমৃদ্ধি আসে। তার ঘরের আশপাশ সজীব হয়ে ওঠে। দেখা যেত, এ পরিবারের ছাগলগুলো ওলান ভরে দুধ নিয়ে আসছে।

নবিজি যখন হালিমার ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন বেড়ে উঠছিলেন, তখন (প্রথমবারের মতো) তাঁর বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটে।[৬২]

এরপর নবিজির পাঁচ বছর পূর্ণ হলে তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়। নবিজি যখন ছয় বছরে পা রেখেছেন, তখন তাঁর মা মারা যান। এরপর তিনি তাঁর দাদার দায়িত্বে যান। আট বছরের সময় তাঁর দাদা মারা যান। তখন তাঁর দায়িত্ব নেন চাচা আবু তালিব।

* * *

৬২ বিস্তারিত জানতে বনু সাদে হালিমার ঘরে নবিজির দুধ পান ও সে সময়ে নবিজির বক্ষবিদারণের ঘটনাটি দেখতে পারেন। *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০১-১০২

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ ও দুধ পানের এ অংশে আমাদের জন্য বেশ কিছু জানার ও বোঝার মতো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে—

এক. বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব

আমরা নবিজির যেই বংশধারা বর্ণনা করেছি, এ থেকে বোঝা যায়—আল্লাহ তায়ালা আরবদের অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর কুরাইশ বংশকে আরবের অন্য সকল বংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনা ছাড়াও এ জাতীয় প্রচুর বর্ণনা রয়েছে । ইমাম তিরমিজির বর্ণনাটি এখানে উল্লেখ করছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন—

: আমি কে?

তারা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন—

: আপনি আল্লাহর রাসুল; আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এরপর তিনি বললেন—

: আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টজীবকে সৃষ্টি করার পর তাদের দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ দু-দলের উত্তম দলে আমাকে রেখেছেন। এরপর তিনি (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাদের বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করে দিয়েছেন। আমাকে সব গোত্রের শ্রেষ্ঠ গোত্রে দিয়েছেন। এরপর তিনি তাদের (বিভিন্ন) পরিবারে ভাগ করেছেন। আমাকে সবচেয়ে সেরা

পরিবারের বানিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবেও আমাকে সবার সেরা বানিয়েছেন।"

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ রাখার মতো বিষয় হলো, নবিজির গোত্র ও জাতির প্রতি, যেখানে নবিজি বেড়ে উঠছেন, কোনো টান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ—এটা স্রেফ (নীতিহীন) গোত্রপ্রেমের অন্তর্গত না; বরং এটা বাস্তবতার নিরিখে। কারণ, আরব জাতি ও কুরাইশদের বাড়তি শ্রেষ্ঠত্ব, এটা নবিজির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই এসেছে। (তাই নবিজি এখানে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেছেন।)

নবিজির বংশের যারা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, মানবতার উৎকৃষ্ট পথ ও মতাদর্শ থেকে যারা ঝরে পড়ছিল, তাদের কারণে নবিজির বংশের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবে ভাটা পড়বে না। শ্রেষ্ঠত্বে ফাটল ধরানোর মতো বিষয়ের কোনো প্রভাব এখানে নেই।

দুই. এতিম হওয়ার ইলাহি হিকমত

নবি-জীবনে যে করুণ উপাখ্যান রয়েছে—পৃথিবীর আলো-বাতাস পাওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে বাবার বিদায়, জন্মের পর শৈশবেই মায়ের ছায়া উঠে যাওয়া, কিছুদিন পর দাদাকে হারানো—এসব নবি-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা প্রদান নয়। এই যে তিনি পিতা-দাদার তরবিয়ত (পরিচর্যা ও দীক্ষা) ছাড়া, ভালো রকম মায়ের স্নেহ পাওয়ার সুযোগ না পেয়েই বেড়ে উঠেছেন, এগুলো তাঁর জীবন গঠনে প্রতিবন্ধক নয়। তাকে এ রকম নিঃসঙ্গ আবহে বাড়িয়ে তোলার মাঝে আল্লাহ তায়ালার বিশাল হিকমত রয়েছে । সম্ভবত এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে হিকমত, তা হলো—অবিশ্বাসী-ভ্রান্তরা যেন কোনো খুঁত বের করার সুযোগ না পায়। মানুষের মাঝে সন্দেহ-সংশয় ছড়ানোর ফুরসত না পায়। তারা যেন এ কথা বলতে না পারে—'মুহাম্মাদ যেই দাওয়াত দিচ্ছে, এটা শৈশবে সে তার বাপ-দাদার যেই নির্দেশনা ও যেই আবহে বেড়ে উঠেছিল, এরই বহিঃপ্রকাশ।'

কারণ বাবা তার সন্তানকে, দাদা তার নাতিকে সে যে বিশ্বাস ও আদর্শ লালন করে, এরই পাঠ দিতে চায়। তারা তখন ভাবত, তিনি তাঁর বাপ-দাদার দেওয়া পাঠ ও

---

৬৩ *জামি তিরমিজি*, কিতাবুল মানাকিব, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৩৬

আদর্শই ছড়াচ্ছেন। আর এটা বলা বা ভাবা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাঁর দাদা ছিলেন কুরাইশদের সবার প্রধান। তার নিকট রিফাদাত ও সিয়াকাতের[৬৪] দায়িত্ব ছিল।

আল্লাহ তায়ালার হিকমতের দাবি ছিল—তিনি নবিজির ব্যাপারে এ রকম সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ রাখবেন না। তাই নবিজিকে সেই ছোট্ট শৈশবেই বাবা-মা-দাদা সকলের ছায়া থেকে দূরে রাখেন। পরিবার-পরিজন সবার থেকে অনেক দূরে গ্রাম্য পরিবেশে বনু সাআদে তাকে বড়ো করে তোলেন। নবিজির ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ বাকি না থাকে, এজন্য আবু তালিবকে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম গ্রহণ করার তাওফিক দেননি। দাদার মৃত্যুর পর নবিজির প্রতিপালনের দায়িত্ব যায় চাচা আবু তালিবের কাছে। হিজরতের তিন বছর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবিজি শত চেষ্টা-কামনার পরও চাচা ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার এই ইসলাম না গ্রহণ করাটা আল্লাহ তায়ালার এ হিকমতের পরিপূরক। যাতে কেউ এ ধারণা করতে না পারে যে, নবিজির এই দাওয়াতে চাচার কোনো হাত রয়েছে । নবিজির দাওয়াতি মিশন ও কার্যক্রম—এটা তার পারিবারিক ঐতিহ্য, নেতৃত্ব ও পদের ফসল।

আল্লাহর হিকমতের দাবি ছিল এটাই, নবিজি এতিম হয়ে বেড়ে উঠবেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর প্রতিপালন করবেন। তাঁকে ধনসম্পদ বিত্তবৈভ থেকে দূরে রাখবেন। যাতে নবিজির মন ধনসম্পদ ও সম্মানের পেছনে না ছোটে। তিনি যেন পারিপার্শ্বিকতা, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রভাবিত না হন। যাতে তাঁর নবুয়তের পবিত্রতা দুনিয়ার সম্মান কামনার কলুষে কলুষিত না হয়। মানুষ যেন এ কথা মনে না করে যে, তিনি দুনিয়ার মর্যাদা- প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য নবুয়তকে ব্যবহার করছেন।

তিন. নবিজির ব্যক্তিত্বের মর্যাদা

নবিজি হালিমাতুস সাদিয়ার ঘরে যাওয়ার পর সচ্ছলতার যে ধারা বয়েছিল, ফসলের মাঠ সজীব হয়ে উঠেছিল, যে উটনীতে এক ফোঁটাও দুধ আসছিল না, সে উটনীর ওলান ভরে দুধ আসিছিল—যে ব্যাপারে সিরাতবিশারদগণ একমত—এসব বিষয়

---

৬৪ জাহিলি যুগে কুরাইশদের সমাজসেবাকে রিফাদাত বলা হয়। তারা প্রত্যেকে যার যার সামর্থ অনুযায়ী মাল-অর্থ জমা করে তা দিয়ে আঙুর, কিশমিশ নাবিজ (আরবে প্রচলিত মাদকজাতীয় একপ্রকার দ্রব্য) বিভিন্ন খাবার কিনত। এরপর তা মানুষদের মাঝে বিলাত। মানুষকে পান করাত। হজের মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা এ রকম করত।

থেকে সেই ছোটোবেলায়ই নবিজির ব্যক্তিত্ব ও আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদার ব্যাপারটা বুঝে আসে।

নবিজির ওসিলায় হালিমার ঘরে বরকতের ফোয়ারা বয়ে যাওয়া—এটা নবিজির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল উপহার। তবে এখানে খুব আশ্চার্যান্বিত হওয়ার বিশেষ কিছু নেই। কারণ, ইসলাম থেকে আমরা শিখেছি—বৃষ্টি (বা অন্য কোনো) প্রয়োজনে আমরা দুআ কবুলের বিশেষ আশায় সালিহিন (আল্লাহর সৎ বান্দাগণ) ও আহলে বাইতের (নবিপরিবার) মানুষজনের বরকতের ওসিলা নিয়ে দুআ করতে পারব।[৮৫]

তো, নবিজির মতো মহান ব্যক্তিত্বের ছোট্ট শৈশবে তাঁর কারণে হালিমার ঘরে বরকতের ফোয়ারা বয়ে যাওয়া এতে আশ্চর্যের কী আছে? বৃষ্টি ও ঝরনা এসব শুষ্ক ভূমি সজীব হয়ে ওঠার বিশেষ উপকরণ ও কার্যকারণ। আর এসব কার্যকারণ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই সব কার্যকারণের পরিচালনা। সুতরাং নবিজি আল্লাহর বিশেষ উপহার ও বরকতের কার্যকারণের প্রধান ভূমিকায় থাকবেন, এতে ভীষণ আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আর যেখানে তিনি কুরআনের এ ভাষ্য অনুযায়ী—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَٰلَمِينَ ۝

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।"[৮৬]

যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রহমাতুল্লিল আলামিন ঘোষণা করেছেন, সেখানে এ রকম হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক বিষয়।

চার. নবুয়তের নিদর্শন

বনু সাআদে থাকাকালে নবিজির বক্ষবিদারণ, এটা তাঁর নবুয়তের অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ তায়ালা ভবিষ্যতে তাঁকে মহৎ কোনো কাজের জন্য নির্বাচিত করতে যাচ্ছেন—এটা তার অন্যতম সাক্ষী।

---

৮৫ আহলুস সালাহ ওয়াত তাকওয়া, আহলুল বাইত—তাদের ওসিলা নিয়ে (বৈধ) যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া মুস্তাহাব। জুমহুরুল আয়িম্মা ওয়াল ফুকাহা (ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদের বিশাল অংশ) এ ব্যাপারে একমত। দেখুন—*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ২, খণ্ড : ৩৩৯; *নাইলুল আওতার*, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৭; *সুবুলুস সালাম*, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ১৩৪; *আল মুগনি*, ইবনে কুদামা, খণ্ড : ২ খণ্ড : ২৫৬।

৮৬ সূরা আমবিয়া, আয়াত : ১০৭

নবিজির বক্ষবিদারণের এই ঘটনাটি বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন। অনেকভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই বিশুদ্ধ। এখানে ইমাম মুসলিমের বর্ণনাটুকু তুলে ধরছি। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত—

> (বনু সাআদে অবস্থানকালে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় তাঁর নিকট জিবরাইল এলেন। তাঁকে ধরে মাটিতে ফেলে (শুইয়ে দিয়ে) তাঁর বক্ষবিদারণ করলেন। এরপর তাঁর বুক ফেঁড়ে কলব বের করে এনে তা থেকে 'রক্তপিণ্ডে'র মতো বের করে আনলেন। এরপর জিবরাইল বললেন—এটা আপনার মাঝে থাকা শয়তানের অংশ। এরপর তা জমজমের পানিতে স্বর্ণের পেয়ালায় ধৌত করলেন। এরপর সেটাকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। তার সাথের বালকেরা তার দুধমা (হালিমা)-এর নিকট ছুটে এসে বলতে লাগল—'মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে।' তারা সবাই তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে দেখল, তিনি বিবর্ণ।[৬৭]

কিন্তু এই বক্ষবিদারণের মানে এই নয় যে, নবিজির ভেতরে 'মন্দের উপকরণ' ছিল আর জিবারাইল এটার মূলোৎপাটন করেছেন। কারণ, মানুষ থেকে যে মন্দ কাজ প্রকাশ পায়, এটা যদি তার শরীরে থাকা কোনো মন্দত্বের কারণে হতো, তাহলে অস্ত্রপাচার করে তা দূর করার মাধ্যমে মন্দ লোক ভালো হয়ে যেত; কিন্তু বক্ষবিদারণের উদ্দেশ্য হলো—বস্তুগত নিয়মে শৈশব থেকেই তাকে নবুয়ত প্রদানের উপযুক্ত করে তোলা। এটা যেন মানুষের কাছে তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতিতে অন্যতম ভূমিকা রাখে। নবুয়তের জন্য পবিত্র করা—এটা তো মানবীয় (অভ্যন্তরীণ) বিষয়। এখানে এ ধরনের বস্তুগত কার্যক্রমের কোনো প্রভাব নেই। তবুও এই বস্তুগত নিয়ম ব্যবহারের উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে তাঁর নবুয়তের বিষয়টা জানিয়ে দেওয়া।

যাক, ঘটনা যেহেতু বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তাই হিকমত যা-ই হোক, এক্ষেত্রে অযথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ডুবতে বসা, এর জাহির (দৃশ্যমানবোধ) হাকিকত (বাস্তবতা) বাদ দিয়ে দূরবর্তী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ আমাদের জন্য উচিত নয়। বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর দূরবর্তী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অযথা চেষ্টা করা দুর্বল ঈমানেরই পরিচায়ক।

---

৬৭ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০১-১০২; *সহিহ বুখারি*তে একাধিকবার বক্ষবিদারণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

মনে রাখবেন, আমাদের কাছে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করার মানদণ্ড শুধু সেই বর্ণনার সত্যতা ও বিশুদ্ধতাই। তাই কোনো বর্ণনা যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই। আর এক্ষেত্রে আমাদের বোঝার মানদণ্ড হলো—আরবি ভাষার প্রায়োগিক নিয়মনীতি। বাস্তবতাই হচ্ছে মূল। এখন প্রত্যেক পাঠক বা গবেষকই যদি বাস্তবতা বাদ দিয়ে তার পছন্দসই রূপকার্থের দিকে ছোটে, তাহলে আরবি ভাষা তার মূল্য হারাবে। মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। সর্বোপরি সে তার আবেদন হারিয়ে ফেলবে।

এত তাবিলের পেছনে ছোটা এবং বাস্তবতাকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করার অর্থ কী?

এটা কেবল আল্লাহর প্রতি দুর্বল ঈমান, রাসুলের নবুয়তের বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। অন্যথায় যা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত, তার হিকমত ও ইল্লত, অর্থাৎ তাৎপর্য ও কারণ জানা থাকুক বা না থাকুক, তা সহজেই মেনে নিত।

* * *

শামের প্রথম সফর : জীবিকার প্রয়োজনে কাজ

নবিজির বয়স যখন বারো, তখন তাঁর চাচা আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার সাথে সিরিয়ায় রওনা হন। সঙ্গে ভাতিজা মুহাম্মাদকেও নিলেন। বুসরায় (সিরিয়ার একটি শহর) তখন বুহাইরা নামের এক খ্রিস্টান পাদরি বসবাস করতেন। বুহাইরা ছিলেন ইনজিলের আলিম। খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে তিনি ভালো জ্ঞান রাখতেন। কাফেলা সেখানে নেমে যখন বুহাইরার পাশ অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন তিনি নবিজিকে দেখতে পেলেন। নবিজিকে দেখার পর কিছুক্ষণ তিনি চিন্তা করলেন এবং এরপর এসে নবিজির সাথে কথা বললেন। তারপর তিনি আবু তালিবকে লক্ষ করে জিজ্ঞেস করলেন, এ ছেলে আপনার কী হয়? আবু তালিব জবাব দিলেন—আমার ছেলে।[৬৮]

বুহাইরা তখন বললেন—না, সে আপনার ছেলে হতে পারে না। (তাঁর পিতা অন্য কেউ; কিন্তু) তিনি জীবিত থাকার কথা না।

: সে আমার ভাতিজা।

: তাঁর বাবা এখন কী করছেন?

: ভাতিজা গর্ভে থাকাবস্থায়ই তিনি মারা গেছেন।

: আপনি সত্য বলেছেন।

আপনি তাঁকে দ্রুত আপনাদের দেশে নিয়ে ফিরে যান। ইহুদিদের পক্ষ থেকে তাঁর ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে । আল্লাহর শপথ, ইহুদিরা তাঁকে দেখলে নিশ্চিত তাঁর ক্ষতি

---

৬৮ আবু তালিব ভাতিজার প্রতি অধিক ভালোবাসা ও স্নেহের কারণে ছেলে বলেছেন।

করে বসবে। কারণ, আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে বড়ো কিছু হবে। এ কথা শুনে আবু তালিব ভাতিজা মুহাম্মাদকে নিয়ে দ্রুত মক্কায় নিয়ে ফিরলেন।"

শাম থেকে যখন নবিজি ফিরে এলেন, তখন তাঁর যৌবনের শুরু। এ সময় জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে কর্মজীবনে পা রাখতে হয়। তিনি মানুষের ছাগল চরানোর কাজ শুরু করেন। (পরবর্তী সময়ে) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বলতেন—'আমি মক্কার মানুষের ছাগল চরানোর কাজ করতাম।'[৬৯]

যুবক বয়সে সাধারণত যেসব রংচটা খেলতামাশা ও বিনোদনে মেতে ওঠে মানুষ, আল্লাহ সেসব বিষয় থেকে নবিজিকে বিশেষ পদ্ধতিতে রক্ষা করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেন—

> জাহিলি যুগে যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো, এগুলোতে দুইবার ছাড়া আর কখনো অংশ নিইনি; কিন্তু এ দুইবারেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে বেঁচে

---

৬৯ *সিরাতে ইবনে হিশাম* থেকে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। দেখুন—*সিরাতে ইবনে হিশাম*, ১/১৮০; *তারিখুত তাবারি*, ২/২৮৭; *আসসুনানুল কুবরা*, বাইহাকি; *আল হিলইয়া*, আবু নুয়াইম। তবে বিশদ বিবরণে বর্ণনাগুলোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ইমাম তিরমিজি বিস্তারিতভাবে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা এনেছেন। ইমাম তিরমিজি এ ব্যাপারে যে বর্ণনাটি এনেছেন, এখানে সম্ভবত কিছুটা লিন (দুর্বলতা) রয়েছে। তিনি নিজেই এ হাদিস বর্ণনা করার পর বলেছেন—

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

এটি একটি হাসান ও গারিব স্তরের সনদযুক্ত হাদিস। কারণ, এই বর্ণনাটি ছাড়া এর আর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ হাদিসের সনদে আবদুর রহমান ইবনে গাজওয়ান নামে একজন রাবি রয়েছে। *আল মিজানে* তার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> তার কিছু রেওয়ায়াত মুনকার। তার চেয়ে বড়ো কথা হলো, তার বর্ণনার ভেতর সবচেয়ে বেশি মুনকার যা, তা হলো—তিনি ইবনে ইসহাক থেকে (চাচা আবু তালিবের সাথে নবিজির শাম সফরের বিষয়ে) যা বর্ণনা করেছেন, সেটুকু।

ইবনে সায়্যিদিন নাস তার সম্পর্কে বলেন—

> তার মতনে নাকারত রয়েছে (দেখেন—*উয়ুনুল আসার* ১/৪৩;) আশ্চর্যের বিষয় হলো, নাসিরুদ্দিন আলবানি এ সত্ত্বেও তিনি যে গাজালির 'ফিকহুস সিরাহ' কিতাবের তাখরিজ করেছেন, সেখানে বলেছেন—তার সনদ সহিহ। আর ইমাম তিরমিজির তালিকের (হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য) শুধু هذا حديث حسن (এটি হাসান সনদের হাদিস) এ অংশটুকু উল্লেখ করেছেন। অথচ তার অভ্যাস হলো, এই মানের হাদিসের চেয়েও বিশুদ্ধ হাদিসকে জয়িফ সাব্যস্ত করা। যাহোক, মূল ঘটনাটি শক্তিশালী বিভিন্ন তুরুকে প্রমাণিত।

৭০ এই বর্ণনাটি এসেছে ইমাম বুখারির বর্ণনায় *আত-তারিখুল কাবির*-এ। হাদিস নং : ১৩১; এ ছাড়াও এটি *আখবারু মাক্কা লিল ফাকিহি* : ১৬৬০; *আল ফিতান লি-নুআইম ইবনি হাম্মাদ* : ৫৩৭; *তারিখুত তাবারি* : ৩৯৩; *আল মাতালিবুল আলিয়া লিবনি হাজার* : ৪৩৫৬; *আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন* : ৭৬৮৩; *আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি* : ১৫৯৮০ সহ অসংখ্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

থাকতে সাহায্য করেছেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে নবুয়ত দেওয়া পর্যন্ত আর কখনো এগুলোতে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা করিনি। (নবুয়তের পরে তো অংশ নেওয়ার প্রশ্নই আসে না)।

মক্কার উঁচু ভূমিতে আমার সাথে যে ছেলেটা ছাগল চরাত, আমি তাকে একরাতে বললাম, মক্কায় যুবকরা যেভাবে গল্পগুজব করে রাত কাটায়, আমারও সেভাবে গল্পগুজব করে রাত কাটানোর ইচ্ছা ছিল। তুমি যদি আমার ছাগলগুলো একটু দেখতে!

সে বলল—ঠিক আছে, দেখব। আমি গল্পের উদ্দেশ্যে বেরোলাম। যখন মক্কা নগরীর প্রথম ঘরটার কাছে পৌঁছলাম, তখন বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম—এ আওয়াজটা কেন হচ্ছে?

তারা বলল—বিয়ের অনুষ্ঠান তো, তাই। আমিও সেখানে বসে পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা তখন আমার কানে মোহর এঁটে দিলেন। (অর্থাৎ আমি এর কিছুই শুনতে পেলাম না।)

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। (পরের দিন) সূর্যের আলোতে আমার ঘুম ভাঙল। এরপর আমি আমার সঙ্গীর নিকট ফিরে এলাম। আমাকে জিজ্ঞেস করলে ব্যাপারটা আমি তাকে খুলে বললাম। পরবর্তী সময়ে আরেক রাতে আমি এ রকম তাকে দেখার দায়িত্ব দিয়ে গেলাম; কিন্তু মক্কায় পৌঁছার পর প্রথম দিনের মতোই অবস্থা হলো। এরপরে আর কখনো আমি এ রকম মন্দ কাজের ইচ্ছা করিনি।[৭১]

* * *

৭১ ইবনুল আসির বর্ণনাটি এনেছেন। ইমাম হাকিম আলি রা.-এর সূত্রে বর্ণানা করেন। এ বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেন—

صحيح على شرط مسلم

মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদিসটি সহিহ।
তাবারানি আম্মার ইবনে ইয়াসিরের সূত্রে বর্ণনা করেন।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

পূর্ববর্তী কিতাবে নবিজির সংবাদ

বর্ণনায়[৭২] বুহাইরার যে কথা এসেছে, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—আহলে কিতাবরা (ইহুদি-খ্রিষ্টান) নবিজিকে প্রেরণের কথা জানত। সেই প্রেরিত নবির কী কী আলামত হবে, তাও তারা জানত। তারা এসব জেনেছিল তাদের ধর্মীয় কিতাব তাওরাত ও ইনজিল থেকে। এতে নবিজির প্রেরণ, তাঁর আলামত ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রচুর দলিল বিদ্যমান।

এর একটি হলো, সিরাত বিশারদগণের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদিরা নবিজির প্রেরিত হওয়ার পূর্বে আওস ও খাজরাজের বিরুদ্ধে তারা তাঁর ওসিলা দিয়ে সাহায্য চাইত। এবং তারা আওস ও খাজরাজকে বলত—

> অচিরেই একজন নবি প্রেরিত হবেন। আমরা তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সাথে মিলে আদ-ইরমের মতো তোমাদের হত্যা করব।

কিন্তু নবিজির আগমন হলে তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেন—

> وَلَمّا جاءَهُم كِتٰبٌ مِن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُم وَكانوا مِن قَبلُ يَستَفتِحونَ عَلَى الَّذينَ كَفَروا فَلَمّا جاءَهُم ما عَرَفوا كَفَروا بِهِ ۚ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الكٰفِرينَ

> যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল, যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন

---

৭২ এটা ব্যাপকভাবে সিরাত বিশারদগণ সবাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি আবু মুসা আশআরির সূত্রে দীর্ঘ বর্ণনা এনেছেন।

তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।[৭৩]

ইমাম কুরতুবিসহ অনেকেই বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা যখন এ আয়াত...

الَّذينَ ءاتَينٰهُمُ الكِتٰبَ يَعرِفونَهُ كَما يَعرِفونَ أَبناءَهُم ۖ وَإِنَّ فَريقًا مِنهُم لَيَكتُمونَ الحَقَّ وَهُم يَعلَمونَ

আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।[৭৪]

নাজিল করলেন, তখন উমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে (যিনি কিতাবি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুসলিম হয়েছেন।) জিজ্ঞেস করেন—তুমি নিজ সন্তানকে যতটা চেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি ততটা চেন?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, বরং আরও বেশি।

আকাশে আল্লাহ তায়ালার কাছে যিনি বিশ্বস্ত, জমিনে তিনি বিশ্বস্ততার গুণসহ তাঁকে পাঠিয়েছেন। তাই আমি তাঁকে চিনেছি। তাঁকে আমি এতটাই নিশ্চয়তার সাথে চিনি, যতটা আমি আমার ছেলের ব্যাপারে (নিজের ছেলে বলে) নিশ্চিত হতে পারি না। কারণ, আমি নিশ্চিত জানি না, আমার স্ত্রীর অন্য কারও সাথে সম্পর্ক ছিল কি না, সে তা সাথে কিছু করেছে কি না। একইভাবে সালমান ফারসি রা.-এর ইসলাম গ্রহণের কারণও ছিল আহলে কিতাবের আলিম-পাদরিদের ইনজিল থেকে নবিজি ও তাঁর সিফাতের ব্যাপারে একের পর এক সংবাদ আসতে থাকা।

তাওরাত ও ইনজিলে নবিজির ব্যাপারে এসব বর্ণনা থাকলেও অধিকাংশ আহলে কিতাবই তা অস্বীকার করেছে। নবিজির ব্যাপারে ইহুদিদের জানা এটা তাকে তাদের অস্বীকারের ক্ষেত্রে বাধা না।

---

৭৩ সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৯

৭৪ সূরা বাকারা, আয়াত : ১৪৬

আজকালের প্রচলিত ইনজিলগুলোতে নবিজির দিকে ইশারাকারী কোনো বর্ণনা নেই। এখান থেকে পষ্ট বোঝা যায়—এসব কিতাবে কী পরিমাণ রদবদল হয়েছে! আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে তাদের এ ব্যাপারটা তুলে ধরেছেন—

وَمِنهُم أُمِّيّونَ لا يَعلَمونَ الكِتٰبَ إِلّا أَمانِيَّ وَإِن هُم إِلّا يَظُنّونَ

> তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙক্ষা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।

فَوَيلٌ لِلَّذينَ يَكتُبونَ الكِتٰبَ بِأَيديهِم ثُمَّ يَقولونَ هٰذا مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشتَروا بِهِ ثَمَنًا قَليلًا ۖ فَوَيلٌ لَهُم مِمّا كَتَبَت أَيديهِم وَوَيلٌ لَهُم مِمّا يَكسِبونَ

> অতএব, তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।[৭৫]

তো, জীবিকার প্রয়োজনে নবিজি যে ছাগল চরিয়েছেন, এখান থেকে বিশেষভাবে আমরা তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি—

এক.

সুউচ্চ রুচি ও তীক্ষ্ণ ইহসাস-অনুভূতি—যে দুটি গুণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে সাজিয়েছিলেন। তাঁর চাচা তাঁর খুব যত্ন নিতেন। নবিজি চাচার কাছে একজন পিতার ছায়া ও স্নেহ পেয়েছিলেন; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপার্জনের সক্ষমতা অনুভব করতেই তিনি জীবিকার কাজে নামেন। উপার্জনের চেষ্টা চালিয়ে যান, যেন চাচার ভার কিছুটা কমে যায়।

নবিজির জন্য আল্লাহ তায়ালা জীবিকার যেই কাজ বেছে দিয়েছিলেন, এটা হয়তো তাঁকে যে কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, এর বিবেচনায় অনেক ক্ষুদ্র, গুরুত্বের

---

৭৫ সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৮,৭৯

দাবি রাখে না; কিন্তু সবকিছুর পরে এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন। কৃতজ্ঞ বানানো। পরিশ্রমী, বিচক্ষণ, নেতৃত্বশীল আচার ব্যবহারে সৎ বানানোর পাঠ দেওয়া।

দুই.

এটি এমন জীবনযাপন—যার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বেশি সন্তুষ্ট। তিনি চান, তার সৎ বান্দারা এ রকমই জীবনযাপন করুক। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলেই নবিজির জীবনের শুরুতে তুচ্ছ জীবিকার জন্য ছাগল চরানোর মতো কাজ না করিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন দিতে পারতেন; কিন্তু হিকমতে ইলাহি (আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা) থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হলো—যে ধনসম্পদ মানুষ নিজ হাতে কামাই করে, সমাজসেবার মধ্য দিয়ে মানুষ যে সম্পদ অর্জন করে, তা উত্তম সম্পদ। আর অনুত্তম সম্পদ হলো, যা কোনো কষ্ট ব্যতিরেকে অর্জন হয়। যেখানে সমাজসোবার কোনো ছাপ থাকে না।

তিন.

যেকোনো একজন দায়ি যখন তার দাওয়াতকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বানাবে, এর বিনয়ের হদ হাদিয়া-তোহফা ইত্যাদি গ্রহণ করবে, তখন তার দাওয়াতের কোনো মূল্য থাকবে না। এ কারণে যিনি দায়ি হবেন, তার জীবন ও জীবিকায় হতে হবে স্বনির্ভর। তার ওপর কারও ইহসান বা করুণা থাকবে না। এজন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে পারেন। জীবনের এ সময়টাতে যদিও নবিজির মনে এসব বিষয়ের উদয় হয়নি।

আর উদয় হবেই বা কীভাবে? তিনি তো জানতেন না, ভবিষ্যতে তার কাঁধে বিশাল নবুয়তের দায়িত্ব আসবে। তাঁকে এ ছাগল চরানোর কাজে জড়ানোতে আল্লাহর হিকমত এটাই। এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, নবিজির নবুয়তপূর্ব জীবনে এমন কোনো বিষয় না থাকুক, যা তাঁর নবুয়তপরবর্তী জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নবিজির শৈশব, যৌবনের প্রারম্ভ থেকে নিয়ে সারাজীবন আল্লাহর তাঁকে বিশেষভাবে হিফাজত করা থেকে আমাদের নিকট দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। দুটোই বেশ গুরুত্বপূর্ণ—

☞ **এক.** নবিজির মাঝে অন্য দশজন মানুষের মতো মানবিক সব বৈশিষ্ট্যাবলি ছিল। স্বভাবজাত হিসেবে একজন যুবকের মন যেসব বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, নবিজির মনও সেসব বিষয়ে আকৃষ্ট হতো। তিনি গল্পগুজব বা আড্ডা এসব বুঝতেন; এসবে যে উপভোগ রয়েছে, তাও তার বুঝে ছিল।

অন্যরা যেভাবে উপভোগ করে, তাঁরও মন চাইত, তিনি সে রকম উপভোগ করেন।

☞ **দুই.** স্বভাবজাত এসব বিষয় থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে নির্মল রেখেছেন। নবুয়তের শান উপযোগী নয়—এমন সব বিষয় থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটা তিনি যখন থেকে নবুয়ত ও শরিয়ত পাননি, তখন থেকেই। তার এই সুরক্ষা শরিয়ত লাভের পূর্ব থেকেই ছিল। তিনি তাঁর মনের কামনার সামনে বা তাঁর নবুয়তের শান উপযোগী নয়—এমন ক্ষেত্রে তিনি অদৃশ্য কোনো এক প্রতিবন্ধকতা পেতেন। এটাই ছিল তাঁর জন্য আবশ্যক। তাঁকে তো তাঁর শরিয়তের কাজ করতে হবে, মাকারিমুল আখলাকের দায়িত্ব পূর্ণ করতে হবে।

এ দুই বাস্তবতা থেকে বোঝা যায়—নবিজিকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে প্রতিপালন করেছেন। তরবিয়ত ও নির্দেশনা ইত্যাদি ওসাইল ছাড়াই তাঁকে হাত ধরে চালিয়েছেন। আর আল্লাহ ছাড়া কে তাঁর চালনা করবে? নির্দেশনা দেবে? কে তাকে সুরক্ষার পথে চালাবে? তার আশপাশের পাড়া-প্রতিবেশী নিজেরাই তো পথহারা!

নবিজিকে আল্লাহর বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষেণের যে আলোকচ্ছটা তৈরি হয়েছিল, এটা নবিজির জাহিলিয়াতের আঁধার ভাঙার মোক্ষম অস্ত্র। এটা তার নবুয়তের (যে নবুয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তার সৃষ্টি, সে নবুয়তেরই এটা) অন্যতম নিদর্শন। আর তিনি যেহেতু নবুয়তের মহান দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন, তাই এসব বিষয়ের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, জীবন ও ব্যবহার—সবকিছু গঠন করা হয়েছে।

আল্লাহ চাইলে পারতেন নবিজিকে প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত করে জন্ম দিতে। তখন আর তার মন চাইত না, তিনি তার সঙ্গের ছেলেকে বলে গল্প করতে যাবেন; কিন্তু তখন নবিজি যে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন, সেটা প্রকাশ পেত না।

নবিজিকে আল্লাহ তায়ালার এই বিশেষ প্রতিপালনের অন্যতম হিকমত হলো, তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে মানুষের ঈমান আনার পথ সহজ ও সুগম করে দেওয়া। তাঁর রিসালাতে যেন কোনো ধরনের সন্দেহ না থাকে।

* * *

খাদিজা রা.-এর মূলধন, নবিজির ব্যবসা ও বিয়ে

খাদিজার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ ছিলেন[৭৬] একজন ধনাঢ্য, ব্যবসায়ী, সম্ভ্রান্ত নারী। তিনি তার সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য লোক নিতেন। এবং তাদের সাথে নির্ধারিত বিনিময়ে 'মুদারাবা'র[৭৭] চুক্তি করতেন।

খাদিজা যখন নবিজির সততা, আমানতদারি ও মহৎ চরিত্রের কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি নবিজির কাছে ব্যবসার প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন। তিনি যেন খাদিজার মূলধন নিয়ে শামে গিয়ে ব্যবসায় শ্রম দেন। বিনিময়ে তিনি তাঁকে

---

৭৬ ইবনুল আসির ও ইবনে হিশাম যেমনটা বর্ণনা করেছেন।

৭৭ মুদারাবা : (مضاربة) শব্দটি আরবি (ضرب) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, আঘাত করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেওয়া, পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে বহু জায়াগায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। সূরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ২০

মুদারাবা মূলত ইসলামে বৈধ ব্যবসার একটা প্রকার। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্বচুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মাঝে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে তা বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে সবটুকু লোকসান পুঁজিদাতা বহন করলেও মুদারিব তার শ্রম ও তৎপরতার কোনো পারিশ্রমিক না পাওয়াটাই তার লোকসান হিসেবে গণ্য হয়। তবে যদি মুদারিব কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন, অবহেলা বা চুক্তিভঙ্গের কারণে লোকসান হয়, তাহলে মুদারিবকে লোকসানের দায় বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, মুদারাবা ব্যবসায় স্বাভাবিক লোকসান হয়ে পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রথমত পূর্বতন লভ্যাংশ দ্বারা পুঁজির সমন্বয় করা হবে। লভ্যাংশ দ্বারা পুঁজির সমন্বয় না হলে অবশিষ্ট ক্ষতি পুঁজিদাতাই বহন করবে। এক্ষেত্রে মুদারিব বা উদ্যোক্তার ওপর এর কোনো দায় আরোপিত হবে না। *শারহুল মাজাল্লাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৬৩

লভ্যাংশের বড়ো একটা অংশ দেবেন। যে পরিমাণ অংশ তিনি অন্য কাউকে দেননি। তাঁর কাজের সহায়তায় গোলামও সাথে দেবেন।

নবিজি খাদিজার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। খাদিজার মালামাল নিয়ে শামের বাজারে রওনা হলেন। সঙ্গে ছিল খাদিজার গোলাম মাইসারা। শামে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। সেবারের ব্যবসা বেশ ভালো হলো। খাদিজার নিকট নবিজি কয়েকগুণ বেশি লাভ তুলে দেন। নবিজি তাঁর নিকট থাকা খাদিজার সব আমানত ফিরিয়ে দেন। মাইসারা নবিজির সফরসঙ্গী হওয়াতে নবিজির উন্নত চরিত্রমাধুরী ও বৈশিষ্ট্য দেখতে পেল ভালোভাবে। এতে সে নবিজির প্রতি ভীষণ রকম মুগ্ধ হলো। আশ্চর্যান্বিতও হলো। খাদিজার নিকট ফিরে আসার পর নবিজির এসব উন্নত চরিত্রের কথা তার কাছে তুলে ধরল।

খাদিজাও তাঁর আমানতদারির কথা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর এই বিশাল মুনাফা দেখে কেমন যেন বিস্ময়াভিভূতও হলেন। এরপর তিনি তার বান্ধবী (নাফিসা বিনতু মানিয়্যাহ)-এর মাধ্যমে নবিজিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

এ প্রস্তাব শুনে নবিজি চাচাদের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বললেন। এরপর তারা খাদিজার চাচা আমর ইবনে উসাইদের নিকট নবিজির সাথে খাদিজার বিয়ের প্রস্তাব দেন। নবিজির বয়স তখন পঁচিশ আর খাদিজার বয়স চল্লিশ।

খাদিজার সাথে নবিজির বিবাহ

নবিজির সাথে খাদিজা রা.-এর বিবাহের আগে অন্য দুই স্বামীর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। তাদের প্রথমজন আতিক ইবনে আয়িজ আত-তামিমি। দ্বিতীয়জন আবু হালাহ আত-তামিমি (যার মূল নাম হিন্দ ইবনে জুরারা)।[৭৮]

* * *

৭৮ ইবনে সায়্যিদিন্নাস তার রচিত *উয়ূনুল আসার* এবং ইবনে হাজার *আল ইসাবা*-তে এটি বর্ণনা করেছেন। অন্যরাও বর্ণনাটি এনেছেন। প্রথম স্বামীর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে ইবনে সায়্যিদিন্নাস 'আতিক ইবনে আয়িজ' (যা কাতাদা ও ইবনে ইসহাকের বর্ণনা)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

মুদারাবা চুক্তির কারণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার মূলধন নিয়ে যে মুদারাবা চুক্তি করেছিলেন, তা ছিল জীবন ও জীবিকার তাগিদে; যা শুরু হয়েছিল অন্যের ছাগল চরানোর মাধ্যমে। পূর্বে আমরা আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে এই কাজে লাগানোর যে বিশাল হিকমত রয়েছে, তার কিছুটা উল্লেখ করেছি।

খাদিজা রা.-এর বৈশিষ্ট্য

খাদিজা রা. ছিলেন সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নবি-জীবনে খাদিজার বেশ মূল্যায়ন ও কদর ছিল। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সাধারণভাবে তিনি তার যুগের নারীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

> মারইয়াম বিনতে ইমরান, তিনি তার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী ছিলেন। আর নবিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ।[৭৯]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

> আমি খাদিজা ছাড়া অন্য কোনো নারীর ওপর ঈর্ষা করিনি। আমি তাকে পাইনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বকরি জবাই করতেন, তখন বলতেন—এর গোশত থেকে খাদিজার বান্ধবীদের নিকট কিছু পাঠাও। আমি একদিন তাঁর (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

৭৯ *সহিহ বুখারি* : ৩৮১৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩০

ওপর রাগ করে ফেললাম। এবং বললাম—শুধু খাদিজা খাদিজা! তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম।[৮০]

ইমাম আহমাদ ও ইমাম তাবারানি দুজনই মাসরুক (বর্ণনাপদ্ধতিতে) বর্ণনা করেছেন, আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

নবিজি খাদিজার কথা স্মরণ না করে, তার প্রশংসা না করে ঘর থেকে বের হতেন না। একদিন তার কথা আলোচনা করলে আমি অভিমানে কাঁদতে লাগলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম—তিনি তো ছিলেন একজন বুড়ি! আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে তার চেয়ে উত্তম নারী মিলিয়ে দেননি? (এরপরও আপনি শুধু তারই কথা বলতে থাকেন সব সময়।)

নবিজি তখন রাগ করে ফেললেন। এবং বললেন—না, আল্লাহ তায়ালা আমার জীবনে তার চেয়ে উত্তম নারী দেননি। মানুষ যখন কুফরি করেছে, তখন সে ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তখন সে আমার সত্যায়ন করেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে আমার সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। তার উদর থেকেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন; অন্য কোনো নারী (স্ত্রী) থেকে নয়।

নবিজি কি লোলুপ ছিলেন

নবিজি খাদিজাকে বিয়ে করা থেকে যেই ব্যাপারটি প্রথমে আমাদের বুঝে আসে, তা হলো—নবিজির শারীরিক চাহিদা ও স্ত্রী-সম্ভোগের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তা না হলে অন্য আর দশজন যুবক যা করে তিনিও তাই করতেন। নিজের চেয়ে কমবয়সি, অন্তত সমবয়সি অবশ্যই বিয়ে করতেন।

এখান থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি—খাদিজার আভিজাত্য, নিজ বংশমর্যাদা, প্রতিপত্তি, নিষ্কলুষতা—জাহিলি যুগে পর্যন্ত যিনি 'আফিফাহ' (সচ্চরিত্রা)-এর গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এর কারণে নবিজি তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

নবিজির সাথে সংসার করাবস্থায়ই ৬৫ বছর বয়সে খাদিজা রা. মারা যান। নবিজির বয়েস তখন ৫০-এর কাছাকাছি। দীর্ঘ এই দাম্পত্যজীবনে নবিজি অন্য কোনো নারী

---

৮০ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম*, শব্দচয়ন : মুসলিম

বা যুবতিকে বিয়ে করার চিন্তা তিনি মাথায় আনেননি। অথচ বিশ থেকে পঞ্চাশ—এই বয়সটাই মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যৌবনকাল। মানবিক প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে মানুষ তখন একাধিক নারী, একাধিক স্ত্রীর সান্নিধ্য পেতে চায়।

কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনের এই দুরন্ত সময়টিতে খাদিজা ছাড়া অন্য কোনো নারীর (স্ত্রী হোক বা সে যুগে প্রচলিত দাসী) কথা চিন্তা করেননি। চাইলেই তিনি বহু স্ত্রী ও দাসীকে নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারতেন। সামাজিকভাবেও এর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বহুবিবাহকে জাহিলি সমাজ কিছু মনে করত না। একাধিক বিবাহ ছিল তাদের সমাজে প্রচলিত সাধারণ ব্যাপার।

প্রাচ্যবিদদের মুখে চপেটাঘাত

খাদিজা রা. কুমারী ছিলেন না। তার বয়সও ছিল নবিজির প্রায় দ্বিগুণ। তবুও টগবগে একজন যুবক এই নারীকে বিয়ে করেছেন! এটা ইসলামবিদ্বেষী সম্প্রদায়, খ্রিষ্টান মিশনারি, মুসতাশরিকিন (প্রাচ্যবিদ) ও তাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ অনুসারীদের প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে শক্তিশালী দলিল।

প্রাচ্যবিদরা ইসলামকে আহত করার লক্ষ্যে, নবিজির সুখ্যাতিতে কালিমা লেপন করার জন্য নবিজির বিবাহের ব্যাপারটাকে মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। নবিজির বিবাহকে বিকৃত প্রচারণার মাধ্যমে তাঁকে প্রবৃত্তির পুজোয় মত্ত, শারীরিক বাসনা ও জীবন উপভোগে ডুবন্ত এক মানব হিসেবে উপস্থাপন করে; যা তাঁর নির্মলতার প্রতিবন্ধক, যা তাঁর রিসালাতে কলঙ্ক সৃষ্টি করে।

খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদদের বড়ো অংশটাই ইসলামবিদ্বেষী, ইসলামের বিরুদ্ধবাদী, ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনকারী। ইসলামকে কলুষিতকারী, ইসলামের বিরুদ্ধে কালিমালেপন—এটা তাদের অনন্য পেশা; যা তাদের জীবিকা উপার্জনের বিশেষ হাতিয়ার আর যেজন্য তারা প্রচুর শ্রম ব্যয় করে। এটাই বাস্তবতা। আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের অধিকাংশরাই তাদের অন্ধানুসরণে লিপ্ত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছে। এই অন্ধানুসরণ তাদের প্রকৃতভাবে সত্য অনুসন্ধান এবং সত্যকে বোঝার সুযোগটুকু দিচ্ছে না। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ এটা মানুষের মাঝে তাদের পরিচিতির প্রতীকী চিহ্ন, যার মাধ্যমে তারা স্পষ্ট বার্তা দেয়—সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার সাথে তাদের ব্যাপক ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদরা যেই সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা লালন করে, তারা মানুষকে যার দিকে ডাকে, তারাও এর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম প্রশ্নে তাদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটা

(ইসলাম চিন্তা ও গবেষণা) প্রকৃত ও নিরপেক্ষ চিন্তা বা গবেষণার প্রয়োজনে নয়; এটা কেবল স্বজাতির কাছে নিজেকে তুলে ধরার জন্য।

নবিজির বিয়ে কি নারী সম্ভোগ ছিল

নবিজির বিবাহের ব্যাপারটা নিতান্তই সাধারণ। তারা এ ব্যাপারে যেই প্রোপাগান্ডা—প্রবৃত্তিপূজারি ও নারী সম্ভোগে ডুবন্ত মানব বলে প্রচারণা—চালায় আদৌ ব্যাপারটা এ রকম নয়। একজন মুসলিম, দ্বীনকে যে ভালো বোঝে, যে নবিজির সিরাত সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত, তার কাছে বরং নবিজির বিবাহের ব্যাপারটা তাদের বিকৃত প্রচারণার বিরুদ্ধে দলিল। তারা নবিজিকে প্রবৃত্তিপূজারি ও শারীরিক কামনা-বাসনার প্রতিবিম্ব হিসেবে তুলে ধরে তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করতে চায়!...

অথচ তারা যেই ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা চালায়, স্বয়ং ওই ব্যাপারটাই তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দলিল। একজন প্রবৃত্তিপূজারি পঁচিশ বছর পর্যন্ত জাহিলি সমাজে—যেখানে প্রবৃত্তিপূজার জয়জয়কার, মানবতা যেখানে কামনা-বাসনায় গভীরভাবে আচ্ছন্ন, নিজেকে নির্মল রাখবে, ব্যাপারটা বেশ দুরূহ।

একজন কামুক ব্যক্তি জীবনসায়াহ্নে প্রায় এসে যাওয়া এক নারীকে জীবনে প্রথমবারের মতো বিয়ে করবে এবং বিয়ের পর স্রেফ তার সঙ্গেই দিন যাপন করবে; সমাজে অবারিত কাম-প্রবৃত্তির উপকরণ ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ওসব থেকে নিজকে সংবরণ করে রাখবে—এভাবে নির্লিপ্তভাবে যৌবন পাড়ি দিয়ে পৌঢ়, এরপর বার্ধক্য পা দেবে—এটা বেশ জটিল।

পরবর্তী সময়ে তিনি যে আয়িশা রা.-সহ অন্যান্য নারীকে বিবাহ করেছিলেন, সেগুলো ভিন্ন আলাপ। প্রত্যেকটার ব্যাপারেই আলাদা কথা রয়েছে। ওই বিবাহগুলোর প্রত্যেকটাতেই 'বিশেষ কারণ ও হিকমত' রয়েছে; যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে একজন মুসলিমের ঈমানকে সুদৃঢ় করে, তার কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা, গুরুত্ব ও উন্নত চরিত্র-মাধুরী বাড়িয়ে তোলে। কারণ, ও হিকমত যাহোক, কথা হলো, বিবাহের মাধ্যমে নবিজির স্রেফ শারীরিক কামনা-বাসনার পেছনে ছোটা—এটা কখনোই ছিল না। তা না হলে প্রবৃত্তির বাসনায় মরিয়া হয়ে ওঠার প্রকৃতিগত যেই সময়, সেই সময়েই তিনি তাঁর এই বাসনা পূরণে প্রবৃত্ত হতেন। এবং তা মনের সাধ মিটিয়ে করতে পারতেন। কারণ, তিনি তখন সম্পূর্ণ ঝামেলামুক্ত ছিলেন; প্রবৃত্তির বাসনাপূ রণে প্রতিবন্ধক কোনো কাজে (যেমন : দাওয়াত) কাজে তিনি তখন নিমগ্ন ছিলেন না।

আমি অন্য আর দশজন গবেষকের মতো ওদের বিকৃত প্রচারণার প্রতিরোধ করে আর আলোচনা দীর্ঘ করতে যাচ্ছি না। আমি নবিজির বিবাহের ব্যাপারটাকে এমন কোনো সংকট—বিরুদ্ধবাদীরা যেটাকে চরম সংকট হিসেবে ভাবে—মনে করছি না, যা আলোচনা পর্যালোচনা, গবেষণার দাবি রাখে। ইসলামের এমন অনেক বিষয় আছে, বিরুদ্ধবাদীরা নিজেরা যেগুলোকে সরাসরি ভ্রান্ত বলতে যায় না; কিন্তু এসব ব্যাপারে তারা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পরে (অযথা) আলোচনা-পর্যালোচনা তর্কবিতর্কে ডুবিয়ে রাখে।

* * *

কাবা নির্মাণে নবিজির অংশগ্রহণ

প্রথম ইবাদতগৃহ

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম নেওয়া, তাঁর ইবাদত করা, একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে ঘর নির্মিত হয়, সেটি কাবা। আবুল আম্বিয়া (নবিদের পিতা) ইবরাহিম আ. এর নির্মাতা। মূর্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, মূর্তির বেদি, উপাসনালয় গুঁড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর আদেশে তিনি এ ঘর নির্মাণ করেন। কুরআন তাঁর কাজের এই চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

> স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তাঁরা দুআ করেছিল—পরওয়ারদিগার, আমাদের থেকে কবুল করেন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।[৮১]

এরপর কাবা বিভিন্ন সময় নানান দুর্যোগ-দুর্বিপাকের শিকার হয়েছে; যেগুলো তার ভিত্তিকে দুর্বল ও নড়বড়ে করে দিয়েছিল, যেসব দুর্যোগের কারণে দেওয়ালে ফাটল ধরেছিল। এসব দুর্যোগের মধ্য থেকে নবিজির নবুয়ত লাভের অল্প কিছুকাল পূর্বে মক্কায় যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, সেটি অন্যতম। এটি কাবার নড়বড়ে ভিত্তিকে আরও নড়বড়ো করে, দেওয়ালের ফাটল আরও বাড়িয়ে দেয়। কুরাইশরা কাবার

---

৮১ সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭

তাজিম (জাহিলি আরবদের মাঝে ইবরাহিমি শরিয়তের ছিটেফোঁটা যা বাকি ছিল, এর মধ্যে কাবার তাজিমও একটি।) ও সম্মানের কারণে কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা দেখছিল না।

নবিজির অংশগ্রহণ

নবুয়তের আগে নবিজি কুরাইশদের কাবার এই পুনর্নির্মাণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি খালি গায়ে (শুধু লুঙ্গি পরে) নিজের কাঁধে পাথর বহন করতেন। বিশুদ্ধতম বর্ণনামতে, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত—

> কাবা নির্মাণের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আব্বাস রা. দুজন পাথর বহন করছিলেন। আব্বাস রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, তুমি তোমার লুঙ্গি ঘাড়ে উঠিয়ে রাখো।
>
> (এ কথা বলে আব্বাস তাঁর লুঙ্গিতে টান দিলে লুঙ্গি কিছুটা খুলে গেলে লজ্জায়) সঙ্গে সঙ্গে নবিজি মাটিতে পড়ে গেলেন। এবং আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এরপর তিনি বললেন, আমার লুঙ্গিটা দেন, এরপর তিনি তা পরে নিলেন।[৮২]

হাজরে আসওয়াদ রাখা নিয়ে কুরাইশদের মাঝে যেই ভয়ংকর ঝগড়া বেঁধেছিল, এর সমাধান ও নিরসনে নবিজির বড়ো অবদান ছিল। এ ব্যাপারে তিনি যেই সমাধান বের করেছিলেন, তার সামনে সবাই মাথা নত করেছিল। যেহেতু তিনি আল আমিন, সবার প্রিয়।

* * *

৮২ *সহিহ বুখারি* : ১৫৮২; *সহিহ মুসলিম* : ৩৪০। বর্ণনা মুসলিমের। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এই দুজন ছাড়াও ইমাম ইবনে হাজমও এটি বর্ণনা করেছেন।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

কাবা নির্মাণের সময় নবিজির যে ভূমিকার কথা আমরা সংক্ষেপে এখানে জানলাম, সিরাতে নববির টুকরো অংশ থেকে আমরা চারটি বিষয়ের পাঠ নেবো—

এক. কাবা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য

কাবা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে' মর্যাদাপূর্ণ ঘর। এরচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ঘর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। কাবার মর্যাদা বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য, মানুষের নিরাপত্তার ও আশ্রয়ের জন্য আল্লাহর আদেশে ইবরাহিম আ.-এর মতো মহান নবি তা নির্মাণ করেছেন। তবে এর দ্বারা কাবা স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্মানের অধিকারী—এটি উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা কেবলই নির্জীব পাথর; যার উপকার বা ক্ষতি কোনো কিছু করারই ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করার কারণে তা সম্মানিত হয়েছে।

তো, যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইবরাহিম আ.-কে মূর্তি-প্রতিমা, দেব-দেবীর নিধন এবং এগুলোর উপাসনালয় নিঃশেষকরণ, স্মৃতিচিহ্নগুলো মুছে ফেলা, প্রতিমাপূজা থেকে বারণের মিশন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাই আল্লাহর হিকমতের দাবি ছিল—এই ভূপৃষ্ঠে ওইসব তাগুতি নিদর্শনের পরিবর্তে আল্লাহর একত্ববাদ ও কেবল তাঁরই ইবাদতের নিদর্শন-প্রতিবিম্ব দাঁড় করানো; যেটা যুগ যুগ ধরে একত্ববাদের নিদর্শন হয়ে থাকবে।

দীর্ঘকাল মানবতা ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির যেই অতল গহ্বরে রয়েছে, যেই প্রতিমা ও পাথরপূজা করেছে, প্রতিমাদের জন্য যেসব উপাসনালয় গড়েছে, কাবা নির্মাণ তার পরিবর্তন ঘটাবে। মূর্তি আর প্রতিমাপূজার অসারতা প্রকাশিত হবে। ওইসব দেব-দেবীর উপাসনালয়ের ওপর তাওহিদের নতুন এই নিদর্শন—কাবা প্রভাব বিস্তার

করতে সক্ষম হবে। কাবা হবে ইবাদতের বিশেষ একটি স্থান। মানুষ এখানে এসে আত্মিক শক্তি—আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সামনে মাথা না ঝোঁকানো—লাভ করবে।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিনদের ঐক্যের একটা প্রতীকী চিহ্ন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; যেটা হবে দেশ-কাল ভাষা বর্ণ যা-ই হোক—সবার মিলনমেলার স্থান; আন্তর্জাতিক মিলনস্থল। এটাই হবে সেই মিলনস্থল, যার ছায়াতলে সত্যের[৮৩] সঙ্গে তারা পরিচিত হবে। যেই ঘর হবে পৃথিবীর পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যে, আল্লাহর একত্ববাদ ও ইবাদতের নিদর্শন। আর নিচের আয়াতটির বক্তব্যও তা-ই—

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

আর স্মরণ করেন, যখন আমি কাবাগৃহকে যেহেতু মানুষের জন্য সম্মিলন-স্থল ও শান্তির আলয় করলাম। আর তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের জায়গা বানাও। আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম—তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো।[৮৪]

বান্দা যখন তার ভেতরে উবুদিয়্যাহ (আল্লাহ দাসত্বের অনুভব) এবং তার বাস্তবায়ন করা, বাধ্যগত একজন বান্দা হিসেবে তার আদেশ নিষেধ মান্য করার তীব্র তাড়না নিয়ে কাবায় ছুটে যায়, বাইতুল্লাহকে তাওয়াফ করে, তখন সে গভীরভাবে তা অনুভব করে। বাইতুল্লাহ যখন এত কিছুর সম্মিলনকেন্দ্র, তাই আমরা বাইতুল্লাহর তাজিম করি, সম্মান করি, বাইতুল্লায় হজ করতে যাই, তার চারপাশে তাওয়াফ করি।

---

৮৩ সত্য দ্বারা উদ্দেশ্য তাওহিদ ও একত্ববাদ, যা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য এই ঘরের নির্মাণ।

৮৪ সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫

দুই. কাবা নির্মাণ ও নিশ্চিহ্নের ইতিবৃত্ত

পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চারবার কাবাঘর নির্মাণ করা হয়েছে। চারবারের ব্যাপারটাই নিশ্চিত; এর আগে-পরে নির্মাণের ব্যাপারে যেসব বর্ণনা রয়েছে , সেগুলোতে মতানৈক্য আছে এবং সেগুলো নিশ্চিতও না।

প্রথমবার : প্রথমবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ইবরাহিম আ. নির্মাণ করেন। তাঁর ছেলে ইসমাইল আ. তাঁকে এই মহৎ কাজে সহযোগিতা করেন। এ ব্যাপারটি কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কুরআনে কারিমের ইরশাদ—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

স্মরণ করেন, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। তাঁরা দুআ করেছিলেন—পরওয়ারদিগার, আমাদের থেকে কবুল করেন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।[৮৫]

এ ব্যাপারে প্রচুর হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে ইমাম বুখারি নিজস্ব সনদে ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। হাদিসের বর্ণনা এ রকম—

'...এরপর ইবরাহিম আ. বললেন—ইসমাইল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে একটি ব্যাপারে আদেশ করেছেন।

তিনি উত্তরে বলেন—আপনার রব আপনাকে যেই ব্যাপারে আদেশ করেছেন, তা পালন করেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, সাহায্য করব।

তিনি বললেন—আল্লাহ তায়ালা আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে আদেশ করেছেন। এ বলে তিনি আশপাশে থাকা উঁচু উঁচু টিলার দিকে ইশারা করলেন। (অর্থাৎ সেখান থেকে পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করতে বলেন।) এরপর ইবনে আব্বাস বলেন—তখনই দুজন মিলে কাবাঘরের

---

৮৫ সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭

ভিত্তি নির্মাণ করেন। ইসমাইল আ. পাথর নিয়ে আসতেন, আর ইবরাহিম আ. তা নির্মাণের কাজে লাগাতেন..।'[৮৬]

জারকাশি রহ. আজরুকি রচিত *তারিখু মাক্কাহ* গ্রন্থ থেকে বর্ণনা এনেছেন—

ইবরাহিম আ. কাবার নির্মাণের সময় তার গঠনটা (দেওয়াল) এভাবে রাখেন—দৈর্ঘ্যে, ওপরের (আসমান) দিকে সাত গজ এবং নিচের দিকে অর্থাৎ জমিনের ওপর ত্রিশ গজ। আর প্রস্থে, নিচের দিকে (জমিনের ওপর) বাইশ গজ। তখন কাবা ছিল ছাদবিহীন।[৮৭]

সুহাইলির বর্ণনামতে—

কাবার ওপরের (আসমান) দিকে দৈর্ঘ্য ছিল নয় গজ।[৮৮]

এই বর্ণনাটি আজরুকির রেওয়ায়াতের খুব কাছাকাছি।

দ্বিতীয়বার : নবিজির নবুয়তের পূর্বে কুরাইশ কাফিররা নির্মাণ করেছে। স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। এই নির্মাণের সময় তারা ওপরের দিকে (আসমান) দৈর্ঘ্যে ১৮ হাত রাখে। আর নিচের দিকের (জমিনের ওপর) দৈর্ঘ্য হতে তারা আগের চেয়ে ছয় গজের কিছু বেশি কমিয়ে আনে।[৮৯]

তাদের এই হ্রাসকরণের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসেও বলেছেন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার ছুটে যাওয়া অংশকে এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলতেন—আয়িশা, তোমার সম্প্রদায় মাত্র জাহিলি যুগ পাড়ি দিয়ে এসেছে; যদি এমন না হতো (অর্থাৎ তারা যদি নওমুসলিম না হতো), তাহলে আমি কাবাঘর ভেঙে তা পুনর্নির্মাণের সময় তার ছুটে যাওয়া অংশ (যা কুরাইশদের নির্মাণের সময় ছুটে গিয়েছিল) কাবার অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম। এবং তাকে জমিনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতাম। এবং এতে পূর্ব দিকে একটি দরজা এবং

---

৮৬ *সহিহ বুখারি* : কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া

৮৭ *ই'লামুস সাজিদ*, জারকাশি : ৪৬

৮৮ *উয়ুনুল আসার*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২

৮৯ *সহিহ বুখারি* : কিতাবুল হাজ্জ; দেখুন, *ই'লামুস সাজিদ*, জারকাশি : ৪৬

পশ্চিম দিকে একটি দরজা রাখতাম। ফলে ইবরাহিম আ. নির্মিত কাবার আদলে ফিরে যেত।[৯০]

তৃতীয়বার : ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনকালে—যখন তার সৈন্যরা শাম থেকে যুদ্ধ করতে এসেছিল—কাবাঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৩৬ হিজরির শেষের দিকে ইয়াজিদের আদেশে তার বাহিনী হুসাইন ইবনে নামির আস-সাকুনির নেতৃত্বে মক্কায় ইবনে জুবাইরকে অবরোধ করে রাখে। তারা বাইতুল্লাহর সীমানায় 'মিনজানিক' (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ) ব্যবহার করলে তার আঘাতে কাবাঘরে আগুন লেগে যায় এবং তার অনেকটা ক্ষতি হয়।

ইবনে জুবাইর হজের মৌসুমে অপেক্ষা করছিলেন। হজের মৌসুমে মানুষ এলে তিনি তাদের সাথে পরামর্শে বসেন। তিনি বলেন—হে লোকসকল, তোমরা কাবার ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আমি চাচ্ছি, এটা ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করব অথবা আগেরটাই রেখে তার সংস্কার করব। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমি যেটা ভালো মনে করি, তা হলো আপনি একেই সংস্কার করেন। মানুষ কাবার যেই গঠন, ও পাথরের ওপর ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেটাই বহাল থাকুক। ইবনে জুবাইর বললেন—তোমাদের কারও ঘর পুড়ে গেলে ওইটাকে সে পোড়াবস্থায় দেখতে চায় না; বরং সে তা সংস্কারের চেষ্টা করে, তাহলে তোমাদের রবের ঘরের ব্যাপারে নির্লিপ্তভাবে বসে থাকছ? আমি আমার রবের নিকট তিনবার ইস্তেখারা[৯১] করেছি। এরপর আমি আমার সিদ্ধান্তে (নতুন করে নির্মাণ) উপনীত হয়েছি।

এর তিন দিন পর সত্যি সত্যিই ভাঙার কাজ শুরু হলো। তারা পুরোটা ভেঙে মাটি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। ইবনে জুবাইর তার চারপাশে কয়েকটি খুঁটি বসালেন। এবং এর ওপর পর্দা টেনে দিলেন। এরপর দেওয়াল উঁচু করার কাজে নামলেন। (কুরাইশদের নির্মাণের সময়) ছুটে যাওয়া সেই ছয় গজকেও এর অন্তর্ভুক্ত করলেন। ওপরের দিকের দৈর্ঘ্য দশ গজ বানালেন। কাবার দুটি দরজা রাখলেন, একটি দিয়ে ঢুকবে, আরেকটি দিয়ে বের হবে। তার এই সম্প্রসারণের পেছনে মূলত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদিসের বর্ণনাটি উৎসাহ জুগিয়েছিল।[৯২]

---

৯০ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম,* শব্দচয়ন বুখারির।

৯১ কোনো ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ভালো-মন্দ নির্ণয়ের বিশেষ সালাত।

৯২ বিস্তারিত দেখুন—*উয়ুনুল আসার,* ইবনে সায়্যিদিন্নাস, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৩; *ই'লামুস সাজিদ,* জারকাশি : ৪৬; *সহিহ মুসলিম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯; *তারিখুত তাবারি,* খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৯৮; তাবারি প্রমুখের বর্ণনায় আছে—কাবা শরিফকে তার পাশে জ্বালানো আগুনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থবার : ইবনে জুবাইরের হত্যার পর। ইমাম মুসলিম নিজস্ব সনদে আতা থেকে বর্ণনা করেন—

> ইবনে জুবাইরকে যখন হত্যা করা হলো, তখন হাজ্জাজ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট এ সংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখল এবং ইবনে জুবাইর (কুরাইশদের প্রাচীন গঠন থেকে সরে গিয়ে) যেই কাঠামোতে—যেটা মক্কার গ্রহণযোগ্য লোকদের কাছে স্বীকৃত—নির্মাণ করেছেন, সেটা জানাল। আবদুল মালিক তার উত্তরে লিখে পাঠাল—
>
> আমরা ইবনে জুবাইরকে কোনো কিছুতে কলুষিত করতে চাই না, এতে তার ব্যক্তিগত কোনো অভিলাষ ছিল না। সুতরাং তিনি দৈর্ঘ্যে যা বাড়িয়েছেন, তা ভেঙে প্রাচীন কাঠামোতে ফিরিয়ে নেবেন। এবং তার খুলে দেওয়া অতিরিক্ত দরজা বন্ধ করে দেবেন। এ আদেশের পর হাজ্জাজ তা ভেঙে দেন এবং মূল কাঠামোতে ফিরিয়ে দেন।[৯৩]

ইতিহাসবিদরা বলেন—খলিফা হারুনুর রশিদ তার শাসনকালে কাবাঘর ভেঙে ইবনে জুবাইরের আদলে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্প করেন। তখন মালিক ইবনে আনাস রা. তাকে বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর শপথ, আপনি এই ঘরটিকে আপনার পরবর্তী খলিফাদের জন্য খেলার বস্তু বানাবেন না। একজন এসে আরেকজনেরটা শুধু পরিবর্তন করতে থাকবে। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে কাবার যে তাজিম, ভয়ভীতি ও শ্রদ্ধা আছে, তা উঠে যাবে। এ কথা বলে ইমাম মালিক রহ. খলিফাকে তার মনোবাঞ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখেন।[৯৪]

মূলত কে নির্মাণ করেছিলেন কাবা

এ তো গেল কাবাঘর চারবার নির্মাণের ইতিবৃত্ত। এই চারবারের ইতিহাসটুকু নিশ্চিত বলা যায়। পঞ্চমবার নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে —

ইবরাহিম আ.-এর নির্মাণের পূর্বে কি কখনো কাবাকে নির্মাণ করা হয়েছে? কিছু রেওয়ায়াত ও আসারে আছে—সর্বপ্রথম যিনি কাবাঘর নির্মাণ করেন, তিনি আদম আ.। কোনো বর্ণনামতে, সর্বপ্রথম শিস আ. কাবাঘর নির্মাণ করেন।

---

৯৩ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯৯

৯৪ কাবাঘর ভেঙে কে পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা করেছিল, এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে। *শারহুন নাবাবি* ও *ফাতহুল বারি*তে আছে, খলিফা হারুনুর রশিদ। এদিকে *উয়ুনুল আসার* ও *ইলামুস সাজিদে* আছে, আবু জাফর আল মানসুর। ইমাম মালিক দুজনেরই সামসময়িক। সুতরাং উভয়ের সম্ভাবনাই বিদ্যমান।

এ ব্যাপারে যতগুলো বর্ণনা আছে, এগুলোর মাঝে সবচেয়ে স্পষ্ট রেওয়ায়াত ইমাম বাইহাকি যেটি *দালাইলুন নুবুওওয়াহ*-তে এনেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ.-কে আদম আ. ও হাওয়া আ. দুজনের নিকট পাঠিয়ে বললেন—তোমরা দুজন আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করো। জিবরাইল আ. তাদের ঘরের সীমানা এঁকে দিলেন। আদম আ. মাটি খুঁড়তেন, হাওয়া আ. তা ফেলে আসতেন। এভাবে একসময় পানি এসে গেল। পানির নিচ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, আদম, যথেষ্ট হয়েছে। তাদের নির্মাণকাজ শেষ হয়ে এলে আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে তাঁকে তাওয়াফ করার আদেশ দিলেন।
>
> তাঁকে বলা হলো—আপনি প্রথম মানুষ, আর এটা প্রথম ঘর। তার পর বহুকাল কেটে গেল। এরপর নুহ আ. হজ করলেন। এরপর বহুকাল কেটে গেল, ইবরাহিম আ. এসে এর ভীতসমূহ উঁচু করলেন।

এরপর বাইহাকি বলেন—ইবনে লাহিআ একাই 'মারফু' বর্ণনা করেছেন। আর এটা জানা কথা যে, ইবনে লাহিআ দুর্বল রাবি। তার বর্ণনা দলিল হয় না। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন আসার ও বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো বাইহাকির বর্ণনার প্রায় কাছাকাছি। তবে ওসব রেওয়ায়াতও 'দুর্বলতা' বা 'নাকারাত' থেকে মুক্ত নয়।

আমরা যদি এসব দুর্বল বর্ণনাগুলোকে মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে—পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মোট পাঁচবার কাবার নির্মাণকাজ করা হয়েছে।

তবে প্রথম আমরা যা বলেছি, অর্থাৎ চারবার—এটাই সুনিশ্চিত। বাকি সব আমরা আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করব। এ ছাড়া আরও যেসব বর্ণনার কথা পাওয়া যায়, সেগুলো মূলত কাবার মেরামত ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

তিন. নবিজির বিচক্ষণতা ও পরিচালনার যোগ্যতা

এখানে আমরা নবিজির কার্যপরিচালনার দক্ষতা, সংকট সমাধানের ব্যাপারে চমৎকার মূলনীতি, বিবাদ নিরসনের অপূর্ব দক্ষতার ব্যাপারে জানতে পারি। তিনি এমন জাতির বিশাল সংকট নিরসন করেছেন, যাদের সংকটটা রক্তারক্তির পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। বনু আবদুদ দার রক্তভর্তি পাত্র নিয়ে এলো। এরপর তারা এবং বনু আদি সবাই নিজেদের হাত সেই রক্তে চুবিয়ে মৃত্যুর শপথ নিল। এই অবস্থায় কুরাইশরা

চার বা পাঁচ রাত কাটায়। কারও কোনো কথা বা প্রচেষ্টা তাদের দমানোর মতো ছিল না। অবশেষে সেই ফিতনার ভয়ংকর আগুন এসে নিভে যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে; কিন্তু এটা তাঁকে মূল্যায়নের মূল মানদণ্ড নয়। আমাদের উচিত, নবিজিকে বিচক্ষণতার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করার আগে, আল্লাহ তাঁকে রিসালাতের যেই মহান দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই মান্দণ্ডে বিচার করা।

নবিজিকে মূল্যায়নের প্রথম ভিত্তি হলো, তিনি একজন নবি ও রাসুল। আর অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো—পরিচালনা দক্ষতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি—এগুলো প্রাসঙ্গিক। এগুলো মূলভিত্তির সাথে এসে যুক্ত হবে।

চার. নবিজির অবস্থান

কুরাইশদের বিভিন্ন স্তর থাকা সত্ত্বেও তাদের সকলের মাঝে তাঁর উচ্চ অবস্থান। তাদের মাঝে তিনি ' আল আমিন' নামে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। তিনি কথা বললে তার সত্যতায় কেউ সন্দেহ করত না। কারও সাথে লেনদেন করলে এ ব্যাপারে তাঁর উন্নত চরিত্র নিয়ে কারও সন্দেহ হতো না।

যখন তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া হতো, তাঁর ওপর কোনো ব্যাপারে ভরসা করা হতো, তখন সে বিষয়ে তাঁর উচ্চমার্গের ইখলাসে এবং নিঃস্বার্থ কাজে তাদের কারও সন্দেহ হতো না। মনে রাখতে হবে, তার মর্যাদাপূর্ণ এই অবস্থানটা ছিল সেইসব লোকেদের কাছেই, নবুয়ত লাভের পর যাদের অন্তর বিদ্বেষ ও শত্রুতায় হয়ে গিয়েছিল ভরপুর।

* * *

হেরা গুহায় নির্জনবাস

নবিজির নির্জনবাস

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চল্লিশে পা দিয়েছেন, বিভিন্ন সময় তখন তাঁর জনবিচ্ছিন্ন থাকা এবং নির্জন সময় কাটানোটা অভ্যাসে পরিণত হলো। হেরা গুহায় (মক্কার পূর্ব উত্তরে অবস্থিত) নির্জন সময় কাটাতে তিনি ভালোবাসতেন। টানা কয়েক রাত ও কয়েক দিন সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

নির্জনবাসের সময়

নবিজির নির্জনবাসের সেই সময়টা কখনো দশ দিনের হতো, আবার কখনো দশ দিনের বেশি; যা এক মাস পর্যন্ত গড়াত। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে আসতেন। বাড়ি এসে খুব অল্প সময়ই অবস্থান করতেন। এরপর আগামী কয়েক দিনের পাথেয় নিয়ে আবার হেরা গুহায় চলে যেতেন। হেরা গুহায় কাটানো তাঁর নির্জন মুহূর্তগুলোর কোনো এক মুহূর্তেই তাঁর নিকট ওহি (প্রত্যাদেশ) আসে।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

ধ্যান-নির্জনতা : মুহাসাবার অনন্য উপায়

নবিজির এই নির্জন প্রিয়তা অনেক ভাবনার ব্যাপার। সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহ, বিশেষত দায়িদের জীবনে এই নির্জনতার বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব রয়েছে। নবিজির নির্জনপ্রিয়তা থেকে আমরা বুঝতে পারি—ব্যক্তির যতই মর্যাদা থাকুক, ব্যক্তির ইবাদতের পরিধি যতই বিশাল হোক, পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়ার জন্য তার নির্জনতার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে সে 'মুহাসাবাতুন নাফস' (নিজের হিসাব) করবে। আল্লাহর ধ্যানে বসবে, সৃষ্টিজগৎ নিয়ে ভাববে, আল্লাহর মহিমা নিয়ে ভাববে। পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে এটা যেকোনো মুসলিমেরই প্রয়োজন। সুতরাং যারা দায়ি ইলাল্লাহ, যারা আল্লাহর পথে মানুষকে পথপ্রদর্শন করবে, তাদের কতটা প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

মানুষের মানসিক এমন কিছু ব্যাধি আছে, যা থেকে নিরাময়ের একমাত্র উপায় নির্জনতা; বাস্তব দুনিয়া থেকে কিছুটা দূরে সরে 'মুহাসাবাতুন নাফস'-এ প্রবৃত্ত থাকা। অহংকার, আত্মগরিমা, হিংসা, রিয়া, দুনিয়ার মহব্বত—সবগুলোই এমন ভয়ানক ব্যাধি, যা মানুষের হৃদয়মনের গহিনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অভ্যন্তরীণ এই ব্যাধিগুলো, বাহ্যিকভাবে ঈমানে-আমলে সুশোভিত হওয়া সত্ত্বেও, এমনকি দাওয়াতের মহৎ কাজে নিমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের ভেতরকে ঝাঁঝরা করে ফেলে। এই কঠিন ব্যাধিগুলো থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো, ব্যক্তি সময়ে সময়ে নির্জনতার আশ্রয় নিয়ে নিজের হিসাব নিজেই কষবে। তার হাকিকত (প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান), তার অস্তিত্বদানকারী সত্তা, যাপিত জীবনে আল্লাহর সাহায্য তাঁর কতটা প্রয়োজন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর তাওফিকের কতটা দরকার—এসব বিষয়ে সে ভাববে। এরপর মানুষকে নিয়ে সে ভাবতে বসবে—সৃষ্টিকর্তার সামনে মানুষ কতটা দুর্বল, মানুষের প্রশংসা বা নিন্দার স্বয়ংসম্পূর্ণ

কোনো ক্ষমতা না থাকা—এইসব ব্যাপারে সে ভাববে। আল্লাহর বড়োত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে ভাববে, আখিরাত, বিচার দিবস, আল্লাহর বিশাল রহমত ও কঠিন শাস্তির কথা ভাববে। এভাবে যখন সে ভাবনায় নিমগ্ন থাকবে, তখন ওইসব ব্যাধি থেকে তার হৃদয়-মন আপনিই সেরে উঠবে। অন্তর মারিফাতের আলো, ঈমানের স্বচ্ছ নুরে আলোকিত হবে। অন্তর নতুন যবনিকা পাবে।

সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর জীবনে বিশেষভাবে দায়িদের জীবনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হৃদয়ে; যে হৃদয় মুজাহাদা (অবিশ্রান্ত পরিশ্রম) ও উৎসর্গের উৎস আল্লাহপ্রেমের পরিচর্যা করা । স্রেফ যুক্তিসংগত ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেমে হৃদয় সিঞ্চিত হয় না। স্রেফ যুক্তি বিবেচনার বিষয়গুলো কোনো দিনও অন্তরে রেখাপাত করে না। যদি এমনই হতো, তাহলে মুসতাশরিকরা (প্রাচ্যবিদ) সবচেয়ে' বড়ো ঈমানদার ও মুমিন হতো। তাদের অন্তর আল্লাহ রাসুলকে সবচেয়ে' বেশি ভালোবাসত।[৯৫]

অথবা আমরা কখনো এমন কিছু একটা শুনতাম, কোনো গণিতবিদ গণিতের কোনো সূত্রে বিশ্বাস রাখার কারণে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। কখনো এমন হয়েছে? আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর হৃদয়ে তাঁর প্রেম-পরিচর্যার সবচেয়ে বড়ো উপায় হলো—আল্লাহর নিয়ামত ও সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা করা, তাঁর বড়োত্ব ও মহত্ত্ব নিয়ে ভাবা। মুখে ও অন্তরে আল্লাহর বেশি বেশি জিকির করা। আর এই সবগুলো তখনই সম্ভব হবে, যখন সে নির্জনতার আশ্রয় নেবে। সময়ে সময়ে কর্মব্যস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরালায় কাটাবে।

একজন মুসলিম নির্জনে বসে যখন আল্লাহপ্রেমের এই কাজগুলো করবে, এগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করবে, তখন তার অন্তরে প্রভুপ্রেমের স্রোত বয়ে চলবে। যার সামনে অন্য সব বড়োত্বকে নিতান্ত ছোটো মনে হবে। প্রত্যেক চিত্তাকর্ষক বস্তুকে তুচ্ছ মনে হবে। সেই প্রেমের জন্য নিদারুণ কষ্ট ও কঠিন শাস্তিকে তার কাছে নিতান্ত হালকা মনে হবে। সেই প্রেমের জন্য ঠাট্টা-তামাশা, লাঞ্ছনাকে সে পাত্তা দেবে না। আর এই প্রেম এই ভালোবাসা এমন এক সাজ, প্রত্যেক দায়িকেই যেই সাজে সজ্জিত হওয়া উচিত। এটাই সেই সাজ, যা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৯৫ অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তাদের প্রচুর পড়াশোনা, ঈমান সম্পর্কে তাদের বিপুল জানা সত্ত্বেও তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবিষ্ট হয় না, আল্লাহ রাসুলের প্রতি ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও তাদের ভেতরে থাকে না।

ওয়া সাল্লামকে সজ্জিত করা হয়েছিল। যার ফলে তিনি ইসলামের দাওয়াতের নিদারুণ কষ্ট সহজে সইতে পেরেছিলেন।

ভয়, আশা, ভালোবাসা—এ ধরনের মানবিক আবেগ-অনুভূতিগুলো খুবই শক্তিশালী। এগুলোর মাধ্যমে অনেকসময় এমন কাজ হয়, যা স্রেফ চিন্তা ও বোধের মাধ্যমে হয় না। ইমাম শাতেবি সাধারণ মুসলিম ও বিশেষ মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতির পার্থক্য করে চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন—

> প্রথম প্রকারের অবস্থা হলো, যারা স্রেফ ইসলাম ও ঈমানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমল করে। দ্বিতীয় প্রকারের অবস্থা হলো যারা ভয়, আশা, ভালোবাসা—এগুলোর তাড়নায় আমল করে। ভয় হলো চালনাকারী এক চাবুক। আশা কঠিন এক চালিকাশক্তি। ভালোবাসা বিশাল একটি স্রোত। ভয়কারী ব্যক্তি কষ্ট সত্ত্বেও আমল করে।
>
> ভয় (যা বেশি কষ্টকর) জিনিসটা ধৈর্য (যা কম কষ্টকর) ধারণে সহায়তা করে। আশাবাদীও কষ্ট সত্ত্বে আমল করে। আশা (যার পুরোটাই সুখের) ধৈর্য (যার পুরোটাই কষ্টের) ধারণে সাহায্য করে। আর প্রেমিক প্রিয় জিনিসের তরে তার সর্বোচ্চটুকু বিসর্জন দিতে কসুর করে না। তার প্রিয় বস্তুটির জন্য কঠিন বিষয়কেও সে সহজ মনে করে। দূরবর্তী বিষয়কেও সে নিকটবর্তী মনে করে। নিজেনর সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েও সে ভাবে—ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারছে না। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারছে না।[৯৬]

মানসিক এসব শক্তি অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেন। জুমহুর আলিম ও গবেষকদের নিকট এটা 'তাসাওউফ' (আত্মশুদ্ধি) নামে পরিচিত। কেউ কেউ এটাকে বলেন, 'ইহসান'। আবার ইবনে তাইমিয়ার মতো অনেকে এটাকে 'ইলমুস সুলুক' বলে থাকেন।[৯৭]

---

৯৬ *আল মুওয়াফাকাত*, ইমাম শাতিবি, খণ্ড :২, পৃষ্ঠা : ১৪১; আরও দেখুন—*যাওয়াবিতুল মাসলাহা ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, সায়িদ রামাদান বুতি : ১১১-১২২

৯৭ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ*, খণ্ড ১০; ইবনে তাইমিয়ার নিকট তাসাউফের বাস্তবিক মর্যাদা কেমন ছিল, তা পাবেন এখানে। আপনি আরও জানতে পারবেন তাসাউফবিরোধীরা নিজেদের স্বার্থে তাসাউফের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার নামে কী পরিমাণ মিথ্যা রটিয়েছে!

নবুয়ত লাভের কিছুকাল পূর্বে নবিজি যেই নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন, এটি সেসব মাধ্যমেরই একটি। তবে এই নির্জনতা দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ নির্জনতা—কেউ কেউ যেমনটা বুঝেছেন—উদ্দেশ্য নয়। লোকজন থেকে একদম কেটে পড়া, পাহাড়-পর্বত-গুহাকে নিজের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্যে নয়; বরং এটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আদর্শের বিপরীত। উদ্দেশ্য, নিজেকে শুদ্ধ করার মানসে আমরা ইতঃপূর্বে যে পন্থা উল্লেখ করেছি, সে পন্থায় নির্জনতা অবলম্বন করা। নির্জনতা—এটা একধরনের ওষুধ। ওষুধ পরিমিত হওয়া চাই। ওষুধ হতে হবে প্রয়োজনমতো এবং পরিমাপমতো। বিপরীত হলেই বিপজ্জনক। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে—সালাফদের কারও কারও নির্জনতা অবলম্বন ছিল সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ; এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যদের জন্য এটা দলিল হতে পারে না।

* * *

ওহির সূচনা

আম্মাজান আয়িশার বর্ণনা

ইমাম বুখারি রহ. ওহির সূচনাকালীন অবস্থা সম্পর্কে আয়িশা রা. থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেন—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন, তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি হেরা গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।
>
> তারপর খাদিজা রা.-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহি এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন—পড়ুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি বলেন—তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম—আমি তো পড়তে পারি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে

বললেন—পড়ুন। আমি জবাব দিলাম—আমি তো পড়তে পারি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন—

'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন আর আপনার রব মহামহিমান্বিত।'[৯৮]

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের কাছে এসে বললেন—'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'

তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদিজা রা.-এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাকে বললেন—আমি নিজের ওপর আশঙ্কা বোধ করছি।

খাদিজা রা. বললেন—

> আল্লাহর কসম! কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

এরপর তাঁকে নিয়ে খাদিজা রা. তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল আসাদ ইবনে আবদুল উজ্জার কাছে গেলেন; যিনি জাহিলি যুগে ঈসায়ি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানি ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফিক অনুযায়ী ইবরানি ভাষায় ইনজিল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। বয়েসের ভারে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা রা. তাকে বললেন—হে চাচাতো ভাই, আপনার ভাতিজার কথা শোনুন।

ওয়ারাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ভাতিজা, তুমি কী দেখো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন।

---

৯৮ সূরা আলাক, আয়াত : ১-৩

তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন—

> ইনি সে দূত, যাকে আল্লাহ মুসা আলাইহিস সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—তারা কি আমাকে বের করে দেবে?

তিনি বললেন—

> হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।

এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন। আর ওহি স্থগিত থাকে।

'ফাতরাতুল ওহি' বা ওহি বন্ধের সময় নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে [৯৯]। কেউ বলেন, তিন বছর। আবার কেউ বলেন, এর চেয়েও কম। তবে এ ব্যাপারে বাইহাকি যা বর্ণনা করেছেন (ছয় মাস) সেটা প্রণিধানযোগ্য।[১০০]

ইমাম বুখারি রহ. বিখ্যাত সাহাবি জাবির রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—যেখানে তিনি ফাতরাতুল ওহি সম্পর্কে বলেছেন—

> আমি চলছিলাম, আকাশ থেকে হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি তাকালাম। হঠাৎ সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যিনি আমার নিকট হেরা পর্বতের গুহায় এসেছিলেন। তিনি আকাশ ও জমিনজুড়ে ব্যাপ্ত থাকা একটি চেয়ারে বসে আছেন। তাই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর আমি (বাড়ি) ফিরলাম। এবং (পরিবারের লোকজনকে) বললাম—আমাকে কাপড়ে আবৃত করো, আমাকে কাপড়ে আবৃত করো।[১০০]

এরপর আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন—

---

৯৯ বিস্তারিত দেখুন, *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১

১০০ *সহিহ বুখারি*

يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

হে চাদরাবৃত,

قُم فَأَنذِر.

ওঠুন, সতর্ক করেন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّر.

আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّر.

নিজের পোশাক পবিত্র করেন।

وَالرُّجزَ فَاهجُر.

এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।[১০১]

এরপর থেকে ধারাবাহিক ওহির ধারা চলতে লাগল।

* * *

১০১ সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১-৫

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

সকল ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্যই যখন ওহি

বাদউল ওহি বা ওহির সূচনাকালীন অবস্থার হাদিসটি মূলনীতিভিত্তিক একটি হাদিস। এর ওপর আকায়িদসহ দ্বীনের অনেক বিষয়ের নির্ভর করছে। এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নবিজির আনীত যাবতীয় বিষয়—গায়েবি বিষয়, তাশরিয়ি বিষয়াবলি—এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের মূলভিত্তি।

ওহির বাস্তবতা হলো—যে ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে,[১০২] এবং যে ব্যক্তি স্রেফ তার রবের পন্থাকেই গ্রহণ করে—যেখানে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা, বাড়ানো কমানো অর্থাৎ নিজ হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার থাকে না[১০৩]—ওহি এমন দুজন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যবিধান করে।

এ কারণেই ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা ওহির মূল গঠনকে নিয়েই প্রথমে তাদের সকল অপারেশান শুরু করে। এর ওপরই তাদের চিন্তাগত আগ্রাসন চালায়। সর্বতোভাবে তারা ওহির মৌলিকতায় সংশয় সৃষ্টি করে। ওহি, ইলহাম (অন্তরে প্রেরিত অনুপ্রেরণা), হাদিসুন নাফস (মনোগত ভাবনা) ইত্যাদিকে জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলে। কেননা, এভাবে করে ওহির মূল গঠনের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে পারলে তাদের সব উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হতে শুরু করবে। কারণ, ওহি মুসলিমদের যাবতীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের উৎস। এখন যদি এর মৌলিকত্বে সন্দেহের বীজ বপন করা যায়, তাহলে আকায়িদ ও আহকামের বাকি শাখাগুলোতে অস্বীকার করানোর ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে। মানুষের মাঝে এই চিন্তার অনুপ্রবেশ

---

১০২ অর্থাৎ, একজন সাধারণ মানুষ।

১০৩ অর্থাৎ, বিশেষভাবে নির্বাচিত নবি-রাসুল।

ঘটানো যাবে, যে, মুহাম্মাদের যেই শরিয়ত ও আদর্শ—এর সবই তার ব্যক্তিগত চিন্তা।

এই ভয়ংকর উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আগ্রাসী চিন্তাবিদরা ওহির যে ধারাবাহিক ইতিহাস ব্যক্তি-পরম্পরায় চলে এসেছে, এবং আসহাবুস সিত্তাহ যেভাবে বর্ণনা করে এসেছেন, তা থেকে অনেক দূরে সরে প্রত্যেকে যার যার মতো করে নিজ উদ্দেশ্যে ওহিকে ব্যাখ্যা করে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলে—

> মুহাম্মাদ[১০৪] (কাশফের পদ্ধতিতে) চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। একপর্যায়ে তাঁর হৃদয়ে কোনো একটা বিষয় বদ্ধমূল হতো, আর এটাকে প্রতিমাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাস হিসেবে দাঁড় করাতেন।

আবার কারও কারও কথা—

> মুহাম্মাদ[১০৫] কুরআনসহ ইসলামের মৌলিক আদর্শ-বিশ্বাস বুহাইরা রাহিব থেকে শিখেছেন। কেউ কেউ আবার বলে উঠছেন—না, বিষয়টা এ রকম-ওরকম কোনোটাই নয়; কিন্তু মুহাম্মাদের স্নায়ুতে সমস্যা ছিল, তিনি ছিলেন মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।'[১০৬]

তাদের ভিত্তিহীন এসব আগ্রাসী কথা স্পষ্টতই তাদের নবুয়তের অস্বীকারের ব্যাপারটা তুলে ধরেছে। আমরা যখন ইমাম বুখারি রহ. বর্ণিত হাদিস থেকে 'বাদয়ু নুজুলিল ওহি' (ওহি নাজিলের সূচনা) ব্যাপারটা বুঝতে যাব, তখন ওহির প্রকৃত বাস্তবতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে। এবং ওহির পদ্ধতিগত ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতের ব্যাপারগুলোও স্পষ্ট হবে আমাদের সামনে।

কিছু গুরুতর প্রশ্ন

প্রথমবারই কেন নবিজি জিবরাইলকে চর্মচক্ষে দেখলেন? প্রথমবার ওহি তো পর্দার পেছন থেকেও অর্থাৎ জিবরাইলকে সরাসরি না দেখে নাজিল হতে পারত?

আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে কেন ভয়ের সঞ্চার করলেন? তিনি কেন সেই ওহির হাকিকত (প্রকৃত বাস্তবতা) বুঝতে পেরেশান হলেন? অথচ আল্লাহ তাঁর রাসুলকে যে বিশেষ মহব্বত করেন এবং তাঁকে হিফাজত করেন, এর দাবি তো ছিল—তাঁর

---

১০৪ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

১০৫ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১০৬ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*হাজিরুল আলামিল ইসলামি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯

মনে স্থিরতা ও প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দেওয়া, তাই না? তাঁর কেন মনে হলো, হেরা গুহায় আসা ফেরেশতা জিন এবং যার কারণে তিনি নিজের ব্যাপারে শঙ্কিতও ছিলেন? তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা—এ কথা তাঁর কেন মনে হয়নি? ওহি আসার পর দীর্ঘকাল কেন তা বন্ধ রইল? আর এ কারণে তিনি ছিলেন অস্থির ও বিশাল চিন্তিত এবং যে কারণে তাঁর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হতো—ইমাম বুখারি যেমনটা বর্ণনা করেছেন—পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিতে?

ওহির সূচনার ব্যাপারে এগুলো স্বভাবজাত প্রশ্ন। এগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাব—এগুলোর প্রত্যেকটাতেই প্রচুর হিকমত রয়েছে; যার মাধ্যমে একজন সত্য-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কাছে ওহির বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আগ্রাসী চিন্তাবিদদের চিন্তার কবল থেকে সে মুক্তি পাবে।

প্রশ্নের উত্তর

নির্জন হেরা গুহায় নবিজি হঠাৎ তাঁর সামনে জিবরাইলকে দেখতে পেলেন এবং জিবরাইল তাঁকে বলছেন, 'পড়ো'—এ আকস্মিক ঘটনায় তিনি ভড়কে গেলেন। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, ওহি ব্যাপারটা ব্যক্তিগত কোনো কিছু—যেটাকে হাদিসুন নাফস বলা যাবে, এমনটা নয়। এটা ভিন্ন বিষয়, ব্যক্তিগত বিষয়ের সাথে যার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। (কারণ, ব্যক্তিগত বিষয়ে মানুষ ভয় পায় না।)

ফেরেশতা কর্তৃক তাঁকে তিনবার চাপ দেওয়া এবং প্রত্যেকবার পড়তে বলা—এটাও ব্যক্তিগত বিষয় না হওয়াকে আরও জোরদার করে। (কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের মতো বিষয়ের জন্য বলপ্রয়োগ করতে হয় না, ব্যক্তি নিজেই তা করে থাকে।)

তিনি ফেরেশতাকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে এতটাই ভয় পেয়েছেন যে, তিনি নির্জনতা বাদ দিয়ে দুরুদুরু বুকে দ্রুত ঘরে ফিরেছেন। এখান থেকে প্রত্যেক বিদগ্ধ চিন্তাবিদের কাছে এটা স্পষ্ট হবে যে—তাঁকে যেই রিসালাতের গুরুভার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং যেই জন্য তাঁর প্রেরণ, তিনি তাঁর প্রতি পূর্বাগ্রহী ছিলেন না, তাঁর সাজানো কোনো চিত্রপট অনুসারে সেই ওহি আসেনি। এটা একদমই হঠাৎ তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার। যেজন্য তাঁর কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। আর যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে কোনো চিন্তা ও বিশ্বাস লালন করে আসছে, সে হঠাৎ (কাশফের পদ্ধতিতে) নতুন কোনো বিশ্বাস ও চিন্তা লাভ করে তার দাওয়াত দিতে যাবে—এটা হতে পারে না!...

ইলহাম, হাদিসুন নাফস, আল ইসতিশরাকুন নাফসি, (আলোকিত রুহ) ঊর্ধ্বজাগতিক চিন্তাভাবনা—এর কোনোটার জন্যই ভয়ভীতি-শঙ্কা ও চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়। কোনো একটা ছক আঁকা চিন্তায় ডুবে থাকা এবং হঠাৎ ভয় পাওয়া ও শঙ্কিত হয়ে ওঠার মাঝে কোনো মিল নেই। অন্যথায় যেসব চিন্তাবিদ কোনো বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, নানান ভয় ও শঙ্কায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল।

আমরা জানি, ভয়ভীতি-শঙ্কা শরীর কেঁপে ওঠা, চেহারার রং পরিবর্তন হওয়া—এগুলো মানুষের আবেগীয় বিষয়; যেগুলোতে কৃত্রিমতার সুযোগ নেই। আমরা যদি মেনেও নিই, নবিজির ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে, তবুও এটা অসম্ভব যে, তার নবুয়তের পূর্বের সত্যের স্বভাব মুহূর্তে সম্পূর্ণ পালটে যাবে।

নবিজি এই ব্যাপারটাকে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, হেরা গুহায় যে এসে তাঁকে চাপ দিয়েছে, কথা বলেছে সে জিন। এটা তাঁর কথায়ই ফুটে উঠেছে। ভয় পাওয়ার পর তিনি খাদিজা রা.-এর কাছে সেই সংবাদ দিয়ে বলছিলেন—'আমি আমার নিজের ওপর (জিনের) ভয় করছি।' কিন্তু খাদিজা রা.-এর ভেতর এই শঙ্কা কাজ করেনি। তার ভাবনা ছিল—যার মাঝে এত সিফাতে হামিদা (প্রশংসনীয় গুণাবলি) রয়েছে, যিনি 'মাকারিমুল আখলাখ'(উন্নত চরিত্রমাধুরী)-এর অধিকারী, এমন ব্যক্তিকে জিন ক্ষতি করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাঁর মন প্রশান্ত করে দিতে পারতেন। ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর কাছে এই জিনিসটাকে স্পষ্ট করতে পারতেন যে, তাঁর সাথে যে কথা বলেছে, সে একজন ফেরেশতা—জিবরাইল, তিনি তাঁর নিকট তাঁর রাসুল হওয়ার সংবাদ দিতে এসেছেন; কিন্তু হিকমতে ইলাহির দাবি ছিল, তিনি তাঁর নবুয়তের আগের ও পরের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পৃথক করে তুলবেন। এটা যেন স্পষ্ট হয়, ইসলামের কোনো আকিদা-বিশ্বাস বা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিষয় পূর্ব থেকে তাঁর কাছে ছিল না।

খাদিজা রা. যে গুরুত্ব সহকারে তাঁকে ওরাকা ইবনে নওফালের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার নিকট ব্যাপারটা তুলে ধরেছিলেন, তাও আরেকটা বিষয় স্পষ্ট হওয়ার জন্য। তা হলো, তিনি হঠাৎ পেয়ে বসা যে জিনিসের কারণে ভড়কে গেছেন—এটা ওহি; যা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের ওপর নাজিল করেছিলেন এবং ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি যেই ঘোরে ছিলেন, তা যেন কেটে যায়।

আর ওহি আসার পর তা আবার ছয় মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় স্থগিত থাকে; এটাও একটা বিশেষ মুজিজার মান রাখে। কারণ, এটা আগ্রাসী চিন্তাবিদরা নবিজির কাছে আসা ওহিকে 'ইসতিশরাকুন নাফসি'; যা দীর্ঘ সাধনা ও চিন্তার মাধ্যমে অর্জন হয়েছে এবং যা তাঁর ব্যক্তিসত্তা থেকেই সৃষ্ট বলে আওড়ান, সেটার বিরুদ্ধে যায়।

হিকমতে ইলাহির দাবি ছিল—হেরা গুহায় তিনি প্রথমবারের মতো যেই ফেরেশতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেই ফেরেশতা দীর্ঘকাল তাঁর অগোচরে থাকবেন। এ কারণে তাঁর অস্থিরতা বেড়ে যায়, এরপর সেই অস্থিরতাটা ভয়ে রূপান্তরিত হয় যে, তাঁর কোনো অসতর্কতার কারণে তাঁকে ওহি এবং রিসালাতের আলোয় আলোকিত করা সত্ত্বেও তা থেকে আল্লাহ তায়ালা দূরে রাখছেন। ফলে সুবিশাল প্রশস্ত দুনিয়াটাও তাঁর কাছে সংকীর্ণ মনে হয়। নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও ইচ্ছা জাগে। পাহাড় থেকে ফেলে নিজেকে শেষ করে দেবেন এজন্য তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছেন!...

হঠাৎ একদিন দেখেন সেই ফেরেশতা, যাকে তিনি হেরা গুহায় দেখেছিলেন, তিনি বলছেন—

হে মুহম্মাদ, আপনি মানুষের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসুল!

তিনি আবার ভয় পেয়ে শঙ্কিত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। আয়াত নাজিল হলো—

يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

হে চাদরাবৃত,

قُمْ فَأَنذِرْ.

ওঠেন, সতর্ক করেন।[১০৭]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে এতগুলো কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, সেই অবস্থা বিবেচনা করেও তাঁর কাছে প্রেরিত ওহিকে ব্যক্তিগত বিষয় বলা—একধরনের পাগলামি। যেহেতু এটা স্পষ্ট, ইলহামের অধিকারী ব্যক্তি, নিজের চিন্তায় ডুবে থাকা ব্যক্তিকে এ রকম কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় না।

*সহিহ বুখারি*তে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত বাদউল ওহি (ওহির সূচনাকালীন অবস্থা) সম্পর্কে যেই হাদিস রয়েছে, এটা ওহি ও নবুয়তকে কলুষিত করার ঘৃণ্য

---

১০৭ সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১-২

চেষ্টায় লিপ্ত বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা যেই অবস্থা ও যেই আবহে এবং যেভাবে ওহির সূচনা করেছেন, সেটা হিকমতে ইলাহির (আল্লাহর প্রজ্ঞা) শামিল।

আবার প্রশ্ন

এবার সন্দেহবাদীরা প্রশ্ন তুলবে—যখন তাঁর নিকট ওহির ধারা চালু হলো, তখন তাঁর পাশে তো আরও অনেক সাথি থাকতেন। তারা কেউ দেখতেন না; ফেরেশতাকে শুধু তিনিই দেখতেন?

এরও আছে উত্তর

একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকার জন্য তা চোখে দেখা শর্ত না। কারণ, আমাদের চোখের কাজ সীমিত। অন্যথায় বলতে হবে, যেসব জিনিস চোখে দেখা যায় না, সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা, যিনি স্বয়ং এসব চোখ সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন চান, যতটুকু চান এসব চোখে শক্তি বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং তিনি যার চোখে শক্তি বাড়িয়ে দেবেন, সে তা দেখবে—যা অন্যরা দেখতে পায় না। (নবিজির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এমনই ছিল; আল্লাহ তার চোখকে বিশেষায়িত করেছিলেন।)

এরপর যে ওহির অবারিত ধারা শুরু হয়, এতেই ওহির বাস্তবতা পরিস্ফুট হয়। এবং এটা স্পষ্ট হয় যে, সন্দেহবাদীরা ওহিকে যেভাবে বিকৃত করে থাকে, বিষয়টা মূলত সে রকম না। নিচের কয়েকটি পয়েন্টে আমরা এ সম্পর্কীয় অতিরিক্ত আরও সামান্য কিছু আলোচনা করব—

♦ ০১.

কুরআন ও হাদিসের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য হলো, প্রথমটাকে দ্রুত সংরক্ষণের নির্দেশ দিতেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টাকে সাহাবায়ে কিরামের স্মৃতিশক্তির ওপরই ছেড়ে দিতেন। এটা এই জন্য নয় যে, হাদিস তাঁর নিজের পক্ষ থেকে; নবুয়তের সাথে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এর মূল কারণ হলো—কুরআন তার নিকট জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে হুবহু লফজ ও হরফসহ (শব্দ ও অর্থসহ) নাজিল হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদিসের ভাবার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি, কিন্তু শব্দ ও শব্দের শৈলী তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তাই তিনি ভয় করতেন—দুটো একসাথে মিশে যাবে। এই দুটির জন্য ভিন্ন দুই রকমের বিধান।

♦ ০২.

নবিজিকে কখনো কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো, কিন্তু তিনি তার উত্তর দিতেন না। কখনো কখনো নিরুত্তর অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে যেত। একসময় এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাজিল হতো। প্রশ্নকারীর উত্তরে তিনি নাজিলকৃত আয়াত শুনিয়ে দিতেন। আবার কখনো কখনো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে নবিজির 'ত্রুটি' হয়ে গেলে সে ব্যাপারে আয়াত নাজিল হতো; যেগুলো অনেক সময় তিরস্কারসংবলিত হতো।

♦ ০৩.

নবিজি ছিলেন উম্মি। আর একজন উম্মির পক্ষে সম্ভব নয় সে 'মুকাশাফাতুন নাফসিয়্যাহ (মনোগত উন্মোচন বা আধ্যাত্মিক একধরনের অনুপ্রেরণা)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহাসিক বাস্তবতা যেমন : ইউসুফ আ.-এর কাহিনি, মুসা আ.-এর মা যে তাঁকে সাগরে ফেলে দিয়েছিলেন সে কাহিনি, ফেরাউনের কাহিনি ইত্যাদি জেনে যাবে; বরং এই সবগুলো তিনি উম্মি অবস্থায়ই জেনেছিলেন—

وَما كُنتَ تَتلوا مِن قَبلِهِ مِن كِتٰبٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ ۖ إِذًا لَارتابَ المُبطِلونَ

আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণহস্ত দ্বারা কোনো কিতাব লেখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।[১০৮]

♦ ০৪.

চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝে নবিজির সততার যে খ্যাতি ছিল, এটা দাবি করে—ইতঃপূর্বে নিজের ব্যাপারে তিনি সত্যবাদী ছিলেন। ইতঃপূর্বে সত্যবাদী হয়ে থাকলে পরে তো আরও উত্তমরূপে সত্যবাদী হবেন। কারণ, প্রথম ব্যাপারটা ছিল একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। আর দ্বিতীয়টা অর্থাৎ নবুয়তের পরের ব্যাপারটা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যের ব্যাপারটা আরও প্রবল। তাই তিনি ওহির ব্যাপারে ভিন্ন কিছু করবেন না। কাউকে সন্দেহে

---

১০৮ সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৮

নিপতিত করবেন না। এখান থেকে বোঝা যায়, নিচের আয়াতটি, প্রথমবার নিজের ওহির ব্যাপারে নবিজির যেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার রদে (প্রত্যাখ্যান) নাজিল হয়েছে—

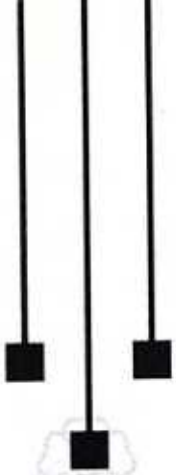
فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِمّا أَنزَلنا إِلَيكَ فَسـَٔلِ الَّذينَ يَقرَءونَ الكِتـٰبَ مِن قَبلِكَ ۚ لَقَد جاءَكَ الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكونَنَّ مِنَ المُمتَرينَ ▫

সুতরাং আপনি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোনো সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাকেন—যা আপনার প্রতি আমি নাজিল করেছি, তবে তাদের জিজ্ঞেস করেন, যারা আপনার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট থেকে আপনার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই আপনি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হবেন না।[১০৯]

(পরবর্তী অভিজ্ঞতার রদে নয়। কারণ, পরবর্তী অভিজ্ঞতা ছিল প্রথম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।) তাই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবিজি বলেন—(ওহির ব্যাপারে) আমি সন্দেহও করি না, প্রশ্নও তুলি না।

* * *

১০৯ সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯৪



তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে নবুয়তপ্রাপ্তির আলোচনা থেকে শুরু করে মদিনায় নবিজির হিজরত পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। মোটাদাগে এগুলো জানতে চাইলে এভাবে বলতে হবে, এই অধ্যায়ে নবি-জীবনের এই অংশগুলো স্থান পেয়েছে—

- নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর, গোপন দাওয়াত, গোপনীয়তার কারণ, ইসলাম নিয়ে কাফিরদের মাথাব্যথার কারণ কেন, সেই প্রশ্নের উত্তর; প্রকাশ্য দাওয়াত, তায়েফ যাত্রা, সাফা পাহাড়ে নবিজির দাওয়াত নিয়ে গমন।
- প্রকাশ্যে দাওয়াতের কারণে কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়া, এখান থেকে আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ, কুরাইশদের আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা, এগুলোর পেছনে আল্লাহ তায়ালার হিকমতসমূহ, নবিজির পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কটকরণসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা।
- ইসলামে প্রথম হিজরত, হাবশায় কি প্রথম হিজরত হয়েছিল নকি অন্য কোথাও—সেই আলোচনা। ইসলামের সাথে ঈসায়ি ধর্মের নৈকট্য, মক্কায় প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ।
- শোকের বছর, তায়েফ যাত্রা, তায়েফে দাওয়াত প্রদান ও আদ্দাসের ইসলাম গ্রহণ, ইসরা ও মিরাজ, প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা, বাইয়াতে আকাবায়ে উলা, বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়ার সংক্ষিপ্ত শিক্ষা ও ইতিহাসসংক্রান্ত আলোচনা।
- সবশেষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবিজিকে মদিনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান ও মদিনার পথপানে নবিজি...

নবি-জীবনে ইসলামি দাওয়াতের নানা স্তর

দাওয়াতের চার স্তর

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভ করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার দাওয়াতের চারটি স্তর গিয়েছে—

- ✓ **এক.** গোপন দাওয়াত; এটা চলছিল তিন বছর পর্যন্ত।
- ✓ **দুই.** প্রকাশ্যে মৌখিক দাওয়াত; এর সময়সীমা হিজরত পর্যন্ত।
- ✓ **তিন.** প্রকাশ্য দাওয়াত; তবে এটা শুধু মৌখিকে সীমাবদ্ধ নয়, কাজেও। তখন বিধান ছিল, নিজ থেকে যারা যুদ্ধ শুরু করবে বা অন্য কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তাদের সাথে যুদ্ধ। এটা চলে হুদাইবিয়া পর্যন্ত।
- ✓ **চার.** দুর্দান্ত গতিতে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত; মুশরিক, ধর্মান্তরিত নাস্তিক অবিশ্বাসী, মূর্তিপূজারি যেই আল্লাহর রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা হবে।

শেষের স্তরটা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরেই ইসলামি শরিয়তের বিষয়গুলো স্থিতিশীল হয়, ইসলামের চূড়ান্ত জিহাদের হুকুম আসে।

প্রথম প্রকার : গোপন দাওয়াত

সীমিত পরিসরে দাওয়াত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত মিশন শুরু করেন। মানুষকে প্রতিমাপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত দেন; কিন্তু তাঁর এই দাওয়াত ছিল চুপিচুপি। শিরক ও প্রতিমাপূজায় ডুবন্ত কুরাইশদের নিকট যেন হঠাৎ এসে পড়া কোনো ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়—এজন্য তাঁর এই গোপন দাওয়াতের পদ্ধতি। নবিজি তাই কুরাইশদের সাধারণ মাজলিসে ও প্রকাশ্যে কাউকে দাওয়াত দিতেন না। দাওয়াতের পরিধি ছিল খুবই সীমিত; পূর্বপরিচিতজন বা আত্মীয়—এই পর্যন্ত। তাদের মাঝে যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা হলেন—

> খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, আলি ইবনে আবু তালিব, জায়িদ ইবনে হারিসা, আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা, উসমান ইবনে আফফান, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ আরও অনেকে।

তারা সবাই গোপনে নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের কেউ যখন কোনো ইবাদত করতে চাইতেন, সেজন্য তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে মক্কার বিভিন্ন গিরিপথে গিয়ে লুকিয় লুকিয়ে ইবাদত করতে হতো।

এরপর ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পুরুষ-নারী মিলে বৃদ্ধি পেয়ে যখন ত্রিশে পৌঁছে, তখন নবিজি তাদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য তাদেরই একজনের একটি ঘর

নির্বাচন করেন; নবিজির নির্বাচিত ঘরের মালিক ছিলেন সেই গুটিকয়েক মুসলিমেরই আরেক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি—আরকাম ইবনে আবুল আরকাম। আরকামের ঘরে এসে নবিজি তাদের ইসলামের বিভিন্ন বিধান শেখাতেন, তাদের নসিহত করতেন। দাওয়াতের এই স্তরের শেষ ফলাফল ছিল চল্লিশজনের মতো পুরুষ-নারীর ইসলাম গ্রহণ। যাদের অধিকাংশই গরিব, গোলাম এবং এমন কিছু লোক, কুরাইশদের মাঝে যাদের কোনো মূল্য নেই।[১১০]

* * *

১১০ বিশদভাবে জানতে দেখুন, *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৯-২৬১

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির প্রথম স্তরের গোপন দাওয়াত থেকে আমরা প্রধানত দুটি বিষয় জানব, যা এর প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা বুঝতে আমাদের সহায়তা করবে। এবং আমাদের ভেতরে কোনো প্রশ্ন থাকলে তারও নিরসন করবে।

এক. নবিজির দাওয়াতি মিশনের শুরুতেই কেন গোপনীয়তা

ইসলামের প্রথম দিকের বছরগুলোতে নবিজির গোপনে দাওয়াত দেওয়াটা তাঁর নিজের প্রাণের ভয় ছিল, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি যখন দাওয়াতে কাজে আদিষ্ট হলেন এবং তাঁর ওপর আয়াত নাজিল হলো—يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ...(হে চাদরাবৃত...), তিনি তখনই বুঝতে পারলেন যে, তিনি মানুষের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসুল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—যেই আল্লাহ তাঁকে এই মহৎ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতেও সক্ষম। আল্লাহ তায়ালা যদি প্রথম দিন থেকেই একদম প্রকাশ্যে দাওয়াতের আদেশ দিতেন, তাহলে নিজের প্রাণ বাজি রেখে হলেও সেই আদেশ পালনে কসুর করতেন না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট ইলহাম[১১১] করলেন—তিনি দাওয়াতের প্রথমদিকে গোপন দাওয়াত চালিয়ে যাবেন। এই দাওয়াত শুধু তার কাছেই নিয়ে যাবেন, যে একে গ্রহণ করে নেওয়ার মতো মানসিকতা লালন করে।

এই অংশ থেকে দায়িদের (প্রচারকগণ) গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে —

☛ ০১. দাওয়াতের কাজে সফল হওয়ার জন্য সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে উৎসারিত বাহ্যিক কলাকৌশল অবলম্বন করতে হবে।

---

১১১ যা রাসুলের নিকট প্রেরিত ওহির একটি প্রকার।

তবে কলাকৌশলের ওপর পরিপূর্ণ ভরসা চলবে না। ভরসা হবে একমাত্র আল্লাহর ওপর। এসব উপকরণ ও কলাকৌশলের পেছনে ছুটতে গিয়ে উপকরণই যেন মূলের মাঝে বিরাট প্রভাব ফেলে না বসে, সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। অন্যথায় সেই উপকরণ, সেই কলাকৌশল ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে।

☛ ০২. প্রত্যেক যুগের দায়ি (প্রচারক) সেই কাল ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গোপন হলে গোপন, প্রকাশ্য হলে প্রকাশ্য, কোমলতা বা কাঠিন্য—তার দাওয়াতের কৌশল সাজাতে পারে। তবে এই কৌশলগত পদ্ধতিও অবাধ নয়; এখানেও ইসলামি শরিয়ত সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এক্ষেত্রে নবিজির দাওয়াতি জীবনের বাস্তব নমুনাকে সামনে রাখতে হবে; আমাদের আলোচিত চারটি স্তর থেকে যখন যেটি প্রয়োজন ও উপযোগী, তখন সেটি গ্রহণ করতে হবে। তবে সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতে হবে উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণের প্রতি।

এ কারণেই মুসলিমরা যখন শক্তিতে, বলে, সংখ্যায় দুর্বল হবে এবং তাদের বদ্ধমূল ধারণা হবে—শত্রুদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে নামলে তারা খুব সহজেই হত্যার শিকার হবে, তখন (জুমহুর ফুকাহার প্রাধান্যমতে,) নিজেকে বাঁচানোর দিকটাই প্রাধান্য পাবে। কারণ, এখানে এসে দ্বীনের বাঁচানোর দিকটাকে প্রাধান্য দিতে গেলে তার ফলাফল (জয়-পরাজয়) অনিশ্চিত, অথবা মন্দ ফলাফল (পরাজয়) নিশ্চিত।

ইজ ইবনে আবদুস সালামও এই ধরনের জিহাদে প্রবৃত্ত না হওয়ার বিষয়টাকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন—

> শত্রুদের মধ্যে যখন কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না, তখন পরাজয় অবধারিত। কারণ, লড়তে থাকার মধ্যে প্রাণনাশের ব্যাপার আছে; আর মুসলিমদের প্রাণনাশে কাফিরদের অন্তরের উপশমও রয়েছে বটে; যেহেতু তারা মুসলিমদের লাঞ্ছিত করাটাই চায়। তাই অনিশ্চিত ও দুর্বল বিশ্বাস নিয়ে এভাবে লড়তে থাকাটা শুধুই বিপর্যয় ছড়ায়, যাতে কোনো কল্যাণ নেই।[১১২]

---

১১২ *কাওয়াইদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম* : ১/৯৫; *যাওয়াবিতুল মাসলাহা ফিশ শারিয়াতিল ইসলামিয়্যাহ* : ২৬১

আমার মতে—এখানে নিজের দিকটাকে প্রাধান্য দেওয়ার যে কথা এসেছে, সেটা স্রেফ বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এতেও দ্বীনের একপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে দ্বীনি কল্যাণ হলো—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রাণগুলো নিরাপদ থাকবে। প্রাণে বেঁচে থেকে তারা অন্যান্য ময়দানে জিহাদ করবে এবং একসময় বিজয় ছিনিয়ে আনবে। অন্যথায় যখন তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিশ্চিত হবে, তা অবশ্যই ইসলামের ক্ষতির কারণ। কেননা, নিজেদের ধ্বংসের মাধ্যমে কাফিরদের যাবতীয় প্রতিবন্ধক দূর করে দেওয়ারটাই ইসলামের ক্ষতি করার শামিল হবে।

সারকথা

যখন প্রকাশ্য দাওয়াত বা মোকাবিলা ক্ষতির কারণ হয়, তখন গোপন দাওয়াত, ও নিজেকে নিরাপদে রেখে কাজ করে যাওয়াটাই আবশ্যক; কিন্তু প্রকাশ্য দাওয়াতের মাধ্যমে যদি উপকার হয়, তখন গোপন দাওয়াতের সুযোগ নেই। আবার যখন প্রতিরোধ মোকাবিলার উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য হয়, তখন নির্লিপ্তভাবে, নিরাপদে বসে থাকার সুযোগটুকুও নেই।

দুই. প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের দ্রুত ইসলাম গ্রহণের নেপথ্য

একটু আগেও আমরা জেনেছি, প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের বড়ো অংশটাই ছিল দরিদ্র, গোলাম ও দুর্বল শ্রেণির লোক। এর হিকমত কী? তাদের ওপরই ভিত্তি করে একটি ইসলামি রাষ্ট্র নির্মাণের মূল রহস্যটা কী?

প্রকৃতিগতভাবে নবিদের দাওয়াতের প্রাথমিক দিনগুলোর বাস্তবতা এটাই। নুহ আ.-এর জাতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁর অনুসারীরা সমাজের দুর্বল ও সমাজের নিম্নশ্রেণির লোক। তাদের সম্ভ্রান্তরা নবির অনুসারীদের ইতর বিবেচনা করে বলছে—

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

তখন তার কওমের কাফির প্রধানরা বলল—আমরা তো আপনাকে আমাদের মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না; আর

আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না এবং আমাদের ওপর আপনাদের কোনো প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি।[১১৩]

মুসা আ.-এর অনুসারীরাও ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণির লোক। ফেরাউন ও দলের লোকেরা মুসা আ.-এর অনুসারীদের সবিশেষ দুর্বল ভাবত। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তার দলের লোকদের ধ্বংসের কাহিনি শোনানোর সময় এ কথাটাও তুলে ধরেছেন—

وَأَورَثنَا القَومَ الَّذينَ كانوا يُستَضعَفونَ مَشٰرِقَ الأَرضِ وَمَغٰرِبَهَا الَّتى بٰرَكنا فيها۝

আর যাদের দুর্বল মনে করা হতো, তাদেরও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের; যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি।[১১৪]

সামুদ জাতির নিকট আল্লাহ তায়ালা সালিহ আ.-কে পাঠিয়েছিলেন। সেই জাতিরও দুর্বল লোকেরাই ঈমান এনেছে, আর নেতারা চরম বিমুখতা প্রদর্শন করেছে—

قالَ المَلَأُ الَّذينَ استَكبَروا مِن قَومِهِ لِلَّذينَ استُضعِفوا لِمَن ءامَنَ مِنهُم أَتَعلَمونَ أَنَّ صٰلِحًا مُرسَلٌ مِن رَبِّهِ ۚ قالوا إِنّا بِما أُرسِلَ بِهِ مُؤمِنونَ۝

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দারিদ্রদের জিজ্ঞেস করল— তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, সালেহকে তাঁর পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বলল, আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী।

قالَ الَّذينَ استَكبَروا إِنّا بِالَّذى ءامَنتُم بِهِ كٰفِرونَ۝

দাম্ভিকরা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত।[১১৫]

---

১১৩ সূরা হুদ, আয়াত : ২৭

১১৪ সূরা আরাফ, আয়াত : ১৩৭

১১৫ সূরা আরাফ, আয়াত : ৭৫-৭৬

ইসলাম নিয়ে কাফিরদের মাথাব্যথার প্রধান কারণ

এর মূল রহস্য হলো, এই দ্বীন; যার প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে সমস্ত নবি-রাসুলকে পাঠানো হয়েছিল; এই দ্বীনের হাকিকত হচ্ছে—মানুষকে বান্দার দাসত্ব ও শাসন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্ব ও শাসনে নিয়ে আসা। আর এটাই সেই বাস্তবতা, যা প্রভুদের প্রভুত্ব ও শাসকদের শাসনকে, যা তারা দুর্বলদের ওপর চালাত, খামচে ধরে।

তাই ইসলামের দাওয়াতের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে ওইসব (কাফির) প্রভু ও শাসকেরা অহংকার ও বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায়; যেখানে দুর্বলদের অনুগত থাকতে হয়, যার কারণে দুর্বলদের তাদের ডাকে সাড়া দিতে হয়।

রুস্তমের সাথে রিবহ ইবনে আমরের কথপোকথন

দেখুন, এই বাস্তবতাটুকুই কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর সেনাপতি রুস্তম ও সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসেরর বাহিনীর সেনাপতি রিবহ ইবনে আমরের মাঝে যেই কথোপকথন হয়েছিল, তাতে তা স্পষ্ট হয়—

রুস্তম তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—

> কোন জিনিস তোমাদের আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আমাদের দেশের দিকে আকৃষ্ট করেছে?

তিনি বলেছিলেন—

> আল্লাহ যাকে চান, আমরা তাকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসতে এসেছি। এরপর তিনি রুস্তমের ডানে-বামে রুকুরত ব্যক্তিদের কাতারের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমাদের থেকে আমরা অনেক সহনশীলতা পেয়েছি; কিন্তু তোমাদের চেয়ে বেশি নির্বোধ কোনো জাতির ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের কেউ কারও ইবাদত করে না। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা পরস্পর সহমর্মিতা প্রকাশ করো, যেমন আমরা করি। তোমাদের করা সবচেয়ে যে জিনিসটা বিস্ময়কর লেগেছে তা হলো, তোমরা আমাকে এই সংবাদ দিয়েছ যে, তোমাদের কতক কতকের প্রভু...

সেনাপতি রিবয়ি ইবনে আমরের এই বক্তব্য শুনে রুস্তমের পাশে থাকা সৈন্যবহরের নিষ্পেষিত লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ফিসফিস করে বলতে লাগল—

আল্লাহর শপথ! এই আরব ব্যক্তি সত্য বলেছে।

আর সেনাপ্রধান ও নেতাদের মাঝে রিবয়ির কথা বজ্রের মতো আঘাত হানল। তারা পরস্পর বলতে লাগল—

> সে এমন কথা বলেছে যে, আমাদের দাসশ্রেণিরা তার দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারছে না।[১১৬]

কিন্তু আগে যারা ঈমান এনেছিলেন, তার মানে এই নয় যে, তাদের ভেতরে মূলত ঈমান ছিল না। তারা শুধু প্রতিপত্তিশালীদের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ঈমান এনেছে। কারণ, নবিজির যারা এসে যারা ঈমান এনেছিল, তারা শুধু দুর্বল শ্রেণির লোক তা নয়; বরং তাদের মাঝে কুরাইশ নেতারাও ছিল। প্রত্যেকেই নবিজির সত্যতা সম্পর্কে জানত; কিন্তু নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বের লোভ শক্তিশালীদের ধ্রুব সেই সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। এর উত্তম দৃষ্টান্ত আবু তালিব; কিন্তু দুর্বলদের সামনে ঈমান আনার জন্য এ রকম প্রতিবন্ধক কিছু ছিল না।

এবার প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির ঈমানের কথা ভাবেন। সে আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে কতটা বিশ্বাস করে, তার কর্তৃত্বকে কতটা মানে এবং গায়রুল্লাহর কর্তৃত্বকে কতটা অমান্য করে!

ঈমানদার ব্যক্তির এই অনুভব ও অনুভূতিটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ফল; যা ব্যক্তির শক্তি বাড়িয়ে দেয়। এবং তার সৌভাগ্য ও সফলতার দরোজা খুলে দেয়।

এখান থেকে আমরা এ কালের বিকৃত চিন্তার অধিকারী কিছু চিন্তাবিদের চিন্তার মিথ্যা ও অসারতার প্রমাণ পাই। তারা বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেটা আরব আবহ থেকেই উৎসারিত। তাঁর দাওয়াতি মিশন সেই আবহকে নাড়া দিয়ে প্রাণবন্ত করেছিল! তাঁর দাওয়াত ছিল আরব চিন্তার নতুন জাগরণ!

---

১১৬ ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে পড়তে পারে—*ইতমামুল ওয়াফা ফি সিরাতিল খুলাফা*, মুহাম্মাদ আল খুজারি : ১০০

যদি এমনই হতো, তাহলে দাওয়াতের তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নারী-পুরুষ মিলিয়ে মাত্র চল্লিশ হতো না; যাদের অধিকাংশরাই ছিল গোলাম শ্রেণির, দুর্বল ও গরিব। যদি ব্যাপারটা এমনই হতো, তাহলে আরবরাই এক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকত। অথচ বাস্তবতা বিপরীত। তাদের অগ্রগামী ছিলেন সুহাইব রুমি ও বিলাল হাবশির মতো বিভিন্ন আজমি (অনারব)।

সামনের আলোচনায় আপনি পাবেন, স্বয়ং আরব সংস্কৃতিই—যা নবিজির দাওয়াতকে ঘৃণার চোখে দেখত—তাদের হিজরতে বাধ্য করেছিল। এবং তার অনুসারীদের এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়া ও হাবশায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। এখন প্রশ্ন হলো, নবিজির দাওয়াত যদি আরব আবহ থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে, তাহলে অনুকূল উৎস থেকে তারা পলায়ন করতে যাবে কেন?

* * *



দ্বিতীয় প্রকার : প্রকাশ্য দাওয়াত

সাফা পাহাড়ে নবিজি

ইবনে হিশাম লেখেন—এরপর নারী-পুরুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। একপর্যায়ে গোটা মক্কায় ইসলামের দ্যুতি ছড়িয়ে যায় এবং এ নিয়ে সমাজের পথে পথে কথাবার্তা ও আলোচনা চলতে থাকে। ফলে উপযুক্ত সময় অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা নবিজিকেও নির্দেশ প্রদান করেন—যেই সত্যের বাণী ও বার্তা দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে, এবার প্রকাশ্যে তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন। সবাইকে এই পয়গাম কবুলের নির্দেশ প্রদান করেন এবং এর দিকে ডাকতে থাকেন।

নবুয়তপ্রাপ্তির পর তিন বছর লাগাতার নবিজি গোপনে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন। এরপর প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমের আয়াত অবতীর্ণ করেন—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۝

> অতএব, আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করেন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করেন।[১১৭]

এরপর—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۝

> আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করে দেন। এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।[১১৮]

---

১১৭ সূরা হিজর, আয়াত : ৯৪

এরপর—

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

এবং বলুন, আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।[১১৮]

এবার নবিজি আল্লাহ তায়ালার আদেশ মোতাবেক প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা করেন। সূরা হিজরের উক্ত আয়াতটি নাজিল হলে নবিজি সাফা পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেন—

হে বনু ফিহর...

হে বনু আদি...

সাফা পাহাড় থেকে ভেসে আসা এই সংকেতধ্বনি শুনে সবাই এসে পাহাড়ের কাছে জড়ো হয়। এমনকি যারা কোনো কারণে নিজে আসতে পারেনি, তারা খবর নিতে লোক পাঠায়।

নবিজি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

> আমার ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী? বলো তো, আমি যদি বলি— তোমাদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী এই পাহাড়ের পেছনেই ওত পেতে আছে, তবে কি তোমরা আমার বিশ্বাস করবে?

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে—

> এর আগে আমরা আপনার মুখ থেকে কখনো মিথ্যা শুনিনি। (তো হঠাৎ আজ এমন প্রশ্ন করছেন কেন? ব্যাপার কী, বলুন তো?)

এবার নবিজি তাদের বলেন—

> আমি তোমাদের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি, যা তোমাদের সামনেই উপস্থিত।...

---

১১৮ সূরা শুআরা, আয়াত : ২১৪-২১৫
১১৯ সূরা হিজর, আয়াত : ৮৯

নবিজির এই সতর্কবার্তা আবু লাহাবের মনঃপূত হয়নি। সে রাগত স্বরে এক ঝটকায় বলে ওঠে—তোমার সারাটা দিনই বরবাদ হোক। (তার ভাষায়, সামান্য) এই কথা বলতেই কি তুমি আমাদের এখানে জড়ো করেছ?

কিন্তু আল্লাহ তায়ালাও তার পোড়া মুখের জবাবে নাজিল করেন—

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۝

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।[১২০]

তারপর নবিজি পাহাড় থেকে নেমে আল্লাহ তায়ালার পরবর্তী নির্দেশের ওপর আমল শুরু করেন। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۝

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।[১২১]

নবিজি সকল আত্মীয়স্বজন ও কাছের লোকদের একত্র করে বলেন—

> হে বনু কাব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বনু মুররা, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বনু আবদে মানাফ, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বনু আবদুল মুত্তালিব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা, তুমিও নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর দরবারে তাঁর সন্তুষ্টির বিপক্ষে তোমাদের কিছু দিতে পারব না। অবশ্য এই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা মনে রাখব।[১২২]

তারা নবিজির প্রকাশ্য দাওয়াত সরাসরি অস্বীকার করে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় এবং ভ্রান্ত আকিদা ও ভিত্তিহীন কর্ম পরিত্যাগে বাপ-দাদার ধর্মকে অপারগতা হিসেবে পেশ করে। তারা বলে—এসব রীতিনীতি আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে পাওয়া। এগুলো এখন আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই পরিস্থিতিতে নবিজি তাদের মুক্তচিন্তা ও ভাবনা-কল্পনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে মূর্তির অন্ধ অনুসরণ ও পূজার অপবিত্রতা থেকে

---

১২০ সূরা লাহাব, আয়াত : ১

১২১ সূরা শুআরা, আয়াত : ২১৪

১২২ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম*

পবিত্র করতে সচেষ্ট হন। তাদের নিজ নিজ আকল ও বুদ্ধি কাজে লাগানোর উপদেশ দেন। তাদের সামনে পরিষ্কার করে বলেন—ইবাদতের উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের যেসব তথাকথিত ছোটো ছোটো খোদার সামনে মাথানত করো, সেগুলো তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না। এবং মূর্তিপূজার এই কুপ্রথা বংশপরম্পরায় প্রাপ্তির যেই ওজর তোমরা পেশ করেছ, তাও সুস্পষ্ট ভুল। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

আর তাদের যখন বলা হয়, তোমরা এসো আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের দিকে এবং রাসুলের দিকে, তখন তারা বলে—'আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।' যদিও তাদের বাপ-দাদারা কোনো জ্ঞান রাখত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না তবুও?[১২৩]

নবিজি যখন তাদের মিথ্যা ও ভ্রান্ত উপাস্যদের দোষ-ত্রুটি ও অবাস্তবতা এক এক করে শোনান এবং তাদের দৃষ্টিতে বিখ্যাত ও জ্ঞানী লোকদের নির্বোধ ও জ্ঞানহীন আখ্যা দেন, আর বাপ-দাদাদের মূর্তিপূজার প্রকৃত কারণ অজ্ঞানতা ও বোধহীনতাকে ওজর হিসেবে পেশ করার প্রশান্তিমূলক জবাব দেন, তখন ব্যাপারগুলো কুরাইশদের খুব গায়ে লাগে। তারা সরাসরি তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু সবাই তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আল্লাহ তায়ালা যাদের মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, যাদের আল্লাহ তায়ালা তাঁর রোষানল ও পাকড়াও থেকে বাঁচান, কেবল তারাই থেকে যায় নবিজির পক্ষে। নবিজির চাচা আবু তালিব নিজেকে তাদের থেকে পৃথক করে নেন। তিনি নবিজির সার্বিক তত্ত্বাবধান, সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং প্রাণপণ রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ান।

* * *

১২৩ সূরা মায়িদা, আয়াত : ১০৪

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবি-জীবনের এই অংশের পাঠশেষে এখান থেকে আমাদের সামনে তিনটি দিক বেরিয়ে আসে। সংক্ষেপে আমরা সেগুলো দেখে নেব—

প্রথম দিক

কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের প্রতি নবিজির উক্ত দাওয়াত তাদের মনের আশার বিপরীত এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডবিরোধী ছিল। উপস্থিত সমাবেশেই আবু লাহাবের স্পষ্ট অস্বীকার এবং বেয়াদবিমূলক শব্দ উচ্চারণ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এমনকি পরবর্তী সময়ে সে সকল মুশরিক ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে তার দলে ভিড়িয়ে নেয়।

এই ঘটনার মাধ্যমে 'আরব জাতীয়তাবাদই ইসলামের শিক্ষা ও আইনকানুনের ভিত্তি এবং নবি মুহাম্মাদ তাঁর নতুন ধর্মের যেই প্রচারণা করেছে, তা তৎকালীন আরবের জনগোষ্ঠীর মনের বাসনা ও মনের চাহিদারই প্রতিফলন' বলে যারা চরম মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি করে এবং কুরআনি অনুশাসন ও ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজে প্রোপাগান্ডা চালায়, সিরাতের এই আলোচনা দ্বারা তাদের দাবিও খণ্ডিত হয়ে যায়।

এ জাতীয় চরম হাস্যকর উক্তি ও নির্বুদ্ধিতা সুলভ বক্তব্যের খণ্ডনে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে নামার প্রয়োজন নেই। কারণ, নবিজির জীবনচরিত সম্পর্কে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে যারই ন্যূনতম সঠিক জ্ঞান ও অবগতি আছে সে ই জানে, সমাজে এই হাস্যকর দাবি প্রচারের ধান্দাকারীরাও এই দাবিকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে জানে, তবুও তারা কেন এ দাবি করে?

কারণ, একে তো মনগড়া কিছু দাবি না করলে তারা অন্তরে স্বস্তি পায় না, রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না; পেটের ভাত হজম হয় না; দ্বিতীয়ত যেন ইসলামের

নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব অন্যান্য মৌলিক বিষয় থেকে সহজেই খসিয়ে ফেলতে পারে। কোনো কিছু দাবি করা এবং তা প্রচারের জন্য সেই দাবিটি সত্য ও নির্ভুল হওয়ার আন্তর্জাতিক থিওরি তাদের দৃষ্টিতে জরুরি বা আবশ্যক নয়; বরং তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো—তাদের স্বার্থ ও লক্ষ্য পূরণে যা দরকার, সেগুলোরই প্রচারণা; চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা। পাঠকের হয়তো মনে আছে, বইয়ের ভূমিকায় এ নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে!

দ্বিতীয় দিক

আল্লাহ তায়ালার প্রথম নির্দেশ ছিল—'আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।' এই নির্দেশের ভেতর তিনি দাওয়াতের 'ক্ষেত্র' নির্দিষ্ট করে দেননি। সেহেতু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের এই ক্ষেত্রটি ছিল ব্যাপক এবং এতে আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু তার পরও নিকটাত্মীয়দের বিশেষভাবে দাওয়াত দেওয়ার পৃথক নির্দেশ প্রদানের রহস্য কী?

এর রহস্য হলো—সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আর বিশেষ করে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনাকারীদের ওপর দাওয়াতের দায়িত্বের যেই স্তরগুলো রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সেগুলো স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছেন।

প্রথম স্তর : দাওয়াতের প্রথম স্তর ও সর্বপ্রথম দায়িত্ব নিজ সত্তাকে অর্থাৎ নিজেকে অনুগত করানো। সবার আগে এই দাওয়াতের সত্যতার ওপর নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এর গুরুত্ব নিজে উপলব্ধি করা। এজন্য আল্লাহ তায়ালা ওহি নাজিলের প্রাথমিক পর্বে দীর্ঘ একটা সময় ওহি নাজিল বন্ধ রেখে নবিজিকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। যেন নবিজি নিজের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট ওহির সাথে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হতে পারেন এবং প্রশান্তির সাথে বুঝতে পারেন—তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর ওপর যেসব বার্তা আসছে, সেগুলো সাধারণ ও জাগতিক কোনো আলাপচারিতা নয়; বরং নিখিল জাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র ওহি। এ ছাড়াও তিনি যেন পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত সকল বিধিবিধান ও মূলনীতি এবং শরিয়তের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।

দ্বিতীয় স্তর : নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত দেওয়া। এই দায়িত্ব পালনে ব্রত হতে আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনদের সামনে দাওয়াত পেশ করতে এবং তাদের আল্লাহর ভয় দেখাতে নির্দেশ দেন। দাওয়াতের এই স্তরে সকল পরিবার ও গোত্র বা গোষ্ঠী প্রধান সমান অংশীদার।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো—নবিজি যেই দাওয়াত স্বজাতি ও স্বদেশি লোকদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, আর সাধারণ উম্মত তার আত্মীয়স্বজনের কাছে পৌঁছায়—এই দুয়ের মধ্যে 'দাওয়াত' হিসেবে কোনো তারতম্য বা মতভেদ নেই। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, নবিজি (তৎকালীন মানুষের ধ্যানধারণা ও সমাজের ভ্রান্ত রীতিনীতির বিপক্ষে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এক নতুন শরিয়তের দাওয়াত দিয়েছেন, আর সাধারণ উম্মত দাওয়াত দেয় (বিশ্ববিশ্রুত) এই মুহাম্মাদি পয়গাম ও বার্তার। তবে একজন নবি ও রাসুল যেভাবে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিতেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত নির্দেশনাবলি পৌঁছাতেন এবং কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও এই মিশন থেকে থেমে যেতেন না, অনুরূপ একজন পরিবারপ্রধানও কোনো অবস্থাতেই এই দায়িত্ব থেকে থেমে যেতে পারবে না। প্রত্যেক পরিবারপ্রধানের গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য—আমৃত্যু পরিবারের প্রতিটি সদস্য ও আত্মীয়স্বজনের কাছে ইসলামের যাবতীয় বিধান পৌঁছাতে থাকা। এ কাজে তিনি প্রয়োজনমতো তার অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাব ও কর্তৃত্ব এবং শক্তি ও জোর—সবই প্রয়োগ করতে পারবেন।

তৃতীয় স্তর : দাওয়াতের এই স্তরে একজন আলিমের নিজ পাড়া-মহল্লা বা শহর-নগরীর অধিবাসীদের এবং সমকালীন শাসকের গোটা দেশের জনগণকে দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টি শামিল। সুতরাং কাজের বিবেচনায় ওই আলিম ও শাসক নবিজির উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধি বলে বিবেচিত। যেমনটি নবিজি হাদিস শরিফে বিবৃত হয়েছে—

العلماء ورثة الأنبياء»

আলিমসমাজ নবিগণের উত্তরাধিকার।[৩৩]

শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানকে নবিজির স্থলাভিষিক্ত বলা হয়।[৩৪] তাই (ফরজ পরিমাণ) দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ইসলামি সমাজের শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য আবশ্যক ও অপরিহার্য।

---

১২৪ সূত্র : *সুনানু আবি দাউদ*

সুতরাং এই স্তরে নবিজির দাওয়াতের দায়িত্ব এবং উলামা ও শাসকদের দায়িত্ব এক রকম হয়ে যায়। পার্থক্য এতটুকু, নবিজি একজন নবি হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নতুন শরিয়তের দাওয়াত দিয়েছেন, আর উলামা ও শাসকগণ উম্মত হিসেবে তাঁর দাওয়াত কবুল করে তাঁর সুন্নাত ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেরা আমল করেন এবং পাশাপাশি এই দাওয়াত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে মাঠে-ময়দানে কাজ করেন।

এভাবে আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরখ করলে এবং ভালোভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট বুঝতে পারব, নবিজি দাওয়াতের তিনটি স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন—

- ✓ ০১. নিজের ব্যক্তিসত্তার ওপর প্রাপ্ত দায়িত্ব। কারণ, তিনি এ ব্যাপারে মুকাল্লাফ (مكلف অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার বিধিনিষেধ প্রয়োগের উপযুক্ত) ছিলেন।
- ✓ ০২. নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব। কারণ, তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজন ছিল।
- ✓ ০৩. সমগ্র মানবজাতির কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব। কারণ, তিনি ছিলেন কিতাবপ্রাপ্ত নবি এবং প্রেরিত রাসুল।

অতএব এভাবে দাওয়াতি অঙ্গনে নবিজির রীতি ও আদর্শ অনুযায়ী প্রথম স্তরের দায়িত্বে মুকাল্লাফ প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় স্তরে সকল পরিবার ও গোত্রপ্রধান শামিল। আর তৃতীয় স্তরে রয়েছেন উলামা-মাশায়েখ এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ।

তৃতীয় দিক

নবিজি স্বজাতির দোষগুলো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন—তোমরা চিন্তা-ফিকির ছাড়াই এবং ভালো-মন্দের মাঝে তফাত না করেই নিজেদের বাপ-দাদার অভ্যাস ও প্রথায় আবদ্ধ ও বন্দি করে রেখেছ। তিনি তাদের গোঁড়ামির ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে বিচার-বুদ্ধিভিত্তিক ইসলামি শরিয়তের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান।

---

১২৫ এ থেকে বোঝা যায়—মুসলিম দেশের শাসন পুরুষতান্ত্রিক হওয়া উচিত; কারণ, শাসক নবিজির স্খলাভিষিক্ত। আর নবিজি ছিলেন পুরুষ। সর্বোপরি বড়ো কথা হলো—নবিজি নিজেই পুরুষ শাসককে নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এতে (বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর মুসলিমদের জন্য) নির্দেশনা রয়েছে যে, ইসলামি শরিয়ত মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস ও শাখাগত বিধান মিলিয়ে এমন এক ব্যবস্থাপনা—যা যৌক্তিক ও বুদ্ধিদীপ্ত। প্রাকৃতিক ও বাস্তবিক। স্বাভাবিক ও সম্পাদনযোগ্য। কারণ, এর প্রতিটি বিধান মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মেজাজ উপযোগী। ঠিক এ কারণেই আল্লাহর প্রতি ঈমানসহ অন্যান্য আকিদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো—আকিদাটি পূর্ণ নিশ্চয়তা ও স্বাধীন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাতে সামাজিক আচার-প্রথা বা অন্ধ অনুসরণের ছোঁয়াও না থাকা।

আল্লামা বুরহানুদ্দিন ইবরাহিম লাক্কাকি মালিকি রহ. (মৃত্যু : ১০৪১ হি.) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *জাওহারাতুত তাওহিদ*-এ একটি কবিতায় উল্লেখ করেন—

اذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد

> তাওহিদের বিষয়ে যে অন্ধ অনুসরণ করবে, মুহূর্তেই তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এ থেকে জানা যায়, ইসলাম প্রাচীন কুফরি মতবাদ ও প্রথা-প্রবচনের মাথায় কুঠারাঘাত করেছে এবং সেসবের গোলামির শৃঙ্খল ও দাসত্বের বন্ধন থেকে মানুষকে করেছে মুক্ত। কারণ, এর যাবতীয় মূলনীতি ও বিধান সুস্থ চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন বিবেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিপরীতে প্রাচীন প্রথা ও প্রবচনের ভিত্তি কেবল অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামির ওপর। অর্থাৎ এতে চিন্তা-ফিকির এবং পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের কোনো উপাদানই নেই; বরং শুধুই একগুঁয়েমি।

আরবি তাকলিদ (تقليد) শব্দের অর্থ পুরনো রুসম-রেওয়াজ ও তথাকথিত উক্তি। আরবি ভাষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এর সংজ্ঞা কিছুটা এভাবে—

> তাকলিদ হলো বাপ-দাদাদের রীতিনীতি ও অভ্যাসের সেসব সমষ্টি, যেগুলোর ওপর কোনো সমাজ বা অঞ্চলের রুসুম ও প্রথার ছাপ থাকে এবং শুধুই অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামির ভিত্তিতে সেসব অভ্যাস স্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকে।[১২৬]

---

১২৬. স্মর্তব্য, এই ব্যাখ্যা অমুসলিমদের ধর্ম ও মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে বর্তমানে ভিন্ন ব্যাখ্যার সাথে চার মাজহাবের মুসলিমদের ক্ষেত্রে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কাজেই আমাদের মুসলিম নেককার বাপ-দাদা বা হক্কানি

মানুষ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ধাপে যেসব অভ্যাস ও আচারে অভ্যস্ত হয়, আনন্দ-উৎফুল্ল অবস্থায় যেসব খেলতামাশা করে, দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে যেই মাতম ও হা-হুতাশ করে আবার যেসব কর্মকাণ্ড স্বভাববশত করে থাকে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসব লালন করে চলে অথবা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সুসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার কারণে তারাই সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে—এ ধরনের সবকিছুই ভাষা ও সমাজবিজ্ঞানীদের পরিভাষায় রেওয়ায়াত (কথিত উক্তি) ও অন্ধ অনুসরণ বলে সংজ্ঞায়িত।

এ থেকে স্পষ্ট, ইসলাম কথিত উক্তি বা প্রবচনের (রেওয়ায়াত) স্থান নয়; চাই সেগুলো আকিদা-বিশ্বাসকেন্দ্রিক হোক বা অন্যান্য শাখাগত বিধানসংবলিত হোক। কারণ, যেকোনো বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হয় সুস্থ বিবেক ও নির্ভুল যুক্তির ওপর। আর শাখাগত বিধানের ভিত্তি হয় ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণের ওপর। আর ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণ বোঝা চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার বিষয়। যদিও কারও কারও বিবেক প্রাসঙ্গিক বাধাবিপত্তির কারণে সঠিক ও যথাযথ অর্থ বুঝতে সমর্থ হয় না।

এ থেকে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হলো, সেসব লোক কী মারাত্মক অপবাদ ও চরম মিথ্যাচার করে, যারা কিনা ইসলামি অনুশাসন ও ইসলামের হুকুম-আহকামকে 'ইসলামি রেওয়ায়াত' (ইসলামের তথাকথিত ও প্রচলিত বর্ণনা) বলে আখ্যায়িত করে।[১২৭] তাদের এই জালিম-সুলভ বক্তব্য ও মন্তব্যে এ কথাই ফুটে ওঠে, ইসলামি রীতিনীতির মূল্যায়ন-মর্যাদা এ কারণে নয় যে, এটিই মানবজাতির সৌভাগ্য লুক্কায়িত খোদায়ি সংবিধান; বরং তাদের কথায় মনে হবে, এর মূল্যায়ন ও কদরদানির কারণ হলো—ইসলামি আচার ও রীতিনীতি এর অনুসারীদের বাপ-দাদা থেকে চলে আসা প্রাচীন ও ওয়ারিশি প্রথা ও কুসংস্কারের সমষ্টি।

উলামায়ে কিরামের দেখাদেখি কোনো নেক আমল করাকে বিধর্মী ভাইদের মতো 'অন্ধ অনুসরণ' বলার সুযোগ বা অবকাশ নেই এবং অন্যায়ও বটে।

১২৭. 'রেওয়ায়াত' ও 'ইসলামি রেওয়ায়াত' ভিন্ন ভিন্ন দুটি পরিভাষা। পরিভাষা দুটির পরিচিতি এমন—

রেওয়ায়াত : এই পরিভাষাটি হাদিসশাস্ত্রে পারদর্শী সকল হাদিসবিশারদ ব্যবহার করেছেন। অতএব, এক্ষেত্রে শুধু এই 'রেওয়ায়েত বা বর্ণনা' শব্দ নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই।

ইসলামি রেওয়ায়াত : এই শব্দটির উৎপত্তি পশ্চিমা ইসলাম গবেষক ও ওরেয়ান্টালিস্টদের থেকে। তারা সাধারণত পরিভাষাটিকে 'ভিত্তিহীন কথিত উক্তি বা বর্ণনা' অর্থে চালানোর উদ্দেশ্যে চয়ন করেছে। অথচ ইসলামের প্রতিটি শাখাগত ও শাস্ত্রীয় বিবরণ যুগের নির্ভরযোগ্য পরম্পরায় বর্ণিত। এমনকি প্রতিটি বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও সমালোচনাও গ্রন্থবদ্ধ। কাজেই এগুলো ভিত্তিহীন হওয়ার কোনো অর্থই নেই। এবং তাদের এই চক্রান্ত নিতান্তই নিকৃষ্ট কর্ম।

স্বভাবতই এ জাতীয় মনগড়া কথাবার্তার উদ্দেশ্য অনিবার্যভাবে নির্দেশ করে, অনুন্নত যুগের যেসব প্রাচীন ও মিথীয় বিষয়কে উন্নত ও পরিবর্তিত যুগে বাধ্যতামূলক করা হয়, সেগুলো গ্রহণে কারও আগ্রহ জাগে না এবং কোনোটির প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি হয় না। ইসলামও যেন তা-ই।

বাস্তবতা হলো—ইসলামের 'নির্দেশনা'র ওপর 'ইসলামি রেওয়ায়াতের নিদর্শন' শব্দের প্রয়োগ কোনো ছোটো বা সাধারণ ভুল নয়; বরং এটা ওই শিকলেরই একটি কড়ি, যার উদ্দেশ্যই হলো—বাতিল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক পরিভাষার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই উসকে দেওয়া।

ইসলামের ব্যাপারে 'ইসলামি বর্ণনা' পরিভাষা প্রচলনের প্রথম উদ্দেশ্যই হলো ইসলামের সিংহভাগ হুকুম-আহকাম ও নিয়মনীতির ওপর 'প্রচলিত বর্ণনা'-এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া; যাতে করে দীর্ঘ একটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইসলামের বিধিবিধান ও নিয়মনীতি মানেই 'কথিত উক্তি ও বক্তব্য'। এগুলোর শক্তিশালী ও মজবুত কোনো উৎস বা ভিত্তি নেই। ফলত একটা সময় গিয়ে ইসলামের অনুসারীদের মনেই থাকবে না—এই ব্যবস্থাপনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জিবরাইল আ.-এর মারফতে নবিজি এবং নবিজি থেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এবং এসব বিধিবিধান পুরোপুরি বিবেকসম্মত ও মুক্ত বিশ্লেষণযোগ্য। তারপর ইসলামের শত্রুদের জন্য এর যেকোনো দিক থেকে তীব্র আক্রমণ ও বড়ো হামলা অতি সহজ হয়ে যাবে।

ইসলাম যেই ব্যবস্থাপনা ও শরিয়তের নাম, সেটা ভিত্তিমূলক মৌলনীতি। মৌলনীতি কাকে বলে? যা বিবেক ও যুক্তির আলোকে বোঝা যায়, চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে গবেষণায় উঠিয়ে আনা যায় এবং যার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়—এমন বিষয়ই তো মৌলনীতি। মানুষের বিবেকপ্রসূত নীতি ও সংবিধান নানাজনের চিন্তা-গবেষণার ফল হওয়ায় ভুলের শঙ্কা থাকে বেশি; কিন্তু ইসলামের মূল থিওরি কখনোই ভুল হওয়ার নয়। কারণ, যেই মহামহিম সত্তা একে প্রণয়ন করেছেন, তিনিই সব চিন্তক ও গবেষক মন-মস্তিষ্কের একক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টা। এই একটি যুক্তিই ইসলামের মৌলিক নীতিমালার ওপর ঈমান আনয়ন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য, বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার ওপর নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট।

এতে কোনো সন্দেহ নেই, যখন ইসলামের সিংহভাগ আকিদা-বিশ্বাস ও বিধিবিধান যেমন : বিয়ে-তালাক-নারীদের পর্দা এবং তাদের নিরাপত্তা, চলনরীতি ও চরিত্রকেন্দ্রিক সাধারণ মাসয়ালার ওপর 'তথাকথিত বা প্রচলিত বর্ণনা'-এর ট্যাগ লাগানো হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা এসব প্রচলিত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতে, এসবের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে এবং এসবের শিকল ভাঙতে মানুষকে দাওয়াত দেবে। বিশেষ করে এই যুগে; যে যুগের মানুষের মুখের লাগাম বলতে কিছু নেই; এবং তাদের চিন্তাচেতনা নিয়ন্ত্রণহীন।[১২৮]

কিন্তু বাস্তবতা হলো—ইসলামে প্রচলিত বর্ণনা ও তথাকথিত উক্তি বলতে কিছু নেই। এটা তো এমন ধর্ম, যা বিবেককে প্রচলিত বর্ণনার ধূম্রজাল ও তথাকথিত উক্তির জাঁতাকল থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই এসেছে। যেমনটি আমরা দাওয়াতের প্রাথমিক ধাপগুলোয় নবিজিকে করতে দেখেছি।

রেওয়ায়াত বা প্রচলিত বর্ণনা : সমাজের রীতিনীতি ও পথ পদ্ধতির সেসব ধারা, যেগুলোর মধ্যে মানুষ আপনা-আপনিই শুধু অন্ধ অনুসরণের স্রোতেই ভেসে যায়।

মৌলনীতি : ওই লিপি, যার মাধ্যমে যুগের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেটা উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্তকারী বিপরীত কিছু নয়।

প্রচলিত বর্ণনা ও অন্ধ অনুসরণের উদাহরণ সেসব আগাছা ও পরগাছা উদ্ভিদের মতো, যেগুলো সমাজের চিন্তা ও চেতনার ময়দানে আপনা-আপনিই গজিয়ে ওঠে। এগুলো হয় মারাত্মক ক্ষতিকর। তাইতো এগুলো উপড়ে ফেলা এবং সুস্থ চিন্তার মসৃণ পথকে নিরাপদ ও আবর্জনামুক্ত রাখা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য।

* * *

১২৮. যেমনটি প্রান্তিক আচরণের তথাকথিত আহলে হাদিস ভাইয়েরা করে সফল হয়েছে। গোটা উম্মতের স্বীকৃত চার মাজহাবের মুকাল্লিদ মুসলিমদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ তাদের হিদায়াত করুন, নতুবা উপযুক্ত প্রতিদান দান করুক।

কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন

প্রকাশ্য দাওয়াতের পরপরই নবিজি এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রতি কুরাইশদের শত্রুতা চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়। নবিজির ওপর নির্যাতন ও অত্যাচারের নতুন নতুন পদ্ধতি যোগ হয়। যেমন : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বর্ণনা করেন—

> একবার নবিজি কাবা চত্বরে সালাতে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত এসে নবিজির গলা মুবারক কাপড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে ফেলে এবং সজোরে এমন টান দেয় যে, নবিজির গলায় ফাঁস লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় আবু বকর রা. দৌড়ে এসে উকবাকে কাঁধে উঠিয়ে নবিজির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেন এবং বলেন—তুমি কি এমন ব্যক্তিকে খুন করতে চাও, যে বলে, আমার রব আল্লাহ![১২৯]

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন—

> একবার নবিজি সিজদারত ছিলেন এবং আশপাশে কুরাইশরাও ছিল। উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের নাড়িভুঁড়ি এনে নবিজির পিঠের ওপর ফেলে দেয়। নাড়িভুঁড়ির চাপে নবিজি মাথা ওঠাতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় ফাতিমা রা. দৌড়ে এসে নবিজির ওপর থেকে সব ময়লা-আবর্জনা সরান। এবং যেই নরাধম পশু নিষ্পাপ বাবার সাথে এমন নির্মম আচরণ করেছে, ছোট্ট মুখে আল্লাহর কাছে তার ওপরও রহম না করার ফরিয়াদ জানান।[১৩০]

---

১২৯ *সহিহ বুখারি*

১৩০ *সহিহ বুখারি*

কুরাইশ কাফিরদের লাগামহীন জ্বালা-যন্ত্রণা ও সীমাতিরিক্ত বিরক্তির কারণে নবিজির মক্কায় থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি যেখানেই যেতেন, দাঁড়াতেন, বসতেন, কথা বলতেন, সেখানেই কাফিররা গিয়ে তাঁর সাথে বেয়াদবি করত। ঠাট্টা-তামাশা করত। নোংরা আচরণ করত। বিভিন্ন রকমের কষ্ট দিত।

অনুরূপ তাবারি ও ইবনে ইসহাকের এক বর্ণনায় এসেছে—

> নবিজি একদিন মক্কার গলিপথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে এক কাফির মুষ্টিভরা মাটি নিয়ে তাঁর মাথায় নিক্ষেপ করে। এই মাটিভরা অবস্থায়ই নবিজি ঘরে ফিরলে নবিজির মেয়ে মাথা ধুয়ে দেন আর কাঁদতে থাকেন। নবিজি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—মা রে, কেঁদো না; নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমার বাবার হিফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ।[১৩১]

সাহাবায়ে কিরামও নানা রকম জুলুম-নির্যাতন ও শাস্তি সহ্য করেছেন। এমনকি শাস্তির তীব্র যন্ত্রণায় কারও কারও প্রাণ বের হয়ে যায়। কেউ কেউ সারাজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যান। তবুও কোনো শাস্তি বা যন্ত্রণা তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরাতে পারেনি। এইসব আলোচনার ঘটনাসংবলিত বিবরণে গেলে তা এত বেশি হবে যে, এই আলোচনার পৃষ্ঠা বাড়তে থাকবে গাণিতিক হারে। তাই অনুমানের জন্য এখানে শুধু খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি রহ.-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হচ্ছে—

খাব্বাব রা. বলেন—

> একদিন আমি নবিজির সামনে উপস্থিত হই। নবিজি কাবা চত্বরে একটি চাদর বিছিয়ে বসে ছিলেন। তখন পর্যন্ত মুশরিকদের নানা ধরনের নির্যাতনের মুখে আমাদের পড়তে হয়েছে। আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন না? নবিজি সোজা হয়ে বসেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণের হয়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন—নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের দেহ লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হতো। ফলে তাদের হাড় থেকে গোশত খসে খসে পড়ত। তার পরও এই অকথ্য ও বর্ণনাতীত

---

১৩১ *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৪; *সিরাতে ইবনে হিশাম* : ১/১৫৮

যন্ত্রণা তাদের সত্যধর্ম থেকে একচুলও নড়াতে পারেনি। নিশ্চিত জেনে রাখো—আল্লাহ এই দ্বীনকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেন। এমনকি একসময় আসবে, যখন কোনো উট আরোহী সানআ থেকে হাজরামওত[১৩২] পর্যন্ত সফর করবে; কিন্তু এই দীর্ঘ যাত্রায় শুধু আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোনো কিছুর ত্রাস বা শঙ্কা তার মনে থাকবে না।[১৩৩]

* * *

---

১৩২ **সানআ** : ইয়ামানের রাজধানী। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলোর একটি এবং অন্যতম সর্বোচ্চ রাজধানী শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২৩০০ মিটার (৭,৫০০ ফুট)।

হাজরামওত : ইয়ামানেরই আরেকটি বিখ্যাত শহর। দুই শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ দিনের। তবে যদি সানআ দ্বারা এই হাদিসে নবিজির উদ্দেশ্য শামের সানআ হয়ে থাকে, তাহলে দুই শহরের দূরত্ব অনেক। সূত্র : *ফাতহুল বারি শরহু বুখারি*

১৩৩ কাফিরদের অত্যাচার নির্যাতনের বিস্তারিত ঘটনা জানতে পড়তে পারেন—*সিরাতে ইবনে হিশাম, তাহজিবুস সিরাত* ও *নুরুল ইয়াকিন* গ্রন্থগুলো ইত্যাদি।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের নির্যাতন এবং কষ্ট ভোগের ঘটনাগুলো পড়ে স্বভাবতই যেকোনো চিন্তাশীল ও সচেতন লোকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তিনি ও তাঁর সাহাবিগণ যদি সত্যের পথেই থেকে থাকেন, তাহলে এত নির্যাতন ও অত্যাচারের সম্মুখীন কেন তাদের হতে হয়েছে? আল্লাহই হুকুম করেছেন তাঁর দ্বীন ও বাণী প্রচার করতে, মানুষকে তাঁর ভয় দেখাতে, সবাইকে তাঁর পথের দিকে ডাকতে, তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম-সাধনা করতে, অথচ সেই তিনিই আবার কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনের সুযোগ দিলেন? কিন্তু কেন? কেন তিনি তাদের রক্ষা করলেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব—এই পার্থিব জগতে মানুষের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা সবাই মুকাল্লাফ। অর্থাৎ খোদায়ি বিধিবিধান পালনে যেসব কষ্ট-যন্ত্রণা ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে, সেগুলো সহ্য ও হজম করতে আমরা বাধ্য ও অনুগত।

ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া এবং সত্যের পতাকা সমুন্নত ও উঁচু রাখতে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আবশ্যক। আর আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় বিধিবিধানের অনুসরণ তাঁর দাসত্ব ও গোলামির নিদর্শন। কারণ, তাঁর বন্দেগি ও গোলামির অর্থই হলো—তাঁর প্রতিটি হুকুমের সামনে মাথানত রাখা। যখন তাঁর হুকুম পালন শুরু হবে, তখন কষ্ট ও দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। আমরা যদি তাঁর সামনে বন্দেগি ও গোলামি প্রদর্শন না করি, তাহলে তাঁর ওপর ঈমান আনার কোনো অর্থই থাকে না। সুতরাং বন্দেগি ও গোলামির দাবিই হলো—তাঁর হুকুম পালন ও অনুসরণকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া। তাঁর হুকুম পালনে কষ্ট ও যন্ত্রণাও সহ্য করে যাওয়া। এবং নিজের মনের কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির

বিরোধিতায় অবিরাম সংগ্রাম-সাধনায় লেগে থাকা। এগুলো বন্দেগি ও দাসত্বের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

এজন্যই এই পার্থিব জীবনে বান্দাদের ওপর দুটি বিষয় আবশ্যক করে নেওয়া জরুরি—

- **এক.** ইসলামকে অন্তরজ্ঞা ও আপন করে নেওয়া এবং পরিচ্ছন্ন ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।
- **দুই.** যেই পথ আল্লাহর দিকে পৌঁছেছে, সেটা অবলম্বন করা। এই পথে চলতে গিয়ে সব বাধাবিপত্তি-শঙ্কার দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া। সকল কষ্ট সহ্য করে নেওয়া। এবং অভীষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্যে পৌঁছতে নিজের শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ঈমান আনয়নের পাশাপাশি তাঁর হুকুম পালনের মুকাল্লাফ ও বাধ্যও বানিয়েছেন। এই ঈমানি ও সত্যের পথে সর্বপ্রকার কঠিন অবস্থা এবং সব ধরনের কষ্ট সহ্য করতেও আমরা বাধ্য।

আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমাদের ঈমান আনার পর সহজেই এবং বিনা পরিশ্রমেই ইসলামি ও তাঁর অনুশাসিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার নিয়ম করে দিতে পারতেন; কিন্তু এতে আল্লাহর পথের পথিকদের দাসত্ব ও বান্দাসুলভ আচরণ এবং একনিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটত না। কারণ, প্রকৃত পথিক তো সে-ই, যে কিনা রাস্তায় থাকা সকল বাধাবিপত্তি ও ভয়-শঙ্কা উপেক্ষা করে সত্যের সেই পথ ধরেই অবিরত সামনে এগিয়ে যায়। কারণ, মুমিন যখন ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেয়, তখন থেকেই সে নিজের জানমাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়। এবং স্বীকার করে নেয়—তার মনের সকল চাহিদা ও সকল কামনা-বাসনা নবিজির আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী হয়ে থাকবে। এই অবস্থায় এরও সম্ভাবনা ছিল যে, মুমিন-মুনাফিক, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী—সবাই এই পথে চলতে থাকবে এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ও তারতম্য থাকবে না।

এভাবে দায়ি (দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারী) ও জিহাদকারীদের জন্য খোদায়ি যেই নিয়ম রয়েছে, তা শুরু থেকেই তিনটি নিগূঢ় রহস্যের দাবি করে—

প্রথম রহস্য : আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগির লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন ও নিঃশেষ করে দেওয়ার গুণ হাসিল করা মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা যথার্থই বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

> আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।[১৩৪]

দ্বিতীয় রহস্য : বন্দেগি ও দাসত্বের মাঝেই মুকাল্লাফ থাকা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুম পালনকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেওয়া। যেকোনো নারী-পুরুষ বিবেকসম্পন্ন, বয়ঃপ্রাপ্ত এবং সঠিক বিচার-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলেই সে আল্লাহ তায়ালার সকল হুকুম ও বিধানপালনের মুকাল্লাফ হয়ে যায়। তাই শরিয়তের যাবতীয় হুকুম পালন নিজের ওপর আবশ্যক করা, সমাজে সেগুলো প্রচার ও বিস্তারে যত কষ্ট ও নির্যাতন আসে, সব সহ্য করা এবং সকল কঠিন ও জটিল অবস্থায় ধৈর্য ধারণকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নেওয়া।

তৃতীয় রহস্য : সত্যবাদীদের সত্য আর মিথ্যুকদের মিথ্যা প্রকাশ। সমাজের মুসলিম নামধারী প্রত্যেকেই চামড়ার মুখে খাঁটি মুসলমানিত্ব এবং মনে আল্লাহর ভালোবাসা পোষণের দাবি করে ঠিকই; কিন্তু কার দাবি সত্য আর কার দাবি মিথ্যা—তা অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে বিপদ ও পরীক্ষায় ফেলা এমন দুটি দাঁড়িপাল্লা ও মাপকাঠি, যেগুলো সঠিকভাবে ও বিশুদ্ধ তরিকায় সত্যবাদী-মিথ্যাবাদীর মাঝে সহজেই পার্থক্য করে দেয়। বিপদাপদে যে সফল হবে, সে-ই প্রকৃত সত্যবাদী। আর যে বিফল হবে, সে-ই মিথ্যুক। আল্লাহর কথাই সত্য। তিনি বলেন—

الم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

> আলিফ লাম মিম। মানুষ কি মনে করে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ পরীক্ষা করা হবে না? অবশ্যই আমি

---

১৩৪ সূরা জারিয়াত, আয়াত : ৫৬

তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের।[১৩৫]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

তোমরা কি ভেবে রেখেছ, এমনি এমনি তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ এখনও আল্লাহ দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী এবং কারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারী?[১৩৬]

মোটকথা, বান্দাদের ব্যাপারে এটাই যখন আল্লাহ তায়ালার নিয়ম, তখন তা তো আর পরিবর্তিত হতে পারে না। উপরন্তু এই নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং সবার সাথেই এবং সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমনকি সৃষ্টির সেরাদের সেরা নবি-রাসুলগণের সাথেও। যেমনটি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

ঠিক এ কারণেই নবিজি সৃষ্টির সেরা এবং আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেও বিভিন্ন সময় দুঃখ-কষ্ট এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তাঁর পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণেরও একই ধারাবাহিকতায় কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকেও কঠিন বিপদ ও জটিল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমনকি কতক সাহাবি নির্যাতনের শিকার হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। কতক সাহাবি অসহ্যকর অত্যাচারের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেন। অথচ তাদের মর্তবা ও স্তর, সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে বহু বহু উঁচু। তবুও দুনিয়ার জীবনে তাদের নানা ধরনের এবং বহু রকমের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, এটাই আল্লাহ তায়ালার নীতি ও সুন্নাহ।

ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে মুসলিমদের ভোগ করা কষ্ট ও বিপদের হিসাব-নিকাশ যখন আমরা করি, তখন বুঝতে পারি—এসব কঠিন পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্ট কিছুই না যে, এগুলো একজন সাধক বা মুজাহিদকে তার চলার পথে বাধাগ্রস্ত করতে পারে; যেমনটি কেউ কেউ মনে করেন; বরং যেই পথিক ও মুজাহিদ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক এবং এই সফরে বের হয়ে চলতে থাকে, সে

---

১৩৫ সূরা আনকাবুত, আয়াত : ১-৩

১৩৬ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪২

তার চলার পথে এ ধরনের বহু কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদাপদের মোকাবিলা করেই চলতে থাকে।

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম যাকে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার মুকাল্লাফ ও বাধ্য বানিয়েছেন তাকে এই পথে অবশ্যই কিছু না কিছু বাধাবিপত্তির ঘাটি পেরোতেই হয়। এটাই নিয়ম। হক ও সত্যের পথে দুঃখ-কষ্ট এবং বাধাবিপত্তি থাকবেই। এ পথ কসুমাস্তীর্ণ ও মসৃণ নয়। কিছু লোক এসব বাধা ডিঙিয়ে যাবে আবার কিছু লোক জীবন উৎসর্গ করে দেবে। যে যতটুকু কষ্ট সইতে পারবে, সে গন্তব্যের ততটুকু কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

এ কারণেই যত কষ্ট ও দুর্দশাই আসুক না কেন, কোনো পরিস্থিতিতেই একেবারে নিরাশ ও হতাশ হওয়া এবং ভেঙে পড়া কোনো মুসলিমের উচিত নয়; বরং ইসলামের রীতি, স্বভাব ও প্রকৃতিই হলো—একজন মুসলিম হক ও সত্যের পথে চলতে গিয়ে সকল দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ, বাধাবিপত্তি এবং সর্বপ্রকার কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে এক আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা এবং প্রাণপণ সংগ্রাম ও সাধনা করে যাবে। আর সেসব দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ বলে মনে করবে। নিচের আয়াতে চিন্তা-ফিকির করলে এর স্বপক্ষে স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমরা কি ভেবে রেখেছ, এমনি এমনি তোমরা জান্নাতে চলে যাবে অথচ এখনও তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার সম্মুখীন হওনি? তারা কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদাপদ এবং ভয় ও শিহরনের মুখোমুখি হয়েছে। একপর্যায়ে তৎকালীন রাসুল ও তাঁর মুমিন সাথিরা বলতে বাধ্য হয়েছে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? শুনে নাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।[১৩৭]

১৩৭ সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৪

যারা ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে মোটামুটি অবগত; কিন্তু মনে করে, হকের পথে যেসব দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ আসে সেগুলো গন্তব্য ও আল্লাহর সাহায্য থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার আলামত ও লক্ষণ, তাদের আল্লাহ তায়ালা 'শুনে নাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে' বলে জবাব দিয়েছেন।

সেসব লোকের ধারণার খণ্ডন খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-এর ঘটনায় গিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তার পিঠে ছেক দেওয়াসহ নানা রকম জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে তিনি নবিজির কাছে এসব থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতির জন্য দুআর ফরিয়াদ জানালে নবিজির উক্তির ভাবার্থ ছিল—

> বিপদাপদে ধৈর্য ধরো। জুলুম-নির্যাতন সহ্য করো। গায়েবি মদত ও সাহায্যের অপেক্ষা করো। এই পথে যদি তুমি দুঃখ-কষ্ট দেখে ভয় পেয়ে যাও, বিপদাপদ দেখে ভড়কে যাও এবং এসব সহ্য করতে না পার, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো—এই রাস্তা এমনই; এবং যারা এক আল্লাহর একত্ববাদের প্রবক্তা ও বিশ্বাসী হয়, তাদের সাথে এমনটাই ঘটে। ব্যতিক্রম ঘটে না। তোমাদের আগে যত উম্মত অতিবাহিত হয়েছে, দ্বীনের রাস্তায়, ইসলামের পথে তাদেরও অসংখ্য-অগণিত কঠিন পরিস্থিতি ও মহাবিপদের ঘাট পার হতে হয়েছে। তাদের শরীরে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হতো। ফলে তাদের হাড় থেকে গোশত খসে খসে পড়ত। তবুও তারা ইসলামের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে যায়নি।
>
> এখন তোমরা যদি এসব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেখেই একেবারে হতাশ হয়ে যাও বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাও, তাহলে এটা কেবলই তোমাদের ধারণা। নতুবা সত্য ও বাস্তবতা তো হলো—ওইসব মহাবিপদ, মহাদুর্যোগ ও দুঃখ-কষ্টের চোখে চোখ রেখে সত্যকে আঁকড়ে থাকা এবং সত্যের পথে চলার দ্বারাই বিজয় ও সাহায্যের সাথে আলিঙ্গান করতে হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর এই দ্বীনকে বিজয় দান করবেন। এমনকি এই দ্বীনের বিজয়ের এমনই প্রভাব হবে যে, ইয়ামানের সানআ থেকে হাজরামাওত একা একা যাওয়ার পথে এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কিছুর ভয় থাকবে না। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তার ভেড়া বা বকরির পালের ওপর চিতাবাঘের হামলার আশঙ্কা থাকলেও নিজের ব্যাপারে থাকবে একেবারে শঙ্কামুক্ত।

এই হাদিসটিতে নবিজি (ইঙ্গিতাকারে) সুবিশাল রোম-পারস্য জয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। অথচ এগুলো বিজয় হয়েছে তাঁর ইন্তেকালের পর; কিন্তু তিনি এর খবর ও সুসংবাদ তখন দেন, যখন কয়েকজন মাত্র মুসলিম হয়েছেন। তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নেতৃত্বেই এসব সাম্রাজ্য বিজিত হওয়া ছিল তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও ইজ্জতের দাবি। অথচ ইতিহাস রচিত হয়েছে তাঁর অনুসারীর নেতৃত্বে বিজয় হওয়ার মধ্য দিয়ে। এর রহস্য বা ভেদ কী, তা কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন; কিন্তু সফলতা অর্জনের সূত্র ভিন্ন।

সাহাবায়ে কিরাম নবিজির জীবদ্দশায় (জাজিরাতুল আরব জয়ের মূল্য পরিশোধ করতে পারলেও) ইরাক-শামে বিজয় লাভের পুরোপুরি মূল্য আদায়ে সক্ষম হননি। অথচ সফলতা অর্জনে পূর্ণমূল্য পরিশোধ জরুরি ছিল। অন্যথায় সফলতা ধরা দিচ্ছিল না; যদিও স্বয়ং নবিজি ছিলেন তাদের মাঝে বিদ্যমান।

এখানে মনে রাখা উচিত, শহরের পর শহর জয় করাকে নবিজির নাম বা তাঁর নেতৃত্ব বা তাঁর তত্ত্বাবধানের সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি মূল নয়। কারণ, তিনি তো সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয়; বরং যারা মুসলিম হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে বাইয়াত হয়েছে, তারা বাইয়াতে সত্যবাদী এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার্থে খুশি ও আগ্রহের সাথেই তাঁর ফয়সালার ওপর প্রতিষ্ঠিত; এটা প্রমাণ করে দেখানোই আসল ও প্রকৃত বিষয়। আর এগুলোই বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য জরুরি। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতঃপর মারে এবং মরে।[১৩৮]

* * *

১৩৮ সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১

আপসের সব ব্যর্থ চেষ্টা

ইবনে ইসহাক থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

কুরাইশদের বিখ্যাত নেতা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব উতবা ইবনে রবিয়া একবার কুরাইশদের এক বৈঠকে বলল—ভাইয়েরা, তোমাদের কী মত বলো তো, আমি যদি কিছু প্রস্তাব নিয়ে মুহাম্মাদের কাছে যাই এবং তার সাথে আলাপ-আলোচনা করি, আর সেও রাজি হয়, তাহলে কেমন হয়?

কুরাইশরা বলল—কেন যাবে না! অবশ্যই, তুমি তাড়াতাড়ি যাও এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলো।

বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে উতবা নবিজির কাছে এসে মুখোমুখি বসে। সে বলা শুরু করে—ভাতিজা, তুমি তো জানো, বংশের লোকদের মাঝে তোমার মর্যাদা ও বংশীয় সম্মান সবার থেকে আলাদা; কিন্তু তারপরও তুমি লোকদের সামনে বড়ো বিপদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছ। তুমি ঐক্যের মাঝে বিভেদের ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছ। এবং শ্রদ্ধেয় মৃত বুদ্ধিজীবীদের নির্বোধ বলে অভিহিত করেছ। আমার কথা শোনো। আমি তোমার সামনে কিছু প্রস্তাব ও পরামর্শ রাখছি। সেগুলো নিয়ে তুমি চিন্তা-ফিকির করলে কিছু কিছু হয়তো সমর্থন করবে।

নবিজি বলেন—ঠিক আছে, আবুল ওয়ালিদ, বলো। আমি শুনছি।

সে বলল—ভাতিজা, যেই দ্বীনের দাওয়াতের কাজ তুমি শুরু করেছ, এর দ্বারা যদি তোমার সম্পদশালী হওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কথা দিচ্ছি—আমরাই তোমাকে এত অর্থকড়ি দেবো যে, তুমিই হবে আমাদের মধ্যে সর্বশীর্ষ

ধনী। অথবা তোমার দাওয়াতের দ্বারা যদি সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আশা করে থাকো, তাহলে বলো, আমরা নির্বাচন ও ইলেকশন ছাড়াই এককথায় তোমাকে আমাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মেনে নিতে রাজি আছি। এমনকি একটি কাজও তোমার অজান্তে বা তোমার স্বাক্ষর ব্যতীত হবে না।

আর যদি তোমার ওপর কোনো জিনের আছর পড়ে থাকে এবং তোমার মনে হয়, সেই আছর দূর করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে বলো—আমরা তোমার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ কবিরাজ (ডাক্তার) নিয়ে আসি। সে তোমার পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা লাভ পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাবে এবং সকল ব্যয়ভার আমরা বহন করব।

নবিজি বললেন—আবুল ওয়ালিদ, তোমার কথা শেষ হয়েছে?

আবুল ওয়ালিদ বলল—হ্যাঁ।

নবিজি বললেন, এবার আমার কথা শোনো—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم. تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ۝

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হা-মিম। পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই কুরআন। এটা এমন গ্রন্থ—যার আয়াতগুলো আরবি ভাষায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। এই গ্রন্থ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তবুও অধিকাংশ মানুষ বিমুখতা প্রদর্শন করেছে। ফলে তারা শোনে না। তারা বলে—তোমার আহ্বানকৃত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের অন্তর মোড়কবন্ধ। আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে অন্তরায়। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো, আমরাও আমাদের কাজে লিপ্ত। আপনি বলে দিন—আমিও

তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার কাছে এই মর্মে ওহি আসে যে, তোমাদের সকলের উপাস্য একজন। কাজেই তোমরা তাঁর অভিমুখেই দৃঢ় থাকো এবং (আপনি) তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য।[১৩৯]

নবিজি এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকলেন আর উতবাও মন্ত্রমুগ্ধ ও আত্মহারা হয়ে শুনতে থাকল। একপর্যায়ে নবিজি যখন ১৩ নম্বর আয়াতে পৌঁছেন, যার অর্থ হলো—

এরপরও তারা যদি বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহলে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের আদ-সামুদের বিধ্বংসী শাস্তির মতো শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি।

উতবা তখন নবিজির মুখ চেপে ধরে। তিলাওয়াত বন্ধ করতে বলে এবং আত্মীয়তার দোহাই দেয়। কারণ, এই আয়াতে প্রদত্ত ধমকিতে সে ভয় পেয়ে যায়। তারপর সে কুরাইশদের বৈঠকে ফিরে যায়।

সে বৈঠকে গিয়ে বসতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল—আবুল ওয়ালিদ, কী ব্যাপার? কী সুরাহা করে এলে, বলো?

তখন সে তাদের বলল—খোদার কসম! আজকে আমার কানে যেসব কথা ঢুকেছে, সেগুলো ইতঃপূর্বে আমি কখনো শুনিনি। সেগুলো কবিতাও না। জাদুমন্ত্রও না। আবার গণক বা জ্যোতিষী কথাবার্তাও না।

হে কুরাইশের লোকেরা, তোমরা যদি আমার কথা মানো এবং আমার পরামর্শের মূল্যায়ন করো, তাহলে তোমরা তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও। খোদার কসম! আমি তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা শুনেছি, সেগুলো সাধারণ কোনো কথা নয়; বরং অমর বাণী ও মহাসংবাদ। সেগুলো বাস্তবায়িত হবেই। আরবরা যদি তাঁর ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে তাঁর সাথে দ্বন্দ্ব নিরসনে অন্যরাই তোমাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট এবং তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। বিপরীতে সে যদি আরবের ওপর জয়লাভ করে, তাহলে তাঁর রাজত্ব মানে তোমাদেরই রাজত্ব এবং তাঁর ইজ্জত মানে তোমাদেরই ইজ্জত।

---

১৩৯ সূরা হামিম সিজদা, আয়াত : ১–৬

কুরাইশপ্রধানরা বলল—আবু ওয়ালিদ, খোদার কসম! সে তোমার ওপর জাদুমন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে।

সে বলল—আমার মত এটাই। এবার তোমাদের মর্জি।

ইমাম তাবারি ও ইবনে কাসিরসহ অন্যান্য সিরাত বিশেষজ্ঞ বর্ণনা করেন—

> ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা ও আস ইবনে ওয়ায়েলসহ মুশরিকদের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির কাছে আসে। তারা তাঁর সামনে কয়েকটি প্রস্তাবনা পেশ করে। বলে, আমরা তোমাকে এত ধনদৌলত ও অর্থকড়ি দেবো যে, তুমি আমাদের মধ্যে সর্বশীর্ষ ধনী হয়ে যাবে। এবং চিত্তাকর্ষক ও ষোড়শী কুমারী দুই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পার। তবে...
>
> সবকিছুর ক্ষেত্রে শর্ত একটাই—আমাদের দেবতা ও উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও দোষচর্চা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং আমাদের চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রচলিত সামাজিক প্রথার ওপর সমালোচনা ও দোষারোপ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

নবিজি স্পষ্টভাবে এসব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের প্রস্তাব অস্বীকার করেন। এরপর দাওয়াতের প্রাপ্ত দায়িত্বে লেগে থেকে তাদের দাওয়াতগ্রহণে পীড়াপীড়ি করলে তারা বলে—

> ঠিক আছে, আমরা আরেকটি প্রস্তাব দিই : একদিন তুমি আমাদের দেবতাদের উপাসনা করবে, আরেক দিন আমরা তোমার রবের ইবাদত করব।

তখন নবিজি তাদের এই ফালতু প্রস্তাব তাদের দিকেই ছুড়ে মারেন এবং তাদের আবোল-তাবোল কথাকে স্পষ্ট করতে গিয়েই নাজিল হয়—

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

> আপনি বলে দিন, হে কাফির সমাজ, তোমরা যেগুলোর ইবাদত করো, আমি সেগুলোর ইবাদত করি না। আবার আমি যার ইবাদত করি, তোমরা

তাঁর ইবাদত করো না। তোমরা যেগুলোর ইবাদত করো, আমি সেগুলোর ইবাদত কখনোই করব না। আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদত করো না। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য।[১৪০]

কুরাইশরা উতবার মতো দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালায়। নেতৃস্থানীয় সবাই দ্বিতীয়বার একজোট হয়ে নবিজির কাছে এসে আগের মতো ধনদৌলত ও নেতৃত্ব-রাজত্ব—এসবেরই লোভ দেখায়। পাশাপাশি এ কথাও বলে—

তোমার ওপর যদি জিন-ভূতের কোনো আছর পড়েছে বলে মনে করো, তাহলে বলো, আমরা সেটার চিকিৎসা করিয়ে দিই।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে নবিজি বলেন—

তোমাদের যা খুশি বলতে পারো। আমি কোনো রোগী নই। তোমাদের কাছে ধনদৌলত, নেতৃত্ব-রাজত্ব ভিক্ষা করতে আমি আসিনি; বরং আল্লাহ তায়ালা রাসুল হিসেবে আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিই আর জাহান্নামের ভয় দেখাই। সুতরাং আমি তোমাদের আমার রবের বার্তা এবং সঠিক উপদেশ পৌঁছে দিয়েছি। এখন যদি তোমরা সত্য বার্তা কবুল করে নাও, তাহলে তা তোমাদের দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। আর যদি একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা, তাতে আমি ধৈর্যধারণ করব। তোমাদের শাসাতে থাকব। এভাবে একসময় আল্লাহ আমার এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন।

কুরাইশরা বলে—

তুমি যদি আমাদের কোনো প্রস্তাব কবুল না করো, তাহলে তুমি তো ভালোই জানো, আমাদের এই এলাকা খুবই সংকীর্ণ এবং অনেকটা বসবাস অযোগ্য। এখানে পানির কত অভাব। আমাদের জীবনধারণ কতটা মুশকিল ও কষ্টকর। কাজেই তোমার দাবি অনুযায়ী তোমার যেই রব তোমাকে নবি বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে আবদার করো, তিনি যেন এই শক্ত ও পাথুরে পর্বতমালাকে সরিয়ে দেন। শাম-ইরাকের মতো

---

১৪০ সূরা কাফিরুন আয়াত : ১-৬

এখানেও আমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করেন। আমাদের পরলোকগত বাপ-দাদাদের আবার জীবিত করে দেন এবং তাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাবকে অবশ্যই লাগবে। কারণ, তিনি বড়ো সত্যবাদী ছিলেন। তাই তাকে আমরা তোমার আনীত এই পয়গাম ও বার্তার বিষয়ে জিজ্ঞেস করব, এগুলো সত্য না মিথ্যা? এবং তুমি তোমার রবের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে আলিশান অট্টালিকা, মনোরম উদ্যান ও সোনা-রুপার খনি দান করেন। যেন তুমি এই ফকিরি জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বাদশাহি জিন্দেগি লাভ করো।

আমরা তোমার কাছে যা যা আবদার করেছি, তুমি যদি সেগুলো ঠিক ঠিক করে দেখাতে পারো, তাহলে আমরা তোমার সত্যায়ন করব এবং আল্লাহর দরবারে তোমার যেই মর্যাদা ও মর্তবা, তাও আমাদের জানা হবে যে, তিনি তোমাকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

এই আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে নবিজি স্পষ্ট জানিয়ে দেন—

আমি কখনোই এমন করব না এবং আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে কোনো দুআ-প্রার্থনাও করব না।

তারপর কুরাইশরা দীর্ঘ আলাপচারিতা শেষ করে নবিজিকে বলে—

নিঃসন্দেহে আমরা জানতে পেরেছি, ইয়ামামার 'রহমান' নামক এক লোক তোমাকে সব শিখিয়ে দেয়; কিন্তু আমরা তো কখনো ওই রহমান নামক লোকের ওপর ঈমান আনব না। আর মুহাম্মাদ, আমরা আমাদের এই অপারগতা প্রকাশ করছি। এবং খোদার কসম! আমরা তোমাকে ছাড়ব না। হয়তো তুমি মরবে অথবা আমাদের শেষ করবে। এসব হুমকি-ধামকি দিয়ে তারা উঠে চলে যায়।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির জীবনীর এই পর্বে তিনটি হিকমত (নিগূঢ় রহস্য) রয়েছে । এবং তিনটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে আমরা সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব—

প্রথম হিকমত

নবিজির জীবনীর এই অংশে গভীর চিন্তা-ফিকির ও ভাবনার পরে তাঁর দাওয়াতি মিশনের আসল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সাথে সাথে স্পষ্ট হয় বর্তমান সময়ে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনাকারী ও ইসলামি আন্দোলনের দাবিদারদের মনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও।

নবিজি কি তাঁর সংগ্রাম মুখর দাওয়াতি কার্যক্রমের আড়ালে রাজত্ব বা নেতৃত্ব কামনা করেছেন? নাকি পদ বা ধনদৌলত লাভের প্রত্যাশী ছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ) নাকি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে ওইসব ধ্যানধারণা সমাজে ছড়িয়েছেন?

এগুলো খাঁটি মুসলিমদের কাছে অনর্থক চিন্তা হলেও এমন কিছু সম্ভাবনা, যেগুলোকে ইসলামের শত্রু ও ইসলামের বিপক্ষীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডাররা ঠিকই রংঢং মাখিয়ে মানুষের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পেশ করে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল ও হাবিবের জীবনকে এত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ভেদ ও রহস্যে ভরপুর করে রেখেছিলেন এবং তাঁর নবির জীবনকে এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন চাক্ষুষ প্রমাণ ও ঘটনাবহুল করেছিলেন, যেগুলো সর্বপ্রকার সন্দেহ ও সব ধরনের সম্ভাবনার শিকড় উপড়ে ফেলেছে এবং সব রকমের কুমন্ত্রণার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। যে কারণে ইসলামের বিপক্ষীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডাররা তাদের উগড়ে দেওয়া সকল ষড়যন্ত্রে বিফল ও ব্যর্থ। আর তাদের মাথায় ধরে না, তাদের আর কী করণীয় আছে?

কুরাইশদের মনে নবিজির নবুয়ত নিয়ে ছিল হাজার রকমের সন্দেহ ও সংশয়। এ নিয়ে তারা নবিজির সাথে প্রাইভেট এবং কমিটি—দুই ধরনের মিটিংই করেছে।

এতে আল্লাহ তায়ালার অনেক বড়ো রহস্য লুকানো ছিল। কারণ, কুরাইশরা সন্দেহ পোষণ করলেও নবিজির দাওয়াত ও রিসালাতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভালো করেই জানত। তারা জানত, তিনি তাদের কোনো লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণের লোক নন; কিন্তু এতে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে ও পরবর্তীকালে ইসলামের দুশমন এবং দ্বীনের বিপক্ষে সন্দেহ সৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই পরিচালনাকারীদের ইতিহাস যেন সর্বযুগে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে যে, নবিজিকে নিয়ে তাদের উদ্ভাবিত সন্দেহ ও সংশয় সবই সম্পূর্ণ ভুল ও বানোয়াট।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডের অধীনে স্যামুয়েল নোয়াহ ক্র্যামার[১৪১] ও জেরলফ ভ্যান ভ্লোটেন[১৪২] এক দীর্ঘ গল্প প্রসব করেছে। রাতদিন একাকার করে জালিয়াতি ও ভিত্তিহীন অলীক কথা উগরে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা ও তদবির তারা চালিয়েছে; কিন্তু তবুও সন্দেহ ঢোকানো এবং ষড়যন্ত্রের মেশিনে তাদের হাতে কিছুই ধরা পড়েনি; বরং শেষ পর্যন্ত তারা সত্য ও বাস্তবতা এড়িয়ে চোখ বন্ধ করে পাগলের প্রলাপ বকে গেছে—(নাউজুবিল্লাহ)—

> নবি মুহাম্মাদ তার দাওয়াতি কার্যক্রমের আড়ালে রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভের আশায় ছিলেন!

এরা তো উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শকুন। এদের বহু আগে উতবা ইবনে রবিয়া ও তাদের সমমনা লোকদের থেকেও আল্লাহ তায়ালা এই কাজটাই নিয়েছেন। তারা নবিজির সামনে সেসব প্রস্তাব ও অফারই পেশ করে, যেন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সেগুলো গ্রহণ করে নেন। তিনি গ্রহণ করে নিলে কুরাইশরা তার অনুসারী হয়ে যেত। তাঁকে এবং তাঁর সাহাবিদের কষ্ট ও নির্যাতনের সকল প্ল্যান-প্রোগ্রাম বর্জন করত; কিন্তু তিনি কি তা-ই করেছিলেন? বরং যদি তাঁর রিসালাত ও দাওয়াতের আড়ালে এসব দৃঢ় বিষয়ই থাকত, তাহলে তিনি এই সুযোগকে গনিমত মনে করে কেন নম্রতা ও নমনীয়তার আচরণ করেননি?

আচ্ছা, বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করা যাক—কেউ রাজত্ব ও নেতৃত্ব কামনা করে। তার জাতি ও এলাকাবাসী তাকে সেই অফারও দিচ্ছে এবং আপসচুক্তির আকারে তার কাছে সমর্পণ করছে। এই অফার গ্রহণের বিনিময়ে মান-সম্মান ও ইজ্জত-

---

১৪১ স্যামুয়েল নোয়াহ ক্র্যামার (shemuel Noah cremer : ১৮৯৭-১৯৯০) একজন ঐতিহাসিক। সুমেরি সভ্যতার গবেষণায় তিনি কাজ করেছেন।

১৪২ জেরলফ ভ্যান ভ্লোটেন (Gerlof van Vloten :1866–1903) একজন প্রাচ্যবিদ। *মাফাতিহুল উলুম* আরবি বিশ্বকোষ তার হাতে সম্পাদিত।

মর্যাদা সব, সবই দেওয়ার গ্যারান্টিও দিচ্ছে। উলটো এই অফার অস্বীকারে নানা রকম হুমকি-ধামকিও দিচ্ছে। এত কিছুর পরও কি সেই লোক তাদের বলতে পারে—

> আমি যেই সত্যের বাণী নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, তার বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে ধনদৌলত ইত্যাদি কিছুই চাই না। আমি তোমাদের থেকে মান-সম্মান-ইজ্জতও চাই না। তোমাদের রাজা বা রাষ্ট্রপতিও হতে চাই না; বরং আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তোমাদের সুসংবাদ শোনানো ও ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা যদি আমার এই বার্তা কবুল করে নাও, তাহলে তা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম অংশ হবে। আর যদি তোমরা একে প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা, তাতে আমি ধৈর্যধারণ করব এবং আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর ফয়সালার আগপর্যন্ত তোমাদের শাসাতে থাকব।

নবিজির সামাজিক জীবন ও তার জীবনযাপনের পদ্ধতি তার এই উক্তিমাফিকই ছিল। এমন ছিল না যে, বড়ো মুখে সবার সামনে নেতৃত্ব ও রাজত্ব একবাক্যে অস্বীকার করেছেন; কিন্তু তলে তলে সেগুলো অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর খাবারদাবার খুবই সাধারণ ও সাদাসিধে ছিল। তাঁর সামাজিক জীবন ফকির-মিসকিনদের চেয়ে উন্নত ছিল না।[১৪৩]

ইমাম বুখারি রহ. আম্মাজান আয়িশা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

> নবিজির ইন্তেকালের সময় আমার ঘরের ছোটো সেলফ-এ অল্প কিছু যব ছিল। এ ছাড়া খাওয়ার আর কিছুই ছিল না। শেষমেশ ওই অল্প যবই কিছুদিন পর্যন্ত খাই।

ইমাম বুখারি রহ. আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

---

১৪৩ নবিজি এই দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন অবলম্বন করেছেন আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে। এমন নয় যে, আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে এ অবস্থায় রাখতে চেয়েছেন; বরং নিজেই তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। সূত্র : *ফাতহুল বারি।*

> নবিজি সারাজীবন (আয়েশি ও সম্পদশালীদের ব্যবহৃত বিশেষ) দস্তরখানে খাবার খাননি এবং তিনি জীবনে কখনো চাপাতি (পাতলা, মিহি ও সফট) রুটি খেয়ে দেখেননি।

অনুরূপ তিনি পোশাক-আশাক ও ঘরের জিনিসপত্রের ব্যাপারেও খুবই সাদামাটা এবং একেবারেই হালকা আয়োজনের পথ অবলম্বন করেছেন। তিনি খেজুরের চাটাই বা পাটিতে বিশ্রাম নিতেন। ফলে তাঁর বরকতময় পিঠে চাটাইয়ের স্পষ্ট ছাপ ও দাগ পড়ে যেত এবং কখনো আরামদায়ক বিছানায় শোয়া পছন্দ করতেন না।

একবার আম্মাজান আয়িশা রা.-সহ সকল স্ত্রী একসাথে নবিজির কাছে এসে অভাবের অভিযোগ তোলেন এবং সবাই মিলে ভরণপোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ও বিলাসসামগ্রীর বাজেট বৃদ্ধির আবদার করেন; যেন সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীদের থেকে তাদের অবস্থা ভালো ও উন্নত দেখায় এবং তাদের মর্যাদা বেশি থাকে; কিন্তু একপর্যায়ে তাদের এই আবদারের পরিপরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন—

> يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا[১৪৪]

> হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দেন—যদি তোমরা পার্থিব জগৎ এবং এর বিলাসিতার প্রত্যাশী হয়ে থাকো, তবে আসো, আমি তোমাদের সম্পদ ও ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং তারপর অতি উত্তমভাবে তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ও আখিরাত কামনা করো, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের সৎকর্মশীলদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাপ্রতিদান।

নবিজি আয়াত দুটি তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন। মহান আল্লাহর ফরমান শুনিয়ে তিনি তাদের ইচ্ছাধিকার দেন—ইচ্ছা হলে তাঁর চাহিদা মোতাবেক এই দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থায় তাঁর সঙ্গ দিতে পারে। আর না চাইলে এবং বেশি ভরণপোষণ,

---

১৪৪ সূরা আহজাব, আয়াত : ২৮-২৯

সৌন্দর্য-সজ্জার জিনিসপত্র এবং ধনসম্পদের পীড়াপীড়ি করলে তিনি তাদের মুক্তি দিয়ে দেবেন এবং উত্তমভাবে ছেড়ে দেবেন। এই অপ্রীতিকর ও ভীতিকর কথা শুনে সব স্ত্রী দ্বিতীয় কোনো পথ না খুঁজে তাঁর সাথেই এই সাদাসিধে জীবন কাটাতে একবাক্যে সম্মতি জানান।[১৪৫]

এত সব বিবরণ ও বর্ণনা থাকার পরও একজন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান লোকের মনে তাঁর সততার ব্যাপারে সন্দেহ জাগতে পারে? বা কীভাবে কারও ধ্যানধারণায় আসতে পারে, তিনি রাজত্ব-নেতৃত্ব বা ধনদৌলতের লোভী ও প্রত্যাশী ছিলেন?

নবিজির জীবনের এসব ঘটনাপ্রবাহ সুস্পষ্ট সাক্ষী, তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম পুরোপুরি ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ছিল। এতে দুনিয়াবি কোনো চাহিদা বা লোভ-লালসার লেশমাত্রও ছিল না।

দ্বিতীয় হিকমত

এই আলোচনা থেকে ওই 'হিকমত'-এর অর্থ স্পষ্ট হয়, যেই অর্থ নবিজি বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করেছেন। দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনায় যেকোনো প্রকারের বা যেকোনো অবস্থার তদবির ও কৌশল অবলম্বনের নামই কি হিকমত? নিজের উদ্দেশ্য হাসিলে যেকোনো পথে চলা বা যেকোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা, যদিও তার লক্ষ্য ঠিক ও বিশুদ্ধ হোক না কেন, শরিয়তপ্রণেতা কি তার অনুমতি কাউকে দিয়েছে?

এর সুস্পষ্ট উত্তর হলো—না।

ইসলামি শরিয়ত মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গন্তব্য যেভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই গন্তব্যে পৌঁছার মাধ্যম ও উপায়-উপকরণও সুনির্দিষ্ট ও বরাদ্দ করে দিয়েছেন। শরিয়ত সবার ওপর আবশ্যক করে দিয়েছে—আল্লাহ তায়ালার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে (কুরআন-সুন্নাহয়) বর্ণিত ও নির্ধারিত পথ ও পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। হিকমত ও তদবিরের বিভিন্ন ও গ্রহণযোগ্য একাধিক অর্থ রয়েছে; কিন্তু কেবল এগুলোই বৈধ ও শরিয়তসম্মত উপায় ও মাধ্যমের সীমারেখা।

উপর্যুক্ত ঘটনাগুলোই এর প্রমাণ। হিকমত ও তদবিরের ক্ষেত্রে এই কল্পনা বা চিন্তা করাও যেতে পারে যে, রাজত্ব ও নেতৃত্ব লাভ এবং মনে মনে পরবর্তী সময়ে এই

---

১৪৫ সূত্র : *সহিহ বুখারি* / বিস্তারিত জানতে *তাফসিরু ইবনি কাসিরসহ* অন্যান্য তাফসিরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

রাজত্ব ও নেতৃত্বকে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার শক্তিশালী মাধ্যম বানানোর দৃঢ় প্রত্যয় করে নেওয়ার শর্তেও তো নবিজি আপস ও মীমাংসা করতে পারতেন। বিশেষ করে যখন শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তৃত্ব হাসিল হয়, তখন তিনি প্রজাদের দিয়ে যেকোনো কাজ করাতে সক্ষম হন। (সেহেতু তিনিও প্রথমে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে তারপর সরকারি ও রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন জারি করে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে পারতেন।) আর সকলের মনে রাখা উচিত—বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শের আহ্বায়করা কিন্তু শাসনদণ্ড হাতছাড়া করতে রাজি নয়; যেন শাসনের মুগুর দেখিয়ে নিজেদের চিন্তাধারা ও মতবাদ গ্রহণে সবাইকে বাধ্য করতে পারে। সুতরাং নবিজিও কি তা-ই করতে পারতেন না?

কিন্তু না। নবিজি এই হিকমতে আমলি (রাষ্ট্রদর্শন) ও দাওয়াতের এই মাধ্যম পছন্দ করেননি। কারণ, এটা সরাসরি দাওয়াতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।[১৪৬]

এ ধরনের রীতিনীতিকে যদি বিশুদ্ধ হিকমত ও সঠিক কৌশলের প্রকারভুক্ত বলা হয়, তাহলে সত্যবাদীর সত্য এবং মিথ্যুক ধোঁকাবাজের ধোঁকা ও মিথ্যার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। অনুরূপ মুখলিস দায়ি আর মিথ্যুক ধোঁকাবাজকে এই হিকমত ও কৌশলের নামে এক পথের যাত্রী মনে হবে।

এই দ্বীন ইসলাম ও শরিয়তে মুহাম্মাদির দর্শন মাধ্যম ও লক্ষ্য গ্রহণে উৎকর্ষ ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্য যেভাবে সততা, উৎকর্ষ ও হকের বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত সঠিক হতে পারে না, ঠিক সেভাবে ওই লক্ষ্য পর্যন্ত উপনীতকারী মাধ্যমকেও সততা, শরিয়ত ও হকের বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এ থেকে বোঝা যায়—দায়িদের অধিকাংশ অবস্থায়ই কুরবানি ও জিহাদ (ত্যাগ ও সংগ্রাম)-এর প্রয়োজন হয়। কারণ, তাদের অনুসৃত পথ তাদের মন খুশিমতো ডান-বামে চলতে দেয় না।

এই চিন্তা নিতান্তই ভুল ও বেঠিক যে, দাওয়াতের কাজে হিকমত অবলম্বনের উদ্দেশ্য হলো—এই কাজকে সহজ ও কষ্টহীন করা বা দায়িকে দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখা; বরং উদ্দেশ্য হলো—এমন কিছু কৌশল ও টেকনিক গ্রহণ করা, যেগুলো মানুষের বিবেকের খুবই ঘনিষ্ঠ। এর অর্থ, যখন অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হবে এবং

---

১৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ক্ষুরধার লেখক জনাব মওদুদি সাহেবের চিন্তা ও দর্শন ছিল অনুরূপ।

দাওয়াতের পথে বিদ্বেষ ও হঠকারিতার নানা প্রাচীর দাঁড় করানো হবে তখন হিকমত হলো—জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জানমাল উৎসর্গের জন্য তৈরি হওয়া। আর বাকি সময় হিকমত হলো—প্রতিটি বিষয়কে যথাস্থানে রাখা। অর্থাৎ যেই কাজ যখন প্রয়োজন, সেটাকে তখন করা। এই হলো হিকমত ও ধোঁকাবাজির মাঝে পার্থক্য এবং অনুরূপ হিকমত ও আপসের মাঝেও এটাই পার্থক্য।

পাঠকের জানা আছে, একবার নবিজির দরবারে কয়েকজন কুরাইশ নেতা আসে এবং ইসলামকে বুঝতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নবিজি তখন খুশিমনে পুরোপুরি তাদের প্রতি মনোযোগ দেন। তাদের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন হোন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে তাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। তাদের ইসলামের স্বরূপ বোঝাতে থাকেন। এমতাবস্থায় একজন অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবিজির তালিমের আওয়াজ শুনে তিনিও দাঁড়িয়ে যান এবং এক-দুইটি প্রশ্ন করেন। নবিজি যেহেতু কুরাইশদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করছিলেন, তাই অন্ধ সাহাবির কথাকে গুরুত্ব দেননি; এই চিন্তায় যে, তার জিজ্ঞাসার উত্তর পরেও দেওয়া যাবে। আপাতত কুরাইশদের সাথে আলোচনা শেষ হোক; কিন্তু এই সামান্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই আচরণকে তিরস্কার করে নাজিল করেন—

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝

> সে ভ্রু কুঁঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। তাঁর কাছে একজন অন্ধ এসেছে (বলে)।[১৪৭]

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা চলাকালে অন্ধ সাহাবির জিজ্ঞাসাকে গুরুত্ব না দেওয়ার ব্যাপারে নবিজি যেই ইজতিহাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেননি। যদিও বিষয়টি কিন্তু তেমন বড়ো কিছু নয়।[১৪৮] কারণ, তিনি তখন তাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। (অর্থাৎ প্রাপ্ত দায়িত্বই পালন করছিলেন।) কিন্তু তারপরও এই

---

১৪৭ সূরা আবাসা, আয়াত : ১ ও ২

১৪৮ নবি-রাসুলকে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির আদর্শ ও অনুসরণীয় বানিয়ে পাঠাতেন। তাই তাঁরা মাটির মানুষ হলেও তাঁদের নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ রেখেছেন। তবে মানবত্যের কারণে কখনো কোনো বিষয়ে তাঁদের থেকেও চিন্তা ও গবেষণাগত ভুল স্বাভাবিকভাবে হয়ে গেছে। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'ইজতিহাদি খাতা' বলে। আল্লাহ তায়ালার সংবিধানে মানুষের এই ইজতিহাদি ভুল ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু মওদুদি সাহেব নবিগণের এই ক্ষমাযোগ্য ভুলকেও সাধারণ মানুষের পাপের সমপর্যায়ের গণ্য করে বিভ্রান্তির পথ মাড়িয়েছেন। (দারুল ইফতা অনলাইন : দেওবন্দ) [অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

উপেক্ষা যেহেতু একজন মুসলিমের মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে, তাই আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতের কাজে এ ধরনের ছোটো ও সামান্য বিষয় থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, নবিজি মুশরিকদের মন খুশির লক্ষ্যে অন্ধ সাহাবিকে এড়িয়ে যান। এতটুকুও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা : হিকমত ও নসিহতের নাম দিয়ে ইসলামের বিধিবিধান ও মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন ও বদল বা ইসলামের দণ্ডবিধির সীমালঙ্ঘন বা দণ্ডবিধিকে গুরুত্বহীন মনে করা কোনো মুসলিমের জন্য অনুমোদিত নয়। কারণ, যেসব হিকমত ও কৌশল ইসলামের বিধিবিধান, দণ্ডবিধি ও উত্তম চরিত্রের আওতাভুক্ত, সেগুলোই শুধু শরিয়তে গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় হিকমত

কুরাইশরা যখন দাওয়াতের কাজ বাদ দেওয়ার শর্তে নবিজিকে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করে এবং নবিজিকে রাজত্ব ও নেতৃত্বের লোভ দেখায়, তখন নবিজি তাদের জবাবে যেই দিক অবলম্বন করেছেন, তাতে আমাদের জন্য বহু শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। নবিজি এই অবস্থান আল্লাহ তায়ালার খালেস সাহায্য ও সমর্থনে অবলম্বন করেছেন। সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এই প্রেক্ষাপটেই নিচের আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

আর কাফিররা বলে—আমরা তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য ঝরনা প্রবাহিত করবে অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙুরের কোনো উদ্যান তৈরি হবে; যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত করবে। অথবা তোমার কথানুযায়ী তুমি আমাদের ওপর আসমানকে টুকরো টুকরো করে পতিত করবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সরাসরি আমাদের সামনে হাজির

করবে। অথবা তোমার জন্য একটি স্বর্ণমহল নির্মিত হবে। অথবা তুমি আকাশে উঠে যাবে; বরং তুমি আকাশে উঠে গেলেও আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের ওপর কোনো কিতাব নাজিল করাবে। আপনি বলে দিন—আমার রব চির পবিত্র। আমি তো একজন মানুষ, প্রেরিত রাসুল।[১৪৯]

কুরাইশদের প্রার্থনা মোতাবেক দুনিয়াবি ধনসম্পদ না পাওয়ার কারণ এই ছিল না যেমনটি কেউ কেউ মনে করে যে, নবিজিকে কুরআন ছাড়া আর কোনো মুজিজাই দান করা হয়নি। ফলে মুজিজাস্বরূপ কুরাইশদের প্রার্থনাও পূরণ হয়নি।

এই ধারণা একেবারেই ভুল; বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অগণিত মুজিজা দান করেছেন। কুরাইশদের তাদের প্রার্থনামাফিক দুনিয়াবি চাহিদা পূরণ না করার আসল কারণ হলো—আল্লাহ তায়ালা খুব ভালো করেই জানতেন যে, ওরা এসব আবদার করছে কুফরি ও হঠকারিতাবশত এবং ঠাট্টা ও তামাশার ছলে। যেমনটি তাদের প্রার্থনার ধরন ও ভঙ্গিমা থেকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার।

এতে যদি তাদের সত্যিকারের আবেদন, নেক নিয়ত এবং বাস্তবেই ইসলাম গ্রহণের সদিচ্ছা থাকত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের আবেদন মঞ্জুর করতেন এবং তাদের জীবনোপকরণে পরিবর্তন আনতেন। আরব মরুভূমিকে নদী-নালা-ঝরনা দিয়ে ভরপুর করে দিতেন; কিন্তু তাদের আচরণ ও আবদার ছিল পুরোপুরি নিচের আয়াত মোতাবেক। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۝

এদের সামনে যদি আকাশের কোনো দরজাও খুলে দিই এবং এরা তাতে আরোহণে লেগে থাকে, তারপরও এ কথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে। না, বরং আমরা জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।[১৫০]

* * *

১৪৯ সূরা ইসরা (আম্বিয়া), আয়াত : ৯০-৯৩

১৫০ সূরা হিজর, আয়াত : ১৪-১৫

অর্থনৈতিক বয়কট

যখন আটকানো গেল না

মুসা ইবনে উকবা রহ.[১৫১] ও ইবনে ইসহাক প্রমুখ থেকে বিভিন্ন সূত্রে একাধিক বর্ণনায় আছে, কুরাইশ কাফিররা নবিজিকে তাদের টোপ গেলাতে ব্যর্থ হলে রাগে-ক্ষোভে নবিজিকে মেরে ফেলতে একজোট হয়। এ সিদ্ধান্ত তারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে জানালে দুই গোত্র নবিজিকে তাদের হাতে তুলে দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। কুরাইশ কাফিররা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে বিফল হয়ে এবার নতুন চাল চালে। নবিজি, সাহাবায়ে কিরাম আর বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের যারাই নবিজির সমর্থক বলে তাদের জানা ছিল, তাদের সবার বিরুদ্ধে বয়কট ও একঘরকরণের ফন্দি আঁটে। এ ব্যাপারে তারা একটি অঙ্গীকারনামা (Phonetic) লেখায়। সকল মুশরিক এতে সম্মতি প্রকাশ করে। অঙ্গীকারনামায় চারটি ধারা লেখা ছিল, ধারাগুলো নিম্নরূপ—

- ✓ **ধারা : ১.** তাদের সাথে বিয়ে-শাদি ও সব রকম সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ।
- ✓ **ধারা : ২.** তাদের সাথে সব ধরনের লেনদেন নিষেধ।
- ✓ **ধারা : ৩.** তাদের ক্ষুধা-পিপাসায় খাবার-পানির ব্যবস্থা করা বা ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা নিষেধ।

---

১৫১ আবু মুহাম্মাদ মুসা ইবনে উকবা কুরাইশি রহ. (মৃত্যু : ১৪১ হি.)। বিখ্যাত তাবিয়ি। বিশ্বস্ত হাদিসবিশারদ। বিশিষ্ট ইতিহাসশাস্ত্রজ্ঞ। নবি-জীবনের যুদ্ধসংক্রান্ত প্রথম *মাগাজি* গ্রন্থ রচয়িতা।

✓ **ধারা : ৪.** তাদের সাথে যেকোনো সন্ধিচুক্তি, সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ বা নমনীয়তা প্রদর্শন সবই নিষেধ।

বনু মুত্তালিব যতক্ষণ মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে না দেবে, ততক্ষণ এসব নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। এবং ততক্ষণ এই বয়কট চুক্তি ও অবরোধ কর্মসূচিও কঠোরভাবে কার্যকর ও পালিত হবে।

লেখা শেষে অঙ্গীকারনামাটি তারা (ভাঁজ করে) খানায়ে কাবার মাঝখানে ঝুলিয়ে দেয়। কুরাইশরা তিন বছর যাবৎ এই বয়কট চুক্তির ওপর অটল থাকে। এই দীর্ঘ দুরবস্থা ও দুঃসময়ের সূচনা হয় নবুয়তের সপ্তম বছরে এবং সমাপ্তি হয় দশম বছরে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের এই বয়কট ও অবরোধ কর্মসূচি দুই বছর ছিল। মুসা ইবনে উকবার বর্ণনা থেকে পরিষ্কার—

> এই অঙ্গীকারনামা সাহাবায়ে কিরামকে হাবশায়[১৫২] হিজরতের নির্দেশ প্রদানের আগে লেখা হয়। নবিজি বয়কটকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরামকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

তবে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত—বয়কট চুক্তি উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ এবং হাবশায় সাহাবায়ে কিরামের হিজরতের পরে লেখা হয়।

নবিজি, সাহাবায়ে কিরাম এবং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবসহ জানাশোনা সকল মুসলিমকে শিয়াবে আবু তালিবে বয়কট ও অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। স্মর্তব্য, মক্কায় বিভিন্ন নামের একাধিক ঘাঁটি ছিল।

শিয়াবে আবু তালিবে সাহাবায়ে কিরামের সাথে বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিম ছাড়া আরও কিছু কাফিরও অবরুদ্ধ ছিল। মুসলিমদের দোষ তো ছিল মুসলিম হওয়া, আর কাফিরদের অপরাধ ছিল মুসলিমদের সহযোগিতা করা। তারা স্বগোত্র ও গোষ্ঠীর খাতিরে নবিজির সাথে ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ থাকাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়। বনু হাশিমের আবু লাহাব ও আবদুল উজ্জা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শুধু বাইরে থাকে; বরং তারা অন্যান্য কুরাইশ কাফিরদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে।

---

১৫২ হাবশা। আধুনিক ও বর্তমান নাম ইথিওপিয়া। রাজধানী আদ্দিস আবাবা। লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন হাবশা ভেঙে বর্তমানে কয়েকটি দেশে পরিণত হয়েছে। বর্তমান হাবশার উত্তরে ইরিত্রিয়া ও উত্তর পশ্চিমে সুদান। দক্ষিণে কেনিয়া। পূর্বে জিবুতি ও সোমালিয়া। আর পশ্চিমে দক্ষিণ সুদান।

নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে বয়কটের তিনটি বছর খুবই কঠিন অবস্থা ও নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে কাটান। এই অসহ্যকর ও কঠিন পরিস্থিতিতে খাদ্যাভাবের কারণে সাহাবায়ে কিরামকে গাছের পাতা ও শুকনো চামড়া পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

সুহাইলি[১৫৩] রহ. উল্লেখ করেন—

যখনই কোনো বণিক দল মক্কায় আসত, তখন কোনো সাহাবি খাদ্যদ্রব্য কিনতে বাজারে ঢুকলে আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বলতে থাকত—হে ব্যবসায়ীরা, তোমাদের কাছে মুহাম্মাদের অনুসারীরা এলে চড়া দাম বলবে। যাতে ওরা কিনতে না পারে। ব্যবসায়ীরাও এই নেতার চামচামি করে কয়েক গুণ দাম বাড়িয়ে বলত। ফলে সাহাবায়ে কিরাম শূন্যহাতে ফিরে যেতেন। এমতাবস্থায় ছোটো ছোটো শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠত এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকত। তবুও তাদের কিছুই করার ছিল না। নিষ্পাপ সন্তানদের মুখে তুলে দেওয়ার মতো কিছুই তাদের হাতে উঠত না।

দিন-সপ্তাহ করে অপেক্ষা করতে করতে একসময় তিন তিনটা বছর অতিবাহিত হয়। বনু কুসাইয়ের কিছু লোক কুরাইশদের নিন্দা জানায় এবং এই অমানবিক চুক্তি ভঙ্গের জোর তাগিদ দেয়। ওদিকে আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকারপত্রে উইপোকা লাগিয়ে দেন। উইপোকা অঙ্গীকারপত্রটি এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, শুধু আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম ছাড়া আর একটা অক্ষরও বাকি থাকে না। অঙ্গীকারপত্রের এই দশার কথা নবিজি চাচা আবু তালিবকে জানিয়ে দেন। আবু তালিব জিজ্ঞেস করেন—তোমার রব কি তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছেন?

নবিজি জবাব দেন—হ্যাঁ।

আবু তালিব জবাব শুনেই কুরাইশদের সভায় উপস্থিত হয়ে বলেন, আনো তোমাদের সেই অঙ্গীকারপত্র। ওটার ব্যাপারে তোমাদের সাথে কথা বলতে এসেছি।

এতে তাদের মনে হয়, আবু তালিব বুঝি তাদের শর্তগুলো মেনে নেবেন! তাই তারা অঙ্গীকারনামাটি নামিয়ে আনে।

আবু তালিব বলেন—আমার ভাতিজা কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেনি। সে আমাকে নিশ্চিতভাবে খবর দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এই অঙ্গীকারনামায় উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি এই অঙ্গীকারনামার সকল বিধিনিষেধ উঠিয়ে দিয়েছেন। যেটাতে

---

১৫৩ আবুল কাসিম আবদুর রহমান আস-সুহাইলি (৫০৮-৫৮১ হি.)। হাফিজে হাদিস। ভাষাবিজ্ঞানী। সিরাত বিশেষজ্ঞ।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন, জোর-জুলুমের কথা লেখা হয়েছে। আমার ভাতিজার কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে তোমাদেরও উচিত খোদার এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং নিজেদের মন্দ কাজের ইচ্ছা থেকে ফিরে আসা। খোদার কসম! আমরা আমাদের জীবন থাকতে তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না। আর যদি আমার ভাতিজার সংবাদ সত্যি না হয়, তাহলে আমরা তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। তারপর তোমাদের যা খুশি তাঁকে করতে পারো।

কুরাইশরা বলল—আপনার কথায় আমরা রাজি।

তারপর তারা অঙ্গীকারনামা খুলে দেখে, নবিজি যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনই অবস্থা। উইপোকা সব খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু হতভাগা কুরাইশরা এবারও পলটি দিলো। ওরা বলল—আপনার ভাতিজা এর ওপর জাদু করেছে। নরাধমরা এই ধারণা করে আরও ক্ষেপে যায়।

তারপর তাদেরই পাঁচজন নেতা ও মাতব্বর এই অঙ্গীকার ভাঙতে এবং বয়কটের অবসান ঘটাতে উদ্যোগ নেয়। তারা হলো হিশাম ইবনে আমর ইবনুল হারিস, জুহাইর ইবনে উমাইয়া, মুতয়িম ইবনে আদি, আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম ও জামআহ ইবনে আসওয়াদ। তাদের মধ্য থেকে জুহাইর ইবনে উমাইয়া বয়কট অবসানের প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়। সে প্রথমে খানায়ে কাবার কাছে সমবেত লোকদের সামনে আসে এবং উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দেয়—

> হে মক্কাবাসী, আমরা কি খাবার খাই না? আমরা কি কাপড়চোপড় পরি না? দেখো, বনু মুত্তালিব ও বনু হাশিমের সাথে লেনদেন নিষেধ থাকায় না খেয়ে খেয়ে আজ তারা মরার পথে। খোদার কসম! এই জুলুম-নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের মূল কারণ যেই অঙ্গীকারনামা, সেটা আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব এবং বয়কটও উঠিয়ে দেবো। (তোমাদের কারও কিছু বলার আছে?)

এরপর তার দেখাদেখি বাকি নেতারাও উঠে দাঁড়ায় এবং এমন বক্তব্য দেয়। তারপর মুতয়িম ইবনে আদি অঙ্গীকারপত্রের দিকে এগিয়ে যায় এবং অবশিষ্টাংশও টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে। এরপর এই পাঁচ নেতা আরও অনেককে সাথে নিয়ে শিয়াবে আবু তালিবে যায় এবং সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে আনে।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

স্বেচ্ছায় সাজাবরণকারী সেসব লোকেরা

জুলুম-নির্যাতন আর শত কষ্টে ঘেরা এই বয়কট পর্ব থেকে জানা যায়, নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামকে দ্বীনের খাতিরে কত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কত যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে!

এসব নির্যাতনের শিকার শুধু যে মুসলিমরাই হয়েছেন তা নয়; বরং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুশরিকরাও তাদের সাথে স্বেচ্ছায় নিজেদের সঁপে দেয়। নবিজিকে একা ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নবিজির অনুসারী না হয়েও তাদের এই অবস্থান গ্রহণের কারণ কী ছিল, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা আমাদের জন্য জরুরি নয়। আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে বলা চলে, তারা নবিজির হিফাজত ও সহযোগিতার জজবায় এবং আত্মীয়তা ও সুসম্পর্ক বজায়ের উদ্দীপনায় এমনটি করেছে। ঠিক এ কারণেই তারা অন্যান্য কুরাইশি মুশরিককে নবিজিকে হত্যা করার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। এভাবে তারা মনের দুটি চাহিদা ও বাসনাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং সেগুলো একসাথে লালন করেছে—

- ✓ **এক.** শিরকের ওপর জমে থাকা এবং নবিজির আনীত সত্যের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন।
- ✓ **দুই.** সহযোগিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। যেই সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ অন্যদের জুলুম-নির্যাতন থেকে নিজ আত্মীয়ের হিফাজত ও সহযোগিতা করে; সে হকের ওপর থাকুক বা বাতিলের ওপর।

নবিজি এবং সাহাবায়ে কিরাম এই অবরুদ্ধ সময়ে যেসব কষ্ট-যন্ত্রণা ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, সেগুলো শুধু এবং শুধুই আল্লাহ তায়ালার হুকুমের আনুগত্য প্রদর্শন আর দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিতেই সহ্য করেছেন।

কারণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির মোকাবিলায় তাঁর সৃষ্টি দুনিয়া তাদের সামনে ছিল একেবারে মূল্যহীন, নগণ্য ও তুচ্ছ। এখানে এ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা গুরুত্বের দাবিদার।

শোনা যায়, ইসলামবিরোধী কোনো কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডার দাবি তোলে—

> নবি মুহাম্মাদের মিশন পরিচালনায় বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের স্বজনপ্রীতি ও আত্মীয়তার গোঁড়ামির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। যারা তখন তার হিফাজত ও সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করেছিল। তার দ্বীনপ্রচারে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। এর দলিল হলো—কুরাইশ মুশরিকরা যখন মুসলিমদের বয়কটে ফেলে, তখন এই দুই গোত্র বয়কটের ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান নেয়।

কিন্তু তাদের এই মন্তব্য ও দাবি চরম ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কথা অযৌক্তিক ও অমূলক হওয়ায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। কারণ, এটা তো একেবারে স্বাভাবিক ও বাস্তবিক যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আপন ভাতিজার জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে আসবেই। (তখনও জাহিলি যুগের অবসান ঘটেনি।) ফলে তারা স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিকভাবেই জাহিলি যুগের সাহায্য-রীতিতে[১৫৪] ভাতিজার হিফাজতে এগিয়ে এসেছিল; এমন সময় যখন মুষ্টিবদ্ধ অপরিচিত একহাত তাদের ভাতিজাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছিল এবং কুমতলবে তাঁর দিকে প্রসারিত হচ্ছিল।

জাহিলি রীতির সহযোগিতা যখন আত্মীয়দের এ ধরনের স্বজনপ্রীতি ও গোঁড়ামির ওপর প্রলুব্ধ ও উদ্দীপিত করে, তখন তাদের সামনে কোনো নিয়মকানুন বা আইন টেকে না। এই পরিস্থিতিতে হক-বাতিল তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাদের দৃষ্টিতে তখন শুধু স্বজনপ্রীতির গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমিই থাকে। এজন্যই তো এ থেকে পরিষ্কার, নবিজির অমুসলিম আত্মীয়দের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ হলো, তাদের মধ্যে দুটি বিরোধপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটা—

---

১৫৪ জাহিলি যুগে আরবদের একটি সামাজিক রীতি। এ রীতি অনুযায়ী তারা ঝগড়া-বিবাদ, লড়াই-যুদ্ধ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে স্বপক্ষীয় ও স্বগোত্রীয় লোকের পক্ষে থাকত। এমনকি দোষ বা অন্যায় সে করলেও তারা তার বিরুদ্ধে যেত না।

- ✓ **এক.** নবিজির দাওয়াতের ফলাফলে বড়াই ও অহংকার করে দাওয়াত অস্বীকার করা।
- ✓ **দুই.** কুরাইশি মুশরিকদের মোকাবিলায় নবিজির সাহায্য-সহযোগিতা করা।

কিন্তু নবিজির ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মিশনে আদতে এসবের ফায়দা বা উপকারিতা কিছু ছিল কি না, পাশাপাশি তাও চিন্তা করা দরকার। অথচ নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামকে যতটুকু যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে, ঠিক ততটুকু তাদেরও দেওয়া হয়েছে। নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম যেসব কঠিন পরিস্থিতি ও অসহনীয় দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদেরও সেসবের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সহজেই যেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝে আসে, তা হলো—নবিজিকে তাঁর সেসব অমুসলিম আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সঙ্গাদান তাঁর নবুয়ত-রিসালাত ও দাওয়াতের পক্ষে সাহায্য ছিল না; বরং তাদের সহযোগিতা ছিল কেবলই নবিজির ব্যক্তিত্বের খাতিরে এবং বংশ ও গোষ্ঠীর স্বার্থে।

পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম যদি তাদের এই সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা লাভবান হতেন এবং একে জিহাদ ও কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের এবং কাফিরদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যম ও উপায় হিসেবে গ্রহণ করতেন, তাহলে তাদের এই চেষ্টা জিহাদের কাজে খুবই ফলপ্রসূ হতো এবং তাদের মুজাহাদার পথ হতো অতি মসৃণ।

নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের ঈমান রক্ষার পর্ব থেকে একটি কৌতূহল জন্মায়, সেই স্পিরিট বা মূল চেতনা কী ছিল—যা তাদের এই দুঃসময় ও সংকীর্ণ অবস্থায়ও তাঁর ওপর অটল ও জমে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে এবং কীসের প্রত্যাশায় এই কঠিন ও নাজুক অবস্থার মোকাবিলায় তারা টিকে ছিলেন?

এই কৌতূহলের জবাব ওই সকল লোক কীভাবে দেবে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের ব্যাখ্যায় বলে—

> এটা ডান বাহুর বিপরীতে বাম বাহুর বিরোধিতা ও বিদ্রোহ। অর্থাৎ সম্পদশালী ও আয়েশি লোকদের বিপরীতে হতদরিদ্র ও নিপীড়িত

লোকদের বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহের চেতনাই তাদের টিকিয়ে রেখেছিল।

নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের নির্যাতন ও অত্যাচারের উপস্থাপিত ঘটনাগুলো একটু কল্পনা করে তারপর এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেখতে হবে। ইসলামি দাওয়াতের পর্বকে এমন সামাজিক বিদ্রোহ ও আন্দোলনের সাথে কীভাবে তুলনা করা চলে, যেই বিদ্রোহের ইস্যু থাকে ক্ষুধা ও অভাব? এবং যেই আন্দোলনের নেপথ্যে থাকে মক্কার ব্যবসায়ী ধনিক শ্রেণি আর সেখানকার অর্থনৈতিক প্ল্যাফরমের বিরোধিতায় ঘৃণা ও বিদ্বেষ?

দাওয়াতের কাজ বাদ দিতে মুশরিকরা নবিজিকে নেতৃত্ব ও ধনসম্পদের লোভনীয় প্রস্তাব কম দিয়েছে? তবুও কেন তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হননি? ক্ষুধা নিবারণ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন যদি সাহাবায়ে কিরামের জীবনের মূল লক্ষ্য ও টার্গেট হতো, তাহলে নবিজির সামনে কুরাইশদের পেশকৃত অফার গ্রহণে তারা তাঁকে কেন বাধ্য করেননি? কেন তাঁর ওপর জোর খাটিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের আবদার জানাননি?

তারা যদি বামপন্থি বিদ্রোহীই হতেন, তাহলে বামপন্থি বিরোধীরা হাতে ক্ষমতার বাগডোর আর পকেট ভর্তি টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিছু কি চায়?

নবিজি ও তাঁর সাহাবিদের সাথে তাদের গোষ্ঠী ও বংশীয় লোকদের ওপরও পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট আরোপ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদের রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শত কষ্টে উপার্জিত অর্থকড়ি, ধনসম্পদ, পৈতৃক সম্পত্তি, জমিজমা, আত্মীয়স্বজন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে শিয়াবে আবু তালিবের অবরোধ মেনে নেয়। ফলে ব্যবসার কোনো পণ্যদ্রব্য তাদের কাছে পৌঁছত না। আহারের কোনো বস্তু তাদের তাঁবুতে ঢুকত না। পান করার একফোঁটা পানিও তাদের কলস-মশকে থাকত না। নিরুপায় হয়ে তারা গাছের পাতা খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং এভাবেই কঠিন সময়গুলো পার করতে থাকে। সবকিছু মুখ বুজে সয়ে যায় আর সাহাবায়ে কিরামের মতো নবিজির সঙ্গে লেগে থাকে।

পাঠকের কি মনে হয়, অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানো যাদের ইচ্ছা ও লক্ষ্য, তারা কখনো এমন পরীক্ষা দিতে পারবে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করলে তাঁর আগে-পরে প্রায় সকল সাহাবি মক্কা ছেড়ে যান। নিজেদের সহায়সম্পত্তি ও মালিকানাধীন সব কিছুই ফেলে যেতে বাধ্য হন এবং মদিনা সফরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

তাহলে বলুন তো, অর্থকড়ি ও ধনসম্পদের লোভীরা কি এভাবে অর্জনের নয়; বরং বর্জনের এক হুকুম পালনে সবকিছু ত্যাগ করতে এবং বিসর্জন দিতে পারবে?

অথচ সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনয়নের মোকাবিলায় সবাইকে 'খোদা হাফেজ' বলতে সামান্য দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ, তাদের সামনে দুনিয়া ও দুনিয়ার শাসন বা রাজত্ব—কোনোটিরই এক পয়সা মূল্যও ছিল না।

একবার ভাবেন তো, এটা কি দুমুঠো ভাতের জন্য বামপন্থিদের বিদ্রোহের আগুন উসকে দেওয়ার দলিল হতে পারে?

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা খুঁত সন্ধান ও বাচালিপনায় লিপ্ত, তারা মাঝেমধ্যে নিজেদের অবস্থান প্রমাণ করতে নিচের লাইনগুলোকে দলিল হিসেবে পেশ করে—

> **প্রথম :** মক্কায় নবি মুহাম্মাদের সাহাবিদের প্রথম সারি, যাদের অধিকাংশই ছিল দাস-দাসী, হতদরিদ্র ও নিঃস্ব তারা মুসলিম হয়েছে এবং তাঁর অনুসারী হয়েছে দারিদ্র্যের জাঁতাকল ও অভাবের তাড়না থেকে মুক্তি পেতে। এবং এই নতুন ধর্মের ছত্রছায়ায় থেকে একসময় ঐশ্বর্য ও ধনভান্ডারের মালিক হওয়ার আশায়।
>
> **দ্বিতীয় :** প্রথম সারির মুসলিমদের তুলনামূলক কম সময়ই কষ্ট করতে হয়েছে। কারণ, মুসলিমদের সামনে কিছুদিন পরেই অর্থনীতির নতুন দিগন্ত খুলে যায় এবং তাদের চারপাশে ধনসম্পদের স্তূপ জমে যায়।
>
> আর এই অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটানোই যে নবি মুহাম্মাদের লক্ষ্য ও মিশন ছিল, এটা তার একটা দলিল।'

ইসলামবিরোধীদের নিক্ষিপ্ত ও ছুড়ে মারা এসব অভিযোগ ও আপত্তিকর মন্তব্যের বিচার-বিশ্লেষণে গেলে প্রথমেই যা সামনে আসে, তা হলো—এসবই তাদের অমূলক ধারণা ও ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র এবং নির্জলা মিথ্যাচার ও মিথ্যা অপবাদ।

প্রথম সারির সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই ছিলেন হতদরিদ্র ও দাস-দাসী—এটা যদিও পুরো সত্য, কিন্তু তবুও ইসলামবিদ্বেষীদের উত্থাপিত এসব অবান্তর বুলি ও

চিরসত্য বাস্তবতার মাঝে ধারে-কাছে তো দূরের কথা, দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগও নেই।

কারণ, সর্বজনস্বীকৃত কথা হলো—যেই শরিয়ত সমাজে ইনসাফ ও সমতা কায়েমের অকাট্য নির্দেশ দেয় এবং প্রত্যেক জালিম, ধোঁকাবাজ ও অবাধ্যের মুখে লাগাম পরায়, সেই শরিয়তকে জুলুম-নির্যাতন, কষ্টদান ও অবাধ্যতার জীবনযাপনে অভ্যস্তদের সবাই যে শুধু উপেক্ষা করবে, তা নয়; বরং এর বিরোধিতায় উন্মুক্ত তরবারি ও বর্শা নিয়ে হামলে পড়তেও তারা দ্বিধাবোধ করবে না। কারণ, এই শরিয়ত মানতে গেলে তাদের উপকারের চেয়ে অপকারই হবে বেশি।

অনুরূপ এটাও সর্বস্বীকৃত যে, এই শরিয়তকে ভালোবেসে এবং আদর করে কোলে তুলে নেবে প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যে কিনা দুর্বল, শক্তিহীন, নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং অবাধ্যতা ও সুবিধা ভোগের ময়দানে যাদের বিচরণ নেই। কারণ, এতে তাদের ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি। অন্তত পক্ষে অন্যদের সাথে তাদের এমন আচরণ হবে না, যে কারণে অন্যরা এই শরিয়তের দায়দায়িত্ব ও চাহিদার ওপর আমল করতে দ্বিধায় পড়ে যাবে।

নবিজির পাশে জড়ো হওয়া অধিকাংশরই অগাধ বিশ্বাস ছিল—'তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল।' তবে নেতৃস্থানীয় ও কর্তৃত্বশীল অহংকারীরা এই সত্যের সামনে বাধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে, মাথা নত করার ক্ষেত্রে তাদের সামনে কোনো প্রতিরোধকারী ছিল না।

এটাই বাস্তবতা—যা সবার বোধগম্য হয়। এই বাস্তবতা আর ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের কল্পনার মাঝে কোনো সম্পর্ক আছে?

এ ছাড়াও যেই ধারণা করা হয় যে—

> নবি মুহাম্মাদ দাওয়াতের আকৃতিতে এর অন্তরালে যেই ইশতেহার ও ব্যবস্থাপত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেন, তার নেপথ্যে উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করা এবং তাদের স্থানে স্থানে বাদশাদের সিংহাসনে সমাসীন করা; যা কিছুকাল পরেই সত্যে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন দেশের রাজদণ্ড তাদের হাতে আসে।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম এক করে ফেলার মতো। আচ্ছা, যখন মুসলিমদের দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা এবং

আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপক্ব বিশ্বাস রাখার বদৌলতে তিনি রোম-পারস্যের শাসনদণ্ড তাদের হাতে তুলে দেন, সেসব ভূখণ্ডে তাদের বসবাসের সুযোগ করে দেন এবং তাদের চারপাশে জাগতিক বস্তুসামগ্রীর মেলা বসিয়ে দেন, তখন এর উদ্দেশ্য বা অর্থ কি এটা হতে পারে যে, তারা মুসলিম হয়েছেন রোম-পারস্যের সিংহাসন আর ধনদৌলতের লোভে?

তাদের ইসলাম গ্রহণের আড়ালে যদি ধনদৌলতের লোভ ও আকাঙ্ক্ষা কিংবা জাগতিক কোনো চাহিদা পূরণের ইচ্ছা ও বাসনা থাকতই, তাহলে তাদের একের পর এক ভূখণ্ড জয়ের মুজিজা দুনিয়া দেখতে পেত না।

ফারুকে আজম রা. কাদিসিয়ার[১৫৫] যুদ্ধের সেনাবাহিনী গঠন করে চিফ অব কমান্ডার বানান সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে। এই সেনা অভিযানের উদ্দেশ্য যদি ধনভান্ডার লুট বা পার্থিব ধনদৌলত কব্জা করার আকাঙ্ক্ষা থাকত, কিংবা সিংহাসন দখলের ইচ্ছা থাকত, তাহলে কস্মিনকালেও সাদ রা. বিজয়ের সুসংবাদ ও সাহায্যের আবেদন নিয়ে মদিনায় ফিরে আসতেন না। তাকে পরাজয় ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হতো; বরং সকল যুদ্ধে এবং প্রতিটি রণাঙ্গনে মুসলিমদের দৃষ্টি ছিল একজায়গাতেই; দ্বীন ইসলামের সহযোগিতা ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি বহিঃপ্রকাশের সময় যখন হয়, তখন তিনি তাদের হাতে পৃথিবীর শাসনদণ্ড তুলে দেন। তাদের সামনে ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে দেন। এবং খনি ও গুপ্তধনের চাবি সঁপে দেন। যেগুলোর কল্পনা বা ধারণাও তাদের ছিল না।[১৫৬]

কাদিসিয়ার রণাঙ্গনে যদি মুসলিমদের নিয়ত থাকত পার্থিব আসবাবপত্র, জাগতিক সুখ ও বিলাসসামগ্রী অর্জন, তাহলে রিবয়ি ইবনে আমির রা. রুস্তমের[১৫৭] প্রাসাদসদৃশ প্যান্ডেলের ভেতরে ঢুকে সবকিছু বরবাদ ও বিনাশ করতেন না।

---

১৫৫ কাদিসিয়া। মুসলিম ও অগ্নিপূজারি পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে সংঘটিত এক ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ময়দান। হিজরি ১৫ সনের শাবান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সেনাপ্রধান ছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. আর পারস্য বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল বীর রুস্তম।

১৫৬ দুনিয়া লাভের পরও দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে সাহাবায়ে কিরামের যেসব উক্তি, বাণী ও ঘটনা রয়েছে, সেগুলো জেনে নেওয়াই এ ব্যাপারে সত্যতা যাচাই ও বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট।

১৫৭ রুস্তম ফররুখজাদ আর্মেনি। গ্রেট সাসানি তথা পারস্য সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতি। পারস্য সিংহাসনের শেষ প্রদীপ তৃতীয় ইয়াজদিগার্দের শাসনামলে দীর্ঘ উনিশ বছর (৬৩২ থেকে ৬৫১ ঈ.) সেনাপ্রধান ছিল। জ্ঞানী। সমরকুশলী। রণাঙ্গনের বীর। মুসলিম উম্মাহর হাতে তার পতন হয়।

রিবয়ি ইবনে আমির রা. যখন রুস্তমের প্যান্ডেলের ভেতরে ঢোকেন, তখন তার আয়েশি ও বিলাসী জীবন এবং আড়ম্বরপূর্ণ বাদশাহী জিন্দেগি দেখে ঘৃণায় নাক সিঁটকান। তিনি বর্শা দিয়ে সেখানে পড়ে থাকা গালিচা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং অহমিকার জিনিসপত্র তছনছ করে দেন। আর রুস্তমের উদ্দেশে বলেন—

> তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমার ভূখণ্ডের শাসন এবং তোমার ধনসম্পদ সব তোমারই থাকবে। তোমার সামনে কোনো বাধা থাকবে না।

এটা বড়োই চিন্তার বিষয়, যেই বিজেতার দৃষ্টি থাকে শত্রুপক্ষের ওপর কর্তৃত্ব লাভ এবং ধনসম্পদ, সহায়সম্বলের ওপর দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রতি, তার কি এসব কথা বলার সাহস আছে?

এ থেকে পরিষ্কার, মুসলিমরা যেসব ভূখণ্ড জয় করেছেন, সেসব বিজয়াভিযান ইসলামের খাতিরে এবং পৃথিবীর বুকে ইনসাফ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ছিল। পদমর্যাদার লোভ বা শাসক হওয়ার কোনো চিন্তা থেকে ছিল না।

আল্লাহ তায়ালা এ কারণেই মুসলিমদের দুনিয়ায় মান-সম্মান, ইজ্জত-মর্যাদা দান করেছেন। কারণ, মুসলিমদের মনে দুনিয়াবি মান-মর্যাদা ও পদমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনোই ছিল না। প্রতিটি রণাঙ্গনে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই থাকত মুসলিমদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের পার্থিব নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেন। মুসলিমদের জিহাদের উদ্দেশ্য যদি হতো দুনিয়া অর্জন, তাহলে তারা সর্বাবস্থায় এবং সর্বক্ষেত্রে মাহরুম ও বঞ্চিত হতেন।

আল্লাহ তায়ালার যেই নিয়মনীতির আওতায় নিখিল জাহানের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলে মুসলিমদের উত্থান ও দিগ্বিদিক জয়ের রহস্য দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ

> আর আমি চেয়েছিলাম দেশে (মিশরে) যাদের দুর্বল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা বানাতে এবং (দেশের) উত্তরাধিকারী বানাতে।[১৫৮]

---

১৫৮ সূরা কাসাস, আয়াত : ৫০

কোনো উদ্দেশ্য-আকর্ষণে বন্দি না থেকে গোঁড়ামির উর্ধ্বে গিয়ে নিরপেক্ষভাবে এতে চিন্তা-ফিকির করলে খোদায়ি উক্ত আইন যেকোনো বিবেকবান মানুষ সহজেই বুঝতে পারবে। আল্লাহই তার তাওফিকদাতা।

* * *

ইসলামে প্রথম হিজরত

হিজরতের অনুমতি

নবিজি যখন লক্ষ করেন—নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলিমদের ওপর মক্কার কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়ন তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, দিনদিন তাদের বেঁচে থাকাকে অসম্ভব করে তুলছে এবং তাদের নিরাপত্তা ও মাথা গোঁজার মতো কোনো স্থান এখানে আর মিলছে না, তখন তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন—

> তোমরা যদি হাবশায় চলে যাও, তাহলেই ভালো হয়। কারণ, সেখানকার বাদশার প্রজাদের কেউ কারও ওপর জুলুম করতে পারে না। সেটি একটি নিরাপদ ভূখণ্ড। আল্লাহ তায়ালা যতদিন তোমাদের এই বিপদ নামক পরীক্ষা শেষ না করেন, ততদিন তোমরা সেখানেই থাকো।

এই অনুমতি বাণী শোনার পরপরই অত্যাচার-অবিচার ও নির্যাতনে জর্জরিত সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর দ্বীনের হিফাজতের লক্ষ্যে হাবশা গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় উপকরণ বেঁধে নেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই মুসলিমদের প্রথম হিজরত।

এই মুহাজিরদের প্রথম কাতারে ছিলেন উসমান ইবনে আফফান ও তার সহধর্মিণী নবি দুলালি রুকাইয়া, আবু হুজাইফা ও তার সহধর্মিণী, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, মুসআব ইবনে উমাইর ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. প্রমুখ। জড়ো হতে হতে এই কাফেলার সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় আশির (৮০) চেয়ে কিছু বেশি।[১৫৯]

---

১৫৯ এই বর্ণনা বিশুদ্ধ। ইবনে হিশাম তার গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত জানতে দেখতে পারেন, *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩০

হাবশায় মুশরিক প্রতিনিধি

(কিছুদিন পর) কুরাইশরা যখন খেয়াল করল, মুসলিমরা তো গা বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে দেশ ছেড়ে হাবশা চলে যাচ্ছে এবং তাদের হিংস্র থাবা থেকে ভেগে যাচ্ছে, তখন তারা আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবিয়া ও আমর ইবনুল আসকে হাবশার সম্রাট নাজ্জাশি[১৬০] ও তার মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের জন্য নানা আইটেমের বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন ও রাষ্ট্রীয় উপহার দিয়ে পাঠায় এবং মুসলিমদের অভিবাসী হিসেবে তার রাষ্ট্রে আশ্রয় না দিয়ে প্রশাসনিক আইন জারি করে দূতদের অধীনে মক্কায় ফেরত পাঠানোর মর্মে সম্রাট বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

তারা রাজধানীতে পৌঁছে আগেই মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের হাতে উপঢৌকন পৌঁছে দেয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যাপারে কথাবার্তা বলে রাখে। বাদশাহ এই খবর শোনেন, তখন তিনি 'একজনকেও ফেরত দেবেন না' বলে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এবং মুসলিমদের নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে মুসলিম আর ওই দুই কুরাইশি দূতকে বাদশার সামনে আনা হয়।

নাজ্জাশির কথোপকথন

বাদশাহ মুসলিমদের জিজ্ঞেস করেন—এটা কেমন ধর্ম, যার কারণে তোমাদের স্বজাতিই ত্যাগ করতে হলো? এবং তারপর তোমরা না আমার ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছ, না অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছ!

জাফর ইবনে আবু তালিব রা. উত্তরে বলা শুরু করেন—

> মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সম্রাট, আমরা এক অজ্ঞ ও মূর্খ জাতি ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম। অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজই ছিল আমাদের কাজ। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাই ছিল আমাদের অভ্যাস। প্রতিবেশীর হক নষ্ট করতে আমরা ভাবতাম না। আমাদের সবলরা দুর্বলদের চুষে খেতে সামান্য দ্বিধাবোধ করত না। এভাবেই কাটছিল আমাদের জীবন। একসময় মহান খোদা আমাদের থেকেই একজনকে রাসুল বানিয়ে পাঠান। যার বংশ-গোত্র-পূর্বপুরুষ এবং তাঁর সততা-আমানতদারি-পবিত্রতা ইত্যাদি সবকিছুই আমাদের নখদর্পণে। তিনি

---

১৬০ নাজ্জাশি। প্রাচীন হাবশার রাষ্ট্রপতির উপাধি। নাম আসহামা ইবনে আবজার রা. (৫৬০-৬৩০ ই.)। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, নবিজি সা. যার গায়েবানা জানাজার সালাত আদায় করেছেন।

আমাদের এক স্রষ্টার দিকে আহ্বান করেন এবং কেবল তাঁর ইবাদত-উপাসনার নির্দেশ দেন। আমাদের বাপ-দাদারা যুগ যুগ ধরে যেসব মূর্তি ও পাথরের পূজা করে আসছিল, তিনি আমাদের সেসব করতে বারণ করেন। আমাদের বলেন সত্য কথা বলতে, আমানত পৌঁছে দিতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে। সর্বপ্রকার অশ্লীল, বাজে ও মন্দ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেন। তাই আমরা তাঁকে সত্যায়ন করেছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি সেই পরম করুণাময় স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেই বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, আমরা তার অনুসরণ করেছি।

শুধু এই কারণেই আমাদের জাতি আমাদের শত্রু হয়ে গেছে। আমাদের বিভিন্ন ধরনের কষ্টে ফেলেছে। নানা রকম যন্ত্রণায় ভুগিয়েছে। যেন আমরা আবার মূর্তিপূজার দিকে ফিরে যাই।

তারা যখন আমাদের ওপর জোর-জুলুমের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং আমাদের জীবনযাপন সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন করে তোলে, তখন আমরা বাধ্য হয়ে আপনার রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছি। অন্যদের মোকাবিলায় আমরা আপনার রাষ্ট্রে আপনার তত্ত্বাবধানে নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে থাকার আশায় এ বিপৎসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

নাজ্জাশি বলেন—

বেশ ভালো কথা। তোমাদের রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহি লাভ করেছেন, তা থেকে কিছু শোনাও।

জাফর রা. সূরা মারইয়ামের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। মহামহিম আল্লাহর পবিত্র বাণী শুনে সম্রাট আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। দু-চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। এমনকি তার দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়।

নাজ্জাশি বলেন—

খোদার কসম! এ তো সেই কথা, যা ঈসা ইবনে মারইয়াম নিয়ে এসেছেন।

এরপর তিনি কুরাইশি দুই দূতের দিকে ফিরে বলেন—তোমরা ভালোই ভালোই এখান থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! একজনকেও আমি তোমাদের হাতে দেবো না। এটা হতেই পারে না।

(দ্বিতীয় দিনও) দূতেরা পুনরায় সম্রাটের কাছে এসে কানপড়া দিয়ে বলে—জাহাঁপনা, এরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে খুব আজিব আজিব কথা বলে।

নাজ্জাশি সন্দেহ দূর করতে মুসলিমদের আবার দরবারে ডেকে আনেন এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

জাফর রা. বলেন—

> আমরা সেই মহান রাসুলের ব্যাপারে তা-ই বলি, যা আমাদের নবি বলেন। তিনি আমাদের বলেছেন—ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর বান্দা। তাঁর পক্ষ থেকে রূহ এবং তাঁর কালিমা।[১৬১] যাকে তিনি কুমারী ও সতী নারী মারইয়ামের গর্ভে পাঠিয়েছেন।

এই বক্তব্য ও মন্তব্য শুনে নাজ্জাশি মাটিতে হাত মেরে একটি কাঠি উঠিয়ে নেন এবং বলেন, খোদার কসম! ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে তুমি যতটুকু শুনিয়েছ, তিনি এই কাঠি সমপরিমাণই; এর চেয়ে একচুলও বেশি ছিলেন না। এরপর তিনি কুরাইশি দুই দূতের আনা উপহারসামগ্রী ফিরিয়ে দেন এবং সোজা মক্কায় ফিরে যেতে বলেন। আর তার রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আরও জোরদার করেন। অপরদিকে কুরাইশি দূতেরা বিফল ও ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে যায়।

কিছুদিন পর। হাবশা অভিবাসী মুসলিমদের কানে খবর পৌঁছল, মক্কার কাফিররা মুসলিম হয়ে গেছে। মুসলিমদের তেত্রিশ সদস্যের কাফেলা খুশিতে মক্কার পথে

---

১৬১ কালিমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ : ইসা আ.-এর দুটি গুণবাচক নাম। কালিমা শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরিনে কিরাম থেকে তিনটি অর্থ রয়েছে—

- **এক.** আল্লাহপাকের 'কুন' নির্দেশের বাস্তবায়ন।
- **দুই.** আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ।
- **তিন.** আল্লাহর নিদর্শন।

রুহ শব্দের ব্যাখ্যাতেও তাদের থেকে কয়েকটি অর্থ রয়েছে—

- **এক.** অতিশয় পবিত্র সত্তা।
- **দুই.** আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ।
- **তিন.** আল্লাহর রহস্য।
- **চার.** আল্লাহর পক্ষ থেকে ফুৎকার।

সূত্র : *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন*, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২৯৮-৯৯

যাত্রা শুরু করে; কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছতেই শোনা গেল—এ তো খবর ছিল না, ছিল গুজব। তারপর এই কাফেলার বেশির ভাগই আবার হাবশা ফিরে যান; আর কয়েকজন মক্কায় অবস্থানকারী অন্যের নিরাপত্তা ও আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে উসমান ইবনে মাজউন রা. ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার আশ্রয়ে আর আবু সালামা রা. আবু তালিবের নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হাবশার হিজরতের তিনটি শিক্ষা

হাবশার হিজরতপর্ব থেকে তিন ধরনের শিক্ষা পাওয়া যায়—

প্রথম প্রকার : বিসর্জনে প্রস্তুত থাকা

নিঃসন্দেহে ইসলাম, ইসলামের অনুসরণ এবং ইসলামের ওপর পুরোপুরি আমলই সকল শক্তির উৎস ও ঝরনা। এই ইসলামই জমিজমা, বাড়ি-গাড়ি, ধনদৌলত, স্বাধীনতা, মান-সম্মান ইত্যাদি সব ধরনের এবং সকল প্রকারের অধিকার আদায় ও রক্ষার জিম্মাদার ও মূল চাবিকাঠি।

এজন্য দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনাকারী ও মুজাহিদগণের ওপর ওয়াজিব ও জরুরি হলো—তারা নিজেদের সকল স্বার্থ-সামর্থ্য ও সক্ষমতা ইসলামের ভিত্তি ও শিকড় রক্ষায় ব্যয় করবেন। নিজ জন্মভূমি-দেশ-ভিটেবাড়ি, জমিজমা, অর্থকড়ি, টাকা-পয়সা ও জীবন—সবকিছু ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার ও উৎসর্গ করবেন এবং অকাতরে সব বিলিয়ে দেবেন। সময় ও প্রেক্ষাপট-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বস্তু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করবেন না।

এ কারণেই তো যদি ধর্মের ওপর কোনো শকুনের ছায়া পড়ে বা দ্বীন মিটে যায় তাহলে এর সমাধান দেশ-ধনসম্পদ ও ভূখণ্ড না করতে পারলেও পার্থিব ও জাগতিক এসব বস্তুসামগ্রী অর্থাৎ জন্মভূমি-দেশ-ভিটেবাড়ি, জমিজমা, অর্থকড়ি টাকা-পয়সা ও জীবন—সবকিছু যদি দ্বীন রক্ষা ও দ্বীনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়; যার ফলে মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে দৃঢ়তা আসে, সমাজে এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষের অন্তরে এর প্রতি বিশ্বাস প্রগাঢ় ও বদ্ধমূল হয়, তাহলে এ পথে উপর্যুক্ত যা কিছুই কুরবানি ও উৎসর্গ করা হোক না কেন, তা ফিরে আসবেই; বরং আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও মজবুত এবং অধিক হয়ে আসবে।

ইতিহাসের পাতা মেলে ধরলে সামনে আসে, নিখিল জাহানে এটাই আল্লাহর নীতি যে, অদৃশ্য বিষয় অর্থাৎ আকিদা-বিশ্বাস ও অভ্যন্তরীণ জগৎ যখন মজবুত ও শক্তিশালী হয়, তখন ভেতরের এই শক্তিই দৃশ্য বস্তুজগৎ ও বাহ্যিককে শক্তিশালী করে।

দুনিয়ার যেই সম্প্রদায় বা জাতিই বিশুদ্ধ আকিদা, উত্তম চরিত্র ও সামাজিক নির্ভুল মূলনীতির ওপর জমে থাকে এবং আমল করতে থাকে, বস্তুগত শক্তি ও কর্তৃত্ব তাদের দখলেই থাকে। পক্ষান্তরে তারা যখন স্বভাব-চরিত্র, আকিদা-বিশ্বাস এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় আইনকানুনে থাকে নড়বড়ে ও দুর্বল, তখন তাদের বস্তুগত ও বাহ্যিক শক্তিও দুর্বল ও কমজোর হয়ে যায় এবং তারা বিলুপ্তি ও নিশ্চিহ্নের শিকার হয়।

কখনো কখনো এমন হয়েছে—কোনো জাতি তাদের আকিদা-বিশ্বাসে দুর্বল এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত কৃষ্টি-কালচার ও স্বভাব-চরিত্রে অধঃপতনের শিকার হলেও বস্তুগত ও বাহ্যিক শক্তিতে তারা সবল ও বলীয়ান; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের পতনই হয় অতি দ্রুত এবং তারাই বিলুপ্ত হয় চোখের পলকে।

এর কারণ, কোনো জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের বিবেচনায় একজন মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই কম। কোনো মানুষ তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণে এতে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না; বরং পুরো ইতিহাসের আয়নায় এর যাচাই-বাছাই হয় এবং দূরের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে একটা ফল বেরিয়ে আসে।

কখনো আবার এমনও দেখা গেছে—কোনো জাতি একসময় বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস লালন করত, সকল ভালো ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল। তবে তারা বস্তুগত ও জাগতিক শৌর্যবীর্য ও কর্তৃত্ব-নেতৃত্বশূন্য ও শক্তিহীন ছিল; কিন্তু যখন তারা এই বাহ্যিক কিছু আসবাবপত্রও দ্বীন ও বিশুদ্ধ আকিদা রক্ষায় ব্যয় করে ফেলে এবং সব ধরনের মন্দত্ব থেকে একটি পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি দাঁড় করায়, তখন অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিশুদ্ধ আকিদা পোষণকারী এবং এর ওপর আমলকারী এই জাতিই তাদের হারানো দেশ-মাটি পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ফিরে পায় এবং তাদের বাহ্যিক শক্তিমত্তাও নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং নতুন পরাশক্তিতে জেগে ওঠে।[১৬২]

১৬২ বর্তমানের আফগানিস্তান এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

বিশ্বজগৎ তথা জগতের সূচনা-সমাপ্তি, মানুষ ও জীবন সম্পর্কে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ এবং যৌক্তিক ও বাস্তবিক ধারণা ও জ্ঞান ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ধর্মে দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ, ইসলাম মানুষের জন্য স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার প্রণীত প্রিয় সংবিধান। ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবনব্যবস্থা শুধু ইসলামই মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে এবং বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। ঠিক এ কারণেই ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমে নিজের ধনসম্পদ, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, পৈত্রিক সম্পত্তি এবং জীবন পর্যন্ত কুরবান ও উৎসর্গ করে দিতে হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম তার জানমাল ও দেশ-মাটির হিফাজত ও নিরাপত্তার জামানত হাসিল করতে পারে। এটা অযৌক্তিক কোনো ব্যাপার নয়। এজন্যই ইসলামে হিজরত শরিয়তসিদ্ধ ও সূচিত হয়েছে। যখন মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন সকল সীমা অতিক্রম করে এবং দিনদিন দ্বীনি কাজে তারা নতুন নতুন বাধা সৃষ্টি করতে থাকে, তখন নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে এবং হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে যেসব দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এই হিজরত যেকোনো অংশেই সেসবের চেয়ে কম বা ছোটোখাটো কোনো বিপদ নয়—এটা সবারই জানা। বাস্তবে এই হিজরত বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পালিয়ে যাওয়ার নাম নয়; বরং খোদায়ি সাহায্য আসা পর্যন্ত এটা পরীক্ষার ধরন ও সাধনার পথ পরিবর্তনের নাম।

এটাও সবাই জানে, মক্কা তখন ইসলামি রাষ্ট্র ছিল না। তারপরও কোনো কোনো স্বল্প বোধসম্পন্ন অল্পবিদ্যার লোক অভিযোগ তোলে—সাহাবায়ে কিরাম আশ্রয়ের খোঁজে ইসলামি রাষ্ট্র মক্কা ছেড়ে কাফির রাষ্ট্র হাবশায় কেন গিয়েছিলেন?

এর বাস্তব ও আসল উত্তর হলো—ওই সময় মক্কা, হাবশা বা অন্য কোনো এলাকাই ইসলামি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইসলাম পালনের উপযোগী স্থান ছিল না। সবই ছিল এক রকম। (কারণ, নবিজি কোনো ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন না।) কাজেই এই পরিস্থিতিতে কোনোভাবে দ্বীন পালন ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারের একটু সুযোগ-সুবিধা যেখানেই ছিল, সেখানে আশ্রয় নেওয়াই ছিল বড়ো কথা। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম হাবশাকে মক্কার চেয়ে নিরাপদ ও উপযুক্ত স্থান দেখে সেখানেই চলে যান। কারণ, মক্কায় তখন মুসলিমদের আর কিছুরই নিরাপত্তা ছিল না। পক্ষান্তরে হাবশায় জানমাল দুটিরই নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইসলামি রাষ্ট্র থেকে হিজরত করার হুকুম তিন ধরনের—

- ০১. ওয়াজিব
- ০২. জায়িজ
- ০৩. হারাম

০১. ওয়াজিব

যখন ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান আজান-সালাত-সিয়াম-হজ ইত্যাদি পালন ও আদায়ে বাধা আসে, তখন হিজরত করা ওয়াজিব।

০২. জায়িজ

যখন মুসলিমদের সামনে নানা রকম সমস্যা ও বিপদ এবং দুঃখ-কষ্টের প্রাচীর দাঁড় করানো হয় এবং তাদের সংকীর্ণ অবস্থার সম্মুখীন করা হয়, তখন হিজরত করা জায়িজ।

০৩. হারাম

হঠকারিতা বা অলসতাবশত ইসলামি অনুশাসন মোতাবেক জীবন পরিচালনা না করার উদ্দেশ্যে এমন কোনো স্থান, যেখানে শরিয়ত পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে হিজরত করা হারাম।[১৬৩]

দ্বিতীয় প্রকার : ইসলামের সাথে ঈসায়ি ধর্মের নৈকট্য

আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈসা আ.-এর[১৬৪] শরিয়তে কত গভীর সম্পর্ক, এই ঘটনা থেকে সেই বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। বাদশাহ নাজ্জাশি ছিলেন ঈসা আ.-এর শরিয়তে প্রতিষ্ঠিত এবং ঈসায়ি আকিদার একনিষ্ঠ ভক্ত ও খাঁটি বিশ্বাসী। তার এই একনিষ্ঠতার চাহিদা ও দাবি ছিল—তিনি

---

১৬৩ দ্রষ্টব্য : *তাফসিরে কুরতুবি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৫; *আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৮৭

১৬৪ 'আমাদের নবি এবং ইসা আ.' —এভাবে বলা বা লেখার দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইসা আ. আমাদের শ্রদ্ধেয় নন; বরং এভাবে বলার কারণ হলো—আমরা যেহেতু শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরিয়তের অনুসারী, তাই তিনি আমাদের নবি। পক্ষান্তরে যেহেতু ইসা আ.-এর শরিয়ত আমাদের জন্য নয়, তাই তিনি আমাদের নবি নন। তবে দুজনই যেহেতু ইসলামের নবি এবং আমরা সবাই মুসলিম, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুজনই আমাদের শ্রদ্ধেয়। আর এই অর্থ নবিজি ও বাকি সকল নবির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায়িত। সুতরাং যেখানেই এভাবে বলা বা লেখা হবে, সেখানেই এই অর্থ ও উদ্দেশ্য মনে রাখতে হবে।

ইনজিল ও ঈসা আ. প্রচারিত আকিদা-বিশ্বাস পরিপন্থি কোনো ধর্ম বা মতবাদের প্রতি ঝুঁকবেন না এবং তার সমর্থনও করবেন না। অর্থাৎ (আজকের মতো) তৎকালীন খ্রিষ্টানদের বক্তব্য ছিল, (নাউজুবিল্লাহ) ঈসা আ. আল্লাহর ছেলে এবং তিনি তিন খোদার একজন।[১৬৫]

এদের কথা যদি সত্যি ও সঠিক হতো, তাহলে নাজ্জাশি বাদশাহ নিজে তো ইনজিলের হুকুম-আহকাম মানতেন, ঈসা আ.-এর প্রচারিত শরিয়ত মোতাবেক আমল করতেন এবং একজন খাঁটি ঈসায়ি ছিলেন। কাজেই এমতাবস্থায় তার করণীয় ছিল, তার নবি ঈসা আ.-এর ব্যাপারে মুসলিমদের আকিদা খণ্ডন করা এবং কুরাইশদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা; কিন্তু প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন।

সম্রাট যখন ঈসা আ. সম্পর্কিত কুরআনি বিবরণ শোনেন, তখন বলেন—নিঃসন্দেহে এই আলোচনা আর ঈসা ইবনে মারইয়ামের বক্তব্য একই জায়গা ও অভিন্ন সত্তা থেকেই এসেছে।

নাজ্জাশি বাদশাহ এই কথাটি চারপাশে উপস্থিত ও উপবিষ্ট ইনজিল লেখক ও ঈসায়ি উলামায়ে কিরামের সামনে বলেন। (তাদের কেউই দ্বিমত পোষণ করেননি।) কাজেই সকল নবি এক ও অভিন্ন (শরিয়ত নয় বরং) আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে যে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং পরবর্তী কোনো নবিই পূর্ববর্তী নবির মূল কথায় বা প্রধান কাজে বিরোধিতা করেননি—সেই দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট প্রমাণকে বাদশাহর উক্ত বক্তব্য আরও দৃঢ়, মজবুত ও জোরালো করে। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যেই মতভেদ ও মতানৈক্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে, সেগুলো তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ, অজ্ঞতা

---

১৬৫ কুরআন নাজিলের সামসময়িক সময়ে খ্রিষ্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করত—মসিহই খোদা। আরেক দল বলত—মসিহ খোদার ছেলে। আরেক দলের বিশ্বাস ছিল—তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার।

এই তৃতীয় দলের আবার দুটি উপদল ছিল। একদলের বিশ্বাস—খোদার একক পরিবারের সদস্যরা হলো পিতা আল্লাহ, পুত্র ইসা মসিহ ও স্ত্রী মারইয়াম।

আরেক দলের মতে—আল্লাহ, ইসা ও রুহুল কুদস জিবরাইল। (নাউজুবিল্লাহ)। সূত্র : *তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন*, বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৩০০

এদের সবার খণ্ডনে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসায় বলেন—

> আহলে কিতাবগণ তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সংগত বিষয় ছাড়া কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়ামের ছেলে মসিহ ইসা আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি পাঠিয়েছেন মারইয়ামের নিকট এবং তাঁর রুহ—তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মান্য করো এবং তোমরা তিন খোদা বলো না।' সূরা নিসা, আয়াত : ১৭১

প্রচলিত খ্রিষ্টবাদ বিষয়ে জানতে দ্রষ্টব্য *ইজহারুল হক*, *খৃষ্টধর্মের মূলসূত্র সন্ধানে* ইত্যাদি গ্রন্থ।

আর অনবগতির কারণে নয়; বরং তা জ্ঞানের আলো তাদের কাছে আসার পরও উপেক্ষা, হঠকারিতা ও অবাধ্যতার ফসল। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা সূরা জাসিয়ার ১৭ নং আয়াতে এবং অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় প্রকার : অমুসলিম দেশে আশ্রয়

এ থেকে এটাও পরিষ্কার যে, প্রয়োজনের খাতিরে মুসলিমরা অমুসলিমদের আশ্রয়ে যেতে পারবে। আশ্রয়দাতা অমুসলিম বা আহলে কিতাব, যা-ই হোক না কেন। যেমন—বাদশাহ নাজ্জাশি তখনও খ্রিষ্টান ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম হন। আবার কখনো প্রয়োজনে এমন কারও আশ্রয়ও নেওয়া যাবে, হোক সে কোনো মুশরিক। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমরা যখন হাবশায় থেকে মক্কাবাসীর মুসলিম হওয়ার সংবাদ পান, তখন তারা মক্কায় ফিরে এসে দেখেন, খবরটি ভুয়া ও মিথ্যা। এমতাবস্থায় কয়েকজন মুসলিম আবু তালিবসহ আরও কিছু মুশরিকের অধীনে আশ্রয় নেন। অনুরূপ আগে গিয়েছে (এবং সামনে আসবে), নবিজি তায়েফ থেকে ফিরে মুতয়িম ইবনে আদির আশ্রয় নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

কিন্তু এই সহযোগিতা ও আশ্রয় লাভের জন্য শর্ত হলো—দাওয়াতি কার্যক্রম যেন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়। দ্বীনের হুকুম-আহকামে পরিবর্তন না ঘটে। এবং কোনো হারাম কাজে নীরব থাকা শর্তযুক্ত না হয়। অন্যথায় এসব শর্তের ভিত্তিতে কোনো অমুসলিমের আশ্রয় লাভ মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত নয়। এর দলিল নবিজির ওই অবস্থান—যা তিনি চাচা আবু তালিবের আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের সময় গ্রহণ করেছিলেন। আবু তালিব যখন বলেছিলেন—তুমি তোমার প্রাণ বাঁচাও। তোমার সাধ্যের বাইরে কিছু করো না। মুশরিকদের ভগবানদের নিয়ে কথা বলো না। তখন নবিজি চাচার আশ্রয় ও নিরাপত্তা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সত্য প্রচারে ও হক স্পষ্টকরণে নীরব থাকাকে অস্বীকার করেন।

* * *

প্রথম প্রতিনিধিদলের আগমন

হাবশার আহলুল কিতাব

নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম যখন কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্যাতন ও যন্ত্রণা সহ্য করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সর্বপ্রথম মক্কার বাইরে থেকে বিদেশি যেই প্রতিনিধিদল ইসলামকে জানা ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে নববি দরবারে হাজির হয়, তারা ছিলেন হাবশার ত্রিশের কিছু বেশি ঈসায়ি উলামায়ে কিরাম।

এই প্রতিনিধিদল জাফর রা.-এর মক্কা প্রত্যাবর্তনের পরে আসে। তারা নবিজির সামনে বসে তাঁর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা ইত্যাদি দেখেশুনে তাঁর সম্পর্কে জানেন এবং তাঁর পবিত্র মুখে কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত শোনেন। শেষে সবাই এক বৈঠকে মুসলিম হয়ে যান। এ খবর আবু জাহেলের কানে পৌঁছতেই সে কঠিন ভাষায় বলে ওঠে—

> আমরা তোমাদের চেয়ে বড়ো নির্বোধ, গাধা ও আহম্মক প্রতিনিধিদল এ জীবনে আর দেখিনি। তোমাদের জাতি তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে এই লোকের ব্যাপারে জেনেশুনে এবং খোঁজখবর নিয়ে তাদের তার ব্যাপারে জানাতে। আর তোমরা বোকারা কিনা তাঁর কাছে কয়েক মিনিট বসেই তাঁর মিষ্টি কথায় গলে গেলে এবং নিজেদের দ্বীন-ধর্মই ছেড়ে দিলে! এর কথায় বিশ্বাস করলে! একে আবার সত্যবাদীও বলেও স্বীকৃতি দিলে!

এই প্রতিনিধিরা উত্তরে বলে—

তোমার প্রতি সালাম। আমরা তোমার সাথে মূর্খের মতো কথা বলতে আসিনি। তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাকো, আমরা আমাদের ধর্মে আছি। আমরা নিজেদের কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করতে রাজি নই।

অতঃপর তাদের পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন—

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

এর (কুরআনের) পূর্বে যাদের আমি কিতাব দান করেছিলাম, তারা এর প্রতি ঈমান এনেছে। আর যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে—'আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এর আগে থেকেই আমরা মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করেছি।' এরাই সেসব লোক, যাদের দুইবার প্রতিদান দেওয়া হবে তাদের ধৈর্যের কারণে। এরা মন্দকে ভালোর মাধ্যমে প্রতিহত করে এবং আমার দেওয়া রিজিক থেকে খরচ করে। আর যখন কোনো অনর্থক কথা শোনে, তখন তা এড়িয়ে চলে এবং বলে—'আমাদের আমল আমাদের, তোমাদের আমল তোমাদের। তোমাদের ওপর সালাম। আমরা মূর্খদের সাথে তর্ক করতে আগ্রহী নই।'[১৬৬]

* * *

১৬৬ সূরা কাসাস, আয়াত : ৫২-৫৫

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হাবশা থেকে প্রতিনিধিদলের এই আগমন-পর্ব থেকে দুটি বিষয় জেনে নেওয়া আমাদের জন্য জরুরি—

প্রথম বিষয় : দায়ির জন্য স্মরণীয়

যেই সময়ে মুসলিমদের বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করাসহ নানা ধরনের কষ্ট-যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছিল এবং বয়কটের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে সংকীর্ণ করা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় নবিজির দরবারে এই প্রতিনিধিদলের আগমন এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এ বিষয়েরই স্পষ্ট ও পরিষ্কার দলিল যে, দাওয়াতের কাজে দায়িদের যত কষ্টই হোক না কেন এবং সাধনার পথে যত কঠিন পরিস্থিতিই সামনে আসুক না কেন, তারা নিজেদের কখনোই ব্যর্থ ও বিফল মনে করবে না। দুর্বলতা, পিছপা হওয়া বা নৈরাশ্যের শিকার হবে না; বরং আগের কথাটিই মনে রাখবে যে, এই পথে দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হওয়াই সফলতার আলামত ও বিজয়ের পূর্বলক্ষণ।

আগত এই প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিল ত্রিশজনের বেশি। এক বর্ণনা অনুযায়ী চল্লিশের বেশি। উত্তাল সমুদ্রের ভয়ংকর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাড়ি দিয়ে তারা নবিজির দরবারে পৌঁছান। যেন এই কূলহীন বিদ্যাসাগর থেকে কয়েকটি মুক্তা তুলে নিতে পারেন। এই নতুন দাওয়াত কবুল করে এর সাথে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে পারেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে পারেন—'ইসলামের শত্রুরা এই দাওয়াতি কাজে যতই বাধা দিক না কেন, মুসলিমদের যতই কষ্ট-যন্ত্রণায় জর্জরিত করুক না কেন, সবকিছু করেও তারা ইসলামের তেজোদীপ্ত আলোকরশ্মি পূর্ব-পশ্চিমে সূর্যালোকের মতো ছড়িয়ে পড়তে কোনোভাবেই আটকাতে পারবে না এবং এর সুমিষ্ট ফল ভোগে বাধা দিতে পারবে না।'

যেই না আবু জাহেলের কানে প্রতিনিধিদলের ইসলাম গ্রহণের খবর পৌঁছল, তৎক্ষণাৎ এই শয়তান মনের ক্ষোভ নিকৃষ্ট শব্দে প্রকাশ করে এবং খুব বাজে শব্দে তাদের সম্বোধন করে; কিন্তু এই শয়তানের আর কীই-বা করার ক্ষমতা ছিল? এই কুত্তা ও তার সমমনাদের তো এই শক্তিই ছিল যে—এরা সাহাবায়ে কিরামকে আরও বেশি নির্যাতন-নিপীড়নের নিশানা ও টার্গেট বানাবে। বাকি ইসলামের দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করা তাদের পক্ষে অকাট্যভাবে আর সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিষয় : হাবশিদের ঈমান ও সাধারণ মুমিনের ঈমান কি একই

হাবশার এই প্রতিনিধিরা নবিজির ওপর যে ঈমান এনেছেন, তার ধরন কী? তাদের ঈমান আর কুফর বর্জনকারী মুমিনের ঈমান কি একই রকম?

না। এক রকম নয়। প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তবে তাদের ঈমান পূর্ববর্তী ঈমানেরই ধারাবাহিকতা ও গতিশীলতা; যেই ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাস তারা আগে থেকেই বুকে ধারণ ও লালন করছিল এবং সেই অনুযায়ী দ্বীন পালন করে আসছিল। যেমনটি সিরাতশাস্ত্রজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেন—তারা ঈসায়ি ছিলেন। ইনজিলে বিশ্বাস করতেন। সে অনুযায়ী আমল করতেন। ফলে ইনজিলই তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল, ঈসা ইবনে মারইয়ামের পরে যেই নবি আসবেন, তাঁর ওপর তোমরা ঈমান আনবে এবং ইনজিলই তাদের সেই নবির শারীরিক গঠন-কাঠামো ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির বিবরণও তুলে ধরেছে। কাজেই ইনজিলের প্রতি বিশ্বাস রাখার দাবিই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করবে।

নবিজির প্রতি তাদের ঈমান আনয়নের অর্থ এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে প্রবেশ তথা ধর্মান্তর নয়; বরং এ তো ইনজিলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখারই বাস্তব অবস্থার ধারাবাহিকতা। কারণ, ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এবং ইনজিলই তাদের শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলেছে। এই বিষয়বস্তু বোঝাতেই নাজিল হয়েছে—

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

আর যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে—আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এর আগে থেকেই আমরা মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করেছি।[১৬৭]

অর্থাৎ আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। এবং তাঁর আনুগত্যে মাথা নত করেছি। কারণ, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ইনজিলেরই একটি হুকুম।

প্রকৃতপক্ষে মুসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামের আনীত শরিয়ত ও হুকুম-আহকামে যারা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ আমলকারী, তাদের যে কেউ নবিজিকে মানতে বাধ্য। কারণ, তাওরাত ও ইনজিলের ওপর ঈমান আনয়ন ও বিশ্বাস স্থাপনের চাহিদা ও দাবিই হলো—পরবর্তী সময়ে আগমনকারী কুরআন ও কুরআনপ্রাপ্ত নবির ওপর ঈমান আনা। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে নির্দেশ দেন, যারা তাওরাত ও ইনজিলের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের আপনি সঠিক ও বাস্তবিকভাবে গ্রন্থে বর্ণিত চাহিদা ও আদিষ্ট দাবির ওপর আমল করার দাওয়াত দেন। তাহলে দেখবেন, তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার ওপর ঈমান আনবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ...

আপনি বলে দেন—হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা তাওরাত-ইনজিল প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত (হিদায়াতের) কোনো অংশের ওপর নও...[১৬৮]

উপর্যুক্ত বিবরণের আলোকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, সত্য ধর্ম একটি হওয়ার জ্ঞান রাখা। ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তা কখনো একাধিক নয়; বরং একটি। এই একমাত্র ধর্মই আদি পিতা ও প্রথম নবি আদম আ. থেকে শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত। পক্ষান্তরে কিছু কিছু মানুষের মুখে 'আসমানি ধর্মসমূহ' বলে চমকপ্রদ যেই শব্দের প্রচলন ঘটেছে, তা একেবারেই ভুল ও অর্থহীন এবং ষড়যন্ত্রমূলক। কারণ, আল্লাহর কাছ থেকে একাধিক ধর্ম কখনো আসেনি।

---

১৬৭ সূরা কাসাস, আয়াত : ৫৩

১৬৮ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৮

হ্যাঁ, আসমান থেকে একাধিক যা এসেছে, তা হলো নিয়মকানুন তথা শরিয়তের বিভিন্নতা। যুগ, সমাজ ও মানুষের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক পরবর্তী শরিয়ত পূর্ববর্তী শরিয়তকে রহিত করেছে; কিন্তু 'আসমান থেকে ধর্ম এসেছে একাধিক'—এই কথা সম্পূর্ণ ভুল ও অশুদ্ধ। এতে শুদ্ধাশুদ্ধির কোনো বালাই নেই। ধর্মজগতের সূচনালগ্ন থেকে একটিই। আর তা হলো ইসলাম। তবে একেক নবির যুগে একেক নবির অঞ্চলে শরিয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এজন্যই আমাদের কর্তব্য ও করণীয় হলো 'ধর্ম' ও 'শরিয়ত' শব্দ দুটি ব্যবহারে ভুল করেও জগাখিচুড়ি না পাকানো।

কারণ, শব্দ দুটির মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। দ্বীন বা ধর্ম বলতে বোঝায় আকিদা-বিশ্বাস। আর শরিয়ত হলো ইবাদত-মুআমালাত[১৬৯] সম্পর্কিত অনুসৃত নিয়মনীতি ও হুকুম-আহকাম।

* * *

১৬৯ শরিয়তের অধীনে চারটি বিষয় : ১. ইবাদত (সালাত-সিয়াম ইত্যাদি), ২. মুআমালাত (লেনদেন, চুক্তি ইত্যাদি), ৩. মুআশারাত (বিয়ে তালাক দুগ্ধপান ইত্যাদি) ও ৪. আখলাক (স্বভাব-চরিত্র, আচার ব্যবহার ইত্যাদি)



শোকের বছর

প্রিয়তমা স্ত্রী ও চাচার বিদায়

নবিজির নবুয়ত লাভের দশম বছরটি ইসলামি ইতিহাসে 'শোকের বছর'। এ বছর নবিজির প্রিয়তমা সহধর্মিণী খাদিজাতুল কুবরা রা. ও প্রিয় চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। ইবনে সাদ রহ. তার *তাবাকাত* গ্রন্থে লেখেন—দুজনের ইন্তেকালের মাঝে এক মাস পাঁচ দিনের ব্যবধান ছিল।

খাদিজা রা. মর্যাদায় বহু উঁচু স্তরের নারী। ইবনে হিশাম লেখেন—

> তিনি ইসলামের প্রকৃত বন্ধু। নবিজি যখনই ঘরে এসে তার কাছে মনের কোনো ব্যথা বা আঘাতের কথা বলতেন, তখনই তিনি তাঁকে পরম ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও প্রশান্তির চাদরে জড়িয়ে নিতেন।

অপরদিকে আবু তালিবও বাইরে তাঁর বাহু এবং পুরো জাতির মোকাবিলায় প্রধান সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হতেন।

ইবনে হিশাম লেখেন—

> আবু তালিবের ইন্তেকাল কুরাইশ কাফিরদের জন্য নবিজিকে কষ্ট দেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। তারা তার জীবদ্দশায় যেই কষ্ট নবিজিকে দেয়নি, এবার তাও শুরু করে। এমনকি কুরাইশদের এক নির্বোধ ও হতভাগা নবিজিকে পথরুদ্ধ করে তাঁর মাথা মুবারকে মাটি ঢেলে দেয়। এই মাটিভরা অবস্থায়ই তিনি ঘরে ফিরলে এক মেয়ে মাথা ধুয়ে দেন আর কাঁদতে থাকেন। নবিজি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—

'মা গো, কেঁদো না। নিশ্চিত জেনে রাখো, তোমার বাবার হিফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ।'[১৭০]

এ বছর দাওয়াতের কাজে অসংখ্য কঠিন পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার কারণে তিনি এই বছরকে 'শোকের বছর' (عام الحزن) বলে ঘোষণা দেন।

* * *

১৭০ *সিরাতু ইবনি ইসহাক, তারিখুত তাবারি,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪৪

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

একটি প্রশ্ন ও উত্তর

মক্কায় দুর্বল মুসলিমদের শক্তি অর্জনের আগেই নবিজির পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক আবু তালিবকে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যু দিয়ে দেন। অথচ তখনও এক আবু তালিব ছাড়া আর কেউ ছিল না, যে কিনা নবিজির দেখভাল করবে এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে বাধাবিপত্তি এবং কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে থাকবে। আবু তালিব নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী নবিজির হিফাজত ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং যথাসম্ভব কাফিরদের জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিপদাপদ থেকে তাঁকে বাঁচাতেন। কাজেই এত তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কী হিকমত লুক্কায়িত ছিল?

অনুরূপ তিনি দাওয়াতি কাজে বাইরের সকল ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের পেরেশানি নিয়ে ঘরে এলে খাদিজা রা. থেকেই ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও প্রশান্তি লাভ করতেন। এবং এই দুজনের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশে তাঁর মনের দুঃখ-বেদনা বহুলাংশে কমে যেত। সুতরাং তাকেও দ্রুত উঠিয়ে নেওয়ার মধ্যে কী ভেদ বা রহস্য ছিল?

এ থেকে পরিষ্কারভাবে যেই হিকমত বা রহস্য বোঝা যায়, তা ইসলামি আকিদা-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তা হলো—আবু তালিব যদি নবিজির হিফাজত ও তত্ত্বাবধানের আরও সুযোগ পেতেন, আর এভাবেই একসময় মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করত এবং নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবে অনেকেরই ধারণা হতো—

'দাওয়াতি কার্যক্রমে তো আবু তালিবের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিলই, এবার এই ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমও হয়েছে তার পরোক্ষ দিকনির্দেশনা এবং সাহায্য-সহযোগিতায়। কারণ, স্বজাতির কাছে আবু তালিব ছিলেন বহু উঁচু স্তরের লোক। তাকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথেই দেখত। তিনি যদিও তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি, তবুও ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রমে এবং ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমে তার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা ছিল। যার ফলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সফল ও কামিয়াব হয়েছেন। পক্ষান্তরে বাকি সব মুসলিমকে এমন হিফাজত ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কাফিরদের অত্যাচার বেশি সইতে হয়েছে।'

ঠিক এ কারণেই খোদায়ি ফয়সালা ছিল আবু তালিব ও খাদিজা রা. ছাড়াও বাহ্যিকভাবে তাঁর অন্য সহযোগী ও সমর্থকদের উঠিয়ে নিয়ে নিচের দুটি বাস্তবতা সবার সামনে তুলে ধরা—

প্রথম বাস্তবতা : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কেউ যদি তাঁর সহযোগী নাও হতো, তবুও তিনিই তাঁর রাসুলকে মুশরিকদের থেকে হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর সত্তা নিরাপদ ও সুরক্ষিতই থাকত এবং তাঁর দাওয়াতি কার্যক্রম সফল হতোই।

দ্বিতীয় বাস্তবতা : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

আর আল্লাহই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।[১৭১]

এখানে মানুষের অনিষ্ট থেকে হিফাজত ও রক্ষার অর্থ এই নয় যে, কাফির-মুশরিকরা তাঁকে বাহ্যিকভাবে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় ফেলতে পারবে না; বরং এর অর্থ হলো—তারা তাঁকে খুন ও হত্যা করতে পারবে না।[১৭২]

এ ছাড়া অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট পরিমাণে নবিগণকে ভোগ করতে হয়েছে। কারণ, বাস্তবতা এটাই, হক ও সত্যের পথে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতেই হয়। এটা উক্ত হিফাজতের প্রতিশ্রুতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

অতএব, আপনি যেই বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করেন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করেন। আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আমিই যথেষ্ট।[১৭৩]

---

১৭১ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

১৭২ জ্বলন্ত ও বাস্তব প্রতিফলন হিজরতের রাতে হয়। কুরাইশি যুবকরা শত চেষ্টা ও কৌশল খাটিয়েও তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে পূর্বে বনি ইসরাইলের ইহুদিরা তাদের একাধিক নবিকে হত্যা ও খুন করেছে। তাদের ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি ছিল না।

১৭৩ সূরা হিজর, আয়াত : ৯৪-৯৫

আরেক আয়াতে বলেন—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ[১৭৪]

আমি খুব ভালো করেই জানি, এদের কথাবার্তার কারণে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। কাজেই আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাবাণীর মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকেন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। আর আপনার রবের ইবাদত করতে থাকেন মৃত্যু পর্যন্ত।

খোদায়ি নিয়মের দাবি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ হিকমত হলো—দাওয়াতি কার্যক্রমে নবিজি যেভাবে সর্বপ্রকার কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে তার উম্মতকেও ঠিক সেভাবে সকল প্রকার কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং সবকিছু সয়ে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং খুশির সাথেই সব ধরনের জ্বালা-যন্ত্রণা হজম করতে হবে। নবিজি যদি তাঁর দাওয়াতি মিশনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করেই গন্তব্যে পৌঁছে যেতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী দায়িগণ আরাম-আয়েশের জিন্দেগি কামনা করতেন এবং এ কাজে বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাকে অস্বীকার করতেন।

কিন্তু বাস্তব কথা হলো—নবিজির দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার কারণে ফল দাঁড়িয়েছে এই—উম্মত এখন যখন দাওয়াতি কাজে সেসবের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মনে পড়ে, নবিজিকেও তো এসবের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁকেও তো এসব ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করতে হয়েছে। (সুতরাং এতে দুঃখের কী আছে?) এসব ভেবে তারা হাসিখুশিতে সব বরণ করে নেয়। নবিজিকে সময়ে সময়ে হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে। যেমন : তাঁর মাথা মুবারকে মাটি ঢেলে দেওয়ার ঘটনা।

ভাবা যায়, কার মাথায় মাটি ঢালা হয়েছে? যিনি বিশ্বস্রষ্টা ও মহাশক্তিধর আল্লাহর বন্ধু এবং নিখিল জাহানের সকল কিছুকে বাদ দিয়ে যাকে তিনি বন্ধুত্বের জন্য বেছে নিয়েছেন তাঁর মাথায়!

অনুরূপ তায়েফ যাত্রায় তিনি যেসব কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি ও অসহনীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, সেগুলোও মুসলিমদের দাওয়াতি কাজে আপতিত সকল

---

১৭৪ সূরা হিজর, আয়াত : ৯৭-৯৯

নির্যাতন-নিপীড়নের মোকাবিলায় দৃঢ় থাকার উৎসাহ ও প্রেরণা জোগায়। ফলে তারা সহজেই এবং স্বাচ্ছন্দ্যেই সব দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নেয়।

'শোকের বছর' নামটি কেন

দ্বিতীয় যেই বিষয়টি এই পর্ব থেকে উঠে আসে, তা হলো—কারও কারও ধারণা, নবিজি নবুয়ত লাভের দশম বছরকে 'শোকের বছর' (আমুল হুজন/عام الحزن) নাম দিয়েছেন কেবল খাদিজা রা.-এর বিরহ বেদনা ও আবু তালিবের বিচ্ছেদের কারণে। আবার কেউ কেউ তো আরও অগ্রসর হয়েছেন। তারা নিজ আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় পরিজনদের মৃত্যুতে মাতম করা এবং দীর্ঘদিনব্যাপী শোক পালনের দলিল রীতিমতো উদ্ভাবন করেছেন সিরাতের এই পর্ব থেকে।

অথচ বাস্তবতার নিরিখে এসব মত ও মন্তব্য তাদের বোধ ও চিন্তার ভুল ও অশুদ্ধতা। নবিজি প্রিয় চাচা ও প্রিয়তমা সহধর্মিণীর বিচ্ছেদে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শোকাতুর হয়ে পড়েননি এবং এই দুই নিকটাত্মীয় ও মনের মানুষ হারানোর বেদনা ও দুশ্চিন্তার কারণেও এই বছরকে শোকের বছর নাম দেননি; বরং এই নামকরণের আসল কারণ তাদের দুজনের চলে যাওয়ায় দাওয়াতি কার্যক্রমের কয়েকটি দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

চাচা আবু তালিবের সহযোগিতায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সহজেই দাওয়াত পৌঁছাতে পেরেছেন; কিন্তু চাচার ইন্তেকালে সেই সুবিধাটি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যখনই দাওয়াতের জন্য বেরোতেন, তখনই সামনে একাধিক বাধা ও শত্রুতা পথ আটকে দিত। এবং যখনই কোনো দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। ফলে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যেভাবে ঘর থেকে বের হতেন, সেভাবেই আবার ঘরে ফিরে আসতেন। নতুন করে কেউ তাঁর ওপর ঈমান আনবে তো দূরের কথা, তাঁর কথাও শুনত না; বরং প্রত্যেকেই হাসি-তামাশা করত, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, কথার বিরোধিতা করত এবং অসম্মানজনক অভদ্র আচরণ করত। তিনি প্রাপ্ত দায়িত্বে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় খুবই চিন্তাগ্রস্ত ও মর্মাহত হতেন। আর এ কারণেই মূলত এ বছরের নাম দেন শোকের বছর; বরং তিনি তো কখনো কখনো এই ভেবে মর্মাহত হতেন—

> আমি যা নিয়ে এসেছি, তা অকাট্যভাবে শতভাগ সত্য হওয়ার পরও মানুষ কেন তা গ্রহণ করছে না? কেন আমার ওপর ঈমান আনছে না?

দিনের বেশির ভাগ সময় এই চিন্তাটাই তাকে কুরে কুরে খেত। তাঁর এই পেরেশানি কমাতে এবং মানসিক অশান্তি দূরীকরণ ও সমবেদনা জ্ঞাপনে আল্লাহ তায়ালা নিচের আয়াতগুলো নাজিল করেন। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সান্ত্বনা দিয়েছেন, আপনি শুধু দাওয়াত-তাবলিগের কাজ করেন। এর বেশি আপনার দায়িত্ব নয়। এরা যদি আপনার পৌঁছানো হকের বার্তা কবুল না করে, তাহলে খামোখা নিজের ওপর কোনো প্রেসার বা চাপ নেবেন না। কুরআনে কারিমের ভাষায়—

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

আমি ভালো করেই জানি, তাদের কথাবার্তা আপনাকে দুঃখিত করে। তবে এরা কিন্তু আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না; বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছে। অবশ্যই আপনার পূর্ববর্তী অনেক রাসুলকেও মিথ্যুক বলা হয়েছিল। তখন তাঁদের কাছে আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তাঁরা মিথ্যুক অভিহিত হওয়া ও কষ্ট পাওয়ার ওপর ধৈর্যধারণ করেছে। আল্লাহর কালিমার কোনো পরিবর্তনকারী নেই। অবশ্যই আপনার কাছে রাসুলগণের কিছু সংবাদ এসেছে। আর ওদের বিমুখতা প্রদর্শন যদি আপনার কাছে বড়ো মনে হয়, তবে আপনি যদি জমিনে কোনো সুড়ঙ্গ পেয়ে যান অথবা আসমানে ওঠার কোনো সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে পারেন; অতঃপর কোনো মুজিজা তাদের সামনে দেখান, তবুও (এরা ঈমান আনবে না)। আল্লাহ চাইলে অবশ্যই এদের হিদায়াতের ওপর একতাবদ্ধ করতে পারতেন। কাজেই আপনি কখনোই মূর্খদের দলভুক্ত হবেন না।[১৭৫]

* * *

১৭৫ সূরা আনআম, আয়াত : ৩৩-৩৫

তায়েফ যাত্রা

মক্কার কুরাইশরা জুলুম-নির্যাতনের শেষ সীমায় উপনীত হলে একদিকে সাহাবায়ে কিরাম হাবশায় হিজরত করেন, অপরদিকে নবিজি বনু সাকিফের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সত্য বাণী কবুল করে তাঁর ওপর ঈমান আনয়নের আশায় তায়েফ[১৭৬] অভিমুখে যাত্রা করেন।

তায়েফ পৌঁছার পর প্রথমেই সাক্ষাৎ হয় বনু সাকিফের একদল লোকের সাথে। এরা গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক। তিনি তাদের মাঝে বসেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দাওয়াত দেন। আর এতদূর আগমনের উদ্দেশ্যও জানান; কিন্তু এরা খুব বাজেভাবে তাঁর দাওয়াতের জবাব দেয় এবং এমন বিশ্রী ভাষায় কথাবার্তা বলে, যা তাঁর কাছে ছিল একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত ও আশাতীত। তিনি তাদের থেকে উঠে পড়েন এবং যাওয়ার সময় শেষ আবদার করেন—'আমার এখানে আসার খবর কুরাইশদের থেকে গোপন রাখবে।'

কিন্তু ওরা এ ব্যাপারেও তাঁকে ইতিবাচক কোনো উত্তর দেয়নি। এতেই ক্ষান্ত থাকেনি। তায়েফের এই নেতা ও প্রধানরা এলাকার দুষ্ট ও বাজে ছেলেপেলে আর গোলামদের তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়; ওরা যেন তাঁকে ঘিরে শোরগোল ও হইচই করে, পাগল-উন্মাদ বলে চ্যাঁচামেচি ও গালিগালাজ করে এবং সমান তালে পাথর

---

১৭৬ তায়েফ। বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিম-দক্ষিণের মাঝামাঝি একটি শহর। মক্কা থেকে ৯০ কিলোমিটার, জেদ্দা থেকে ১৬০ কিলোমিটার আর রাজধানী রিয়াদ থেকে ৯০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আরব উপদ্বীপের অন্যতম প্রাচীন নগর ও বাণিজ্য লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। জাহিলিয়াতের 'উকাজ' বাজার এই তায়েফের সীমারেখাতেই অবস্থিত। এলাকাটি কৃষির জন্য উর্বর। এখানকার উল্লেখযোগ্য মসজিদের মধ্যে আছে মসজিদে ইবনে আব্বাস রা. ও মসজিদে আদ্দাস রা.। এখানে অসংখ্য টিলা, ছোটো ছোটো লেক, পর্যটন স্পট আছে। *মাউসুআতু 1000 মাদিনাতি ইসলামিয়া* : ৩২৪-৩২৫

মারতে থাকে। ফলে ওরা তা-ই করতে শুরু করে। নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে আঘাতে নবিজির দুই পা মুবারক রক্তস্নাত হয়ে যায়।

এ সময় তাঁর সঙ্গী ছিলেন আজাদকৃত দাস জায়িদ ইবনে হারিসা রা.। তিনি আঘাত ঠেকাতে তাঁর সামনে নিজের শরীর পেতে দেন। আঘাতের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতায় তাঁর মাথাতেও কয়েকটি গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়।[১৭৭]

নবিজি এভাবে চলতে চলতে উতবা ইবনে রবিয়ার আঙুর বাগানে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি হাতের নাগালের বাইরে চলে আসায় ইবলিস ছেলেপেলেও ধীরে ধীরে ফিরে যায়। দুর্বলতা ও আঘাতের যন্ত্রণা তাঁকে বসে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে। তিনি আঙুর গাছের ছায়ায় বসে পড়েন। রবিয়ার দুই ছেলে দূর থেকে সব দেখছিল। কিছুক্ষণ ছায়ায় বসে কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করলে তিনি মাথা মুবারক ওঠান এবং দুআ করেন—

> হে মাওলায়ে কারিম, আমি আপনার কাছে আমার শারীরিক দুর্বলতা, আমলি শক্তির ঘাটতি আর মানুষের চোখে নিজের অসহায়ত্বের অভিযোগ করছি। হে করুণার আধার, আপনি সব দুর্বলের প্রভু। আপনি আমারও প্রভু। আপনি আমাকে কার কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন? আপনি কি আমাকে এমন কারও কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন, যে রুষ্ট চেহারায় আমার সামনে আসবে? আপনি কি আমার বিষয়াশয় কোনো শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার প্রতি নারাজ না থাকেন, তাহলে এসব কষ্ট আমার কাছে কিছুই না। তবে আপনার পক্ষ থেকে যদি আমি ক্ষমা ও শান্তি পাই, তাহলে তা আমার জন্য প্রশান্তি। আমি আপনার নুর ও আলোর আশ্রয়প্রার্থী; যেই নুরের ছটায় সকল আঁধার আলোকিত হয়ে যায়। দুনিয়া-আখিরাতের কাজকারবার সঠিক ও পুরস্কারযোগ্য হয়। আমার ওপর আপনার গজব পড়া থেকে আমায় রক্ষা করুন। আমার ওপর আপনি নারাজ থাকবেন না। আমি আপনার সন্তুষ্টির ভিখারি, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আপনার শক্তি ও জোর ব্যতীত আর কোনো শক্তি নেই।

---

১৭৭ *তাবাকাতু ইবনি সাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৬

নবিজির সাথে আদ্দাসের সাক্ষাৎ

নবিজির এসব আচরণ ও কাজ দেখে বাগানের মালিক রবিয়ার ছেলেদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা তাদের আদ্দাস নামের এক ঈসায়ি গোলামকে ডেকে আনে। এক থোকা আঙুরের একটি পাত্র আদ্দাসের হাতে দিয়ে নবিজির কাছে পাঠায়। আদ্দাস আঙুরের পাত্র নিয়ে নবিজির সামনে হাজির হয় এবং সম্মানের সাথে খেতে বললে তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত বাড়ান এবং কয়েকটি আঙুর খান।

নবিজির বিসমিল্লাহ উচ্চারণ শুনে আদ্দাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, খোদার কসম! খাওয়ার আগে এ রকম কথা তো এই এলাকার কারও মুখে শোনা যায় না। (আপনি তাহলে)? নবিজি জানতে চান, তুমি কোন এলাকার এবং তোমার ধর্ম কী? সে উত্তর দেয়—আমি একজন ঈসায়ি (খ্রিষ্টান)। আমার বাড়ি মাওসিলের[১৭৮] নিনওয়া।[১৭৯] তিনি জিজ্ঞেস করেন, ও তুমি কি তাহলে আল্লাহর নেক বান্দা ইউনুস ইবনে মাত্তার এলাকার?

আদ্দাস জিজ্ঞেস করে—আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে কীভাবে চেনেন?

নবিজি জবাব দেন—তিনি তো আমার দ্বীনি ভাই। তিনি নবি ছিলেন আর আমিও নবি। এ কথা শুনতেই আদ্দাস নবিজির একেবারে কাছে এসে তাঁর মাথা, হাত ও পা মুবারকে চুমু খেতে থাকে।

জিনদের তিলাওয়াত শ্রবণ

ইবনে ইসহাক বলেন—

নবিজি তায়েফ থেকে মক্কায় ফেরার সময় পথমধ্যে নাখলা[১৮১] নামক স্থানে সালাতে দাঁড়ান। ঘটনাক্রমে একদল জিন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কানে নবিজির

---

১৭৮ মাওসিল বা মওসুল বা মসুল। উত্তর ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী। নিনওয়া জেলার বিভাগীয় শহর। হিজরি প্রথম শতকেই এখানে ইসলাম পৌঁছে। জনসংখ্যার বিবেচনায় রাজধানী বাগদাদের পরই এর স্থান। শহরটি বাগদাদ থেকে ৪৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ শহর নিয়ে আছে বহু ইতিহাস। *মাউসুআতু 1000 মাদিনাতি ইসলামিয়া* : ৪৮৯

১৭৯ নিনওয়া। পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরগুলোর একটি। বর্তমান ইরাকের উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। এর পশ্চিমে সিরিয়া। এটি দজলার উত্তরে আর এর বিপরীতে মাওসিল। আশুরি সম্রাট নিনাউস নিজের নামে এ নগরীর গোড়াপত্তন করে। তারপর একসময় নগরটি ধর্মীয় কেন্দ্রের রূপ নেয়। পরবর্তী সময়ে মাওসিল শহর প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে এটাই বড়ো ও ব্যস্ত নগরীতে পরিণত হয়। আর নিনওয়া হয়ে যায় তার অংশ ও জেলাশহর।

১৮০ দ্রষ্টব্য : *ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২০

১৮১ নাখলা উপত্যকা। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। বনু হুজাইলের আবাসস্থল। এর একটি পথ গেছে ইয়ামানের দিকে, আরেকটি গেছে বৃহত্তর শামের দিকে।

তিলাওয়াতের শব্দ পৌঁছতেই তারা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় এবং নবিজির পুরো তিলাওয়াত শোনে। সালাত শেষ হলে তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ দেয় এবং ভয় দেখায়। তারা সবাই শ্রুত বাণী মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে। এই ঘটনাটিই আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেন—

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

স্মরণ করেন ওই সময়কে, যখন একদল জিনকে আপনার অভিমুখী করে দিয়েছিলাম; যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। তারা যখন আপনার কাছে পৌঁছে, তখন পরস্পরে বলে—সবাই চুপ থাকো। তারপর যখন তিলাওয়াত শেষ হয়, তখন তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায় ভীতি প্রদর্শকরূপে। তারা গিয়ে বলে—হে আমাদের জাতি, আমরা এমন এক কিতাব শুনে এসেছি—যা মুসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারীরূপে। যা সত্য ও সরল পথপ্রদর্শন করে। হে আমাদের জাতি, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে আশ্রয় দেবেন।[১৮২]

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ...

আপনি বলে দিন, আমার কাছে ওহি এসেছে যে, একদল জিন মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছে।[১৮৩]...

নবিজি জায়িদ রা.-কে নিয়ে আসতে আসতে যখন মক্কার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন, তখন জায়িদ রা. জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কীভাবে মক্কায় প্রবেশ

১৮২ সূরা আহকাফ, আয়াত : ২৯-৩১
১৮৩ সূরা জিন, আয়াত : ১

করবেন, ওরা তো আপনাকে এখান থেকে বের করে দিয়েছে? নবিজি জবাব দেন—

> জায়িদ, তুমি যা দেখছ, আল্লাহ তায়ালা তাতে প্রশস্ততা দেবেন। তিনি একটা উপায় বের করে দেবেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। তাঁর নবিকে বিজয় দানকারী।

তিনি এই বলে জায়িদ রা.-কে বনু খুজাআর মুতয়িম ইবনে আদির কাছে পাঠান এবং জানাতে বলেন—তিনি তার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে চান। মুতয়িম খবর পাওয়ামাত্র প্রস্তাব গ্রহণ করে। এভাবে নবিজি পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করেন।[১৮৪]

* * *

১৮৪ *তাবাকাতু ইবনি সাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৬; *ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮১

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

নবিজির তায়েফ যাত্রা, সেখানে তাঁর ওপর চালানো জুলুম-নির্যাতন এবং তারপর মক্কা ফিরে দাওয়াতের নতুন কর্মপন্থা ও কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করলে সেগুলোকে এভাবে বর্ণনা করা যায়—

নবিজিকে যেসব কঠিন পরিস্থিতি ও দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিশেষ করে এই তায়েফ যাত্রায় যেসব অত্যাচার ও নিপীড়ন সইতে হয়েছে, সবকিছুরই সম্পর্ক দাওয়াত-তাবলিগের সাথে।

তিনি যেভাবে আমাদের কাছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যাপারে আকিদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধ ও বাস্তবিক জ্ঞান পৌঁছিয়েছেন এবং হুকুম-আহকাম, ইবাদত-বন্দেগি, স্বভাব-চরিত্র ও ইসলামের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন, ঠিক সেভাবে মুসলিমদের আল্লাহর রাস্তায় কী পরিমাণ ধৈর্য ধরতে হবে, তাও বলেছেন। শুধু বলেননি, বরং ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিজ আমল ও কর্মজীবনের মাধ্যমেও দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا...

> ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো। দৃঢ়পদ থাকো এবং যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকো...[১৮৫]

নবিজি 'তোমরা ঠিক সেভাবেই সালাত পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো' বলে যেভাবে সালাতের ধরন-পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে ঘোষণা দিয়েছেন—

---

১৮৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২০০

তোমরা আমার আমল দেখে দেখে তোমাদের সব ইবাদত-পদ্ধতি শিখে নাও।

এর ওপর বিবেচনা করে এবং এই মৌলিক কাজের ওপর অন্য সব আমলের ভিত্তি দাঁড় করিয়ে দাওয়াতের কাজে নানা ধরনের, নানা প্রকারের কষ্ট-যন্ত্রণা বরদাশত করার ব্যাপারে তিনি বলেন—'তোমরাও তেমন ধৈর্যধারণ করো, যেমন আমাকে করতে দেখো।'

এ থেকে পরিষ্কার, ঝামেলা ও বিপদাপদে ধৈর্য ধরা, কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি এবং সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন অবস্থার মোকাবিলা করাও ইসলামের ভিত্তিমূলক ও মৌলিক বিষয়। যেগুলোর ব্যাপারে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নবিজি নিজেও সেই নির্দেশের অধীন।

নবিজির তায়েফ সফর থেকে কারও মনে খটকা লাগতে পারে—

(নাউজুবিল্লাহ) তিনি সেখানে পরাজিত হয়েছেন। সেখানেও তাঁর ওপর জুলুমের শেষ সীমা অতিক্রম করা হয়। এতে তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত ও চোট লাগে। তাই তিনি বাগানে যাওয়ার পর মনের দুঃখে আল্লাহর কাছে ওই দুআ করেন।

কিন্তু এই ধারণা শুধু ধারণাই; বরং আসল ও বাস্তব কথা হলো—তিনি এইসব জুলুম-নির্যাতন ও বিপদাপদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকেই ধৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমে এসব কঠিন পরিস্থিতি ও চরম দুরবস্থার মোকাবিলা করেন।

অন্যথায় তিনি চাইলে ওইসব বাজে ও দুষ্ট ছেলেপেলে এবং ওদের উসকানিদাতা তায়েফ নেতৃবৃন্দের থেকে প্রতিশোধ ও বদলা নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এর দলিল 'সহিহ বুখারি' ও 'সহিহ মুসলিম'-এর বর্ণিত হাদিস। আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

একবার আম্মাজান আয়িশা নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার জীবনে কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন ও বেদনাদায়ক কোনো দিন অতিবাহিত হয়েছে?

জবাবে তিনি বলেন—তোমার জাতি থেকে আমাকে কয়েকবার কষ্টে পড়তে হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দিন 'ইয়াওমুল আকাবা'

তথা তায়েফের দিন। আমি ইবনে আবদ ইয়ালায়ল ইবনে আবদ কিলাল[১৮৬]-এর সামনে গিয়ে দাওয়াত পেশ করলে সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। আমার মুখ যেদিকে ফিরে সেদিকেই চলতে থাকি। যেতে যেতে আমি 'করনুস সাআলিব'[১৮৭]-এ পৌঁছে ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি, মেঘেরা আমার ওপর ছায়া দিয়ে আছে।

লক্ষ করলাম, তাতে জিবরাইল আ. উপস্থিত। তিনি আমাকে লক্ষ করে বলেন—আপনার জাতির সব বেয়াদবিমূলক কথাবার্তা আপনার রব শুনেছেন। আপনার দাওয়াতের জবাব যে তারা কী এবং কীভাবে দিয়েছে, তাও তাঁর জানা হয়েছে। তিনি এই মুহূর্তে আপনার ইচ্ছাপূরণে পর্বতমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের পাঠিয়েছেন।

অতঃপর প্রধান ফেরেশতা আমায় সালাম দিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ আপনার জাতির অশোভনীয় জবাব শুনেছেন। আমি পর্বতমালার নিয়োজিত প্রধান ফেরেশতা। আপনার রব আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার ইচ্ছা পূরণে। বলুন, আপনার ইচ্ছা কী? আপনি চাইলে এদের দু-দিকের পাহাড় দিয়ে পিষে ফেলি। নবিজি জবাব দেন—না। এমন করবেন না। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তায়ালা এদের ঔরসে এমন প্রজন্মের আগমন ঘটাবেন, যারা তাঁর ইবাদতগুজার হবে।

নবিজি এভাবে তার প্রিয় ছাত্র সাহাবায়ে কিরামকে কঠিন পরিস্থিতি ও মহাবিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করতে শিখিয়েছেন; বরং এ পথে যেকোনো বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ এবং দৃঢ় ও অনড় থাকার নিয়মিত পাঠদান করেছেন।

একটি প্রশ্ন

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে—

আচ্ছা তা-ই যদি হয় তাহলে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা এবং দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে দুআ করার দরকার কী ছিল?

---

১৮৬ ইবনে আবদ বা লাইল ইবনে আবদ কিলাল। বনু সাকিফের বড়ো একজন সর্দার ও মাতব্বর।

১৮৭ করনুস সাআলিব। উদ্দেশ্য করনুল মানাজিল। এটা নজদবাসীর ইহরাম বাঁধার মিকাত। মক্কা থেকে এক দিন ও এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত।

প্রশ্নের উত্তর

এর উত্তর হলো—মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর সামনে নিজেকে হীন ও তুচ্ছ হিসেবে পেশ করা, নিজের কমজোরি ও দুর্বলতা তুলে ধরাই তাঁর পূর্ণ ইবাদত-বন্দেগি ও তাঁর নৈকট্যলাভের মাধ্যম এবং সান্নিধ্যের উপায়।

এতে রহস্য হলো—বিপদাপদ ও ব্যথা-বেদনায় পীড়িত ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং ইবাদত-বন্দেগি প্রদর্শন করে আল্লাহর দরবারে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে সে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর নৈকট্যলাভে ধন্য হয়।

তো এভাবে ধৈর্যধারণের সাথে আল্লাহর দরবারে কল্যাণের দুআ করা এবং দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করার মাঝে কোনো সংঘর্ষ বা বৈপরীত্য নেই; বরং নবিজি তো আমাদেরকে তাঁর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনাদর্শের মাধ্যমে এই শিক্ষাটাই দিয়েছেন, বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণের পাশাপাশি বিপদাপদের মালিক আল্লাহর দরবারে কায়মনো বাক্যে দুআ করা বিশিষ্ট লোকদের আমল এবং সাথে সাথে নিজের হীনতা, দীনতা, তুচ্ছতা ও অক্ষমতা মুখ ফুটে বলা ও প্রকাশ করা ইবাদতের সর্বোচ্চ তরিকা।

মানুষ নিজে সাধনা করে বা অলৌকিকভাবে মানবিক উৎকর্ষের যত ওপরই উঠুক না কেন, সে সর্বদা মানবত্বের গণ্ডির ভেতরেই থাকে। এর বাইরে যায় না। কারণ, আদমসন্তান হওয়ার কারণে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে ভালো-মন্দের অনুভব ও উপলব্ধি থেকেই যায়। ফলে সে মজাদার নিয়ামতের স্বাদ যেমন আস্বাদন করতে পারে, ঠিক তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদাপদ ও ব্যথা-বেদনার তিক্ততাও চাখতে পারে। দু-অবস্থায় সে অটোমেটিক দু-ধরনের স্বাদগ্রহণে মুকাল্লাফ ও বাধ্য।

এই সবকিছুর মর্ম হলো—নবিজি যদিও যেকোনো কষ্ট বা বিপদের মুখোমুখি হতে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সব সময় প্রস্তুত রাখার অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন, তাই বলে তাঁর মানবত্বের বৈশিষ্ট্যও বিলীন হয়ে যায়নি। যে কারণে মজাদার নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করতেন এবং কষ্টদায়ক নিয়ামতের বিস্বাদও অনুভব করতেন। তবে তিনি আল্লাহর পথে স্বাদ ও ভোগের নিয়ামতের তুলনায় বালা-মুসিবত, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট খুশিমনে ও আনন্দচিত্তে বরণ করে নিতে পারতেন। শুধু এবং শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আর তাঁর উপযুক্ত বন্দেগি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এটাই সাওয়াব অর্জন এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও রাজি-খুশি অর্জনের উপায় ও মাধ্যম। আর এভাবেই তার মুকাল্লাফ হওয়ার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

সিরাতের বিভিন্ন ঘটনা ও দৃশ্যপট পর্যালোচনা ও গবেষণায় উঠে আসে, নবিজিকে স্বগোত্রীয় মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট প্রদানের তুলনায় তায়েফ ভূখণ্ডে তীব্র ও মারাত্মক নিপীড়ন ও যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে; কিন্তু যখনই তাঁকে কষ্টে ফেলা হয়েছে, তখনই আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। তিনি প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তিনি তাঁর হাবিবকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাঁর নবির ওপর দয়া প্রদর্শন করেছেন। যেন লাগাতার দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতির কারণে তাঁর মনে নিরাশা বাসা বাঁধতে না পারে।

আগে গিয়েছে, এই তায়েফ যাত্রায় দুষ্ট ও বাজে ছেলেদের পাথর নিক্ষেপের ফলে শারীরিক কষ্ট আর দাওয়াত অস্বীকারের কারণে মানসিক যন্ত্রণা—দু-ধরনের আঘাতই নবিজি পেয়েছেন। মক্কার মতো এখানেও আল্লাহ তায়ালা এই জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তায়েফের যেই বাজে ও দুষ্ট ছেলেপেলে তাঁকে পাথরের পর পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছে এবং যেসব নেতা ওদের উসকানি দিয়েছে আর নবিজিকে করেছে গালমন্দ, সবার ব্যাপারেই তিনি কঠিন ধমকি শোনান; কিন্তু এই সফরেই আবার ঘটেছে ঈসায়ি আদ্দাসের ইসলাম গ্রহণের যথেষ্ট প্রশান্তি ও সান্ত্বনাদায়ক ঘটনাও। আদ্দাস মুসলিম হয়ে নবিজির মাথা-হাত-পা মুবারকে চুমু খায়। এতে বনু সাকিফের বদমাইশ ও হতভাগা পশুদের বেয়াদবি ও অভদ্রতার রেশ অনেকাংশে কেটে যায়।

প্রসঙ্গত এখানে মুস্তাফা সাদিক রাফিয়ি মিশরি রহ. (১২৯৮-১৩৫৬/১৮৮০-১৯৩৭)-এর কিছু কথা তুলে ধরা হলো। তিনি তার *ওয়াহয়ুল কলাম* গ্রন্থে তায়েফের ঘটনা উল্লেখের পর লেখেন—

> কত বিস্ময়কর! তায়েফের ঘটনায় খোদায়ি ফয়সালার কত রহস্য-ভেদ সুপ্ত ছিল! কত দ্রুত মান-মর্যাদা ও উত্তম অবস্থা এসে ধরা দেয়! কাফিরদের মন্দত্ব, নির্বুদ্ধিতা ও শত্রুতার ওপর ক্ষমা চায়। সমালোচনা, গালিগালাজ ও বাজে শব্দে অভিহিত করার পরপরই আদব ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়। এবং হাত-পা চুমুতে সিক্ত করা হয়!
>
> রবিয়ার দুই ছেলেও ইসলামের শত্রু ছিল। এবং তাদের সঙ্গী ছিল যারা আবু তালিবকে হুমকি দিয়েছিল, আপনি আপনার ভাতিজাকে মুক্ত করে দেন। তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অথবা তাঁকে আমাদের হাতে তুলে দেন। নতুবা এরা আপনাদের সাথে লড়াই শুরু করবে এবং দুই পক্ষের

একপক্ষ বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাতেই থাকবে; কিন্তু এদের দুজনের পাশবিক মেজাজ ও হিংস্র স্বভাব ওই সময় মানবিক গুণ ও চরিত্রে পরিবর্তন হয়ে যায়—যেই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে এই দ্বীনের আগমন ঘটেছে। কারণ, দ্বীনের ভবিষ্যত চিন্তাভাবনার সাথে সম্পৃক্ত, কঠোর মেজাজ বা হিংস্র স্বভাবের সাথে নয়।

অনুরূপ খাঁটি ঈসায়ি শরিয়তও (বর্তমান) ইসলামের (অর্থাৎ শরিয়তে মুহাম্মাদির) খুবই ঘনিষ্ঠ এবং ইসলামকে (শরিয়তে মুহাম্মাদিকে) শ্রদ্ধা করে। কারণ, একটি সঠিক ও সত্য বিষয় তার মতো আরেকটি বিষয়ের সাথে ভাই ভাই আচরণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে পার্থক্য হলো—দুই ভাইয়ের মধ্যে থাকে রক্তের সম্পর্ক, আর দুই শরিয়তের মধ্যে আছে বিবেক-বুদ্ধির।

তায়েফের ওই আঙুরের ঘটনায় খোদায়ি সিদ্ধান্তের রহস্য ও ভেদের পূর্ণতা পায় এভাবে—আঙুরের পাকা মিষ্টি ও রসে ভরা যেই থোকাটি নবিজির সামনে পেশ করা হয় এবং নবিজির পবিত্র মুখে বিসমিল্লাহ উচ্চারিত হয় সেটাতে লুক্কায়িত ভেদটি হলো রসে ভরা আঙুরের থোকার দ্বারা ইঙ্গিত ভবিষ্যতের বিরাট ইসলামি সাম্রাজ্য। আর প্রতিটি আঙুর দ্বারা ইঙ্গিত বিরাট সাম্রাজ্যের একেকটি রাষ্ট্র।[১৮৮]

জায়িদ ইবনে হারিসা রা. নবিজির সুরক্ষা নিশ্চিতের যেই চেষ্টা চালিয়েছেন, তাও বিশ্ব মুসলিমের জন্য একটি উপমা ও দৃষ্টান্ত। দুষ্ট ছেলেরা যখনই নবিজির দিকে পাথর ছুড়ত তিনি নিজের শরীর নবিজির সামনে পেতে দিতেন। ফলে নিক্ষেপের তীব্রতা ও আধিক্যের কারণে তার মাথায়ও একাধিক আঘাত ও জখম তৈরি হয়।

এই ঘটনায় তার প্রতিরোধকর্ম সকল মুসলিমের জন্য এক নমুনা ও আদর্শ স্থাপন করেছে যে, তারাও মুসলিম উম্মাহর প্রধান ব্যক্তি খলিফা বা ইমামের প্রাণ রক্ষার্থে নিজেদের জীবন কুরবান করে দেবে। নবিজির সাথে সাহাবায়ে কিরামের এত গভীর হৃদ্যতা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল যে, তারা তাঁর জীবন বাঁচাতে নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করতেও কোনো কষ্ট অনুভব করতেন না। আজ যদিও তিনি সশরীরে আমাদের মাঝে উপস্থিত নন যে আমরা তার চারপাশে প্রতিরক্ষা বলয় তৈরি করে তাঁর হিফাজত করব, তবে এখন তার বিকল্প হলো—ইসলাম ও দাওয়াত-

---

১৮৮ *ওয়াহয়ুল কলাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০

তাবলিগের পথে বিপদাপদ বা দুঃখ-কষ্ট দেখে পালিয়ে না যাওয়া। আর ইসলামের প্রচার-প্রসারে এবং দিগ্বিদিক তার আলো ছড়িয়ে দিতে নবিজি যেমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা করেছেন, আমাদেরও তেমন মেহনত-মুজাহাদা চালিয়ে যাওয়া। সর্বযুগে ও সর্বকালে ইসলামের পথে পরিচালনাকারী বিদ্যমান ও সক্রিয় ছিল, আছে এবং থাকবেই। এ কাজে তারাই নবিজির স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিরূপের মতো।

সকল মুসলিমের ওপর ফরজ সবাই তার একনিষ্ঠ সমর্থক ও সৈনিক হবে। তার চারপাশে বৃত্তাকার বানিয়ে তার হিফাজতে লেগে থাকবে এবং তার জীবনরক্ষায় নিজেদের জানমাল সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে, যেমনটি সাহাবায়ে কিরাম করেছেন নবিজির জন্য।

জিনজাতির সাক্ষাৎ

নাখলায় নবিজির উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতের সাথে সালাত আদায় এবং তিলাওয়াত শুনে একদল জিনের ইসলাম গ্রহণের যেই ঘটনা ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তা থেকে পৃথিবীতে জিনজাতির উপস্থিতি, তাদের চলাফেরা এবং মানবজাতির মতো মুকাল্লাফ তথা ধর্মীয় বিধিবিধান আরোপের উপযুক্ত ও বাধ্য হওয়া ইত্যাদি প্রমাণিত। মানুষের মতো অবস্থা তাদেরও। তাদের মধ্যেও কিছু জিন নবিজির ওপর ঈমান এনেছে, আবার কিছু কুফরি করেছে।

এই দলিল অকাট্যতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কারণ, কুরআনে কারিমে অকাট্য ও স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সূরা জিনের প্রাথমিক কয়েকটি। সূরা আহকাফ-এর তিন (২৯-৩১) আয়াত।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের বর্ণিত এই এক ঘটনাই ইমাম বুখারি মুসলিম তিরমিজি রহ.-ও রেওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি রহ.-এর বর্ণিত শব্দগুলো এই—

> নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে উকাজ[১৮৯] বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। আর তখন শয়তান তথা জিনদের আসমানে আরোহণ ও চুপিচুপি

---

১৮৯ উকাজ বাজার। তায়েফ শহরের উত্তরে ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গঞ্জ। ৫০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রাক-ইসলামি যুগের প্রধান তিনটি বাজারের মধ্যে একটি। আরবরা জিলকদের প্রথম বিশ দিনের জন্য এখানে এসে জিনিসপত্র বিক্রি করত এবং কবিতা আবৃত্তি করত। তারপর তারা মাজান্না বাজারে শেষ দশ দিন বেচাকেনা করত। তারপরে জিলহজ মাসের প্রথম আট দিন জুল মাজাজ বাজারে অতিবাহিত করে হজের উদ্দেশ্যে রওনা করত। এ বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রথম বসতি ছিল আদাওয়ান ও হাওয়াজিন গোত্রের।

খবরাখবর সংগ্রহের সুযোগ বন্ধ ছিল। উপরন্তু তাদের ওপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো। এমতাবস্থায় জিনেরা তাদের জাতির কাছে ফিরে গিয়ে পরামর্শে বসে। তারা বলতে থাকে, আমাদের আর আসমানের মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো অন্তরাল ও বাধা সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা আমাদের ওপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয় কেন? সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলে, আমাদের এই সমস্যা নতুন কোনো ঘটনা বা প্রেক্ষাপটের কারণে তা খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই তোমরা পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ো এবং তা খুঁজে বের করো। অতএব, তারা নতুন কারণ উদঘাটনে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে।

> তাদের যেই দলটি তিহামার[১৯০] উদ্দেশে যাচ্ছিল, তারা উকাজ বাজার অতিক্রমের সময় নাখলায় নবিজির সাক্ষাৎ পায়। নবিজি এখানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনরা নবিজির তিলাওয়াত শুনে বলে, এটাই ওই বিশেষ ঘটনা ও কারণ—যা আমাদের মাঝে আর আকাশের বিষয়বস্তুর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সেখান থেকেই নিজ এলাকায় ফিরে যায় এবং জাতিকে লক্ষ করে বলে—ভাইয়েরা, নিশ্চিতভাবে তোমরা জানো, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন তিলাওয়াত শুনেছি; যা হিদায়াতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কাজেই আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন থেকে আমরা আমাদের রবের সাথে আর কিছুকে শরিক করব না। আল্লাহ নবিজিকে এই খবর জানিয়ে দিতে নাজিল করেন—
>
> قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ...
>
> আপনি বলে দেন, আমার কাছে ওহি এসেছে, একদল জিন মনোযোগ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছে।[১৯১]

ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিজি রহ.-ও উপর্যুক্ত শব্দেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাদের বর্ণনার শুরুতে কয়েকটি শব্দ বেশি আছে। শব্দগুলো এই—

---

১৯০ তিহামা। লোহিত সাগরের উপকূলীয় আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাংশকে অতীতে বলা হতো।

১৯১ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৭৩

'নবিজি জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনাননি এবং তারা তাঁর দৃষ্টিগোচরও হয়নি।'

ইবনে হাজার আসকলানি রহ. *ফাতহুল বারি*তে লেখেন—উল্লিখিত শব্দমালা ইচ্ছে করেই হয়তো ইমাম বুখারি রহ. অনুল্লেখ রেখেছেন। কারণ, ইবনে মাসউদ রা. প্রমাণ করেছেন, নবিজি জিনদের তিলাওয়াত শুনিয়েছেন। কাজেই ইতিবাচক বিষয়টি ইবনে আব্বাস রা.-এর নেতিবাচক বর্ণনার ওপর অগ্রগণ্য। আর এদিকেই সম্ভবত ইমাম মুসলিম রহ. ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই তিনি তার গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের পরে ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদিস এনেছেন। তাতে বর্ণনা করেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

আমার কাছে জিনদের একজন দায়ি আসে। আমি তার সাথে যাই এবং জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়ে আসি।[১৯২]

তারপর কথা হলো—ইমাম বুখারি, মুসলিম ও তিরমিজি রহ. যেই বিবরণ তুলে ধরেছেন, সেগুলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সাথে দুভাবে কিছুটা ব্যতিক্রম—

প্রথমত : ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় নবিজির সালাত আদায়ের কথা নেই। তার বর্ণনায় বোঝা যায়, তিনি একাকী সালাত আদায় করেছেন। বিপরীতে অন্যান্য সব বিবরণে আছে, তিনি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাতে নিজে ইমাম হয়ে তা আদায় করেছেন।

দ্বিতীয়ত : ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় নির্দিষ্ট করে কোনো ওয়াক্তের কথা নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ফজরের সালাতের উল্লেখ রয়েছে।

ফলাফল দাঁড়ায়—ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অভিযোগের ঊর্ধ্বে। বিপরীতে অন্যান্য রেওয়ায়াতে দু-ধরনের আপত্তি থাকে—

প্রথম আপত্তি : তায়েফ সফরে নবিজির সাথে জায়িদ ইবনে হারিসা রা. ছাড়া আর কোনো সাহাবি ছিলেন না। এটাই সকল সিরাত বিশেষজ্ঞের মত। অতএব, নবিজি যে সাহাবায়ে কিরামের এক জামাত নিয়ে সালাত আদায় করেছেন, তার দলিলের মজবুতি কী?

---

১৯২ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৭৩

দ্বিতীয় আপত্তি : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়েছে মিরাজের রাতে। আর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে তায়েফ সফরের পরে। এই সিদ্ধান্তই সকল মুহাক্কিক তথা বিশ্লেষক ও গবেষক উলামায়ে কিরামের। কাজেই ফজরের সালাত আদায়ের বর্ণনার শুদ্ধতা ও সঠিকতা কোথায় থাকল?

প্রথম আপত্তির জবাব : এমন হতে পারে, নবিজি তায়েফ থেকে মক্কায় ফেরার পথে নাখলায় পৌঁছলে সাহাবায়ে কিরামের এক জামাতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। আর সেখানে তিনি তাদের নিয়ে ফজরের সালাত নিজে ইমামতিসহ আদায় করেন।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব : হতে পারে নবিজির সাথে জিনদের সাক্ষাৎ ও কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তো একবারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রা., আরেকবারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইবনে মাসউদ রা.। তাহলে তো কোনো ঝামেলা থাকে না। প্রত্যেক বর্ণনা স্ব-স্ব স্থানে ঠিক।

এই সম্ভাবনাগুলোর ওপরই ইবনে হাজার রহ.-সহ জমহুর মুহাক্কিক আলিমের ঐকমত্য। এটা ওই অবস্থায়, যখন মিরাজের ঘটনা তায়েফ সফরের পরে হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি তায়েফ সফরের আগে হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে কোনো রিওয়ায়াত নিয়েই ঝামেলা নেই।

জিনজাতির মুকাল্লাফ হওয়ার বিশ্বাস রাখা

এই ঘটনা পর্যালোচনায় যেই কথাটি জানা আমাদের জন্য জরুরি, তা হলো—জিনজাতির অস্তিত্ব ও উপস্থিতি, তাদেরও আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি হওয়া এবং আমাদের মতোই তারাও তাঁর হুকুম-আহকামের মুকাল্লাফ হওয়ার প্রতি প্রত্যেক মুসলিমের ঈমান ও বিশ্বাস রাখা; যদিও আমরা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের বুঝতে পারি না।

তাদেরকে আমাদের অনুভব না করতে পারার কারণ হলো—আল্লাহ তায়ালা তাদের উপস্থিতিকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির আওতাহীন রেখেছেন। ফলে আমরা তাদের দেখতে পারি না। আর এটা তো সর্বস্বীকৃত, আমাদের দৃষ্টিশক্তি কেবল সরল রেখায় বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট দূরত্বের বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতেই সক্ষম।

এই সৃষ্টির অস্তিত্বশীলতা যেহেতু কুরআন-হাদিসের অকাট্য বর্ণনায় প্রমাণিত এবং বিষয়টি জরুরিয়াতে দ্বীন[১৯৩] তথা দ্বীনের অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় অংশে পরিণত হয়েছে, সেহেতু সকল আলিমের অভিমত এটাই—কেউ যদি জিনজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে বা সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে মুরতাদ ও কাফির হয়ে যাবে।

অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত কোনো জ্ঞানী ও বিবেকবান লোকের উচিত নয়, তিনি দাবি তুলবেন—তিনি কেবল আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত বিষয়গুলোই মানবেন। এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অহংকার করে বলবেন—'আমি জিনজাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কারণ, কোনো জিন আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আবার আমার শরীরেও কখনো ভর করেনি। অতএব, জিন বলতে কিছুই নেই।'

এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট, এ ধরনের দাবির দ্বারা অসংখ্য অকাট্য বিদ্যমান বস্তু ও সৃষ্টি অটোমেটিক অস্বীকার করা হয়। অথচ বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ থিওরি হলো—কোনো জিনিসের নাগাল না পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, জগতে জিনিসটাই নেই। অর্থাৎ কোনো জিনিস খুঁজতে গিয়ে যদি পাওয়া বা দেখা না যায়, তাহলে এতে জিনিসটার অস্তিত্বহীনতা বোঝায় না।

একটি প্রশ্ন

তায়েফ সফরে নবিজি যা কিছু দেখেছেন, অথবা যেসব সমস্যায় তাঁকে পড়তে হয়েছে, সেগুলো তাঁর ওপর কী প্রভাব ফেলেছে?

প্রশ্নের উত্তর

এই প্রশ্নের উত্তর তা-ই, যা নবিজি জায়িদ ইবনে হারিসা রা.-কে দিয়েছেন। জায়িদ রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি মক্কায় আবার কীভাবে প্রবেশ করবেন? ওরা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে!

উত্তরে নবিজি বলেছিলেন—জায়িদ, তুমি যেসব দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছ, আল্লাহ তায়ালাই এসবের প্রশস্ততা দানকারী এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর নবির সাহায্যকারী ও রক্ষক।

---

১৯৩ যেসব বিষয় শরিয়তে মুহাম্মাদির অন্তর্ভুক্ত বলে ধারাবাহিক পরম্পরায় বর্ণিত এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবারই জানা, সেগুলোকে জরুরিয়াতে দ্বীন। যেমন—সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত, আল্লাহর একত্ববাদ, নবিজির শেষ নবি হওয়া ইত্যাদি। সূত্র : দারুল ইফতা, অনলাইন, দারুল উলুম দেওবন্দ।

নবিজিকে তায়েফে যেই দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আগে মক্কায় যেসব অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হয়েছে, সেগুলোর কারণে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও নিজের ভেতরের ইচ্ছাশক্তির ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি; বরং তিনি ছিলেন প্রশান্ত এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপক্ক ও পূর্ণ বিশ্বাসী। আল্লাহর কসম! তাঁর আত্মা সাধারণ কোনো আত্মা নয়; বরং তাঁর হৃদয়জুড়ে নবুয়তের বিশ্বাস ছিল অটল ও সুদৃঢ়। তিনি অকাট্যভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর হুকুম কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবেই।

তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন, আল্লাহর আদিষ্ট পথেই তিনি চলমান এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহ তাঁর কাজকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেনই। তিনি প্রতিটি ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছেন। অপেক্ষা শুধু সেই সময়ের।

এতে আমাদের জন্য একটি ইলমি ফায়েদা বা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ রয়েছে যে, যতক্ষণ আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং তাঁর তাওফিকে তাঁর পথে চলতে থাকব, ততক্ষণ দাওয়াতি কার্যক্রমে আপতিত নানা পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট আমাদের এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এবং আমাদের মধ্যে অলসতা ও নির্মোহতাও সৃষ্টি হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে বলীয়ান হয়, অলসতা বা হতাশাকে মনে ঠাঁই দেওয়া তার জন্য সাজে না। কারণ, যেই কাজের নির্দেশ আল্লাহ নিজে দিয়েছেন, সেই কাজে তিনি সহযোগিতা করবেন না—তা হতেই পারে না; বরং তাঁর সাহায্য করাটা সন্দেহাতীত।

অবসাদ, নিরাশা ও হীনম্মন্যতায় মূলত আল্লাহ তায়ালার অনাদিষ্ট অন্যান্য পথ ও নিয়মনীতির মাঝে আপতিত বাধাবিপত্তি ও পরীক্ষার কারণেই পড়তে হয়। কারণ, এমতাবস্থায় কর্মী তার বিশেষ যোগ্যতা এবং তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনার ওপরই নির্ভর করে। (কাজের পূর্ণতা দানকারী আল্লাহর অনাদিষ্ট হওয়ায় তাতে তাঁর সাহায্য থাকে না।) আর এসবই যে মানুষের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আওতার বাইরে নয়; বরং সীমিত ও সীমাবদ্ধ, তা সবারই জানা।

কাজেই মানুষের সীমিত শক্তির মানদণ্ড ও মাপকাঠির বিবেচনায় এবং অসংখ্য পরীক্ষা ও অগণিত দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির কারণে আমলের শক্তি, নিজস্ব পরিকল্পনা, হতাশা ও অলসতার শিকার হবে—এটাই স্বাভাবিক।

* * *

ইসরা ও মিরাজ[১৯৪]

ইসরা ও মিরাজের পার্থক্য

ইসরা ও মিরাজ। ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম অলৌকিক ও আলোচিত ঘটনা। লক্ষাধিক নবির মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা কেবল আমাদের নবিকেই এই অপার্থিব সম্মানে ভূষিত করেছেন। ঊর্ধ্বাকাশের এই সফরটি দুই ভাগে বিভক্ত—

- ০১. ইসরা
- ০২. মিরাজ

ইসরা : মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা নামে অভিহিত করা হয়।

মিরাজ : মসজিদুল আকসা থেকে সপ্তম আসমানের ওপরে—সৃষ্টিজগৎ, মানুষ, জিন ও ফেরেশতাদের ইলমেরও ওপরের জায়গা সিদরাতুল মুনতাহার সফরটি মিরাজ নামে প্রসিদ্ধ। সফরের পুরো প্রক্রিয়াটি এক রাতেই সমাপ্ত হয়।

কোন বছর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল

মিরাজের তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মাঝে এই বিষয়ে অল্পবিস্তর মতভিন্নতা রয়েছে যে, এটা নবুয়তের দশম বছর হয়েছিল, না আরও পরে; ইতিহাসবিদ ইবনে

---

১৯৪ মিরাজ (المعراج) শব্দটি مفعال-এর ওজনে ব্যবহৃত হয়েছে। ওপরে ওঠার যন্ত্রকে المعراج বলা হয়। এটি সিঁড়ির মতোই; কিন্তু এটি কেমন, তা জানা সম্ভব নয়। এর হুকুম অন্যান্য গায়েবি বিষয়ের হুকুম একই রকম। আমরা এগুলোর ওপর ঈমান আনয়ন করি; কিন্তু এগুলোর কাইফিয়াত (ধরন) জানার চেষ্টা করি না।

সাদ *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে বলেন—'ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের আঠারো মাস আগে।'

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে, মিরাজের ঘটনা দৈহিক ও আত্মিক উভয়ভাবে সংঘটিত হয়েছে। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* শরিফে মিরাজের ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে।[১৯৫]

---

১৯৫ এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় আমরা আনাস ইবনে মালিক রা.-এর মিরাজের ঘটনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, সেই বর্ণনাটি পড়ে নিতে পারি। তিনি মিরাজের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন—

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একরাতে কাবার মসজিদুল হারাম থেকে সফর করানো হয়। নবিজির কাছে এ বিষয়ে ওহি পাঠানোর আগে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশতার জামাত আসে। অথচ তখন তিনি মসজিদুল হারামে ঘুমিয়ে ছিলেন। ফেরেশতাদের প্রথমজন বলে, তিনি কে? দ্বিতীয়জন বলেন—তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক। সর্বশেষ ফেরেশতা বলেন—তাহলে তাদের সবচেয়ে ভালো লোকটিকেই নিয়ে চলো।

সে রাতের ঘটনা এতটুকুই। এজন্য তিনি আর তাদের দেখেননি। শেষে তারা অন্য এক রাতে এলেন, যা তিনি অন্তর দ্বারা দেখছিলেন। তাঁর চোখ ঘুমায়, অন্তর ঘুমায় না। এভাবে অন্য নবিগণের চোখ ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর ঘুমায় না। এ রাতে তারা তাঁর সঙ্গে কোনো কথা না বলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে জমজম কূপের কাছে রাখলেন। জিবরাইল আ. তাঁর সাথিদের থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব নিলেন। জিবরাইল আ. তাঁর গলায় নিচ হতে বুক পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। তাঁর বুক ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে জমজমের পানি দ্বারা নিজ হাতে ধৌত করে পরিষ্কার করলেন, তারপর সোনার একটি তশতরি আনা হলো। এবং তাতে ছিল একটি সোনার পাত্র—যা ঈমান ও হিকমাত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর বুক ও গলার রগগুলো এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে রেখে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে উঠলেন। আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। ফলে আসমানবাসী তাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কে? তিনি উত্তরে বললেন—জিবরাইল। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন—আমার সঙ্গে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জিজ্ঞেস করলেন—তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন—হ্যাঁ। তখন তারা বললেন—মারহাবান ওয়া আহলান। তাঁর আগমনে আসমানবাসী খুবই আনন্দিত। আল্লাহ জমিনে কী করতে চাচ্ছেন, তা আমাদের না জানানো পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না।

দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম আ.-কে পেলেন। জিবরাইল আ. তাঁকে দেখিয়ে বললেন—তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম দেন। নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সালাম দিলেন। আদম আ. তাঁর সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন—মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র! তুমি আমার কতই-না উত্তম পুত্র!

নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার আসমানে দুটি প্রবহমান নদী দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ দুটি কোন নদী, হে জিবরাইল! তিনি বললেন, এ দুটি হলো নীল ও ফুরাতের উৎসমূল। এরপর জিবরাইল আ. নবিজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরও একটি নদী দেখলেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মোতি ও জাবারজাদের তৈরি একটি প্রাসাদ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নদীতে হাত দিলেন। তা ছিল অতি উন্নতমানের মিশক। তিনি বললেন, হে জিবরাইল, এটি কী? জিবরাইল আ. বললেন—হাউজে কাউসার; যা আপনার রব আপনার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন।

তারপর তিনি নবিজিকে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন। প্রথম আসমানের ফেরেশতাগণ তাকে যা বলেছিলেন, এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল, তিনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল!
তারা বললেন, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা বললেন—তাঁর কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন—হ্যাঁ। তারা বললেন—মারহাবান ওয়া আহলান।
তারপর নবিজিকে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারাও তা-ই বললেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে গেলেন। তারাও তাঁকে আগের মতোই বললেন। তারপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গমন করলেন। তারাও পূর্বের মতো বললেন। এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে গেলেন। সেখানেও ফেরেশতারা আগের মতোই বললেন। সবশেষে তিনি নবিজিকে নিয়ে সপ্তম আসমানে গেলে সেখানেও ফেরেশতারা পূর্বের মতো অভিবাদন জানালেন। প্রত্যেক আসমানেই নবিগণ রয়েছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আমি মনে রেখেছি যে—দ্বিতীয় আসমানে ইদরিস আ., চতুর্থ আসমানে হারুন আ., পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নবি, যার নাম আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছেন ইবরাহিম আ. এবং আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার মর্যাদার কারণে মুসা আ. আছেন সপ্তম আসমানে। সে সময় মুসা বললেন—হে আমার রব, আমি তো ধারণা করিনি, আমার ওপর কাউকে উচ্চমর্যাদা দান করা হবে। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত ওপরে ওঠানো হলো, যে, ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না। শেষে তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। এখানে প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। অতি নিকটবর্তীর ফলে তাঁদের মাঝে দুই ধনুকের সমান ফারাক রইল অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহি পাঠালেন। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের ওপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের কথা ওহিযোগে পাঠানো হলো। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামলেন।
মুসা আলাইহি সালামের কাছে এলে তিনি তাঁকে আটকিয়ে বললেন, এই মুহাম্মাদ, আপনার রব আপনাকে কী নির্দেশ দিলেন? নবিজি বললেন—রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন—আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। কাজেই আপনি ফিরে যান, তাহলে আপনার রব আপনার এবং আপনার উম্মত হতে এ আদেশটি সহজ করে দেবেন। তখন নবিজি জিবরাইলের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন তিনি এ ব্যাপারে তার থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন।
জিবরাইল আ. তাঁকে ইশারায় বললেন—হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছে করলে তা হতে পারে। তাই তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর কাছে গেলেন। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাস্থানে থেকে বললেন, হে আমার রব, আমার উম্মত এটি আদায় করতে পারবে না। তখন আল্লাহ সালাত দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। এরপর মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসলে তিনি তাঁকে থামালেন। এভাবেই মুসা তাঁকে তাঁর রবের কাছে পাঠাতে থাকলেন। শেষে পাঁচ ওয়াক্ত বাকি থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মুসা আ. তাঁকে থামিয়ে বললেন, শোনেন মুহাম্মাদ, আমি আমার বনি ইসরাইল কওমের কাছে এটা হতেও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তবুও তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মত শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সব দিক দিয়ে আরও দুর্বল। কাজেই আপনি আবার যান এবং আপনার রব থেকে আদেশটি আরও সহজ করে আনেন। প্রতিবারই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শের জন্য জিবরাইলের দিকে তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিবরাইল তাঁকে নিয়ে যাত্রা করলেন।
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—হে আমার রব, আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহ খুবই দুর্বল। তাই আদেশটি আমাদের থেকে আরও সহজ করে দেন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন—মুহাম্মাদ!

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোরাকে চড়ে মসজিদুল আকসায় আসেন। আর বোরাক হলো গাধার চেয়ে বড়ো এবং ঘোড়ার চেয়ে একটু ছোটো প্রাণীসদৃশ জন্তু। যার দিগন্তবিস্তৃত পাখনা রয়েছে...
>
> নবিজি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করলেন। তারপর সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ হতে জিবরাইল আ. দুটি পেয়ালা নিয়ে এলেন। যার একটি শরাবের আর অপরটি দুধের। নবিজি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন। নবিজির দুধের পেয়ালা গ্রহণ করা দেখে জিবরাইল আ. বললেন—'আপনি আপনার ফিতরাতের অনুগামী হয়েছেন...'
>
> ...এরপর তিনি ঊর্ধ্বাকাশে মন করলেন; প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, এভাবে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। (সেখানে) আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে যা পাঠানোর ছিল, ওহির মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন।
>
> এখানেই মুসলিমদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। যা মূলত রাত-দিনে ৫০ ওয়াক্ত ছিল।[১৯৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আপনার নিকট উপস্থিত, বারবার উপস্থিত। আল্লাহ বললেন—আমার কথার কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদের ওপর যা ফরজ করেছি, তা উম্মুল কিতাব তথা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি নেক আমলের দশটি নেকি রয়েছে। উম্মুল কিতাবে সালাত পঞ্চাশ ওয়াক্তই লেখা আছে। তবে আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো।

এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন? নবিজি বললেন, আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রতিটি নেক আমলের পরিবর্তে দশটি সাওয়াব নির্ধারিত করেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বনি ইসরাইলের নিকট হতে এর চেয়েও অল্প জিনিসের আশা করেছি, কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার রবের কাছে আপনি আবার ফিরে যান, যেন তিনি আরও একটু কমিয়ে দেন। এবার নবিজি বললেন, হে মুসা, আল্লাহর শপথ! আমি আমার রবের কাছে বারবার গিয়েছি, আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি, যেন তাঁর সঙ্গে মতভেদ করছি। এরপর মুসা আ. বললেন—নামতে পারেন আল্লাহর নামে। এ সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হলেন, দেখলেন, তিনি মসজিদুল হারামে আছেন। সূত্র : *সুনানুন নাসায়ি* : ৪৫০

১৯৬ আপনি যদি মিরাজের এই ঘটনা বিস্তারিত পড়তে চান, তাহলে আপনি *সহিহ বুখারি* বা *সহিহ মুসলিম* থেকে বর্ণিত ঘটনাগুলো পড়ে নিতে পারেন। এর বাইরে 'মিরাজু ইবনি আব্বাস' বা এই ধরনের আরও কিছু বই আছে,

মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া ও আবু বকর রা.-এর সত্যায়ন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালবেলা রাতের ঘটনা শোনালেন। কাফিরদের খুশির অন্ত নেই। এতদিন পর তারা নবিজিকে নিয়ে হাসি-মজা করার মোক্ষম একটি উপলক্ষ্য পেয়ে গেল। এই অসম্ভব কথা পাগল ছাড়া কে বিশ্বাস করবে! তারা ঠাট্টাচ্ছলে মানুষের কাছে বিষয়টি বলে বেড়াতে লাগল। এমনকি বুকভরা আশা নিয়ে নবিজির সবচেয়ে আস্থাভাজন আবু বকর রা.-এর কাছে গেল। আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন—যদি নবিজি নিজ মুখে এই ঘটনা বলে থাকেন, তাহলে এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কয়েকজন বলল, যদি তিনি সত্যিই সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করে থাকেন, তাহলে বাইতুল মাকদিসের পূর্ণ বিবরণ আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হোক। তবেই আমরা তাঁর দাবি সত্য বলে মেনে নেব। তারপর বাইতুল মাকদিস সম্বন্ধে তারা নবিজিকে এমন সব আজগুবি প্রশ্ন করতে শুরু করল, যা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক ও অযৌক্তিক।

অযৌক্তিক প্রশ্নের লা-জবাব উত্তর

তারা নবিজির কাছে বাইতুল মাকদিসের খুঁটি, সিঁড়ি, দরজা-জানালা ইত্যাদির সংখ্যা জানতে চাইল। এমন কুটিল প্রশ্ন করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লা-জবাব করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, মানুষ সফরে গিয়ে এসব বিষয়ের পেছনে পড়ে না। নবিজির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তারা প্রশ্নের উত্তর না পেলে এক্ষুনি তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। ঠিক তখনি আকাশ থেকে আল্লাহর সাহায্য নেমে এলো। এ প্রসঙ্গে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* শরিফের হাদিসে নবিজি নিজ মুখে ইরশাদ করেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা তখন বাইতুল মাকদিসের পুরো কাঠামো আমার সামনে উপস্থিত করে দিলেন। তখন আমি এমনভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম, যেন আমি বাইতুল মাকদিসকে দেখে দেখে উত্তর দিচ্ছি।'

যেগুলো মিথ্যায় পরিপূর্ণ, এগুলো থেকে বেঁচে থাকবেন। এবং চেষ্টা করবেন, সুন্নাহর সহিহ কোনো বর্ণনাসংবলিত হাদিস থেকে ঘটনাটি জেনে নেওয়ার।—লেখক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শ্রদ্ধেয় পাঠকের জন্য আমরা এর আগেই একটি দীর্ঘ সহিহ বর্ণনা সংযুক্ত করে দিয়েছি। টীকায় সংযুক্ত আনাস ইবনে মালিকের সূত্রে বর্ণিত এই হাদিসটি পড়লে আশা করছি, পাঠক মিরাজের রাতের ওই ঘটনার একটি স্পষ্ট চিত্র পাবেন।—সম্পাদক।

এরই মাঝে জিবরাইল আ. নবিজির কাছে এসে সালাতের সময় ও পদ্ধতি বর্ণনা করলেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে নবিজি সকাল ও সন্ধ্যায় ইবরাহিম আ.-এর মতো দুই রাকাত করে সালাত আদায় করতেন।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

মিরাজের শিক্ষা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুজিজা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সময়ের প্রয়োজনে নব জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রকাশিত হয়েছে মুজিজার অলৌকিকতা; কিন্তু কিছু মানুষ নবিজির জীবন আলোচনার সময় মুজিজাকে পাশ কাটিয়ে যায়। তারা মুজিজাকে মানবীয় স্বভাববহির্ভূত বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করে অস্বীকার করে। তারা দৃঢ়তার সাথে বলে, মুজিজার অলৌকিকতা নবিজির মর্যাদা পরিপন্থি এবং তিনি তা দেখাতে সক্ষম নন। তারা দলিল হিসেবে কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে—

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ

'বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছেই।'[১৯৭]

প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র

মুজিজা অস্বীকারকারী এইসব ব্যক্তিরা মূলত পাশ্চাত্যের অমুসলিম গবেষক প্রাচ্যবিদ গুসতাভে লে বুন[১৯৮], ডেভিড হিউম[১৯৯], ওগ্যুস্ত কোঁত[২০০], গোল্ডজিহার[২০১] প্রমুখ দ্বারা

---

১৯৭ সূরা আনআম, আয়াত : ১০৯

১৯৮ চার্লস ম্যারি গুসতাভে লে বুন (Charles-Marie Gustave Le Bon)। জন্ম : ১৮৪১; মৃত্যু : ১৯৩১। একজন শীর্ষস্থানীয় ফরাসি পলিম্যাথ। যার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসা, উদ্ভাবন ও পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তার ১৮৯৫-এর কাজ 'দ্য ক্রড : এ স্টাডি অব দ্য পপুলার মাইন্ড'-এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। গুসতাভে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, উইলফ্রেড ট্রটার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৯ ডেভিড হিউম ছিলেন একজন স্কটিশ দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং প্রবন্ধক; যিনি দার্শনিক সমীচীন ভাবধারা ও প্রকৃতিবাদে তার অত্যন্ত প্রভাবশালী অবস্থানের জন্য সুপরিচিত। দর্শনে হিউম-এর অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাকে জন লক ফ্রান্সিস বেকন ও টমাস হোবসের সাথে একটি ব্রিটিশ এমপিজিস্ট হিসেবে স্থান দিয়েছে। তার জন্ম ৭ মে, ১৭১১, এডিনবরা, যুক্তরাজ্য এবং মৃত্যু : ২৫ আগস্ট, ১৭৭৬, এডিনবরা, যুক্তরাজ্য।

প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের গবেষকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নাস্তিকতা প্রচার না করে নতুন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমদের চিন্তায় অবিশ্বাস ও সংশয়ের বীজ বপন করার জন্য নবিজির জন্য এমন সব গুণাবলি প্রচার করতে থাকে—যা নবি-জীবনের একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। নেতা, সেনাপতি, বীর ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত করে সাধারণ মানুষের জীবনের মতো উপস্থাপন করতে থাকে। নবিজির মুজিজা, মিরাজ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে ফেলে। একপর্যায়ে মানুষ মুজিজাকে অসম্ভব মনে করে অলীক কল্পকাহিনি মনে করতে শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে আবশ্যিকভাবে তারা ইসলামের অসংখ্য অকাট্যবিধান অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হয়। এভাবে একসময় তাদের ঈমানই শেষ হয়ে যায়।

দুঃখজনক সত্য হলো—অনেক মুসলিম জেনে বা না জেনেই তাদের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়েছে। তাদের মেধা ও অর্থ অমুসলিমদের মতবাদ প্রচারের কাজে ব্যয় করছে। মূলত ইউরোপের বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্টতায় প্রলুব্ধ হয়ে তারা এই ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়েছে।

বীর, সেনাপতি, নেতা। মুগ্ধকর বিশেষণ; কিন্তু নবি-জীবনের সাথে এই বিশেষণগুলো ব্যাপক প্রচারের মধ্যে রয়েছে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের ইসলামবিদ্বেষীদের উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম অস্ত্র ও জনবলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এই বিষয়টি প্রমাণ করা। তাদের এই ষড়যন্ত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন নবিজির উম্মতকে 'মুসলিম' শব্দের পরিবর্তে 'মুহাম্মাদিয়্যিন' বলে নামকরণ করে।

কল্পনার প্রচ্ছন্ন আবরণ নয়, যুক্তি, বাস্তবতা ও অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে প্রশস্ত বৈঠকে কয়েকটি পয়েন্টে নবি-জীবন নিয়ে আলোচনা করব। যেন সত্য ও সুন্দরের সোনারোদ স্বমহিমায় আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়।

♦ ক. মুজিজা অস্বীকারের পরিণতি

---

২০০ ওগ্যুস্ত কোঁত। তিনি ছিলেন একজন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ও লেখক। তিনিই প্রথম সোসিওলজি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তাকে সমাজবিজ্ঞানের জনক গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞানে প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি দৃষ্টবাদ বা পজিটিভিজম দর্শনের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন। জন্ম : ১৯ জানুয়ারি, ১৭৯৮, মন্টপেলিয়ের, ফ্রান্স। মৃত্যু : ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, প্যারিস, ফ্রান্স।

২০১ গোল্ডজিহার, যাকে প্রায়শই 'ইগনাজ গোল্ডজিহার' হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হতো। তিনি ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান। জার্মান থিওডর নলদেক এবং ডাচ ক্রিশ্চিয়ান স্নুক হুরগনজেজের পাশাপাশি তিনি ইউরোপে আধুনিক ইসলামি গবেষণার প্রতিষ্ঠাতা (প্রাচ্যবাদের জনক) হিসেবে বিবেচিত হন।

ওহি। আসমানি প্রত্যাদেশ। মহান প্রভুর অকাট্য নির্দেশ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সাথে ওহির গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর জীবনের সিংহভাগ গুণাবলি নবুয়ত ও রিসালাতের সাথে সম্পৃক্ত। রিসালাতের যাবতীয় বিষয় উর্ধ্বজগতের সাথে সম্পৃক্ত। এতে মানবীয় হস্তক্ষেপের দূরতম কোনো সুযোগ নেই। এই বাস্তবতার জানালায় দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—মুজিজা ও অলৌকিক বিষয়াদি নবি-জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া নবুয়তের মূল মর্ম, বক্তব্য ও বিশ্বাস অস্বীকার করার নামান্তর। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এই ভয়াবহ সত্য গোপন করে তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু দিন শেষে তাদের দুরভিসন্ধি চাপা থাকেনি। কতক স্থানে অজান্তেই তারা এই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে। ডারউইন মতবাদের বলিষ্ঠ প্রচারক শিবলি শুমাইল কোনো রাখঢাক না করেই মুজিজাকে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করেছে।[২০২]

দ্বীনের মৌলিক বিষয় মুজিজা প্রশ্নবিদ্ধ ও অস্বীকারের পাত্র বানানো দ্বারা মুজিজাসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

♦ খ. মুজিজার অকাট্যতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোকিত জীবন মুজিজায় প্রাচুর্যময়। এই অলঙ্ঘনীয় সত্য অস্বীকার করার জো নেই। বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রের পরম্পরায় তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। অকাট্য বর্ণনা, বোধ, চিন্তা ও বিশ্বাসের আয়নায় মুজিজার সত্যতা সকলের কাছে অতি পরিচিত। নবিজির আঙুল মুবারক দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া সকলের কাছে অতি পরিচিত ও বহুল প্রচলিত একটি মুজিজা। ইমাম বুখারি 'কিতাবুল অজু', ইমাম মুসলিম 'কিতাবুল মাসাইল' ইমাম মালিক 'কিতাবুত তাহারাত' এবং অন্য ইমামগণ বিভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম জুরকানি ইমাম কুরতুবির সূত্রে বলেন—

> নিঃসন্দেহে একাধিকবার অনেক মানুষের সম্মুখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার মুজিজা

---

২০২ টীকা: ড. শিবলী শুমাইল বুকানজের কিতাব আরবিতে অনুবাদ করেছে। সেই কিতাবে ডারউইনের মতবাদের উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবের ভূমিকায় শিবলি এই মন্তব্য করেছে।

সংঘটিত হয়েছে। এ হাদিসটি এত অধিকসংখ্যক মানুষ বর্ণনা করেছেন যে, তা অকাট্য বর্ণনায় রূপ নিয়েছে।[২০৩]

অনুরূপ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা। ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম এবং অন্য অনেক ইমাম এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসির বলেন—

ধারাবাহিক বিশুদ্ধ সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। এই মুজিজা নবিজির জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছে।[২০৪]

মুজিজাসংক্রান্ত হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। মিরাজ ও অন্য মুজিজাসমূহের অকাট্যতার ব্যাপারে বিশ্বের মুসলিমদের কোনো দ্বিমত নেই; কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো—মুজিজার প্রামাণ্যতার পক্ষে অকাট্য দলিলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও একদল লোক নবি-জীবন থেকে মুজিজাকে পৃথক করতে সদা তৎপর। এজন্য তাদের কৌশলের অন্ত নেই। তারা নবিজির জন্য অতিমাত্রায় 'মেধাবী' শব্দটি প্রয়োগ করে মুজিজার ঐশ্বরিক গুণটি ধামাচাপা দিতে চায়। মুজিজা প্রসঙ্গে তারা অন্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মুজিজার স্বপক্ষের হাদিসগুলো পাশ কাটিয়ে যায়। এর কারণ হলো, এই অকাট্য হাদিসগুলো তাদের ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়।[২০৫]

♦ গ. মুজিজার পরিচয় ও সম্ভাব্যতা

মুজিজা মূলত কী? দীর্ঘ আলাপসূত্র ছাড়া এককথায় বলা যায়—মানুষের মাঝে অপ্রচলিত ও দুর্লভ বিষয়কে মুজিজা বলা হয়; কিন্তু বাস্তবে মুজিজার সংজ্ঞা এমনটি নয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রচলিত অসামান্য বিষয়গুলোও মুজিজার অন্তর্ভুক্ত। চাঁদ, আকাশ, মানুষের শিরাতন্ত্র, সুশৃংখল রক্ত সঞ্চালন ও রুহ গুণিজনের কাছে প্রতিটি বিষয় মুজিজা। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের একজন বিজ্ঞানী সূক্ষ্ম কথা বলেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো অজ্ঞাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ার কারণে এগুলো মুজিজা হওয়ার বিষয়টি তারা ভুলতে বসেছে। মানুষের মনে গ্রোথিত প্রচলিত বিষয়গুলোকেই কেবল তারা মুজিজা মনে করে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও

---

২০৩ জুরকানি আলাল মুআততা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৫

২০৪ তাফসিরু ইবনি কাসির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬১

২০৫ *হায়াতে মুহাম্মাদ* গ্রন্থের লেখক এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারকদের অন্যতম একজন। নিজের পিঠ বাঁচিয়ে মুজিজার স্বপক্ষের হাদিসগুলোর প্রামাণ্যতা অকার্যকর করতে তিনি এমন কপটতা ও বাহুল্য কথাবার্তার পথ অবলম্বন করেছেন—যা নিতান্তই বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনাপ্রসূত।

সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এই ভুল ধারণা থেকে বের হতে পারেনি। ভাবনার দ্বার ঈর্ষৎ উন্মুক্ত করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, পৃথিবীর ছোটো-বড়ো প্রতিটি সৃষ্টি একেকটি মুজিজা। যে মহান প্রভু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুর জন্য মিরাজ ও চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ওলিম জোন্স বলেন—

> কিছু মানুষ মুজিজাকে অসম্ভব বিষয় বলে মন্তব্য করে; কিন্তু কথা হলো, আলোচ্য মুজিজাগুলো পৃথিবী সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন কাজ নয়। যে আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিনের মতো প্রকাণ্ড সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর জন্য আলোচ্য মুজিজা অস্তিত্বে আনা নিতান্তই সহজ।

♦ ঘ. মুজিজার আগের ঘটনা

মিরাজের ঘটনা অন্য দশটি মুজিজার মতো নয়। এই ঘটনার পেছনে রয়েছে বেদনাদায়ক ইতিহাস, রোমহর্ষক দৃশ্যপট। দশম হিজরি। একে একে মারা যান বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে থাকা চাচা আবু তালিব ও ব্যথিত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়া প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা। তাদের ইন্তেকালে কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলল। পুরো মক্কা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুনিয়ার জাহান্নামে পরিণত হলো। বুকে আশার পাহাড় বেঁধে নিয়ে পাড়ি জমালেন প্রতিবেশী তায়েফে। মুহূর্তেই প্রত্যাশার পাহাড় ভেঙে কাচের পাত্রের মতো টুকরো টুকরো হলো। জীবনের সবচেয়ে কষ্টের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন নবিজি। তায়েফ সফরে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে রবিয়ার দুই ছেলের বাগানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত শরীর-মন। করুণ আর্তনাদে আল্লাহর কাছে সাহায্যের আর্জি জানালেন। ধৈর্যের পাহাড় বুকে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে জানালেন—'আয় মেরে রব, যদি এই পরীক্ষা সমস্ত আপনার অসন্তুষ্টির কারণে আপতিত না হয়ে থাকে, তাহলে এগুলোতে আমার কোনো পরোয়া নেই।'

এমনই ভয়াবহ এক পরিস্থিতিতে নবিজিকে সান্ত্বনা ও সম্মানে ভূষিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কাছে ডেকে নিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নব উদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। মিরাজের ঘটনা দ্বারা এই বিষয়টিও প্রমাণিত হলো যে, নবিজির ওপর মুসিবত আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে আরোপিত হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা দাওয়াতের ময়দানে যুগে যুগে তার প্রিয় বান্দাদের এভাবেই পরীক্ষা করেন।

♦ ঙ. বাইতুল মাকদিস রক্ষা করো

বাইতুল মাকদিস। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত মসজিদ। মিরাজের ঘটনার সাথে এই মসজিদের নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানে আল্লাহ তায়ালা সকল নবিদের একত্র করেছেন। এই ঘটনার ফলে ইসলামি ইতিহাসে বাইতুল মাকদিস স্পর্শ করেছে মর্যাদার হিমালয়।

এই ঘটনায় মুসলিমদের জন্য পথনির্দেশ হলো—এই পবিত্র ভূমি দুশমনদের কালো থাবা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নমনীয় অবস্থানের কোনো সুযোগ নেই। তাদের নাপাক হাত থেকে এই মসজিদকে পুনরুদ্ধার করা সকল মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব। কে জানে! ইতিহাসের মহাবীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি মিরাজের সেই শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়ে বাইতুল মাকদিস থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করেছিলেন।

♦ চ. ইসলাম জীবনের জন্য

মিরাজের সফরে জিবরাইল আ. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে শরাব ও দুধের পেয়ালা উপস্থাপন করেছিলেন। নবিজি দুধের পেয়ালা হাতে নেন। শরাব স্পর্শ করেননি। মিরাজের এই ঘটনা প্রমাণ করে, ইসলাম মানবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাস ও বিধান মানুষের সুস্থ চাহিদার অনুকূল। দ্রুতগতিতে ইসলামের বিস্তৃতি ও মানুষের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার এটাই গূঢ় রহস্য। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি ও পার্থিব প্রশান্তি তার দ্বীনের চাহিদা পালনের ওপর নির্ভর করে। পৃথিবীর অন্য কোনো মতবাদ নয়, কেবল ইসলাম মনুষ্য চাহিদা পূরণের নিরাপদ ঠিকানা।

♦ ছ. মিরাজ কি স্বপ্ন ছিল, না সশরীরে

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মিরাজের ঘটনা আত্মিক ও শারীরিক উভয়ভাবে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম নববি রহ. *শরহে সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে লিখেছেন—

> পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সিংহভাগ ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুতাকাল্লিমিন মিরাজ সশরীরে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে একমত। এই অকাট্য সত্য বিষয়টি

বিশ্বাস করার জন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যারা মনগড়াভাবে এর বিপরীত মত প্রকাশ করে, তা নিতান্তই অজ্ঞতাসুলভ মন্তব্য।[২০৬]

ইমাম ইবনে হাজার রহ. *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি*তে লেখেন—

নিঃসন্দেহে ইসরা ও মিরাজ একই রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা, গ্রহণযোগ্য ফকিহ, মুহাদ্দিস ও তর্কশাস্ত্রবিদরা এই মতামত পেশ করেছেন। এ রকম স্পষ্ট বিষয়ে দ্বিমত করা দুঃখজনক। কারণ, যুক্তির বিবেচনায় সশরীরে মুজিজা সংঘটিত হওয়া এমন অসম্ভব কিছু নয় যে, তাতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে।[২০৭]

মিরাজ সশরীরে সংঘটিত হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে । তন্মধ্যে অন্যতম বড়ো প্রমাণ হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মিরাজের সংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। যদি নবিজি তাদের কাছে স্বপ্নযোগে মিরাজে যাওয়ার কথা বলতেন, তাহলে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে তা অস্বীকার করত না। কারণ, স্বপ্নে দেখা জিনিস কারও কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। মুসলিম-কাফিরনির্বিশেষে সকলেই স্বপ্নযোগে মিরাজে যাওয়ার দাবি করতে পারে। এরচেয়ে বড়ো কথা হলো—যদি নবিজি স্বপ্নযোগে মিরাজে যাওয়ার কথা বলতেন, তাহলে কাফিররা বাইতুল মাকদিসের খুঁটি, দরজা-জানালা ইত্যাদি সম্বন্ধে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করত না।

মোটকথা হলো, পৃথিবীর অন্যান্য মুজিজা যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, মিরাজের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম নয়। অন্য দশটি মুজিজার মত মিরাজও একটি মুজিজা।

♦ জ. ইবনে আব্বাস কি মিরাজবিষয়ক কিতাব লিখেছেন

মিরাজে ইবনে আব্বাস শিরোনামে একটি কিতাব প্রচলিত রয়েছে । কিতাবটি মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্ভট কথাবার্তায় ভরপুর। কোনো সূত্র ছাড়াই উদ্ভট বর্ণনাগুলো ইবনে আব্বাস রা.-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন—এসব মিথ্যা বর্ণনার সাথে ইবনে আব্বাস রা.-এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি মিরাজসংক্রান্ত কোনো কিতাব রচনা করেননি। কিতাব রচনার প্রচলন উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে শুরু হয়েছে।

---

২০৬ *শরহুন নববি আলা সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯০

২০৭ *ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৬-১৩৭

ইসলামবিদ্বেষী কিছু লোক এই কিতাবটি সন্ধান পেয়ে মানুষের ঈমান হরণ করার জন্য তা প্রচার করতে শুরু করে। ইসলামবিদ্বেষী মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তিরাই কেবল এই কিতাবটি প্রশংসা করেছে। ডক্টর লুইস আউস স্পষ্ট জানতেন, এই কিতাব ইবনে আব্বাস রা. লেখেননি; কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য নির্জলা মিথ্যাকে তিনি সত্য হিসেবে প্রচার করা শুরু করলেন। এইসব ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়— এই কিতাবটি ইসলামবিদ্বেষীদের চক্রান্তের ফসল। এই কিতাবের সাথে ইবনে আব্বাস রা.-এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

* * *

প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও ইসলাম গ্রহণের সূচনা

নবিজির অক্লান্ত দাওয়াত

হজের মৌসুম। লোকে লোকারণ্য হারামের চারপাশে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ধর্মমত-নির্বিশেষে সকলের গন্তব্য স্বর্ণখচিত কালো গিলাফের আবরণে আচ্ছাদিত কাঙ্খিত ঘরটি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের এই সময়টির অপেক্ষায় প্রহর গোনেন। মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর এটাই তো মোক্ষম সুযোগ। একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ইসলামের বার্তা। এজন্য তিনি বাইতুল্লাহর জিয়ারতে আসা লোকদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতেন; কিন্তু সাধারণত কেউ তা গ্রহণ করত না।

ঐতিহাসিক ইবনে সাদ তার *তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে হজের সময়ের চিত্র সার্থকভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর হজের মৌসুমে উকাজ, মাজিন্না ও জুল-মাজাজ মেলায় গিয়ে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। বলতেন—হে লোকসকল, তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো, তাহলে তোমরা সফল হয়ে যাবে। আরবের রাজত্ব তোমাদের হাতে চলে আসবে। অনারব দেশগুলো নতজানু হতে বাধ্য হবে। যদি তোমরা ঈমান আনো, তাহলে তোমরা জান্নাতেও কর্তৃত্ব লাভ করবে; কিন্তু দুঃখজনক হলো, বুকভরা দরদ নিয়ে আহ্বান করলেও কেউ তার ডাকে সাড়া দিত না।

দাওয়াত দেওয়ার পুরো সময়জুড়ে নরাধম আবু লাহাব নবিজির পেছনে চলতে থাকত। সে চলতে চলতে বলত—তোমরা তাঁর কথা শুনো না; সে ধর্মত্যাগী, মিথ্যুক। মাআজাল্লাহ!

আবু লাহাবের কথা বিশ্বাস করে মানুষ নবিজির দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্টও দিত।[২০৮]

ইবনে ইসহাক ইমাম জুহরি থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু আমির ইবনে সা'সা'র নিকট আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাতের দাওয়াত দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাহিরা ইবনে ফাররাস নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল—আল্লাহর শপথ! কুরাইশ বংশের এই যুবক আমার সাথে থাকলে পুরো আরব জয় করতে পারব। তারপর সে নবিজিকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বলুন তো, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের বিপক্ষে জয়যুক্ত করলে আপনার পর কে বাদশাহ নিযুক্ত হবেন?

নবিজি উত্তর দিলেন—সব ক্ষমতার লাগাম তো আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করবেন। উত্তর শুনে লোকটি বলল—আমরা জান বাজি রেখে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, আর জয়লাভ করার পর আমরা ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতার মসনদে বসবে, এটা কখনো মানা যায় না। নাহ, আপনার দাওয়াত গ্রহণ করলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।[২০৯]

প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

নবুয়তের এগারোতম বছর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের সময় অন্যান্য বছরের মতো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী জামরায়ে আকাবার নিকটবর্তী স্থানে একটি কাফেলার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে।[২১০]

নবিজি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের পরিচয়?

---

২০৮ *আত-তাবাকাতুল কুবরা লিবনি সাদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০০-২০১; *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৩; ইবনে ইসহাক একই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

২০৯ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫০

২১০ কাফেলায় ছয়জন লোক ছিলেন। আসআদ ইবনে জুরারা, আউফ ইবনুল হারিস, রাফি ইবনে মালিক, কুতবা ইবনে আমির, উকবা ইবনে আবু আমির ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ।

তারা উত্তর দিলো—আমরা মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক।

ফের প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি ইহুদিদের ভ্রাতৃপ্রতিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত?

তারা বললেন—হ্যাঁ।

এরপর তিনি তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপের ইচ্ছা পোষণ করলেন। কাফেলার লোকদের বললেন—আপনাদের হাতে সময় থাকলে কিছু কথা বলতাম। তারা নবিজির পাশে বসতে বসতে বলল—অবশ্যই, কিছু বলতে চাইলে বলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয় তুলে ধরলেন। কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন। পরিশেষে তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। দাওয়াতের মর্মবাণী তাদের হৃদয়ের গভীরে স্পর্শ করল। তা ছাড়া পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি তাদের দুর্বলতা ছিল। হৃদয়ে ছিল ইসলামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। এই ভালোবাসা এক দিনে তৈরি হয়নি। এই ভালোবাসা তৈরির পেছনে রয়েছে বর্ণিল এক ইতিহাস।

খাজরাজের ইসলাম গ্রহণের কারণ

অনেক বছর যাবৎ ইহুদিদের সাথে ছিল খাজরাজ গোত্রের বসতি। একসাথে বসবাসের সুবাদে ইহুদিদের মুখে জীবনে অসংখ্যবার নতুন একজন নবির আগমনবার্তার কথা শুনেছে। এমনকি খাজরাজ গোত্রের সাথে ইহুদিদের মনোমালিন্য হলে তারা বলত—

> অচিরেই শেষ নবির আগমন ঘটবে, আমরা তাঁর অনুসরণ করব। তাঁর নেতৃত্বে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আদ ও ইরম জাতির মতো তোমাদের ধ্বংস করব।

নবিজির সাথে কথা বলা অবস্থায়ই খাজরাজ গোত্রের লোকগুলো পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকল। একপর্যায়ে তারা বলতে লাগল—আল্লাহর কসম! উনি তো সেই নবি, যার আগমনের ব্যাপারে ইহুদিরা আমাদের বারবার ভয় দেখাত। আসো, দেরি না করে আমরা ইহুদিদের পূর্বেই তাঁর অনুসারী হয়ে যাই। তারপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।

ইসলাম গ্রহণ শেষে তারা আরজ করল—অন্য সব গোত্রের চেয়ে বর্তমানে আমাদের গোত্রে খুব বেশি পারস্পরিক কলহ চলছে, আমরা আশাবাদী, আপনার দাওয়াতের

ওসিলায় আল্লাহ তায়ালা পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। আমরা স্বীয় গোত্রের কাছে আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত পৌঁছাব এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাব। যদি আল্লাহ তায়ালা তাদের আপনার হাতে সমবেত করে দেন, তাহলে আপনি সকলের চেয়ে শক্তিধর হিসেবে আবির্ভূত হবেন। কথাবার্তা শেষে কাফেলা ঈমানের আলো নিয়ে মদিনায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। যাওয়ার সময় আগামী বছর হজের সময় পুনরায় আসার ওয়াদা করে।[২১১]

* * *

২১১ আসিম ইবনে উমার-এর সূত্রে ইবনে ইসহাক এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তারা তাদের গোত্রের মুরুব্বিদের থেকে বর্ণনা করেছেন। *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৮

বাইয়াতে আকাবায়ে উলা

নবুয়তের এগারোতম বছর। এ বছরই মদিনায় ইসলামের আলো প্রবেশ করে। তারপর হজের মৌসুমে বারোজন ব্যক্তি আকাবায়ে উলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই বাইয়াতে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এটি অবশ্য জিহাদের বাইয়াত ছিল না। মক্কা বিজয়ের পর সাফা পাহাড়ে নবিজি নারীদের থেকে যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তা এই প্রকারের বাইয়াত ছিল। এই মুবারক কাফেলায় আসআদ ইবনে জুরারা, রাফি ইবনে মালিক, উবাদা ইবনে সামিত, আবুল হাইসাম ইবনে তিহান উপস্থিত ছিলেন।

এই বাইয়াত সম্বন্ধে উবাদা ইবনে সামিত রা. স্মৃতিচারণ করে বলেন—

> সেই কাফেলায় আমরা বারজন ছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম আমাদের বললেন, 'আসো! তোমরা আমার হাতে এই কথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করো—আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করব না; চুরি, ব্যভিচার ও অপবাদে জড়াব না। নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। নেকির কাজে আমার দেখানো পথ ব্যতীত মনগড়া আমল করবে না।' তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বাইয়াত লঙ্ঘন করবে না, তার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দেবেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন অপরাধের কারণে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা তোমাদের গুনাহ মাফের কারণ।

পক্ষান্তরে যে গুনাহগুলো আল্লাহ তায়ালা গোপন রাখেন, তিনি ইচ্ছে করলে এর শাস্তি দেবেন বা বিশেষ করুণায় ক্ষমা করে দেবেন।[২১২]

এই বাইয়াতে উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর উপস্থিতি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। (এই সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।) মদিনার এই বারজন লোক বাইয়াত শেষে ফিরে যাওয়ার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। এজন্য তাকে 'মুকরিউল মদিনা' বা 'মদিনার শিক্ষক' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

* * *

২১২ *সহিহ বুখারি*, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বাবু উফুদিল আনসার ওয়া বাইআতুল আকাবাহ; *সহিহ মুসলিম*, কিতাবুল হুদুদ।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

প্রথম বাইয়াতের শিক্ষা

বাইয়াতের পর নবিজির ওপর বিভিন্ন মুসিবত ও সমস্যার পাহাড় গলে গলে পড়তে লাগল। নবিজির ধৈর্যের ফলে পরিপক্কতার রং ধরতে শুরু করল। দ্বীনি দাওয়াতের যে বীজ বপন করেছিলেন, তা চারা গজিয়ে ক্রমে বিস্তৃত হতে লাগল; কিন্তু এ পর্যায়ে আসতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করেছেন, তা পর্যালোচনা করা অতীব প্রয়োজন।

আমরা দেখতে পাই, তিনি ইসলামের দাওয়াত কুরাইশ বংশের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের দ্বারে দ্বারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। বিশেষত হজের মৌসুমে অবজ্ঞা করা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে দাওয়াত দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ এবং *সুনান* হাদিসের গ্রন্থসমূহে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে বলতেন—

> এমন কোনো ব্যক্তি কি আছেন, যিনি আমাকে তার গোত্রে নিয়ে যাবেন? কারণ, কুরাইশরা মানুষের কাছে আমার প্রভুর দাওয়াত পৌঁছাতে আমাকে বাধা দেয়।[২১৩]

---

২১৩ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৫৬; *আল ফাতহুর রাব্বানি ফি তারতাবি মুসনাদে ইমাম আহমাদ*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৬৯; *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০

নবুয়তের প্রথম এগারোটি বছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। কুরাইশদের অনবরত অত্যাচারে কোনো একটি মুহূর্ত স্বস্তিতে কাটাতে পারেননি। তারা নবিজিকে শহিদ করার জন্য সর্বদা ওত পেতে থাকত। শুধু কি তা-ই, নবিজি নিজ গোত্র, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও কাছের মানুষদের থেকে সীমাহীন বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এত কিছুর পরও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃঢ়চেতা মনোবলে কখনো চিড় ধরেনি। আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়নি। এই সীমাহীন কষ্ট-সাধনার পর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে ইসলামি হুকুমত কায়েম করেছেন। সময়ের পরিক্রমায় মুসলিমদের অবস্থা এমনও হয়েছিল, রোম-পারস্যের মতো পরাশক্তি মুসলিমদের ভয়ে থরথর করে কাঁপত।

মুসলিমদের এই শক্তি ও সম্মান আল্লাহ তায়ালা জিহাদ ও ধৈর্যের পরীক্ষা ছাড়াই দিতে পারতেন; কিন্তু বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম হলো—সাধনার পথ পাড়ি দেওয়ার পর তিনি পুরস্কার প্রদান করেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা আবশ্যিকভাবে মানুষের মাঝে ইবাদত করার যোগ্যতা দিয়েছেন; কিন্তু বাধ্য করেননি। পরীক্ষা করার জন্য মানুষকে ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন। কে নিজ ইচ্ছায় কষ্ট-সাধনা ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে, আর কে অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়। কষ্ট-ক্লেশহীন ইবাদতের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মনজিল অর্জিত হয় না। পরীক্ষা ছাড়া মুনাফিক ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্যও নির্ণীত হয় না। স্বাভাবিক নিয়ম হলো—কষ্টের পরই সফলতা অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দীর্ঘ সময় কঠিন সাধনার পর সফলতার মহাসড়কের সন্ধান দিয়েছেন। সফলতার উচ্চশিখরে পৌঁছার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য দুটি করণীয় নির্ধারণ করেছেন—

- **ক.** মানবজীবনে শরয়ি বিধান ও ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা।
- **খ.** এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কণ্টকাকীর্ণ পথ গ্রহণের মানসিকতা লালন করা।

দীর্ঘ এগারো বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও কষ্ট ভোগের পর নবিজির সামনে দৃশ্যমান হয়েছিল সফলতার মহাসড়ক। সাধনার কিছু চিত্র উল্লেখ করার পর আমরা দ্বীনের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও কিছু সফলতার দিকে গভীর দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নেব—

♦ এক.

কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ইসলামের সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। কুরাইশ নবিজির নিজ গোত্র, কুরাইশের রয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রের মুকুট। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে ইসলামের বিজয় কেতনের গৌরবান্বিত পতপত ধ্বনি অন্যান্য গোত্রের ললাটে কেন লেখা হলো? এর কারণ হলো—সহজভাবে ঈমান গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশই রাখেননি।

এজন্য আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে নিরক্ষর হিসেবে প্রেরণ করেছেন। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি থেকে তিনি পড়ালেখা শেখেননি। নবিজি এমন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে গোত্রের লোকদের মাঝে পড়ালেখা ও শিষ্টাচারচর্চার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। অথচ নবিজি ছিলেন বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা, সদ্ব্যবহারসহ পরিপূর্ণ মানবীয় গুণাবলির প্রবাদপুরুষ। পৃথিবীর অনাগত সকল মানুষের জন্য আদর্শ। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে সম্ভাব্য সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন। যেন মানুষ সহজেই অনুধাবন করে, নবিজি নির্দিষ্ট কোনো গোত্রের জন্য প্রেরিত হননি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সর্বোত্তম আদর্শে সুসজ্জিত করে পুরো পৃথিবীর মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন।

পশ্চিমা বিশ্বের কয়েকজন খ্রিষ্টান গবেষক এই চিরসত্য বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন। *হাজিরুল আলামাল ইসলামি* গ্রন্থে পশ্চিমা গবেষক দিনার বরাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি বলেন—

> পশ্চিমা গবেষকরা তাদের ভ্রান্ত চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নবিজির জীবনী রচনা করে। তাদের এই কুটিল ষড়যন্ত্র তিন-চারশত বছর যাবৎ চলে আসছে। এই গর্হিত কাজের মাধ্যমে সিরাতের সঠিক শিক্ষা বিদায় করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়; কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। ইংরেজ, ফ্রান্স, জার্মান, পোলান্ডসহ তাবৎ পৃথিবীর ইসলামবিদ্বেষীদের চক্রান্ত নিজেদের কর্মকাণ্ডের ফলে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ইসলামের বিরোধিতায় তারা পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। একজনের বক্তব্য আরেকজন প্রত্যাখ্যান করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।[২৪]

---

২১৪ *হাজিরুল আলামাল ইসলামি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩

♦ দুই.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের পূর্বেই সেখানে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাইয়াতে আকাবায় মদিনার সেই ছোট্ট কাফেলার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল সেই সম্ভাবনা। মদিনার লোকগুলো ইসলাম গ্রহণের কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে ইতিহাসের গলি-ঘুপচি। মদিনায় দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল—

- **এক.** মুশরিক সম্প্রদায়; যারা আদিকাল থেকেই আরবের বাসিন্দা।
- **দুই.** ইহুদি সম্প্রদায়; যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিজরত করে আরবে বসতি স্থাপন করে।

আরবের আদি বাসিন্দা মুশরিকরা মূলত দুটি গোত্রে বিভক্ত—

- **এক.** আওস,
- **দুই.** খাজরাজ।

অনুরূপভাবে বহিরাগত ইহুদিরা তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল—

- ০১. বনু কুরাইজা,
- ০২. বনু নাজির ও
- ০৩. বনু কাইনুকা।

দুরাচার ইহুদিরা নিজেদের স্বভাবজাত অভ্যাস অনুযায়ী আওস ও খাজরাজ গোত্রের মাঝে কৌশলে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। দুটি গোত্র পরস্পরের চোখের কাঁটায় পরিণত হয়। দফায় দফায় রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে মদিনার তপ্ত জমিন। ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজা আওস গোত্রের পক্ষাবলম্বন করে। বনু নাজির ও কাইনুকা খাজরাজ গোত্রের সাথে সমঝোতা করে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল* গ্রন্থে লিখেছেন—

> এই দুই গোত্রের মাঝে একশত বিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চলমান ছিল। আওস ও খাজরাজের মাঝে সর্বশেষ হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে তাদের বড়ো বড়ো নেতারা নিহত হয়।[২১৫]

---

২১৫ *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল* : ১৪৪

মুশরিক আওস ও খাজরাজ সম্প্রদায় ইহুদিদের থেকে শেষ নবির আবির্ভাবের গল্প শুনত। তাদের সাথে মনোমালিন্য হলে বলত—

> এই তো, আর কদিন অপেক্ষা করো, অচিরেই সর্বশেষ নবির আগমন ঘটবে; আমরা তাকে সাথে নিয়ে আদ ও ইরম জাতির মতো তোমাদের ধ্বংস করব।

এভাবে ইহুদিদের থেকে শুনে শুনে আওস এবং খাজরাজ সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি আগ্রহী ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তারা আশায় বুক বেঁধে ছিল, হয়তো শেষ নবির দ্বীনের ওসিলায় আমাদের মাঝে ঐক্যের ভিত স্থাপিত হবে। দূর হবে শত্রুতার কালো অধ্যায়।

জাদুল মাআদ গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এভাবেই কাফিরদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি ধাবিত করে দেন। আল্লাহ তায়ালার কৌশলের ফয়সালা এভাবেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, তিনি মদিনাকে ইসলামের কেন্দ্রস্থল মনোনীত করবেন। সেখান থেকেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের শাশ্বত বাণী।[২১৬]

তিন.

আকাবায়ে উলার সর্বপ্রথম বাইয়াতটি ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাইয়াতে আকাবায় মদিনার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে দেখতে পাই, নবিজি তাদের মৌখিকভাবে কালিমা পড়িয়ে বিদায় দেননি। অন্তঃকরণে ও মৌখিকভাবে ইসলামের দীক্ষা দিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন ও আচরণ ইসলামের বিধি মোতাবেক আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের থেকে আরও বাইয়াত নিয়েছেন যে, 'তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করবে না, চুরি, ব্যভিচার ও অপবাদে জড়াবে না। নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। নেকির কাজে আল্লাহর দেখানো পথ ব্যতীত মনগড়া আমল করবে না।'

তখনও পর্যন্ত জিহাদের বিধান নাজিল না হওয়ায় বারোজনের কাফেলা থেকে জিহাদের বাইয়াত নেননি। এজন্য ঐতিহাসিকরা এই বাইয়াতকে 'বাইয়াতে নিসা'

---

২১৬ *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০

নামে আখ্যায়িত করেছেন। বাইয়াতে আকাবার কাফেলাকে শুধু কালিমা পড়িয়ে বিদায় দিলে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অসংগতি আপন অবস্থায় থেকে যেত। অথচ ঈমানের দাবি হলো—শুধু মুখে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরয়ি বিধান বাস্তবায়ন করা; কিন্তু আমরা সমাজের কিছু লোককে দেখতে পাই, যারা ইসলামকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনমতো জীবনবিধান রচনা করে। তারা কাজের মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করলেও তা মুখে প্রকাশ করে না; কিন্তু তাদের কাজকর্মে প্রমাণ হয়, তারা দ্বীনকে মিটিয়ে দেওয়ার গর্হিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে । সালাত, মসজিদ, সিয়ামসহ যে বিধানগুলো অনুসরণ না করে উপায় নেই, তারা সেই বিধানগুলোতে নীরবতা অবলম্বন করে। জীবনের অন্যান্য বিধানে ইসলামকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনমতো বিধান কার্যকর করে। সেসব ক্ষেত্রে ইসলামকে অপাঙক্তেয় মনে করে।

যারা নবিজির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদি তাদের সম্মুখে বর্তমান যুগের ভ্রান্ত লোকদের এই জীবনদর্শন উপস্থাপন করা হতো, তারা নিঃসংকোচে ইসলাম গ্রহণ করত। কারণ, এভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে শরিয়ত তাদের অনুগামী হতো। নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে সমস্যা হতো না; কিন্তু তারা জানত, ইসলাম সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল এক জীবনবিধানের নাম। সেই বিধানে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। তাতে মনগড়া কোনো বিধান প্রণয়ন বা আমলের সুযোগ নেই। কাফিররা এই বিষয়টি জানার কারণে ইসলাম গ্রহণ না করে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেছে। কপটতার আশ্রয় নেয়নি। কিছু মানুষ ইসলামকে কিছু দুআ ও ইবাদতের সমষ্টি মনে করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের কার্যকারিতা অস্বীকার করে। তাদের সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও

সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়?[১৭]

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ইসলাম কেবল কিছু বিশ্বাস ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান।

চার.

কোনো ব্যক্তি বা গোত্র ইসলাম গ্রহণের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী সিদ্ধান্ত নিতেন? বাইয়াতে আকাবায়ে উলার ঘটনায় এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে । বাইয়াত গ্রহণ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের সাথে মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের কুরআন শিক্ষাদান, সালাত প্রতিষ্ঠা ও শরিয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দিতে থাকেন।

পাশাপাশি মদিনাবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। দাওয়াতের পথ মসৃণ ছিল না তার জন্য। হরহামেশাই শত্রুর টার্গেটে পরিণত হয়েছেন। মুসা ইবনে উমাইরকে শহিদ করতে এসে তার কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত ও অমায়িক ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার গল্প নেহায়েত কম নয়। এ যেন পরশপাথর। জীবন হরণ করতে এসে মুহূর্তেই বনে যেত পরম আপনজন। বসে যেত ছাত্রত্বের কাতারে। এভাবে মদিনার অলিগলি ও প্রতিটি বৈঠকে ইসলামের নাম উচ্চকিত হতে থাকল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের পূর্বেই সেখানে ইসলামের জন্য তৈরি হলো অনুকূল পরিবেশ।

মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর মেহনতে মদিনা ইসলামের উর্বর ভূমিতে পরিণত হলো। যিনি ইসলামের জন্য দুনিয়ার সুখ ও বিলাসিতা বিসর্জন দিয়েছেন। আরামের জীবন ছেড়ে বেছে নিয়েছেন কষ্টের গিরিপথ। ইসলাম-পূর্ব জীবনে আকণ্ঠ বিলাসিতায় নিমজ্জিত ছিলেন। প্রাচুর্যে টইটুম্বুর ছিল জীবনের চারপাশ। ব্যবহার করতেন দামি সুগন্ধি। সুঠাম দেহে পোশাকের আভিজাত্য মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিত। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে সব বিলাসিতা পরিত্যাগ করলেন। ইসলামের দাওয়াতের জন্য জীবনের স্বপ্নসাধ বিসর্জন দিয়ে কষ্ট-সাধনার কণ্টকাকীর্ণ পথ অবলম্বন করলেন। উহুদের যুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর পরিধানের কাপড় ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল

---

১৭ সূরা নিসা, আয়াত : ৬০

না। এই কাপড় দ্বারা পুরো শরীর আবৃত করা যাচ্ছিল না। মাথা ঢাকলে পায়ের দিক ও পায়ের দিকে কাপড় ছড়িয়ে দিলে মাথা আলগা হয়ে যাচ্ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ দেওয়ার পর মুসআব ইবনে উমাইরের পূর্বের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের কথা মনে করে তিনি কাঁদতে লাগলেন। নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, কাফনের কাপড় দিয়ে মাথার দিকে টেনে দাও, পায়ের দিকে ঘাস দ্বারা ঢেকে দাও।[২১৮]

ইসলামের দাওয়াত ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। দাওয়াতের সারকথা হলো, মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা। এই দায়িত্ব নবি-রাসুল ও উলামায়ে কিরামের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। দাওয়াতের এই কাজটুকু জিহাদের মতো ফরজ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মুসলিমের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে অন্যান্য বিধানের মতো তার ওপর জিহাদের বিধান অর্পিত হয়। নারী-পুরুষ, আলিম-দরবেশ ও জনসাধারণ—সকলেই এই বিধানের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের পরিবর্তে মুসলিমদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এজন্য ইসলামকে উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর জন্য ত্যাগের মানসিকতা লালন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর গুরুদায়িত্ব।

* * *

২১৮ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮; *আল ইসাবাহ লিবনি হাজার*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০৩

বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়া

বাইয়াতে আকাবা উলার ঠিক এক বছর পর পুনরায় হজের মৌসুম দরজায় কড়া নাড়ল। মুসআব ইবনে উমাইর মদিনা থেকে সত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারীর বিরাট এক কাফেলা নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। সফরসঙ্গী মুশরিকদের কাছে সফরের উদ্দেশ্য গোপন রাখা হলো। কাব ইবনে মালিক রা. সেই কাফেলার গর্বিত একজন সদস্য। তিনি বাইয়াতের পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইয়্যামে তাশরিকের মধ্যবর্তী রাতে আমাদের সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেন। সেদিন রাতে আমরা দ্রুত শুয়ে গেলাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অতি সন্তর্পণে সাক্ষাতে নির্ধারিত স্থান আকাবার ঘাঁটিতে উপস্থিত হলাম। আমাদের কাফেলায় তেহাত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারী, নুসাইবা বিনতু কাব ও আসমা বিনতু আমর ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উপস্থিত ছিলেন।
>
> আমরা সেখানে নবিজির জন্য অপেক্ষমাণ ছিলাম। হঠাৎ রাতের আঁধার ভেদ করে যেন আলোর ফুল ফুটল। চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে সাথে নিয়ে আগমন করলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। প্রিয় ভাতিজার নিরাপত্তার জন্য এই মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুরুতেই তাদের স্বাগত জানালেন। তারপর কাফেলার লোকেরা আলোচনা শুরু করল।

তারা নবিজির কাছে বিনীত কণ্ঠে আরজ করল—হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য এবং আপনার প্রভুর জন্য আমরা কী করতে পারি, আমাদের আদেশ করেন।

তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নবিজি কুরআন তিলাওয়াত করলেন। আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে বাইয়াত করার পূর্বে বললেন—আমি তোমাদের এই শর্তে বাইয়াত করব যে, তোমাদের স্ত্রী-বাচ্চাদের যেভাবে নিরাপত্তা দাও, ঠিক সেভাবে আমার নিরাপত্তা দেবে।

বারা ইবনে মারুর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে বললেন—ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবি করে পাঠিয়েছেন। আমরা বংশানুক্রমে যোদ্ধা জাতি। নিজেদের স্ত্রী-বাচ্চাদের যেভাবে নিরাপত্তা দিই, সেভাবেই আপনাকে নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টন করে রাখব। প্রিয় রাসুল, আমাদের আপনি বাইয়াত করে নেন।

এরই মাঝে আবুল হাইসাম ইবনে তিহাম রা. বলে উঠলেন—আমাদের এবং ইহুদিদের মাঝে সমঝোতা চুক্তি রয়েছে। প্রয়োজনে আমরা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবো; কিন্তু একটি বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে, যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিজয়ী করবেন, তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে মক্কায় স্বীয় গোত্রের কাছে চলে আসবেন?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—না, কখনো আমি তোমাদের ছেড়ে চলে আসব না। আমার কাছে তোমাদের রক্ত ও সম্মানের মূল্য আমার নিজের রক্ত ও সম্মানের মতো। আমি তোমাদের মাঝে একাকার হয়ে গিয়েছি। তোমরা যাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমিও তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হব। যাদের সাথে বন্ধুত্বের বাঁধন গড়ে তুলবে, আমিও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখব। তারপর তাদের বললেন—তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা নির্বাচিত করো, যারা নিজ নিজ প্রতিনিধিত্ব করবে।

তখন খাজরাজ গোত্রের নয়জন ও আউস গোত্রের তিনজনকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। তারপর নবনির্বাচিত বারোজন প্রতিনিধিকে বললেন—আমি তোমাদের ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের সঙ্গীদের মতো দায়িত্বশীল করে পাঠাচ্ছি। তোমরা নিজ নিজ গোত্রে সামর্থ্যের সবটুকু

উজাড় করে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করবে। আমিও নিজ গোত্রের একজন দায়িত্বশীল।

বৈঠকের মৌলিক কথাবার্তা শেষ হলো। সর্বপ্রথম ইবনে মারুর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই বাইয়াতে নবিজি জিহাদের কথাও যুক্ত করেছিলেন। তিনি মহান আল্লাহ তায়ালা ও নিজের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন। নবিজির সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের জন্য আনসারদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ শোনান। তারপর একে একে গোত্রের সকলেই বাইয়াত গ্রহণ করেন।

বাইয়াতের কাজ শেষ হলে নবিজি ঘোষণা করলেন—তোমরা প্রত্যেকের গন্তব্যে চলে যাও। চলে যাওয়ার সময় আব্বাস ইবনে উবাদা ইবনে নাফলা নবিজির কাছে অনুমতির স্বরে বলল—হে আল্লাহর রাসুল, যিনি আপনাকে সত্য নবি করে পাঠিয়েছেন ওই সত্তার কসম! আপনি যদি অনুমতি দেন, সকালেই আমরা মিনায় অবস্থানরত মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—আমি তো তোমাদের এই নির্দেশ দিইনি; এক্ষুনি নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাও।

কাব ইবনে মালিক রা. বলেন—তারপর আমরা সকলেই নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেলাম। সকাল হতেই কুরাইশদের একদল লোক আমাদের কাছে এসে বলতে লাগল, আমাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা অনেক বড়ো অ্যাজেন্ডা নিয়ে মক্কায় এসেছ। তোমরা নাকি মুহাম্মাদকে এখান থেকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাবে, এমনকি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমরা তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করেছ! কিন্তু তোমরা জেনে রাখো—পুরো আরবের মধ্যে অন্য সব গোত্রের চেয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের কাছে খুবই অপছন্দনীয়।

এমনি সময় আমাদের জন্য আল্লাহর নুসরত নেমে এলো। আমাদের সফরসঙ্গী এক মুশরিক রাতের ঘটনা সম্বন্ধে অবগত ছিল না, সে দাঁড়িয়ে বলল—খোদার কসম! আমরা কখনো এমনটি করিনি, এমনকি এই জাতীয় কোনো ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অবগত নই। এ সময় আমরা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করেছিলাম। এরপর সকলেই মিনা থেকে চলে গেল; কিন্তু ঘটনার রেশ এখানেই শেষ হয়নি।

কাব ইবনে মালিক রা. বলেন—কুরাইশরা রাতের ঘটনা সম্বন্ধে আরও সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারল। তারা পুনরায় আমাদের তালাশে বের হলো; কিন্তু ততক্ষণে আমরা সেখান থেকে সরে গিয়েছি। আজাখির নামক স্থানে কুরাইশরা সাদ ইবনে উবাদা ও মুনজির ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে পেল। তন্মধ্যে সাদ রা.-এর হাত কাঁধের সাথে বাঁধল। তারপর নির্মমভাবে প্রহার করে কপালের চুল ধরে টানতে টানতে মক্কায় নিয়ে গেল।

সাদ রা. বন্দিত্ব সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, একবার কুরাইশরা আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছিল। এমনি সময়ে কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি কানে কানে এসে বলল—এখানের কোনো ব্যক্তির সাথে তোমার কোনো অঙ্গীকার বা ভালো সম্পর্ক আছে?

আমি বললাম—অবশ্যই আছে। এই তো সেদিন জুবাইর ইবনে মুতয়িম ও হারিস ইবনে উমাইয়ার ব্যবসায়ীদেকে আমি নিজ শহরে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম। তখন ওই ব্যক্তি পরামর্শ দিলো—এই দুজনের প্রভাব কাজে লাগাও। আমি তার পরামর্শ মোতাবেক কুরাইশদের কাছে এই দুজনের নাম বললাম। তারা দুজন এসে কুরাইশদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করলেন।

উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে জিহাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন। আমরা আরও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি যে, আমরা ভালো-মন্দ সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্যে অটল থাকব। তার কাছের মানুষদের সাথে বিবাদে জড়াব না। সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলব। ভর্ৎসনাকারীদের কথায় কর্ণপাত করব না।[২১৯]

সর্বপ্রথম এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিহাদের অনুমতি দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

২১৯ এই বর্ণনাকৃত ঘটনাটির সূত্র *সিরাতে ইবনে হিশাম, মুসনাদু আহমাদ, তারিখুত তাবারিসহ* আরও সেইসব নির্ভরযোগ্য কিতাব, যেগুলোতে এই পরিপূর্ণ বর্ণনাটি স্থান পেয়েছে। এটি মা'বাদ ইবনে কাব ইবনে মালিক রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন।

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম; তাদের তাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে—'আমাদের রব আল্লাহ।' আল্লাহ যদি মানুষদের একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত নাসারা সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যাতে খুব বেশি স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[২২০]

* * *

২২০ সূরা হজ, আয়াত : ৩৯-৪০

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হিজরতের পূর্বের দুই বছরে মদিনার দুটি কাফেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। উভয় কাফেলা ইসলামের ঘোষণা, দ্বীনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ও নবিজির সব শর্ত বিনা বাক্যে মানতে বদ্ধপরিকর ছিল। উভয় বাইয়াতের ধরন একই রকম ছিল। তবে উভয় বাইয়াতের মাঝে দুটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

প্রথম পার্থক্য

প্রথম বাইয়াতে মদিনার বারোজন পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পঁচাত্তরে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে তিয়াত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারীও ছিলেন।

প্রথম বাইয়াতের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার বারোজনের সাথে মুসআব ইবনে উমাইর রা.-কে প্রেরণ করেন। মুসআব ইবনে উমায়ের মিশন অনুযায়ী মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। ইসলামে দীক্ষিত মুসলিমদের কুরআন শিক্ষা দেন। প্রতিটি কাজে দ্বীনের বিধিবিধানে অভ্যস্ত করে তোলেন। তার অক্লান্ত মেহনতের ফলে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে যায়। ইসলামের আলোচনায় সরগরম হয়ে ওঠে মদিনার অলিগলি, প্রতিটি মজলিস। মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর মতো প্রত্যেক যুগের প্রতিটি মুসলিমের ওপর নিজের সামর্থ্য অনুপাতে ইসলাম প্রচার করা আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

দ্বিতীয় পার্থক্য

বাইয়াতে আকাবায়ে উলায় জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইয়াতে আকাবায়ে সানিয়ায় স্পষ্টভাবে জিহাদের বাইয়াত

গ্রহণ করেছেন। কারণ, নবিজির নিরাপত্তা ও দ্বীনের দাওয়াতের প্রয়োজনে অচিরেই অস্ত্র হাতে কাফিরদের মুখোমুখি হতে হবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বাইয়াতে জিহাদ ও দাওয়াতের কাজে মদিনাবাসী কর্তৃক সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি আলাদা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। মক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল হয়নি; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বেই বিষয়টি অবগত করেছিলেন। এজন্য তিনি অগ্রিম মদিনাবাসীর থেকে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন যে হিজরত সংঘটিত হওয়ার পর তোমাদের জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। কিছু মানুষ মাক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার কথা বলেন। যেমন : ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে বিষয়টি বোঝা যায়। তাদের এই দাবি ঠিক না হওয়ার পক্ষে আব্বাস ইবনে উবাদার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। যখন তিনি বলেছিলেন—

> হে আল্লাহর রাসুল, যিনি আপনাকে সত্য নবি করে পাঠিয়েছেন ওই সত্তার কসম! আপনি যদি অনুমতি দেন, সকালেই আমরা মিনায় অবস্থানরত মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করব।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিহাদের অনুমতি না দিয়ে বলেছিলেন—

> 'আমি তো এই মুহূর্তে তোমাদের জিহাদের অনুমতি দিইনি; এক্ষুনি নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাও।'

এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, সূরা হজের উনচল্লিশ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম জিহাদ শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে জিহাদসংক্রান্ত কোনো আয়াত নাজিল হয়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এ আয়াত নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—

> যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা হতে বহিষ্কার করা হলো, তখন আবু বকর রা. বললেন তারা তাদের নবিকে বের করে দিলো 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' এই লোকগুলো নিশ্চিত ধ্বংস হবে। তখন এই আয়াত নাজিল হলো—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদের—যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।'[২২১]

আবু বকর রা. বলেন—তখন আমি বুঝলাম, শীঘ্রই জিহাদ আরম্ভ হবে।[২২২]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়—নবিজি হিজরত করার পর জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। মাক্কি জীবনে জিহাদ শরয়ি বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এই মতামত ব্যক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।

জিহাদ দেরিতে শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার কারণ

কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—জিহাদসংক্রান্ত আয়াত বিলম্বে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কী? বাস্তবে এর পেছনে লুক্কায়িত রয়েছে গূঢ় রহস্য। বাস্তবতার দাবি হলো—জিহাদের বিধান নাজিল করার পূর্বে সর্বপ্রথম ইসলামের পরিচয় ও শাশ্বত সৌন্দর্যের দিকগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা। দলিলের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। দাওয়াতি কাজের বাধাবিপত্তিগুলো পর্যবেক্ষণপূর্বক অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা। এই ধাপগুলো অতিক্রম করার পর আল্লাহ তায়ালা জিহাদের ফরজে কিফায়া বিধান নাজিল করলেন। জিহাদের এই দায়িত্ব বিশ্বের সকল মুসলিমের কাঁধে অর্পিত হয়েছে।

মাক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল না হওয়ার একটি কারণ হলো—তখনও মুসলিমরা মক্কার মুশরিকদের অধীনে বসবাস করত। তারা স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রের মালিক হয়নি। মুসলিমদের জন্য জিহাদের জন্য প্রয়োজন নিজস্ব রাষ্ট্র। মুসলিমদের জন্য মদিনা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ার সাথে সাথে সেই প্রতিবন্ধকতা মিটে গেল। মদিনা নামক দুর্গ থেকে পরিচালিত হতে থাকল জিহাদের সব আয়োজন।

শরয়ি দৃষ্টিকোণে জিহাদ

জিহাদ। শান্তিপ্রিয় ইসলামের গৌরবময় বিধান। জিহাদ সম্বন্ধে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নির্দেশনা। সন্ত্রাসের সাথে জিহাদের দূরতম কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সন্ত্রাসের সম্পর্ক হিংস্রতার সাথে। জিহাদ হিংস্রতাকে উৎখাত করে সমাজে ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। জিহাদকে কলুষিত করতে একদল লোকের

---

২২১ সূরা হজ, আয়াত : ৩৯

২২২ *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২; *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৪

চেষ্টার অন্ত নেই। জিহাদকে সন্ত্রাস আখ্যা দেওয়ার জন্য মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক অপব্যাখ্যা। মানুষের মগজে বপন করছে সন্দেহের বীজ। জিহাদ তাগুত শক্তির কাছে ভয়ংকর বিধান। জিহাদ শব্দটি শুনতেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা অনুধাবন করেছে—মুসলিমদের থেকে জিহাদের প্রেরণা বিদায় করতে হবে। তাদের মাঝে জিহাদের চেতনা জাগরূক থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তির তাদের রুখার সাধ্য নেই। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে তারা জিহাদের বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। মিথ্যা তথ্যে ভারী করছে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়া।

তাগুত শক্তির প্রোপাগান্ডা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের সামনে কিছু বিষয় স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে শরিয়তে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং জিহাদের স্তর বিন্যাসের ধারণা অন্যতম। এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনার কারণ হলো, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ ও স্তরবিন্যাসের বিষয়গুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তির জাল। এগুলো সম্বন্ধে আলোচনার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হবে।

জিহাদ কাকে বলে

শরিয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়—কালিমার আওয়াজ উচ্চকিত করতে এবং সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করা। এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রের মাধ্যমে শক্তি ব্যয় করা জিহাদের একটি প্রকার। জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ধাপে ইসলামের হুকুম কায়েম করা।

জিহাদের স্তর

জিহাদের পরিচয় ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানার পর এবার আমরা স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করব। ইসলামের শুরু যুগ অর্থাৎ মাক্কি জীবনে জিহাদের বিধান নাজিল হয়নি। সে সময় শত্রুদের জুলুম-নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তারপর হিজরতের শুরুতেই রক্ষণাত্মক জিহাদের অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন—তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ জুলুম করতে এলে এর সমুচিত জবাব দেবে। এর কিছুদিন পর আক্রমণাত্মক জিহাদের অনুমতি দিয়ে বলা হয়, ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যারা তোমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। জিহাদের এই স্তরটি ইসলামে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনোনীত হয়। প্রতি যুগে

সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জিহাদ করা ওয়াজিব। যাদের সর্বশেষ স্তর আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

> কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের কাছাকাছি, তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন।[২২৩]

এ প্রসঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই—মানুষ এর স্বীকারোক্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাদের তাদের জীবন ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হবে। আর তাদের চূড়ান্ত হিসাব আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বে।[২২৪]

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলামে জিহাদের বিধানে আক্রমণাত্মক বা রক্ষণাত্মক বলে কোনো বিভাজন নেই। রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সময়ের প্রয়োজনে নমনীয় কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই কৌশল জিহাদের অংশ বলে বিবেচিত। ফিকহের কোনো কিতাবে সেই জিহাদকে রক্ষণাত্মক জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়নি। ফিকহের কিতাবে পৃথক শিরোনামে এ সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে । আশঙ্কার বিষয় হলো, অনেক গবেষক বিভ্রান্তির শিকার হয়। জিহাদের মূল অর্থের সাথে রক্ষণাত্মক জিহাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে। অথচ জিহাদ বলা হয়—কালিমার আওয়াজ উচ্চকিত করতে ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করা। জিহাদের এই সংজ্ঞায় রক্ষণাত্মক জিহাদের নতজানু নীতির ব্যাপারে কোনো কথা নেই। জিহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এটাই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

---

২২৩ সূরা তাওবা, আয়াত : ১২৩
২২৪ *জামে তিরমিজি* : ২৬০৬

ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার

জিহাদের বিধান নাজিল হওয়ার পর জিহাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা ছড়ানো হয়। জিহাদের ওপর আরোপিত বিভ্রান্তির ওপর ভিত্তি মানুষ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামবিদ্বেষী লোকগুলো ঘোষণা করতে থাকে—

> ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে। নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম জোর করে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। মানুষের ওপর জুলুম ও কঠোরতার ফলে ইসলাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয় লাভ করে। মানুষ স্ব-ইচ্ছায় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি।[২২৫]

ধোঁকার পদ্ধতি

ঈমানদার ব্যক্তিরা বলেন—ইসলাম শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার ধর্ম। যখন জিহাদ ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না, তখনই কেবল জিহাদ করা হয়। উল্লিখিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ একটি অপরটির বিপরীত; কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীরা উভয় মতামতকে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। উভয় মতামতের মাধ্যমে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কোণঠাসা করার পাঁয়তারা করে। এক্ষেত্রে তাদের কৌশল হলো—প্রথমেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। মুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলামের শান্তি ও সৌন্দর্য তুলে ধরার পর তারা বলে, ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, তাহলে মানুষের ওপর অস্ত্রধারণ করা তো ইসলামের শিক্ষার বিপরীত। এই কথা শোনার পর জিহাদ সম্বন্ধে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। জিহাদের প্রতি বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। একপর্যায়ে জিহাদকে অস্বীকার করে।

প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য

আমার বন্ধু ডক্টর ওহবাহ জুহাইলি *আসারুর হারব ফিল ফিকহিল ইসলামি* গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রাচ্যবিদ আন্ডারসন সম্বন্ধে এই সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমি হুবহু তার বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি—

> পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে ইংরেজরা মুসলিমদের মাঝে জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়াকে খুব বেশি ভয় করে। কেননা, এর ফলে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়ে শত্রুদের পরাভূত করবে। এজন্য তারা প্রচার করে বেড়ায়—'জিহাদের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগে

---

২২৫ ফান ফুলটন *আস-সিয়াদাতুল আরাবিয়্যা* কিতাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা : ৫

জিহাদের বিধানের কার্যকারিতা অবশিষ্ট নেই।' অ্যান্ডারসন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্যতম। এই সকল বেঈমানদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> অতঃপর যদি 'মুহকাম' কোনো সূরা নাজিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের কোনো নির্দেশ থাকে, আপনি দেখবেন—যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে।

যাহোক ৩ জুন, ১৯৬০ সালের শুক্রবার দিন সন্ধ্যায় প্রাচ্যবিদ আন্ডারসনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে জিহাদ সম্বন্ধে তার বক্তব্যের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলাম। সে আমাকে ফিকহের মূলনীতি শুনিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামের বিধানেও পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরজ নয়। বিশ্বের সকল মুসলিম বৃত্তের বন্ধনে একাট্টা হয়ে আছে। জিহাদের কারণে মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কটু কথা বলে। তা ছাড়া স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল কোনো ব্যক্তি শক্তির জোরে আধিপত্য বিস্তারকে পছন্দ করবে না।[২২৬]

ইসলামবিদ্বেষী শক্তি ভালো মানুষের ছদ্মাবরণে যুগে যুগে এভাবে ইসলামে বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে।

* * *

২২৬ *আসারুর হারব ফিল ফিকহিল ইসলামি* : ৫৯

মদিনায় হিজরতের অনুমতি

মক্কার অসহনীয় পরিবেশ

অসহনীয় জুলুমে উত্তপ্ত মক্কার পরিবেশ। কুরাইশ কর্তৃক মুসলিম নিধনের মহোৎসব চলছে। ঠিক তখনই মদিনার সত্তরোর্ধ্ব লোকের কাফেলা মক্কায় আগমন করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ইবনে সাদ *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে আয়িশা রা. আনহার সূত্রে সেই সময়ের চিত্র উল্লেখ করেছেন—

> কাফেলার প্রতিটি প্রাণ নবিজির পক্ষে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহর দরবারে নবিজি শুকরিয়া আদায় করেন। কুরাইশরা মদিনার কাফেলার সাথে নবিজির সাক্ষাতের বিষয়টি জানতে পেরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। জুলুমের মাত্রা পূর্বের চেয়ে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছল। এহেন পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম নবিজির কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, যারা মক্কা থেকে চলে যেতে চাও, তারা সোজা মদিনায় চলে যাও।
>
> নবিজির অনুমতি পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত সংগোপনে পরস্পরের সাথে পরামর্শ করে মদিনায় হিজরত করেন। আবু সালামা ইবনে আবদুল্লাহ আসাদ সর্বপ্রথম মুহাজির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারপর আমির ইবনে রবিয়া তার স্ত্রী বিনতে আবু হাসামাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেন। নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিনতে আবু হাসামা হাওদায়

আরোহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। তারপর দলে দলে মদিনায় হিজরতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়। মদিনার আনসার মুহাজিরদের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[২২৭]

অন্য সকল সাহাবির চেয়ে উমর রা.-এর হিজরতের চিত্র ব্যতিক্রম ছিল। আলি রা. সেই চিত্র বর্ণনা করেছেন—

> উমর রা. ঘর থেকে রণসাজে সজ্জিত হয়ে হিজরতের ইচ্ছায় বের হলেন। গলায় ঝোলানো তরবারি, কাঁধে ধনুক, হাতে তির এবং কোমরে বর্শা বেঁধে কাবা প্রাঙ্গণে ছুটে চললেন। যেখানে পূর্ব থেকে কাফির নেতারা বৈঠক করছিল। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ধীরেসুস্থে বাইতুল্লাহর চারপাশে সাতবার তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায় করলেন। তারপর সেখানে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—আল্লাহ দুশমনদের ধ্বংস করুক, লাঞ্ছিত করুক!
>
> যে ব্যক্তি মায়ের চোখে অশ্রু ঝরাতে চায়, বাচ্চাদের এতিম ও স্ত্রীকে বিধবা করতে চায়, সে যেন এই মুহূর্তে আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার এই ঘোষণার পর কিছু দুর্বল ও মাজলুম ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ায়। তিনি তাদের সাথে কিছু কথা বলে একাই মদিনার পথে রওনা হন।[২২৮]

এভাবেই হিজরতের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। একসময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং মুশরিকদের হাতে বন্দি মুসলিম ও সফর করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ ছাড়া সকলেই মদিনায় হিজরত করেন।

* * *

২২৭ *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১০-২১১; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬৭

২২৮ *উসদুল গাবাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

হিজরতের শিক্ষা

হিজরতের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে জর্জরিত ছিলেন। হিজরতের মাধ্যমে সেই কঠিন পরীক্ষা থেকে নিস্তার পাওয়ার পর শুরু হলো পরীক্ষার নতুন অধ্যায়। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জন্মভিটা, সহায়সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে আসার নিদারুণ কষ্টের পরীক্ষা হাসিমুখে বরণ করে নেন। মক্কা থেকে হিজরত করার সময় তারা ঈমানকে বুকে ধারণ করে দুনিয়াবি সব অর্জন বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা মদিনায় এমন সাহায্যকারী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, যারা তাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে অপেক্ষমাণ ছিলেন।

মুহাজির সাহাবায়ে কিরামের এই ঘটনা পৃথিবীর অনাগত সকল মুসলিমের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ত্যাগের নাজরানা পেশ করলে আল্লাহ তায়ালা প্রতি যুগে বান্দাদের যথাযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

মদিনার আনসার সাহাবিগণ মুহাজির সাহাবিগণের জন্য নিজেদের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ইসলামের প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। স্থাপন করলেন মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা রক্তের ভ্রাতৃত্বের চেয়েও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাজিরদের জন্যও মিরাসের বিধান কার্যকর ছিল। মদিনায় ইসলামের ভিত্তি শক্তিশালী হওয়া পর্যন্ত মিরাসের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য আলাদাভাবে তাদের নির্ধারিত অংশের বিধান নাজিল হয়নি। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের স্বার্থ রক্ষার জন্য আল্লাহ

তায়ালা এই বিধান বিলম্বে নাজিল করেন। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ়করণে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই।[২২৯]

হিজরতের ঘটনা থেকে বিশেষত এই দুটি শিক্ষা মুসলিমদের জন্য পরম পাথেয়।

দারুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব

ইমাম কুরতুবি র ইবনুল আহ. রাবি থেকে হিজরতসংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ফরজ বিধানের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান রয়েছে। কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে জামাতে সালাত আদায়, রোজা, হজসহ ইসলামের অন্যান্য বিধান পালনে বাধাপ্রাপ্ত হলে মুসলিমদের জন্য সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ। নবিজির দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য হিজরতের যে বিধান কার্যকর ছিল, মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। হিজরতের বিধান বলবৎ থাকার স্বপক্ষে এ আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

২২৯ সূরা আনফাল, আয়াত : ৭২

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করে— 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?'

তারা বলে—'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।' তারা জিজ্ঞেস করে— 'আল্লাহর জমিন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে?' এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না।[২৩০]

পারস্পরিক সহমর্মিতা ওয়াজিব

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিশ্বব্যাপী। বিশ্বের সব প্রান্তের মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে । সকল উলামায়ে কিরাম এই বিধানে একমত যে, কোনো মুসলিম নির্যাতিত হলে অপর মুসলিমের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নির্যাতিত মুসলিমের সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে কবিরা গুনাহকারী সাব্যস্ত হবে।

আবু বকর ইবনুল আরাবি বলেন—

কোনো মুসলিম কাফিরদের হাতে বন্দি বা জুলুমের শিকার হলে অন্য মুসলিমদের ওপর তার শরয়ি অধিকার সাব্যস্ত হয়। ওই মুসলিমকে মুক্ত করার জন্য অন্য মুসলিমদের ওপর শারীরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সবটুকু ব্যয় করা ওয়াজিব। এমনকি এই জন্য মুসলিমদের কাছে কোনো সম্পদ অবশিষ্ট না থাকলেও এই দায়িত্ব থেকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই।[২৩১]

কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ

---

২৩০ সূরা নিসা, আয়াত : ৯৭-৯৮

২৩১ *আহকামুল কুরআন লিবনিল আরাবি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭৬

মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ থাকবে। সম্পর্কের এই বাগডোরে আবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। কুরআনুল কারিমের আয়াতের মাধ্যমে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

আর যারা কুফরি করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। যদি তোমরা তা নাক রো, তবে জমিনে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।[২৩২]

আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—'কাফিরদের সাথে আন্তরিক সম্পর্কে জড়ালে মুসলিমদের ওপর নেমে আসবে বিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু।' ইসলামের বিজয়ের জন্য এই শিক্ষা বুকে ধারণ করার বিকল্প নেই।

ইবনুল আরাবি আরও বলেন—

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। মুসলিম ও কাফির প্রত্যেকের জন্য নিজ ধর্মের লোকদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেকের স্বধর্মের লোকদের বিশ্বাস, আমল ও আচার-সংস্কৃতির সাথে মিল রয়েছে।[২৩৩]

আল্লাহ তায়ালার এই শিক্ষা প্রতি যুগের মুসলিমদের বিজয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিমরা যখনই ভ্রাতৃত্ববোধ ভুলে কাফিরদের সাথে হাত মিলিয়েছে, তখনই মুসলিমরা নতজানু হতে বাধ্য হয়েছে। নেমে এসেছে লাঞ্ছনার ঝড়।

* * *

২৩২ সূরা আনফাল, আয়াত : ৭৩

২৩৩ *আহকামুল কুরআন লিবনিল আরাবি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭৬

মদিনার পথপানে

আবু বকরের অপেক্ষা

সাহাবায়ে কিরাম হিজরত করে দলে দলে ছুটে চললেন মদিনার পানে। মক্কায় হাতে গোনা দুয়েকজন ছাড়া কোনো মুসলিম নেই। এই পরিস্থিতিতে আবু বকর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হিজরতের অনুমতি কামনা করলেন। নবিজি বললেন—

আর কিছুদিন অপেক্ষা করো; আমি আশাবাদী, আল্লাহ তায়ালা আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেবেন।

আবু বকর রা. অবাক মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আপনিও সফরের ইচ্ছা পোষণ করেন!

নবিজি বললেন—হ্যাঁ।

আবু বকর রা. নবিজির সাথে সৌভাগ্যময় সফরের আশায় মক্কায় রয়ে গেলেন। সফরের বাহন হিসেবে দুটি উট ক্রয় করে খুবই যত্নে লালনপালন করতে থাকেন।[২৩৪]

নবিজিকে হত্যার চক্রান্ত

দিনদিন ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে কুরাইশদের কপালে নিদারুণ চিন্তার অসংখ্য ভাঁজ পড়ল। তারা দেখতে পেল—শুধু মক্কা নয়, আশপাশের এলাকা থেকেও মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ছুটে আসছে। এই ভেবে তাদের দুশ্চিন্তার মাত্রা আরও বেড়ে গেল যে, অচিরেই হয়তো মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারী অধ্যুষিত

---

২৩৪ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫৫

আশপাশের কোনো এলাকায় গিয়ে তাদের সংঘবদ্ধ করে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে। এই পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় নির্ধারণ করার জন্য তারা কুসাই ইবনে কিলাবের বৈঠকঘর দারুন নদওয়াতে মিলিত হলো। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো—

> প্রত্যেক গোত্র থেকে সুঠাম দেহবিশিষ্ট যুবক বাছাই করা হবে। প্রত্যেক গোত্র থেকে বাছাই করার উদ্দেশ্য হলো, সব গোত্রের বিরুদ্ধে নবিজির বংশ প্রতিশোধ নিতে সাহস করবে না। সবার হাতে থাকবে ধারালো তরবারি। নির্ধারিত দিনে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আক্রমণ করে নবিজিকে শেষ করে দেবে।

এহেন জঘন্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা দিনক্ষণও নির্ধারিত করল। তখনই জিবরাইল আ. নবিজির কাছে এসে হিজরতের সুসংবাদ শোনালেন। রাতে নিজ বিছানায় ঘুমাতে নিষেধ করে দিলেন।[২৩৫]

আম্মাজান আয়িশার বর্ণনা

হিজরতের ঘটনা প্রসঙ্গে আয়িশা রা. বলেন—

> একদিন আমরা ঠিক দুপুরবেলায় আবু বকর রা.-এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবু বকরকে খবর দিলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মস্তক আবৃত অবস্থায় আসছেন। তা এমন সময় ছিল—যে সময় তিনি ইতঃপূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবু বকর তাঁর আসার খবর শুনে বললেন—আমার মাতা-পিতা তার প্রতি কুরবান। আল্লাহর কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণেই এসেছেন।
>
> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন—এখানে অন্য যারা আছে, তাদের বের করে দাও।
>
> —হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান! এরা তো আপনারই পরিবার।

---

২৩৫ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৫; *তাবাকাতু ইবনি সাদ* : ২১২

—আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

—হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে ইচ্ছুক।

—ঠিক আছে।

—হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতামা-তা কুরবান! আমার এ দুটি উট হতে আপনি যেকোনো একটি নিন।

—নিতে পারি, তবে মূল্যের বিনিময়ে।

আয়িশা রা. বলেন—আমরা অতি শীঘ্রই সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী গুছিয়ে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর তার কোমরবন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাকে 'কোমরবন্ধওয়ালি' বলা হতো।

ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমাদ যৌথভাবে বর্ণনা করেন, আসমা রা. বলেন—

আবু বকর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরতের সময় ঘরের পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহামের সবগুলো নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমার দাদা আবু কুহাফা বললেন, আমার মনে হয় আবু বকর ঘরের সব টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে; কোনো কিছু রেখে যায়নি। আমি বললাম—না, দাদা; বরং বাবা আমাদের জন্য যথেষ্ট টাকা-পয়সা রেখে গেছেন।

তখন দাদার দৃষ্টিশক্তি ছিল না। তাকে বুঝ দেওয়ার জন্য আমি কিছু পাথর একত্র করে বাবার টাকা-পয়সা রাখার পাত্রে সেগুলো রেখে ওপরে কাপড় বিছিয়ে দিলাম। সেই কাপড়ের ওপর দাদাজানের হাত স্পর্শ করানোর পর তিনি সেগুলোকে দিরহাম মনে করলেন। দাদা খুশি হয়ে বললেন—সে কিছু হলেও রেখে গেছে; যাক খুব ভালো কাজ হয়েছে।

আসমা রা. বলেন—দাদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। মূলত ঘরে তখন কোনো অর্থকড়ি ছিল না।[২৩৬]

---

২৩৬ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৮; *মুসনাদু ইমাম আহমাদ*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা :২৮২

নবিজির বিছানায় কে

কুচকুচে কালো রাত। বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক কাফির যুবকরা ঘেরাও করেছে নবিজির ঘরের চারপাশ। এদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আলি রা.-কে নিজ বিছানায় রেখে এলেন। এর কারণ হলো—কাফিররা নবিজির প্রতি সীমাহীন শত্রুতা পোষণ করলেও পুরো মক্কায় তাঁকে সবচেয়েয়ে বিশ্বস্ত মনে করত। তাদের দামি গয়নাগাটি, আসবাবপত্র নবিজির কাছে আমানত রাখত। সেই আমানতগুলো নবিজি যথাযথভাবে মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বের হওয়ার সময় আলি রা.-কে আশ্বস্ত করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সকাল অবধি নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

নবিজি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। কাফিরদের চোখ লক্ষ্য করে মাটি নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তেই তাদের চোখে ভর করল রাজ্যের ঘুম। আল্লাহর কুদরত প্রকাশিত হলো। তিনি তাদের শরীর ঘেঁষে বের হয়ে আসলেন; কিন্তু তারা কিছুই বলতে পারল না।

সাওর গুহায় রাত

নবুয়তের তেরো বছর অতিক্রম হওয়ার পর দুই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ ঈসায়ির বিশ সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক রাত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. অত্যন্ত সন্তর্পণে সাওর পর্বতের মুখে দাঁড়ালেন। আবু বকর রা. আরজ করলেন—হে আল্লাহর রাসুল, আপনি সামান্য সময় গুহার বাইরে অবস্থান করুন।

নবিজি বাইরে দাঁড়ালে আবু বকর গুহার ভেতরে ঢুকে পরিষ্কার করেন এবং গর্তগুলো বন্ধ করেন; যেন বিষাক্ত কোনো বিচ্ছু নবিজিকে দংশন করতে না পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এভাবেই তারা নিজের জীবনের চাইতে নবিজিকে প্রাধান্য দিতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন সাওর গুহায় অবস্থান করেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর সারাদিন তাঁদের দুজনের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করা হতো, তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তারপর যখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসত, তখন সংবাদ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতেন। আসমা বিনতে আবু বকর

সন্ধ্যাবেলায় খাবার নিয়ে আসতেন। আবু বকর রা.-এর গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরাহ তাঁদের কাছেই দুধালো বকরির পাল চরিয়ে বেড়াত। রাতের কিছু সময় চলে গেলে, এরপর সে বকরির পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দুজন দুধ পান করে আরামে রাত্রি যাপন করতেন। তাঁরা বকরির দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর প্রথমে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর গুহা থেকে বের হতেন। আমির ইবনে ফুহাইরা তার পিছু পিছু বকরির পাল নিয়ে বের হতেন; যেন পায়ের ছাপ (ট্র্যাক) অবশিষ্ট না থাকে।

গুহামুখে কুরাইশরা

এদিকে ভোররাতে কাফিররা নবিজির হিজরত সম্বন্ধে অবগত হলো। সাথে সাথে নবিজির তালাশে চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দিলো। একদল লোক গারে সাওরের মুখ অবধি এসে পৌঁছল। তাদের পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। নবিজির নিরাপত্তা-চিন্তায় আবু বকর অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাদের কোনো একজন যদি নিজেদের পায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে।

নবিজি বললেন—আবু বকর, আমাদের দুজনের সাথে তৃতীয়জন হিসেবে আল্লাহ তায়ালা কি নেই?

আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের চোখে পর্দা এঁটে দিলেন। তারা একবারের জন্যও গর্তের ভেতরে দৃষ্টি দিলো না। কাফিররা ব্যর্থ হয়ে নিজেদের আস্তানায় চলে গেল। তারা চলে যাওয়ার পরপরই আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত দুটি উট নিয়ে আগমন করল। সে মুশরিক ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদিনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাড়া করা হয়েছিল। নিরাপত্তার স্বার্থে সে পরিচিত রাস্তায় না গিয়ে সমুদ্রের উপকূল ধরে মদিনা অভিমুখে চলতে থাকল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. তার দেখানো পথ ধরেই উটের ওপর আরোহণ করে পথ চলতে থাকলেন।

নবিজিকে সুরাকার পশ্চাদ্ধাবন

ওদিকে কাফিররা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা.-কে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারা ঘোষণা দিলো—যারা এই দুজনকে ধরে আনতে পারবে, প্রত্যেকের জন্য একশত করে মোট দুইশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। সুরাকা ইবনে জুসুম মুদলিস গোত্রের এক মজলিসে বসে ছিল। এই অবস্থায়

এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল—হে সুরাকা, আমি এই কেবল উপকূল ধরে ছোট্ট কাফেলা যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সহযাত্রী হবেন।

সুরাকা বুঝতে পারল—এরাই কাঙ্ক্ষিত কাফেলা। সুরাকা পুরস্কারের লোভে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলল—এরা তারা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখছ। এরা এইমাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। সুরক্ষা অল্প কিছুক্ষণ পর বাড়িতে এসে নবিজির তালাশে ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে গেল। সুরাকা নবিজির কাছাকাছি পৌঁছার পর ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তারপর সে পুনরায় ঘোড়ায় উঠে নবিজির এতটুকু কাছে পৌঁছে গেল যে, সে নবিজির কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিল। আবু বকর রা. বারবার সুরাকাকে দেখছিলেন; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবারের জন্যও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। এমন সময় হঠাৎ সুরাকার ঘোড়ার সামনের পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং সে ঘোড়ার ওপর থেকে ছিটকে পড়ল।

সুরাকা ঘোড়াটিকে ধমক দিলো। অনেক কষ্টের পর যখন ঘোড়ার পা সোজা হয়ে দাঁড়াল, সে তখন সামনের পা দুটি যেখানে গেড়ে ছিল সেখান থেকে ধোঁয়ার মতো ধূলি আকাশের দিকে উঠতে দেখল। এ ঘটনার পর সুরাকার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হলো। সে নবিজিকে আহ্বান করল। তিনি সুরাকার আহ্বানে সাড়া দিলেন। সুরাকা তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করল। তারপর সে নবিজির কাছে সফরের কিছু উপঢৌকন পেশ করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে বললেন—আমাদের হাদিয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তুমি শুধু আমাদের এতটুকু উপকার করো যে, আমাদের সংবাদ কারও কাছে বলো না।[২৩৭]

সুরাকা সেই ফিরতি পথে বাড়িতে যাওয়ার সময় অসংখ্য মানুষ তার কাছে নবিজির হদিস জানতে চায়। সুরাকা তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কৌশলে কেটে পড়ে। যে ব্যক্তি সকালবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার মতো জঘন্য ইচ্ছায় বের হয়েছিল, সেই ব্যক্তি বিকেলবেলায় নবিজির নিরাপত্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

* * *

২৩৭ *সহিহ বুখারি* : ৩৯০৫

কুবায় আগমন

কুবায় প্রথম মসজিদ

কয়েক দিনের অনবরত সফর শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় পৌঁছলেন। কুবায় উপস্থিত মুসলিমরা হৃদয়ের দুয়ার খুলে নবিজিকে অভিনন্দন জানাল। আনন্দের আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল তাদের চোখে-মুখে। এই নিয়ামত অপার্থিব। পৃথিবীতে এই নিয়ামতের বিকল্প কিছু নেই। নবিজি কুবায় কুলসুম উম্মে হাদামের ঘরে কয়েক দিন অবস্থান করলেন। এই কয়েক দিনে মক্কার কাফিরদের কাছে আমানত বুঝিয়ে দিয়ে আলি রা. নবিজির সাথে কুবায় মিলিত হলেন। সে সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ সম্বন্ধে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

> যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, সেটিই আপনার সালাতের জন্য বেশি উপযুক্ত।[২৩৮]

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার দিকে যাত্রা করেন। রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ তিনি মদিনায় পৌঁছেন।[২৩৯]

---

২৩৮ সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৮

২৩৯ *মুরাওজুজ জাহাব*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৯

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে মদিনায় সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। সকলের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে আনন্দধ্বনি। মদিনাবাসী উটের লাগাম ধরার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। নবিজি বললেন—

> তোমরা উটের লাগাম ছেড়ে দাও। এটি সেই স্থানে বসবে, যেখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বসতে আদেশ করেছেন।

উট মদিনার অসংখ্য গলি অতিক্রম করে চলতে থাকল। পেছনে কৌতূহলী মানুষের মিছিল। সকলের উৎসুক চোখ অপেক্ষায় আছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের, কার বাড়িতে মেহমান হবেন বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অবশেষে বনু নাজ্জারের দুজন এতিম ছেলের খোলা মাঠে আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর বাড়ির সামনে উটটি বসে পড়ে। আবু আইয়ুব নবিজিকে ইসতিকবাল জানান। নবিজির সামানপত্র সযত্নে ঘরে নিয়ে রাখেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, নবিজির আগমনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বনু নাজ্জারের শিশুরা ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তখন খুশিতে তারা কবিতা পাঠ করছিল—

> আমরা বনু নাজ্জারের অন্তর্গত সন্তান, কী সৌভাগ্য! আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বলো তো, তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো?

সকলেই সমকণ্ঠে জবাব দিলো—জি, অবশ্যই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশে বললেন—আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমার অন্তরেও তোমাদের জন্য ভালোবাসা রয়েছে ।

* * *

আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে

নিচতলা নাকি ওপরতলা

সৌভাগ্যের চাঁদ আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর ঘরে উদিত হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দোতলাবিশিষ্ট ঘরের নিচতলায় অবস্থান করাকে পছন্দ করলেন। তারপর যে মধুর বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছিল, সেই দৃশ্য আবু বকর ইবনে আবু শাইবা, ইবনে ইসহাক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহসহ উল্লেখযোগ্য মুহাদ্দিসের জবানে বর্ণিত হয়েছে। আবু আইয়ুব আনসারি নবিজির কাছে আবেদন করলেন—

প্রিয়নবি, আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আমার কাছে এই বিষয়টি খুবই অপছন্দনীয় যে, আমি আপনার ওপরতলায় অবস্থান করব। মেহেরবানি করে আপনি ওপরতলায় অবস্থান করলে ভালো হয়।

নবিজি তাকে বললেন—আমার জন্য এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য নিচতলাই উত্তম। ঘটনা এখানে থেমে থাকল না।

মধুর বিড়ম্বনা

এরপর একদিনের ঘটনা। আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন—

> আমরা দোতলায় থাকা অবস্থায় একদিন পানিভর্তি কলস ভেঙে গেল। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে তড়িঘড়ি করে আমাদের একমাত্র লেপ দিয়ে সেই পানি শুষিয়ে ঘর শুকানোর কাজে লেগে গেলাম। আমরা খুবই ইতঃস্তত বোধ করছিলাম যে, পানি নিচতলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের ওপর পতিত হয় কি না! এই অবস্থায় আমি নিচে গিয়ে নবিজির কাছে পুনর্বার ওপরতলায় অবস্থানের আবেদন করলাম, তখন নবিজির সানন্দে রাজি হয়ে দোতলায় তাশরিফ নিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা—

আমরা নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য রাতের খাবার পাঠাতাম। কোনো সময় খাবার বেঁচে গেলে তা ফেরত আসত। আমি এবং উম্মে আইউব খুব আগ্রহ সহকারে সেই খাবার খেতাম। খাবার সময় আমরা নবিজির হাত খাবারের যে অংশ স্পর্শ করেছে, খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে শুরু করতাম। একদিন পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে খাবার পাকিয়ে নবিজির দরবারে পাঠানো হলো। তিনি খাবার ফেরত পাঠালেন। আমরা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নবিজির হাতের স্পর্শ খুঁজতে লাগলাম; কিন্তু দেখতে পেলাম—নবিজির খাবারে হাত স্পর্শ করেননি। আমরা চিন্তায় জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। আমি নবিজির কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ওপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত! আপনি আজকে খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার পর মনে হলো, খাবার স্পর্শ করেননি। কারণ, খাবার ফেরত যাওয়ার পর আমি এবং উম্মে আইয়ুব আপনার হাতের স্পর্শ খুঁজে সেখান থেকে খাওয়া শুরু করি; কিন্তু আজকে আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শ দেখতে পাইনি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি এই খাবারে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পেয়েছি; ফেরেশতাদের কাছে এগুলোর গন্ধ কষ্টকর ও অপছন্দনীয়। ওহি নাজিল হওয়ার সময় আমাকে কানে কানে এই বিষয়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এজন্য আমি খাবার ফিরিয়ে দিয়েছি। তবে তোমরা এই খাবার খেতে পারো।

আবু আইয়ুব আনসারি রা. বলেন—এরপর থেকে কখনো আমরা খাবারে পেঁয়াজ ও রসুন দিইনি।[২৪০]

* * *

২৪০ *আল ইসাবাহ লিবনি হাজার*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৫; *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৯; *মুসনাদু ইমাম আহমাদ*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৯২

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

পূর্বে (মুসলিমদের হাবশা হিজরত-সম্পর্কীয় আলোচনা) আমরা ইসলামের হিজরত নিয়ে কিছু কথা বলেছি। সেখানে মূলকথা যা ছিল—

'আল্লাহর তায়ালা দ্বীন ও আকিদার নিরাপত্তা, পবিত্রতাকে সবকিছুর উর্ধ্বে রেখেছেন। যখন ইসলামি আকায়িদ এবং দ্বীনের শাআয়িরগুলো (ধর্মীয় নিদর্শন ও আসার) অস্তিত্ব সংকট ভুগবে, তখন দেশ-ভূমি-সম্পদ-প্রভাব-দাপটের কোনো মূল্য নেই। ইসলাম ও আকিদা রক্ষায় এসব কিছু বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন হলে বিসর্জন দিতে হবে।'

সেখানে আরও বলেছিলাম—আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত বিধান এই যে, ভেতরগত শক্তি (যা সত্য দ্বীন ও বিশুদ্ধ আকিদায় প্রতিভাত হয়) সেটা বাহ্যিক শক্তির (বস্তুগত শক্তি) নিয়ন্তা ও রক্ষক হয়ে থাকে। সুতরাং উম্মাহর অভ্যন্তরীণ শক্তি যখন সুদৃঢ় ও মজবুত হবে (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ দ্বীনকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরবে, নৈতিকতার ওপর অটল থাকবে), তখন তাদের বাহ্যিক শক্তিও (দেশ-দশ, ধনসম্পদ, শক্তি-দাপট) বাড়তে থাকবে, বাহ্যিক শক্তি সুদৃঢ় হতে থাকবে; কিন্তু যখন বিপরীত হবে (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শক্তি স্বল্প, দুর্বল ও নড়বড়ে হবে), তখন বাহ্যিক শক্তিও পতনোন্মুখ হবে। ইতিহাস যার বড়ো সাক্ষী। (ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত প্রচুর।)

এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দ্বীন ও আকিদা রক্ষার প্রয়োজনে জান-মাল-দেশ-ভূমি—সবকিছু বিসর্জনের নিয়ম রেখেছেন। যেই বিসর্জনের মাধ্যমে পরিশেষে মুসলিমদের বাহ্যিক শক্তি—দেশ, ভূমি, ধনসম্পদ ও জীবনের সুরক্ষার নিশ্চয়তা লাভ হয়।

দলিল হিসেবে এখানে নবিজির হিজরতের ব্যাপারটাই যথেষ্ট। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেটা ছিল নিজের দেশ ও ভিটেমাটি হাতছাড়া হওয়া, মাতৃভূমি বিসর্জন দেওয়া; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা 'বিসর্জন ও হাতছাড়া হওয়া' ছিল না; বরং তা ছিল নিজেদের দেশ ও ভূমিতে নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কর্মপন্থা। (অনেক ব্যাপারই এমন থাকে, যার সুরক্ষার বাহ্যিক রূপ হচ্ছে, বিসর্জন দেওয়া।)

হিজরতের কয়েক বছর পরেই তিনি দুর্দান্ত শক্তিতে, অনন্যরূপ—বিরুদ্ধবাদীরা যার সামনে হাল ধরে রাখতে পারছিল না—নিয়ে একদা হাতছাড়া হওয়া মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। যাক, এবার আমরা ফিরে আসি মূল কথায়। এখানে নবিজির হিজরতে আমাদের যেসব পাঠ রয়েছে, তা উল্লেখ করব—

০১.

এখানে যে বিষয়টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, নবিজি অন্য যে কাউকে বাদ দিয়ে সফরসঙ্গী হিসেবে কেবল আবু বকরকেই নিয়েছেন। এখান থেকে আলিমগণ বলেন—আবু বকরের প্রতি নবিজির গভীর ভালোবাসা ছিল, আবু বকর নবিজির বিশেষ নৈকট্য পেয়েছেন এবং নবিজির পর খিলাফতের ব্যাপারে তিনিই অধিক হকদার। এ বিষয়ে (আবু বকরের প্রতি নবিজির বিশেষ ভালোবাসা এবং খিলাফতের ব্যাপারে আবু বকরের অধিক উপযুক্ত হওয়া) আরও প্রচুর দলিল রয়েছে। যেমন—

- **এক.** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুকালীন অসুস্থতায় অন্য সব সাহাবিকে বাদ দিয়ে কেবল তাকেই ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন।

- **দুই.** নবিজি আবু বকরের ব্যাপারে বলেছিলেন—

  لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا

  'আমি যদি কাউকে বন্ধ হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম।'[২৪১]

২৪১ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০৫

এসব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আবু বকর রা ছিলেন, নবিজির নিরেট নির্ভেজাল সঙ্গী; বরং তিনি ছিলেন তাঁর জন্য উৎসর্গপরায়ণ। তিনি নবিজির জন্য নিজেকে কতটা উৎসর্গ করেছেন! আমরা জেনেছি—হেরা গুহায়, যেখানে সাপ-বিচ্ছুর উপদ্রবসহ নানা বিপদের অশনিসংকেত ছিল, কীভাবে তিনি আগে ঢুকে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। আমরা আরও দেখেছি, হিজরতের কণ্টকময় সফরে নবিজির সাহায্যার্থে নিজের ধনসম্পদ, ছেলেমেয়ে, গোলাম-রাখাল সবকিছু কীভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। দ্বীনের শপথ করে বলছি—নবিজিকে আবু বকর রা. যেমন ভালোবেসেছেন, নবিজির প্রতি প্রত্যেক মুসলিমেরই সে রকম ভালোবাসা থাকতে হবে। দ্বীনের প্রশ্নে এটা খুব জরুরি। এই কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তানসন্ততি এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হবো।'[২৪২]

০২.

একটি প্রশ্ন : কেউ কেউ আবার নবিজির হিজরত ও উমর রা.-এর হিজরত—এ দুটোর মাঝে মুকারানা (তুলনা) করে ভুল করতে বসে। তাদের প্রশ্ন—উমর রা. যখন হিজরতে করেছেন, তখন তিনি কোনো ভয়-শঙ্কা ছাড়াই প্রকাশ্যে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে হিজরত করেছেন; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে, নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করে! তাহলে কি উমর রা. নবিজির চেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন!...

উত্তর : উমর রা.-সহ অন্য যেকোনো মুসলিমের তাসাররুফ (আচরণ ও কার্যাবলি) নিতান্তই ব্যক্তিগত; যা শরিয়তের কোনো দলিল নয়। অন্যদের ব্যাপারটা যেহেতু নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাই ব্যক্তি তার মতো করে সেক্ষেত্রে উপযোগী বিভিন্ন ওয়াসাইল-মাধ্যম, শৈলী ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু

---

২৪২ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

নবিজির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি হচ্ছেন 'মুশাররি' (শরিয়তের বিধানপ্রণেতা)। অর্থাৎ দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত তাঁর সব তাসারুফাত (আচরণ ও কাজ) আমাদের জন্য 'তাশরি' (প্রণীত বিধান)। এ কারণেই তো নবিজির সুন্নাহ; এটি ইসলামের মূল দ্বিতীয় উৎস। হিজরতের ক্ষেত্রে নবিজিও যদি উমরের মতো প্রকাশ্যে করতে যেতেন, তাহলে অনেকেই ভাবত, সেটা ওয়াজিব বা আবশ্যক। তাই হিজরতের ক্ষেত্রে (ভয়ের ব্যাপার নিশ্চিত হলেও) কোনো কৌশল, কোনো সতর্কতা অবলম্বন জায়িজ নেই। সময়ের ভাষা ও সময়ের উপযোগী কর্মপন্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর শরিয়তের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা রেখেছেন।

এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বস্তুগত প্রত্যেক (সময়ের ভাষা ও কর্মপন্থা উপযোগী) আসবাব ও মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। হাতের কাছে পাওয়া সবগুলো মাধ্যমই তিনি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট ছিলেন। হিজরতের সময় আলি রা.-কে নিজ চাদরে ঢেকে বিছানায় রেখে যান। আমিন (নিরাপত্তার ধারক) নিযুক্ত হওয়ার পর একজন মুশরিককে পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন; যে তাকে সাহায্য করবে, নিরাপদ পথে চালনা করবে, শত্রুদের বিপৎসংকুত শাখাপথ দিয়ে তাঁকে নিয়ে যাবে। হেরা গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। এর মানে আসবাব গ্রহণ ও সতর্কতা অবলম্বনের কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখেননি। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান বস্তুগত আসবাবকে (উপায় উপকরণ ও মাধ্যমকে) গ্রহণ করতে মানা করে না।

তবে হিজরতের সময় নবিজির এই আসাবাবগ্রহণ ব্যক্তিগত ভয়ের কারণে নয়, অথবা তিনি মুশরিকদের হাতে আটকে যাবেন, এই শঙ্কার কারণেও নয়। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ, নবিজি যখন বস্তুগত সব আসবাব গ্রহণ করে ফেলেছেন, মুশরিকরা নবিজির গুহার একদম নিকটে—এতটাই নিকটে যে, শত্রুদের কেউ পায়ে দিকে তাকালে নবিজি ও আবু বকরকে তারা দেখে ফেলত—এম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এমন নিদারুণ মুহূর্তে নবিজি একদম নিশ্চিন্ত হয়ে আবু বকর রা.-কে অভয় দিয়ে বলছিলেন—

يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

> আবু বকর, যে দুজনের সাথে তৃতীজন হিসেবে আল্লাহ আছেন, তাঁদের আবার ভয় কীসের?

বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁর এই আসবাব গ্রহণের অর্থ ছিল, এই বিপৎসংকুল মহূর্তে তিনি ভড়কে যাবেন; কিন্তু না, তিনি ভড়কে যাননি।

আরেকটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়—নবিজির সতর্কতা অবলম্বন ও আসবাব গ্রহণের সবগুলো পর্যায় শেষ হয়ে এলে নিরেট আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন।

এখানে আমাদের শেখার যা, প্রত্যেক কাজেই কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত। তবে এটা সবব গ্রহণ করতে মানা করে না। নবিজি আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করেছেন, কিন্তু তা সব আসবাব গ্রহণের পর।

এক্ষেত্রে আরও সুস্পষ্ট দলিল হলো—অশুভ ইচ্ছায় কাফির সুরাকা যখন নবিজির একদম নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন এই ভয়াল পরিস্থিতিতে নবিজির কিছু হলেও ভয় পাওয়া, ভড়কে যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু না, তিনি ভয় পান নি; তিনি বরং তিলাওয়াতুল কুরআনে এবং মোনাজাতে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন, যেই আল্লাহ তাঁকে হিজরতের আদেশ দিয়েছেন, তিনিই তাঁকে কাফিদের চক্রান্ত থেকে হিফাজত (যেমনটা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন) করবেন।

০৩.

নবিজি কর্তৃক আলি রা.-কে ওদিয়তের মাল (গচ্ছিত সম্পদ বা আমানত) আদায় করার জন্য রেখে যাওয়া;—এ থেকে আশ্চর্য ধরনের বিপরীত একটা বিষয় প্রকাশ পায়। যেই কাফির-মুশরিকরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, তাঁর সাথে প্রতারণা করত, তাঁকে জাদুকর বলেত, তারাই আবার তাঁকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও উত্তম ভেবে তাঁর কাছে ওদিয়ত রাখত! তাঁকে নিরাপদ ভেবে তাঁর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখত। এখান থেকে বোঝা যায়—তাদের কুফরিটা সত্যের ব্যাপারে তাদের সন্দেহের কারণে নয়; বরং তা তাদের অহংকার, বড়োত্ব ও বড়াইয়ের কারণে। নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব খতম হয়ে যাওয়ার ভয়ের কারণে।

০৪.

এখানে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের উদ্যম লক্ষণীয়। আবদুল্লাহ মক্কা ও হেরা গুহায় আসা-যাওয়া করতেন। নবিজি ও পিতার কাছে কাফিরদের হালচাল সম্পর্কে সংবাদ দিতেন। আর তার বোন আসমা রা.—যে তার বাবা ও নবিজির

সফরের প্রস্তুতির জন্য বিরাট শ্রম করেছেন—তার অবদান কোনো অংশেই কম নয়।

এখানে মুসলিমদের (পুরুষ হোক বা নারী) জন্য ইসলামের শাশ্বত আদর্শ বাস্তবায়ন, ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বিশাল শিক্ষা রয়েছে। নিজের চেষ্টা-পরিশ্রম শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা, নিজের ইবাদতে নিমগ্ন থাকা চলবে না।

ইসলামের পথে নিজের উদ্যম ও সামর্থ্যের সবটুকুই ব্যয় করবে। প্রত্যেক কালে প্রত্যেক যুগেই এটাই মুসলিম যুবকদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। আপনি যখন নবিজির দাওয়াতি কার্যক্রম ও জিহাদ ইত্যাদিতে নবিজির পাশে থাকা লোকজনকে নিয়ে ভাবতে যাবেন, তখন দেখবেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন টগবগে যুবক—যারা তাদের যৌবন বয়েসের প্রথম পর্বও পাড়ি দেননি। তারা ইসলাম ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চেষ্টায় কোনো কসুর করেননি।

০৫.

এখানে সুরাকা তার সুরাকার ঘোড়ার যেই ঘটনা, এটা নবিজির অনন্য মুজিজা। মুহাদ্দিসগণের সবাই—যারা তার সমর্থন করেছেন, অনেকে বর্ণনা এনেছেন, এবং তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। (এ ছাড়া নবিজির অন্যান্য মুজিজা তো আছেই।)

০৬.

নবিজির হিজরত পর্বে সবচেয়ে বড়ো মুজিজা হলো—অবিশ্বাস্য রকমে নবিজির সুরক্ষা। নবিজিকে হত্যার জন্য মুশরিকরা যখন চারদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছিল, তখন হঠাৎ তাদের চোখে ঘুম চাপিয়ে দেওয়া হলো। নবিজি এই ফাঁকে বের হয়ে চলে গেলেন, তারা একটু টেরও পেল না। তাদের ষড়যন্ত্রে তারা শুধু ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়; সেই সঙ্গে তারা লজ্জাও উপহার পেয়েছে। নবিজি বের হওয়ার সময় মাটি নিক্ষেপ করলে তা তাদের ধুলোমলিন করে দেয়। নবিজি যখন তাদের থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনি এই আয়াত পড়তেছিলেন—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

আর আমি তাদের সামনে এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং পেছনেও এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি; আর এভাবে তাদের সব দিক থেকে ঢেকে দিয়েছি। ফলে তারা কোনো কিছুই দেখতে পায় না।[২৪৩]

নবিজির এই মুজিজা প্রত্যেক যুগের মুশরিক ও অন্যান্যদের জন্য স্পষ্ট পয়গাম—নবিজি ও তাঁর অনুসারীরা অল্প কিছু কাল যেই পরাজয় ও নানান শাস্তিতে ভোগেন—এর মানে এটা নয় যে, আল্লাহ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, বিজয় তাদের থেকে বহুদূরে। ওইসব মুশরিক এবং ইসলামের শত্রুরা—যারা ইসলামের পরাজয়ে দারুণ খুশি হয়—তারা যেন এ কথা ভুলে না যায় যে, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। বিজয়ের সব উপকরণ যেকোনো মুহূর্তেই কার্যকর হতো পারে।

০৭.

এখানে আমরা নবিজির প্রতি মদিনার নারী, পুরুষ, শিশুনির্বিশেষে সকলের উপচে পড়া ভালোবাসা ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেরেছি। তারা প্রতিদিন মদিনার বাইরে এসে নবিজির জন্য অপেক্ষা করতেন। অপেক্ষার পালা শেষ হওয়ার পর নবিজি যখন তাদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তারা নবিজিকে উপচে পড়া ভালোবাসায় সিক্ত করছিলেন। নবি আগমনের আনন্দের আতিশয্যে তারা বিভিন্ন কবিতা, প্রশংসাগাথা উচ্চারণ করছিলেন। নবিজিও তাদের সাথে ভালোবাসা বিনিময় করছিলেন। তিনি বনু নাজ্জারের ছোটো ছোটো মেয়েদের—যারা তাঁর প্রশংসায় গান গেয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল—দিকে তাকিয়ে বললেন—

أتحببنني ؟ والله إن قلبي ليحبكن

তোমরা কি আমাকে ভালোবাসো? আল্লাহর শপথ! আমার হৃদয় তোমাদের ভালোবাসে।

এইসব থেকে আমরা বুঝতে পারি—নবিজির ভালোবাসা হৃদয়ের গহিনের প্রকৃত ভালোবাসা আর এটাই তাঁর অনুসরণের মূলভিত্তি। কারণ, হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসাটাই। কোনো কিছুর অনুসরণের প্রেরণাদায়ক।

---

২৪৩ সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৯

কারও অনুসরণ—এটা কোনো একটি মানদণ্ডের কারণেই হয়। আর সেই মানদণ্ডটা হবে হৃদয়ের প্রকৃত ভালোবাসা। এ কারণেই নবিজি তাঁর প্রতি (প্রকৃত) ভালোবাসা রাখাকে—যেই ভালোবাসা সন্তান পিতার ভালোবাসাকেও হার মানাবে—ঈমানের মানদণ্ড বানিয়েছেন। এখান থেকে বোঝা গেল, নবিজির ভালোবাসা এটা বাবা-সন্তানের ভালোবাসার প্রকারভুক্ত। অর্থাৎ উভয়টারই উৎস হচ্ছে হৃদয়ের গহিন থেকে প্রকৃত ভালোবাসা।

০৮.

আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে নবিজির অবস্থান গ্রহণ—এটাও নবিজির প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত। এখানে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় হলো—আবু আইয়ুব আনসারির ঘরে খাবারের পর নবিজি যখন অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়ে দিলেন, তখন আবু আইয়ুব ও তার স্ত্রী পাত্রে লাগা নবিজির আঙুলের ছোঁয়া থেকে বরকত নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এখান থেকে বোঝা গেল, নবিজির আসারের (বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মারক) মাধ্যমে বরকত নেওয়া স্বীকৃত ও মাশরু' তথা শরিয়তসম্মত বিষয়। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এ ব্যাপারে ভিন্ন বর্ণনা এনেছেন। সাহাবায়ে কেরাম নবিজির বিভিন্ন আসারের বরকতের উসিলায় রোগমুক্তি, সাহায্য ইত্যাদি কামনা করতেন।

ইমাম বুখারি 'কিতাবুল লিবাসে' (পোশাক পরিচ্ছদের অধ্যায়) উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা এনেছেন—উম্মে সালামা রা. নিজের পাত্রবিশেষে নবিজির চুল সংরক্ষণ করে রাখতেন। সাহাবায়ে কিরামের কারও চোখের পীড়া হলে বা অন্য কোনো অসুখ হলে তারা উম্মে সালামার নিকট পানিভরা পাত্র পাঠাতেন। উম্মে সালামা নবিজির চুলগুলো সেই পাত্রের পানিতে রাখতেন। এরপর তারা রোগ থেকে নিরাময়ের জন্য এই বরকতপূর্ণ পানির ওসিলা নিতেন।

ইমাম মুসলিম 'কিতাবুল ফাজায়িল' (ফজিলতের অধ্যায়)-এ একটি বর্ণনা এনেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের ঘরে ঢুকতেন। এরপর তার বিছানায় ঘুমাতেন। উম্মে সুলাইম তখন ঘরে থাকতেন না। (সেই ধারাবাহিকতায়) নবিজি একদিন তার ঘরে এসে তার বিছানায় ঘুমালেন। হঠাৎ উম্মে সুলাইম ঘরে এলেন। নবিজির শরীর থেকে তখন ঘাম ঝরছিল। এরপর উম্মে সুলাইম তার 'আতিদ' (নারীসামগ্রী রাখার বক্স বিশেষ) খুলে (তা থেকে

কিছু বের করে সেটা দিয়ে) ঘাম মুছে তা বোতলে সংরক্ষণ করছিলেন। নবিজি হঠাৎ টের পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—উম্মে সুলাইম, তুমি এ কী করছ? তিনি বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, শিশুদের জন্য আপনার (ঘামের) বরকত নেওয়ার আশা করছি। তখন নবিজি বললেন—তুমি ঠিক করেছ।[২৪৪]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এর বর্ণনা : নবিজির অজুর পর থাকা অবশিষ্ট পানি নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামে প্রতিযোগিতা করতেন।[২৪৫] এ ছাড়াও নবিজির জামা, পাত্র ইত্যাদি থেকে সাহাবায়ে কিরামের বরকত নেওয়ার প্রচুর বর্ণনা রয়েছে ।

এখানে তাওয়াসসুলকে (ওসিলা গ্রহণ) তাবাররুকের (বরকত নেওয়া) ওপর কিয়াস (প্রয়োগ) করা হচ্ছে—এটা ভাববেন না। কিয়াসের কোনো দখল নেই এখানে। কারণ, তাওসসুল এবং তাবাররুক দুটি ভিন্ন শব্দ। যদিও দুটি একই অর্থ—মুতাওয়াসসাল বিহির (যাকে মাধ্যম হিসবে গ্রহণ করা হয়) বরাতে কল্যাণ ও বরকত লাভ করা বোঝায়। আল্লাহর নিকট থাকা নবিজির মহিমা, নবিজির বিভিন্ন আছার—কাপড়, নবিজির ব্যবহৃত কিছুর মাধ্যমে ওসিলা গ্রহণ করা 'ফরদি ও জুজয়ি' (অংশবিশেষ) বিষয়। যেগুলো সহিহ হাদিসে প্রমাণিত মুতলাক (মূল) তাওয়াসসুলের আওতাভুক্ত। কারণ, প্রত্যেক জুজয়ি বিষয়ই

---

২৪৪ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৩

২৪৫ শাইখ আলবানি মনে করেন, এ যুগে এ ধরনের হাদিসের কোনো ফায়দা নেই। উসতাজ মুহাম্মাদ আল মুনতাসির আল কাত্তানি কর্তৃক কুল্লিয়াতুশ শারিয়ার (শরয়ি অনুষদ) ছাত্রদের জন্য নির্বাচিত হাদিসের সমালোচনায় এ কথা উল্লেখ করেছেন।

আমি মনে করি এ ধরনের কথাবার্তা ভয়ানক। একজন মুসলিমের পক্ষে বলে বেড়ানো কখনোই উচিত নয়। (শরিয়তের ব্যাপারে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথা, সব কাজ, সব স্বীকারোক্তিই 'তাশরি' (শরিয়তভুক্ত)। কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাহ নসখ না করলে তাশরির এ বিষয়টা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান। আর এসব সহিহ ও প্রমাণিত হাদিসকে এগুলোর সমমানের কিতাব বা সুন্নাহর কোনো কিছু নসখ করেনি। সুতরাং এর ব্যাপারটা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। অর্থাৎ নবিজির বিভিন্ন আসারের মাধ্যমে ওসিলা ও বরকত গ্রহণে কোনো বাধা নেই। এই 'মাশরু'এটা সবকালেই সমানভাবে চলমান। সুতরাং কীভাবে বলাটা সম্ভব হলো— 'এ যুগে এর কোনো ফায়দা নেই?'

আমার খুব ধারণা হচ্ছে, এটা যেহেতু তাওয়াসসুলের ক্ষেত্রে তার মাজহাবের বিরুদ্ধে যায়, তাই তিনি এটাকে অস্বীকার করেছেন...

এখানে একটা বিষয় গভীরভাবে লক্ষ করার মতো, এইসব বস্তুগত আসারের মাধ্যমেই যদি ওসিলা নেওয়া যায় অর্থাৎ এগুলোকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে নবিজির মহান মর্যাদা ও মহৎ অবস্থান (রহমাতুল্লিল আলামিন)-এর মাধ্যমে ওসিলা আরও ভালোভাবেই নেওয়া যাবে।

উসুলবিদদের নিকট প্রচলিত 'তানকিহুল মানাত'-এর নিয়ম অনুসারে নসের (মূলপাঠ) ব্যাপকতার মধ্য দাখিল (অন্তর্ভুক্ত)।

হিজরতের পাঠ সম্পর্কীয় আলোচনার ইতি এখানেই টানছি। সামনে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—নবিজি কর্তৃক মদিনায় নতুন রাষ্ট্রগঠন ও নতুন সমাজ বিনির্মাণ—শুরু করতে হবে।

* * *

প্রথম বুনিয়াদ : মসজিদ নির্মাণ

ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্ভব-ইঙ্গিত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় হিজরত—এটি ওই সময় পৃথিবীর বুকে প্রথম 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। তা এই কথার ঘোষণা ছিল যে, প্রথম স্থপতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের উদয় হতে যাচ্ছে।

এ লক্ষ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক যে কাজগুলো করেছেন, তা হলো—রাষ্ট্রের মূলভিত্তিগুলো স্থাপন করেছেন। ভিত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হয় নিম্নোক্ত তিনটি পয়েন্টে—

- ০১. মসজিদ নির্মাণ;
- ০২. ব্যাপকভাবে মুসলিমদের মাঝে এবং বিশেষভাবে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে ভাতৃত্য-বন্ধন সৃষ্টি করা;
- ০৩. একটি সংবিধান প্রণয়ন করা—যা মুসলিমদের নিজেদের ভেতর পারস্পরিক আচরণবিধি, ব্যাপকভাবে সকল মানুষের সাথে এবং বিশেষত ইহুদিদের সাথে তাদের কর্মপন্থা কী হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়।

মসজিদ নির্মাণ

আমরা প্রথমে মসজিদ নির্মাণের পয়েন্টেই আলোচনা শুরু করব। ইতঃপূর্বে হিজরতের ঘটনায় আমরা আলোকপাত করেছি—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী আনসারি দুজন এতিম বালকের জমিতে হাঁটু গেড়ে বসে যায়।

অন্যদিকে আসআদ ইবনে জুরারা রা. রাসুলের হিজরতের পূর্বেই ওই জমিতে অন্য সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জমিতে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং বালক দুটিকে ডেকে পাঠালেন। তখন তারা আসআদ ইবনে জুরারার তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে জমি নিয়ে দরাদরি করলেন। তারা বলল—'আমরা বরং তা আপনার জন্য দান করে দিলাম।' কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে অবশেষে দশ দিনার মূল্যে তাদের থেকে জমিটা ক্রয় করে নিলেন।[২৪৬]

সেই জমিতে কিছু গারকাদ গাছ, কয়েকটা খেজুরগাছ এবং মুশরিকদের প্রাচীন কিছু কবর ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরগুলো খনন করা ও গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ দিলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে রেখে দিলেন। মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল একশত গজ, প্রস্থও ছিল এমনই বা কিছুটা কম।

এরপর তারা কাঁচা ইট বানালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের সাথে সশরীরে নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ হাতে পাথর স্থানান্তর করেন।

মসজিদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। খেজুরগাছের খুঁটির ওপর খেজুর পাতা ও শাখা দিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলেছিল—আমরা কি মজবুত ছাদ বানাতে পারি না?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, মুসা আ.-এর ছাউনির মতোই রেখে দাও, যা কিছু লাকড়ি ও সাধারণ পত্রপল্লব দ্বারা তৈরি হয়েছিল; এর মর্যাদা অনেক বেশি।[২৪৭] আর তার মেঝেতে বালু ও কঙ্কর বিছানো ছিল।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত—

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদ নির্মাণের আগে) যেখানেই সালাতের সময় হতো, সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন; এমনকি ভেড়ার পালের মধ্যেও সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তাই বনু নাজ্জারের নেতাদের কাছে লোক পাঠান।

---

২৪৬ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫৮; *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪; *ইলামুস সাজিদ* : ২২৩

২৪৭ *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫

তারা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাদের অনুরোধ করে বলেন—হে বনু নাজ্জার, তোমাদের এই জমিটুকু আমাকে মূল্যের বিনিময়ে দিয়ে দাও।

তারা বললেন—না, আল্লাহর শপথ! আমরা এর বিনিময় শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে নেব।

আনাস ইবনে মালিক বলেন—মুশরিকদের কিছু কবর, খানাখন্দ এবং কিছু খেজুরগাছ ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরগুলো খনন করার, গর্তগুলো সমান করার এবং গাছগুলো কেটে ফেলার আদেশ দিলেন।

আদেশ বাস্তবায়ন করা হলো এবং গাছগুলো মসজিদের কিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেওয়া হলো। দুই দিক দিয়ে পাথর অঙ্কিত করে দেওয়া হলো। সাহাবায়ে কিরাম 'রজয' ছন্দে কবিতা পড়তে পড়তে পাথর টানতে লাগলেন; তাদের সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও, শরিক ছিলেন। তারা বলছিলেন—

হে আল্লাহ আখিরাতের সুখ ছাড়া কোনো সুখ নেই; আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দেন।[২৪৮]

এই মসজিদ আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর খিলাফত পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ও মেরামতহীন আপন অবস্থায় অটুট ছিল। উমর রা. এসে কিছুটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তবে রাসুলের গঠনের মতোই তার খুঁটি ও ছাদ গাছের পাতা ও শাখা দিয়ে দেন। অতঃপর উসমান রা. এসে তাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেন। মসজিদের কলেবর বৃদ্ধি করেন এবং পাথর ও চুনা দিয়ে তার দেওয়াল অঙ্কিত করেন।[২৪৯]

* * *

২৪৮ *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫

২৪৯ *ই'লামুস সাজিদ*, ২২৪-২২৫

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলো অর্জন করতে পারি—

এক. ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করে থিতু হওয়ার পরপরই একটি সংহত ও সুদৃঢ় ইসলামি সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হন; মদিনায় সমবেত আনসার ও মুহাজিরদের মাধ্যমে যা অস্তিত্বশীল হবে। এ লক্ষ্যে একেবারে প্রথম যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন, তা হলো মসজিদ নির্মাণ।

এতে আশ্চর্য বা বিস্ময়ের কিছু নেই। অবশ্যই ইসলামি সমাজ গঠনের জন্য প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো মসজিদ নির্মাণ করা। কেননা, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র সংহতি ও দৃঢ়তার গুণ অর্জন করতে পারবে তখনই, যখন তা ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, নিয়মকানুন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরবে। আর এসব কিছুর ঝরনাধারা তো মসজিত ও তার ঐশী চেতনা থেকেই প্রবাহিত হয়।

ইসলামের একটি নীতি ও নিজাম হলো—মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের বন্ধন তৈরি করে দেওয়া। এই নীতি বিস্তৃত করা মসজিদ ব্যতীত সম্ভবপর নয়। কেননা, মুসলিমগণ অর্থসম্পদ ও ক্ষমতায় বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত, তাই দৈনিক কয়েকবার যদি আল্লাহ তায়ালার কোনো ঘরে একত্র না হয়, তাহলে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সহানুভূতিশীলতা তৈরি হবে না।

ইসলামের আরও একটি নীতি ও নিজাম হলো—মুসলিমদের মাঝে সমস্ত পরিস্থিতি ও স্থানে ইনসাফ ও সমতার চেতনা প্রজ্বলিত করা। কিন্তু এই চেতনা তাদের মাঝে

ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তারা নিত্যদিন একই মাটিতে তাদের রবের সামনে তাঁর গোলামি স্বীকার করে, তাঁর সাথে সকলের অন্তর সংযুক্ত করে একই কাতারে দাঁড়িয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ করবে। অন্যথায় মুসলিমরা এই সমাবেশ ও অংশগ্রহণ ছাড়া যতদিন তাদের ঘরে ঘরে একা একা ইবাদত করবে, ততদিন সমাজে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও অহমিকার ওপর সমতা ও ইনসাফের চেতনা বিজয় লাভ করবে না।

ইসলামের অন্যতম নীতি ও নিজাম হলো—আল্লাহ তায়ালার রশি তথা শরিয়ত ও আদেশের সামনে সুসংহত ঐক্যবদ্ধভাবে এক পাত্রে সকল মুসলিমদের বিগলিত হওয়া; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সমাজের আনাচে-কানাচে মুসলিমদের দ্বীন ও শরিয়তের দীক্ষা লাভ করার জন্য মসজিদ তৈরি না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের ঐক্য বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হবে; প্রবৃত্তি ও কামনার তাড়নায় খুব দ্রুতই তারা বিভক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

এ সমস্ত চেতনা মুসলিমদের মাঝে প্রজ্বলিত ও বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই মসজিদ নির্মাণের প্রতি তৎপর হয়েছেন।

দুই. নাবালক শিশু ও এতিমদের সাথে ব্যবহার নীতি

হানাফি মাজহাবের উলামায়ে কিরাম উক্ত হাদিস দ্বারা নাবালকের হস্তক্ষেপ শুদ্ধ হওয়ার দলিল দিয়েছেন। তারা বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের জমিটুকু এতিমদ্বয় থেকে দরদাম করে ক্রয় করেছেন। অতএব, যদি তাদের হস্তক্ষেপ শুদ্ধ না হতো, তাহলে তিনি তাদের থেকে তা ক্রয় করতেন না।

অন্যদিকে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাদের হস্তক্ষেপ শুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হলো, আল্লাহ তায়ালার এই বাণী—

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴿١٥٢﴾

> বালক হওয়ার আগে ন্যায়পন্থা ব্যতিরেকে তোমরা এতিমদের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না।[২৫০]

আর জমি কেনার হাদিসের ব্যাপারে তারা দুটি উত্তর প্রদান করেন—

---

২৫০ সূরা আনআম, আয়াত : ১৫২

- ০১. ইবনে উয়াইনাহ'র একটি বর্ণনায় আছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অভিভাবক চাচার সাথে কথা বলেছেন এবং তার মাধ্যমে তাদের থেকে ক্রয় করেছেন।[২৫১] এমন হলে তো হানাফি উলামায়ে কিরামের এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা সহিহ হবে না।

- ০২. এ ধরনের কাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্তৃত্ব আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলিমের সাধারণ অভিভাবক হিসেবে এই লেনদেন করেছেন; মুসলিমদের অন্তর্গত একজন হিসেবে নয়।

প্রাচীন কবরে মসজিদ নির্মাণ : একটি মাসয়ালা

প্রাচীন কবর খনন করার অনুমতি এবং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে মসজিদ বানানোর তথ্যের এই হাদিসের টীকায় ইমাম নববি রহ. বলেন—

> উক্ত হাদিসে প্রাচীন কবর খনন করার অনুমোদন পাওয়া যায়। পাশাপাশি তাদের রক্ত-পুঁজমিশ্রিত মাটি আলাদা করে সেখানে সালাত আদায় করা এবং সে জমি পবিত্র হয়ে গেলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমোদনও পাওয়া যায়।
>
> অধিকন্তু হাদিসের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে জমিতে লাশ দাফন করা হয়েছে এবং তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা যদি ওয়াকফকৃত না হয়, তাহলে তার মালিকের মালিকানায় অবশিষ্ট রয়ে গেছে এবং তা বিক্রি করা জায়িজ; তার উত্তরাধিকাররা সে জমির অধিকারী হবে।[২৫২]

অন্যদিকে ইতিহাসবিদ উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন—

> এই জমিতে যে কবরগুলো ছিল, তা ছিল অনেক প্রাচীন এবং নিশ্চিহ্ন। সে হিসেবে এখানে রক্ত ও পুঁজের কল্পনাও আসে না। তথাপি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খনন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ধ্বংসাবশেষ বের করে ফেলার আদেশ দিয়েছেন।

---

২৫১ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৭৫

২৫২ *ই'লামুল সাজিদ* : ২৩৬

স্মর্তব্য যে, প্রাচীন কবর খনন করা এবং তার স্থলে মসজিদ বানানো—এই হুকুম ওই জমির ব্যাপারে, যা ওয়াকফকৃত নয়। অন্যথায় যে কাজের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কাজে পরিবর্তন করা জায়িজ নেই।

তিন. মসজিদ নির্মাণ, মসজিদে নকশা ও কারুকার্যের বিধান

'তাশয়িদ' বলা হয় পাথর প্রভৃতি—যা দ্বারা স্তম্ভ, দেওয়াল ও ছাদ সুদৃঢ় হয়। এগুলো দিয়ে মসজিদের ইমারত বানানো। আর নকশা ও কারুকার্য হলো, মূল অবকাঠামোর ওপর যে সাজসজ্জা করা হয়।

তাশয়িদের হুকুম : সমস্ত উলামায়ে কিরাম এটাকে জায়িজ বলেছেন এবং উত্তম বলে গণ্য করেছেন। উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ পুনর্নির্মাণ—এটা তাদের দলিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও নিজে এ কাজ করেননি, কিন্তু তাঁর না করা বিপরীত অর্থ, অর্থাৎ তাশয়িদ ও সুগঠিতকরণ নিষেধ বোঝায় না। কেননা, এর সাথে মসজিদ নির্মাণের মৌলিক কোনো দর্শনের বিরোধিতা তৈরি হয় না। উপরন্তু এর দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি মনোযোগ ও যত্ন বৃদ্ধি পায়। তাই তাকে নিষেধ বলার কোনো সুযোগ নেই।

উলামায়ে কিরাম এর পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও দলিল দেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ١٨﴾

> আল্লাহর মসজিদ তারাই বিনির্মাণ করে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখে।[২৫৩]

উক্ত আয়াতে 'ইমারত' শব্দমূল ব্যবহার করা হয়েছে; আর তার অর্থ তখনই বাস্তবায়ন হয়, যখন তাশয়িদ ইত্যাদি দ্বারা সুগঠিত করে তার যত্ন নেওয়া হয়।

নকশা ও কারুকার্যের হুকুম

উলামায়ে কিরাম সকলেই একমত যে, নকশা ও কারুকার্য মাকরুহ তথা অপছন্দনীয়। অতঃপর তারা হারাম ও মাকরুহ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। তবে উভয়পক্ষ একটি

---

২৫৩ সূরা তাওবা, আয়াত : ১৮

বিষয়ে একরৈখিক। তা হলো—মসজিদের ইমারতের জন্য ওয়াকফকৃত সম্পদ নকশা ও কারুকার্যে ব্যয় করা হারাম।

আর যদি সেখানে ব্যয়িত সম্পদ নির্মাতার হয়, তাহলে আবার পুরাতন মতানৈক্য ফিরে আসবে। ইমাম জারকাশি ইমাম বাগাবি থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> ওয়াকফের সম্পদ থেকে মসজিদের নকশা করা জায়িজ নেই। যদি করে, তাহলে মুতাওয়াল্লি ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি অন্য কেউ নিজের সম্পদ দ্বারা করে, তাহলেও তা মাকরুহ হবে; কেননা, তা মুসল্লিদের অন্তর আকৃষ্ট করে নেয়। (এটি ফিকহে শাফিয়ির ইমামদের মত। তবে ফিকহে হানাফির ইমামগণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে একে জায়িজ বলে থাকেন।)

সাধারণ তাশয়িদ এবং নকশা ও কারুকার্যের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কেননা, প্রথমটার কারণে মসজিদ নির্মাণের কোনো চেতনা কিংবা দর্শন ক্ষুণ্ন হয় না; কিন্তু নকশা ও কারুকার্যের কারণে হয়। কেননা, এর দ্বারা মুসল্লিদের অন্তর একাগ্রতা ও খুশুখুজু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে যায়; অথচ মসজিদে আসার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো—দুনিয়াবি কল্পনা থেকে অন্তরকে মুক্ত করা এবং তার চাকচিক্য ও জাঁকজমক থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করা।

উমর রা. এ ব্যাপারে অনেক আগেই সতর্ক করে গেছেন। *সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত আছে, তিনি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন এবং এও বলে দিলেন যে—

> মানুষ যেন বৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে, সেভাবে বানাবে; লাল কিংবা হলুদ রং ব্যবহার করবে না, এতে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

মসজিদে কিবলার দিকে কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করা—তা নিষিদ্ধ কারুকার্যের অন্তর্ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। ইমাম জারকাশি তার কিতাব *ই'লামুস সাজিদ*-এ লিখেছেন—

> মসজিদের কিবলায় কুরআনের আয়াত বা কিয়দংশ লেখা মাকরুহ। ইমাম মালিক বলেন, কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম তাকে জায়িজ সাব্যস্ত করে বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, উসমান রা. রাসুলের মসজিদে তা করেছিলেন; কিন্তু কেউ তার অস্বীকৃতি জানায়নি।[২৫৪]

---

২৫৪ *ইলামুস সাজিদ* : ২২৭

পূর্বোল্লেখিত আলোচনা থেকে বর্তমানে যারা মসজিদ নির্মাণকাজ পরিচালনা করে, তাদের অনেকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, তারা তাদের সমুদয় প্রচেষ্টা মসজিদ নকশা করা, জাঁকজমক এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের পেছনে ব্যয় করে। অবস্থা এমন হয় যে, সেখানে প্রবেশ করলে কেউ আল্লাহর দাসত্বের নমনীয়তা ও স্বাদ অনুভব করে না; বরং তার বাহ্যিক অবস্থার অভিব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মাঝে শৈল্পিক কারুকার্য ও বিচিত্র জাঁকজমকের গর্ববোধ সৃষ্টি হয়।

সাধারণ মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই শয়তানি ছলনার একটি শোচনীয় ফলাফল হলো, দরিদ্র ও গরিব মুসলিমরা কোনো স্থানেই দুনিয়ার ঠাকঠমকের প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

মসজিদগুলো ছিল এমন, যা গরিবকে তার অসহায়ত্বের ওপর সান্ত্বনা দিত, তাদের দুনিয়ার চাকচিক্য ও আবহ থেকে বের করে আখিরাত ও তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত; কিন্তু এখন এই মসজিদের জাঁকজমক থেকেই তাদের অপ্রাপ্ত দুনিয়ার কথা স্মরণ হয়ে যায় এবং দারিদ্র্যের দুর্দশা ও হতভাগ্যের উপলব্ধি জাগরূক হয়।

হায় আল্লাহ! মুসলিমদের কি শোচনীয় অবস্থা! তারা তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয় ছেড়ে মিথ্যা জাঁকজমকের পেছনে ছুটছে; বাহ্যত যা দেখলে মনে হয় দ্বীন, কিন্তু তার ভেতরটা দুনিয়া, প্রবৃত্তি ও কামনায় ভরপুর! আপনি আমাদের রক্ষা করেন, মালিক!

* * *

দ্বিতীয় বুনিয়াদ : মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা

মুসলিম পরিচয়ই আত্মীয়তা

মদিনায় আগমনের পর গুরুত্বের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন; এমনকি মৃত্যুর পর তাদের মাঝে উত্তরাধিকারও বণ্টন হবে। এর নেপথ্য ছিল, তাদের মাঝে যেন আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রভাব বেশি শক্তিশালী হয়।

সে পরিপ্রেক্ষিতে জাফর ইবনে আবু তালিব এবং মুআজ ইবনে জাবাল, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং জায়িদ ইবনে হারিসা, আবু বকর সিদ্দিক এবং খারিজা ইবনে জুহাইর, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং উতবান ইবনে মালিক, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং সাদ ইবনে রবি—এভাবে দুজন দুজনকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন।[২৫৫]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল সাহাবির মাঝে এই সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। সামনে এর আলোচনা আসবে।

ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন অনেকাংশে বস্তুগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিরাসের সম্পদে ভাগ পাওয়া—বস্তুগত ভিত্তিরই একটি বাহ্যিক দৃষ্টান্ত। এই সম্পর্কের

---

২৫৫ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০৪; *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২

অধিকার আত্মীয়তার সম্পর্কের অধিকারের ওপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ছিল বদর যুদ্ধের আগপর্যন্ত। তার পরপরই এই আয়াত নাজিল হয়—

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

> আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আত্মীয়রা একে অন্যের বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে সম্যক অবগত।[২৫৬]

এই আয়াত ভ্রাতৃত্বের ওই রীতিকে রহিত করে দেয় এবং মিরাসের মধ্যে তার অধিকারকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর দ্বারা সমস্ত মানুষ তার বংশ ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং মুসলিমরা সকলে ব্যাপকভাবে ভাই ভাই হয়ে যায়।

ইমাম বুখারি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন—

> মুহাজির সাহাবিগণ মদিনায় আগমন করার পর আনসারদের আত্মীয়স্বজনের স্থলে তারাই আনসারদের উত্তরাধিকারী হতেন; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হয়ে তা রহিত করে দিলো—প্রত্যেকের জন্যই আমি বানিয়ে দিয়েছি আত্মীয়তার বন্ধন।
>
> এরপর আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন—আর যাদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।[২৫৭] অর্থাৎ, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও কল্যাণ করো। এর মাধ্যমে মিরাসের বুনিয়াদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[২৫৮]

* * *

২৫৬ সূরা আনফাল, আয়াত : ৭৫
২৫৭ সূরা নিসা, আয়াত : ৩৩
২৫৮ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৭

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের পথে এটা হলো দ্বিতীয় ভিত্তি, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থাপন করেছেন। এই ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাসিত হবে নিম্নোক্ত আলোচনায়—

এক.

কোনো রাষ্ট্রই জাতির ঐক্য ও সংহতি ব্যতীত উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে না। আবার ঐক্য ও সংহতি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও পারস্পরিক সহানুভূতি ছাড়া গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বস্তুত যে জাতির মধ্যে নিখাদ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অনুপস্থিত থাকবে, তারা কোনো বিষয়েই সমান্তরালে আসতে পারবে না। আর ঐক্য ও সংহতি না থাকলে কোনো রাষ্ট্র গড়ে তোলাও সম্ভব নয়।

উপরন্তু বন্ধন ও ভালোবাসা একটি আকিদা-বিশ্বাসনির্ভর হতে হয়, যার ওপর সকলের বিশ্বাস থাকে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়। তাই দুজন মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হওয়া—তাদের মাঝে বিরোধপূর্ণ মতাদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তা ও চেতনা থেকে নিরাপত্তার দাবি রাখে। বিশেষত যদি ওই মতাদর্শ ও বিশ্বাস এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, যা ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সাহাবিগণের মাঝে এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন, যার ওপর তাদের সকলের অন্তর সমবেত হয়েছে। আর তার ভিত্তি ছিল, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, যা সকল মানুষকে কোনো পার্থক্য ছাড়া আল্লাহর খাঁটি দাসত্বের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। যেখানে পার্থক্যের ভিত্তি হয় শুধু তাকওয়া ও আমলে সালেহা। কেননা,

মানুষের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন হবে, আর তাদের মাঝে প্রবৃত্তি, অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার স্থলে ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থতার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে—এটা আকাশকুসুম কল্পনা বৈ কিছু নয়।

দুই.

যেকোনো সমাজে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন হোক, তা একটি নীতিতে একরৈখিক। তা হলো—এই সমাজের মানুষদের মাঝে, তাদের জীবনের সমস্ত অঙ্গন ও অনুষঙ্গে, সহযোগিতা ও সহানুভূতিশীলতার ভিত্তি স্থাপন করা। যদি এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তি ইনসাফ ও সমতার আদলে গঠিত হয়, তাহলে সে সমাজ নিরাপদ ও ন্যায্য সমাজ। আর যদি তা জুলুম ও অত্যাচারের আদলে গঠিত হয়, তাহলে সে সমাজ অত্যাচারী ও বক্র সমাজ।

অতএব, নিরাপদ সমাজের ভিত্তি যেহেতু জীবনযাপন ও জীবিকায় ন্যায়ের ওপর গঠিত, তাহলে এখন প্রশ্ন হলো—এই ন্যায়কে কে অক্ষুণ্ন রাখবে? তাকে উত্তমভাবে বাস্তবায়ন করার নিশ্চয়তা কে দেবে?

এর জন্য সৃষ্টিগত এবং প্রাকৃতিক জামানত হলো, সহযোগিতা ও সহানুভূতি, অতঃপর রাষ্ট্র ও সংবিধানের পৃষ্ঠপোষকতা। কোনো রাষ্ট্র জনগণের মাঝে ইনসাফের নীতি কায়েম করার যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের মাঝে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করা ব্যতীত তা সম্ভব নয়। অধিকন্তু এ সমস্ত নীতি উলটো মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ প্রসারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। আর হিংসা-বিদ্বেষের একটি গুণ হলো, সে তার ভেতরে জুলুম-অত্যাচার ও অবাধ্যতার বীজ অত্যন্ত ভয়ংকর ও বীভৎসভাবে লালন করে।

এ কারণেই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রাতৃত্বের উপাদান গ্রহণ করেছেন এবং তা সাহাবায়ে কিরামের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; যা ছিল মূলত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের বুনিয়াদস্বরূপ।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য শরিয়তের হুকুম-আহকাম ও আইনকানুনের রূপ ধরে ইনসাফের নীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তথাপি তার সমগ্রই প্রথম নীতির ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে। আর তা হলো, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব; ওই গৌরবময় ভ্রাতৃত্ব, যা ইসলামি আকিদার মূলে তার ভূমিকা স্থাপন করেছে। তা যদি না থাকত, ইসলামি সমাজের ভিত্তি মজবুত করা এবং তার অস্তিত্বকে সুগঠিত করার

ক্ষেত্রে ওই সমস্ত আইনকানুন ও নীতি কোনো কার্যকর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারত না।

তিন.

'ভ্রাতৃত্ব' স্লোগানের ব্যাখ্যামূলক অর্থ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের মাঝে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা নিছক মৌখিক কোনো স্লোগান ছিল না; বরং তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আনসার ও মুহাজিরদের যাবতীয় কাজে, সম্পর্কে বাস্তবিক কার্যে পরিণত হয়েছিল।

এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভ্রাতৃত্বকে সাহাবিদের মাঝে একটি বাস্তব দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছিলেন এবং তারা উত্তমভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দৃষ্টান্তের জন্য সাদ ইবনে রাবি রা.-এর ঘটনাই যথেষ্ট—

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাঝে ও আবদুর রহমান ইবনে আউফের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেওয়ার পরপরই সাদ ইবনে রবি তার সম্পদ পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীসমূহ অর্ধেক অর্ধেক করে আবদুর রহমান ইবনে আউফের সামনে পেশ করে দিলেন; কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আউফ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বাজারের পথ দেখিয়ে দিতে বললেন, যেন সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সচ্ছল হতে পারেন।

তবে এ ধারণা করা যাবে না যে, সাদ ইবনে রবিই এ ভূমিকায় অনন্য ছিলেন; বরং সমস্ত আনসার সাহাবিরই পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতায় একই অবস্থা ছিল। বিশেষত হিজরতপরবর্তী সময়ে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের মাঝে বন্ধন তৈরি করে দেওয়ার পর। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা তখন উত্তরাধিকারের ভিত্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক না করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে স্থির করেছিলেন।

এই বিধানের একটি রহস্য এই ছিল, যেন মুসলিমদের করোটিতে এই ভ্রাতৃত্বের বাস্তবতার উপলব্ধি হয়; যেন তারা অনুধাবন করে যে, মুসলিমদের এই ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার বন্ধন নিছক একটি মৌখিক স্লোগান নয়; বরং তার রয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামাজিক নিরেট বাস্তবতা—যা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল স্তম্ভ।

ভ্রাতৃত্বনীতি রহিত করার কারণ

তবে পরবর্তী সময়ে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারনীতি রহিত করার পেছনেও রয়েছে একটি রহস্য। তা হলো—এই নীতি রহিত করার পরও ব্যাপকভাবে তা মুসলিমদের মাঝে কার্যকর রয়ে গেছে। তাইতো ভিন্ন ধর্মের দুজন পরস্পর উত্তরাধিকারী হয় না। তা ছাড়া হিজরতের পর প্রাথমিক সময়টুকুতে আনসার ও মুহাজির সকলের ওপর সহযোগিতা সহমর্মিতা ও ভালোবাসার বিশেষ একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কেননা, মুহাজিরগণ মক্কায় তাদের পরিবার-পরিজন সর্বস্ব রেখে মদিনায় এসে আনসারদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব আরোপ করেছিলেন। আর সে কারণেই এই ভ্রাতৃত্বের চাহিদা ছিল, শুধু আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়েও তা বাস্তবে শক্তিশালী এবং প্রভাবী হওয়া।

অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মদিনায় সচ্ছল হয়ে গেলেন, ইসলাম হয়ে উঠল শক্তিশালী এবং মদিনার নতুন সমাজের প্রকৃতি ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল ইসলামি চেতনা, তখন মদিনায় আগমনের পরপরই আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে যে বন্ধন তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, তার কাঠামোকে দূর করা মুনাসিব হয়ে গেল। কেননা, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ব্যাপক নীতি এবং তার ওপর আরোপিত দায়িত্ববোধ সুদৃঢ় হওয়ার পর এই সমাজে আর কখনো বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের কোনো আশঙ্কা অবশিষ্ট নেই। তাই এখন মুসলিমদের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধের পাশাপাশি বর্ধিত হিসেবে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রভাব ফিরে আসাতে কোনো সমস্যা নেই।

নবিজি কয়বার মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছেন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন, তা এই প্রথমবার ছিল না; বরং এর পূর্বে মক্কাতেও তিনি মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার বলেন—

> ভ্রাতৃত্ববন্ধন দুইবার হয়েছিল; একবার মক্কায় শুধু মুহাজিরদের মাঝে। আরেকবার মদিনায় আনসার ও মুহাজির সকলের মাঝে।[২৫৯]

---

২৫৯ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯১

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন একটি ইসলামিক যোগসূত্র। তবে তা নবায়ন ও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, মুহাজির ও আনসারদের এক ভূমিতে সমবেত হওয়া এবং হিজরতপরবর্তী পরিস্থিতির কারণে। ইসলামের যোগসূত্র ও আকিদার ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত ভ্রাতৃত্বের চেয়ে তা কোনো নতুন জিনিস নয়; বরং বাস্তবায়নের দিক থেকে তার নতুন একটি চিত্র মাত্র।

* * *

তৃতীয় বুনিয়াদ : মুসলিম ও অন্যদের মাঝে চুক্তিপত্র প্রণয়ন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ

এটা ছিল নতুন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্যবোধ-সংশ্লিষ্ট সবচেয়েয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বুনিয়াদ—যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পাদন করেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার সমস্ত আরব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল; এমনকি আনসারদের আউস গোত্রের কিছু লোক বাদে এমন কোনো ঘর বাকি থাকল না, যেখানে কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।
>
> তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে একটি চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করলেন এবং ইহুদিদেরও সেখানে শামিল করে তাদের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হলেন। তাদের আপন দ্বীনের ওপর বহাল রাখলেন, তাদের সম্পদ তাদের মালিকানাতেই রাখলেন এবং তাদের ওপর কিছু শর্ত আরোপ করলেন।[২৬০]

চুক্তিপত্রটি অনেক দীর্ঘ, তাই আমরা পুরোটা উল্লেখ করতে পারব না। তবে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো

---

২৬০ ইবনে ইসহাক ওই চুক্তিপত্রটি সূত্র ব্যতীত উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইবনে খাইসামা সূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। *উয়ুনুল আসার*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৮; অনুরূপ ইমাম আহমাদ তার মুসনাদেও সূত্র সহকারে বর্ণনা করেছেন। *শরহুল বাদা*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ১০

এখানে উল্লেখ করব। তাহলে আমরা মদিনায় গঠিত ইসলামি সমাজ ও নতুন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক মূল্যায়ন উপলব্ধি করতে পারব।

চুক্তিপত্রের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কিছু ধারা উল্লেখ করা হলো—

- ০১. কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলিমগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সাথে যুক্ত হবে এবং এক হয়ে লড়াই করবে—এরা সকলেই এক জাতি।
- ০২. গোত্রীয় ভিন্নতার উর্ধ্বে সমস্ত মুসলিম পরস্পরের রক্তপণ আদায় করবে, ন্যায়সংগতভাবে বন্দিদের মুক্তিপণ দেবে এবং মুমিনদের মাঝে ইনসাফ রক্ষা করবে।
- ০৩. মুমিনরা নিজেদের মধ্যে কাউকে ঋণগ্রস্ত রেখে দেবে না, বরং তার ঋণ আদায় করবে এবং থাকে মুক্ত করবে।
- ০৪. মুমিনদের কেউ যদি জুলুম-অত্যাচার, পাপাচার ও নিজেদের মাঝে শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, তাহলে সে যদি তাদের কারও সন্তানও হয়, তবুও সমস্ত মুসলিম তার বিরুদ্ধে একমত হয়ে যাবে।
- ০৫. কোনো মুমিন কোনো কাফিরের জন্য অন্য কোনো মুমিনকে হত্যা করবে না এবং কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফিরকে সাহায্য করবে না।
- ০৬. মুমিনদের সকলের সন্ধি সমান। যুদ্ধক্ষেত্রে যেকোনো মুসলিম কোনো সন্ধি করলে, ন্যায়সংগতভাবে তা সকলের রক্ষা করতে হবে।
- ০৭. আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা অভিন্ন। নিম্ন পর্যায়ের মুমিনও নিরাপত্তা দিতে পারবে। আর মুমিনগণ পরস্পর পরস্পরের মিত্র।
- ০৮. যে সমস্ত মুসলিম এ পত্রের লিখিত চুক্তিগুলো মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের জন্য কোনো ফিতনাবাজকে সাহায্য করা কিংবা আশ্রয় দেওয়া হালাল হবে না। আর যে তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ তায়ালার গজব ও অভিশাপ নেমে আসবে, যুগপৎ

কিয়ামতের দিন তার ছোটো-বড়ো কোনো আমলই গ্রহণ করা হবে না।

- ০৯. ইহুদিরা যতদিন যুদ্ধরত থাকবে, ততদিন তারা ইহুদিদের সাথে খরচ বহন করবে।
- ১০. বনি আউফের ইহুদিরা মুসলিমদের একটি জাতি। তারা তাদের ধর্ম পালন করবে, মুসলিমরা নিজেদের দ্বীন পালন করবে; কিন্তু যে অত্যাচার কিংবা অনাচার করবে, সে শুধু নিজেকে ও তার পরিবারকে ধ্বংস করবে।
- ১১. ইহুদিরা তাদের খরচ বহন করবে। অনুরূপ মুসলিমরা নিজেদের খরচ বহন করবে। এই চুক্তির অনুগত লোকদের ওপর যারা আক্রমণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে বাকি সকলেই সহযোগিতা করবে।
- ১২. এই চুক্তি অনুমোদনদাতাদের মাঝে যদি কোনো বিশৃঙ্খলা কিংবা কলহ দেখা দেয়, তাহলে তার ফয়সালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের অধিকারে থাকবে।
- ১৩. যে মদিনার বাইরে থাকবে সেও নিরাপদ। আর যে মদিনায় ভেতরে থাকবে, সেও নিরাপদ। তবে অত্যাচারী বা পাপাচারী ব্যতিক্রম।
- ১৪. আল্লাহ তায়ালা সর্বাগ্রে এই চুক্তিপত্র সত্যায়ন করেছেন এবং তা পূরণ করেছেন। যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং সৎকাজ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্যকারী।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এই চুক্তিপত্রে ইসলামি সমাজের বিভিন্ন বিধিবিধানসংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে —

এক.

বর্তমান যুগের পরিভাষা অনুযায়ী এই চুক্তিপত্রের সবচেয়ে সমীচীন নাম হলো 'সংবিধান'। যদি তাকে ঘোষিত সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা বর্তমান যুগের যেকোনো সংবিধানকে—যা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সর্বদিকে স্পষ্ট পরিকল্পনার প্রতি যত্নশীল, পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের ভেতরে পরস্পরের আচরণবিধি এবং রাষ্ট্রের বাইরে অন্যদের সাথে সম্পর্ক নীতি কেমন হবে, তা পরিপূর্ণ রূপে বর্ণনা করে দিয়েছে।

যে সংবিধান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির মাধ্যমে প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁর সাহাবিদের দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, অতঃপর তাকে মুসলিম ও প্রতিবেশী ইহুদিদের ঐকমত্যে বিধানের রূপ দিয়েছেন, সে সংবিধানই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের গর্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইসলামি সমাজ সূচনা থেকেই একটি পরিপূর্ণ সংবিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত; ইসলামি রাষ্ট্র প্রথম সূর্যোদয় থেকেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক উপাদানসমূহে পূর্ণ ছিল।

আরও স্পষ্ট কথা হলো—এ সমস্ত উপাদান ছিল ভিত্তিস্বরূপ। ইসলামি সমাজে শরিয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য তা ছিল অপরিহার্য। কেননা, তা সামষ্টিকভাবে মুসলিম জাতির ঐক্যের ওপর সম্পাদিত; প্রশাসনিক অন্যান্য ধারা তো আছেই। এমন কোনো ভূমি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রণীত সংবিধান ব্যতীত ইসলামি বিধিবিধান ও শরিয়ত বাস্তবায়ন

করা সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু, এ সংবিধান ও ধারাগুলো তো ইসলামি শরিয়তেরই অংশ।

ইসলাম কি শুধু ব্যক্তিজীবনের জন্য

এখানে এসেই ওই সমস্ত ব্যক্তিদের দাবি ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়, যারা উপর্যুক্ত সহজ বাস্তবতা থেকে নিজেদের চর্মচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টি বন্ধ করে ফেলে এবং দাবি করে যে, ইসলাম ব্যক্তি ও তার স্রষ্টার মাঝে সংযোগের একটি ধর্মমাত্র; তার কোনো রাষ্ট্রীয় উপাদান ও সাংবিধানিক নীতি নেই।

বস্তুত এটি একটি প্রাচীন ফাঁদ; উপনিবেশবাদের গোলাম এবং সাংস্কৃতিক চেতনা বিকৃতকারীরা এর মাধ্যমে নিজেদের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট। আর তা হলো, ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা, যেন সে ইসলামি সমাজ এবং অন্যান্য ভ্রষ্ট ভ্রান্ত সমাজে নিজের কাজ আঞ্জাম না দিতে পারে এবং কোনো কর্তৃত্ব অর্জন না করতে পারে। আর তার একমাত্র পন্থা হলো এ কথা প্রচার করা যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্মমাত্র, রাষ্ট্র নয়; কিছু ইবাদত উপাসনামাত্র, কোনো সংবিধান বা জীবনবিধান নয়। এমনকি বাস্তবেও যদি ইসলাম কোনো জীবনবিধান ও রাষ্ট্র হয়ে থাকে, তবুও যেন তাদের মিথ্যা প্রচারণার দ্বারা সে পরিবর্তিত হয়ে তার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

তবে ওই সমস্ত বিকৃতিকারীদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের এই ফাঁদ খুব স্বল্প সময়েই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাদের দাবিগুলো হয়ে গেছে অনর্থক কথাবার্তা এবং স্পষ্ট হিংসা-বিদ্বেষ প্রসারের প্রমাণবহ; কিন্তু যাহোক, আমরা যেহেতু এ সমস্ত ধারা নিয়ে আলোচনা করছি, তাই বলব—

> ইসলামি সমাজের জন্ম হয়েছিল একটি রাষ্ট্রের সংহত অবকাঠামোর অধীনে। এবং পরবর্তী সময়ে তার বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়েছে চতুর্দিক থেকে সুগঠিত একটি সমাজের অবকাঠামোর অধীনে। এই চুক্তিপত্রই তার সবচেয়েয়ে বড়ো সাক্ষী।

তা ছাড়া মূলগতভাবে শরিয়তের বিধিবিধানের মূল্যের বিষয়টা তো আছেই। এটা তো তার একটা অংশমাত্র। যখন তা অন্যান্য বিধিবিধানের সঙ্গে সমন্বিত হবে, তখন তা একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান ও বিশাল প্রশাসনিক নীতিতে পরিণত হবে।

দুই.

এই চুক্তিপত্রে ইহুদিদের সাথে রাসুলের ব্যবহারের মাধ্যমে ইনসাফের চূড়ান্ত সীমা প্রদর্শিত হয়েছে। আর মুসলিম ও ইহুদিদের মাঝে এই ইনসাফের উজ্জ্বল ফলাফল আসারও সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু ইহুদিদের প্রকৃতিতেই রয়েছে ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যগ্রতা। তাই অল্প কিছুদিন পরেই তারা এই ধারার সিদ্ধান্তগুলো বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ল এবং রাসুল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফন্দি ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। এর আলোচনা উপযুক্ত স্থানে আসবে, ইনশাআল্লাহ। ফলে মুসলিমরাও তাদের কার্যকলাপের বিপরীত সমাধান গ্রহণ করেছিল।

তিন.

এই চুক্তিপত্র ইসলামি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধিবিধান উন্মোচিত করেছে। তন্মধ্যে কিছু আমরা উল্লেখ করছি—

- **এক.** প্রথম ধারা থেকে আমরা এই রহস্য উদঘাটন করতে পারি যে, ইসলামই একমাত্র শক্তি—যা মুসলিমদের মাঝে ঐক্য তৈরি করতে পারে এবং তাদের এক জাতিতে পরিণত করতে পারে। পাশাপাশি তাদের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ভেদাভেদ ও বৈশিষ্ট্য দূরীভূত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই সর্বজনীন ঐক্যের অধীনে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়—

> 'কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলিমগণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সাথে যুক্ত হবে এবং এক হয়ে লড়াই করবে; এরা সকলেই এক জাতি।'

এটাই হলো একটি সুসংহত ও শান্তিপূর্ণ ইসলামি সমাজ গড়ে তোলার প্রধান ভিত্তি।

- **দুই.** দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারা থেকে আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো—মুসলিমদের মাঝে পূর্ণাঙ্গরূপে ঐক্য ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। তাই তারা সকলেই দুনিয়া ও আখিরাতে অন্যদের প্রতি নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তা ছাড়া ইসলামি শরিয়তের অনেক বিধিবিধান এই দায়িত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের মাঝে সহযোগিতা ও সংহতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারিত।

● **তিন.** সাত নম্বর ধারা মুসলিমদের মাঝে সমতার যথার্থতা বিশ্লেষণ করে দেয়। তা শুধু মুখরোচক সুসজ্জিত প্রদর্শনীয় কোনো স্লোগান নয়; বরং তা ইসলামি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক স্তম্ভ, যা পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

মুসলিমদের মাঝে সমতা নিশ্চিত করার বাহ্যিক রূপ দেখার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহীত এই সিদ্ধান্তই যথেষ্ট—

> আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তা সমান, নিম্নমানের মুসলিমও কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।

এর অর্থ হলো—মুসলিমের নিরাপত্তা, সে যে-ই হোক, সম্মানিত। তার আশ্রয় সুরক্ষিত, তার ওপর হাত প্রসারিত করার অধিকার কারও নেই। তাই কোনো মুসলিম যদি কাউকে আশ্রয় দেয়, তাহলে তার আশ্রয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কোনো শাসক বা প্রজার নেই। এক্ষেত্রে মুসলিম নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো বিভেদ নেই। তাই কোনো নারীও যদি কাউকে নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তার আশ্রয়ের সম্মান ক্ষুণ্ণ করার অধিকার কারও নেই, সে যত বড়ো পদেরই হোক না কেন, যত উচ্চমর্যাদাশীল হোক না কেন। সমস্ত মাজহাবের উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত। তবে ইসলামি আইনবিদগণ এক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন : মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর, যেমন—গোয়েন্দা বা এমন কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না। অনুরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যা ও সময়, তথা চার মাস, এর বেশি কাউকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।[২৬১]

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিম*-সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন—

> মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রাসুলের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার ভাই আলি বলছে যে, আমি যে লোককে (ফুলান ইবনে বুহাইরা) আশ্রয় দিয়েছি, সে তাকে হত্যা করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—উম্মে হানি, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

---

২৬১ *মুসান্নিফ মুহতাজ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৮



পঞ্চম অধ্যায়

হিজরতের পর নবিজির প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো ছিল একটি নিরাপদ আবাস তৈরিকেন্দ্রিক এবং আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে একটি সমঝোতাচুক্তি সম্পন্ন করার পর নবিজি মূলত কিছু যুদ্ধের সম্মুখীন হন। এই অধ্যায়ে হিজরতের পর থেকে নবিজি সফলভাবে যে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধগুলো মোকাবিলা করেছেন, তারই আলোচনা আসবে। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে—

- প্রতিরোধ-যুদ্ধের পূর্বকথা, গাজওয়াতু বাদরিল কুবরা, বনু কাইনুকার ইহুদিদের মুসলিমদের সাথে করা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা, উহুদ যুদ্ধ ও উহুদের শিক্ষা, ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা, বনু নাজিরের ইহুদিদের দেশান্তর এবং এর কারণ কী ছিল, সেইসব বিষয়ে আলোচনা।
- গাজওয়া জাতির রিকা, গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিক—এই দুটি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট কী ছিল, কেন হয়েছিল, সেই বিষয়ের আলোচনা। এই দুটি যুদ্ধ থেকে মুসলিমদের জন্য প্রাপ্ত শিক্ষা—সেইসব আলোচনা।
- গাজওয়ায়ে খন্দক ও গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজারে কারণ, যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এই দুটি যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও উপদেশ কী, সেই শিক্ষা।

প্রথমবারের মতো যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তথা কুরাইশ ও বনু হামজা অভিমুখে অভিযানে বের হন। যাকে গাজওয়ায়ে ওয়াদ্দান (ওয়াদ্দানের যুদ্ধ) বলা হয়; কিন্তু এখানে কোনো কিতাল (হত্যাযজ্ঞ) সংঘটিত হয়নি। বনু হামজা নবিজির সাথে সন্ধি করে। নবিজি ও সাহাবায়ে কিরাম এরপর মদিনায় ফিরে আসেন।

* * *

গাজওয়াতু বাদরিল কুবরা

আবু সুফিয়ান বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে শাম থেকে মক্কায় ফিরছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানতে পেরে মুসলিমদের একটি দল অভিযানে পাঠালেন। হিজরতের সময় মক্কায় তাদের রেখে আসা ধনসম্পদে কাফিররা যে অন্যায় ভোগদখল বসিয়েছিল, এর বদলা নেবেন এই কাফেলা। মুসলিমদের এ দলটি তখনও যুদ্ধের কথা ভাবতে পারেননি। তাই ব্যাপারটা কারও কাছে স্বাভাবিক মনে হলো, আবার কারও কাছে বেশ ভারী।

আবু সুফিয়ান পথমধ্যে মুসলিমদের বাণিজ্য কাফেলা প্রতিরোধের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে পেরে জমজম গিফারি নামের এক দূত মারফত মক্কায় সাহায্য চেয়ে পাঠাল। সেই দূতের মাধ্যমে কাফেলা উদ্ধারের জন্য খবর পাঠাল সে। কুরাইশদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিল। প্রায় এক হাজারের মতো সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো। এ বাহিনীতে কুরাইশ সর্দারদের কেউই বাদ পড়েনি; সকলেই অংশগ্রহণ করল।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের সাহায্যে কুরাইশদের বিরাট প্রস্তুতি ও তাকে উদ্ধারের জন্য কুরাইশ বাহিনী বের হওয়ার খবর শুনলেন। খবর শুনে তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শে বসলেন। মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে চমৎকার কথা বলছিলেন। মিকদাদ ইবনে আমর বললেন—

> আপনাকে আল্লাহ তায়ালা যেমন আদেশ করেছেন, তেমনি পালন করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি।

কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের উত্তর শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন—

হে লোকসকল, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

তাঁর এ মনোভাব বুঝতে পেরে আনসারি সাহাবি সাদ ইবনে মুআজ রা. দাঁড়িয়ে বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, সম্ভবত আপনি আমাদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

নবিজি বললেন—হ্যাঁ।

এরপর সাদ রা. বললেন—

> আমরা আপনার ব্যাপারে ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি—আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। এর ভিত্তিতে আমরা আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আপনার যেমন ইচ্ছে কাজ করে যান, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। যেই সত্তা আপনাকে সত্যের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমাদের সামনে যদি সমুদ্র পড়ে, আর আপনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উৎসর্গ হওয়ার এ বক্তব্যে বেশ খুশি হলেন। তিনি বললেন—

> চলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তায়ালা দুই দলের একদলকে (মুসলিম বাহিনী) (বিজয়ের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন...
>
> আল্লাহর শপথ, এখনই আমি যেন ওই জাতির (কাফির) ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাচ্ছি।

যুদ্ধ শুরু হলো। নবিজির অংশগ্রহণে প্রথম যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরির রামাদানের কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের এক জামাত নিয়ে বাণিজ্য কাফেলা অভিযানে বের হন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী, সে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৩১৪ জন। সঙ্গে বাহন হিসেবে সাতটি উট। যাত্রাপথে এসব উটে তারা পালাক্রমে দুজন বা তিনজন করে উঠতেন। ওই দিকে আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সমুদ্রের তীর ধরে নিরাপদে দ্রুত চলল।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোয়েন্দা মারফত কুরাইশদের অভিযানের গোটা ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তাদের সংখ্যা নয়শত থেকে এক হাজারের ভেতরে। এ বাহিনীতে কুরাইশ নেতৃবর্গের সবাই অংশ নিয়েছে।

বাণিজ্যিক কাফেলা যেহেতু এখন নিরাপদ, তাই আবু সুফিয়ান এ কাফেলাকে মক্কায় ফিরে যেতে বলল; কিন্তু আবু জাহল নাছোড়বান্দা। সে বদরে যাবেই। সে বলল—

> আল্লাহর শপথ, আমরা বদরে না গিয়ে ফিরব না। বদরে গিয়ে তিন দিন অবস্থান করব, সেখানে উট জবাই করে আমরা খাব, মদের আসর হবে, বাদ্যসুর বাজানো হবে। আমাদের এ জড়ো হওয়া, বদরে দিকে আমাদের এ যুদ্ধাভিযান চালানোর মাধ্যমে আরবদের মাঝে আমাদের বিরাট সুনাম হবে, আরবরা সব সময় আমাদের ভয় করে চলবে।

এরপর কুরাইশরা সামনের পথে চলল। তারা গিয়ে উপত্যকার ভালো, বেশি সুবিধাজন উঁচু স্থানটি বেছে নিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর-কূপের নিকটে নামলেন। হুবাব ইবনুল মুনজির জিজ্ঞেস করলেন—

> ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ জায়গাটা কি এমন নাকি যে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এখানে নামার নির্দেশ দিয়েছেন? এখানেই আমাদের থাকতে হবে? নাকি এটাকে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে এমনিতেই বেছে নেওয়া?

নবিজি বললেন—যুদ্ধকৌশল হিশেবে বেছে নেওয়া।

তিনি বললেন—

> তাহলে এটা উপযোগী জায়গা নয়। লোকজনকে জাগিয়ে আমরা সামনে চলি। তাদের (প্রতিপক্ষ) ওখান থেকে পানির ব্যবস্থা করে হাউজ বানিয়ে পানি ভরে রাখব। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব, পানি পান করব, তারা পান করতে পারবে না।'

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ নিয়ে হুবাব রা.-এর কথামতো সেই স্থানে গেলেন। হুবাব যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা মেনে নিলেন।[২৬৩]

সাদ ইবনে মুআজ রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটা নিরাপত্তা ছাউনি বানানোর প্রস্তাব করলেন। নবিজির নিরাপত্তা জাতীয় জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

---

২৬৩ ইবনে হিশাম তার সিরাতের কিতাবে হুবাব ইবনুল মুনজির রা.-এর এ হাদিসটি ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিশাম যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাতে কিছুটা সমস্যা আছে। তবে ইবনে হাজার এ হাদিসটিই *আল ইসাবায়* যে সনদে নিয়ে এসেছেন, সেটি সহিহ । ইবনে হাজার তার বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। আরও জানতে দেখুন—*আল ইসাবা*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০২

মদিনায় নবিজির নিরাপদে ফিরে যাওয়াই কাম্য। তাঁকে হারিয়ে যেন মুসলিমদের শোকাতুর হতে না হয়।

নবিজি এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সাহবায়ে কিরামকে আল্লাহর নুসরতের (সাহায্যের) বাণী শুনিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিক-ওদিক ইশারা করে বলছিলেন—

> এটা অমুকের (মুশরিক) ধ্বংসস্থল। এটা অমুকের ধ্বংসস্থল। নবিজি যার ব্যাপারে যেখানেই বলছিলেন, সেখানেই তার হত্যার কাজ সমাধা হয়েছে।[২৬৪]

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (২য় হিজরির ১৭ রমজানের আগের সন্ধ্যা) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করছিলেন। বিনয়ানবত হয়ে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন—

> اللّٰهُمَّ هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك و تكذب رسولك. اللّٰهُمَّ فنصرك الذي تعاني ، اللّٰهُمَّ أحنهم الغداة...
>
> হে আল্লাহ, কুরাইশরা দম্ভ-অহংকারের সাথে এসে (আপনার দ্বীনের বিরুদ্ধে) চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। আপনার রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। হে আল্লাহ, আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করে আমাদের সাহায্য করেন। হে আল্লাহ, আপনি আগামী ভোরে তাদের নত (পরাস্ত) করে দেন...

নবিজির রোনাজারির এ অবস্থা দেখে আবু বকর রা.-এর অন্তরে দরদ উথলে উঠল। তিনি নবিজির পেছন থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন—

> ইয়া রাসুলাল্লাহ, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করবেন।

অন্য মুসলিমরাও কাকুতি-মিনতি করে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করছিলেন।[২৬৫]

---

২৬৪ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭০

২৬৫ বদর যুদ্ধে আল্লাহর কাছে নবিজির সাহায্য কামনার হাদিস *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* দুটি কিতাবেই বর্ণিত আছে। *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৫; *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭

শুক্রবার সকালে মুসলিম-কাফির দু-বাহিনীর মাঝে লড়াই শুরু হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি নুড়ি পাথর বা কঙ্কর নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মারলেন। ছুড়ে মারার পরই প্রত্যেক কাফিরের চোখেই তার প্রভাব দেখা গেল। আল্লাহ তায়ালা সেদিন ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য করেছেন। তারা মুসলিমদের হয়ে তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন।[২৬৬]

অবশেষে মুসলিমরা অকল্পনীয় বিজয় লাভ করলেন। কুরাইশদের উল্লেখযোগ্য ৭০ জন মারা গেল এবং ৭০ জন বন্দি হলো। এদিকে মুসলিমদের মাত্র ১৪ জন শহিদ হলেন। মুশরিকদের মৃতদেহগুলো (কাফিরদের নেতৃস্থানীয় সবার দেহও যার অন্তর্ভুক্ত ছিল) কালিবে বদরে (বদরের পরিত্যক্ত একটি কূপ) নিক্ষেপ করা হলো। এরপর কূপের পাশে দাঁড়িয়ে নবিজি তাদের ও তাদের পিতার নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন—

> হে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে করা কি তোমাদের জন্য ভালো ছিল না? আমাদের রব আমাদের যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তার সত্যতা পেয়েছি। তোমাদের তোমাদের প্রভু যেই ওয়াদা দিয়েছিলেন, তোমরা কি তার সত্যতা পেয়েছ?

উমর রা. তখন বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি প্রাণহীণ দেহগুলোর সাথে কীভাবে কথা বলছেন?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> যেই সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর শপথ, আমি তাদের যা বলছি, (তাদের চেয়ে) তোমরা তা অধিক শ্রবণকারী নও।[২৬৭]

উমর রা.-এর পরামর্শ

বন্দিদের বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর রা. বললেন—বন্দিদের থেকে ফিদয়া (মুক্তিপণ) নেওয়া হবে। এর মাধ্যমে মুসলিমরা আর্থিকভাবে শক্তিশালী হবেন। ফিদয়া নিয়ে কাফিরদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে, আল্লাহ হয়তো তাদের হিদায়াত দেবেন; কিন্তু উমর রা. পরামর্শে বললেন—তাদের হত্যা করা হোক। এরাই

---

২৬৬ ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুমিনদের এ সাহয্যের বিষয়ে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* দুটিতেই বর্ণনা আছে।
২৬৭ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৮; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬৩

কুরাইশদের তৃণমূল নেতা, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। (এদের এভাবে ছেড়ে দিলে আবারও তারা মুসলিমদের শত্রুতায় মত্ত হবে।)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা. নমনীয় কোমল সিদ্ধান্তটাই গ্রহণ করলেন। ফিদয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। অবশেষে এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হলো; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল এর বিপরীত। উমর রা. এর রায়ের পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে রায় আসে।[২৬৮]

নবিজিকে তিরস্কার করে আয়াত নাজিল হলো—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যদি একটি বিষয় না হতো, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ, সেজন্য বিরাট আজাব এসে পৌঁছত।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২৬৯]

* * *

২৬৮ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৫৭-১৫৮

২৬৯ সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৭-৬৯

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

বদর যুদ্ধে যেভাবে নিষ্ঠাবান, কর্মপরায়ণ, নিজ আদর্শে অবিচল মুমিনদের সাহায্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ হওয়া বিভিন্ন অলৌকিক সাহায্যের ব্যাপার আছে, একইভাবে এতে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক জানার ও শেখার মতো বিষয়। নিচের পয়েন্টগুলোতে আমরা সেই বিষয়গুলো তুলে ধরছি—

০১.

বদর যুদ্ধে মুসলিমরা মূলত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে শাম থেকে ফিরে আসা বাণিজ্য বহরে অভিযান চালানো; কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছে ছিল বিপরীত। অকল্পনীয় বিজয়, গনিমত লাভ এবং মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ একটা ইস্যু তৈরি করা। তাই বাণিজ্য বহরকে তাদের নাগালের বাইরে রাখলেন। বিপরীতে তাদের এমন এক বাহিনীর মুখোমুখি করলেন, যার আশা তারা করেনি। এখানে থেকে আমরা দুটো বিষয় বুঝতে পারি—

- **এক.** হারবি (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধকারী) কাফিরের মাল, ধনসম্পদ মুসলিমদের বিবেচনায় মূল্যহীন। তাই মুসলিমদের জন্য এসব কাফিরদের মালে আধিপত্য বিস্তার করা এবং সাধ্যানুপাতে তা নিজেদের করে নেওয়া বৈধ। ফুকাহায়ে কিরামের এ ব্যাপারে একমত। (সুতরাং কাফেলা অভিযানের ব্যাপারে এখানে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।) তবে এক্ষেত্রে মুহাজিরদের ভিন্ন আরেকটা যুক্তি আছে। সেটা হলো—তারা মক্কায় যেসব ধনরাজি রেখে এসেছিলেন, কাফিররা সেগুলোতে অন্যায় ভোগদখল বসিয়েছিল। ফলে কাফেলা অভিযানের মাধ্যমে তার প্রতিশোধ গ্রহণে তারা উন্মুখ ছিল।

♦ **দুই.** আগে যা বলা হয়েছে, সেটি তো আছেই; সবচেয়ে বড়ো কথা হলো—আল্লাহ তায়ালা তার মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে এরচেয়ে বড়ো ইচ্ছা করেছেন; যা তাদের সৃষ্টির লক্ষ্যের সাথে বিশেষভাবে সংগতিপূর্ণ। তা হলো, আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদে বের হওয়া, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা)-এর লক্ষ্যে নিজের জানমাল বিলিয়ে দেওয়ায় মুমিনদের মনন তৈরি করা।

এই তারবিয়তে ইলাহি (আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা) নিচের আয়াতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

وَإِذ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحدَى الطَّائِفَتَينِ أَنَّها لَكُم وَتَوَدّونَ أَنَّ غَيرَ ذاتِ الشَّوكَةِ تَكونُ لَكُم وَيُريدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَيَقطَعَ دابِرَ الكٰفِرينَ.

আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোনো রকম কাঁটা নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে।[২৭০]

০২.

কুরাইশদের অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর আগমনের খবর শুনে নবিজি সাহাবায়ে কিরামের সাথে যে পরামর্শ বৈঠক করেছিলেন, এতেও আমরা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো শিক্ষা পাই—

♦ **এক.** পরার্শের গুরুত্ব। নবিজি এখানে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শে বসেছেন। আমরা নবি-জীবন পাঠ করলে দেখতে পাব, নবিজি শরয়ি (ইসলামি) রাজনীতি, বিভিন্ন বিষয় পরিচালনাসহ নানান বিষয়ে—যেখানে কোনো নস (নির্দেশনা) নেই—পরামর্শ করা ছিল তাঁর নিয়ম। এ কারণে যেসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট কোনো নস নেই, সেসব বিষয়

২৭০ সূরা আনফাল, আয়াত : ৭

তবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—এককটু পূর্বে যেই 'পরামর্শে'র কথা বলা হয়েছে, এটা মাশরু তথা শরিয়তসম্মত, তবে আবশ্যক নয়। ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত। অর্থাৎ একজন মুসলিম শাসক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শের মাধ্যমে আলো নিতে পারেন; কিন্তু তার জন্য স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের (মতামত) ভিত্তিতে নিজের ভালো মনে করা সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত আবশ্যক নয়...ইমাম কুরতুবি এ ব্যাপারে বলেছেন—

المستشير ينظر في اختلاف الآراء ، و ينظر أقربها إلي الكتاب والسنه إن أمكنه،فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منها عزم عليه، وأنفذه متوكلا عليه

পরামর্শ গ্রহীতা (শাসক) বিভিন্ন রায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে চিন্তা করে দেখবে, কোনটা কুরআন-সুন্নাহর বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহ তাকে এটা বোঝার তাওফিক দিলে, সে তাতেই দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।[২৭১]

০৩.

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—নবিজি যখন পরামর্শ করছিলেন, তখন আবু বকর উমর রা.-এর কথায় কেন নবিজি পরিতুষ্ট হননি? কেন নবিজি অন্যদের তথা আনসারদের জবাবের অপেক্ষা করছিলেন? এরপর আনসারি সাহাবি সাদ ইবনে মুআজ ভাষণ দিলে তাঁর মন পরিতৃপ্ত হয় কেন?

এই প্রশ্নের সাধারণ যে উত্তর আমরা দেবো, তা হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের রায় জানতে চাওয়ার ভিন্ন কারণ আছে। নবিজি ও আনসারদের মাঝে যেই চুক্তি হয়েছিল তা হলো—তারা মদিনার ভেতরে নবিজির প্রতিরক্ষা করবে, এখানে থেকে যুদ্ধ করবে। তো, নবিজি দেখতে চাইলেন, তারা সেই নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলেই থাকছে? নাকি তারা আল্লাহর সাথে করা এরচেয়েও বড়ো চুক্তিতে সক্রিয় থাকার আগ্রহ প্রকাশ করছে?

---

২৭১ আল জামে লিআহকামিল কুরআন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫২

সাদ ইবনে মুআজের বক্তব্যে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন—হিজরতের পূর্বে মক্কায় আনসাররা নবিজির হাতে যে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, সেটা মূলত আল্লাহর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করাই ছিল। এটা শুধু নবিজির প্রতিরক্ষার বাইয়াত ছিল না, ছিল ধর্মের প্রতিরক্ষার বাইয়াতও।

তারা শুধু নবিজির প্রতিরক্ষা করবেন, ধর্মের প্রতিরক্ষা করবেন না—তাদের এ রকম মানসিকতার কথা ভাবা যায় না। তাদের প্রতিরক্ষার বিষয়টা সামগ্রিক। মূলত তারা এ আয়াতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন—

۞ إِنَّ اللَّهَ اشتَرىٰ مِنَ المُؤمِنينَ أَنفُسَهُم وَأَموٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ۚ يُقٰتِلونَ فى سَبيلِ اللَّهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ ۖ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا فِى التَّورىٰةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرءانِ ۚ وَمَن أَوفىٰ بِعَهدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمُ الَّذى بايَعتُم بِهِ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ.

> আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতিরক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।[২৭২]

এ কারণেই সাদ রা. জবাব দিয়েছেন এভাবে—'আমরা আপনার ব্যাপারে ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি যা (সত্যের যেই দাওয়াত) নিয়ে এসেছেন তা সত্য...'

অর্থাৎ আমরা বাইয়াতে আকাবায় যে চুক্তি করেছিলাম, সেই চুক্তির চেয়েও আরও বড়ো চুক্তি অনুসারে আমরা আপনার সাথে চলছি।

০৪.

ইমামের (শাসক) জিহাদসহ বিভিন্ন কাজে মুসলিমদের সতর্কতা, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সাজাতে গোয়েন্দা বা গুপ্তচরের সাহায্য নিতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি

---

২৭২ সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১

যেকোনো পদ্ধতিই অবলম্বন করতে পারেন। চাই তা একধরনের ধোঁকা-ছলনা-কৌশল যা-ই হোক। মুসলিমদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে, মুসলিমদের কল্যাণে যেকোনো পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যা, তা হলো—কল্যাণের আয়োজন করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই তা যেন আবার ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

সিরাতের বিভিন্ন বইয়ে পাওয়া যায়—বদরের নিকটে পৌঁছলে নবিজিসহ একজন সাহাবি বাহনে চড়ে এক বৃদ্ধ লোকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কুরাইশ মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। বৃদ্ধ লোকটি বলল, তোমরা দুজন কে? এ পরিচয় দেওয়ার পূর্বে আমি বলব না। নবিজি বললেন, আপনি সংবাদ দিলে আমরাও আমাদের ব্যাপারে আপনাকে জানাব। সে বলল, এমনই হবে? নবিজি বললেন—হ্যাঁ।

এরপর বৃদ্ধ লোকটা কুরাইশ কাফিরদের ব্যাপারে যতটুকু জানত, মুহাম্মাদের ব্যাপারে যতটুকু শুনেছিল, সব বলে দিলো। বৃদ্ধের কথা শেষ হলে 'আমরা পানিময় স্থান থেকে এসেছি'—এ কথা বলেই নবিজি কেটে পড়লেন। তখন বৃদ্ধ চিন্তায় পড়ে গেল—কোন পানিময় স্থান থেকে? ইরাকের পানিময় স্থান থেকে? (এখানে যে নবিজি বদরের পানিময় স্থানের কথা বলেছেন, তা সে বুঝতে পারেনি।)

০৫.

হুবাব রা. ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল (আমার মতে, হাদিসের সনদ সহিহ)-এ থেকে বোঝা যায়—নবিজির সব কাজ সিদ্ধান্ত তাশরিয়ি (শরিয়তের অবশ্যপালনীয় আইন) হিসেবে ছিল না, অনেক সময়ই তিনি সমাজের একজন চিন্তাশীল মান্যগণ্য ব্যক্তি হিসেবে কোনো একটা কাজ করতেন। সিদ্ধান্ত দিতেন। পরিচালনা করতেন।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ আমাদের জন্য আবশ্যক না। যুদ্ধের আগে নবিজির জায়গা গ্রহণের ব্যাপারটা এরই অন্তর্ভুক্ত। এখানে নবিজি একটা জায়গা গ্রহণের পরও হুবাব রা. অন্য জায়গায় অবস্থানের পরামর্শ দেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুবাব রা. অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি (প্রত্যাদেশ) নয়। তাই নবিজির এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করা করা যেতে পারে।

এভাবে শরয়ি সিয়াসাতের বিভিন্ন ব্যাপারে নবিজির তাসাররুফ (হস্তক্ষেপ-সিদ্ধান্ত-পরিচালনা) ছিল একজন ইমাম ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, রাসুল হিসেবে নয়।

একইভাবে তিনি বিভিন্ন সামরিক কার্যক্রমে তাসাররুফ করেন। সেটাও রাসুল হিসেবে নয়। ফুকাহায়ে কিরাম (ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞ) এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

০৬.

(আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি, সাহায্য তলব করতে হবে) আমরা আগেও জেনেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বিজয়ের বাণী শুনিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। তিনি এক্ষেত্রে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি বিজয়ের আগেই মুসলিমদের সামনে বিজয়ের ছবি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। কাফিররা পরাজিত হয়ে কে কোথায় মারা যাবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন। এত নিশ্চয়তার পরও তিনি আল্লাহর সাহায্য কামনা থেকে অমুখাপেক্ষী হননি।

আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করেছেন। তাঁর এই মিনতি দেখে আবু বকর অবশেষে তাঁকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিতে গিয়ে বলেছেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে (বিজয়ের) যেই ওয়াদা দিয়েছেন, তা পূরণ করবেন।

'আমি যেন তাদের ধ্বংস স্থল দেখতে পাচ্ছি'—এতটা নিশ্চয়তা লাভ করার পরও কেন নবিজির এই কাকুতি-মিনতি?

বিজয়ের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা লাভের মাধ্যমে নবিজি আল্লাহর ওয়াদাকে সত্যায়ন করেছেন। আর আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি, আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ—এটা বান্দার উবুদিয়্যাতের (দাসত্ব) বহিঃপ্রকাশ। যেজন্য বান্দার মূলত সৃষ্টি। এই উবুদিয়্যাত প্রকাশ বিজয়ের অন্যতম উপাদান। সর্বকালে, সর্বযুগে, সব অবস্থায়। উপায়-উপকরণ যতই বেশি হোক, আল্লাহর তাওফিক ছাড়া বিজয় আসতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা চান, আমরা স্বেচ্ছায় তাঁর বান্দা হই, উবুদিয়্যাতই সবচেয়ে বেশি বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। উবুদিয়্যাত প্রকাশে বান্দা যতটুকু আল্লাহর সাড়া পায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তা পায় না।

মানুষের জীবনে যত বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত আসে, সবগুলোই বান্দাকে উবুদিয়্যাত প্রকাশে সতর্ক করে। দিন খারাপের সময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে ছুটে যাবে, তাঁর কাছে বিনীত হবে, নিজের দুর্বলতা ও উবুদিয়্যাত প্রকাশ করবে, বালামুসিবতে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নেবে—এটাই আমাদের কাছে চান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। বান্দা যখন তাঁর জীবনে এ বাস্তবতাকে সামনে রাখবে,

যেকোনো প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে ছুটে যাবে, যেকোনো বিপদে তাঁর আশ্রয় নেবে, সেই সঙ্গে আল্লাহর আনুগত্যের রঙে রঙিন হবে, তখন সে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

এই যে নবিজির উবুদিয়্যাতের প্রকাশ, আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি—এটা বদরে বিজয় আসার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহর কাছে মুসলিমদের বিনম্র মিনতির কারণে তাদের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার বিষয়টি কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

> তোমরা যখন ফরিয়াদ (যাচনা) করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের (প্রতিপালক) নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।[২৭৩]

আপনি নবিজির এই উবুদিয়্যাত প্রকাশ ও তার চমৎকার ফল, অন্যদিকে আবু জাহেলসহ কাফিরদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও তার ভয়াবহ পরিণাম—দুটোকেই ভাবেন। উবুদিয়্যাত ও বিনয়ের ফলাফল ছিল শুভ ও সম্মানজনক; যার সামনে সারা দুনিয়া নত হয়েছিল। আর ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ফলাফল ছিল লাঞ্ছনা, নর্দমায় নিক্ষেপণ। বিনয়ী ও অহংকারীদের ক্ষেত্রে এটাই এটাই আল্লাহর শাশ্বত বিধান।

০৭.

(বদরে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফেরশতাদের মাধ্যমে) মুসলিমদের সাহয্যে বদরে যেই মুজিজা প্রকাশ পেয়েছিল, তা মুজিজাসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা সরাসরি ফেরেশতাদের মাধ্যমে মুসলিমদের সাহায্য করেন। কুরআন-সুন্নাহর সুপষ্টভাবে তা প্রমাণিত। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবুর ভেতরে ভয়ার্ত অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ বলে ওঠেন—আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর

---

২৭৩ সূরা আনফাল, আয়াত : ৯

সাহায্য আসছে। এই তো, জিবরাইল তার ঘোড়ার লাগাম ধরে নিম্নভূমিতে তাকে পরিচালনা করেছেন।[২৭৪]

অনেকে মনে করে থাকেন—আয়াতে যে ফেরেশতার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তা মুসলিমদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য। আমি এটাকে এভাবে দেখি না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে, আমি তোমাদের সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।

এ আয়াতে ফেরেশতাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, এক হাজার। সংখ্যার ধারণাটা ধর-ছোঁয়া যায়—এমন জিনিসের ক্ষেত্রেই করা যায়। আর এখানে ফেরেশতাদের ব্যাপারটা এমন না। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং মানসিক শক্তির জন্য সংখ্যার উল্লেখ এটা বলা যায় না।

আয়াতে সংখ্যার উল্লেখের উদ্দেশ্য তাদের মনে প্রশান্তি জাগানো। তারা জীবনের প্রথম এ রকম যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছেন। শত্রুসংখ্যা তাদের তিন গুণ। সাহায্যের ভীষণ প্রয়োজন। তাই সংখ্যা উল্লেখ করে তাদের মানসিক প্রশান্তি দেওয়া। অন্যথায় আল্লাহ একাই তাদের সাহায্য করেছেন। ফেরেশতাদের এখানে হাত নেই। কুরআনের বক্তব্যের সাথে সংগতিপূর্ণ—

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারও পক্ষ

---

২৭৪ *সহিহ বুখারি*র বর্ণনাও কাছাকাছি : 'এই তো জিবরাইল তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন। তার গায়ে যুদ্ধাস্ত্র জড়ানো।' দেখুন—*সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪

থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী, প্রজ্ঞাবান।"

০৮.

হায়াতে বারজাখ (কিয়ামতের আগপর্যন্ত মৃত্যুপরবর্তী জীবন) কালিবে বদরে দাঁড়িয়ে নবিজির নাম ধরে ধরে ডাকা—এ থেকে বোঝা যায়, মৃতদের বিশেষ রুহ, বিশেষ জীবন রয়েছে; কিন্তু তার বাস্তব রূপ আমাদের জানা নেই। মৃততের রুহ তাদের দেহের আশপাশে ঘোরাফেরা করে।

এখান থেকে কবরের আজাবের প্রামাণ্যতা বোঝা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, বারজাখ বা মৃত্যুপরবর্তী বিষয়াবলি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ দুনিয়াতে বসে এসব ঠিক বোঝার সামর্থ্য আমাদের নেই। এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো—যার প্রামাণ্যতা বিশুদ্ধ হবে, সেটা নির্দ্বিধায় আমাদের মেনে নেওয়া।

০৯.

(বন্দিদের সাথে আচরণ কেমন হবে?) নবিজির পরামর্শ, ফিদয়ার সিদ্ধান্ত, এরপর ফিদয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে নবিজি ও সাহাবায়ের কিরামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিরস্কার আয়াত নাজিল হওয়া—এসব থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি—

♦ **এক.** (বন্দি ও নবিজির ইজতিহাদের ব্যাপারে) উসুলবিদ আলিমদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে একমত যে, নবিজি (শরিয়তের কোনো বিষয়ে) ইজতিহাদ করতে পারবেন। তারা বদর যুদ্ধের বন্দিদের বিষয়ে নবিজির করা ইজতিহাদ দিয়ে দলিল দেন। নবিজি যেহেতু ইজতিহাদ করতে পারবেন, তাই এখান থেকে আরেকটা বিষয় এমনিতেই বেরিয়ে আসে, তা হলো—তার ইজতিহাদ সঠিক-ভুল দুটোরই সম্ভাবনা রাখবে। তবে তাঁর এ ভুলের স্থায়িত্ব হবে না। কারণ, কুরআনের আয়াত নাজিল হয়ে তা শুধরে দেবে। আয়াত নাজিল না হলে বুঝতে হবে—তাঁর ইজতিহাদ ঠিক এবং এক্ষেত্রে অর্থাৎ নবিজির ইজতেহাদের পর যেই সিদ্ধান্ত আসবে, তা মানা আবশ্যক।

আবু ইসহাক সিরাজির *আল লামা* কিতাবে ব্যাখ্যাকার বলেন—

---

২৭৫ সূরা আনফাল, আয়াত : ১০

وقد كان الخطأ عليه جائزا ،إلا أنه لا يقرر عليه ،بل ينبه عليه سريعا ' وقال أبو إسحاق الشيرازي 'ومن أصحابنا من قال: ما كان يجوز عليه الخطأ ، وهذا خطأ ، لقوله تعالي{ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم } فيدل علي أنه أخطأ

(ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নবিজির ভুল হতে পারে; কিন্তু এর স্থায়িত্ব হবে না। তৎক্ষণাৎ তা শুধরে দেওয়া হবে। আবু ইসহাক সিরাজি বলেন—যারা বলেন, (ইজতিহাদে) নবিজির ভুল হতে পারে না তাদের এ কথা ভুল। এর প্রমাণ নিচের আয়াত—

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الكٰذِبِينَ

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। [২৭৬]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, তাঁরও ভুল হতে পারে।[২৭৭]

আসনাওয়ি তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন—

আ-মাদি এবং ইবনে হাজিবের মত হলো, নবিজির ভুল হতে পারে। তবে তিনি এ ভুলের ওপর অটল থাকবেন না। এই বর্ণনাটি আমাদের মাজহাব ও হাম্বলি ফিকহের অধিকাংশ ইমামসহ একদল মুহাদ্দিস থেকে আসানয়ি বর্ণনা করেছেন।[২৭৮]

ইমাম বাইজাবি—

ما كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكونَ لَهُ أَسرىٰ حَتَّىٰ يُثخِنَ فِي الأَرضِ ۚ تُريدونَ عَرَضَ الدُّنيا وَاللَّهُ يُريدُ الءاخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ.

---

২৭৬ সূরা তাওবা, : ৪৩

২৭৭ (شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي : ٨٢٤) ২৭৭

২৭৮ (الأسنوي علي المنهاج ٥٣٧/٤) ২৭৮

নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দিদের নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা।[২৭৯]

এ আয়াতের তাফসিরে বলেন—

والآية دليل علي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون ، و أنه قد يكون الخطأ ولكن لا يقرون عليه

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবিগণ ইজতিহাদ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁদের ভুলও হতে পারে। তবে সে ভুলে তাঁদের অটল রাখা হবে না।

অনেকে 'ইজতিহাদে নবিজির ভুল হতে পারে'—এ কথাকে বিশাল অপরাধ মনে করে। তাদের ধারণা, ইজতিহাদে ভুল হওয়াটা গুনাহের বিষয় অথবা বিকৃতি বা ইসমতে আম্বিয়ার (নবিদের গুনাহমুক্ত থাকা) ক্ষেত্রে অন্তরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মূল ব্যাপারটা এমন না। নবিজির ক্ষেত্রে ইজতিহাদে ভুল হওয়ার মানে হলো, নবিজির ইজতিহাদটি আল্লাহ তায়ালা ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন, সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়া। এটা ইসমতের সাথে সাংঘর্ষিক না। এরূপ ভুলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিদান রয়েছে।

এখানে বিবেচনার বিষয় দুটি—

- **এক.** মানুষের বিবেচনা,
- **দুই.** আল্লাহর বিবেচনা।

♦ **এক.** মানুষের বিবেচনায় ধরলে নবিজির ইজতিহাদ (বাহ্যদৃষ্টিতে ভুল হলেও) কখনোই তা ভুল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, ভুল হওয়ার ব্যাপারে মানুষের নিশ্চিত জ্ঞান নেই। আর আমাদের যেহেতু ভুল-সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তাই সব অবস্থাতেই তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এটা আমাদের জন্য আবশ্যক।

---

২৭৯ সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৭

কিন্তু আল্লাহর বিবেচনায় ধরলে তা ভুল-ঠিক দুটোরই সম্ভাবনা রাখে। আল্লাহ ঠিক যেমন চেয়েছেন, এর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে, তাহলে ঠিক। আবার সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারে, তখন তা সঠিক হবে না।

নবিজি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ। আমাদের মতো তাঁর ত্রুটি ছিল না। এ সত্ত্বেও

কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে ত্রুটি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি ইস্তেগফার করতেন। আমরা যেমন আমরা যেমন গুনাহ হলে ইস্তেগফার করে থাকি। তিনি বলেন—...আমি দিনে-রাতে সত্তরবার ইস্তেগফার করি।

♦ **দুই.** শত দুর্বলতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়া এবং নিজেদের বিলিয়ে দেওয়ার এ যেমন প্রথম অভিজ্ঞতা, তেমনি দারিদ্র্যের করাল গ্রাসের দুরবস্থায় যুদ্ধের পর গনিমত লাভও তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা।

হিকমতে ইলাহির (আল্লাহর প্রজ্ঞা) কামনা ছিল, দুর্বলতার মাঝ দিয়েই তারা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এরপর অকল্পনীয় সাহায্যের মাধ্যমে তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে দেবেন, তারা মনে প্রশান্তি পাবে। এরপর তারা সূক্ষ্ম দীক্ষার মাঝ দিয়ে গনিমতের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। যুদ্ধপরবর্তী দুটি ঘটনার মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরাম দীক্ষা পেয়েছেন—

প্রথম ঘটনা : মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় অনেক সম্পদ ফেলে গিয়েছিল। কিছু মুসলিম দ্রুত সেখানে গনিমতের মালের কাছে ছুটে গেলেন; কিন্তু গনিমত বণ্টনের বিধান এখনও নাজিল হয়নি। গনিমতের অধিকার বণ্টন নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়ার মতো বেধে গেল। তারা নবিজির কাছে এর সমাধান চাইলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল করেন—

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনিমতের হুকুম। বলে দেন, গনিমতের সম্পদ হলো আল্লাহর এবং রাসুলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হুকুম মান্য করো, যদি ঈমানদার হয়ে থাকো।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

> যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তাঁর (নাজিলকৃত কুরআনের) আয়াতসমূহ, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।[২৮০]

এখানে চিন্তা করলে দেখা যাবে—আয়াতে সরাসরি তাদের জিজ্ঞাসার জবাব আসেনি। মূল বিষয় থেকে সরে জবাব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে, আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তোমাদের কারও নয়; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। তাদের কর্তব্য, নিজেদের সৃষ্ট সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানা। এটা তাদের মূল দায়িত্ব ও কাজ। মাল ও দুনিয়ার পেছনে নিমগ্ন হয়ে থাকবে না। মাল ও দুনিয়ার প্রশ্নে তারা আল্লাহর ফয়সালার ওপর ভরসা করে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম আয়াত থেকে শিক্ষা নিলেন।

এ আয়াতের শিক্ষা নিয়ে তারা যখন অন্য মানুষ হয়ে উঠলেন, ঝগড়া সৃষ্টিকারী ব্যাপার (গনিমতের মাল-সম্পদ) থেকে বিমুখ হয়ে পড়লেন, তখন অন্য আয়াত নাজিল হলো। যেখানে গনিমত বণ্টনের বিশদ বিবরণ রয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার তাদের সূক্ষ্ম তরবিয়ত (শিক্ষা ও দীক্ষা) দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা : নবিজি সাহাবায়ে কিরামের সাথে বন্দিদের বিষয়ে পরামর্শে বসার পর ফিদয়া নেওয়ার ওপরই পরিশেষে সিদ্ধান্ত স্থির হয়। এর মাধ্যমে বন্দিদের সাথে কোমল ও নমনীয়তার আচরণ করা হয়। অবশ্য বন্দিদের ব্যাপারে দয়া কোমলতার এ পথে যাওয়াটাও ছিল সংগত। এর মাধ্যমে হয়তো তারা ঈমানও আনতে পারে। এবং মক্কায় তাদের ফেলে আসা মালে কাফিররা যে অন্যায় ভোগদখল বসিয়েছিল, তারও একটা প্রতিবিধান হয়ে যাবে। যা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার পথ তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করবে।

সাহাবায়ে কিরামের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো—এটা নবিজির তাদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করে। নবিজি এ স্নেহ-সহানুভূতির কারণেই

---

২৮০ সূরা আনফাল, আয়াত : ১-২

মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম যখন যুদ্ধে বের হচ্ছিলেন, তাদের মাঝে দরিদ্র্যতার নিষ্ঠুর ছাপ ফুটে উঠছিল, তখন আকাশপানে হাত উঠিয়ে দুআ করছিলেন—

اللّٰهُمَّ إنهم حفاة فاحملهم، اللّٰهُمَّ إنهم عراة فاكسهم ، و إنهم جياع فأشبعهم[১]

হে আল্লাহ, তারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। তাদের পোশাক নেই, পোশাকের ব্যবস্থা করে দিন। তারা ক্ষুধার্ত, তাদের পরিতৃপ্ত করান।"

কিন্তু হিকমতে ইলাহির (আল্লাহর প্রজ্ঞা) কামনা ছিল না, এত বড়ো একটা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুখ্য বা মানদণ্ড করা হবে না। বিপরীতে অনেক সমস্যা। প্রথমত এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এটা যেকোনো কাল ও অবস্থার জন্য মৌলিক মানদণ্ড। এর প্রভাব সামনের সবকিছুতে পড়বে। এখন প্রথম অভিজ্ঞতার সময়ই যদি এ দৃষ্টিভঙ্গি লালনকে সমর্থন করা হয়, তাহলে তা পরম্পরায় চলতে থাকবে। পরিশেষে একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির রূপ নেবে। এ রকম বড়ো বড়ো বিষয়গুলো—যেখানে দুনিয়ার কোনো ব্যাপার থাকা শোভা পায় না—এগুলোতে এসে সেই বস্তুবাদী দৃষ্টিই প্রতিফলিত হবে।

পরবর্তী সময়ে এ দৃষ্টি থেকে ফিরে আসাও সম্ভব না। যে দৃষ্টি দুনিয়ার সাথে মিশে যাবে, দুনিয়ার চাকচিক্যে হারিয়ে যাবে, তাকে সেখান থেকে তুলে আনা কঠিন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, ফিদয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আমি নবিজির নিকট গিয়ে দেখলাম, নবিজি ও আবু বকর দুজনই কাঁদছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কী জন্য আপনারা কাঁদছেন? আপনারা কাঁদতে পারলে আমিও কাঁদব। আর না পারলে কাঁদার চেষ্টাটুকু অন্তত করব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

তোমার সাথিরা ফিদয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে যে (কঠিন) অবস্থায় ফেলেছে, আমি সেজন্য কাঁদছি। তাদের প্রাপ্য শাস্তি এ গাছের (নবিজির নিকটবর্তী একটি গাছ) একদম নিকটে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে।

---

[১] (أبو داود . عن جمع الفوائد : ٢/٩٠) ২৮১

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল করেছেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

নবির পক্ষে উচিত নয় বন্দিদের নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো—অথচ আল্লাহ চান আখিরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

যদি একটি বিষয় না হতো, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ, সেজন্য বিরাট আজাব (শাস্তি) এসে পৌঁছত।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।[২৮২]

* * *

২৮২ সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৭-৬৯

বনু কাইনুকা : ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, বনু কাইনুকা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল এ রকম—

> নবিজি ইহুদি গোত্র কাইনুকার লোকজনকে কাইনুকা বাজারে সমবেত করে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরাইশদের যে রকম প্রতিশোধ নিয়েছেন, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে সে রকম প্রতিশোধের ভয় করো। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ, তোমরা জানো, আমি প্রেরিত নবি। এটা তোমরা নিজেদের কিতাবে পেয়েছ। তোমাদের নিকট (আমাকে প্রেরণের ব্যাপারে) আল্লাহর যেই ওয়াদা ছিল, তাতে তোমরা (আমার কথা) জেনেছ।
>
> এ কথা শুনে ইহুদিরা বলল—তুমি কী মনে করছ, আমরা তোমার সম্প্রদায়ের মতো (বোকা)? তুমি এ ধারণা করে ভুল করতে যেয়ো না যে, তুমি এমন জাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছ, যাদের যুদ্ধ-বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই; আর এই সুযোগটাকে তুমি কাজে লাগাবে। আল্লাহর শপথ! তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করলে, মনে রেখো আমরাও মানুষ। (অর্থাৎ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়ে তোমাদের শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব।)

এভাবেই মূলত ধীরে ধীরে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। ইবনে হিশাম আবু আওয়ানার সূত্রে বর্ণনা করেন—

আরবের এক নারী কিছু পণ্য নিয়ে এসে বনু কাইনুকার বাজারে বিক্রি করলেন। এরপর সে (নিজের কোনো প্রয়োজনে) এক স্বর্ণকারের কাছে এলেন। তারা (সমবেত দুষ্ট লোকেরা) চাইল, ওই নারী তার চেহারা উন্মুক্ত করুক; কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। এরপর স্বর্ণকার তার অগোচরে কাপড়ে গিঁট দিয়ে রাখল। এরপর ওই নারী যখন দাঁড়ালেন, তখন তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারা এটা উপভোগ করল। হাসল। এক মুসলিম ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে ওই স্বর্ণকারকে হত্যা করে ফেললেন। স্বর্ণকার ছিল ইহুদি। ফলে ইহুদিরা ওই মুসলিম ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে হত্যা করল। এরপর মুসলিম ব্যক্তির পরিবারের লোকজন অন্য মুসলিমদের (ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য) ডাকল। মুসলিমরা রেগে ছুটে এলেন। এভাবে দু-পক্ষের মাঝে যুদ্ধের আবহ তৈরি হলো। যুদ্ধ বাধল। ইহুদিদের মাঝে এরাই প্রথম মুসলিমদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে।[২৮৩]

তাবারি ও ওয়াকিদির বর্ণনামতে—

দ্বিতীয় হিজরিরর শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে এ ঘটনা ঘটে।[২৮৪]

...তাই নবিজি একটা সময় পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখেন। পরিশেষে বাধ্য হয়ে তারা নবিজির হুকুমের অধীনে আসে। (অর্থাৎ নবিজি যেই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তারা সেটা মেনে নেয়)।

এরপর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল (সে ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলছিল) নবিজির নিকট গিয়ে বলল—

মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের ব্যাপারে একটু ইহসান করো (ভালো ও সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত দাও।)

নবিজি তার কথাকে গুরুত্ব দেননি। দ্বিতীয়বার বললেও তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। এরপর উবাই নবিজির বর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে নবিজি বললেন—

ছেড়ে দাও।

---

২৮৩ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭

২৮৪ *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৮০; *তাবাকাতু ইবনি সাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৭)

নবিজির তখন প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। চেহারায় তার ছাপও ফুটে উঠছিল। তারপরও নবিজি আবারও বললেন—তোমার জন্য আফসোস, ছেড়ে দাও!

সে বলল—

> না, আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদের মিত্রদের ব্যাপারে ইহসান না করা পর্যন্ত ছাড়ব না...

অবশেষে নবিজি বনু কাইনুকাকে মদিনা বের হয়ে যাওয়ার আদেশ করেন। তাদের বলে দিলেন—তারা যেন মদিনার পাশেও না ঘেঁষে। এরপর তারা মদিনা থেকে বের হলো...

মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের মতো, ইহুদিদের সাথে সাহাবি উবাদা ইবনে সামিতও মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু এ ঘটনার পর তিনি আর এর ওপর অটল থাকেননি। ইহুদিদের সাথে করা চুক্তি ভঙ্গ করেন। তিনি নবিজির কাছে গিয়ে বললেন—

> আমি আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদেরই বন্ধুরূপে গ্রহণ করছি। এসব কাফিরদের সঙ্গে আমার যে মৈত্রীচুক্তি ছিল, তা থেকে এখন আমি নিজে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি।

তারা দুজনের ক্ষেত্রে আয়াত নাজিল হলো—

> ۞ يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَتَّخِذُوا اليَهودَ وَالنَّصٰرىٰ أَولِياءَ ۘ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم ۗ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدِى القَومَ الظّٰلِمينَ
>
> হে মুমিণগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না।
>
> يُسٰرِعونَ فيهِم يَقولونَ نَخشىٰ أَن تُصيبَنا دائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأتِىَ بِالفَتحِ أَو أَمرٍ مِن عِندِهِ فَيُصبِحوا عَلىٰ ما أَسَرّوا فى أَنفُسِهِم نٰدِمينَ

বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদের আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে—আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন। ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে।[২৮৫]

* * *

২৮৫ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫১-৫২

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এই ঘটনাটি থেকে মোটাদাগে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো—চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা জাতীয় বৈশিষ্ট্য শুরু থেকেই ইহুদিদের স্বভাবের অংশ ছিল। এরা যে সম্প্রাদায়েরই প্রতিবেশী হয়ে যেখানেই বসবাস করেছে, প্রতিটি সুযোগে তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রতারণার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। নিজেদের সমস্ত সম্পদ এবং উপায়-উপকরণ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন আর প্রতারণার মধ্যে ব্যবহার করতেই পাক্কা এরা। বনু কাইনুকার সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা থেকে যে শিক্ষা ও পাঠ অর্জিত হয়েছে, এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

এক. মুসলিম নারীর হিজাব

আমরা দেখেছি, বনু কাইনুকার সাথে বিবাদের ঘটনার আসল কারণ এটি ছিল যে, এক আরব মুসলিম নারী পাশের অঞ্চল থেকে কেনাবেচা করতে বনু কাইনুকার বাজারে এসেছিলেন। তিনি পুরোপুরি পর্দাবৃতা ছিলেন। এক ইহুদি সেই নারীর কাপড় টেনে তাকে বেপর্দা করে দেয়। যার প্রতিক্রিয়ায় পরিস্থিতি অবশেষে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। যুদ্ধের এ কারণটি বর্ণনা করেছেন ইবনে হিশাম।

অন্যদিকে সিরাতের অন্য বিশেষজ্ঞরা এর অন্য কারণ বর্ণনা করেছেন। সেটা হলো—বদর যুদ্ধে যখন মুসলিমরা বিজয় ও সাহায্য লাভে ধন্য হয়, ইহুদিদের পক্ষে সেটা বিশেষ হিংসা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে ওঠে। তারা বলতে আরম্ভ করে—ঈশ্বরের শপথ! আপনি যদি আমাদের সাথে লড়াই করেন, তবে জানতে পারবেন যে, আমরা কোন কিসিমের যুদ্ধবাজ লোক।

এই উভয় কারণের মধ্যে মূলত কোনো তফাত নেই। দুটি কারণ একসাথেই ঘটেছিল এবং প্রতিটি কারণ একে অপরের পক্ষে সম্পূরক হয়েছে। এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর ইহুদিরা যে নোংরা ভাষা ব্যবহার করছিল, তার ভিত্তিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ব্যাপারটি দূরবর্তী সম্ভাবনা ছিল। পক্ষান্তরে ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করার স্পষ্ট কাণ্ডকীর্তি প্রদর্শন করে দেখিয়েছিল, যেমনটা বর্ণিত হয়েছে ইবনে হিশামের বয়ানে। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, ইহুদিরা যখন এক মুসলিম নারীকে বেপর্দা করার ঘটনায় একজন মুসলিমকে শহিদ করেছিল, তখন ইহুদিরা কার্যতভাবেই সেই চুক্তিটি ভঙ্গ করে ফেলে। সুতরাং তখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

এই ঘটনাটি থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসেছে, তা হলো—ইসলামি শরিয়াহ নারীদের জন্য যে হিজাব বা পর্দা বিধান প্রবর্তন করেছে, তাতে পুরো মুখ ঢেকে দেওয়ারও হুকুম দেওয়া হয়েছে। যদি এই বিধান না থাকত, তবে পুরো মুখটি ঢেকে রাখার দরকার ছিল না। একইভাবে, যদি ইসলামি আইন গুরুত্ব সহকারে এ ব্যাপারে নির্দেশ না দিত, তবে সে নারী তার মুখটি অনাবৃত করেই আসত। ফলত সেই ইহুদির নারীকে চেহারা খোলার কথা বলতে হতো না। সেই নারী যেহেতু ইসলামি শরিয়ার বিধান মেনে আপন চেহারা আবৃত করে এসেছিল, যার ওপর ইহুদি লোকটি তার ধর্মীয় চেতনার ওপর আঘাত করে তাকে ক্রুদ্ধ করার জন্য নিজের ঘৃণ্য আচরণ প্রদর্শন করছিল!

এখানে বলা যেতে পারে, ইবনে হিশাম বর্ণিত বর্ণনায় তিনি একাই এটি বর্ণনা করেছেন; অন্য কোনো বর্ণনাকারী এটাকে বর্ণনা করেননি। এও বলা যেতে পারে, এ বর্ণনায় কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে; যার ভিত্তিতে এ ধরনের হুকুমে শক্তি তৈরি হয় না; কিন্তু এর উত্তরে বলা যায়—এ বিষয়ে এই ঘটনাটি ছাড়া আরও এমন অনেক হাদিস রয়েছে এবং যেগুলো সম্পর্কে অভিযোগ করার কোনো কারণ নেই।

এর মধ্যে একটি হলো আয়িশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত হাদিস; যা *বুখারি শরিফ*-এর অধ্যায় 'মা ইয়ালবাসু আল মুহরিম মিনাস সিয়াব'-এ ইমাম বুখারি নকল করেছেন। আয়িশা রা. বলেন—

মুহরিম (ইহরাম পরিহিতা) নারী না চেহারা আবৃত করবে, না বোরকা পরিধান করবে, আর না জাফরান রাঙানো পোশাক পরবে।[২৮৬]

নারীরা কি মুখ খোলা রাখবে নাকি পুরোটাই ঢেকে রাখবে

ইমাম মালিক রহ. তার *মুয়াত্তা* গ্রন্থে নাফি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন—আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, ইহরাম অবস্থায় কোনো নারীকে তার মুখ আবৃত করে রাখবে না!

এই হাদিসগুলোতে হজ চলাকালীন ইহরাম অবস্থায় কোনো নারীকে চেহারায় নিকাব করতে এবং বোরকা পরতে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে কেন? এবং এই নিষিদ্ধকরণ পুরুষদের ছাড়া বিশেষভাবে নারীদের জন্যই বা কেন?

ইহরাম অবস্থায় নারীর নিকাব করা, মুখ ঢাকা এবং বোরকা দিয়ে মুখ আবৃত করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, এ থেকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় যে, ইহরামের বাইরে সাধারণ পরিস্থিতিতে নারীকে ইসলামি শরিয়া নিকাব করা, মুখ ঢাকা এবং বোরকা দিয়ে চেহারা আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছে; যার কারণে হজ অবস্থায় উক্ত হুকুম থেকে বিশেষভাবে পৃথক সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই বিষয়ে একটি হাদিস ইমাম মুসলিম ও অন্যরাও বর্ণনা করেছেন—

> 'যখন ফাতিমা বিনতে কাইসকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে ইদ্দতের সময়কাল উম্মে শরিকের ঘরে কাটাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুনরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বার্তা পাঠান যে, যেহেতু উম্মে শরিকের ঘরে সাহাবিদের যাতায়াত হয়ে থাকে, সেহেতু তুমি ইদ্দতের সময়কাল তোমার চাচার ছেলে ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে অবস্থান করে অতিক্রম করো। কারণ, ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ; যদি তুমি সেখানে থাকার সময় কখনো (অতর্কিতে) নিজের চাদর সরিয়েও ফেলো, তবে সে তোমাকে দেখতে পাবে না।'

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ, যা পর্দা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, প্রমাণ করে যে, নারীর পক্ষে পরপুরুষের সামনে নিজের চেহারা ও শরীর আবৃত করা ওয়াজিব। একইভাবে

---

২৮৬ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪৬

ইসলামি শরিয়ত পরনারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া পুরুষদের পক্ষে হারাম করেছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদিস।

উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি রহ. বারিরাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে বলেছেন হে আলি, একবার কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি পড়ার পুনরায় দৃষ্টিপাত করবে না। কারণ, প্রথম দৃষ্টিপাতে তোমার জন্য অবকাশ বা ছাড় থাকলেও, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে তোমার জন্য অবকাশ নেই।

এ বিষয়ে একটি হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নহর দিবসে তাঁর সওয়ারির পেছনে বসিয়েছিলেন ফজল ইবনে আব্বাস রা.-কে। ফজল বারবার এক নারীর দিকে তাকাচ্ছিলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থুতনি ধরে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিয়ে নারীর দিকে তাকাতে বাধা দিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে—এই হাদিসগুলোতে দুটি নিষেধাজ্ঞা একত্রিত হয়েছে। একটি হলো, পরপুরুষের সামনে নারীকে তার মুখ খোলা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, চেহারা আবৃত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। অন্যটি হলো—পুরুষদেরও পরনারীর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট দলিল যে, পরপুরুষদের পক্ষে নারীদের চেহারা সতর অর্থাৎ আবৃত রাখা আবশ্যক এবং নারীও পরপুরুষদের সামনে আপন চেহারা আবৃত করতে বাধ্য। তবে কিছু ক্ষেত্রে চেহারা খোলার অনুমোদন রয়েছে। যেমন : চিকিৎসার প্রয়োজনে, জ্ঞান অর্জনে, সাক্ষী দেওয়ার জরুরতে এবং এ জাতীয় অন্য কোনো প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে।

কতিপয় আয়িম্মায়ে মাজহাবের মতে, নারীদের চেহারা এবং উভয় হাতের তালু পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এ অঙ্গদ্বয়ের আবৃতিকরণ ওয়াজিব নয়। আর উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ—যা পর্দার পক্ষে বক্তব্য হাজির করে, তারা সেগুলোর বিধানকে মুসতাহাব পর্যায়ের মনে করেন। অর্থাৎ চেহারা ও হাতের তালুর আবৃতিকরণ তাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত, ওয়াজিব নয়।

অবশ্য সকল ফকিহ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, কামনার চোখে কোনো নারীর দেহের কোনো অঙ্গের দিকেই দেখা জায়িজ নয়। তা ছাড়া যখন পাপাচার

সাধারণ হয়ে যায় এবং বেশির ভাগ লোক—যারা সাধারণত পাপের অভিপ্রায় আর কামনার চোখেই নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে নারীর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে নিজের চেহারা আবৃত করা ওয়াজিব।

বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়—পাপাচার, চরিত্রহীনতা, মূল্যবোধের অভাব তাদের মধ্যে এতটাই বেড়েছে যে, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নারীদের চেহারা প্রকাশ করার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। আমরা আজ যে যুগে বাস করছি, বলাই বাহুল্য যে, তা নেহাত খতরনাক এবং অবক্ষয় আক্রান্ত। কাজেই এর স্বাভাবিক দাবি হলো—নারীরা তাদের নিজস্ব সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য চলাফেরার ক্ষেত্রে আরও বেশি যত্নবান হবে এবং এজন্য যথাযথ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, যতক্ষণ না মুসলিমরা এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠে এবং নিজেদের সংকট নিজেরা সামাল দিতে সক্ষম হয়।

তো, সারকথা হলো—যারা ধর্মীয় বিষয়ে রুখসত ও সুযোগ-সুবিধার পথ অনুসরণ করেন, তাদের পদক্ষেপ মধ্যপন্থা থেকে পিছলে যায় এবং প্রকৃত ওয়াজিবাত ও ফারায়েজ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়ে। বস্তুত এটা তখন পর্যন্ত সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না সমাজের মধ্যে সামষ্টিক সেই ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি হয়, যা এই রুখসতসমূহকে সাধারণ ইসলামি ধারা অনুপাতে কন্ট্রোল করবে এবং সেগুলোকে শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমাপরিসীমা অতিক্রম করা থেকে নিরাপদ রাখবে।

এটি খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, কিছু লোক—যারা রুখসত এবং সুযোগ-সুবিধার অভিলাষী, তারা এটাকে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন—'সময়ের সাথে সাথে বিধিগুলোও পরিবর্তিত হয়।' এই লোকেরা এই উসুল থেকে শুধু নমনীয়তা, সুযোগ-সুবিধা এবং ফারায়েজ-ওয়াজিবাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগটাকেই নিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা যখন এর বিপরীত হয়, তখন তাদের এই বিধির প্রয়োগ-প্রাসঙ্গিকতা বিস্মৃতির শিকার হয়!

আমি এ ধরনের এমন কোনো উদাহরণ পাইনি, যেখানে বলা হয়েছে যে, সময়ের সাথে সাথে নিয়মগুলো পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এখন পরিস্থিতির দাবি এবং প্রয়োজনীয়তা হলো—নারী অবশ্যই নিজের চেহারা আবৃত করবে এবং স্খলন ও মন্দের আশঙ্কা বিবেচনায় জরুরি হচ্ছে, নারী চলাফেরার ক্ষেত্রে আরও অত্যধিক যত্নবান হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপ দেখেশুনে রাখবে। যতদিন না আল্লাহ মুসলিমদের জন্য উপযোগী ইসলামি সমাজের সুব্যবস্থা করে দেন।

দুই. ইহুদিরা বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখেছিল কেন

বনু কাইনুকার ইহুদিদের পক্ষ থেকে যে ঘটনা ঘটেছে, তা এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, ইহুদিদের অন্তরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষের বিষবহ্নি ছিল লুক্কায়িত। তবে প্রশ্ন ওঠে যে, তারা তাদের এই বিদ্বেষভাবাপন্নতাকে কেন প্রায় তিন বছর পর প্রকাশ করল? এবং কেন তারা এই মনোভাবকে নিজেদের ভেতর দাফন করে রাখল? ষড়যন্ত্রকে করে রাখল গোপন?

এর উত্তর হচ্ছে—আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন বদরের ময়দানে মুসলিমদের বিজয় ও সহায়তা দান করেছিলেন, তখন ইহুদিরা এর দ্বারা মুসলিমদের প্রতি আরও বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং অতঃপর তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা হিংসা ও হিংসার অনুভূতি পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ, ইহুদিরা মুসলিমদের ব্যাপারে এমন বিজয় ও সাহায্যের আশা করেনি, যা আল্লাহ পরাক্রমশালী তাদের বদরের ময়দানে দান করেছিলেন। তাই এটি দেখে ইহুদিদের অন্তর আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে, তাদের অন্তর্গত সেই হিংসা ও বিদ্বেষের উগ্রভাব কার্যতভাবেই উদগিরিত হয়। বরঞ্চ বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের পর থেকেই তাদের কথাবার্তা এবং তাদের মন্তব্যগুলো ঘৃণা ও শত্রুতার তির হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আঘাত হানতে শুরু করে।

ইবনে জারির আত-তাবারি বর্ণনা করেছেন—বদর যুদ্ধে বিজয়ের পরে মুসলিমরা যখন মদিনায় ফিরেছিলেন, তখন মদিনার এক ইহুদি মালিক ইবনে সাইফ কিছু মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল—তোমরা কুরাইশের ওপর যে বিজয় অর্জন করেছ, সেজন্য তোমরা কি ভুল ধারণার শিকার হওয়ার দরকার নেই। কারণ, তারা আসলে যুদ্ধ জানে না! যদি আমাদের সাথে এ জাতীয় লড়াইয়ের সুযোগ তৈরি হয়, তবে আমরা এর ওপর পাক্কা প্রত্যয়ী হয়ে এমন লড়াই করব যে, আমাদের সাথে লড়াইয়ে তোমাদের কোনো পাত্তাই থাকবে না!

যদি ইহুদিরা এই চুক্তি এবং অঙ্গীকারের যথাযথ রেসপেক্ট ও মূল্যায়ন করত—যা তাদের ও মুসলিমরা মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, তবে তারা মুসলিমদের সাথে খারাপ মন্তব্য করত না। আর না তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করত! কিন্তু সত্য হলো, তারা মন্দের পথে পা বাড়িয়েছিল, যার ভোগান্তি তাদের নিজেদেরই পোহাতে হয়েছিল!

তিন. ইসলামে মুনাফিকের সাথে আচরণ

এই ঘটনার পরে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যে কায়দায় ইহুদিদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এতে তার নিফাকের বিষয়টা আর গোপন থাকে না; বরং তার নিফাক সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সে একান্তই ভুংভাং লোকদেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে; কিন্তু তার অন্তরের গহিনে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা লালিত ছিল ঠিকই। তবুও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিমের মতোই তার সাথে আচরণ করেছিলেন। ইহুদিদের বিষয়ে সে যে দায় তুলে নিয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করেননি। আর না তার সাথে মুশরিক, মুরতাদ কিংবা মুনাফিকের ন্যায় আচরণ করেছেন; বরং তার নেতিবাচক আচরণের বিপরীতে ইতিবাচক জবাব প্রদর্শন করেছেন। উলামায়ে কিরাম ঐকমত্যও পোষণ করেছেন যে, দুনিয়াতে মুসলিমদের তরফ থেকে মুনাফিকের সাথে একজন মুসলিমের মতোই আচরণ করা হবে, এমনকি মুনাফিকের নিফাক যদি সুনিশ্চিতও হয়।

এর কারণ হচ্ছে, ইসলামের বিধিবিধানের সমষ্টিগতভাবে দুটি দিক রয়েছে —

- ০১. দুনিয়াবি
- ০২. পরকালীন

দুনিয়াবি দিক বিচারে মুসলিমরা সেই নির্দেশের অধীন যে, তারা সেই সকল দুনিয়াবি বিষয়াবলিকে নিজের এবং সমাজের ওপর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য এবং এই পার্থিব বিষয়গুলোর পরিচালক হলেন খলিফা ও রাজ্যপ্রধান, যার তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে এই বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হবে। পক্ষান্তরে অন্য যে বিষয়গুলো পরকালের সাথে সম্পৃক্ত, তা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত এবং তিনিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তকারী।

সুতরাং যে বিষয়সমূহ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত, সে সংক্রান্ত প্রতিটি বিধানের ফয়সালা হবে বাস্তববাদী; অনুভব যোগ্য দলিল-প্রমাণ অনুসারে এবং সেই সাক্ষ্য-প্রমাণ সাপেক্ষে বিধানবলির ফলাফল সাব্যস্ত হবে। এতে আবেগপূর্ণ ও আনুমানিক সূত্রধারার কোনো প্রভাব থাকবে না। অন্যদিকে আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত অন্তর্গত অনুভূতি এবং নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুসারে হবে। এই নীতির বয়ানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলের বাহ্যগত দিক বিবেচনায় তোমাদের হিসাব নেব।

হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন। একইভাবে শাইখাইন বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> তোমরা আমার কাছে তোমাদের বিতর্কের মীমাংসা করতে আসো, হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ তার প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আপন যুক্তি প্রদর্শনে অতিশয় বাকপটু হয়ে থাকে এবং আমি তার পক্ষে রায় দিয়ে দেব। তো যদি আমি কারও হকের পক্ষে তার ভাইয়ের ফয়সালা করি—যা আদতে তার হক ছিল না, তবে সে যেন তা থেকে কিছু না গ্রহণ করে। কারণ, তা তার পক্ষে আগুনের একটা খণ্ডস্বরূপ।

এ নীতির বৈধতার হিকমাহ ও প্রজ্ঞা হলো, জনগণের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং তা জনগণের মধ্যে খেলাধুলা হিসেবে গণ্য হওয়া থেকে নিরাপদ রাখা। কারণ, কিছু বিচারক কেবলমাত্র আবেগপূর্ণ ও অনুমানমূলক সাক্ষীকে পুঁজি করে অন্যায় ফয়সালার মাধ্যমে মানুষদের ভোগানোর ওসিলা বানিয়ে নিত।

এই বিধি মোতাবেক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ শরয়ি নিয়ম অনুসারে মুনাফিকদের সাথে বিনা বৈষম্যমূলক, মুসলিমদের সম আচরণ করতেন। অথচ তিনি ওহির মারফত মুনাফিকদের অনেক বিষয়-আশয় এবং তাদের অন্তরের গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা এই সত্যের বিরোধিতা করে না যে, মুসলিমরা মুনাফিক সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবে এবং তাদের কাজ-কারবার ও পদক্ষেপ তৎপরতা সম্পর্কে সোচ্চার থাকবে। এটি সব সময় এবং সব জায়গাতেই মুসলিমদের মৌলিক দায়িত্বসমূহের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

চার. অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব

যদি আমরা পূর্বের ঘটনার আইনি ও শরয়ি পরিণতি সম্পর্কে বিবেচনা করি এবং কুরআনের আয়াতসমূহ—যা উক্ত ঘটনার পরিপরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে তা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা জানতে পারি—কোনো মুসলিমের পক্ষে অমুসলিমকে তার অভিভাবক এবং বন্ধু বানানো বৈধ নয়। অর্থাৎ, তাকে এরূপ বন্ধু, যা অভিভাবকত্ব এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার দায়দায়িত্ব আরোপিত হয়। এটি ইসলামি বিধিগুলোর মধ্যে সেই বিধান, যা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই।

এই হুকুম সম্পর্কে কুরআনের অনেক স্পষ্ট আয়াত রয়েছে এবং এই নির্দেশের গুরুত্বারোপে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের সংখ্যা মা'নবি তাওয়াতুর (অর্থগত পারম্পর্য, যা অকাট্য) অবধি পৌঁছেছে। সেসব দলিল এখানে উল্লেখ করার মওকা নেই। এগুলো প্রত্যেক গবেষক ও অনুসন্ধানীর কাছে স্পষ্ট এবং সুপরিচিত।

এই উপর্যুক্ত বিধান থেকে স্রেফ একটি অবস্থা ব্যতিক্রম। আর তা হলো—যখন মুসলিমগণ তাদের চরম দুর্বলতার কারণে তাদের সাথে এ ধরনের চুক্তি করতে বাধ্য হয়, সে পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা তাদের রুখসত দিয়েছেন। বলেছেন—

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

> মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের অভিভাবক (বা অন্তরঙ্গ বন্ধু)-রূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোনো ভয় আশঙ্কা করো...[২৮৭]

এখানে আরও লক্ষণীয় যে, অমুসলিমদের সাথে মুওয়ালাত (সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব) নিষিদ্ধ করার অর্থ অর্থ এই নয় যে, তাদের ঘৃণা করা হবে। কারণ, একজন মুসলিমকে যেকোনো মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারটাও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারও প্রতি রাগ করা এবং অকারণে কাউকে ঘৃণা করার মধ্যে বড়ো পার্থক্য রয়েছে ।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারও ওপর রাগ হওয়ার কারণ হলো—একজন অমুসলিম বা যেকোনো ব্যক্তির মধ্যে এ জাতীয় মন্দ কর্ম রয়েছে, যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়; এজন্য সেই মন্দ কাজের কারণে তার ওপর রাগ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। তবে কোনো শরয়ি কারণ ছাড়া, তার কর্ম-তৎপরতা ইত্যাদি বিবেচনা না করেই, কেবল ব্যক্তিগত কারণে কোনো ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা ও হিংসা পোষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

২৮৭ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৮

পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করতে হবে—এটা শরিয়তের একটা মূলনীতি। যা অবহেলা করার সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেখানে কুরআন সুন্নাহর প্রমাণিত নস রয়েছে , সেখানে পরামর্শের মূল্য নেই। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্তের সুযোগ নেই। এখানে নসটাই হবে ধর্তব্য।

♦ **দুই.** এখানে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ, চুক্তিসন্ধি ইত্যাদির ব্যাপারে বিশদ শিক্ষা রয়েছে। ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করি—

শরিয়তে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়া মৌলিকভাবে এমন অকাট্য হুকুম; যাতে নসখ (রহিত হওয়া) বা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। ঠিক একইভাবে শরিয়তে বিধিবদ্ধ সন্ধি চুক্তি ইত্যাদিকেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সবগুলোই মানতে হবে। তবে এসবের প্রায়োগিক ক্ষেত্র বিভিন্ন হবে। সময়-কাল, মুসলিম-কাফিরদের অবস্থা-আবহ ইত্যাদি ভেদে এর প্রায়োগিক ক্ষেত্র ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে কষ্টিপাথর হবেন ন্যায়পরায়ণ ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ইসলামি রাজনীতিতে অভিজ্ঞ; বিভিন্ন বিষয়ে মুসলিমদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের নিরঙ্কুশ মানসিকতার অধিকারী (ইসলামি) রাষ্ট্রপ্রধান।

শাসক যদি মনে করেন—এখন যুদ্ধ না করাই ভালো এবং তার এই মনে করা বা সিদ্ধান্তটা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয় না—এমন পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষের সাথে সন্ধি করে নিতে পারেন। তবে যদি সন্ধির পর পরিস্থিতি পালটে যায়, যুদ্ধের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়, তখন বিধান ভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে শরয়ি সিয়াসতের (ইসলামি রাজনীতি) দৃষ্টিকোণ থেকে যদি যুদ্ধে কোনো কল্যাণ দেখেন, তাহলে জনগণকে জিহাদে বাধ্য করতে পারবেন। এটা ফুকাহায়ে কিরামের সবার মতামত। নবি-জীবনে এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। তবে কাফিররা যখন মুসলিম দেশ-শহরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা থাকলে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে তাদের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন অনুসারে ব্যাপকভাবে মুসলিম নারী-পুরুষ সবার জন্য আবশ্যক।

পরামর্শ 'করা' আবশ্যক নাকি 'গ্রহণ করা' আবশ্যক

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালার জন্য কোনো পাপী, অপরাধী বা অবিশ্বাসীর জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া আসলে তার প্রতি করুণারই ফলশ্রুতি। কারণ, মুমিনের গৌরব হলো, মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করেন, অন্য সমস্ত লোকের জন্যও তা পছন্দ করেন। একজন মুসলিম তো নিজের জন্য এটাই পছন্দ করেন যে, যেন সে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাতের অনন্ত সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তো যখন একজন মুমিন-মুসলিম আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য কারও প্রতি তার ক্রোধ পোষণ ও রাগ প্রকাশ করে, তখন সেখানে আসল উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এই পাপী, অপরাধী বা এই কাফির যেন তার গুনাহ ও পাপাচারকে ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ মেনে চলে, যাতে পরকালে জাহান্নামের আজাব থেকে নিরাপদ থাকে এবং জান্নাত লাভের অধিকারী হয়।

এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহর পক্ষে কারও ওপর ক্রুদ্ধ হওয়ায়—যেন সে সঠিক পথে এসে যায়—ব্যক্তিগত শত্রুতা বা বিদ্বেষের কোনো উপাদান মজুদ নেই; বরং পরিণামের বিচারে এটি ভালো বলেই প্রমাণিত হয়।

এটা এমনই, যেমন একজন পিতা, যিনি তার পুত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কিংবা একজন ভাই নিজের ভাইকে বিপথগামিতা থেকে বাঁচানোর জন্য কঠোরতা প্রদর্শন করেন, যাতে সে জীবনপথে সফল ও সমৃদ্ধ হতে পারে এবং নিজের স্বল্প বুঝ ও অনভিজ্ঞতার কারণে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে তার ভাগ্য নষ্ট না করে দেয়। এ কঠোরতাকে কেউ ঘৃণা হিসেবে গণ্য করে না।

একইভাবে, কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। কারণ, তাদের ওপর আরোপিত এই কঠোরতার ভেতরে আদতে তাদের সংশোধনই নিহিত আছে। এবং নিঃসন্দেহে এটা তাদের প্রতি সমবেদনা ও করুণারই ফলস্বরূপ। যেমন : জনৈক কবি বলেছেন—

> তোমরা কঠোরতা করো, যেন তারা ফিরে আসতে পারে। যে করুণা দেখায়, তার পক্ষে তাদের প্রতি কঠোরতাও দেখানো উচিত, যাদের প্রতি সে করুণা করে।

এখানে এও লক্ষ্য করা উচিত যে, কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করার অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে কৃত চুক্তিগুলোর সম্মান করা হবে না বা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাদের সাথে কোনো রকম বাড়াবাড়ি বা অপব্যবহার করা হবে; বরং সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক—

মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে সিদ্ধান্ত ও চুক্তি, ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার ওপর ভিত্তি করেই হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের প্রতি রাগ-গোস্সা বা কঠোরতা দেখানোর মর্ম এটা কখনোই নয় যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করা হবে। আল্লাহ বরং সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের ওপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো ,আল্লাহ তার খবর রাখেন।[২৮৮]

এই পুরো আলোচনার উদ্দেশ্য হলো—মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য জাতির তুলনায় একটি পৃথক জাতি এবং একটি স্বতন্ত্র উম্মাহ। যেমন, ইতঃপূর্বে মদিনা সংবিধানে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাজেই মুসলিমদের বন্ধুত্ব, গভীর সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাসমূহ কেবল এবং কেবলই নিজের উম্মাহ ও জাতির মধ্যে হতে হবে। তবে হ্যাঁ, অন্যান্য জাতির সাথে লেনদেন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং তা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার, সমস্ত মানবতার কল্যাণকামিতা, হিদায়াত ও সংশোধনকে ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

* * *

২৮৮ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৮

গাজওয়ায়ে উহুদ

হুবশি পর্বতের নিচে...

বদর যুদ্ধের পর যেসব কুরাইশ নেতা জীবিত ছিল, তারা সবাই মিলে বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করল। নবিজির সাথে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা থেকে আর্থিক সাহায্য নেবে। কুরাইশরা সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হলো। অন্যরাও তাদের সাথে শরিক হলো (যাদের 'আহাবিশ' বা সম্মিলিত দল বলা হয়। এ দলটি কুরাইশ কিনানা, খুজাআ গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত। তারা মক্কার 'হুবশি' পর্বতের নিকট একত্র হয়েছিল। এজন্য তাদের 'আহাবিশ' বলা হয়।) সঙ্গে নারীদেরও নিল। মুসলিমদের আক্রমণের কারণে যদি পুরুষরা পলায়ন করতে চায়, তাহলে নারীরা তাদের বাধা দেবে, আটকে রাখবে। তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো।

নবিজি এ সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হলে তাদের ঐচ্ছিকভাবে ছেড়ে দিলেন, কেউ ইচ্ছা করলে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে, আবার না নিয়ে মদিনায়ও থেকে যেতে পারে। যারা মদিনায় থাকবে, কাফিরদের পক্ষ থেকে মদিনার ভেতরে আক্রমণ হলে তারা তার প্রতিরোধ করবে। বয়স্কদের সিদ্ধান্ত ছিল, মদিনা থেকে বের না হওয়ার। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়েরও এ মত ছিল। তবে যারা বদরে অংশ নিতে পারেননি, তারা মদিনা থেকে বের হয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তারা নবিজিকে বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের শত্রুদের নিকট নিয়ে চলুন; তারা আমাদের কাপুরুষতা বা দুর্বলতা কখনোই দেখবে না।...

নবিজি তাদের সাথে একমত হওয়া পর্যন্ত এসব উৎসাহী সাহাবায়ে কিরাম পীড়াপীড়ি করে যেতে থাকলেন। অবশেষে নবিজি ঘরে ঢুকলেন। বর্ম পরিধান করলেন। অস্ত্রে সজ্জিত হলেন। এ সময় যারা নবিজিকে পীড়াপীড়ি করেছিলেন, তাদের কাছে মনে হলো, তারা নবিজির অনিচ্ছাকৃত বিষয়ে তাঁকে বাধ্য করেছেন। ফলে নিজেরা কেমন লজ্জা অনুভব করলেন।

নবিজি তাদের সামনে এলে তারা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনাকে আমরা বাধ্য করে ফেললাম! আসলে আমাদের জন্য এটা উচিত হয়নি। এখন আপনি ভালো মনে করলে যদি না বেরোতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> কোনো নবি যখন বর্ম (যুদ্ধাস্ত্র) গায়ে জড়িয়ে ফেলেন, তখন যুদ্ধ করা পর্যন্ত তাঁর জন্য তা খুলে ফেলা উচিত নয়।[২৮৯]

***

হিজরতের বত্রিশ মাসের (৩য় হিজরি) মাথায় শাওয়ালের সাত তারিখের পর শনিবার মদিনা থেকে এক হাজার মুসলিম সৈন্য (যাদের সাথে মুনাফিকরাও ছিল) নিয়ে নিয়ে বের হন।[২৯০]

সৈন্যরা যখন মদিনা ও উহুদের মাঝামাঝি, তখন তিনশত সৈন্য নিয়ে ইবনে উবাই 'তিনি তো আমাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত করেছেন। কাঁচা বুদ্ধির অধিকারী অল্পবয়সিদের কথা কানে নিয়েছেন। কীসের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতে যাব, জানি না'—এ কথা বলে ফিরতি পথ ধরল। তাদের পেছনে ছুটে আবদুল্লাহ ইবনে হারাম তাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলেন, তারা যেন তাদের নবিকে ছেড়ে না যায়; কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন মুনাফিক নেতা উবাই বলল—

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنٰكُمْ

---

২৮৯ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। তাবারিও কাছাকাছি বর্ণনা এনেছেন। দেখুন—*সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০০; *তারতিবু মুসনাদিল ইমাম আহমাদ*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৫২

২৯০ *তাবাকাতু ইবনি সাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৭; *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২

আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।[২৯১]

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন—

যারা মুসলিমদের ছেড়ে গিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে মুসলিমদের মাঝে ইখতিলাফ শুরু হলো। একদল বললেন, আমরা তাদের হত্যা করব। আরেক দল বললেন—না, হত্যা করার দরকার নেই।[২৯২]

এ পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাজিল হলো—

فَما لَكُم فِي المُنٰفِقينَ فِئَتَينِ وَاللَّهُ أَركَسَهُم بِما كَسَبوا ۚ أَتُريدونَ أَن تَهدوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبيلًا.

অতঃপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু-দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে! তোমরা কি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাও, যাদের আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।[২৯৩]

ইহুদি ও মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। তাই কোনো কোনো সাহাবি পরামর্শ দিলেন, ইহুদিদের সাহায্য নেওয়া হোক; কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

আমরা আহলুস শিরকের (আল্লাহর সঙ্গে যারা শিরক করে) বিরুদ্ধে আহলুস শিরকের সাহায্য নেব না।[২৯৪]

সাহাবায়ে কিরাম (তখন তাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাতশ) উহুদের একটি উপত্যকায় সেনাছাউনি ফেললেন। পেছনে উহুদ, সামনে মদিনা। মুসলিমদের পেছন দিকে উহুদ পাহাড়ের চূড়ায় ৫০ জন তিরন্দাজের একটি বাহিনী রাখলেন। নবিজি

---

২৯১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৭

২৯২ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩১

২৯৩ সূরা নিসা, আয়াত : ৮৮

২৯৪ *তাবাকাতু ইবনি সাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮০; ইবনে ইসহাকও এ রকমই বর্ণনা করেছেন। *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে তাদের আমির নিযুক্ত করে বললেন—

> তোমরা তোমাদের এ নির্ধারিত স্থানে থেকে আমাদের পেছনের দিক রক্ষা করবে। (এদিকে প্রতিরোধ করবে)। আমাদের বিজয় হতে দেখলে তোমরা আমাদের সাথে শরিক হতে যাবে না, আর পরাজিত হতে দেখলেও আমাদের সাহায্য করতে যাবে না।[২৯৫]

পনেরো বছরের দুই বালক। রাফে ইবনে খাদিজ ও সামুরা ইবনে জুনদুব। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাদের বয়স অল্প হওয়াতে নবিজি তাদের এ আবেদন নাকচ করে দেন। নবিজিকে বলা হলো—ইয়া রাসুলাল্লাহ, রাফে তো যেতেই চাচ্ছে। নবিজি তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তখন সামুরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো রাফেকে কুস্তি লড়াইয়ে হারিয়ে দিই। (সুতরাং আমাকেও অনুমতি দেন) নবিজি তাকেও অনুমতি দিলেন।

:♦: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন—কে এই তলোয়ার হাতে নিয়ে তার যথাযথ হক আদায় করবে?

আবু দুজানা তখন সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন—আমি। আমি তা নিয়ে তার হক আদায় করব।

নবিজি তাকে দিলেন। আবু দুজানা এরপর মাথায় লাল পট্টি বেঁধে[২৯৬] সদর্পে (শত্রুদের) কাতারে হাঁটতে লাগলন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, এ স্থান (যুদ্ধ) ছাড়া অন্য কোনো স্থানে এ রকম সদর্পে হাঁটাকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন।'[২৯৭]

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইরের হাতে পতাকা দেন। মুশরিকদের ডানে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, বাঁয়ে ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

---

২৯৫ *তাবাকাতু ইবনি সাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮০; ইবনে হিশামও এরূপ কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা এনেছেন। বুখারি রহ.-ও এ রকম বর্ণনা করেন; *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৯

২৯৬ মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যত যুদ্ধ করেছেন, তার অভ্যাস এ রকমই ছিল।

২৯৭ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৩; মুসলিমও হাম্মাদ ইবনে সালামার মতো এ রকমই বর্ণনা করেন। তবে মুসলিমের বর্ণনায় 'এ স্থান (যুদ্ধ)...' এ অংশটি নেই। দেখুন, *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৫

:♦: দুই পক্ষের প্রচণ্ড লড়াই শুরু হলো। রণাঙ্গান সরগরম। মুসলিমরা কাফিরদের কচুকাটা শুরু করলেন। অগ্রনায়কদের মাঝে আছেন আবু দুজানা, হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মুসআব ইবনে উমাইর।

নবিজির সামনেই মুসআব শহিদ হলেন। পতাকা নিলেন আলি রা.। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল। মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের হত্যা করছিলেন আর গনিমত কুড়াচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের চূড়ায় থাকা সাহাবিগণ এ মুহূর্তে এখানে থাকা না থাকার ব্যাপারে ইখতিলাফ (মতানৈক্য) শুরু করলেন। একদল বললেন, আমাদের এখানে থাকতে হবে। আরেক দল বললেন, এখন আর এখানে থাকা লাগবে না। অধিকাংশই নেমে গেলেন। তারা ভাবলেন, যুদ্ধ তো এখন শেষই। গিয়ে তারাও গনিমত কুড়াতে শুরু করলেন; কিন্তু ইবনে জুবাইর নবিজির কথায় অটল। তিনি বললেন, আমি নবিজির কথার বিপরীত করব না।

ওদিকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (যিনি তখনও মুসলমান হননি) পাহাড়ের ওপর এ অল্পসংখ্যক মুসলিম দেখে ঘোড়া নিয়ে এদিকে ফিরলেন। ইকরিমা তার সঙ্গী হলো। তারা মুসলিমদের আমিরসহ একে একে সবাইকে হত্যা করল। এরপর তারা পেছনের দিক থেকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ শুরু করল।[২৯৮]

:♦: মুসলিমরা এই আকস্মিক আক্রমণে ভড়কে গেলেন। তারা এলোমেলোভাবে যুদ্ধ করতে থাকলেন। মুশরিকরা মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছিল। এমনকি নবিজি পর্যন্ত এসে এ আক্রমণের রেশ পড়ল। নবিজির ডান দিকে পাথর এসে পড়ল। রুবায়ি দাঁতে আঘাত লাগল। চেহারাও আঘাতপ্রাপ্ত হলো। নবিজির চেহারা থেকে তখন রক্ত বেরুচ্ছিল। নবিজি তা মুছছিলেন আর বলছিলেন—ওই সম্প্রদায় কীভাবে সফল হবে, যারা আল্লাহর পথে ডাকার অপরাধে নিজেদের নবির চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে?

আলি রা. পানি ঢালছিলেন, আর ফাতিমা রা. রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। এরপর যখন ফাতিমা রা. দেখলেন রক্ত আরও বেশি বেরোচ্ছে, তখন চাটাইয়ের একটি টুকরা জ্বালিয়ে ছাই করে তা নবিজির ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। তখন রক্ত বন্ধ হলো।[২৯৯]

---

২৯৮ তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৮৩; বুখারি, কিতাবুল জিহাদে বারা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

২৯৯ *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*। দুজনের বর্ণনার শব্দ প্রায় কাছাকাছি।

:♦: এ ভয়াল অবস্থার মাঝে নবিজিকে হত্যা করা হয়েছে—এই সংবাদ রটল। এ ভুয়া সংবাদ মুসলিমদের হৃদয় ভাঙচুর করে দেয়। অনেক দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি এতে বেশ প্রভাবিত হন। তারা বলতে লাগলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলে আমরা এখানে থেকে কী করব?

তারা পালাতে শুরু করলেন। আনাস ইবনেন নজর বলতে লাগলেন—বরং নবিজির পরে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ নেই। এরপর তিনি কোনো কোনো দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি ও মুনাফিকদের দিকে ইশারা করে বললেন—হে আল্লাহ, তারা যা বলছে, আমি এ থেকে মুক্ত। তারা যা বলছে, আমি এজন্য আপনার কাছে ওজর প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তলোয়ার নিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[৩০০]

:♦: উহুদ যুদ্ধের ও ভয়াল অবস্থার মাঝে নবিজির পাশে থাকা সাহাবায়ে কিরাম নবিজির জন্য উৎসর্গের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। নবিজির ভালোবাসায় তারা নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন—

> উহুদ যুদ্ধের দিন মানুষরা (মুসলিমরা) পরাজিত হয়ে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে যাচ্ছিল, তখন আবু তালহা রা. নবিজির সামনে তার একটি ঢাল দিয়ে ঢাল হয়ে প্রতিরোধ করছিলেন। আবু তালহা ছিলেন একজন ভালো তিরন্দাজ, যুদ্ধে ছিলেন খুব পটু । নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু উঁচু হয়ে মুসলিমদের অবস্থা দেখছিলেন। আবু তালহা তখন বলেন—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি উঁচু হয়ে দেখবেন না । কাফিরদের তির এসে বিদ্ধ হবে। আপনার গলা কাটার পরিবর্তে আমার গলাকাটা যাবে (অর্থাৎ আপনার হত্যার পরিবর্তে আমাকে হত্যা করা হবে।)[৩০১]

আবু দুজানা রা.; তিনি একদম নুয়ে নবিজির সামনে ঢাল হয়ে কাজ করছিলেন। একের পর এক তির তার পিঠে এসে বিদ্ধ হচ্ছিল। জিয়াদ ইবনে সাকানও নবিজির সামনে ঢাল হয়ে কাজ করেন। তিনি নিহত হলেন। তার সঙ্গে পাঁচজন নিহত হলো। ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী, তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন উমারা ইবনে ইয়াজিদ ইবনে সাকান। তিনি নবিজির প্রতিরক্ষায় লড়তে লড়তে এক পর্যায়ে আহত হয়ে পড়লেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তাকে আমার

---

৩০০ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

৩০১ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৩

নিকট নিয়ে আসো। (নবিজির কাছে নিয়ে এলে) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পায়ে তার মাথা রাখলেন। এরপর আহত সাহাবি মারা গেলেন। তখন তার গাল ছিল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের ওপর রাখা।

:♦: যুদ্ধ একপর্যায়ে শেষ হয়ে এলো। মুশরিকরা বিজয়ের খুশিতে দম্ভভরে ফিরছিল। এদিকে যুদ্ধের ময়দানে আতঙ্ক। এদিক-সেদিকে পড়ে আছে লাশ। হামজা, ইয়ামান, আনাস ইবনে নাজার, মুসআব ইবনে উমায়ের ও অন্যান্যরা। নবিজি হামজার হত্যায় সবচেয়ে বেশি ব্যথিত হলেন। তাকে মুসলা (হত্যার পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত) করা হয়েছে। পেট ফাঁড়া হয়েছে, নাক-কান কাটা হয়েছে। নবিজি শহিদদের দুজনকে একটি কাফনে ঢুকিয়ে বলছিলেন—তাদের মধ্য থেকে কে কুরআনকে বেশি সংরক্ষণকারী (বা কুরআনের ব্যাপারে বেশি আমলকারী)? যার ব্যাপারে বলা হতো, তাকে আগে কবরে রাখতেন। এরপর তিনি বললেন—

> আমি কিয়ামতের দিন এদের সাক্ষী হব। রক্তসহই তাদের দাফন করতে আদেশ দিলেন। তাদের গোসলও দেওয়া হয়নি, সালাতও পড়া হয়নি।[৩০২]

:♦: মুসলিমদের পরাজয়ে ইহুদি ও মুনাফিকরা বেশ খুশি প্রকাশ করল। ইবনে উবাই ও তার সঙ্গীরা মুসলিমদের বলা শুরু করল—তোমরা আমাদের কথা মানলে তোমাদের কেউ নিহত হতো না।

এরপর তারা নবিজির সম্ভাব্য বিজয় নিয়ে কথা বলা শুরু করল। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকসহ ইহুদিদের ভয় দেখিয়ে আয়াত নাজিল করেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের যা যা ঘটেছে, এর হিকমতও বর্ণনা করেছেন। কুরআনের বর্ণনায় উহুদ যুদ্ধের চিত্র এভবে তুলে ধরা হয়েছে—

> وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
>
> আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকালবেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শোনেন ও জানেন।[৩০৩]

---

৩০২ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৯

৩০৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২২

إِذ هَمَّت طائِفَتانِ مِنكُم أَن تَفشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ

যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারানোর উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর ওপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত।[৩০৪]

وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ.

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।[৩০৫]

إِن يَمسَسكُم قَرحٌ فَقَد مَسَّ القَومَ قَرحٌ مِثلُهُ ۚ وَتِلكَ الأَيّامُ نُداوِلُها بَينَ النّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ الَّذينَ ءامَنوا وَيَتَّخِذَ مِنكُم شُهَداءَ ۗ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظّٰلِمينَ.

তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।[৩০৬]

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذينَ ءامَنوا وَيَمحَقَ الكٰفِرينَ

আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদের পাক-সাফ করতে চান এবং কাফিরদের ধ্বংস করে দিতে চান।[৩০৭]

أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمّا يَعلَمِ اللَّهُ الَّذينَ جٰهَدوا مِنكُم وَيَعلَمَ الصّٰبِرينَ.

---

৩০৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১২২
৩০৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯
৩০৬ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪০
৩০৭ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪১

তোমাদের কী ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।[৩০৮]

وَلَقَد صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعدَهُ إِذ تَحُسّونَهُم بِإِذنِهِ ۖ حَتّىٰ إِذا فَشِلتُم وَتَنٰزَعتُم فِى الأَمرِ وَعَصَيتُم مِن بَعدِ ما أَرىٰكُم ما تُحِبّونَ ۚ مِنكُم مَن يُريدُ الدُّنيا وَمِنكُم مَن يُريدُ الءاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُم عَنهُم لِيَبتَلِيَكُم ۖ وَلَقَد عَفا عَنكُم ۗ وَاللَّهُ ذو فَضلٍ عَلَى المُؤمِنينَ.

আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে, তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারওবা কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। বস্তুত তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।[৩০৯]

إِذ تُصعِدونَ وَلا تَلوۥنَ عَلىٰ أَحَدٍ وَالرَّسولُ يَدعوكُم فى أُخرىٰكُم فَأَثٰبَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيلا تَحزَنوا عَلىٰ ما فاتَكُم وَلا ما أَصٰبَكُم ۗ وَاللَّهُ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ.

আর তোমরা ওপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারও প্রতি, অথচ রাসুল ডাকছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের ওপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না করো এবং যার সম্মুখীন হচ্ছ, সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।[৩১০]

---

৩০৮ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪২
৩০৯ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫২
৩১০ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৩

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيكُم مِن بَعدِ الغَمِّ أَمَنَةً نُعاسًا يَغشىٰ طائِفَةً مِنكُم ۗ وَطائِفَةٌ قَد أَهَمَّتهُم أَنفُسُهُم يَظُنّونَ بِاللَّهِ غَيرَ الحَقِّ ظَنَّ الجٰهِلِيَّةِ ۖ يَقولونَ هَل لَنا مِنَ الأَمرِ مِن شَيءٍ ۗ قُل إِنَّ الأَمرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخفونَ فى أَنفُسِهِم ما لا يُبدونَ لَكَ ۖ يَقولونَ لَو كانَ لَنا مِنَ الأَمرِ شَيءٌ ما قُتِلنا هٰهُنا ۗ قُل لَو كُنتُم فى بُيوتِكُم لَبَرَزَ الَّذينَ كُتِبَ عَلَيهِمُ القَتلُ إِلىٰ مَضاجِعِهِم ۖ وَلِيَبتَلِيَ اللَّهُ ما فى صُدورِكُم وَلِيُمَحِّصَ ما فى قُلوبِكُم ۗ وَاللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ.

অতঃপর তোমাদের ওপড়র শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মতো। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো। তারা বলছিল—আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই?

তুমি বলো, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে, তোমার নিকট প্রকাশ করে না সেসবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে, যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে, তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে, তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন।[৩১১]

إِنَّ الَّذينَ تَوَلَّوا مِنكُم يَومَ التَقَى الجَمعانِ إِنَّمَا استَزَلَّهُمُ الشَّيطٰنُ بِبَعضِ ما كَسَبوا ۖ وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنهُم ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفورٌ حَليمٌ.

তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের দরুন।[৩১২]

---

৩১১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৪

৩১২ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৫

يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَكونوا كَالَّذينَ كَفَروا وَقالوا لِإِخوٰنِهِم إِذا ضَرَبوا فِي الأَرضِ أَو كانوا غُزًّى لَو كانوا عِندَنا ما ماتوا وَما قُتِلوا لِيَجعَلَ اللَّهُ ذٰلِكَ حَسرَةً فى قُلوبِهِم ۗ وَاللَّهُ يُحيۦ وَيُميتُ ۗ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ.

হে ঈমাণদারগণ, তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কাফির হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে—তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, তাহলে মরতও না আহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন।[৩১৩]

أَوَلَمّا أَصٰبَتكُم مُصيبَةٌ قَد أَصَبتُم مِثلَيها قُلتُم أَنّىٰ هٰذا ۖ قُل هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে—এটা কোথা থেকে এলো? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।[৩১৪]

وَما أَصٰبَكُم يَومَ التَقَى الجَمعانِ فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيَعلَمَ المُؤمِنينَ.

আর যেদিন দুই দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে, তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদের জানা যায়।[৩১৫]

---

৩১৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৬
৩১৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৭
৩১৫ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৬

وَلِيَعلَمَ الَّذينَ نافَقوا ۚ وَقيلَ لَهُم تَعالَوا قٰتِلوا فى سَبيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَعوا ۖ قالوا لَو نَعلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعنٰكُم ۗ هُم لِلكُفرِ يَومَئِذٍ أَقرَبُ مِنهُم لِلإيمٰنِ ۚ يَقولونَ بِأَفوٰهِهِم ما لَيسَ فى قُلوبِهِم ۗ وَاللَّهُ أَعلَمُ بِما يَكتُمونَ.

এবং তাদের যাতে শনাক্ত করা যায়—যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদের বলা হলো—এসো আল্লাহর রাহে লড়াই করো কিংবা শত্রুদের প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরির কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুত আল্লাহ ভালোভাবে জানেন—তারা যা কিছু গোপন করে থাকে।[৩১৬]

الَّذينَ قالوا لِإِخوٰنِهِم وَقَعَدوا لَو أَطاعونا ما قُتِلوا ۗ قُل فَادرَءوا عَن أَنفُسِكُمُ المَوتَ إِن كُنتُم صٰدِقينَ.

ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে—যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হতো না। তাদের বলে দিন—এবার তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৩১৭]

:♦: শনিবার সন্ধ্যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ থেকে ফিরলেন। তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম মদিনায় রাত যাপন করলেন। মুসলিমরা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করলেন। রবিবারে ফজরের সালাত আদায়ের পর বিলালকে আদেশ করলেন, তিনি যেন এ ঘোষণা দেন—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের শত্রুর অনুসন্ধানে বের হতে আদেশ করেছেন। তবে এবার আমাদের সাথে তারাই থাকবে; যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।...'

পতাকা এখনও খুলে রাখা হয়নি। নবিজি পতাকা নিয়ে আসতে বললেন। পতাকা দিলেন আলি রা.-এর হাতে। সাহাবায়ে কিরাম এই ক্ষতবিক্ষত নিশ্চল দেহ নিয়েই বের হলেন। হামরাউল আসাদ (মদিনা থেকে দশ মাইল দূরে একটি স্থান)-এ তারা

---

৩১৬ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৭

৩১৭ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৮

সেনাছাউনি ফেললেন। তারা সেখানে বিশাল আগুন জ্বালালেন। অনেক দূরে থেকে যেন এ আগুন দেখা যায়। এবং কাফিররা যেন মনে করে, এখানে অনেক মুসলিম অবস্থান করছেন।

:♦: খুজাআ গোত্রের মাবাদ আল জুহানি (যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন)। মুসলিমদের পাশ অতিক্রম করে মুশরিকদের পাশে গেলেন। তারা তখন বিজয়ের খুশিতে ছিল আত্মহারা। তারা মদিনায় এসে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালানোরও ফন্দি করছিল; কিন্তু সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহ তাদের এ থেকে নিষেধ করছিল। আবু সুফিয়ান মাবাদকে দেখে বললেন—মাবাদ, কী দেখে এলে? সে বলল, তোমাদের জন্য আফসোস, মুহাম্মাদ বিশাল দল নিয়ে তোমাদের খোঁজে বের হয়েছে। আমি যে ধরনের বড়ো আগুনের কুণ্ডলী জ্বলতে দেখেছি। তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের এ রকম আর দেখিনি। তারা তোমাদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। আমি আগে এত ক্ষুব্ধ হতে দেখিনি।...'

এ কথা শোনার পর আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে বিশাল ভয়ের সৃষ্টি করলেন। তারা দ্রুত মক্কায় ফিরে যেতে মনস্থ করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামরাউল আসাদে সোম, মঙ্গল ও বুধ তিন দিন অবস্থান করলেন। এরপর মদিনায় ফিরে এলেন।[৩১৮]

* * *

৩১৮ *তাবাকাতু ইবনি সাদ, ইবনে হিশাম, তারিখুত তাবারি*

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

প্রতি যুগের মানুষের জন্যই উহুদ

উহুদ যুদ্ধের এই পর্বে নবিজির জীবনী থেকে আমাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয়। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা উহুদ যুদ্ধের বর্ণনার ব্যাপারে যে রকম জেনেছি, যুদ্ধটি এ রকম হওয়ার মূল কারণ হলো, শত্রুদেরর সাথে যুদ্ধে মুসলিমরা কীভাবে বিজয় লাভ করবেন, এ বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া। প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলের সময় কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে, সে বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া। এবার তাহলে আমরা সেইসব শিক্ষাগুলো নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করি—

এক.

এখানে নবিজির সারাজীবনের অন্যতম আদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। তা হলো, পরামর্শের যোগ্য বিষয়ে পরামর্শ; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে, অ্যানপরামর্শের সাথে পূর্বের পরামর্শগুলোর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সিদ্ধান্তে লজ্জিত হওয়ার পরও নবিজি যুদ্ধাস্ত্র গায়ে জড়িয়ে ফেললেন, তখন আর তিনি বের হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেননি। এ ছাড়া পরামর্শের সময় মদিনায় থেকে যাওয়ার প্রতি নবিজির ঝোঁক বা প্রায় একরকম ঝোঁক ছিল। তবুও নবিজি পরামর্শের ভিত্তিতে মদিনার বাইরে বেরোনোর যেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তা থেকে সরে আসেননি। কেন?

সম্ভবত এর কারণ, পরামর্শের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। নবিজি যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি নিয়েছেন, গায়ে যুদ্ধাস্ত্র জড়িছেন, অস্ত্র হাতে তুলেছেন। এরপর তাই গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীত যে চিন্তা করা হয়েছে, সেটা নীতির খেলাফ। পরামর্শের আদর্শ হলো—পরামর্শে যা-ই সিদ্ধান্ত হোক, তাতে সুদৃঢ় থাকা। বিশেষত এ রকম একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে তা আরও কাম্য।

এরপর এখানে পরামর্শে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে কথা বলার দ্বারা আরেকটা ব্যাপার প্রকাশ পায়। তা হলো, মনের দুর্বলতা। এটা ভয়, শঙ্কা ও নিজেকে গুটিয়ে রাখার পথ ধরেই আসে।

এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা ও অবস্থার পরিবর্তনের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন—

> কোনো নবি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেলে যুদ্ধ করা পর্যন্ত তাঁর জন্য যুদ্ধাস্ত্র খুলে ফেলা উচিত নয়।

দুই.

এ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুনাফিকদের বড়ো একটা শ্রেণির অংশগ্রহণ ছিল। এর পেছনেও বড়ো হিকমত রয়েছে । তা হলো, মুসলিমদের সাথে মিশে যাওয়া মুনাফিক গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা। আর এতে মুসলিমদের ভবিষ্যতের পথচলার বিশেষ অভিজ্ঞতার পাঠ রয়েছে ।

আমরা দেখেছি, কীভাবে ইবনে উবাই ৩০০ জনকে নিয়ে মাঝপথ থেকে ফিরে যায়। এর বাহ্যিক কারণ বোঝাতে চেয়েছিল, নবিজি কাঁচা বুদ্ধির অধিকারী যুবকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ বয়স্কদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। এটা দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে না। তাই সে ফিরে যাচ্ছে। এটা বাহ্যদৃষ্টিতে চটকদার যুক্তি; কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এ রকম ছিল না। সে মূলত যুদ্ধের ইচ্ছাই করেনি। কেন সে নিজেকে বিপদে ফেলতে যাবে? কেন নিজেকে অযথা শেষ করে দেবে?...

এটা মুনাফিকদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। তারা গনিমতের পেছনে ছুটবে, কিন্তু কোনো কষ্ট স্বীকার করবে না। ইসলামের দুটি বিষয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক দু-রকম—

- ০১. গনিমত; যা তারা চায় ।
- ০২. বিপদ; যা তারা চায় না।

তিন.

নবিজি এ যুদ্ধে অমুসলিমদের সাহায্য নেননি। অথচ এ সহযোগিতার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। মুসলিমের সৈন্যসংখ্যা কম; কিন্তু এরপরও নবিজি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—

আহলুস শিরকের মোকাবিলা করতে গিয়ে আহলুস শিরকের সাহায্য নেব না।[৩১৯]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন—

> এক ব্যক্তি বদরের দিন নবিজির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বের হতে চাইছিল। নবিজি তাকে বললেন—তুমি কি আল্লাহর ব্যাপারে ঈমান আনো?
>
> সে বলল—না।
>
> নবিজি বললেন—তাহলে ফিরে যাও। আমি কখনো কোনো মুশরিকের সাহায্য নেব না।

এখান থেকে জুমহুর আলিমগণ (আলিমদের বড়ো অংশ) বলেন, যুদ্ধের কাফিরদের সাহায্য নেওয়া জায়িজ নেই। ইমাম শাফিয়ি এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন—

> إن رأى الإمام أن الكافر حسن الرأي والأمانة في المسلمين و كانت الحاجة داعية إلى الاستعانة به جاز و إلا فلا[৩২০]
>
> ইমাম যদি মনে করেন, কাফিরের উদ্দেশ্য ভালো, সে মুসলিমদের সাথে আমানত ঠিক রাখবে (বিশ্বাসঘাতকতা করবে না) এবং এ সাহায্যের প্রয়োজনও হয়, তাহলে জায়িজ আছে; অন্যথায় নয়।[৩২১]

প্রয়োজনে আহলে কিতাবদের সাহায্য নেওয়া যাবে—বিভিন্ন দলিল থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে—হুনাইনের যুদ্ধের দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাহায্য নিয়েছেন। মাসয়ালাটি মূলত শরয়ি সিয়াসাতের (ইসলামি রাজনীতি) সাথে সম্পৃক্ত। (তাই এখানে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করতে যাচ্ছি না।) বদর ও উহুদে এক রকম এবং হুনাইনে আরেক রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে বর্ণনা করব।

---

৩১৯ হাদিসের বর্ণনায় পাওয়া যায়—যারা মুসলমনাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিতে চাইছিল, তারা ইহুদি। আর ইহুদিরা হচ্ছে আহলে কিতাব। এবার প্রশ্ন জাগে—নবিজি আহলে কিতাবদের কীভাবে 'আহলুস শিরক' বললেন?
এর উত্তরে বলা হবে তাদের ক্ষেত্রে যে শিরকের প্রয়োগ করা হয়েছে, এটা মূলত পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে না; অর্থাৎ, মক্কার মুশরিকদের ওপর যেই অর্থে এর প্রয়োগ করা হতো, সে অর্থে না। এটা শুধু 'অর্থের ব্যাপকতার' দিক থেকে বলা হয়েছে।

৩২০ বিস্তারিত জানতে দেখুন—مغني المحتاج، ١/٢٢١

চার.

সামুরা ইবনে জুনদুব ও রাফি ইবনে খাদিজ—এ দুজনের ব্যাপারটি আমাদের বেশ ভাবায়। তখন তাদের বয়েস পনেরো বছরও পার হয়নি। কীভাবে তারা নবিজির কাছে এসে যুদ্ধের আগ্রহ প্রকাশ করেন! কত ভয়ংকর যুদ্ধ! মৃত্যু যেখানে প্রায় নিশ্চিত! যেখানে সংখ্যার কোনো সমতা নেই। কাফিররা তিন হাজারেরও ওপরে। আর মুসলিমরা সর্বসাকুল্যে ৭০০'।

তাদের সাহসিকতার মূল্যায়নে কিছু চিন্তকের চিন্তা দেখে আমি বড়ো আশ্চর্যান্বিত হই। তারা মনে করেন—আরবদের ক্ষেত্রে এটা খুবই স্বাভাবিক। পরিবেশেটাই ছিল এমন যে, তাদের যুদ্ধে যুদ্ধে বেড়ে উঠতে হতো। এ কারণে যুদ্ধবিগ্রহকে তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

কোনো সন্দেহ নেই—এসব চিন্তক বাস্তবতাকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। আসলে তাদের এ কথার বাস্তবতা কতটুকু? ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ইবনে উবাই ৩০০ জনকে নিয়ে কেটে পড়ল। গরমের দিনে যারা একসময় মদিনার সুমিষ্ট পানি খেয়ে জীবন বাঁচিয়েছে, যারা মদিনার ছায়ায় বেড়ে উঠেছে, তাদের নবিজি যখন যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য ডাকলেন, তখন তারা বলল—

لا تنفروا في الحر

তোমরা গরমের দিনে বের হয়ো না।

মুশরিকরা সংখ্যায় বিপুল হওয়ার পরও বদরে চরমভাবে পরাজয় বরণ করল। তারা ভয়ার্ত হলো। এরাই তো সেইসব লোক—যারা যুদ্ধের পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল।

একজন নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে কখনোই অস্বীকার করতে পারে না। এড়াতে পারে না। এই যে বালকদের রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অদম্য স্পৃহা—এটা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ঈমানি চেতনার কারণেই সম্ভব হয়েছে। নবিজির অসম্ভব ভালোবাসা থাকলেই তা সম্ভব। যেখানেই এ রকম ঈমানি চেতনা পাওয়া যাবে, যেখানেই এ রকম ভালোবাসা মিলবে। সেখানেই এ রকম বীরত্বের উপাখ্যান তৈরি হবে। আর যেখানে ঈমানের দুর্বলতা থাকবে, যেখানে ভালোবাসার কমতি থাকবে, সেখানে পিছুটান ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাবে না।

পাঁচ.

একটু চিন্তা করে দেখেন তো, নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে সারিবদ্ধ করছেন। পেছনে নিরাপত্তা বাহিনী রাখছেন। তাদের আদেশ করছেন—'তোমরা আমার পক্ষ থেকে আদেশ আসা পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না।' এসব থেকে যে অনস্বীকার্য বাস্তবতাটি আপনার সামনে ফুটে উঠবে, কী সেটি?

নবিজির সমরকৌশল। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য। এটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান। আর তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ভেতর দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। এর দাবি হলো—তিনি রণকৌশল-সমরকৌশল ইত্যাদি সবকিছুতেই হবেন অনন্য। যেভাবে এটা দাবি করে, তিনি সব ধরনের ইনহিরাফ ও জালালাত থেকে মুক্ত হবেন।[৩২১]

ব্যাপকভাবে সবাইকে, বিশেষভাবে তিরন্দাজদের নবিজির এই সূক্ষ্ম নির্দেশনা দেওয়ার সাথে পরবর্তী কাহিনির পূর্বাভাস রয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দূরদর্শিতা বা ওহির আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন, পরবর্তী সময়ে কী ঘটবে। তাই সে অনুযায়ী তিনি আগাম নির্দেশনা দেন। নবিজি এখানে তাদের অন্যতম শত্রু তথা প্রবৃত্তি, সম্পদের প্রতি লোভের মোকাবিলার অন্যতম পরিকল্পনা নিয়েছেন। এটা ভালো পরিকল্পনা। আর একটি ভালো পরিকল্পনা প্রায়ই ভালো ফলাফল বয়ে আনে।

এখানে যদিও নেতিবাচক ফলাফল এসেছে, তবুও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কখনো নেতিবাচক ফল ইতিবাচক ফল থেকেও বেশি উপকার বয়ে আনে।

ছয়.

আবু দুজানা নবিজির হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে দম্ভভরে কাতারে চলছিলেন। নবিজি তাতে নিষেধ করেননি। তিনি এইটুকু বলেছেন—

> এ স্থান ছাড়া অন্য স্থানগুলোতে এ ধরনের চলাকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন।

এ থেকে বোঝা যায়—সাধারণ ক্ষেত্রে দম্ভ-অহংকার নাজায়িজ। তবে যুদ্ধ চলাকালে এর বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ একজন মুসলিম সাধারণ অবস্থায় জমিনে

---

৩২১ আমরা এ নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

দম্ভভরে চলবে না। এটা হারাম; কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তা অপছন্দের ব্যাপার নয়; বরং তা কাম্য। এখানে একটা জিনিস মনে রাখা ভালো, ঘরবাড়ি, বিলাসবহুল আসবাবপত্র, স্বর্ণ-রুপা ইত্যাদি দিয়ে সাজানোও অহংকারের আলামত। তবে এসব দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র সাজানো নিষেধ না। এখানে অহংকার হবে কী করে? এটা তো মূলত ইসলামের দাপটের বড়াই। তার ওপর এসব বিষয় মানসিক আক্রমণেও একটা ভূমিকা রাখে। যা গুরুত্বপূর্ণ। যেটাকে হাতছাড়া করা যায় না।

সাত.

আমরা যখন পুরো যুদ্ধকে বিশ্লেষণ করতে যাব, তখন এর দুটি ভাগ আমাদের সামনে আসবে—

০১. মুসলিমরা তাদের সেনাপ্রধানের কথা ও নির্দেশনার খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল? মুসলিমরা দ্রুত বিজয় লাভ করেছেন। কাফিররা ভীষণ রকমের পরাজয় বরণ করেছে। তিন হাজারের বিশাল বাহিনীর অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি হলো। তারা পালাল। এ দিকটা এ আয়াতে ফুটে উঠেছে—

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ

আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে।[৩২২]

০২. মুসলিমরা পরাজিত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করেন। যাকে নাগালে পাবেন, খতম করে ছাড়বেন। গনিমত কুড়াবেন। পাহাড়ের ওপর থাকা সাহাবায়ে কিরাম এ দৃশ্য দেখেন—তাদের ভাইয়েরা শত্রুদের কচুকাটা করে গনিমত লাভ করছে। তাই তাদের কেউ কেউ সেই গনিমতে অংশগ্রহণের ইচ্ছে করলেন। তারা মনে করলেন—নবিজি যেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন সেই নির্দেশের মেয়াদ শেষ। তাই তারা নবিজির অনুমতিরও প্রয়োজন অনুভব করলেন না। তাদের এই সিদ্ধান্তে অন্যরা আপত্তি জানাচ্ছিলেন। আপত্তিকারীদের অগ্রগামী ছিলেন তাদের আমির ইবনে জুবাইর রা.; কিন্তু আপত্তি উপেক্ষা

৩২২ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫২

করে ভুল ইজতিহাদ করে তারা গনিমতের দিকে ছুটে গেলেন। এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল?

যেই মুশরিকরা ছিল ভয়াতুর, তারা দুঃসাহস দেখানো শুরু করল। পলায়নরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ প্রতারণার আশ্রয় নিলেন। তিনি দেখলেন, পাহাড়ের চূড়া প্রায় শূন্য। লোকসমাগম নেই। প্রতিরক্ষা বা পাহারাদারি করার মতো কেউ নেই। সামরিক বুদ্ধি তার মাথায় খেলে গেল। তিনি তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে পাহাড়ের দিকে ঘুরে গেলেন। পাহাড়ের চূড়ায় যে অল্পকয়জন ছিলেন, তাদের হত্যা করে ফেললেন। এরপর পেছন দিক দিয়ে ঢুকে রণাঙ্গনে থাকা মুসলিমদের ওপর তির নিক্ষেপ শুরু করলেন। শুরু হলো মুসলিমদের ভয় ভয় অবস্থা। এ অংশটা কুরআনুল কারিম তুলে ধরেছে এভাবে—

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে এবং কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারও বা কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদের সরিয়ে দিলেন ওদের ওপর থেকে, যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।[৩২৩]

একটু ভেবে দেখেন, এর ক্ষতি কতদূর গড়ায়। কী হয়েছিল শেষাবস্থা।

অল্পসংখ্যকের ভুলের প্রভাব সবার মাঝে পড়ে। সবার জন্যই বিপদ ডেকে আনে। এমনকি নবিজিকেও...এটাই আল্লাহর সুন্নাত (শাশ্বত বিধান)। স্বয়ং নবিজি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। অথচ এই নবিজিই তো সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

৩২৩ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫২

তাদের ভুল ও আজকালের আমাদের ভুলকে তুলনা করেন। আমাদের যাপিত জীবনে আমরা কত রকম ভুলে ডুবে আছি! চিন্তা করে দেখেন, আমরা আজকাল 'আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার' (সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ) পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। এর জন্য আমরা কোনো পদক্ষেপও নিচ্ছি না। তবুও আল্লাহপাক আমাদের ছাড় দিচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ওপর কতটুকু দয়া করছেন!

আপনি যখন এসব নিয়ে ভাববেন, তখন কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন। আজকাল মুসলিমরা মুসলিম হওয়ার পরও কাফিরদের কাছে পরাজিত হচ্ছে। মার খাচ্ছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো তাদের শেষ করে চলছে। কেন এ রকম হচ্ছে?

আট.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে বিরাট ব্যথা পেয়েছেন। শরীরে ও মাথায় আঘাত লেগেছে। দাঁত ভেঙেছে, চেহারা রক্তাক্ত হয়েছে। কয়েকজনের ভুলের মাশুল অন্যদের সাথে তাঁকেও দিতে হয়েছে।

একটা প্রশ্ন—নবিজি জীবিত নেই—এ কথারটার হেতু কী?

মুসলিমদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি ও সঙ্গাদান—এটা তাদের জন্য অন্যতম শক্তি। তারা নবিজির বিচ্ছেদকে কখনো সহ্য করে পারতেন না। তাঁর পরে তারা ভরসার কাউকে ভাবতে পারতেন না। তাই যেন নবিজির মৃত্যু খবর তাদের ধারণায়ও ছিল না। তাদের মনের আশপাশেও ছিল না। যদিও পরবর্তী সময়ে তাদের ভুল ভেঙেছে; পরে তারা বাস্তবতায় ফিরে এসেছেন, তবুও এ বিষয়টা তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। এর তাদের ঈমানি কাঠামোতে নাড়া পড়েছে; বরং তা অনেকেরই হৃদয় চুরমার করে দিয়েছে!

হিকমতের দাবি ছিল এটাই। এ রকম ঘটনা ঘটুক। যাতে করে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। যেন তারা সংবিৎ ফিরে পান। যেই বাস্তবতায় থাকা উচিত ছিল, তারা যেন সে বাস্তবতায় ফিরে আসেন।

আর নবিজি যদি (বাস্তবেই) তাদর মাঝ থেকে চলে যান, তখন তারা যেন পেছনে না হটেন। মুসলিমদের এ দুঃসময়ে নবিজির মৃত্যু সংবাদ রটার পর, এ গুরুত্বপূর্ণ পাঠের জন্যই আয়াত নাজিল হয়—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন।[৩২৪]

এ পাঠের একটা ইতিবাচক ফলও পরবর্তী সময়ে চোখে পড়ে। নবিজি যেদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন, সেদিন উহুদ যুদ্ধের একটা আবহ বিরাজ করার মতো অবস্থা ছিল। কিন্তু সে রকম অবস্থা বিরাজ করেনি। আগের নাজিল হওয়া আয়াত সেটা মুসলিমদের জাগিয়ে তোলে। তারা বাস্তবতায় বসবাস করেন। ব্যথিত হৃদয়ে তারা নবিজিকে বিদায় দেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের কর্তব্য—দাওয়াত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় নিয়োজিত হন। তারা দুর্মর ঈমানের সাথে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজেদের কর্তব্যে জেগে ওঠেন।

নয়.

সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ ও নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার চিত্রগুলো একটু কল্পনা করুন। তারা নবিজিকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করছেন। নবিজির দিকে ছুটে আসা তির নিজের শরীরে পেতে নিচ্ছেন। একের পর এক ঝরে পড়ছেন! আল্লাহু আকবার!

এসব কিছুর মধ্য দিয়েও তারা নবিজির জীবন বাঁচাতে তৎপর। তাদের কোনো পরোয়া নেই। কেন তাদের এই উৎসর্গ? নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দেওয়া?

প্রথম কথা হলো—আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান। এরপর নবিজির প্রতি তাদের অসম্ভব ভালোবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান, নবিজির প্রতি নির্জলা ভালোবাসা এগুলোই তাদের জীবনোৎসর্গ করতে প্রাণিত করছিল। এজন্য একজন মুসলিমের জন্য দুটো জিনিসই আবশ্যক। তার হৃদয়-মন নবিজির

---

৩২৪ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪

ভালোবাসায় ভরপুর হওয়া পর্যন্ত সে একজন পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না। এ কথাটিই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ভাষায় বলেছেন—

> তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি ও সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।[৩২৫]

ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন—আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে বিশেষ দুটি শক্তি রেখেছেন—

- **এক.** চিন্তাশক্তি।
- **দুই.** হৃদয়।

চিন্তাশক্তি দিয়ে সে চিন্তা করবে, সে ঈমান আনবে। আর হৃদয় দিয়ে সে আল্লাহ যা ভালোবাসতে বলেছেন, তা ভালোবাসবে। যা ঘৃণা করতে বলছেন, তা ঘৃণা করবে। তার অন্তর যখন আল্লাহ, তাঁর রাসুলের ও সালিহিনদের (সৎকর্মশীল) ভালোবাসাশূন্য হবে, তখন তাতে প্রবৃত্তির দখল বসবে। আর যখন হৃদয়ে প্রবৃত্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে, তখন সে হৃদয় থেকে উৎসর্গের দেখা পাওয়া আকাশকুসুম কল্পনার মতোই।

শাশ্বত এসব বাস্তবতা অনেক দার্শনিকের নিকট স্বীকৃত। বাস্তবতাও এর বড়ো সাক্ষী। এ ব্যাপারে দার্শনিক Jean-Jacques Rousseau-এর বক্তব্য শোনেন। তিনি তার বই إميل (Emile)-এ লিখেছেন—

> শুধু চিন্তা-দর্শনের ওপর ভিত্তি করে (মানুষের মাঝে) ইতিবাচক মূল্যবোধ জাগানো নিয়ে অনেক আলোচনা -পর্যালোচনা হয়েছে। (ইতিবাচক মূল্যবোধ জাগানোর ক্ষেত্রে) এটা কি ভিত্তি? এটা কোন ধরনের মূলনীতি?...তাদের কথামতে, আইনই ইতিবাচক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করবে; কিন্তু আইনের এ দর্শন কি আমার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলতে পারবে?...অনুমানের এ দর্শন শুধু শব্দ ও কথার ফুলঝুরি।[৩২৬]...

---

৩২৫ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম*

৩২৬ এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার বই—تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث

১৯৩৩ সালে আমেরিকা যখন নাইটক্লাবসহ বিভিন্ন আসরে মদের বর্ণাঢ্য আয়োজন নিষেধ করতে গেল, তখন তা থেকে মানুষকে সংযত করা যায়নি। কিছুকাল পরেই আইনকারী ব্যক্তিরাই উলটো পথে চলল। ভোগের বঞ্চনার ব্যথায় তারা ছিল দোদুল্যমান। পরিশেষে তারা যেই আবশ্যকীয় আইন করেছিল, তা বাতিল করল। নতুন করে আবার ভোগে মত্ত হলো...

ওদিকে ইসলামের ইতিহাস দেখেন। যখন মদ নিষিদ্ধ হলো, তখন সাহাবায়ে কিরাম নিরঙ্কুশচিত্তে তা মেনে নেন। মদের পাত্রগুলো ছুড়ে ফেলেন। পথে পথে মদ বয়ে যায়। এপরও তারা বলছিলেন—

انتهينا يا رب انتهينا

হে রব, আমরা তো শেষ হয়ে গেছি!

দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো—তাদের মনে এমন কিছু আছে, যার কারণে তাদের প্রবৃত্তি আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। আর তা হলো, ভালোবাসা। নবিজির প্রতি তাদের এই তীব্র ভালোবাসাই নবিজির জন্য উৎসর্গ হতে প্ররোচিত করছিল। নবিজির জীবন রক্ষা করতে গিয়ে তারা নিজের প্রাণটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। উহুদ যুদ্ধে নবির জন্য এ রকম অপূর্ব ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বহু। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বললেন—সাদ ইবনের রাবির খোঁজ কে নিয়ে আসবে? সে জীবিত না মৃত, তা কে দেখে আসবে?
>
> এক আনসারি বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি সাদের ব্যাপারটা দেখে আসব। সাহাবি গিয়ে দেখলেন—সাদ রণাঙ্গনে আহত হয়ে পড়ে আছেন। জীবনসায়াহ্নে তিনি দুনিয়ার জিন্দেগির শেষ মুহূর্ত পার করছেন।
>
> তিনি সাদকে বললন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আদেশ করেছেন, তুমি কি জীবিত না মৃত—তা দেখে যেতে!..

তিনি বললেন—এই তো শেষ বিদায় নিচ্ছি আমি। তুমি নবিজির নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো এবং তুমি নবিজিকে বলো—সাদ ইবনের রাবি আপনার কাছে বলে পাঠিয়েছে—

وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته

আল্লাহ তায়ালা একজন নবিকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যতটুকু প্রতিদান দিয়ে থাকেন, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সে রকম প্রতিদান দিক।...

আনসারি সাহাবি বলেন—আমি স্থান ত্যাগ করার আগেই তিনি মারা যান।

আজকের সময়ে যেদিন মুসলিমদের অন্তর এ রকম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হবে, মুসলিমরা তাদের প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকবে, প্রবৃত্তিকে নিজের বশ করে নেবে, আমি বলতে পারি—সেদিন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। তারা আর সেদিন মার খাবে না, শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করবে। প্রতিবন্ধকতা যতই আসুক, এটা হবেই।

কীভাবে তা অর্জন করা সম্ভব?

জিকির করা; অর্থাৎ, নবিজির কথা বেশি বেশি আলোচনা ও বেশি বেশি দরুদ পড়া। আল্লাহর নিয়ামতরাজি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, নবিজির সিরাত (জীবনচরিত) শামায়িল (জীবনবৈশিষ্ট্য) নিয়ে বেশি বেশি ভাবা। তবে এসব কিছু নিষ্ঠার সাথে ভালোভাবে ইবাদত আদায় করার পরের স্তর। আগে (আবশ্যকীয়) ইবাদত (বিধান) ভালো করে পালন করতে হবে। এরপর এসব বিষয়ও অর্জন করতে হবে।

দশ.

আমরা *সহিহ বুখারির* বর্ণনায় দেখেছি—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহিদদের জানাজা পড়া ছাড়াই রক্তসহ দাফন করতে বললেন। দুজনকে এক কবরে দাফন করা হয়।

এখান থেকে আলিমগণ বলেন—জিহাদের ময়দানে যারা শহিদ হবে, তাদের গোসল দেওয়া হবে না, জানাজাও পড়া হবে না; বরং রক্তসহই দাফন করা হবে।

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন—

মুতাওয়াতির হাদিস থেকে বোঝা যায়, তাদের জানাজা পড়া হবে না। আর 'নবিজি দশজন দশজন করে তাদের জানাজা পড়েন, প্রতিবারই হামজা ছিলেন। সব মিলিয়ে সত্তরবার পড়া হয়, সত্তরবার'—এই যে বর্ণনা এটা দুর্বল। বর্ণনাটা ভুল।[৩২৭]

এগারো.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসার পরপরই দ্বিতীয়বার মুশরিকদের ধাওয়া করার জন্য বের হন—এ ব্যাপারে ভাবলে আমরা উহুদ যুদ্ধ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারব। আমাদের সামনে এখান থেকে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটি দিকই ফুটে উঠবে। এখানে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, বিজয় এসে থাকে সবর, (ধৈর্য) ইতাআত (অনুসরণ), আমালুস সালিহা (সৎকাজ), সেনাপতির আদেশ মান্য করা, নিরঙ্কুশ দ্বীনের উদ্দেশ্যে কাজ করার মাধ্যমে।

আমরা দেখেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার সবাইকে অনুমতি দেননি। শুধু গতকাল যারা অংশ নিয়েছিল, তারাই অংশ নেবে। সাহাবায়ে কিরাম এসে এখনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেননি। দেহ ক্ষতবিক্ষত। বিজয়ের খুশিতে আটখানা হওয়া মুশরিকদের উদ্দেশে সাহাবায়ে কিরাম ছুটলেন। তখন অবস্থাটা এমন ছিল না যে, তারা গনিমতে লোভ করবেন। তারা ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত দেহ নিয়েই আল্লাহর রাহে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতে বা বিজয় লাভ করতে বের হলেন। এর ফলাফল কী হলো?

মুশরিকরা আনন্দ-খুশিতে আত্মহারা হয়ে থাকলেও তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন হয়নি। আর মুসলিমদের এই ক্ষতবিক্ষত নিশ্চিল দেহ ইত্যাদিও তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে?

এখানেও আল্লাহর সেই অলৌকিক শক্তি কাজ করছিল। যেন আমরা এখান থেকে পাঠ নিতে পারি। ওই ব্যক্তির সংবাদ—'এবার মুহাম্মাদ তো মৃত্যু হাতে নিয়ে তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে এসেছে'—তাদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করল। ফলে তারা মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার পরও মক্কায় দ্রুত ছুটল....

কীভাবে অবস্থার এতটা পরিবর্তন ঘটল? কিছুকাল আগে যারা বীরদর্পে সব উড়িয়ে দিচ্ছিল, তারাই এখন ভয়ে থিতু!

---

৩২৭ দেখুন—مغني المحتاج ١/٣٤٩

উত্তর এটাই—আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

এখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিক এনে আল্লাহ তায়ালা এতে আমাদের জন্য বিশাল পাঠ রেখেছেন।

পরিশেষে উহুদের পাঠ পূর্ণ করতে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়—

الَّذينَ استَجابوا لِلَّهِ وَالرَّسولِ مِن بَعدِ ما أَصابَهُمُ القَرحُ ۚ لِلَّذينَ أَحسَنوا مِنهُم وَاتَّقَوا أَجرٌ عَظيمٌ

যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেজগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সাওয়াব।

الَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَكُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إيمٰنًا وَقالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكيلُ

যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজসরঞ্জাম; তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে—আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই-না চমৎকার কামিয়াবিদানকারী!

فَانقَلَبوا بِنِعمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضلٍ لَم يَمسَسهُم سوءٌ وَاتَّبَعوا رِضوٰنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذو فَضلٍ عَظيمٍ

অতঃপর ফিরে এলো মুসলিমরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট।[৩২৮]

* * *

৩২৮ সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭২-৭৪

ইয়াওমুর রাজি ও বিরে মাউনা

ইয়াওমুর রাজি

তৃতীয় হিজরি। আদাল ও কারাহ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির নিকট এলো। তারা বলল—তারা ইসলামের ব্যাপারে জেনেছে। (তাদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়েছে)। এখন তাদের দ্বীনি বিষয়াদি শেখা প্রয়োজন। নবিজি তাদের কথায় সাহাবায়ে কিরামের একটি দল পাঠালেন। সে দলে ছিলেন মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ, খালিদ, জায়িদ ইবনে আবু বুকাইর, আসিম ইবনে সাবিত, খুবাইব ইবনে আদি, জায়িদ ইবনেদ দাসিনাহ, আবদুল্লাহ ইবনে তারিক। তাদের প্রধান ছিলেন আসিম ইবনে সাবিত। ইমাম বুখারি আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেন—

'তারা পথ চলতে লাগলেন। যখন উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি স্থানে তারা অবস্থান করছিলেন, তখন বনু লিহয়ানকে (হুজাইলের শাখাগোত্র) তাদের আগমনের সংবাদ দেওয়া হলো। তারা সাহাবায়ে কিরামের খোঁজে চলল। প্রায় একশত তিরন্দাজ সাহাবির পথ অনুসরণ করে ছুটল।

এরপর তারা একটি স্থানে এসে থামল। তখন দেখল, সাহাবায়ে কিরাম মদিনা থেকে পাথেয় হিসেবে যে খেজুর নিয়ে এসেছিলেন, তার বিচি পড়ে রয়েছে । তারা বলল, এটা তো দেখা যায় ইয়াসরিবের (মদিনা) খেজুর। (তাহলে তারা এদিকেই গিয়েছে)। তারা সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণে ছুটল। একসময় তারা গিয়ে মুসলিমদের সাথে মিলিত হতে পারল। আসিম (মুসলিম বাহিনীর প্রধান) ও তার সাথিরা তা বুঝতে পেরে (এবং উপায়ান্তর না দেখে) একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় নেন।

এরপর তারা এসে সাহাবায়ে কিরামকে ঘিরে ফেলে এবং বলে, তোমরা যদি আমাদের কাছে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো, তাহলে আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি

দিচ্ছি—তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। আসিম বললেন, না, কোনো কাফিরের নিরাপত্তায় আমি নামব না। (এবং তখন তিনি এই দুআ করলেন) হে আল্লাহ, আমাদের এ অবস্থা সম্পর্কে নবিজিকে জানিয়ে দেন। এরপর তারা আসিমসহ সাতজনকে তির ছুড়ে হত্যা করল।

খুবাইব, জায়িদ ও অন্য আরেকজন বাকি রইলেন। কাফিররা তাদের (হত্যা না করার) প্রতিশ্রুতি দিলো। প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা তাদের নিকট নেমে এলেন। তাদেরকে কাছে আনতে যখন তারা সক্ষম হলো, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে বেঁধে ফেলল।

মুসলিমদের সঙ্গে থাকা তৃতীয় ব্যক্তি বললেন—এটা প্রথম ধোঁকা। তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই তারা তাকে টানাটানি করে নিয়ে যেতে চাইল; কিন্তু তিনি রাজি হননি।

পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করল। আর খুবাইব ও জায়িদকে নিয়ে তারা মক্কার বাজারে বিক্রি করে ফেলল। খুবাইবকে হারিসের গোত্রের লোকেরা (প্রতিশোধ নিতে) কিনল। কারণ, খুবাইব হারিসকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। খুবাইব তাদের নিকট বন্দি হয়ে দিন যাপন করতে লাগলেন।

এভাবে একদিন তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাকে হত্যা করা হবে। তিনি হারিসের কোনো এক মেয়ের কাছ থেকে ক্ষুরকর্ম করতে একটা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। সে (হারিসের মেয়ে মুসলিম হওয়ার পর) বর্ণনা করেন—আমি (সেদিন) আমার শিশুসন্তানের ব্যাপারে অসতর্ক থাকার ফলে শিশুটি আস্তে আস্তে খুবাইবের কাছে চলে গেল। খুবাইব শিশুকে তার উরুতে বসাল। তার হাতে ক্ষুর দেখে আমি বেশ শঙ্কিত হলাম (সেই বলতে পারবে—আমি কী পরিমাণ ভয় পেয়েছিলাম)। তখন সে আমাকে বলল, তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? ইনশাআল্লাহ, আমি তা করতে যাব না। তিনি (হারিসের মেয়ে) বলতেন—আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো বন্দিকে দেখিনি। আমি তাকে (সে সময়) দেখেছি, সে আঙুরের থোকা থেকে আঙুর খাচ্ছে। অথচ মক্কায় তখন কোনো ফল ছিল না। আবার সে জিঞ্জারাবদ্ধ!

এ রিজিক আল্লাহ তায়ালা তাকেই দিয়েছেন। তারা হত্যার জন্য তাকে নিয়ে হারাম এলাকা থেকে বের হলো। তখন তিনি বললেন, আমাকে দুই রাকাত সালাত আদায়ের সুযোগ দাও। এরপর (সালাত শেষ করে) তিনি ফিরে এসে তাদের বললেন—তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে যে, আমাকে মৃত্যুর ভয়-উৎকণ্ঠা

পেয়ে বসেছে, তাহলে আমি আমার সালাত আরও দীর্ঘায়িত করতাম। তিনিই সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি, যিনি হত্যার পূর্বে দুই রাকাত সালাতের নিয়ম চালু করেছেন। এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন—

و لست أبالي حين أقتل مسلما :: على أي شق كان في الله مصرعي

و ذالك في ذات الإله و إن يشأ :: يبارك على أوصال شلو ممزع

আমি যেহেতু মুসলিম হয়ে মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাই আমার কোনো পরোয়া নেই যে, মৃত্যুর সময় আমি কোন পাশে ঢলে পড়ব।

আমার এ উৎসর্গ তো নিরেট আল্লাহর জন্য। তাই তিনি চাইলে আমার শরীরে কর্তিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে বরকত দান করবেন।

এরপর উকবা ইবনুল হারিস উঠে গিয়ে তাকে হত্যা করল। কুরাইশরা আসিমের নিহত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার মৃতদেহের কিছু অংশ নিয়ে আসতে একদল লোক পাঠাল। কারণ, আসিম বদরের দিন কুরাইশদের বড়ো এক নেতাকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার (মৃতদেহের) ওপর ভিমরুলের চাক ছাতার মতো করে দিলেন। তা তাকে কুরাইশদের প্রেরিত বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করল। তাই তারা তার মৃতদেহের কোনো অংশই নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি।'[৩২৯]

ইবনে ইসহাক বলেন—

আর জায়িদকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কিনে নিল। তারা যখন তাকে হত্যার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, জায়িদ, তোমাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, এখন তোমার স্থানে মুহাম্মাদ হোক? আমরা (তোমার পরিবর্তে) তার গর্দান উড়িয়ে দেবো, আর তুমি তোমার পরিবারে নিরাপদে থাকবে?

---

৩২৯ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪১; তাবারির বর্ণনায় এখানে আরেকটু বৃদ্ধি করেছেন; তিনি আবু কুরাইবের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—আমার নিকট জাফর ইবনে আউন বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহিম ইবনে ইসমাইল থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমার নিকট জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন—নবিজি তাকে পর্যবেক্ষণে পাঠালেন। তিনি বলেন; এরপর আমি খুবাইবের (হত্যার জন্য প্রস্তুত করা) কাষ্ঠখণ্ডের নিকটে এলাম। আমার তখন পাহারাদারদের ভয় হচ্ছিল। আমি তাতে উঠে তাকে ছাড়িয়ে দিলাম। তিনি তখন মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি একটু দূরেই অবস্থান করছিলাম। এরপর আমি দৃষ্টি দিলাম। তখন খুবাইবের মৃত দেহকে দেখিনি। মনে হচ্ছিল, মাটি তাকে খেয়ে ফেলছে।...

তিনি বললেন—আল্লাহর শপথ! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি যে স্থানে আছি, সে স্থানে নবিজি হবেন আর তাঁকে কষ্ট দেওয়া হবে (হত্যা করা হবে)। আর আমি বসে থাকব ঘরে।

আবু সুফিয়ান তখন বলল—মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথিরা তাঁকে যে রকম ভালোবাসে, সে রকম কোনো মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, তা আমি দেখিনি।[৩৩০]

বিরে মাউনার নিষ্ঠুরতম ঘটনা

৪র্থ হিজরি। আমর ইবনে মালিক নবিজির নিকট এলো। নবিজি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি, আবার ইসলাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শনও প্রকাশ করেনি; বরং সে বলল—হে মুহাম্মাদ, তুমি যদি তোমার কিছু সঙ্গী-সাথিকে নজদবাসীদের নিকট পাঠাতে! তারা নজদবাসীকে তুমি যে পথের দাওয়াত দিয়ে থাকো, সে পথের দাওয়াত দিত। (তুমি তোমার সাথিদের একদল পাঠাও) আশা করি, তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তাদের ব্যাপারে নজদবাসীকে ভয় করছি। আমর বলল, (সমস্যা নেই) আমি তো তাদের প্রতিবেশী। (আমি তাদের বিষয়ে খেয়াল রাখব।) তাদের পাঠাও, তারা তোমার মিশনে মানুষকে দাওয়াত দেবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাচিত সাহাবিদের সত্তরজনের একটি জামাত সেখানে পাঠালেন। ইবনে ইসহাক ও ইবনে কাসিরের বর্ণনানুযায়ী, তা উহুদ যুদ্ধের শেষ হওয়ার চার মাসের মাথায় সফর মাসে সংঘটিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম পথ চলতে চলতে বিরে মাউনায় গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। সেখানে এরপর তারা তাদের একজনকে (হারাম ইবনে মিলহান) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র দিয়ে আমির ইবনে তুফাইলের নিকট পাঠালেন। তার নিকট চিঠি নিয়ে এলে সে তা দেখারও প্রয়োজন অনুভব করল না। উলটো বরং সেই সাহাবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে বসল।

ইমাম বুখারি রহ. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন, হারামকে যখন আক্রমণ করা হলো এবং তার চেহারা রক্তাক্ত হলো, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে বলছিলেন—

فزت و رب الكعبه

কাবার রবের শপথ, আমি সফলকাম।

---

৩৩০ আরও জানতে দেখুন—*সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭২

এরপর আমির ইবনে তুফাইল বনু আমিরকে বাকি সাহাবায়ে কিরামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করল; কিন্তু তারা তার ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল—আমরা আবু বারার (আমির ইবনে মালিক) দেওয়া প্রতিশ্রুতির খেলাফ করতে পারব না।

এরপর আমির ইবনে তুফাইল সুলাইম গোত্রের শাখা গোত্র উসাইয়্যাহ, রি'ল, জাকওয়ানকে ডাকলে তারা তার ডাকে সাড়া দেয়। তারা গিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে বেষ্টন করে ফেলল।

মুসলিমরা এ অবস্থায় তলোয়ার হাতে নিয়ে তাদের মোকাবিলা শুরু করলেন; কিন্তু পরিশেষে সব মুসলিমই নিহত হলেন। তবে দুজন সাহাবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না (অপরাপর দায়ি সাহাবায়ে কিরামের পশু চরানোর কাজে দূরে গিয়েছিলেন।) তাদের একজন আমর ইবনে উমাইয়্যা আজ-জামরি। তিনি এ নিষ্ঠুর কাহিনি ঘটার পর সংবাদ জানতে পারলেন। বাকি থাকা সাহাবি দুজন তাদের ভাইদের প্রতিশোধ নিতে গেলেন। আমরের সঙ্গে যে আরেকজন সাহাবি ছিলেন, তাকেও শহিদ করা হয়। আর আমর পালিয়ে মদিনার পথ ধরলেন।

রাস্তায় দুজন মুশরিকের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি মনে করলেন, লোক দুজন বনু আমিরের। তাই তিনি তাদের হত্যা করে ফেললেন। এরপর নবিজির কাছে পৌঁছলে নবিজির মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, লোক দুজন বনু কিলাবের। আর নবিজি বনু কিলাবকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যেহেতু তুমি দুজনকে হত্যাই করে ফেলেছ, তাই আমি তাদের দিয়ত (রক্তপণ) দেবো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মর্মান্তিক ঘটনায় খুব ব্যথিত হলেন। এমনকি বনু সুলাইমের শাখা গোত্র—রি'ল, জাকওয়ান, বনু লিহয়ান, উসাইয়্যার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন; এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাজে কুনুতে নাজিলাহ[৩৩১] পড়েন।[৩৩২]

---

৩৩১ কুনুতে নাজিলাহ পড়ে বনু সুলাইমের শাখাগোত্রগুলোর ওপর বদদুআ করার বিষয়ে ইমাম বুখারি ও মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা এনেছেন।

৩৩২ বিস্তারিত আরও জানতে দেখুন—*সিরাতু ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৩

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

ইয়াওমুর রাজি বিরে মাউনার ঘটনা দুটিতে আমাদের বেশ কিছু জানার ও বোঝার মতো বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমরা এই পর্যায়ে জানা ও বোঝার চেষ্টা করব—

০১.

বিরে মাউনা ও রাজির ঘটনা থেকে বোঝা যায়—সব সাহাবায়ে কিরামই ইসলামের দাওয়াত, ইসলামের প্রচার-প্রসার, মানুষকে ইসলাম বোঝানোর কাজ করতেন। বোঝা গেল, দাওয়াতের কাজ শুধু নবি-রাসুল-খলিফা বা আলিমদের ওপরই ন্যস্ত না; সবার ওপর এর দায়িত্ব।

নির্বাচিত সত্তরজন যুবক সাহাবিকে দাওয়াতের কাজে পাঠানো থেকে দাওয়াতের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা বোঝা যায়। নবিজি তাদের পাঠানোর অল্প কিছুদিনের মাঝেই তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়...

আমির ইবনে মালিক যখন নবিজির কাছে সাহাবি প্রেরণের আবেদন করছিল, নবিজি তখনই এ আশঙ্কা করছিলেন; কিন্তু প্রশ্ন হলো—এরপরও নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে কেন পাঠাতে গেলেন?

কারণ, নবিজি চিন্তা করে দেখলেন, দাওয়াত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে যদি এ রকম সমূহ আশঙ্কার মুখে পড়তে হয় হোক; তবুও দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ভাগ্যে যা রেখেছেন, তা-ই হবে।

০২.

আমরা আগেও এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি যে, ধর্মপালন সম্ভব না হলে দারুল কুফর বা দারুল হারবে মুসলিমদের জন্য বসবাস করা জায়িজ নয়। আর যদি ধর্ম পালন করা যায়, তাহলে বসবাস করা জায়িজ হলেও মাকরুহ। তবে এখান থেকে

বোঝা যায়—আবশ্যকীয় ইসলামের দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করা যেতে পারে। এটাও একপ্রকার জিহাদের অন্তর্ভুক্ত, যা ফরজে কিফায়া। কিছু মানুষ আদায় করে নিলে বাকি সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে।[৩৩৩]

০৩.

আমরা যখন এ দুটি ঘটনায় মুশরিকদের হিংসা-বিদ্বেষের ঝড় দেখছি, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার নিষ্ঠুর উপাখ্যান পড়ছি, তখন আমরা ঠিক এর বিপরীত মুশরিকদের ষড়যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া সাহাবায়ে কিরামের মহানুভবতার দাস্তানও পড়ছি। আমরা দেখছি—খুবাইবকে হত্যার জন্য কীভাবে বনু হারিসের ঘরে আটকে রাখা হয়, আর তিনি ক্ষুর চেয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন শিশু তার কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এলো। তার মা তখন নিথর ঘুমিয়ে। এটা তাদের হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধের সুবর্ণ সুযোগ ছিল। শিশুকে শেষ করে দেওয়ার ফুরসত এসেছিল এবং সুযোগকে কাজে লাগানোই ছিল স্বাভাবিকতার দাবি; কিন্তু ব্যাপারটা এমন হয়নি। শিশুর মা শিশুর এ অশুভ দৃশ্য দেখার কথা কখনো ভাবতে পারেনি। শিশুটি খুবাইবের কোলে খেলছে, তিনি তাকে আদর করছেন, যেন স্নেহময় পিতা তার আদুরে সন্তানটাকে মায়া বুলিয়ে দিচ্ছেন!...

তিনি শিশুর মায়ের দিকে চেয়ে যখন ভয়ের আবহ দেখতে পেলেন, তখন তিনি একজন মুমিনের শানে নিয়ে বললেন—

أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذالك إن شاء الله

> তুমি কি ভয় করছ যে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? ইনশাআল্লাহ আমি তা করতে যাব না।

ইসলামের এই সুন্দর তরবিয়তের (দীক্ষা) কথা একটু ভাবেন। তিনি হচ্ছেন সেই অনন্য মানুষ খুবাইব। আর তারা হচ্ছে হিংসার অনলে দগ্ধ মুশরিক। তারা সবাই একই পরিবেশে গড়ে উঠেছেন, একই মাটিতে বেড়ে উঠেছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর খুবাইব অনন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আর তারা ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরেই

---

৩৩৩ দেখুন—مغني المحتاج ٤/٢٢٩

নিথর পড়ে থাকল। তাদের থেকে হিংস্রতা, রূঢ়তা ঝরছিল। এটা ইসলামের কত বড়ো বিপ্লব, কত বড়ো অবদান!...

০৪.

এখান থেকে (আসিমের কাজ) বোঝা যায়, শত্রুর হাতে বন্দি হওয়ার পর নিরাপত্তা গ্রহণ না করার সুযোগ আছে। যদিও এ কারণে তাকে হত্যা করার ব্যাপার থাকে। আসিম এমনটাই করেছিলেন; কিন্তু সহজতা চাইলে নিরাপত্তাও গ্রহণ করতে পারে। সুযোগও গ্রহণ করতে পারে। যেমনটা করেছেন খুবাইব, জায়িদ।

বিশুদ্ধ কথামতে, কাফিরদের মাঝে দ্বীন প্রকাশ করার সুযোগ থাকলেও যদি মুসলিম বন্দির পালানোর সুযোগ থাকে, তাহলে পালানো আবশ্যক। কারণ, কাফিরের হাতে একজন মুসলিমের থাকা মানে লাঞ্ছনার জীবনযাপন করা। একজন মুসলিম এই লাঞ্ছনা সইতে পারে না। তাই এই লাঞ্ছনা থেকে তার নিজেকে মুক্ত করা আবশ্যক।[৩৩৪]

০৫.

হত্যার একটু আগে আবু সুফিয়ানকে দেওয়া জায়িদ ইবনে দাসানার জবাবটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে নবিজির মহব্বত কী পরিমাণ ছিল! সাহাবায়ে কিরাম নবিজির প্রতি এই তীব্র ভালোবাসার কারণেই দ্বীনের পথে নিজেদের উৎসর্গ করতেন, সব ধরনের বিপদ নবিজির ওপর আসা থেকে প্রাণপণে প্রতিরোধের চেষ্টা করতেন।

আপনার ঈমান যত বেশিই হোক, নবিজির প্রতি এ রকম ভালোবাসা না থাকলে আপনার ঈমানে অপূর্ণতা থেকেই যাবে। এটাই বাস্তবতা, যার কথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন—

> তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব।[৩৩৫]

০৬.

---

৩৩৪ দেখুন—٨/٧٨ غاية المحتاج للرملي

৩৩৫ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম*

খুবাইব মক্কায় বন্দি দিন যাপনের সময় যে অলৌকিক বিষয় (ফলের মৌসুম না। ফল আসারও কোনোই ব্যবস্থা নেই; তবুও তিনি ফল পেয়েছেন) থেকে বোঝা যায়, একজন নবির পক্ষে যা মুজিজা হতে পারে, তা একজন ওলির জন্য কারামত হতে পারে। তবে এ দুটির মাঝে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে —

- **এক.** নবিদের মুজিজা—এটা তাঁর নবুয়তের দাবিকে সত্যায়ন করে। এখানে চ্যালেঞ্জের ব্যাপার রয়েছে ।
- **দুই.** ওলিদের কারামত—এটা স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে, এখানে চ্যালেঞ্জের কোনো ব্যাপার থাকে না।

এটা জুমহুর আহলুস সুন্নাহর (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের বড়ো অংশের) অভিমত। খুবাইবের ব্যাপারটা এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কথা বলবে। খুবাইবের ব্যাপার প্রমাণিত সত্য। আমরা তা ইমাম বুখারিসহ অন্যান্যদের বর্ণনায় দেখেছি।

০৭.

এখানে প্রশ্ন হলো—কেন আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের এত শক্তি দিলেন? কেন তাদের পরাজয়বরণ করালেন? অথচ তারা তো তার দ্বীন প্রসারের কাজেই গিয়েছিলেন।

জবাব একটাই—আগেও অনেকবার এ রকম জবাব দিয়েছি।

মুসলিমদের এ রকম কঠিন বিপদে ফেলার হিকমত হলো—এর মাধ্যমে পার্থক্যরেখা টানা হবে। মুনাফিক গোষ্ঠী থেকে সত্যিকার মুসলিমদের সহজে আলাদা করা যাবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা নিজেকে বিলিয়ে দিতে তৎপর, তাদের চেনা যাবে। আল্লাহ ও বান্দাদের মাঝে যেই চুক্তি হয়েছিল—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে;

অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।[৩৩৬]

এই আয়াত এর বাস্তব রূপ প্রতিবিম্ব হবে।

এখন যদি সেই চুক্তিরই বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে এ চুক্তির কী লাভ? বরং এ চুক্তি রাখারই-বা অর্থটা কী? যার বিনিময়ে সে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে?

দুনিয়ার পেছনে অত্যধিক ছুটে বেড়ানো, দুনিয়া যতটুকু গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল, এরচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া এবং আখিরাতের বিষয়ে সম্পৃক্ততা কম থাকা অর্থাৎ যেগুলো দুর্বল ঈমানের পরিচয় বহন করে—এগুলো এক্ষেত্রে (চুক্তি বাস্তবায়নে) মূল সমস্যা। এসব সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তিদের থেকে জানমালের উৎসর্গের আশা পোষা যায় না।

পক্ষান্তরে যারা প্রকৃত মুমিন, তাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। কঠিন বিপদ তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই না। আল্লাহর নিকটবর্তী করে—এমন কোনো একটা আনুগত্য করতে গিয়ে যদি তাকে বন্দিও হতেও হয়, তাহলে তা দুনিয়ার উপভোগের চেয়ে তার নিকট প্রিয়। তাদের প্রাণোৎসর্গের কারণ হলো—সংকীর্ণ দুনিয়ার জেল থেকে বেরিয়ে জান্নাতের দিকে যাওয়া। যা মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত আশা। এ অনুভূত টাই খুবাইবকে হত্যার সময় তার কবিতায় ফুটে উঠেছে—

ولست بمبد للعدو تخشعا :: ولا جزعا إلي إلى الله مرجعي

আমি শত্রুর সামনে বিনয় প্রকাশকারী নই। তাদের সামনে আমি ভীত নই, উৎকণ্ঠিতও নই। আল্লাহর কাছেই তো আমার সর্বশেষ ফিরে যাওয়া। (আমি সেখানেই সবকিছুর প্রতিদান পাব।)

* * *

৩৩৬ সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১



বনু নাজিরের দেশান্তর

নবিজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র

চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে এ ঘটনাটি ঘটে। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত একদল সাহাবায়ে কিরাম নিয়ে শনিবারে বের হলেন। কুবা মসজিদে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এরপর বনু নাজিরের কাছে গেলেন। নবিজি তাদের কিলাব গোত্রের দুই ব্যক্তি (যাদের সাথে নবিজির চুক্তি ছিল, যাদের আমর ইবনে উমাইয়া আজ-জামরি হত্যা করে)-র দিয়তের (রক্তপণ) ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে বললেন। কারণ, বনু আমির ও বনু নাজিরের মাঝে চুক্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

ইবনে ইসহাকসহ অনেকেই বর্ণনা করেছেন—

> তারা প্রত্যুত্তরে বলল, হে আবুল কাসিম, আপনি যা চেয়েছেন, তা আমরা অবশ্যই পালন করব।
>
> কিন্তু ওদিকে তারা একান্ত বৈঠক করে নবিজির ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের জাল ফাঁদল। নবিজি বনু নাজির গোত্রের কোনো এক ঘরের দেওয়ালের পাশে বসা ছিলেন। আমর ইবনে জাহাশ আন-নাজারি বলল, আমি ঘরের ছাদের ওপরে উঠে তাঁর মাথায় পাথর নিক্ষেপ করব।

ইবনে সাদের বর্ণনায় পাওয়া যায়—

এ কথা শুনে সালাম ইবনে মুশকিম (বনু নাজিরেরই একজন ইহুদি) বলল, তোমরা এ রকম কিছু করতে যেয়ো না। তোমরা যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছ, তার কথা তিনি অবশ্যই জেনে যাবেন। পরিশেষে আমাদের পারস্পরিক চুক্তি বিনষ্ট হবে।[৩৩৭]

নবিজি তাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে দ্রুত সেখান থেকে সটকে পড়লেন। মদিনার দিকে ছুটলেন। সাহাবায়ে কিরাম তার পেছনে পেছনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি উঠে এলেন যে!

নবিজি বললেন—ইহুদিরা আমার (হত্যার) ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই উঠে এলাম।

এরপর নবিজি তাদের বলে পাঠালেন—তোমরা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছ, তোমরা আমার শহর থেকে বের হয়ে যাও। তোমাদের দশ দিনের সময় দিচ্ছি; এরপর যাকে দেখা যাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ইহুদিরা বের হওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল; কিন্তু ইবনে উবাই তাদের বলে পাঠাল, তোমরা তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের হবে না। নিজেদের দুর্গে অবস্থান করবে। আমার সাথে আমার গোত্রের দুই হাজার লোক রয়েছে । অন্যরাও আছে। তারা সবাই তোমাদের পক্ষ হয়ে লড়বে। তোমরা বের হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসো। নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নাও।

মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের এ উসকানিতে বনু নাজিরের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কথা জেনে নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও তাদের এলাকা অভিমুখে ছুটতে আদেশ করলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহবায়ে কিরামকে নিয়ে তাদের অভিযানে বের হলেন। ইহুদিরা তখন দুর্গে অবস্থান করছে। সঙ্গে তির, পাথর; কিন্তু ইবনে উবাই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা রাখল না। বনু নাজির এখন মুসলিমদের সামনে অসহায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অবরোধ করলেন। তাদের খেজুরগাছ কেটে বিনষ্ট করে দিতে বললেন।[৩৩৮]

---

৩৩৭ *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯৯

৩৩৮ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম*

তারা তখন নবিজিকে ডেকে ডেকে বলছিল—মুহাম্মাদ, তুমিই তো কোনো কিছুকে বিনষ্ট করা থেকে মানুষকে নিষেধ করতে। কেউ নষ্ট করলে তুমি তাকে দোষারোপ করতে। আর এখন তুমি নিজেই খেজুরগাছ কেটে ফেলার, তা জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিচ্ছ!

আল্লাহ তায়ালা তাদের এ কথার জবাবে এ আয়াত নাজিল করেন—

ما قَطَعتُم مِن لينَةٍ أَو تَرَكتُموها قائِمَةً عَلىٰ أُصولِها فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيُخزِيَ الفٰسِقينَ.

> তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন।[৩৩৯]

নবিজি তাদের যেভাবে বের হতে বলেছিলেন, তার ওপর তারা আপত্তি তুলল... কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আজ তা গ্রহণ করা হবে না। তোমরা শুধু তোমাদের রক্ত নিয়েই বের হবে। যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া উট যতটুকু মাল বহন করে নিয়ে যেতে পারে, ততটুকু মালই শুধু সঙ্গে নিতে পারবে। ইহুদিরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিল। তারা উটের পিঠে যতটুকু মাল বহন করা সম্ভব নিয়ে নিল।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, তাদের এক ব্যক্তি তার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে তা উটের পিঠে করে নিয়ে চলছিল।

পরিশেষে বনু নাজিরের ইহুদিরা শাম ও খাইবারের মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস শুরু করল। তাদের মধ্য থেকে দুজন ইসলাম গ্রহণ করে। ইয়ামিন ইবনে উমাইর ইবনে কাব ইবনে আম্মি আমর ইবনে জাহাশ ও আবু সায়িদ ইবনে ওয়াহাব।

ফলে তারা নিজেদের মাল ফিরে পায়।[৩৪০]

বনু নাজিরের সম্পত্তি নবিজির জন্যই বিশেষভাবে ছিল। এরপরও এ থেকে তিনি মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করেন। খুব দরিদ্র হওয়ার কারণে আনসারদেরও দুজনকে দিয়েছেন। সাহল ইবনে হানিফ, আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারশা। বালাজুরি *ফুতুহুল বুলদানে* বর্ণনা করেছেন—

---

৩৩৯ সূরা হাশর, আয়াত : ৫

৩৪০ বিস্তারিত আরও জানতে দেখুন—*তাবাকাতু ইবনি সআদ, সিরাতে ইবনে হিশাম, তারিখুত তাবারি, তাফসিরে ইবনে কাসির*, সূরা হাশরের তাফসির।

বনু নাজির থেকে প্রাপ্ত খেজুরগাছের নিচে থাকা জমিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাষ করে ফসল তুলতেন। এ থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন ও স্ত্রীদের এক বছরের খাবার চলত। আর অতিরিক্ত যা থাকত, তা তিনি মুসলিমদের অস্ত্রশস্ত্রের কাজে ব্যয় করতেন।[৩৪১]

বনু নাজিরের ব্যাপারেই পুরো সূরা হাশর নাজিল হয়। বনু নাজিরের মাল বণ্টনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই নীতি অবলম্বন করেছেন, এর ব্যাপারে আয়াত নাজিল হয়—

وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِنهُم فَما أَوجَفتُم عَلَيهِ مِن خَيلٍ وَلا رِكابٍ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

আল্লাহ বনু নাজিরের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি; কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা, তাঁর রাসুলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِن أَهلِ القُرىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذِى القُربىٰ وَاليَتٰمىٰ وَالمَسٰكينِ وَابنِ السَّبيلِ كَى لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم ۚ وَما ءاتىٰكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهىٰكُم عَنهُ فَانتَهوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ.

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসুলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[৩৪২]

* * *

৩৪১ বিস্তারিত জানতে— *উয়ুনুল আসার*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১
৩৪২ সূরা হাশর, আয়াত : ৬-৭

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এটা ইহুদিদের চিরাচরিত স্বভাব—গাদ্দারি, খেয়ানত, বিশ্বাস ভঙ্গ, ধোঁকাবাজির ঐতিহাসিক দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এর আগে ইহুদিদের আরেকটি গোত্র বনু কাইনুকা এ রকম বিশ্বাসঘাতকতা করছিল।[৩৪৩]

এটাই ইহুদি জাতির ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এর ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে । সবগুলো এখানে তুলে ধরার সুযোগ দেখছি না। তাদের এসব অনৈতিক কাজই তাদের ঘিরে ধরা আল্লাহর লানতের কারণ। কুরআন তাদের লানতপ্রাপ্তির চিত্র এভাবে তুলে ধরেছে—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

> বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফির, তাদের দাউদ ও মারইয়ামতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত।[৩৪৪]

বনু নাজিরের এই ঘটনায় আমাদের বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। ইসলামি শরিয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের (বিধিবিধান) গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে এখানে—

০১.

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহুদিদের গোপন ষড়যন্ত্রে সম্পর্কে নবিজিকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা নবিজির অন্যতম মুজিজা হিসেবে পরিগণিত। নবি-জীবনে এ রকম

---

৩৪৩ (পূর্বে 'বনু কাইনুকা: মুসলিমদের সাথে ইহুদিদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা' এ শিরোনামে অধীনে তাদের নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি।)

৩৪৪ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৭৮

মুজিজার উপস্থিতি ঢের। শুধু যে নবুয়তপ্রাপ্তির পর ঘটেছিল তা না; নবুয়ত লাভের আগেও কিছু মুজিজা প্রকাশ পেয়েছিল। কেন এত মুজিজা? কারণ, যেন আমরা তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করতে পারি।

নবিজির প্রতি কি ইলহাম হতো

কোনো কোনো সিরাতবিশারদ নবিজির এই আশ্চর্য মুজিজাকে 'ইলহাম' হিসেবে ব্যক্ত করেন। এখানে আমার আপত্তি আছে।

তাঁর ক্ষেত্রে ইলহামের প্রয়োগ হবে কীভাবে? ইলহাম জিনিসটা ব্যাপক। এটা যেকোনো মানুষের ক্ষেত্রেই হতে পারে। ইলহাম মানে, যেখানে বিভিন্ন কারিনা ও ইশারা (ইঙ্গিত ও প্রসঙ্গ) থাকবে এবং এসব কিছুর সমন্বয়ে আশ্চর্যজনক কিছু ঘটবে। এটাকে ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যে কারও ক্ষেত্রেই হতে পারে। পক্ষান্তরে সিরাতবিশারদগণের সংজ্ঞামতে, খবরে ইলাহি (আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জানানো সংবাদ) হলো, যেটা নবুয়তের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।

আমরা জানি, এটাই (নবিজি যেই খবরে ইলাহিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত) সেই জিনিস; যার মাধ্যমে নবিজির ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন। এটা নবিজির ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি—

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

আর আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন।[৩৪৫]

—এই প্রতিশ্রুতিরই বিশেষ একটি অংশ। তো, ব্যাপারটি এমন হলে কীভাবে নবিজির এ বিশেষ জানাকে 'ইলহামের পরিচয়ে ব্যক্ত করা যায়?...

আমি মনে করি, এ ধরনের বক্তব্য মূলত নবিজির মুজিজাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। আর (আমরা আগেও জেনে এসেছি) নবিজির মুজিজা প্রমাণ্য হওয়ার পরও তা অস্বীকারের সূত্রপাত নবিজির ব্যাপারে বিশ্বাসের দুর্বলতা থেকেই হয়ে থাকে।

০২.

বনু নাজিরের গাছ কর্তন ও জ্বালানো হয়েছে—এ ব্যাপারে সবাই একমত। তবে মনে রাখতে হবে, নবিজি যা নষ্ট করেছেন, তার পরিমাণ হলো 'যা নষ্ট

৩৪৫ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

করেননি'—এর চেয়ে অনেক কম। নবিজির কাজ ছিল যথার্থ। এর সমর্থনে কুরআনের আয়াত পর্যন্ত নাজিল হয়েছে—

ما قَطَعتُم مِن لينَةٍ أَو تَرَكتُموها قائِمَةً عَلىٰ أُصولِها فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيُخزِيَ الفٰسِقينَ ۝

তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন।[৩৪৬]

এখান থেকে অধিকাংশ আলিম মনে করেন, শত্রুপক্ষের ধনসম্পদ এ রকম বিনষ্টকরণে যদি ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক বা প্রধান সেনাপতি কোনো কল্যাণ দেখেন, তাহলে তা করতে পারবেন। এ মাসয়ালাটি মূলত 'আস-সিয়াসাতুস শারইয়্যাহ' (ইসলামি রাজনীতি)-এর আলোচনা।

নবিজি যে এখানে যে কাজটি করেছেন, তা কল্যাণ বুঝেই করেছেন। এখানে তার পরে ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক যারা হবেন, তাদের জন্য ইরশাদ (নির্দেশনা) রয়েছে।

এক্ষেত্রে (শাসকের জন্য শত্রুর সম্পদ বিনষ্টকরণের বৈধতার ব্যাপারে) ইমাম শাফিয়ি রহ. আরেকটা ইল্লত (কারণ) বলেন। শামের বিভিন্ন যুদ্ধে আবু বকর রা. কর্তন বা জ্বালানো—এসব কাজ থেকে নিষেধ করেন; কিন্তু তিনিই যখন খালিদকে তুলাইহা ও বনু তামিমের অভিযানে পাঠান, তখন 'কাটো, জ্বালাও-পোড়াও'-এর আদেশ করেন।

ইমাম শাফিয়ি রহ এ ব্যাপারে বলেন—

'আবু বকর রা. যে ফলপ্রদ গাছ না কাটতে আদেশ করেছেন, এটা সম্ভবত এ কারণে যে, তিনি নবিজি থেকে মুসলিমদের শাম বিজয়ের সংবাদ শুনেছিলেন। সুতরাং তার জন্য কর্তন করা না-করা দুটিরই অনুমতি ছিল। তিনি মুসলিমদের কল্যাণে কর্তন না করাকে বেছে নিয়েছেন।'[৩৪৭]

আমরা যে ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধান কোনো কল্যাণ দেখলে তার জন্য কাফিরদের সম্পদ বিনষ্ট করা গাছকাটা, জ্বালানো ইত্যাদির বৈধতার কথা বললাম, এটি নাফে (মাওলা

---

৩৪৬ সূরা হাশর, আয়াত : ৫

৩৪৭ *কিতাবুল উম্ম*, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন আমার বই—ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية

ইবনে উমর), মালিক, সুফিয়ান আস-সাউরি, আবু হানিফা, শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক ও জুমহুর ফুকাহার (অধিকাংশ ফকিহ আলিমের) মত। তবে লাইস, ইবনে সাদ, আবু সাওর ও আউজায়ি থেকে নাজায়িজ হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত আছে।[৩৪৮]

০৩.

যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমরা কাফিরদের থেকে যে গনিমত লাভ করবেন (পরিভাষায় যাকে 'ফাই' বলা হয়।), এতে শাসক যেভাবে কল্যাণ মনে করেন, সেভাবে তাসাররুফ (ব্যয়) করা হবে। যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল যেভাবে সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করতে হয়, সেভাবে তা বণ্টন করা আবশ্যক না। এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত। তাদের প্রমাণ—নবিজি বনু নাজিরের ফাই সব সৈন্যদের দেননি। শুধু মুহাজিরদের দিয়েছেন। কুরআনও তার এ কাজকে সমর্থন করেছে—

وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِنهُم فَما أَوجَفتُم عَلَيهِ مِن خَيلٍ وَلا رِكابٍ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَن يَشاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ.

আল্লাহ বনু নাজিরের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যে ধনসম্পদ দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি, কিন্তু আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা, তাঁর রাসুলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلىٰ رَسولِهِ مِن أَهلِ القُرىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربىٰ وَاليَتٰمىٰ وَالمَسٰكينِ وَابنِ السَّبيلِ كَي لا يَكونَ دولَةً بَينَ الأَغنِياءِ مِنكُم ۚ وَما ءاتىٰكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَما نَهىٰكُم عَنهُ فَانتَهوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ.

আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসুলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য; যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ

৩৪৮ *শারহুন নাবাবি লিমুসলিম*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৫০

করেন, তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।[৩৪৯]

কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা যদি ভূমি লাভ করেন, তাহলে এক্ষেত্রে আলিমগণ ইখতিলাফ করেন। ইমাম মালিকের মত হলো—তা বণ্টনই করা হবে না। এটা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে থাকবে। মুসলিমদের কল্যাণের কাজে ব্যবহার হবে। তবে শাসক যদি মনে করেন তা বণ্টন করে দিলেই ভালো, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। হানাফিদের মাজহাবও প্রায় কাছাকাছি। তবে ইমাম শাফিয়ি মনে করেন, অন্যান্য কিছুর মতো একেও বণ্টন করা আবশ্যক। ইমাম আহমাদের মাজহাবের জাহিরও (বাহ্যিক রূপ) এটাই।

শাফিয়ি রহ.-এর দলিল—বনু নাজিরের মালে নবিজির সাধারণ নিয়মের বিপরীত তাসাররুফ এটা ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। সরাসরি আয়াতই নবিজির এ কাজের ব্যাপারে কথা বলেছে—

ما قَطَعتُم مِن لينَةٍ أَو تَرَكتُموها قائِمَةً عَلىٰ أُصولِها فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيُخزِيَ الفٰسِقينَ.

তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশ এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন।[৩৫০]

এটা যেহেতু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সম্পৃক্ত, তাই ওই পরিপ্রেক্ষিতের অনুপস্থিতিতে স্বাভাবিক হুকুম ফিরে আসবে; চাই তা ভূমি হোক বা অন্য কিছু। আবু হানিফা ও মালিকের দলিল প্রচুর। এর মাঝে অন্যতম হলো, উমর রা. 'সাওয়াদুল ইরাক' (ইরাকের কৃষিসমৃদ্ধ এলাকা ও ভূমি; যা উমর রা.-এর শাসনামলে মুসলিমরা জয় করেন) বণ্টনে নিষেধ করেন। তিনি বরং তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে রাখেন, যার খারাজের (ভূমিকর) মাধ্যমে মুসলিমদের লাভ হবে। এ জটিল বিষয় নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই।

এখানে নবিজি বনু নাজিরের মাল বণ্টনে যে নীতি অবলম্বন করেছেন এবং সে নীতির স্পষ্টকরণে যে আয়াত দুটি নাজিল হয়েছিল, সে আয়াত দুটিতে যে তালিল

---

৩৪৯ সূরা হাশর, আয়াত : ৬-৭

৩৫০ সূরা হাশর, আয়াত : ৬

(কারণ) বলা হয়েছে, তা বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এখানে—

كَيْ لا يَكونَ دولَةً بَيْنَ الأَغنِياءِ مِنكُم.

যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।[৩৫১]

তালিল হিসেবে 'সম্পদ সীমাবদ্ধ না হওয়া'-কে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সম্পদ যেন বিত্তশালী শ্রেণির মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে।

এ কারণ থেকে বোঝা যায়—ইসলামি অর্থনীতি এ আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি অর্থনীতির বিস্তর আলোচনাসমৃদ্ধ বই পাঠ করলে বোঝা যাবে, ইসলামি অর্থনীতি যা চায়, তা হলো—একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য থাকবে। যার মাধ্যমে বিদ্রোহের পথগুলো বন্ধ হবে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হবে না। ইসলামি অর্থনীতির বাস্তব রূপ যদি সমাজে প্রয়োগ করা হয়, জাকাত ঠিকমতো আদায় করা হয়, সুদের অবৈধতার প্রয়োগ করা হয়, গুদামজাতকরণের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তাহলে সমাজের মানুষ শান্তির জীবনযাপন করবে। তাদের আয়ের রূপ হয়তো ভিন্ন হবে; কিন্তু সবারই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আল্লাহ যেহেতু এ শরিয়তের মাধ্যমে এ রকম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন এজন্য কিছু আসবাব ও ওসায়েলও (উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থা) প্রণয়ন করবেন; যা আমাদের মানতে হবে, যা থেকে বেরোনো যাবে না। চূড়ান্ত সেই উদ্দেশ্য পৌঁছতে হলে আল্লাহর প্রণীত সেসব ওসিলা ও আসবাবের অনুসরণ অবশ্যই করতে হবে। ইতিহাসে এর জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। ইতিহাসই এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষ্য দেবে।

প্রিয় পাঠক, সূরা হাশর আবার পুরোটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। আল্লাহ তায়ালা এ পুরো ঘটনা ও ঘটনা-সংশ্লিষ্ট বিষয়—ইহুদি, মুনাফিক, নবিজির নীতি ও রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে যে তালিক (পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন) করেছেন, তা ভালো করে ভাববেন। এ সূরা গভীর মনোযোগে পাঠ করলে আপনি এই সুরায় আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কী কী শিক্ষা রেখেছেন, তা বুঝতে পারবেন।

* * *

৩৫১ সূরা হাশর, আয়াত : ৭

অনুবাদক পরিচিত

মুসা আমান। লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক। হিফজ-২০০৯। দাওরা-২০১৮। ইলুমিনাতি, আরব্য রজনীর অজানা অধ্যায়, আমাদের আকিদা, ছোটোদের আকিদা তার অনূদিত-সম্পাদিত বই।

উবায়দুল্লাহ তাসনিম। দাওরা, জামিআতুল উলুমিল ইসলামিয়া ও আরবি সাহিত্য, মাদানি নগর মাদরাসা। তরুণ অনুবাদক। ইখলাস প্রথম অনূদিত বই। নবিজির মাদরাসা-সহ আরও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশের পথে।

ফিকহুস সিরাহ (দ্বিতীয় খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

রচনা

শাইখ ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি

মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত আলিম ও ফকিহ

অনুবাদ

মুসা আমান

উবায়দুল্লাহ তাসনিম

ভাষা সম্পাদনা

জাবির মুহাম্মাদ হাবীব

ইহদিনা

ফিকহুস সিরাহ (দ্বিতীয় খণ্ড)

(নবি-জীবনের পাঠ : শিক্ষা ও উপদেশ)

গ্রন্থস্বত্ব © ইহদিনা পাবলিকেশন

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

মুফতি হাবীবুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া, যায়েদ মুহাম্মাদ, আম্মার আবদুল্লাহ, কাজী আকরাম, রুহুল আমিন, উবাইদ উসমান ও অন্যান্য

প্রকাশকাল

প্রথম বাংলা সংস্করণ : অক্টোবর ২০২১

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

অনলাইন পরিবেশক

বইকেন্দ্র, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, ইহদিনা, মানজিল, বইফেরী, বইসদাই

প্রচ্ছদ ডিজাইন

ফয়সাল মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা

মানজিল গ্রাফিক্স

ISBN : 978-984-34-7806-1

মুদ্রিত মূল্য : ৭০০ টাকা

প্রকাশনায়

ইহদিনা পাবলিকেশন

দোকান নং-২১, ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭০৭-৭৫২০৪৪

সংক্ষিপ্ত সূচি

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	গাজওয়া জাতির রিকা	৯
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭
	গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিক	২৫
	ইফকের ঘটনা	২৯
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৪
	গাজওয়ায়ে খন্দক	৪৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৫৯
	গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা	৭২
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৭৬
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
	হুদাইবিয়ার সন্ধি	৮৬

	বাইয়াতে রিদওয়ান	৯৬
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৯৭
	সন্ধি-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১০৫
	গাজওয়ায়ে খাইবার	১১৪
	জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর প্রত্যাবর্তন	১২০
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১২২
	গাজওয়ায়ে খাইবার-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১২৪
	গাজওয়াসংক্রান্ত আরও দুটি ঘটনা	১৩৪
	বিভিন্ন গোত্রে বাহিনী এবং বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ	১৩৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৪৪
	পত্র-রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট আহকাম	১৫৩
	কাজা উমরাহ আদায়	১৫৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৬০
	কাজা উমরাহ-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১৬২
	গাজওয়ায়ে মুতা	১৬৪
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	১৭২
	সংশ্লিষ্ট আহকাম : গাজওয়ায়ে মুতা	১৭৫
	মক্কা বিজয়	১৭৯
	মক্কা বিজয়-সংশ্লিষ্ট আহকাম	১৯৬
	গাজওয়ায়ে হুনাইন	২১৮
	গনিমত : নবিজির বণ্টনপদ্ধতি	২২৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৩১

	গাজওয়ায়ে তাবুক	২৪৩
	মনের কাছে পরাজিত তিন সৈনিক	২৫২
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৫৮
	গাজওয়া-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও বিধিবিধান	২৬১
	৯ম হিজরি : আবু বকর রা.-এর হজ পালন	২৭৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৭৮
	মসজিদে জিরার	২৮৪
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৮৭
	বসু সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমন	২৯০
	আরবের বিভিন্ন গোত্রের ধারাবাহিক আগমন	২৯৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	২৯৭
	ঘটনা-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা	৩০০
	আদি ইবনে হাতিমের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা	৩০৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩০৮
	ইসলামের মৌলিক শিক্ষাপ্রদানে প্রতিনিধি প্রেরণ	৩১৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩১৬
	বিদায় হজের অপূর্ব ভাষণ	৩১৯
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩২৫
	নবিজির অসুস্থতা : অনন্তের পথে যাত্রা	৩৩৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৪৬
	সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও আহকাম	৩৪৯

	খিলাফতে রাশেদা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	
	খলিফাতুর রাসুল আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল	৩৬৩
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৭১
	খলিফাতুর রাসুল উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকাল	৩৭৫
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৩৮৫
	খলিফাতুর রাসুল উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-এর খিলাফতকাল	৩৯১
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪০৫
	খলিফাতুর রাসুল আলি ইবনে আবু তালিব-এর খিলাফতকাল	৪১০
	জামাল যুদ্ধের পটভূমি	৪১১
	সিফফিন যুদ্ধের পটভূমি	৪১৭
	আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ	৪২৮
	উপসংহার	৪৩৩
	লেখক পরিচিতি	৪৩৯
	অনুবাদক পরিচিতি	৪৪২
	আমাদের প্রকাশিত বই	৪৪৩
	পাঠকের নোট	৪৪৪



গাজওয়া জাতির রিকা

গাজওয়াতু জাতির রিকা। চতুর্থ হিজরিতে বনু নাজির দেশান্তর হওয়ার প্রায় দেড় মাস পর এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মত এটিই। তবে ইমাম বুখারিসহ অন্য অনেক মুহাদ্দিস খাইবার যুদ্ধের পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মতকে প্রাধান্য দেন।

যুদ্ধের কারণ

নজদের অনেকগুলো গোত্র মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা সত্তরজন দায়ি (দ্বীন প্রচারক) সাহাবায়ে কিরামকে হত্যার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। বনু সা'লাব-সহ যেসব গোত্র যুদ্ধ (হত্যা) করছিল, তাদের অভিযানের উদ্দেশে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হন। আবু জর গিফারি রা.-কে মদিনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকের দায়িত্বে নিযুক্ত করে যান। নজদের 'নাখল' নামক স্থানে (গাতফান গোত্রের ভূমি) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু গাড়েন।

ইবনে হিশামের মতে—

> প্রতিপক্ষ বিপুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করেন। ফলে তারা মুসলিমদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এখানে কোনো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়নি।

তবে সবকিছুর পরও এ যুদ্ধের পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা রয়েছে। আমাদের জানার মতো অনেকগুলো বিষয়-আশয় রয়েছে এখানে। সংক্ষেপে পুরো ঘটনা উল্লেখ করার সাথে সাথে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পয়েন্টগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

০১. আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত—

> আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে বের হলাম। আমরা ছয়জনের ছোট্ট একটি দল ছিলাম। আমাদের মাত্র একটি উট ছিল। আমরা এতে পালাক্রমে উঠতাম।

তিনি বলেন—

> (অধিকাংশ পথ পায়ে হাঁটার কারণে) আমাদের পায়ের নিচে ছিদ্র হয়ে যায়। আমারও দু-পায়েও ছিদ্র হয়। আমার (পায়ের) নখগুলো উঠে যায়। তাই আমরা নিজেদের পা পট্টি দিয়ে বেঁধে রাখলাম। আমরা যেহেতু এ যুদ্ধে নিজেদের পা পট্টি দিয়ে বেঁধে রাখছিলাম, তাই এ যুদ্ধকে 'গাজওয়াতু জাতির রিকা' (বা পট্টিবিশিষ্ট যুদ্ধ) বলা হয়।

এই বর্ণনাটি আবু মুসা আশআরি বর্ণনা করার পর পরবর্তী সময়ে একে অন্যদের কাছে বর্ণনা করাকে অপছন্দ করেছেন। সম্ভবত তিনি তার কোনো আমল প্রকাশ করাকে অপছন্দ করতেন।[১]

০২. ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম, দুজনই এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন—

> গাজওয়াতু জাতির রিকায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতুল খাওফ বা ভয়ের সালাত আদায় করেন। (এই সালাত আদায়ের নিয়ম ছিল এ রকম) একদল নবিজির সাথে কাতারে দাঁড়াত। আরেক দল শত্রুদের মোকাবিলা করত। যারা কাতারে দাঁড়িয়েছে, তাদের নিয়ে নবিজি এক রাকাত পড়তেন। এরপর নবিজি (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) দাঁড়িয়ে যেতেন। আর তারা নিজেদের সালাত পূর্ণ করে নিতেন। এরপর তারা ফিরে গিয়ে শত্রুর মুখে দাঁড়াতেন। এরপর অন্য দলটি আসত। নবিজি তাদের নিয়ে তার সালাতের বাকি রাকাত পূর্ণ করতেন। এরপর বৈঠকে

---

১ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

বসতেন। ওদিকে তারা নিজেদের রাকাত পূর্ণ করতেন। এরপর নবিজি তাদের নিয়ে সালাম ফেরাতেন।[২]

এখানে *সহিহ মুসলিমে*-এর বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, সালাতের প্রস্তুতি হয়ে গেলে তিনি (প্রথম) দলকে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর তারা পেছনে সরে যান। (অন্য দল এলে তাদের নিয়ে আরও দুই রাকাত আদায় করেন।

তিনি (জাবির রা.) বলেন—সুতরাং নবিজির চার রাকাত হয়েছিল। আর প্রত্যেক দলের হয়েছিল দুই রাকাত করে। আমি এ দুই হাদিসের সমন্বয়ে বলব—নবিজি সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে একাধিকবার সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। দুইবার দুই রকম আদায় করেছেন। প্রথম যে পদ্ধতি বলা হলো, সে পদ্ধতিতে একবার। আর দ্বিতীয় যে পদ্ধতির বর্ণনা এসেছে, সে পদ্ধতিতে আরেকবার।

সহিহ মুসলিমে-এর এ হাদিস থেকে বোঝা যায়—মুসাফির ইচ্ছে করলে, চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতের পুরোটাই করতে পারে। আবার কসরও (দুই রাকাত) আদায় করতে পারে। এটি ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহর মত। হানাফি ফকিহদের মত এক্ষেত্রে ভিন্ন।...

০৩. ইমাম বুখারি রহ. বিখ্যাত সাহাবি জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন, তিনিও তার সাথে ফিরছিলেন। পথমধ্যে একটি উপত্যকায় এসে তাদের কাইলুলার[৩] সময় হয়ে এলো। সেখানে ছিল প্রচুর 'ইদাত'[৪]। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামলেন। সাহাবিগণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গাছের নিচে ছায়া গ্রহণ করছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সামুরা'[৫] গাছের তলায় নামেন। গাছে নিজের তলোয়ারটা ঝুলিয়ে রাখেন।

জাবির রা. বলেন—

আমরা সবাই সামান্য ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকছেন। আমরা দ্রুত তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি, তাঁর

---

২ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৩; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৪

৩ দুপুরে খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রামকে কাইলুলাহ বলা হয়।

৪ একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ।

৫ বাবলাগাছ; এটি একপ্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ; যা উটের খাবার।

কাছে একজন গ্রাম্য লোক বসা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠে দেখি, সে আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে কোষমুক্ত করে আমার ওপর উঁচিয়ে ধরে বলছে—এবার আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?

আমি বললাম, আল্লাহ। (হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল) এরপর থেকে সে এ রকম বসে আছে...এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো শাস্তি দেননি।[৬])

পরিশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাফ করে দেন।[৭]

০৪. ইবনে ইসহাক ও ইমাম আহমাদ জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন—

গাজওয়াতু জাতির রিকায় আমরা নবিজির সাথে বেরোলাম। যুদ্ধে এক মুশরিক নারী আহত হলো। তার স্বামী তখন সেখানে নেই। (খবর শুনে) সে এলো। শপথ করল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের রক্ত ঝরানো পর্যন্ত সে নিবৃত্ত হবে না। ওদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে যাচ্ছিলেন। সে নবিজির অনুসরণ করে ছুটল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্থানে নামলেন। তিনি বললেন, আজকের রাতে কে আমাদের পাহারা দেবে? তিনি (জাবির) বলেন, একজন মুহাজির ও একজন আনসার নবিজির ডাকে সাড়া দিলেন।[৮] তারা দুজন বললেন—আমরা পাহারা দেবো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা গিরিপথের মুখে থাকবে।

তিনি (জাবির) বলেন—নবিজি ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম একটি উপত্যকার গিরিপথে নেমেছিলেন।

পাহারার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবি দুজন যখন গিরিপথের মুখে গেলেন, তখন আনসারি সাহাবি মুহাজির সাহাবিকে বললেন—রাতের কোন অংশে আপনি পাহারা দিতে পছন্দ করেন, শুরুতে নাকি শেষে?

---

৬ অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণনা থেকে যেমনটা বোঝা যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহ' বলার পর কাফিরের হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। এরপর নবিজি তারবারি হাতে নিয়ে বলেন, তোমাকে কে এবার রক্ষা করবে? সে তখন এভাবে বসে কাকুতিমিনতি করে...

৭ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড ; ৫, পৃষ্ঠা : ৫২-৫৪

৮ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তারা দুজন হলেন—আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আব্বাদ ইবনে বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

তিনি বললেন—বরং আমাকে প্রথম অংশের দায়িত্ব দেন। এরপর মুহাজির সাহাবি হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আনসার সাহাবি তিনি সালাতে দাঁড়ালেন।

তিনি (জাবির) বলেন—ওই ব্যক্তি (মুশরিক নারীর স্বামী) এসে যখন তাকে সালাতে দেখল, তখন সে বুঝতে পারল, এই লোক মুসলিমদের পাহারাদার। তাই সে সালাতে থাকা সাহাবির ওপর একটা তির নিক্ষেপ করল। তিরটা এসে সাহাবির গায়ে বিদ্ধ হলো। তিনি সেটা খুলে রেখে আবার সালাতে দাঁড়ালেন। এরপর সে আরেকটা তির নিক্ষেপ করলে তাও এসে তার গায়ে বিদ্ধ হলো। তিনি সেটাও খুলে আবার সালাতে মগ্ন হলেন। তৃতীয়বার মারলে তাও খুলে ফেলে রুকু-সিজদা করেন। (এভাবে সালাত শেষ করেন)। এরপর তিনি তার সঙ্গীকে জাগান—উঠুন, (আমার সময় পার হয়েছে) আমার কাজ সম্পন্ন করেছি।

জাবির রা. বলেন—এরপর ওই সাহাবি ঘুম থেকে লাফ দিয়ে ওঠেন। এরপর যখন ওই ব্যক্তি তারা দুজনকে দেখল, তখন বুঝতে পারল, তার রহস্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। (সে ধরা পড়ে যাবে) তাই সে পালাল। মুহাজির সাহাবি আনসারি সাহাবির রক্ত দেখে বললেন—সুবহানাল্লাহ! প্রথমবার যখন তির নিক্ষেপ করছিল, তখন আমাকে জাগালেন না কেন?

তিনি বললেন—আমি একটি সুরা পড়ছিলাম। আমি চাইছিলাম না যে, ওই সুরা তিলাওয়াত বন্ধ করে দিই। (সালাত ছেড়ে দিই।)

আমার ওপর যখন একের পর এক তির এসে বিদ্ধ হতেই থাকল, তখন রুকুতে চলে গেলাম। এরপর (সালাত শেষ করে) আপনাকে অবহিত করলাম। আল্লাহর শপথ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সীমান্ত (উপত্যকার গিরিপথ) পাহারার যেই দায়িত্ব দিয়েছেন, তাতে ব্যাঘাত ঘটার ব্যাপার না হলে, (আমি সালাতে নিমগ্ন থাকতাম, আরও দীর্ঘায়িত করতাম। (ফলে) আমি সুরা শেষ বা সম্পন্ন করার আগেই আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যেত।[৯]

০৫. *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, তাবাকাতু ইবনে সাআদ, সিরাতে ইবনে হিশামে* জাবির রা.-এর সূত্রে বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেন—

গাজওয়াতু জাতির রিকায় আমি নিজের একটি দুর্বল উটে চড়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। (যুদ্ধ শেষে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

৯ মুসনাদু আহমাদ; তারিখুত তাবারি; সুনানু আবি দাউদ—সকলেই জাবির রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ওয়া সাল্লাম (উটে করে) ফিরছিলেন, তার উট চলছিল। (ওদিকে আমিও রওনা দিয়েছিলাম তার আগেই; কিন্তু আমার উটের গতি মন্থর হয়ে যাওয়াতে) আমি পেছনে পড়তে থাকলাম। এভাবে একসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এসে পেলেন। তিনি বললন—জাবির, তোমার কী হলো? (এখনও এত পেছনে যে!)

আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার এই উটের গতি খুবই মন্থর হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন—উটকে বসাও। আমি উটকে বসালাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও (নিজের উটনী) বসালেন। এরপর আমাকে বললেন—তোমার হাতের লাঠিটা দাও। আমি দিলাম। লাঠি হাতে নিয়ে তিনি (আমার) উটকে কয়েকটা খোঁচা দিলেন।

এরপর তিনি বললেন—এবার তুমি (উটে) আরোহণ করো। আমি আরোহণ করলাম। যেই সত্তা তাকে প্রেরণ করেছেন, তার শপথ, এরপর (আমার উটটি) তার উটনীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তার আগে আগে চলছিল।

(চলার পথে) আমি নবিজি নবিজির সাথে কথা বলছিলাম; তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—জাবির, তুমি কি আমার কাছে তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, বরং আমি তা আপনাকে হাদিয়া দেবো।

তিনি বললেন—না, এটা তুমি আমার কাছে বিক্রি করবে। আমি বললাম, তাহলে ইয়া রাসুলাল্লাহ, দরদাম করেন।

তিনি বললেন—এক দিরহামে হবে?

আমি বললাম—না, এটা তো আমাকে ঠকানো হয়ে যায়।

তিনি বললেন—তাহলে দুই দিরহাম?

আমি বললাম—না।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাম বাড়াতে থাকলেন। এমনকি এভাবে বাড়তে বাড়তে অবশেষে উটটির মূল্য 'উকিয়া' পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়।

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাহলে আপনি কি এর ওপর সন্তুষ্ট?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

আমি বললাম—তাহলে এখন থেকে এর মালিক আপনি। তিনি বললেন, আমি তা গ্রহণ করলাম।...

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—জাবির, তুমি কি ইদানীং বিয়ে করেছ?

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, জি, আমি বিয়ে করেছি।

তিনি বললেন—সে কি সায়্যিবা (আগে যার বিবাহ হয়েছে) না বাকিরা (আগে যার বিবাহ হয়নি)?

আমি বললাম—বাকিরা না, বরং সে সায়্যিবা।

তিনি বললেন—কোনো (বাকিরা) মেয়ে ছিল না? তুমি যার সাথে খেলতে (আনন্দ-খুনশুটি করতে) সেও তোমার সাথে খেলত?

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, উহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতা শহিদ হয়েছেন। তিনি তার সাতটি মেয়েকে আমার জিম্মায় রেখে গেছেন। তাই আমি এ রকম নারীকে বিবাহ করলাম, যে তাদের দায়িত্ব নিতে পারবে, যে তাদের দেখাশোনা করতে পারবে।

তিনি বললেন—ইনশাআল্লাহ, তুমি ঠিকই করেছ। আর শোনো, আমরা যখন সিরার (মদিনার উপকণ্ঠে একটি স্থান) পৌঁছাব, তখন উট জবাইয়ের আদেশ করব। আমরা সেখানে ওই দিনটা কাটাব। সে (জাবিরের স্ত্রী) আমাদের কথা শুনে বিছানাপত্র ঝাঁট দিয়ে গুছিয়ে রাখবে।

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ, আমাদের এক রকম কোনো বালিশ (বিছানা) নেই।

তিনি বললেন—তা অচিরেই হবে। তুমি যখন যাবে, তখন বুদ্ধির সাথে কাজ করবে।

জাবির বলেন—আমরা যখন সিরারে এলাম, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উট জবাইয়ের আদেশ দিলে উট জবাই করা হয়। আমরা ওই দিন সেখানে কাটালাম। সন্ধ্যাবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম (মদিনায়) প্রবেশ করলেন, আমরাও মদিনায় ঢুকলাম। জাবির রা. বলেন—সকালবেলায় উট নিয়ে (নবিজির

বাড়ির দিকে) রওনা হলাম। নবিজির দরজার সামনে উট বসালাম। এরপর নবিজির নিকটবর্তী মসজিদে আমি বসলাম।

নবিজি বের হয়ে যখন উট দেখতে পেলেন, তখন বললেন—এই উট আবার কোত্থেকে এলো? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এটা জাবিরের উট। জাবির নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, জাবির কোথায়? এরপর আমাকে তার কাছে যেতে বলা হলো। (আমি গেলে) তিনি বললেন—ভাতিজা, তোমার উট তুমি নিয়ে যাও, এটা তোমার। এরপর নবিজি বেলালকে ডেকে বললেন—তুমি জাবিরকে নিয়ে গিয়ে 'উকিয়া' দিয়ে দাও।

আমি তার সাথে গেলে তিনি আমাকে উকিয়া দিলেন। সঙ্গে আরও কিছু বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহর শপথ, তা আমার কাছে বাড়তেই থাকে। তার ঘর আমাদের বাড়ি থেকে দেখা যেত।[১০]

* * *

১০ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায়। ইবনে হিশামও এ রকমই বর্ণনা করেছেন। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমে*-এর বর্ণনাও এর প্রায় কাছাকাছি।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এ যুদ্ধ কবে হয়েছে

গাজওয়াতু জাতির রিকা বদর যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত। তবে পার্থক্য এতটুকু, তাদের কেউ বলেন—চতুর্থ হিজরিতে বনু নাজিরের পরে হয়েছে। আবার ইবনে সাআদ, ইবনে হিব্বানসহ অনেকেই বলেন—পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে।

এ দিকে ইমাম বুখারি *সহিহ বুখারি*-তে খাইবারের পরে সংঘটিত হওয়ার কথা বলেন; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—কিতাবে ঘটনাটি বিন্যাসের সময় তিনি এ যুদ্ধের কথা খাইবারের পূর্বে এনেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বুখারির মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তার দলিল—সালাতুল খাওফ (ভয়ের সালাত) জাতুর রিকায় শরিয়তসম্মত ছিল। এখন যদি তা খাইবারের আগেই হয়ে থাকে, তাহলে খন্দক যুদ্ধে (যা খাইবারের আগে) কেন সালাতুল খাওফ পড়লেন না? তিনি তো সেখানে পরে কাজা সালাত আদায় করেছেন।

তা ছাড়া 'সহিহ বুখারি' ও 'সহিহ মুসলিম'-এর বর্ণনায় এ যুদ্ধের নামকরণের কারণসহ আবু মুসা আশআরির বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি তো খাইবার যুদ্ধের পরে হাবশা থেকে ফিরে এসেছেন। তো, তিনি যদি খাইবারের পরেই আসেন, তাহলে খাইবারের আগে তিনি অংশগ্রহণ করেন কীভাবে?

ইবনুল কাইয়িম তার দলিলের ওপর প্রশ্ন তুলে বলেন—এসব দলিল দ্বারা সর্বোচ্চ এটা প্রমাণিত হয় যে, এটা খন্দকের পর সংঘটিত হয়েছে। (কিন্তু খাইবারের পর তা কোনোভাবেই না)"

---

১১ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯৪; *উয়ুনুল আসার*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩; *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১১

আমার মত হলো—এ যুদ্ধ নিশ্চিত খাইবারের আগেই সংঘটিত হয়েছে। এর কারণ, *সহিহ বুখারি-তে* আছে, খন্দক যুদ্ধের সময় জাবির রা. নবিজির কাছ থেকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি চান। নবিজির ক্ষুধার কথা স্ত্রীকে বলেন। (এখানে নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের দাওয়াতের ঘটনা রয়েছে। যেখানে নবিজির মুজিজা প্রকাশ পেয়েছে।) *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণনাও আছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজওয়াতু জাতির রিকার সময় জাবিরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ইদানীং বিয়ে করেছ?..

তো, দ্বিতীয় বর্ণনা থেকে যা বোঝা যাচ্ছে, তা হলো—জাবির রা. জাতুর রিকার পূর্বেই বিয়ে করেছেন। আর প্রথম বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, উহুদ যুদ্ধের পূর্বেই তার বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। তার স্ত্রী ছিল। তিনি নবিজির কাছে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন।

এসব থেকে বোঝা যায়—তা খন্দকের পূর্বে ছিল। খাইবারের পূর্বে তো বলাই বাহুল্য। তবে যারা এ মত (খাইবারের পূর্বে হয়েছে পোষণ করেন, তাদের কাউকে এর মাধ্যমে খন্দক জাতুর রিকার পরে হয়েছে—এ ব্যাপারে দলিল দিতে দেখিনি। আর যারা ভিন্নমত পোষণ করেন (অর্থাৎ খাইবারের পরের কথা বলেন), তাদেরও এর জবাব দিতে দেখিনি। যাহোক, সর্বাবস্থায় দলিলের দিক দিয়ে আমাদের মত শক্তিশালী।

ইবনে হাজার খন্দকে সালাতুল খাওফ না পড়ার যে দলিল দেন, এটাও বেশ জুতসই না। হয়তো সেখানে মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে পাথর নিক্ষেপ চলমান থাকার কারণে এ রকম সালাতের সুযোগ আসেনি।

এখানে এটাও হতে পারে, খন্দকের যুদ্ধে কাফিররা কিবলার দিকে ছিল, গাজওয়াতু জাতির রিকায় ছিল না। তাই এক জায়গায় আদায়ের সুযোগ পেয়েছেন। আরেক জায়গায় পাননি। অথবা নবিজি সেখানে সালাত আদায় করেননি, যাতে করে সালাত কাজার বিধান বাস্তবায়ন করে দেখাতে পারেন।

যারা আবু মুসা আশআরি রা.-এর কথা দিয়ে যে দলিল দেন, তাও শক্তিশালী নয়। কারণ, অনেক উলামাউস সিয়ার ওয়াল মাগাজি বলেছেন—আবু মুসা এখানে অন্য গাজওয়াতু জাতির রিকার কথা বলেছেন। কারণ, এখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা ছোটো ছয়টি দলে বিভক্ত ছিলাম...'অথচ আমাদের আলোচিত গাজওয়াতে মুসলিমদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি ছিল।

ইবনে হাজার এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেন; কিন্তু আমি মনে করি— এখানে সে সুযোগটুকু নেই। বিশেষত উলামাউল মাগাজি যে মত দিয়েছিলেন, এর স্বপক্ষে যেহেতু শক্তিশালী দলিল আছে। নবিজি কেন খন্দকের দিন সালাত দেরি করে আদায় করেছিলেন? কাজা কেন হলো? এসব বিষয় ও তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আমরা যথাস্থানে বিশদ আলোচনা করব।

এ যুদ্ধে মুসলিমরা কোনো মুশরিকের সাথে কিতালে (সরাসরি যুদ্ধে) লিপ্ত হননি। পূর্বে আমরা সংক্ষেপে তা জেনে এসেছিলাম। সবকিছুর পরও এখানে আমাদের বেশ কিছু বিষয় জানার রয়েছে। পাঁচটি পয়েন্টে সেগুলোকে এখানে আমরা আলোচনা করব—

♦ এক

আবু মুসা রা. যুদ্ধের যে কারণ বর্ণনা করেছেন, তা থেকে দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কিরাম কী পরিমাণ কষ্ট সয়েছেন, কী পরিমাণ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, এর একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাদের দারিদ্র্যের এতটাই দুরবস্থা ছিল যে, তারা যুদ্ধের বাহন পর্যন্ত পেতেন না। সুদূরের পথে মাত্র একটি উটে ছয়জন বা সাতজন পালা বদল করে চড়তেন; কিন্তু দরিদ্রতার এই করাল গ্রাস তাদের দাওয়াত ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তারা তাদের এ মিশনে নেমে, কত কষ্ট সয়েছেন! তাদের কত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে! দুঃসহ ক্লান্তির দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে তাদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে! পাথরে হোঁচট খেয়ে নখ উঠে গেছে! পায়ে জড়ানোর মতোও কোনো কিছু নেই। একের পর এক পট্টি!

এরপরও তারা নিরাশ হননি। হতাশা তাদের পেয়ে বসেনি। তারা পথ চলেছেন নিরন্তর। নিজেদের কর্তৃত্বে ছিলেন নিবিষ্ট। কুরআনের এই আয়াতই বাস্তব প্রতিচ্ছবি—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলিমদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে;

অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের ওপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহান সাফল্য।"[১২]

আমরা বর্ণনায় জেনেছি—আবু মুসা আশআরি রা.-কে যুদ্ধের নামকরণের কারণ জিজ্ঞেস করার পর তার নামকরণের ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে গিয়ে যুদ্ধে তাদের কষ্ট সহ্য করার কথা মুখ ফসকে বলে ফেললে, পরে তিনি তার এ কাজকে অপছন্দ করেন। এর কারণ, তার আমল (দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্যকরণ) মানুষের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তিনি তো কারও সামনে প্রকাশ করতে চান না। কেবল আল্লাহর কাছেই এর প্রতিদান চান।

এ থেকে বোঝা যায়—ইমাম নববিও যেমনটা বলেছেন—একজন মুসলিম আল্লাহর রাস্তায় যে কষ্ট-দুর্ভোগ সহ্য করেছে, সে যেসব সৎকাজ করেছে, তা গোপন রাখা মুসতাহাব। ব্যাপক কোনো কল্যাণের ব্যাপার না থাকলে, সে তা প্রকাশ করবে না। যেমন, শরয়ি কোনো একটা বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তা প্রকাশ করতে পারে। এজন্য আমরা দেখি, আমাদের কোনো কোনো সালাফ তাদের কোনো কোনো আমলের কথা প্রকাশ করতেন; (আবার অধিকাংশ সময়ই করতেন না। আর যা করতেন) এটা এই ব্যাপক কল্যাণের দিকে খেয়াল রেখেই।"[১৩]

♦ দুই

সালাতুল খাওফ ও তার আদায়ের নিয়ম-পদ্ধতি। এ যুদ্ধই সালাতুল খাওফ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূলভিত্তি। সালাতুল খাওফেরর দুটো পদ্ধতি রয়েছে—

- ০১. শত্রুরা যখন (শুধু) কিবলার দিকে থাকবে, তখন একটি পদ্ধতি।
- ০২. আর যখন থাকবে না, তখন আরেকটি পদ্ধতি।

গাজওয়াতু জাতির রিকায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সালাত পড়েছেন। সালাতের সময় হয়ে এলো। চারপাশে শত্রুরা। কিবলাসহ বিভিন্ন দিকে। শত্রুরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণের জন্য ওত পেতে বসে আছে। মুসলিমরা যখন সালাতে থাকবেন, তখন তারা এই সুযোগে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই

---

১২ সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১

১৩ *শারহুন নাবাবি* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৯৭-১৯৮

নবিজি একদলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। অন্য দল তখন বিভিন্ন দিকে শত্রু অভিমুখে ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে এক রাকাত সালাত আদয়ের পর তারা দ্রুত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে আরেক রাকাত নিজেরা পূর্ণ করেন। নবিজি তখন এক রাকাত আদায় করে দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে। তারা তখন শত্রু অভিমুখে যান। পরবর্তী দল আসেন। নবিজির পেছনে ইকতিদা করেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে তার নিজের বাকি থাকা আরেক রাকাত পূর্ণ করলেন। নবিজি তখন বৈঠকে। ওদিকে তারা দাঁড়িয়ে নিজেদের বাকি থাকা এক রাকাত পূর্ণ করেন। তাদের রাকাত শেষ হলে তাদের নিয়ে নবিজি সালাম ফেরান।

দুই জামাত করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এভাবে এক জামাত করার দুটি কারণ—

- ০১. সবাই যেন নবিজির পেছনে সালাত আদায়ের সুযোগ পান। এ সৌভাগ্য অন্য কোথাও পাওয়া অসম্ভব।
- ০২. যতটুকু সম্ভব এক জামাতে সালাত আদায় করা—এটা বেশি ভালো।

প্রয়োজন ছাড়া ফরজের খণ্ড খণ্ড জামাত করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। তাই এক জামাতে সবাই পড়েছেন। তবে হানাফি আলিমগণ শুধু প্রথম কারণটাই ধরেন। তাই তারা মনে করেন, সালাতুল খাওফের এ পদ্ধতি নবিজির ইন্তেকালের পরে আর বৈধ নেই।

♦ তিন

এবার আসি মুশরিক ব্যক্তির ঘটনায়। নবিজি গাছের নিচে তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। আমি যতটুকু বুঝেছি—বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। প্রমাণিত। এ থেকে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নবিজির সুরক্ষার বড়ো রকম একটি ধারণা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে নবিজির বিভিন্ন মুজিজার প্রতি আপনার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হবে। নবিজির নবুয়তের ব্যাপারেও আপনার বিশ্বাস আরও মজবুত হবে।

একজন মুশরিক তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেছে, নবিজি তখন ঘুমিয়ে আছেন। তার পক্ষে এটা একদম স্বাভাবিক ছিল—সে নবিজিকে হত্যা করে বসবে। 'আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে'—তার এ কথা থেকেই বুঝতে পারেন, তার পক্ষে

কতটা সম্ভব ছিল এ কাজ করার।...কিন্তু এটা সম্ভব হলো না কেন? কী ঘটেছিল ঘটনা?

এরপর যা ঘটেছিল, তা মুশরিক কখনো ভাবতে পারেনি। সেটা হলো মহান আল্লাহ তায়ালার সুরক্ষা। আল্লাহ তার অন্তরে ভয় সৃষ্টি করেন। হাতে কম্পন শুরু হয়। তলোয়ার মাটিতে পড়ে যায়...এরপর সে এভাবে সুবোধ হয়ে বসে। এখানে যা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো—এটা মূলত এ আয়াতের (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ: আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন।) কার্যকরী বহিঃপ্রকাশ।

তবে মনে রাখতে হবে—এ আয়াতে যে সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তিনি কোনো বিপদেরই সম্মুখীন হবেন না। সম্মুখীন হবেন না কেন? এটা তো আল্লাহ তায়ালার সুন্নাত (নীতি)...উদ্দেশ্য হলো, নবিজিকে হত্যা বা একদম নিঃশেষ করে দেওয়ার চূড়ান্ত সীমায় শত্রুকে পৌঁছতে দেবেন না।

♦ চার

এখানে জাবির রা.-এর কথা এসেছে। তার ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা উঠে এসেছে; কিন্তু এখানে একটা বিষয় হলো—এতসব কথার মাঝে কোনো কথাই গাজওয়া (যুদ্ধ) সম্পৃক্ত ছিল না। এইখানে এসেই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার অপেক্ষা করছে।

এখানে সাহাবায়ে কিরামের সাথে নবিজির জীবনঘনিষ্ঠতা ও আপনত্বের তরতাজা একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে নবিজির ভালোবাসা, উত্তম আচার-ব্যবহার, হাস্যালাপ ইত্যাদির অনন্য ছবি রয়েছে। আপনি গভীর মনোযোগে পয়েন্টগুলো পড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে পারবেন—নবিজি জাবির রা.-এর দুঃসহ যাপিত জীবনের কথা জানতেন। উহুদ যুদ্ধে জাবিরের পিতা শহিদ হন। তিনি তার বাবার সন্তানদের মাঝে সবার বড়ো। পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা এখন তার কাঁধেই। তাকে পরিবারের লোকজন ও ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হয়। এর ওপর আবার তার আর্থিক সংগতি ছিল না। জাবিরের বাহ্যিক দুরবস্থার দিকে লক্ষ করে বুঝতে পেরেছিলেন—তিনি বাহনজনিত সমস্যায় পেছনে পড়ে গেছেন। তাই নবিজি এ সুযোগকে ওসিলা হিসেবে কাজে লাগিয়ে জাবিরের কিছুটা উপকার করতে চাইলেন। নির্জন পথে জাবিরকে আপনত্বে ভরিয়ে দিলেন। হাস্যালাপ করলেন।

নবিজি তার নিকট উট বিক্রির প্রস্তাব করলেন। তাতে মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল, জাবিরকে তার ন্যায্যমূল্য (এবং সাথে উপহার মূল্যও) আদায় করে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়ানো। এরপর জাবিরকে তার স্ত্রী পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নতুন বিয়ে করা স্বামীকে স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাই কাম্য। এতে মনে সে প্রশান্তি পাবে, তাই নবিজি তা-ই করলেন। মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে কিছুক্ষণের বিরতি নিলেন। উদ্দেশ্য—মদিনায় তাদের আগমনের খবর ছড়াবে, জাবিরের স্ত্রীও জানবে। ঘরে যাওয়ার আগেই স্ত্রী ঘর গুছিয়ে নিতে পারবে। নবিজির চিন্তা দেখে জাবির জানালেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের তো ওই রকম ভালো বিছানাই নেই...নবিজি তাকে শান্তনা দিলেন—অচিরেই তা হবে।

পারস্পরিক অনুভূতি ভাগাভাগি, জীবনের একান্ত বিষয়গুলো একে অপরের নিকট ব্যক্তকরণ, রসালাপ ইত্যাদির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে দুজনের এ ঘটনায়।

আমাদের তো আর নবিজির মজলিসে হাজির হওয়া, তার সঙ্গে যুদ্ধের সফরে অংশ নেওয়া ইত্যাদির সুযোগ নেই; কিন্তু তা অনুভব করার সুযোগ রয়েছে। আমরা নবিজির সিরাত পাঠ করে এসব জানতে পারব। অনুভব করতে পারব। এর মাধ্যমে নবিজির সুবাসিত জীবন থেকে আমাদের এসব আদর্শ পাঠ নেওয়ার বিশাল সুযোগ রয়েছে। আল্লাহর কাছে দুআ করি—

اللّٰهُمَّ عوضنا عن ذالك كله بلقاء معه في جنان خلدك ، وهيئنا لذالك بتوفيق من لدنك للتمسك .بهديه واقتفاء أثره في تحمل كل محنةو ضيم في سبيل دينك وتحقيق شريعتك .

♦ পাঁচ

একজন মুসলিম পাঠক সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত সাহাবি দুজনের উপাখ্যান পড়ে ভাববে—নবিজি এখানে জিহাদের মূল প্রকৃতি কী, তা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তারা কীভাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তা নিয়েও ভাববে।

নবিজি তাদের জিহাদের যে পাঠ দিয়েছিলেন, তা 'ধরো, মারো, কাটো'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সাহাবায়ে কিরাম জিহাদ মানে শুধু মোকাবিলা বোঝেননি। নবিজি জিহাদের যেই পাঠ দিয়েছেন, আর সাহাবায়ে কিরাম যেমন বুঝেছিলেন, তা হলো—জিহাদ একটি মহান ইবাদত। যার মাধ্যমে একজন মুসলিমের আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন হয়। দুনিয়ার সবকিছু ছেড়েছুড়ে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দেওয়ার দুর্দান্ত মানসিকতা নিয়ে এ ইবাদতে নিমগ্ন থাকার পবিত্র মুহূর্তে মুমিন বান্দা আল্লাহর যতটা নিকটবর্তী হতে পারে, অন্য কোনো মাধ্যমে তা পারে না।

এ চেতনায় প্রতিপালিত সাহাবি (আব্বাদ ইবনে বিশর রা.) তিনি পাহারার সময় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যান। তখন তার অস্তিত্ব ছিল কুরআনের আয়াতে ডুবন্ত। এখানে একের পর এক ঝড়ের গতিতে তির আসুক, তার শরীরে বিদ্ধ হোক, এতে কোনো সমস্যা নেই। তিনি তো অন্য এক জগতে। চেনাজানা জগতের বাইরে। বান্দা ও তার রবের মাঝে একান্ত আলাপ হচ্ছে তখন।

অনেকক্ষণ পর তিনি টের পেলেন। ব্যথা অনুভব করলেন; কিন্তু তার এই ব্যথা অনুভব ব্যথার কারণে ছিল না। এটা ছিল এজন্য যে, তার অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে গেলে বিশাল এক দায়িত্বে ক্ষতের সৃষ্টি হবে। তাই তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। তিনি সঙ্গীকে জাগালেন। যেন তিনি এই সীমান্ত পাহারার এই গুরভার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। তার এই কথাটা নিয়ে ভাবেন—

> আল্লাহর শপথ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সীমান্ত (উপত্যকার গিরিপথ) পাহারার যেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাতে ব্যাঘাত ঘটার ব্যাপার না হলে, (আমি সালাতে নিমগ্ন থাকতাম, আরও দীর্ঘায়িত করতাম। (ফলে) আমি সালাত শেষ বা সম্পন্ন করার আগেই আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যেত।

এটাই হচ্ছে ইসলামের জিহাদের মূল প্রকৃতি—আল্লাহ ও বান্দার মাঝে গভীর সম্পর্ক স্থাপন হওয়া, আল্লাহর রাহে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার অদম্য স্পৃহা। এ জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; কিন্তু আমরা আজকের জিহাদ বলতে কী বুঝি...

দুটোকে মেলান। ভাবেন, আল্লাহর আদালতের (ন্যায়বিচার) কথা। তিনি কখনো কারও ওপর জুলুম করেন না। মানুষ নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে।

আসুন, আল্লাহর কাছে দুআ করি—আমাদের বিকৃতির কারণে তিনি যেন আমাদের নিঃশেষ করে না দেন। এই কাকুতি-মিনতির মাধ্যমে আমরা আমাদের পাপ ও কমতির কারণে যেই শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম, তা থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহর সামনে সত্যবাদী হিসেবে দাঁড়াতে পারি।

গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক

যুদ্ধের সময়

ইবনে ইসহাকসহ কতিপয় সিরাত বিশেষজ্ঞের মতে, গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক সংঘটিত হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরিতে; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্লেষকের নিকট এটি ঘটেছিল পঞ্চম হিজরির শাবান মাসে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ হলো—সাদ ইবনে মুআজ রা. এই যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন। ইফকের (আয়িশা রা.-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদের) ঘটনায় তার উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

সাদ ইবনে মুআজ রা. খন্দক যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের কারণে বনু কুরাইজার যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। আর বনু কুরাইজা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরিতে। শীঘ্রই এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। তাই গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক যদি ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়, তাহলে এ কথা বলতে হবে যে, সাদ ইবনে মুআজ রা. তার মৃত্যুর এক বছর পর জীবিত ছিলেন।[১৪]

যুদ্ধের কারণ

এ যুদ্ধের কারণ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম জানতে পেরেছিলেন যে, বনু মুসতালিক হারিস ইবনে জিরারের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য একত্র হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদটি শোনামাত্র সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন

---

১৪ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩০৪; *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১২; *উয়ুনুল আসার*, ইবনে সাইয়িদিন নাস, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৩

এবং তাদের মুরাইসি নামক স্থানে পেলেন। এরপর শুরু হয় তুমুল লড়াই। আল্লাহ তায়ালার দয়ায় বনু মুসতালিক পরাজিত হয়। যুদ্ধে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অসংখ্য মানুষ নিহত হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের মাঝে মোট গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) পাঁচ ভাগের চার ভাগ বণ্টন করে দেন। অশ্বারোহীর দুই অংশ পদাতিকের এক অংশ।[১৫]

এই যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে ছিল মুনাফিকদের বিরাট একটি অংশ, যারা পূর্বের যুদ্ধগুলো থেকে পিছু হটেছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণ হলো, যখন তারা মুসলিমদের একের পর এক বিজয় প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদ প্রাপ্তির আশায় অংশ নেওয়ার মনস্থ করে এবং অংশ নেয়।

নতুন বিষয়

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. দুটি ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন—

যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের মাঝে যুদ্ধলব্ধ বাঁদিদের বণ্টন করে দেন, তখন তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তর দেন—

> 'করলে কোনো সমস্যা নেই, তবে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব প্রাণ অস্তিত্বে আসার, তা আসবেই।'

তাবাকাতু ইবনে সাদ ও *সিরাতে ইবনে হিশাম*-এ বর্ণিত আছে, উমর রা.-এর দাস জাহজাহ ইবনে সায়িদ আল গিফারি ও সিনান ইবনে ওয়াবার আল জুহানি পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তারা দুজন ছিল মুরাইসি কূপের নিকট একটি দলের কাছে, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। মারমুখী পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। জুহানি চিৎকার করে বলল—হে আনসারগণ, তোমরা কোথায়? জাহজাহ চিৎকার করে বলল—হে মুহাজিরগণ, তোমরা কোথায়?

এটা শুনে আনসার ও মুহাজিরগণ দ্রুত সেখানে জমায়েত হয়ে গেলেন। অবশ্য এটা মিটমাট হতে বেশি সময় লাগেনি।

---

১৫ *তাবাকাতু ইবনে সাদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৬; *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৩

ইবনে উবাইয়ের প্রতিক্রিয়া

বিষয়টি যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছল—এতক্ষণে যে বিষয়টির সুরাহা হয়ে গেছে—তারপরও সে এটা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়ল, আর তার আশেপাশের লোকদের বলতে লাগল—তাদের স্পর্ধা এত বেড়ে গেছে যে, তারা আমাদের ভূমিতে আমাদের সাথে পাল্লা দিতে চায়? আবার আমাদের ওপর গর্ব প্রদর্শন করে। আল্লাহর কসম! আমাদের আর কুরাইশদের অবস্থা তো এমন হলো, যেমন কেউ বলেছিল : سمن كلبك يأكلك (নিজেদের কুকুরকে মোটাতাজা করো, যাতে তোমাদেরই কামড় দেয়) আল্লাহর কসম! মদিনায় ফিরে যাওয়ার পরে উচ্চপদস্থরা সেখান থেকে নিম্নদের বের করে দেবে।

কথাটি জায়িদ ইবনে আরকাম রা. শুনতে পান। বিষয়টি জানানোর জন্য তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছিলেন উমর রা.। তিনি শুনে নবিজিকে পরামর্শ দিয়ে বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আব্বাদ ইবনে বিশরকে নির্দেশ দেন, যেন সে তাকে হত্যা করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—মানুষ যখন বলবে, মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের হত্যা করে, তখন কেমন হবে? না হত্যার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। তবে যাত্রা শুরু করার ঘোষণা প্রদান করো। অথচ তখন ছিল প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত ভরদুপুর।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এই সময় সফর করতেন না। তো সবাই প্রস্তুত হয়ে যাত্রা শুরু করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিন এক রাত ও পরের দিন দুপুর পর্যন্ত বিরতিহীন সফর অব্যাহত রাখলেন। সূর্য অতিমাত্রায় তেজোদীপ্ত হয়ে উঠলে তিনি যাত্রাবিরতির অনুমতি দেন। সাহাবায়ে কিরাম ক্লান্ত অবস্থায় মাটিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিরামহীন এই ধারাবাহিক সফরের কারণ ছিল, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর সাথে যে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল, লোকেরা যেন সেসব আলোচনা থেকে বিরত থাকে।

জায়িদ ইবনে আরকাম রা.-এর সত্যায়নে নাজিল হলো সুরা মুনাফিকুন। আল্লাহ ইরশাদ করেন—

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

তারা (মুনাফিকরা) বলে—'আমরা মদিনায় ফেরত যাওয়ার পরে শক্তিমানরা (মুনাফিকরা) দুর্বলদের (মুমিনদের)-কে সেখান থেকে বের করে দেবে।' শক্তি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।[১৬]

ইবনে উবাইয়ের বিস্ময়কর প্রস্তাব

মদিনায় ফেরত আসার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি জানতে পারলাম, আপনি নাকি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যা বলেছে, সে কারণে তাকে হত্যা করতে চান? যদি তা-ই করা হয়, তাহলে আমাকে আদেশ দেন, আমি তার মাথা এনে দেবো। আল্লাহর কসম! সমগ্র খাজরাজে আমার চেয়ে বেশি পিতার অনুগত আর কেউ নেই। যদি আমার স্থলে আপনি অন্য কাউকে আদেশ দেন, আর সে হত্যা করে, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে—আমি সহ্য করতে না পেরে তাকে হত্যা করে ফেলব। ফলে একজন কাফিরকে হত্যাকারী মুমিনের হত্যার কারণে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বললেন—সে যতদিন আমাদের মাঝে আছে, আমরা বরং তার সাথে নম্র আচরণ করি।

এর ফলাফল এই হলো যে, যখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কোনো অসংলগ্ন কথা বলে ফেলত, তার অনুসারীরাই তাকে ভর্ৎসনা করত ও সতর্ক করে দিত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম উমর রা.-কে বললেন—উমর, তোমার কী মনে হয়, তুমি যেদিন আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল তাকে হত্যা করার, সেদিন যদি হত্যা করতাম, তাহলে তার পক্ষে তুফান উঠে যেত; কিন্তু আজ যদি আমি তার গোত্রকে হত্যা করার নির্দেশ দিই, তাহলে তারা সাথে সাথে তাকে হত্যা করে ফেলবে, ঠিক না?

উমর রা. বললেন—আল্লাহর কসম! আমি বুঝতে পারলাম—তার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত বেশি কার্যকর ও কল্যাণময়।

* * *

---

১৬ সূরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮; *ইবনে কাসির*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৭০; *ইবনে জারির আত-তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০৬; *ফাতহুল বারি*, কণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৭০; *ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯১



ইফকের ঘটনা

বেদনাদায়ক পরিস্থিতি

মুসলিমরা বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফেরার পথে আম্মাজান আয়িশা রা.-এর সাথে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে; ইতিহাসে যা 'ইফকের ঘটনা' হিসেবে পরিচিত। ঘটনাটি সম্পর্কে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

আয়িশা রা. বর্ণনা করেন—

তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এই যুদ্ধে বের হন.. তিনি বলেন—যুদ্ধ শেষে যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফেরার ইচ্ছা করলেন, কাফেলাকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়েছিলাম; তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি, আমার গলার হার নেই![১৭] পুনরায় ফিরে গিয়ে হারটি খুঁজলাম। হার খুঁজতে যাওয়ার ফলে দেরি হয়ে যায়।[১৮] তিনি বলেন—হাওদা বহনকারীরা এসে হাওদাটি নিয়ে আমার বাহনের ওপর তুলে দেয়। তারা ধারণা করেছিল—আমি হাওদার ভেতরে আছি। কারণ, আমি ছিলাম গায়ে-গতরে অতিরিক্ত হালকা। অতঃপর তারা উট হাঁকিয়ে দেয়। আমি আমার হারটি খুঁজে পাই আর এরই মধ্যে কাফেলাও চলে যায়। আমি ভাবলাম—

---

১৭ এদিকে কাফেলা যাত্রা করার সময় হয়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি দ্রুত খুঁজতে বের হন।

১৮ অর্থাৎ তিনি ফিরে এসে দেখেন, কাফেলা বুঝতে না পেরে তাকে ফেলেই রওনা হয়ে গেছে।

একটু পরেই তারা আমার অনুপস্থিতি লক্ষ করে আমাকে খুঁজতে আসবে। তাই আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে যাওয়াটা উপযুক্ত মনে করলাম।

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. ছিলেন কাফেলার পশ্চাতে, পেছনে কোনো কিছু রয়ে গেছে কি না, সেই ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া ছিল তার দায়িত্ব। তিনি দূর থেকে মানুষের মতো কিছু একটা দেখতে পেলে কাছে আসেন এবং আমাকে দেখেই চিনে ফেলেন। কারণ, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। ঘুমে দু-চোখ আচ্ছন্ন ছিল আমার, ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমাকে দেখতেই তিনি ইস্তিরজা[১৯] পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে আমি জাগ্রত হয়ে নিজেকে চাদরাবৃত করে নিই। আল্লাহর কসম! আমাদের মাঝে কোনো কথা হয়নি। আর ইস্তিরজা ছাড়া তার কোনো কথা আমি শুনিনি। তিনি উট থেকে নেমে সেটাকে বসালেন। আমি সোজা গিয়ে উটের পিঠে চড়ে বসলাম। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে রওনা হলেন।

আমরা মধ্যাহ্নের দিকে কাফেলার সাথে মিলিত হলাম। তখন তারা বিশ্রাম ছিলেন। আমার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যারা ধ্বংস হওয়ার হয়েছে। আর এই এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

তিনি বলেন—মদিনায় এসে আমি এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলাম। লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছিল; যার কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমি অসুস্থ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম থেকে যে যত্ন-আত্তি পেতাম, তাও সেভাবে প্রত্যক্ষ করছিলাম না। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন—তোমার কী অবস্থা?

আমি সুস্থ হওয়ার পর একরাতে উম্মে মিসতাহ রা.-এর সাথে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বের হলাম, তখন বর্তমানের মতো বাথরুম ছিল না, ফিরে আসার সময় উম্মে মিসতাহ রা. চাদরে প্যাঁচ খেয়ে পড়ে গেলেন।

অগত্যা বলে উঠলেন—মিসতাহ ধ্বংস হোক! আমি তাকে বললাম—আপনি খুবই মন্দ একটি কথা বললেন; আপনি তো একজন বদরি সাহাবির ব্যাপারে মন্দ বললেন। তিনি বললেন—তুমি কি শোনোনি, সে কী বলেছে?

---

১৯ তথা 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া।

তিনি বলেন—তিনি আমাকে অপবাদের সাথে জড়িতদের ব্যাপারে জানালেন। সংবাদ শুনে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে যেতে লাগল। সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে কেটে গেল। অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল; দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি নিয়ে তার কিছু বিজ্ঞ সাহাবির সাথে পরামর্শ করলেন—আমার সাথে বিচ্ছেদ ঘটাবেন কি না? কেউ কেউ বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা আপনার পরিবার সম্পর্কে ভালো ব্যতীত মন্দ কিছু জানি না। আর কেউ কেউ বললেন—দুনিয়া আপনার জন্য আল্লাহ তায়ালা এত সংকীর্ণ করে দেননি! সে ছাড়া নারী তো আরও আছে, আপনি এ ব্যাপারে বারিরাহ রা.-কে জিজ্ঞেস করেন; আসল সত্যটা সেই বলতে পারবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারিরাহ রা.-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আয়িশার মধ্যে কখনো সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখেছ? বারিরাহ রা. উত্তর করলেন—আমি তার ব্যাপারে শুধু ভালোই জানি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলিমগণ, কে আছ আমাকে মুক্ত করবে ওই ব্যক্তি থেকে, যে আমার পরিজনের মধ্যে কষ্ট পৌঁছিয়েছে? আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবার সম্বন্ধে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছে, যার ব্যাপারে আমি শুধু ভালোই জানি।

তখন সাদ ইবনে মুআজ রা. দাঁড়িয়ে বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে তার থেকে পরিত্রাণ করব, যদি সে আউস গোত্রের থেকে হয়, তাহলে আমি তার গরদান উড়িয়ে দেবো। আর যদি খাজরাজ গোত্রের লোক হয়, তাহলে আপনি যা আদেশ দেন, আমরা তা পালন করব। এ কথা শুনতেই মসজিদের মধ্যে লোকেরা উচ্চবাচ্য শুরু করে দিলো। এমনকি পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠল। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শান্ত করলেন।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এলেন, তখন পাশে ছিলেন আমার বাবা-মা। তারা দেখছেন—কান্নায় আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। অপবাদ রটনার পর থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে বসেননি, আবার আমার ব্যাপারে এক মাস যাবৎ অপেক্ষার পরও কোনো ওহি আসেনি।

তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে বসেই কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বললেন—আয়িশা, তোমার সম্পর্কে আমি এমন এমন শুনেছি; সুতরাং তুমি যদি পবিত্র হও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোনো গুনাহ করেই থাকো, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো।

তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কথা শেষ করলেন, তখনই আমার অশ্রু একেবারে থেমে গেল। আমি আমার পিতা-মাতাকে বললাম—আপনারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে দেন, আমার কাছে এর কোনো জবাব নেই। আমি জানি না কী বলব।

আমি বললাম—আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা যা শুনেছেন, তা আপনাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর সেটাকে সত্য মনে করছেন, এখন আমি যদি আপনাদের বলি 'আমি নির্দোষ'—আর আল্লাহ তায়ালা জানেন আমি নির্দোষ—আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি অভিযোগটি স্বীকার করে নিই—আল্লাহর কসম! আমি নির্দোষ—আপনারা তা সত্য বলে ধরে নেবেন। এখন আমি দৃষ্টান্ত দেওয়ার মতো ইউসুফ আ.-এর উক্তি ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না جميل فصبر(উত্তম ধৈর্য)। আপনারা যা বলছেন, সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। এরপর আমি উঠে গিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

তিনি বলেন—আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও মজলিস ত্যাগ করেননি, আহলে বাইতের কেউ ঘর থেকে বের হয়নি, এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি ওহি নাজিল করলেন। ওহি অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন কষ্ট অনুভব করতেন, তা-ই হলো। এমনকি ওহির ভারত্বে তীব্র শীতের দিনেও মুক্তোর দানার মতো ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছিল। এ অবস্থা শেষ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে লাগলেন; সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন সেটা হলো—সুসংবাদ গ্রহণ করো হে আয়িশা, আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। অতঃপর আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও, তার শুকরিয়া আদায় করো।

আমি বললাম—আল্লাহর কসম! আমি কারও কাছে যাব না; আর আল্লাহ ছাড়া কারও প্রশংসাও করব না। কারণ, তিনি আমার পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

> যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে। তারা তোমাদেরই একটি দল, তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু রয়েছে, যতটুকু সে গুনাহ করেছে। তাদের মধ্যে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি।[২০]

তিনি বলেন—আমার পিতা (আবু বকর রা.) মিসতাহ রা.-কে দান-খয়রাত করতেন। কারণ, সে ছিল তার দরিদ্র নিকটাত্মীয়; কিন্তু আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমার পিতা আল্লাহর শপথ করে বললেন—আল্লাহর কসম! আয়িশার ব্যাপারে সে যা বলেছে, এই অপরাধে আমি তাকে আর কিছু দান করব না।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আয়াত নাজিল করেন—

> তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের কিছুই দান করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।[২১]

উক্ত আয়াত শ্রবণান্তে আবু বকর রা. বললেন—অবশ্যই আমি চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুক। অতঃপর মিসতাহ রা.-কে আগের নির্ধারিত পরিমাণ দান পুনরায় দিতে থাকেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিকট গিয়ে খুতবা প্রদানপূর্বক নাজিলকৃত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন এবং মিসতাহ ইবনে উসাসা, হাসসান ইবনে সাবিত ও হামনা বিনতু জাহাশ রা.-এর ওপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন। তারা এই অপবাদ রটিয়েছিল স্পষ্টভাবে।[২২]

---

২০ সুরা নুর, আয়াত : ১১-২০

২১ সুরা নুর, আয়াত : ২২

২২ সূত্র : *সুনানু আবি দাউদ, সুনানু ইবনে মাজাহ, সিরাতে ইবনে ইসহাক* ইত্যাদি।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

বনু মুসতালিক বা মুরাইসির এই যুদ্ধ থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষা বেরিয়ে আসে—

এক. গনিমত বণ্টনবিষয়ক মাসয়ালা

প্রথমত, যোদ্ধাদের মাঝে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও مقتول(হত্যাকৃত ব্যক্তি)-এর সালাব (অস্ত্র, বর্ম) ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ রেখে অবশিষ্টাংশ বণ্টনের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

সালাব লাভের বৈধতা প্রমাণিত হয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি من قتل قتيلا فله سلبه অর্থাৎ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, সে তার সালাব (বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র) পাবে।

আর খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশের হকদারদের কথা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত বর্ণনা করেছেন—

> তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ, তাঁর নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।[২৩]

আর মোট গনিমতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যোদ্ধাদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে, যেভাবে ভাগ করে দিতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অস্থাবর সম্পদ বণ্টনের বিধান এটি, এতে ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন। তবে স্থাবর সম্পত্তির বণ্টন বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যা আমরা বনু নাজিরবিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

---

২৩ সুরা, আনফাল, আয়াত : ৪১

দুই. আজলবিষয়ক মাসয়ালা

'আজল বা সহবাসের সময় বীর্য প্রত্যাহার বা উইথড্রয়িং মেথড এবং ভ্রূণের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের আগে গর্ভপাতের বিধান; যা ইদানীং 'বার্থ কন্ট্রোল' হিসেবে পরিচিত।

উল্লিখিত হাদিসে 'আজল'-এর কথা স্পষ্টত বিবৃত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—'না করলেও কোনো সমস্যা নেই।'

সহিহ মুসলিম-এর বর্ণনায় আরেকটু বাড়তি এসেছে—

> না করলেও কোনো সমস্যা নেই; যে সকল প্রাণ কিয়ামত পর্যন্ত আসার, তারা আসবেই। অর্থাৎ কিয়ামতের আগপর্যন্ত পৃথিবীতে যাদের জন্ম নেওয়ার বিষয়টি সুনির্ধারিত, তাদের জন্ম অবধারিত। তোমাদের আজলের কারণে তাদের জন্ম বাধাগ্রস্ত হবে না।

এরচেয়ে আরও সুস্পষ্টভাবে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত হয়েছে জাবির রা. থেকে। তিনি বলেন—

> আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আজল করতাম। অপরদিকে কুরআন নাজিল হতো। অর্থাৎ আজল যদি অবৈধ হতো, তাহলে কুরআনে তা নিষেধ করা হতো; কিন্তু আমাদের নিষেধ করা হয়নি।[২৪]

জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ইমামগণ এই হাদিসের ভিত্তিতে 'আজল জায়িজ'-এর পক্ষে মতামত দিয়েছেন; কিন্তু তারা এর জন্য স্ত্রীর সম্মতির শর্তারোপ করেছেন। কারণ, এতে করে তার কোনো ক্ষতি হতে পারে। তবে আজল যদি 'রিজিকের ভয়ে' করা হয়, তাহলে তা মাকরুহ।

অপরদিকে জমহুরের বিপরীতে ইবনে হাজম রহ. আজলকে 'শর্তহীন হারাম' বলেছেন। তিনি দলিল পেশ করেন *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত একটি হাদিস দ্বারা। যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন—'সেটা হলো একধরনের গুপ্তহত্যা।'

---

২৪ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

আরও অনেকগুলো মওকুফ হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন, তন্মধ্যে নাফে রহ.-এর সূত্রে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, ইবনে উমর রা. আজল করতেন না। এবং তিনি বলেন—যদি আমি জানতাম, আমার আওলাদের মধ্যে কেউ আজল করছে, আমি তাকে শাস্তি দিতাম। আরেকটি হলো—হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ.-এর বর্ণনা, তাতে তিনি বলেন—আলি রা. আজল অপছন্দ করতেন।

জমহুর ইমামগণের পক্ষ হতে দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদিসের জবাবে ইবনে হাজম রহ. বলেন—সেটি মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে।[২৫]

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. *ফাতহুল বারি*-তে ইবনে হাজম রহ.-এর মত উল্লেখপূর্বক বলেন—এই হাদিসটি অপর দুটি হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক—

☛ ০১. *জামি তিরমিজি* ও *সুনানুন নাসায়ি*-তে জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—আমাদের অনেক বাদী ছিল, তাদের সাথে আমরা আজল করতাম; অতঃপর ইহুদিরা বলল—এটি হলো একধরনের গুপ্তহত্যা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ সৃষ্টি করতে চান, তবে তুমি তা ঠেকাতে পারবে না।

☛ ০২. *সুনানুন নাসায়ি*-তে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।[২৬]

আমার মতে—এ কথা স্পষ্ট যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী 'الوأد الخفي' দ্বারা আজল হারাম উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্যান্য হাদিসের আলোকে এই উক্তিটি মাকরুহে তানজিহির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। জমহুরের অভিমত এটিই।

ইবনে হাজমের দাবির—আজল বৈধতার হাদিসগুলো মানসুখ—জবাব হলো সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত হাদিসগুলো; শুধু আবু দাউদের বর্ণনাটি ছাড়া, যেটা জাবির রা. থেকে বর্ণিত। যেখানে তিনি বলেছেন—

كنا نعزل والقرآن ينزل

---

২৫ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*আল মুহাল্লা*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮৭

২৬ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৪৫

এই হাদিসটির সাথে মুসলিমে একটু বাড়তি উদ্ধৃতি আছে : فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا অর্থাৎ এ ব্যাপারটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি আমাদের নিষেধ করেননি। তাই যদি আজলের বৈধতার বিধান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত বহাল না থাকত, তাহলে জাবির রা. এ কথা বলতেন না। আর এটাই যে সর্বশেষ শরয়ি সিদ্ধান্ত, তা স্পষ্ট।

ভ্রূণহত্যা বা অ্যাবরোশন করানোর বিধান

গর্ভের ভ্রূণে প্রাণসঞ্চারের আগে গর্ভপাত করার বিধান আজলের বিধানের অনুরূপ। তবে জমহুর ইমামদের মধ্য হতে কিছু কিছু ইমাম আজলের বৈধতার পক্ষে মতামত দিলেও গর্ভপাতকে হারাম বলেছেন। সম্ভবত তারা এটাকে আজলের মতো মনে করেন না; বরং তারা গর্ভের ভ্রূণকে বীর্যের বিপরীতে রক্তপিণ্ডেরও আগে মানবদেহকে সৃষ্টির জন্য বেশি উপযুক্ত মনে করেন। এ ছাড়া এটাকে আজলের ওপর কিয়াস না করার কারণ হলো, এতে গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা হতে পারে।

এ বিষয়টি জানা থাকার পর বার্থ কন্ট্রোল সম্পর্কে যে শরয়ি বিধান জানতে পারেন, তা হলো—আজলের পরিবর্তে গর্ভনিরোধক কোনো চিকিৎ সাগ্রহণ জায়িজ। যেগুলোর বৈধতার পক্ষে ইমামগণ মত দিয়েছেন; তবে শর্ত হলো—এতে করে যেন গর্ভধারণের কোনো ক্ষতি না হয়; আর তা যেন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে হয়। এটাই আমাদের সকল ইমামদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। তবে হাফিজ ওয়ালিউদ্দিন ইরাকি রহ. শাইখ ইমাদুদ্দিন ইবনে ইউসুফ ও ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদিস সালাম সূত্রে বর্ণনা করেন—

> নারীদের জন্য যেকোনো ধরনের গর্ভনিরোধক ওষুধ ব্যবহার করা হারাম। ইবনে ইউনুস রহ. বলেন—স্বামী রাজি থাকলেও স্ত্রীর জন্য যেকোনো ধরনের গর্ভনিরোধক ওষুধ সেবন করা হারাম।[২৭]

---

২৭ *তারহুত তাসরিব ওয়া শারহুহু* খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬২

আমার (লেখক) অভিমত

আমি বলব—হাদিসের ইঙ্গিত অনুযায়ী এই অভিমতটি অগ্রাধান্যযোগ্য এবং জুমহুরের মতের বিপরীত। তবে এখানে যে বিষয়টি জেনে রাখা দরকার তা হলো—বার্থ কন্ট্রোল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। তাদের ওপর বহিরাগত কোনো কর্তৃত্ব বা নির্দেশনা থাকতে পারবে না।

অনেক সময় একান্ত ব্যক্তিগত কোনো বিষয় হিসেবে যা বৈধ হয়, তা কোনো গোষ্ঠীর বিবেচনায় বৈধ হয় না। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি। যেমন—তালাক কোনো প্রয়োজন বা কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবাহিত ব্যক্তির জন্য বৈধ; কিন্তু কোনো শাসকের এই অধিকার নেই যে মানুষকে সে বাধ্যতামূলকভাবে তালাক দেওয়ার আদেশ দেবে, আর তারা এর ভিত্তিতে তাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে বাধ্য থাকবে।

বার্থ কন্ট্রোলের এই বিষয়টি হুবহু তালাকের মতোই। গুরুত্বপূর্ণ এই মূলনীতিটি ভালোভাবে স্মরণ রাখা দরকার, যাতে করে আজকাল যারা ফতোয়ার ঠিকাদারি করছে, তারা যেন এ কথা বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে যে, বার্থ কন্ট্রোল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা এ কথার দলিল যে, তাই সরকার চাইলে জনগণকে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য যা ইচ্ছা বা যেকোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। মূলত এখানে দাবি ও দলিলের মাঝে মোটেও সম্পর্ক নেই, শুধু একধরনের ধূম্রজাল তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সারকথা

সারকথা হলো—স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যখন বার্থ কন্ট্রোলকে বিবেচনা করা হবে, তখন তো বিষয়টি সহজ, কোনো সমস্যা নেই; কিন্তু যখন বার্থ কন্ট্রোলকে এভাবে দেখা হবে—এটি এমন একটি মূলনীতি, যেদিকে সাধারণ মানুষকে আহ্বান করা হবে, তাদের উৎসাহিত করা হবে এবং এর ভিত্তি হবে এমন একটি দিকনির্দেশক চিন্তাদর্শনের ওপর—যা প্রচার করার জন্য সকল মিডিয়া ও গণমাধ্যম ব্যবহার করা হবে, সে সময় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। তখন মুসলিমদের উচিত, এর ভয়াবহতা বুঝে তা মোকাবিলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া এবং বিভিন্ন প্রতারক গোষ্ঠীকে বোঝা, যাদের ইসলামের শত্রুরা তৈরি করেছে তাদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। তারা দারিদ্র্য, খাদ্য-বস্ত্র সংকটের যেসব বুলি আওড়ায়, এটি তাদের পরিকল্পনার অংশ।

তিন. ইফকের ঘটনাসংক্রান্ত বিষয়

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য প্রজ্ঞা, মানুষের সাথে ব্যবহার এবং ঘটমান সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠার বিরাট দক্ষতার বিষয়টি জানান দেয়। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই থেকে যেসব কথাবার্তা শুনেছেন, বাহ্যত হত্যার আদেশ দেওয়ার জন্য ততটুকুই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু ব্যাপারটি তিনি ব্যাপক উদারতার সাথে নিয়েছেন এবং তিনি বিভিন্ন কটূ বাক্য ও আক্রমণাত্মক কথা শুনেছেন।

তার দলভুক্তদের মধ্যে ছিল মুনাফিকদের বিরাট একটি অংশ, যাদের কাজ ছিল এ জাতীয় বিষয়গুলো নিয়ে পড়ে থাকা। তাই তিনি এই সমস্যার সমাধান আবেগ দিয়ে করেননি; বরং হিকমত ও প্রাজ্ঞোচিত কর্মকুশলতা দ্বারা করেছেন। তিনি সম্প্রদায়কে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন অস্বাভাবিক সময়ে, যার ফলে সকলে সম্মিলিত কথাবার্তা ও আলাপচারিতা থেকে বিরত ছিলেন। তাদের নিয়ে পূর্ণ এক দিন এক রাত ও দ্বিতীয় দিনের অর্ধাংশ পর্যন্ত একটানা সফর জারি রেখেছেন। ফলত মুনাফিক গোষ্ঠী তাদের হীন উদ্দেশ্য অর্জনের মতো সুযোগ পায়নি। যখন তারা যাত্রাবিরতি করলেন, ক্লান্তির কারণে সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, আর পরস্পরে কথাবার্তা বলার মতো ফুরসত মেলেনি।

লোকেরা অপেক্ষায় ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় পৌঁছে মুনাফিকদের ওপর অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করবেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার বিষয়টি ছিল একেবারে স্পষ্ট। এ কারণে তার পুত্র আবদুল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের দরবারে এসে আরজ করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে দায়িত্বটা যেন তাকে দেওয়া হয়; কিন্তু আবদুল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম থেকে আশাতীত কিছু শুনে বিস্মিত হয়ে যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাম তাকে বললেন—সে যতদিন আমাদের মাঝে আছে, আমরা তার সাথে সদ্ব্যবহার করব।

রাসুল সাল্লালাহ সালামের কারণ দর্শানোর ভঙ্গি দেখেন—যা তিনি উমর রা.-কে বলেছিলেন—উমর, কেমন হবে তখন, যখন লোকেরা বলবে—মুহাম্মাদ তাঁর অনুসারীদের হত্যা করে?!

এ হিকমতের ফলাফল ছিল এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই থেকে তার সম্প্রদায় স্বপ্রণোদিতভাবেই পৃথক হয়ে যায়। যখন সে কোনো কিছু বলতে চাইত, তারাই তাকে নিবৃত রাখত এবং সতর্ক করে দিত। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, মুনাফিককে দুনিয়াবি বিধানে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়, তার থেকে সতর্ক থাকা ও দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক।

নবিজির নবুয়ত ও প্রোপাগান্ডা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাজ্ঞতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সংকট মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা—যেকোনোটি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার আগে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরি মনে করছি, তা হলো—সকল গুণের অন্তরালে রয়েছে নবুয়তের গুণ; এ সকল গুণের মূল উৎস হলো নবুয়ত ও রিসালাত।

আরেকটি স্পষ্ট ভ্রান্তি হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতকে বাদ দিয়ে এ সকল গুণাবলিকে তাঁর জীবনে অনুসন্ধান করা। আর এটি একটি প্রোপাগান্ডা; যা বুদ্ধিবৃত্তিক যোদ্ধারা গ্রহণ করে থাকে, মুসলিমদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে রাখার জন্য। অপরদিকে তাদের এসব লুফে নেয় সে সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা অন্ধ অনুসরণে বান্দরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

চার. পারিবারিক সম্মান : সর্বাধিক কষ্টের জায়গা

অপবাদের ঘটনাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত ধারাবাহিক কষ্ট যাতনার অংশবিশেষ। তবে অন্যগুলোর তুলনায় এটির প্রভাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবচেয়ে প্রকটভাবে পড়েছিল। বস্তুত, মুনাফিকদের তরফ থেকে আসা ষড়যন্ত্রের চরিত্র এটাই, যা সব সময় অন্যদের দেওয়া কষ্টের চেয়ে মারাত্মক ও বেশি ক্ষতিকর ও তীব্র হয়ে থাকে। কেননা, সুযোগ-সুবিধা উপায়-উপকরণ অন্যদের তুলনায় তাদের অনুকূলে বেশি থাকে। অপবাদের সংবাদ মুনাফিকদের দেওয়া কষ্টসমূহের মধ্যে বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত।

এই ট্র্যাজেডি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে। কেননা, ইতঃপূর্বের যত কষ্ট আছে, সেগুলোর একটা দিক নিয়ে আমরা কথা বলেছি,

সেগুলো ছিল আশানুরূপ। আর তিনি সেগুলো বরদাশত করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; বরং সেগুলো দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেকটা অবধারিত বিষয়। আর এটা ছিল একান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং পারিবারিক এ ধরনের সমস্যায় তিনি একেবারেই অনভ্যস্ত। এমনকি এমন কিছু তিনি কখনো কল্পনাও করেননি!

যাহোক, সেটা ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি ভাবতেন—এ অপবাদটি সত্যি না মিথ্যা? যদি ঘটনা সত্যি হয়, তাহলে আঘাতটি হতো সবচেয়ে প্রিয় বস্তুর ওপর। আর প্রত্যেকটি মানুষের প্রিয় বস্তু হলো তাঁর ইজ্জত-সম্মান। এই ষড়যন্ত্রের কষ্ট-যাতনা অন্যগুলোর তুলনায় এ কারণে বেশি ছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসিক অবস্থা সব সময় দোদুল্যমান ছিল। যার থেকে পলায়নের কোনো রাস্তা নেই। তা ছাড়া অবিলম্বে ওহি এসে বাস্তবতা যদি উন্মোচন করে দিত এবং মুনাফিকদের অপবাদ-ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিত, তবুও তো এই দুশ্চিন্তা ও দোদুল্যমানতা থেকে রেহাই পাওয়া যেত; কিন্তু ওহি এসেছে এর এক মাস পরে। এটাও ছিল দুশ্চিন্তার আরেকটি কারণ।

এ ছাড়াও অপবাদের এই বিপদটি হয়তো কোনো ঐশী প্রজ্ঞা ছিল—যাতে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। আর এ প্রকাশটা ছিল সবচেয়ে স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র। যদি অপবাদ ট্রাজেডি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বকে শক্তভাবে নাড়া না দিত—যার ফলে তার স্বচ্ছ নবুয়তি ব্যক্তিত্ব তাঁর সাধারণ ব্যক্তিত্ব থেকে আলাদা হয়ে প্রকাশ পেতে পারে, তাহলে অনেক মুমিন ও কাফিরের অন্তরে তাঁর নবুয়ত ত্রুটিযুক্ত থেকে যেত। অনুরূপ নবুয়ত ও ওহির অর্থ ও মর্মার্থ বিভিন্ন দৃষ্টি ও চিন্তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং এর সাথে অন্য কোনো মানসিক অথবা আনুভূতিক অর্থের মধ্যে কোনো অর্থের সাথে মিলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামকে ভাবিয়ে তুলেছিল। নবি-রাসুলদের জন্য নির্ধারিত ইসমতের (নিষ্পাপত্ব) সংরক্ষিত আওতায় থেকেও তিনি সাধারণ মানুষদের মতো আচরণ করছেন। তাদের মতোই দুশ্চিন্তা করছেন। অন্যান্য মানুষের মতোই একে গ্রহণ করছেন—যার দ্বারা তিনি যে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর এবং কোনো বানোয়াট মিথ্যা সম্পর্কে জানেন না, এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। তাই তিনি বিচলিত হয়েছেন, যেমন অন্য মানুষের বেলায় হয়ে থাকে এবং তাদের মতোই সন্দেহ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে মত পালটাচ্ছেন এবং সাহাবিদের মধ্যে বিজ্ঞদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ মানবীয় এই দিকটি প্রকাশের মধ্যে ঐশী প্রজ্ঞার দাবি এটা ছিল যে, এই সময়টাতে ওহি বিলম্বে আসুক, যেন মানুষের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উন্মোচিত হতে পারে—

প্রথম রহস্য : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাত থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বাভাবিক অন্য মানুষের মতোই ছিলেন। তাই কোনো মুমিনের জন্য এ কথা বিশ্বাস করা উচিত হবে না যে, তিনি মানবীয় গুণাবলির উর্ধ্বে ছিলেন এবং তাঁর দিকে এমন কিছু সম্পৃক্ত করা অনুচিত, যার সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারও দিকে করা ঠিক বা বৈধ নয়।

দ্বিতীয় রহস্য : ঐশী প্রত্যাদেশ বা ওহি কোনো আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তা থেকে উৎসারিত হতো। তেমনি এটি তাঁর ইচ্ছার অনুগামীও ছিল না। যদি তা-ই হতো, তাহলে তাঁর জন্য এটাই সহজ ছিল যে, ঘটনার উৎপত্তির দিনেই তা শেষ করে দেওয়া এবং এর নেতিবাচক ফলাফল থেকে নিজেকে মুক্তি দেওয়া এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে তাঁর ধারণামতে যা ভালো ও স্থায়ী, তা দিয়ে একটি কুরআন তৈরি করা, যা তাঁর অনুসারীদের আশ্বস্ত করবে এবং বিরুদ্ধবাদীদের চুপ করিয়ে দেবে; কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, এতটুকু সামর্থ্য তাঁর নেই।

উক্ত রহস্যের বিবরণে আমরা ড. আবদুল্লাহ দারাজের বর্ণনা তুলে ধরব। তিনি তার আন-নাবাউল আজিম কিতাবে লেখেন—

> মুনাফিকরা আয়িশা রা.-এর ব্যাপারে সমালোচনা ও অপমানের ঝড় বইয়ে দেয়। এমতাবস্থায় ওহিও বিলম্বিত হয়। আর লোকেরাও নানা কথা বলাবলি করতে থাকে। প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় পৌঁছে। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যায়। আর তিনি পূর্ণ সতর্কতার সাথে এ কথা ছাড়া কিছু বলতে পারছেন না—আমি তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া কিছু জানি না।
>
> অতঃপর তিনি চিন্তাভাবনা, জিজ্ঞাসা ও সাথিবর্গের সাথে পরামর্শ ইত্যাদির মধ্যেই এক মাস সময় ব্যয় করেন। অপরদিকে সব লোকেরা বলছে—আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না।
>
> সর্বশেষ তাকে এতটুকু বললেন—আয়িশা, আমি তোমার সম্পর্কে এমন এমন কথা শুনেছি, যদি তুমি নির্দোষ ও পবিত্র হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ

তায়ালা অচিরেই তোমার নির্দোষ ও পবিত্রতার ঘোষণা করবেন; আর তুমি যদি কোনো গুনাহ করেই থাকো, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো।[২৮]

এটা ছিল তাঁর একান্তই মনের কথা। বস্তুত, এগুলো হলো এমন মানুষের কথা, যারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না এবং একজন সুদৃঢ় সত্যবাদী ব্যক্তির কথা; যিনি না জেনে, অনুমান করে কথা বলেন না। এমনকি তিনি এসব কথা বলার পরেও স্বীয় অবস্থান থেকে সরে যাননি। শেষ পর্যন্ত আয়িশা রা.-এর নিশ্চিত পবিত্রতা ও সম্মানের ঘোষণা দিয়ে সুরা নুরের প্রথমাংশে ১০টি আয়াত নাজিল হলো। যদি কুরআন তাঁর নিয়ন্ত্রণেই থাকত, তাহলে তাঁর ইজ্জতরক্ষা ও অবস্থান ঠিক রাখার জন্য তিনি কেন এমন করলেন না যে, এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যগুলো তিনি নিজে থেকেই তৈরি করে ওহি বলে চালিয়ে দিতেন। যাতে করে সমালোচনাকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনি তো ছিলেন এমন—যিনি মানুষের ব্যাপারেই মিথ্যা বলেন না, আল্লাহর ব্যাপারে কীভাবে তিনি মিথ্যা বলবেন? আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্বন্ধে বলেন—

'সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করত, তবে আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম অতঃপর কেটে ফেলতাম তাঁর গ্রীবা, তোমাদের কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারতে না।'[২৯]

আয়িশা রা. ছিলেন প্রথম উম্মুল মুমিনিন—যার ক্ষেত্রে এই দুটি রহস্য ফুটে ওঠে। তিনি ছিলেন তাওহিদ ও আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মজবুত ও একনিষ্ঠ। এমন করুণ পরিস্থিতিতে তিনি সবকিছু ও সব মানুষকে ভুলে গেলেও তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে ভোলেননি। যখন পবিত্রতার আয়াত নাজিল হলো, তখন তার সম্মানিতা মাতা তাকে বললেন—আয়িশা, নবিজির কাছে যাও; তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

তিনি উত্তরে বললেন—আমি কারও কাছে যাব না; আর এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারও কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করব না। কারণ, আল্লাহ তায়ালাই আমার পবিত্রতার সাক্ষী দিয়ে আয়াত নাজিল করেছেন।

আয়িশা রা.-এর এই কথায় আপাতদৃষ্টিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামের পক্ষে অনুপযুক্ত হলেও সময় ও পরিস্থিতির বিচারে অনুপযুক্ত ছিল না। কেননা, হিকমতে ইলাহির দাবি এটাই ছিল যে, ইফকের ঘটনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না থেকে

---

২৮ *আন-নাবাউল আজিম* : ১৭

২৯ সুরা আহকাফ, আয়াত : ৪৪-৪৭

বরং এর দ্বারা মুমিনদের তাওহিদের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হোক এবং আল্লাহ তায়ালার তাওহিদ, আনুগত্য ও আত্মনিবেদন প্রকাশ পাক এবং মুনাফিক ও নাস্তিকদের অপবাদ অবসান হোক।

এভাবেই সৃষ্টিকর্তার অপার হিকমতে অপবাদের ঘটনার সমাধান হয়ে যায়। যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি আকিদার সুদৃঢ়করণ এবং এতে যেসব সন্দেহ এসে যায়, সেগুলো দূরীকরণ। আর এই কল্যাণের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন—

> তোমরা এটাকে খারাপ মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[৩০]

পাঁচ. অন্যায়ের শাস্তি কার্যকরের বিধান

ইফকের ঘটনা দ্বারা অপবাদের শাস্তির বিধান প্রমাণিত হয়। কারণ, আমরা দেখি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, যারা প্রকাশ্যে অপবাদ রটিয়েছে। তাদের আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়; এতে কারও কোনো অভিযোগ বা প্রশ্ন উত্থাপন নেই।

তবে প্রশ্ন হলো—আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কীভাবে শাস্তি থেকে বেঁচে গেল, অথচ এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর ক্ষেত্রে সে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে?

এর কারণ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন—

> সে অপবাদ সম্পর্কে লোকদের এমনভাবে বলত যে, অপবাদের সূত্র হিসেবে কেউ তার নাম উল্লেখ করবে না।[৩১]

আর আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, স্পষ্টভাবে না বললে তার ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। পরিশেষে আয়িশা রা.-এর পবিত্রতা, মুনাফিক ও বিভ্রান্তির শিকার ব্যক্তিদের ব্যাপারে নাজিলকৃত আয়াত ১০টি উল্লেখ করে অপবাদের ঘটনা থেকে শিক্ষার আলোচনা শেষ করছি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন—

---

৩০ সুরা নুর, আয়াত : ১১

৩১ 'জাদুল মাআদ', খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৫

যারা মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল; তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গুনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ?

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, তার জন্য তোমাদের গুরুতর আজাব স্পর্শ করত। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে—যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে; অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল।

তোমরা যখন এই কথা শুনলে, তখন কেন বললে না—এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ তো পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ।

আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন—তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনো পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে বেবিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত!

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ

কাজের ওই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।[৩২]

* * *

৩২ সূরা নূর, আয়াত : ১১-২২

গাজওয়ায়ে খন্দক

যুদ্ধের সময়কাল

ইবনে ইসহাক, উরওয়া ইবনে জুবাইর, কাতাদা, বাইহাকি ও অধিকাংশ সিরাত বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে—এই যুদ্ধটি ছিল পঞ্চম হিজরির শাউয়াল মাসে।

তবে কেউ কেউ বলেন—এটি ছিল চতুর্থ হিজরিতে মুসা ইবনে উকবা এ মত পোষণ করেন। ইমাম বুখারি রহ. তার থেকে এ মতটি বর্ণনা করেন এবং ইমাম মালিক তার অনুসরণ করেন।[৩৩]

যুদ্ধের কারণ বা প্রেক্ষাপট

ইহুদি গোত্র বনু নাজিরের একটি প্রতিনিধিদল মক্কায় এলো; কুরাইশদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উসকে দিতে লাগল। বলল—আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি। আমরা তাকে নির্মূল না করে ক্ষান্ত হবে না। ইহুদিরা কুরাইশদের বলল—নিশ্চয়ই তোমরা মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্মের ওপর আছ। তাদের ব্যাপারে কুরআনের উক্ত আয়াত নাজিল হয়—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

---

৩৩ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৭৫; *ফাতহুর রাব্বানি* (ইমাম আহমাদের বিন্যাস), খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৭৬

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যাদের কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিবত (শয়তান, শিরক, জাদু প্রভৃতি) ও তাগুত (বাতিল উপাস্যে) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

এরাই তো তারা, যাদের আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"

এরপর তারা কুরাইশদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলো।

এরপর ইহুদিদের প্রতিনিধিদলটি সেখান থেকে চলে গেল গাতফানে, সেখানেও তারা অনুরূপ প্রস্তাব রাখল। এবং আলোচনা চলতে থাকল একপর্যায়ে তারা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করল। এরপর তাদের সাক্ষাৎ হলো বনু ফাজারা ও বনু মুররাহ-এর সাথে। এবং তাদের সকলের সাথে মিলে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দিন-তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করে।"

মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সংবাদটি জানতে পারলেন এবং মক্কা থেকে তাদের বের হওয়ার কথা শুনতে পেলেন, তখন সকল লোককে ডেকে শত্রুর অবস্থা তাদের কাছে তুলে ধরলেন। এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। সালমান ফারসি রা. খন্দক বা পরিখা খননের পরামর্শ দিলেন। খন্দক খননের পরামর্শটি সকলেরই পছন্দ হলো (খন্দক সম্পর্কে আরবরা জানত না) মুসলিমরা মদিনা থেকে বের হলেন। সালা পর্বতকে পেছনে রেখে পুরোদমে খন্দক খননের কাজে লেগে পড়লেন। তখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার আর কাফিরদের সংখ্যা ছিল কুরাইশ, আহজাব ও অন্যান্য গোত্র মিলে প্রায় দশ হাজার।"

---

৩৪ সুরা নিসা, আয়াত : ৫১-৫২

৩৫ সূত্র : সারসংক্ষেপ, *তাবাকাতু ইবনে সাদ*, ও *সিরাতে ইবনে হিশাম*

৩৬ *তাবাকাতু ইবনে সাদ*, ও *সিরাতে ইবনে হিশাম*

খন্দক খননের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি

০১. *সহিহ বুখারি*-তে বর্ণিত আছে, বারা রা. বলেন—

খন্দকের দিন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি ধুলোর কারণে তাঁর পেট মুবারকের চামড়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। এবং দেখলাম, তাঁর শরীরে প্রচুর লোম রয়েছে।

০২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

আনসার ও মুহাজিরগণ খন্দক খনন করছিলেন। মাথায় করে মাটি বহন করছিলেন আর এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিলেন : نحن الذين بايعوا محمدا - على الجهاد ما بقينا أبدا—আমরা তো তারা, যারা মুহাম্মাদের হাতে বাইয়াত হয়েছি, যতদিন বেঁচে আছি জিহাদ চালিয়ে যাব।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যুত্তরে বলছিলেন : اللّٰهُمَّ لا خير إلا خير الآخرة- فاغفر للأنصار والمهاجرة—হে আল্লাহ, আখিরাতের কল্যাণই একমাত্র কল্যাণ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বরকত দান করেন।"

০৩. *সহিহ বুখারি*-তে জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

আমরা খন্দক খনন করছিলাম, এমতাবস্থায় হঠাৎ করে একটি বিরাট শক্ত পাথর বেরিয়ে এলো। লোকেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরজ করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, একটি শক্ত পাথর বেরিয়ে এসেছে, আমরা ভাঙতে পারছি না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি নিজেই খন্দকে অবতরণ করছি।

সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন, (কয়েক দিন অভুক্ত থাকার কারণে) তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমরা তিন দিন যাবৎ কিছুই খাইনি।

---

৩৭ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬; *সহিহ মুসলিম*-এ কাছাকাছি শব্দে বারা রা. হাদিস বর্ণিত আছে; সূত্র : *সহিহ মুসলিম*, কণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৮৭

তো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোদাল হাতে নিয়ে পাথরে সজোরে আঘাত করলেন। এতে করে পাথরটি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি আরজ করলাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাকে যদি একটু কিছু সময়ের জন্য বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিতেন! (তিনি অনুমতি দিলেন) অতঃপর আমি ঘরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি যে, আমার পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়। তোমার কাছে কি খাওয়ার কিছু আছে?

সে বলল—খাবার বলতে আমার কাছে আছে কিছু যবের আটা, আরেকটি ছাগলছানা। আমি ছাগলছানাটি জবাই করলাম, আটাগুলো দিয়ে খামির তৈরি করলাম। গোশত ডেগে তুলে দিয়ে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে এলাম। রুটি তৈরি করা হয়ে গেছে আর পাতিলের মধ্যে বলগ এসেছে, গোশত প্রায় পাকানো হয়ে গেছে।

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার জন্য অল্প কিছু খাবার রান্না করেছি; আপনি আসেন, আর আপনার সাথে একজন বা দুজনকে নিয়ে নেন।

তিনি বললেন—(খাদ্যের পরিমাণ) কতটুকু? অতঃপর আমি সবকিছু খুলে বললাম। তিনি বললেন—ভালো, সেটাই তো অনেক। যাও, তোমার স্ত্রীকে বলো—আমি আসার আগপর্যন্ত যেন চুলা থেকে গোশত আর রুটি না নামায়।

এরপর আনসার ও মুহাজিরদের ডেকে বললেন—তোমরা আসো! অন্য সনদে বর্ণিত আছে—অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম উঁচু আওয়াজে ডাক দিয়ে বললেন, হে খন্দকবাসী, জাবির তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে, তোমরা আমন্ত্রিত, তোমাদের স্বাগত।

অতঃপর জাবির রা. তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন—হায় সর্বনাশ! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির-আনসারসহ সকলকে নিয়ে আসছেন। তিনি জাবিরকে জিজ্ঞাসা করলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনাকে খাবারের পরিমাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছেন?

তিনি বললেন—হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছেন।

তিনি বললেন—তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন (কীভাবে এত মানুষের মেহমানদারি করবেন।)

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন—তোমরা একে একে প্রবেশ করো। কোনো রকম চাপাচাপি করো না। তিনি নিজ হাতে রুটি ছিঁড়ে তার ওপর গোশত দিয়ে সকলকে এক এক করে দিতে লাগলেন। নেওয়ার সময় পাতিল ও চুলা ঢেকে রাখতেন, তাঁর সাথিদের হাতে দিয়ে তারপর খুলতেন। এভাবে রুটি ছিঁড়ে চামচ ভরে অঞ্জলি ভরে দিতে থাকেন। এমনকি তারা সকলে তৃপ্ত হওয়ার পরেও (খাবার) যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তোমরা এগুলো খাও আর লোকদের হাদিয়া দাও। কারণ, লোকেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে—জাবির রা. আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, তারা (সাহাবায়ে কিরাম রা.) তৃপ্তিভরে খাওয়ার পর সেগুলো রেখে চলে গেল, আমাদের আটা ততটুকুই বাকি ছিল, যতটুকু রান্নার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।[৩৮]

খনন কাজে মুনাফিকদের পলায়নপরতা

ইবনে হিশাম রহ. বর্ণনা করেন—মুনাফিকদের মধ্য হতে কিছু লোক খন্দক খননের কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের থেকে দূরে থাকতে লাগল এবং কাজে ঢিলেমি ও বিলম্ব করতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়িতে চলে যেত। এর বিপরীতে কোনো সাহাবির যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুমতি চাইতেন। তিনি অনুমতি দিতেন। কাজ শেষ হলে তিনি আবার এসে কাজে লেগে যেতেন। এদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

তারাই বিশ্বাসী, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসুলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত

---

৩৮ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৬; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৭৯-২৮০

সরে পড়ে না। যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব, তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রচণ্ড ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৯]

বনু কুরাইজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

বনু কুরাইজার সরদার কাব ইবনে আসাদের নিকট বনু নাজিরের সরদার হুয়াই ইবনে আখতাব এসে তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচনা দিতে লাগল; বলল—আমি তোমার কাছে কুরাইশের নেতৃবর্গ ও যোদ্ধাদের নিয়ে এসেছি। তাদের রুমা পর্বতের উপত্যকায় রেখে এসেছি। গাতফানকে তার নেতৃবর্গ ও যোদ্ধাদেরসহ নিয়ে এসেছি। তাদের উহুদের পাশে 'নাকমি' উপত্যকায় রেখে এসেছি। তারা সকলেই আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের মূলোৎপাটন না করে ঘরে ফিরে যাবে না।

কাব সবকিছু শুনে বলল—তুমি আমার কাছে কালের কলঙ্ক নিয়ে এসেছ। আফসোস হুয়াই, তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও (এর মধ্যে আমাকে জড়াবে না দয়া করে) । কারণ, চুক্তির সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সকল অঙ্গীকার রক্ষা করেছে এবং নিষ্কলুষ সততার পরিচয় দিয়েছে। আমি তাঁর সাথে গাদ্দারি করতে পারব না।

কিন্তু কাবও নাছোড়বান্দা, সে তার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য করে।

সংবাদটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি সাদ ইবনে মুআজ রা.-কে পাঠালেন। আর তাকে এ কথাও বলে দিলেন—যদি সংবাদ সত্য হয়, তাহলে আমাকে ইশারায় বুঝিয়ে দেবে, তা শুধু আমিই বুঝব। জনসম্মুখে ঘোষণা করে লোকদের মনোবল ভেঙে দেবে না। আর যদি তা মিথ্যা হয়, তবে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দেবে।

---

৩৯ সূরা নূর, আয়াত : ৬২

সাদ রা. খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন—সংবাদ সত্য। তখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফেরত এলেন। এসে ইঙ্গিতসূচক শব্দে বললেন—'আজল ও কারাহ।' অর্থাৎ আজল ও কারাহ গোত্র যেভাবে ইয়াওমুর রাজি অভিযানে মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করেছিল, তারাও তেমনি বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারি করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন—সুসংবাদ গ্রহণ করো, হে মুসলিমগণ।"

তখন মুসলিমদের অবস্থা

বনু কুরাইজার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সংবাদ মুসলিমরা জানতে পারলেন। এর মাধ্যমে মুসলিমদের দুর্বল করে দেওয়ার যে প্ল্যান-পরিকল্পনা মুনাফিকরা হাতে নিয়েছিল, তা নস্যাৎ হয়ে গেল। শত্রুরা মুসলিমদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। এতে করে মুনাফিকরা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের একজন তো বলেই ফেলল—মুহাম্মাদ আমাদের বলেছিল যে, আমরা কিসরা আর কাইসারের ধনভান্ডার ভোগ করব, অথচ আমরা কেউ আজ নিরাপদ নই; এমনকি নিশ্চিন্তে বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারছি না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন; অপরদিকে মুসলিমদের ওপর বিপদ আসন্ন, তখন সাদ ইবনে মুআজ ও সাদ ইবনে উবাদা রা.-কে কবিলায়ে গাতফানের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন। তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে যে, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। এর বিনিময়ে তারা পাবে মদিনার এক-তৃতীয়াংশ ফল।

তারা আরজ করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা কি আপনার পছন্দ নাকি আল্লাহর হুকুম, যা তিনি আপনাকে করতে আদেশ দিয়েছেন অথবা আপনি নিজে থেকেই আমাদের জন্য করতে চাচ্ছেন?

তিনি বললেন—বরং আমি নিজে থেকেই করতে চাচ্ছি, তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য।

তখন সাদ ইবনে মুআজ রা. বললেন—আল্লাহর কসম! তার আর প্রয়োজন নেই। আমরা তাদের তরবারিই উপহার দেবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তাদের মাঝে

---

৪০ *তাবাকাতু ইবনে সাদ, ও সিরাতে ইবনে হিশাম*

চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় আনন্দের ছাপ ভেসে উঠল এবং তিনি বললেন—তাহলে তা-ই হোক!

আসিম ইবনে আমর ও ইবনে শিহাব জুহরির সূত্রে ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন—

> মুসলিমদের ও কবিলায়ে গাতফানের মধ্যে না কোনো সাক্ষ্য হয়েছে, আর না কোনো চূড়ান্ত চুক্তি হয়েছে; বরং এটাকে বহাল রাখার ব্যাপারে চেষ্টা চলছিল।[৪১]

মুশরিকরা যখন হামলা চালানোর জন্য মদিনায় এলো, তখন তারা খন্দক দেখে হতচকিত হয়ে পড়ল। চিন্তিত হয়ে বলতে লাগল—এই কৌশল তো আরবদের না। অতঃপর তারা খন্দকের চারপাশে সেনাছাউনি স্থাপন করে মুসলিমদের ঘিরে ফেলল।

সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবে মুশরিকদের কয়েকজন একটি সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল। মুসলিমগণ সেখানেও আক্রমণ করে বসেন। কতেক নিহত হয়, আর কতেক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আমর ইবনেন উদ। তাকে হত্যা করেছিলেন আলি ইবনে আবু তালিব রা.।

বিনা যুদ্ধে শত্রুদের পরাজয়

যুদ্ধে মুমিনদের (সাহায্যের) জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনি তাবৎ মুশরিকদের দুটি মাধ্যমে পরাজিত করেছেন। তাতে মুসলিমদের কোনো দখল নেই। তা হলো—

- ০১. বিভেদ সৃষ্টি
- ০২. ঝড়ো হাওয়া

এক. বিভেদ সৃষ্টি

মুশরিকদের লোক নুআইম ইবনে মাসউদ আশজায়ি রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং তিনি আবেদন করেন, যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো কাজ দেন। রাসুলুল্লাহ

---

৪১ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৩; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৭৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—তুমিই আমাদের মাঝে (মুশরিকদের মধ্য হতে) একমাত্র ব্যক্তি। যদি তুমি পারো, তাহলে শত্রুদের মাঝে বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দাও, বিভেদ তৈরি করে দাও। কেননা, যুদ্ধ হলো কৌশলের নাম।

নুয়াইম ইবনে মাসউদ রা. বনু কুরাইজায় গেলেন। তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারা মনে করেছিল—তিনি এখনও মুশরিক আছেন। নুয়াইম তাদের বোঝালেন—তারা যেন কুরাইশদের থেকে বন্ধক বা জামানত নেওয়া ব্যতীত মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে না জড়ায়। যাতে করে তারা পিছু হটতে না পারে, অন্যথায় এর ব্যতিক্রম হলে তারা মিত্রহীন ও একাকী পড়ে যাবে। তখন তারা বলল—নিশ্চয়ই তুমি সত্য বলেছ।

এরপর তিনি গেলেন কুরাইশদের কাছে। তাদের বললেন যে, বনু কুরাইজা তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। আর তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোপনে চুক্তি করেছে যে, তারা কুরাইশ ও গাতফানের শীর্ষ কয়েকজন নেতাকে কিডন্যাপ করে তাদের হাতে তুলে দেবে; আর তিনি তাদের হত্যা করবে। তাই যদি ইহুদিরা তোমাদের কাছে কোনো ব্যক্তি বা নেতাকে বন্ধক চেয়ে পাঠায়। সাবধান! তোমরা বন্ধক হিসেবে কাউকে অর্পণ করবে না।

অতঃপর তিনি গাতফানে এসেও একই রকম কথা বললেন; এভাবেই তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে; একে অপরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। একদল আরেক দলকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দোষারোপ করতে থাকে।

দুই. ঝড়ো হাওয়া

হিমশীতল ঘন কালো অন্ধকার রাত্রে প্রলয়ংকরী ঝড়ো হাওয়া এসে তাদের হাড়ি পাতিল উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলে। ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এটা হয়েছিল অবরোধের প্রায় দশ থেকে বারো দিন পর।

সহিহ মুসলিমে-মে বর্ণিত, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

খন্দক যুদ্ধের রাতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম; এদিকে ঝড় বইছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—যে ব্যক্তি

শত্রুদের সংবাদ এনে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সাথে স্থান দেবেন।

সবাই চুপচাপ। কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না। তিনি আবার বললেন—যে ব্যক্তি শত্রুদের সংবাদ এনে দেবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন আমার সাথে স্থান দেবেন। কথাটি তিনবার বললেন। এরপর বললেন—হুজাইফা, তুমি ওঠো; গিয়ে শত্রুদের সংবাদ নিয়ে আসো।

যখন আমার নাম উল্লেখ করে বলেছেন, আর না গিয়ে পারলাম না। তিনি বললেন—সংবাদ নিয়ে আসবে; কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো রকম আতঙ্ক ছড়াবে না।

আমি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ থেকে উঠলাম, মনে হতে লাগল—আমি যেন গোসলখানায় যাচ্ছি। একপর্যায়ে তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আবু সুফিয়ান তার পিঠে আগুনের তাপ দিচ্ছে। আমি ধনুকে একটি তির রাখলাম। ইচ্ছা হলো—তাকে মেরে দিই; তৎক্ষণাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা স্মরণ হলো—তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে না আমি নিশ্চিত ছিলাম, তির ছুড়লে নির্ঘাত সে মারা পড়ত। আমি সেখান থেকে ফেরত এলাম, আর তখনও মনে হচ্ছিল, যেন গোসলখানায় চলছি। ফেরত এসে তাকে শত্রুদের সংবাদ জানিয়ে দায়মুক্ত হলাম।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি কাপড় পরিধান করালেন, যেটা পরিধান করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আমি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—ওঠো, হে ঘুমন্ত ব্যক্তি![৪২]

ইবনে ইসহাক রহ. আরেকটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেন—

আমি শত্রুদের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এদিকে ঝড়ো হাওয়া সবকিছু লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে। আবু সুফিয়ান দাঁড়িয়ে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, প্রত্যেকে যেন তার

---

৪২ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৭৭

*সহিহ বুখারি*র বর্ণনা থেকে বোঝা যায়—গিয়েছিলেন জুবাইর রা.। তবে আসল কথা হলো, সেই ঘটনার সম্পর্ক অন্য ঘটনার সাথে। তাকে পাঠিয়েছিলেন বনু কুরাইজার কাছে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। আর সিরাত বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে, আহজাবে শত্রুদের সংবাদ আনতে গিয়েছিলেন হুজাইফা রা.। আরও বিশদ জানতে ইবনে সাইয়িদিন নাস-এর *উয়ুনুল আসার* ও ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর *ফাতহুল বারি* দেখা যেতে পারে।

পাশের ব্যক্তির দিকে খেয়াল রাখে। হুজাইফা রা. বলেন, আমি আমার পাশের ব্যক্তির হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কে?

সে বলল—অমুকের বেটা অমুক।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলল—সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা তোমাদের ঘরে নেই। এখন আমরা এখানে বেশি সময় অবস্থান করতে পারব না। হয়তো ঘোড়া ও গাধাগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বনু কুরাইজার লোকেরা আমাদের রেখে চলে গেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে হতাশাজনক তথ্য এসেছে। আর এ দিকে হাওয়া বইছে—তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাই তোমরা যাত্রা শুরু করো। আমিও যাত্রা শুরু করছি।'[৪৩]

দ্বিতীয় দিন সকালে সকল মুশরিক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দিনগুলোতে মুসলিমদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুআ করতে কোনো রকম কমতি করেননি। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল দুআর সারসংক্ষেপ হলো—

اللّٰهُمَّ منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب،اللّٰهُمَّ اهزمهم وزلزلهم.

> হে আল্লাহ, আপনি তো কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, আহজাবকে পরাজিত করেন। হে আল্লাহ, আপনি তাদের পরাজিত করুন, আর তাদের প্রকম্পিত করুন।[৪৪]

এ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যায়। সময় শেষ হওয়ার পর তা আদায় করে নেন। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত হয়েছে—উমর ইবনুল খাত্তাব রা. খন্দকের দিন সূর্যাস্তের পর আগমন কুরাইশের কাফিরদের গালিগালাজ করতে করতে আগমন করলেন। তিনি বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি এখন সালাত আদায় করিনি। এদিকে সূর্য ডুবে গেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন—আমিও করিনি। 'বুতহান' নামক

---

৪৩ সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩১

৪৪ *সহিহ বুখারি*

উপত্যকায় আমরা থেমে সূর্যাস্তের পর আসরের সালাত কাজা পড়ে নিলাম। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করলাম।"

সহিহ মুসলিম-এ এই হাদিসের সাথে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তারা আমাদের মধ্যবর্তী সালাত (আসরের সালাত) থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘরবাড়ি ও কবরগুলো অগ্নিময় করে দিক। এরপর নবিজি ও সাহাবিরা মাগরিব ও এশার মাঝে আসরের সালাত আদায় করে নিলেন।

* * *

৪৫ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।*

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি

এই যুদ্ধেরও ভিত্তি ছিল ইহুদিদের গাদ্দারি ও ষড়যন্ত্রের ওপর। কারণ, তারাই অন্য লোকদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উসকে দিয়েছে, সকলকে একত্র করেছে। আর এটা শুধু বনু নাজিরের—যাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আগেই মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে—মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তাদের সাথে অংশ নিয়েছে বনু কুরাইজা। তারা তখনও মুসলিমদের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে যাচ্ছিল। চুক্তি ভঙ্গ করার মতো কোনো আচরণ মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ করেনি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন মনে করছি না।

আমরা এখান থেকে কিছু শিক্ষা ও উপদেশ খুঁজে বের করব; কেননা, ইহুদিদের এ বিষয়টি প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। উল্লেখের কারণ হলো—ইহুদিদের ওয়াদা ভঙ্গ আর বিশ্বাসঘাতকতা কোনো নতুন বিষয় নয়।

আমরা এখন এই যুদ্ধের ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা ও এসবের নিহিত শিক্ষা উপদেশ ও বিধানাবলি সম্পর্কে অবগতি লাভ করার চেষ্টা করব। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো—

০১. কৌশল : মুমিনের হারানো সম্পদ

এই যুদ্ধে মুসলিমদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল ছিল খন্দক বা পরিখা। ইসলামের ইতিহাসে গাজওয়ায়ে আহজাবই প্রথম যুদ্ধ, যাতে খন্দক খনন করা হয়েছিল। আর খন্দক খনন করে আক্রমণকারীদের ঠেকানোর এই কৌশল শুধু অনারবদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, খন্দক খননের এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সালমান ফারসি রা.। প্রস্তাবটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সালামের পছন্দ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দ্রুত তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

নবিজির পক্ষ থেকে একজন পারস্য সাহাবির পরামর্শ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নেওয়ার এই ঘটনা এটিই প্রমাণ করে যে, হিকমত হলো মুমিনের হারানো সম্পদ; যেখানেই তার দেখা পাবে, কুড়িয়ে নেবে। কারণ, অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে একজন মুসলিমই এর বেশি হকদার। ইসলামি শরিয়ত মুসলিমদের অদূরদর্শিতা, কাফির-মুশরিকদের অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ অত্যন্ত অপছন্দ করে। একইভাবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ করে কল্যাণের সকল দিক ও উপকারী নীতিগুলোর সমস্ত দিক—তারা নিজেদের জন্য একত্র করবে যেখানেই পাওয়া যাবে, ও ফুটে উঠবে।

একজন মুসলিমের নীতি

এ ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নীতি হলো, একজন মুসলিম আচার-আচরণ, লেনদেন ও সমস্ত বিষয়ে তার সূক্ষ্ম চিন্তাকে অকেজো করে রাখবে। একজন মুসলিম যদি এমন চৌকশ ও বুদ্ধিমান হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে তার ঘাড়ে এমন কোনো বেড়ি পরাবে না, যেই বেড়ির একপ্রান্ত সে অন্যদের হাতে ছেড়ে দেবে—যারা তাকে কোনো বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ছাড়াই যেখানে ইচ্ছা সেখানে পরিচালনা করবে।

আর তার জন্য এটাও সম্ভব নয় যে, সে এমন কোনো নীতি, কাজ বা শৃঙ্খলা অবলম্বন করবে, যা সাধারণ বিবেক ও মুক্তচিন্তা কখনো সাপোর্ট করে না এবং ইসলামি শরিয়তের যার সাথে সংঘাত রয়েছে। এ রকম কোনো কিছু সামনে এলে সেগুলোকে সে উপেক্ষা করবে; বরং এই ধরনের ব্যাপারগুলোকে মোকাবিলা করে সে নিজেকে উপকৃত করতে কোনো রকম কসুর করবে না।

এ নীতিকে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। এর উৎস হলো একটি মূলনীতি; আর তা হলো—সেই সম্মান, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; যখন তিনি ইচ্ছে করেছেন যে, মানুষ সৃষ্টিজগতের সরদার হবে। আল্লাহর ইবাদতচর্চা এবং শরিয়তের বিধান মান্য করা শুধু এই সম্মান ও নেতৃত্বকে হিফাজত করার জন্য।

০২. সমতা : ইসলামি সমাজের প্রকৃত ভিত্তি

খন্দক খননের সময় সাহাবায়ে কিরাম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম যেভাবে তামিল করেছেন, তাতে সাধারণ মুসলিমদের জন্য রয়েছে

অনেক বড়ো একটি উপদেশ। কেননা, এর মাধ্যমে ইসলামি সমাজ যে তার প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে সমতা বিধান করেছে, তার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। আর এটাও উন্মোচিত হয়ে যায় যে, ইনসাফ ও সমতা ইসলামি বিবেচনায় শুধু প্রতীক নয়—যার দ্বারা সমাজের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়; বরং ন্যায় ও সমতা হলো ইসলামের প্রকৃত ভিত্তি; যেগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিসমূহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে উৎসারিত হয়।

আপনি লক্ষ করে দেখবেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের খন্দক খননের দিকে আহ্বান করে, তাদের পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করতে সংরক্ষিত রাজপ্রাসাদে চলে যাননি। আবার এমনও করেননি যে, একটি কোদাল দিয়ে খননকার্য উদ্বোধন করে কোদাল সেখানে ফেলে রেখে, নিজের পরিহিত সুন্দর পোশাকের ময়লা ঝেড়ে চলে গেছেন। তিনি এতে অংশগ্রহণ করেছেন, এটা বোঝানোর জন্য কোনো ভানও ধরেননি; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাধারণ সাহাবির মতোই কাজে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করেছেন; এমনকি ময়লাযুক্ত পোশাক পরিধান করেছেন। তাঁর শরীর মুবারক ছিল ধুলোমলিন, ফলত তাঁকে অন্যদের চেয়ে আলাদা মনে হতো না। সাহাবায়ে কিরাম একে অপরকে প্রফুল্ল রাখতে কবিতা আবৃতি করছেন। তিনিও তাদের সাথে সাথে আবৃত্তি করছেন। তিনিও তাদের মতোই ক্লান্ত হয়েছেন ও অভুক্ত থেকেছেন; বরং তাদের চেয়ে তিনি বেশি অভুক্ত ছিলেন। এটাই ছিল সেই প্রকৃত সমতা—যা ইসলামি শরিয়ত শাসক-শাসিত ধনী-গরিব আমির ও মিসকিনদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছে। শরিয়তের বিধিবিধানের সকল শাখা-প্রশাখা এই সত্যকে ধারণ করে এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের পার্থক্য

আজকের গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের এ ব্যবস্থার সাথে দূরতম সম্পর্ক নেই। দুই ব্যবস্থার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামি শরিয়তে ইনসাফ ও সমতার ভিত্তি হলো—আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব। এটি একটি অনন্যসাধারণ গুণ—যা সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইসলাম তার অনুসারীদের সবদিক থেকেই এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর সমস্ত মানুষকে বরাবর সমান মর্যাদা দেয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের উৎস হলো অধিকাংশের মতামতকে বাকিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া; সে মতামতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন।

এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ বা দলের জন্য কোনো স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দেয় না। আর না কোনো একটি শ্রেণির জন্য নিরাপত্তাকে জোরদার করে। চাই তার যেকোনো কারণ থাক। কেননা, আল্লাহ তায়ালার দাসত্বের প্রকৃতি হলো—মানুষের মাঝে ভেদাভেদ তুলে দিয়ে তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যকে পিছে ফেলে সকলকে একই শ্রেণিতে উন্নীত করা।

০৩. নবুয়তি ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ

এই ঘটনায় আরও একটি শিক্ষা রয়েছে; যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তি ব্যক্তিত্বের লক্ষণকে ফুটিয়ে তোলে। আর তিনি তাঁর অনুসারীদের প্রতি কতটা দয়া ও স্নেহ রাখতেন, সেটা জানান দেয়। সাথে এর মধ্যে মুজিজার কিছু দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়; যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মানিত করেছেন।

এ প্রেক্ষাপটে তাঁর নবুয়তি ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে এভাবে—খননকাজ চলাকালে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা তিনি সহ্য করেছেন। এমনকি পেটে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছেন। যাতে করে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি পেট খালি থাকার ফলে সৃষ্ট ব্যথা থেকে কোনোরকম বাঁচে; আর যেন লাগাতার কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়।

কীসের ভিত্তিতে এত কষ্ট দুর্ভোগ সহ্য করা! সেটা কি নেতৃত্বের জন্য, না রাজত্ব আর সম্পদের লোভে? অথবা নিজের আশেপাশে বহুসংখ্যক অনুসারী জমায়েত করার উদ্দেশ্যে? দুনিয়ার এ জাতীয় নগণ্য চাহিদা পূরণের জন্য এত এত কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহানো যায় না; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে এত সব কষ্ট সহ্য করেছেন ও ধৈর্যের সাথে সেগুলোর মোকাবিলা করেছেন তা হলো—রিসালাতের জিম্মাদারি; যে জিম্মাদারি আদায়ের জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন। আর এই পথের চরিত্রই এমন কষ্টকর। কষ্ট করেই তা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হয়। এটি নবুয়তি ব্যক্তিত্বের একটি উজ্জ্বল দিক।

সাথিদের প্রতি স্নেহপরায়ণ

আর নবিজি থেকে তাঁর সাহাবিদের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা, স্নেহ-মায়ার দিকটি তখনই ফুটে উঠেছিল, যখন জাবির রা. যখন সামান্য কিছু খাবার তৈরি করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলাদাভাবে দাওয়াত করেন। জাবির রা.-এর পক্ষ থেকে শুধু নবিজি ও এক-দুজনকে দাওয়াত করার কারণ হলো—

তিনি দেখতে পেলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, তাঁর পেটে পাথর বাঁধা। অন্যদিকে তার বাড়িতে এ পরিমাণ খাবারই ছিল, যা শুধু সামান্য দু-চারজন ব্যক্তির জন্যই যথেষ্ট হবে। তাই তিনি খাদ্যের পরিমাণ লোককেই দাওয়াত করতে বাধ্য ছিলেন।

কিন্তু এটা কী করে কল্পনা করা যায় যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের কাজের মধ্যে রেখে একা চলে যাবেন! যেখানে তারাও তাঁর মতোই ক্ষুধায় কাতর। সবাইকে ক্ষুধার্ত রেখে মাত্র তিন-চারজনকে সাথে নিয়ে আরাম করে খাবার খাবেন—এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তিনি প্রত্যেক সাহাবির প্রতি মায়ের চেয়ে বেশি স্নেহশীল ছিলেন।

এদিকে জাবির রা. স্বাভাবিকভাবেই কম লোককে দাওয়াত করতে বাধ্য ছিলেন। কারণ, (তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই চিন্তা করেছেন) তার ঘরে যতটুকু উপকরণ আছে, এর বাইরে তিনি ব্যবস্থা করতে পারবেন না। এ ছাড়া তিনি ভাবছিলেন—ঘরে যতটুকু খাবার আছে, তা শুধু হাতে গোনা কয়েকজন ব্যক্তির জন্যই যথেষ্ট হবে। তাই এতে বিশেষভাবে থাকবেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিদের মধ্যে তিনি যাকে বেছে নেন।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবির রা.-এর এই চিন্তায় প্রভাবিত হওয়ার নন। প্রথমত, তিনি তাঁর সাথিদের মধ্য হতে কোনো নিয়ামত বা শান্তি দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজেকে মানবরচিত বস্তুগত উপায়-উপকরণের সীমানাতে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। এক আল্লাহ তায়ালা সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাকারী ও সৃষ্টিকর্তা। আর অল্প খাবারকে অধিক খাবারে রূপান্তরিত করা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে খুবই সহজ। তিনি অল্প খাবারে বরকত দেবেন—তা সকল মানুষের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

যাহোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। তারা তাদের মাঝে যেকোনো নিয়ামত ভাগ করে নিতেন—তা যতই সামান্যই হোক। যেমনিভাবে ভাগ করে নেন কষ্ট-দুঃখ, তা যত বেশিই হোক। এ কারণেই জাবির রা.-কে তার বাড়িতে পাঠিয়েছেন খাবার প্রস্তুত করার জন্য। আর সাহাবিদের কাছে তিনি নিজে গিয়েছেন তাদের ডেকে আনার জন্য। যেন বড়ো আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে সকলে জাবিরের ঘরে আসেন।

নবিজির মুজিজা প্রকাশ

এই ঘটনায় সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে অংশটুকু ছিল, তা ছিল নবিজির মুজিজা প্রকাশ পাওয়া। জাবির রা.-এর সেই ছোট্ট বকরিটি প্রচুর খাবারে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া। শত শত সাহাবি যা তৃপ্তিভরে খাওয়ার পরও প্রচুর খাবার অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া; সেগুলো তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকা করতে বলেছিলেন।

এই অতিপ্রাকৃত বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের জন্য ছিল একটি ঐশী আপ্যায়নব্যবস্থা; সাহাবিদের প্রতি নবিজির অত্যধিক ভালোবাসা ও বস্তুগত উপায়-উপকরণ থেকে বিমুখতার কারণে যা আল্লাহর কুদরত ও কর্তৃত্বের অধীনেই ঘটেছিল।

সম্মানিত পাঠক থেকে আমি আশা করব, তারা যেন সুচিন্তিতভাবে এসব দিকগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যেগুলো দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বস্তুগত উপায়-উপকরণের কর্তৃত্ব ও মূল্যবোধের আড়ালে সাহায্য আর সাপোর্ট করা হতো। কেননা, এগুলো একজন চিন্তাশীল গবেষক পাঠকের জন্য নবুয়তি ব্যক্তিত্বের প্রতীকের নির্দেশকারী ঘটনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতেই নবুয়তি বৈশিষ্ট্যের আরেকটি দিক ফুটে ওঠে।

পাঠকদের থেকে আশা রাখব—তারা যেন এই বাস্তবতার দিকে চিন্তাগতভাবে খেয়াল রাখেন। এই মুজিজা অন্যরা[৪৬] যেভাবে প্রত্যাখ্যান করে, তারা যেন তেমন না হন। চাই তাদের সামনে পর্যালোচনার সময় যতই স্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করা হোক।

০৪. পরামর্শের হিকমত ও শরয়ি দলিল

গাতফান গোত্রের সাথে এই শর্তে চুক্তির বিষয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, বনু গাতফান কখনো কুরাইশ ও তার মিত্রদের সমর্থন দেবে না। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বনু গাতফান বিরত থাকবে। নবিজির এই পরামর্শের পেছনে কী কোনো হিকমত ছিল? আর পরামর্শের এই প্রস্তাবনা থেকে আমরা শরিয়তের কোন দলিলটা গ্রহণ করব?

---

৪৬ প্রাচ্যবিদ, নাস্তিক, মুরতাদ ও তাদের দোসররা।

প্রথম কথা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেয়েছিলেন, তাঁর সাহাবিদের যতটুকু মানসিক শক্তি, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং তাওফিকের ওপর তাদের যতটুকু আস্থা ছিল, এর অতিরিক্ত তাদের আশ্বস্ত করবেন। কারণ, মুশরিকদের বিভিন্ন দল-উপদল ব্যাপক হারে জোটবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বনু কুরাইজা একই সময়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে মুসলিমরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল—তিনি তাঁর সাহাবিদের এমন কোনো যুদ্ধ বা অপারেশনে পাঠাতেন না, যে যুদ্ধে জড়ানোর বা অপারেশন পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সাহস তারা পেতেন না, বা যার ফলাফল সম্পর্কে তারা আস্থাশীল ছিলেন না। আর এটাই ছিল তাঁর সাহাবিদের শিক্ষাদানবিষয়ক সবচেয়ে স্পষ্ট নীতি।

এ কারণেই মূলত তিনি সাহাবিদের নিকট এ প্রস্তাবনা পেশ করেন। আর তাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ না; বরং এটা তিনি নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুশরিকদের অপতৎপরতা নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য। যখন তারা মনে সাহস পাচ্ছেন না শত্রুর মোকাবিলা করার।

দ্বিতীয় কথা, নবিজির এই পরামর্শ থেকে আমরা যে শরয়ি দলিল গ্রহণ করব তা হলো—পরামর্শ বৈধ শুধু সেসব ক্ষেত্রে, যেসব ক্ষেত্রে কোনো নস (আয়াত) অবতীর্ণ হয়নি। এ ছাড়া এতে এমন কোনো দলিল নেই যে, যখন শত্রুরা মুসলিমদের দেশে আক্রমণ করবে, এর বিনিময়ে তারা তাদের ভূমির কিছু অংশ বা দেশের সম্পদের কিছু অংশ তাদের দিয়ে দেবে। কেননা, ইসলামি শরিয়তে এই মূলনীতি বিধিবদ্ধ যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধু কথা আর ওই সকল কর্ম দলিল বলে গণ্য হবে, যেগুলোর কুরআন আপত্তি করেনি। আর যা শুধু একান্তই মশওয়ারা বা সিদ্ধান্ত হবে, তা কোনোভাবেই দলিল বলে গণ্য হবে না। কারণ—

- **এক.** মশওয়ারা দ্বারা হয়তো কার মনের মধ্যে কী আছে তা জানা উদ্দেশ্য। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবিয়তের একটি অংশ এটাও ছিল যে, তিনি সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কাছে পরামর্শ চাইতেন। আর এখানে এটা করা হয়েছে হয়তো তাদের বীরত্বের জজবা জানার জন্য।
- **দুই.** যদিও তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতো। হতে পারে পরবর্তী সময়ে কুরআনে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসত। কিন্তু এমন হয়নি, তাই তা

শরিয়তের দলিল হিসেবে বাকি থাকে না। অধিকন্তু সিরাত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিলায়ে গাতফানের সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করেননি। আর কোনো সাক্ষ্যও হয়নি; বরং বিষয়টা শুধু আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আমরা এ কথা বলছি, কারণ, আজকাল একদল অখ্যাত লোক খুবই ভয়ংকর ও লজ্জাজনকভাবে বলতে শুরু করেছে—'প্রয়োজন হয়ে পড়লে অমুসলিমদের কাছে মুসলিমদের কর দিতে হবে।' তাদের দলিল—নবিজি এটা করার জন্য খন্দক যুদ্ধে তাঁর সাহাবিদের সাথে এই বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। (কিন্তু বাস্তবতা হলো—এর পেছনে ভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল, আর এর ওপর আমল ও করা হয়নি।)

এ ছাড়া আমরা পেছনে স্পষ্ট করে এসেছি যে, মশওয়ারাতে পেশকৃত রায় কখনো দলিল বলে গণ্য হবে না। আর কর প্রদানের কথা বলা এবং দুটি দলের মধ্যে কোনো চুক্তিবিষয়ক পরামর্শ করার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

একটি প্রশ্ন : আপনি যদি বলেন—ধরে নেন, মুসলিমরা যেকোনো কারণে তাদের কিছু সম্পদ তারা অমুসলিমদের দিতে বাধ্য হলো—তাদের জীবন রক্ষার্থে অথবা তাদের নিজ ভূমি থেকে সমূলে উৎপাটন থেকে রক্ষা পেতে তারা এটা করতে বাধ্য হলো; তো এমন অবস্থায় তাদের হুকুম কী হবে, তারা তা করতে পারবে না?

প্রশ্নের উত্তর : এমন অনেক পরিস্থিতি তৈরি হয়—যেখানে মুসলিমদের ওপর হামলা চালানো হয়। তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। তা শত্রুদের গনিমতে পরিণত হয়। তখন কাফিররা মুসলিমদের দেশ ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

আর এ কথা স্পষ্ট সবারই জানা যে, মুসলিমগণ এ জাতীয় সমস্যা বা যত বড়ো ঝামেলাই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই অমুসলিমদের কর দিতে রাজি হবে না। না ইচ্ছাকৃতভাবে আর না ফাতওয়ার অনুসরণে; বরং এটা করলে এগুলো তাদের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর হবে। তবে আল্লাহ না করুক, যদি কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়, তাহলে এমন সব পরিস্থিতিতেও মুসলিমরা একটি সুযোগের সন্ধানে অপেক্ষা করবে, যেন এই পরিস্থিতি থেকে

নিজেদের মুক্ত করা যায়। তারা গোলামির জিন্দেগির চেয়ে শাহাদতকে প্রাধান্য দেবে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো—ইসলামের সকল বিধিবিধান পালনের জন্য সম্বোধন করা হয়েছে বুঝমান, সাবালক ও স্বাধীন ব্যক্তিকে। কোথাও অক্ষম, অপারগ, পাগল গোলামদের করতে সম্বোধন করা হয়নি। তাই যে অবস্থায় মানুষ মুকাল্লাফ (বিধান পালনে বাধ্য) নয়, সেই অবস্থার ওপর ভিত্তি করে একটি স্বাভাবিক অবস্থার—যেখানে চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়—হুকুম নির্ণয় করা একটি অহেতুক কাজমাত্র।

০৫. মুসলিমদের জয়ের কৌশল : একটি প্রশ্ন ও উত্তর

মুসলিমরা কোন কৌশলে, কীভাবে এই যুদ্ধে জয় লাভ করেছে? আর মুশরিকরা—এত বিরাটসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও—পরাজয় বরণ করেছে? কী ছিল এর কারণ?

আমরা দেখেছি—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম বদর যুদ্ধে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, খন্দক যুদ্ধের সেই একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। সেটা হলো—আল্লাহর নিকট বেশি বেশি কান্নাকাটি আর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সাহায্য প্রার্থনা; বরং এটাই ছিল সার্বক্ষণিক আমল। যখনই কোনো যুদ্ধে কোনো শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন বা কোনো যুদ্ধে গিয়েছেন, তখনই তিনি এ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যসব উপায়-উপকরণের চেয়ে এই উপায় মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে; যখন এর ভিত্তির ওপর তারা পূর্ণভাবে কায়েম থাকবে।

মুশরিকরা এত বিপুলসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে পরাজিত হলো, মুমিনদের ধৈর্য দৃঢ়চিত্ত ও সত্যাসত্যভাবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় নেওয়ার কথা উল্লেখ করার পরে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পুরো প্রক্রিয়াটি তুলে ধরেন—

> হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝড় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তার দেখেন। যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল, তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ

করেছিলে। তখন বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করা হয়েছিলে এবং তারা ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

যখন মুনাফিকরা—এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা—বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বই কিছুই নয়। ওদের একদল বলেছিল—হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোনো স্থান নেই; তোমরা ফিরে চলো। আর ওদের মধ্যে একদল (এসে) নবির নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল—আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত। যদিও ওগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।

যদি শত্রুরা চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করত এবং ওদের নিকট ফিতনা চাওয়া হতো, তাহলে ওরা অবশ্যই তা করে বসত; ওরা এতে বিলম্ব করত না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

বলুন—তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো, তাহলে তাতে তোমাদের কোনোই লাভ হবে না এবং তোমরা পলায়নে সক্ষম হলেও তোমাদের সামান্যই উপভোগ করতে দেওয়া হবে।

বলেন—আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদের রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদের বঞ্চিত করবে?

ওরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই জানেন—তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদের বলে—আমাদের সঙ্গে আসো।

আর ওরা অল্পই যুদ্ধ করে থাকে। তোমাদের সহযোগিতায় ওরা কুণ্ঠিত। যখন বিপদ আসে, তখন তুমি দেখবে—মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ ব্যক্তির মতো চোখ উলটিয়ে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন ওরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় তোমাদের সাথে বাক্‌চাতুরী

করে। ওরা বিশ্বাসী নয়; এজন্য আল্লাহ ওদের আমল নিষ্ফল করেছেন। আর আল্লাহর জন্য এটা সহজ।

ওরা মনে করে (শত্রুর সম্মিলিত) বাহিনী চলে যায়নি। (শত্রু)-বাহিনী আবার এসে পড়লে ওরা কামনা করবে যে—ভালো হতো; যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীর সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। আর ওরা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও ওরা যুদ্ধ অল্পই করত।

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

মুমিনরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন ওরা বলে উঠল—আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তো আমাদের এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। বিশ্বাসীদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে; ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি। কারণ, আল্লাহ সত্যবাদীদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন অথবা ওদের তাওবা গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রচণ্ড ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আল্লাহ কাফিরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন এবং যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। আর আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"

এই ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার ঘটেছে। এর দ্বারা মুসলিমদের প্রস্তুতিবিহীন যুদ্ধ-জিহাদের জন্য প্ররোচিত করা মোটেও উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো—একজন মুসলিম হিসেবে এ কথা বিশ্বাস রাখা যে, জয়ের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গায়েবি মদত। এবং তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা। যদি এ মাধ্যম ঠিক না থাকে, তাহলে শক্তির অন্যান্য মাধ্যম কোনো কাজে আসবে না। আর যখন মুসলিমদের মধ্যে এই মাধ্যম বাস্তবায়িত হবে। তখন

---

৪৭ সুরা আহজাব, আয়াত : ৯-২৫

সাহায্যের বিভিন্ন মুজিজার কথা বলা যায়। অন্যথায় কোথা থেকে এলো এই ঝঞ্ঝাবায়ু? শুধু মুশরিকদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল অথচ অন্য পার্শ্বেই মুসলিমগণ—তারা টেরই পেল না! একই হাওয়া ওদের হাঁড়িপাতিল উলটে দিচ্ছে, তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলছে। তাদের মনে কম্পন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর এদিকে সেটা হিমেল হাওয়া হয়ে সবার হৃদয়কে আন্দোলিত করছে।

০৬. কাজা হওয়া সালাত বিষয়ে আরও কিছু কথা

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপক ব্যস্ততার কারণে আসর সালাত ছুটে যায়। সূর্যাস্তের পর কাজা আদায় করে নিয়েছেন। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* ছাড়া অন্য কিতাবের বর্ণনায় এসেছে—সালাত ছুটে গিয়েছে বা কাজা হয়েছে একাধিক ওয়াক্ত। যেগুলো তিনি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরে পর্যায়ক্রমে আদায় করেছেন। এতে করে সুস্পষ্টভাবে কাজা সালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন—সে সময়ে এ জাতীয় ব্যস্ততার কারণে সালাত কাজা করা বৈধ ছিল; কিন্তু যখন মুশরিক ও মুসলিমদের যুদ্ধের সময় হাঁটতে-চলতে সালাতুল খাওফের (ভয়ের সময়কার সালাত) বিধান অবতীর্ণ হলো। তখন তা রহিত হয়ে যায়।

যদি তাদের কথা মেনেও নেওয়া হয়, তবুও এই নসখ কাজার বৈধতার ব্যাপারে বলা যায় না; বরং তা ব্যস্ততার কারণে সালাত বিলম্ব করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বিলম্ব করা বৈধতার নসখ মূলত নসখ নয়। কেননা, কাজার বৈধতাও যেহেতু প্রমাণিত। আর এ ব্যাপারে নীরব। তাই তা পূর্বের বৈধতার ওপর বহাল থাকবে। এ ছাড়া অকাট্য দলিলের দাবি হলো—ভয়ের সালাত এই যুদ্ধের আগেই বিধিত হয়েছে। পূর্বে গাজওয়ায়ে জাতির রিকায় এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই বৈধতার ব্যাপারে সহিহাইনেও হাদিস বর্ণিত হয়েছে—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহজাব থেকে মদিনায় ফেরার পথে বলেছেন—তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইজা না গিয়ে আসর বা জোহরের সালাত না আদায় করে। পথমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। কেউ বলল—আমরা জায়গামতো না পৌঁছে সালাত আদায় করব না কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বনু কুরাইজায় গিয়েই সালাত আদায় করতে

বলেছেন। আবার কেউ বলল—আমরা বরং সালাত আদায় করে নেব। আমাদের এ কথা বলা হয়নি। প্রথম দল বনু কুরাইজায় পৌঁছে কাজা নামার আদায় করে নেন।

আর যখন ছুটে যাওয়ার পর ফরজ সালাত কাজা করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবে প্রমাণিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই ছুটে যাওয়ার কারণ হবে ঘুম, অবহেলা আর ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া। যেহেতু ব্যাপকভাবে কাজা সালাত আদায়ের ওপর সামগ্রিক দলিল প্রমাণিত হওয়ার পর এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় না, যা কিছু কারণে কাজাকে আবশ্যক করে আর কিছু কারণে করে না। আর যারা বনু কুরাইজার রাস্তায় সালাত ছেড়ে দিয়েছেন, তারা না ঘুমন্ত ছিলেন না ভুলে গিয়েছিলেন। তাই এটা ভুল হবে যে, ফরজ সালাত কাজার বৈধতার বিধানকে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত অন্যগুলোর সাথে বিশেষিত করা।

কেউ কেউ ধারণা করেন—একটি দলিল প্রমাণিত হয়েছে, যা কাজার বৈধতার দলিলসমূহের ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ বা খাস করে দেয়। তা হলো—যে ব্যক্তি সালাতের সময় ঘুমিয়ে থাকে বা ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলে সালাত আদায় করে নেয়। এই হাদিসে দুই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে কাজার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। তাই ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দিলে কাজার প্রয়োজন নেই। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ এই হাদিসের মর্মের বিপরীত। এটি একটি ভ্রম মাত্র—যা একজন দৃষ্টিসম্পন্ন তালিবে ইলমের শিকার না হওয়া উচিত। হাদিস দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তি বা ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে সালাত কাজার আদেশ দেওয়া; অন্যদের নয়—তা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো إذا ذكرها (যখন স্মরণ হয়) শর্তকে উল্লেখ করে উক্ত বিধান দেওয়া। আর এটা সতর্ক করার জন্য যে, যার সালাত কাজা হয়ে যাবে আর সে তা আদায় করতে চায়, তাহলে যেন তাকে দ্বিতীয় দিনের সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়; বরং সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে যেকোনো সময় আদায় করে নিতে পারে।

এ কথা জানার পর এ হাদিস দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য এমন—যা হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় এবং হাদিসের ব্যাখ্যাতা এমনই মন্তব্য করেছেন।[৪৮] তাহলে নিশ্চয়ই এটা জেনে থাকবেন যে, হাদিসে বর্ণিত ঘুমন্ত অথবা ভুলে যাওয়ার বিপরীত অর্থের সাথে দলিলের কোনো সম্পর্ক নেই।

---

৪৮ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২; *নাইলুল আউতার*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭

গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা

জিবরাইল আ.-এর আগমন

সহিহাইনে বর্ণিত হয়েছে—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খন্দক যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফিরলেন, অস্ত্রশস্ত্র রেখে গোসল করলেন, তখনই জিবরাইল আ. আগমন করলেন; তারপর বললেন—আপনি অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেছেন? আল্লাহর কসম, আমরা কিন্তু এখনও খুলিনি! আপনি দ্রুত বের হয়ে তাদের কাছে যান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—কোন দিকে?

জিবরাইল আ. বনু কুরাইজার দিকে ইশারা করে বললেন—এদিকে।

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে বের হলেন।[৪৯]

অবরোধের ঘোষণা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন—কেউ যেন (অবরোধের জন্য) বনু কুরাইজায় না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় না করে। সাহাবিদের সকলে বেরিয়ে পড়লেন। পথমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল কেউ কেউ বললেন—আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে না পৌঁছে আমাদের সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।) আর কেউ কেউ বললেন—আমরা বরং সালাত

---

৪৯ সূত্র : *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম*

আদায় করে নেব। (আমাদের তো সালাত আদায়ে নিষেধ করা হয়নি।) অতঃপর তারা বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থাপন করেন; কিন্তু তিনি কোনো দলের সিদ্ধান্তই প্রত্যাখ্যান করেননি।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কুরাইজাকে তাদের দুর্গের মধ্যে ২৫ দিন মতান্তরে ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন।" একপর্যায়ে অবরোধ তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন।

কাব ইবনে আসাদের প্রস্তাব

ইবনে হিশাম রহ. বর্ণনা করেন—

কাব ইবনে আসাদ যখন দেখল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে ফিরে যাচ্ছেন না, তখন সে ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলল—হে ইহুদি সম্প্রদায়, তোমাদের অবস্থা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি; যেটি ইচ্ছা তোমরা গ্রহণ করতে পারো।

সে বলল—

আমরা এই ব্যক্তিকে অনুসরণ করব এবং তাঁকে সত্যায়িত করব। তিনি সেই ব্যক্তি, যার কথা তোমাদের কিতাবে তোমরা লিখিত পাও। তাহলে তোমরা তোমাদের জানমাল, সন্তানাদি ও স্ত্রীদের নিরাপত্তা লাভ করবে।

তারা বলল—আমরা কখনো তাওরাতের বিধান ছাড়ব না।

সে বলল—তাহলে এসো, আমরা আমাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীদের হত্যা করে এরপর মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিদের সামনে নাঙা তরবারি নিয়ে বের হই। আমরা আমাদের পেছনে কোনো বোঝা রেখে যাব না, যতক্ষণ আমাদের আর মুহাম্মাদের মাঝে কোনো ফয়সালা না হবে। আমরা যুদ্ধ চালিয়েই যাব। আমরা যদি ধ্বংস হয়ে যাই হলাম; কিন্তু আমাদের পেছনে কোনো বংশধর নিয়ে শঙ্কিত থাকলাম না।

তারা বলল—অসহায়দের কী অপরাধ! (কেন তাদের হত্যা করব?)

---

৫০ সূত্র : *সহিহ বুখারি*

৫১ ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন—২৫ দিন; আর ইবনে সাদ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন ১৫ দিন।

সে বলল—যদি তোমরা এটাও না মানো, তাহলে আজ রাত তো হলো শনিবারে রাত। আশা করি, মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিরা আমাদের নিরাপত্তা দেবে; তাই চলো—আমরা দুর্গ থেকে নেমে যাই। হয়তো তাঁর কাছ থেকে কোনো সুযোগ লাভ করব।

তারা সেটাও অস্বীকার করল।

সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর বিচার

অবশেষে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে নেমে বের হয়ে এলো। বনু কুরাইজা যেহেতু মুসলিম গোত্র আউসের মিত্র ছিল, তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেন—বিষয়টি আউস গোত্রের একজন সরদারের কাছে অর্পণ করবেন। তো সে অনুযায়ী এ বিষয়টি তদারকি করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হলো সাদ ইবনে মুআজ রা.-কে। তিনি খন্দক যুদ্ধে তিরবিদ্ধ হয়েছিলেন। (রাফিদা নামক এক নারীর) তাঁবুতে তার চিকিৎসা চলছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করে সংবাদ দিয়ে পাঠালেন। তিনি গাধার পিঠে চড়ে আগমন করলেন। যখন তিনি মসজিদের[৫২] নিকটে এলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের বললেন—তোমাদের নেতার সম্মানার্থে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর বললেন—এরা তোমার আদেশে নেমে বের হয়ে এসেছে।

তিনি বললেন—তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে আর সন্তানদের দাস বানানো হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেছ।"[৫৩]

সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর মাকবুল দুআ

তখন সাদ রা. বললেন, হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয় জানেন যে, যারা আপনার রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁকে আপন মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কোনো জিনিস নেই। হে আল্লাহ, আমার ধারণা—আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন। যদি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের আরও কিছু বাকি থেকে থাকে, তাহলে

---

৫২ এখানে মসজিদ দ্বারা মসজিদে নববি উদ্দেশ্য নয়; বরং বনু কুরাইজায় সালাত আদায়ের জন্য যে স্থানকে মসজিদ (সালাতের স্থান) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, সেটি উদ্দেশ্য।

৫৩ সূত্র : *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

আপনার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করা পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তাহলে এই জখমেই যেন আমার মৃত্যু ঘটে।

এরপরই তার সিনা হতে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। মসজিদের ভেতরে, কাছেই ছিল বনু গিফারের একটি তাঁবু, সেখান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তারা বলতে লাগল—ওহে তাঁবুবাসী, তোমাদের তাঁবু থেকে বের হয়ে আসা এটা কীসের রক্ত? এরপর তারা জানতে পারে যে, সাদ রা.-এর ক্ষত থেকে রক্ত বের হচ্ছে। এই রক্তক্ষরণেই সাদ রা. মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।"

মুসনাদু আহমাদ-এর রেওয়ায়েতে এসেছে—তার জখমের বেশির ভাগই ভালো হয়ে গিয়েছিল; শুধু কানের লতি বরাবর জায়গা বাকি ছিল; কিন্তু দুআর পর দ্বিতীয়বার জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

ইহুদিদের শাস্তি কার্যকর

এরপর ইহুদিদের তাদের দুর্গ থেকে বের করে খন্দকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হয় আর নারীদের দাসী বানানো হয়। যাদের হত্যা করা হয়, তাদের অন্যতম ছিল হুয়াই ইবনে আখতাব। সে বনু কুরাইজাকে গাদ্দারি ও চুক্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করেছিল।

ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন—তাকে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হয়, তখন তার হাত ঘাড়ের সাথে একটি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকিয়ে বলল, আল্লাহর কসম! আপনার দুশমনি করতে আমি নিজেকে কখনো ভর্ৎসনা দিইনি; কিন্তু আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে তো লাঞ্ছিত হতেই হবে। এটা বলে সে বসে পড়ে আর তার গরদান উড়িয়ে দেওয়া হয়।

* * *

৫৪ সূত্র : *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

ইসলামি ইতিহাসে এবং মুসলিমদের জীবনে বনু কুরাইজার এই যুদ্ধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থগুলোতে উলামায়ে কিরাম বনু কুরাইজার এই ঘটনা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান বের করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো—

০১. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের হত্যার বিধান

ইমাম মুসলিম রহ. এই বিধানকে 'বনু কুরাইজা যুদ্ধে' শিরোনাম করেছেন। মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে সকল শান্তি ও নিরাপত্তাচুক্তিকে ততক্ষণ সম্মান জানানো উচিত, যতক্ষণ না অন্যরা নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ করে। তখন যদি মুসলিমগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করার মধ্যে কল্যাণ দেখে, তাহলে এর অনুমতি আছে।

০২. সালিশি নিয়োগের বৈধতা

মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সালিশ বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করার বৈধতাও এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। ইমাম নববি রহ. বলেন—

এর দ্বারা মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ও এসব বিষয়ে কোনো ন্যায়পরায়ণ, যোগ্য, মুসলিম শাসকের শরণাপন্ন হওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। উলামায়ে কিরাম খারিজিদের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কারণ, তারা আলি রা.-এর মধ্যস্থতাকে অস্বীকার করেছিলি এবং তার বিপরীতে দলিল কায়েম করেছিল।

এতে আরও প্রমাণিত হয়—যোগ্য, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ, মুসলিম শাসকের হুকুম অনুযায়ী কোনো এলাকাবাসীর সাথে চুক্তি করার বৈধ। আর অবশ্যই শাসককে যাতে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা হয়, সেভাবে ফয়সালা করতে হবে। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবেন, তা মেনে নেওয়াও আবশ্যক হবে। ইমাম বা তাদের কারও

জন্যই তা প্রত্যাহার করা ঠিক হবে না। তবে তারা চাইলে ফয়সালার আগে আপত্তি জানাতে পারে।"

৩. শাখাগত বিষয়ে ইজতিহাদ ও ইখতিলাফের বৈধতা এবং এর প্রয়োজনীয়তা

সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা 'لا يصلين ألا أحد العصر إلا في بني قريظة' (তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইজায় না পৌঁছে সালাত আদায় না করে) বোঝার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা তৈরি হয়েছিল। এই বিষয়ে সাহাবিদের উভয়পক্ষের অভিযোগ পাওয়ার পরও নবিজির পক্ষ থেকে কারও মতামতকেই প্রত্যাখ্যান না করার মধ্যে শরিয়তের মৌলিক একটি মূলনীতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সে মূলনীতিটি হলো—শাখাগত মাসয়ালার মধ্যে মতভিন্নতার উৎসকে স্বীকৃতি দেওয়া বা বহাল রাখা। আর উভয়পক্ষকে অপারগ ও সাওয়াবের হকদার মনে করা; চাই সঠিক সিদ্ধান্ত একজনের হোক বা একাধিক ব্যক্তির হোক। একইভাবে আরও প্রমাণিত হয় যে, শরয়ি বিধান বের করার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ বৈধ।

এতে আরেকটি বিষয় বোঝা যায়, তা হলো—জন্নি দলিলভিত্তিক শাখাগত মাসয়ালার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য নির্মূল করা একটি অকল্পনীয় ও অসম্ভব ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের দুই ধরনের হুকুমের মুকাল্লাফ (মানতে বাধ্য) করেছেন—

- **এক.** আকিদা, ইবাদত ও সুলুকসংক্রান্ত কিছু সুস্পষ্ট বিধানের ওপর আমল করবে।
- **দুই.** মূলনীতি ও শাখাগত বিধানগুলোকে তার বিভিন্ন সামগ্রিক দলিলসমূহ থেকে বোঝার চেষ্টা করা।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি মরুভূমিতে সফর করছে; আর ইতোমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। এখন তার ওপর সময়মতো সালাত আদায় করা জরুরি। যদি এমন হয়, যখন সালাতের সময় হলো, সে তা আদায়ের ইচ্ছাও করল; কিন্তু কিবলা কোন দিকে তা জানা নেই। তাহলে এই সময় সে নিজের জ্ঞান ও চিন্তা অনুযায়ী ইজতিহাদ করবে। তার জ্ঞানের সবগুলো মাধ্যম ব্যবহার করে জানার চেষ্টা করবে—কেবলা কোন দিকে? পর্যাপ্ত চিন্তা করার পর তার অন্তর যেদিকের প্রতি সাক্ষী দেবে যে, এটাই কেবলা, তখন তার উচিত হবে এদিকে ফিরেই সালাত আদায় করা।

---

৫৫ শরহুন নববি আলাল মুসলিম, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৯২

এখানে দলিল ও নসগুলো সন্দেহজনক বা জন্নি থাকার মধ্যে বিরাট হিকমত নিহিত আছে। এর অন্যতম হলো—কোনো মাসয়ালায় নানামুখী বা বিভিন্ন রকম ইজতিহাদ হবে। সবগুলোরই শরিয়তে নির্ভরযোগ্য দলিলের সাথে মজবুত সম্পর্ক থাকবে। ফলে মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যেকোনোটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে। আর এটি বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সব যুগেই একটি বিরাট রহমত।

আপনি যখন এটা চিন্তা করছেন, নিশ্চয় জেনে থাকবেন—শাখাগত মাসয়ালার মতভিন্নতাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা মানে হিকমতে রব্বানি ও তদবিরে ইলাহির বিরোধিতা করা। এ ছাড়াও এটি একধরনের অনর্থক কাজ। কারণ, কীভাবে একটি মাসয়ালার দলিল জন্নি হওয়া সত্ত্বেও তার মতভিন্নতাকে তুলে দেওয়া যাবে? যদি সেটা আমাদের যুগে সম্ভব হতো, তাহলে এর জন্য সর্বোত্তম যুগ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালামের যুগ। আর ইখতিলাফ না করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম। অথচ তারাই ইখতেলাফ করেছেন।

০৪. ইহুদিরা ইসলামকে স্বীকার করল না কেন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের ওপর ইহুদিদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। আপনি নিশ্চয় ইহুদিদের সাথে কাব ইবনে আসাদের কথায় তা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। এবং তাওরাতে তার সম্পর্কে যেসব আলামত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো তাদের ভালো করেই জানা ছিল; কিন্তু তারা তাদের অহংকার ও গোঁড়ামির বশবর্তী ছিল। আর এটাই তাদের ঈমান আনার ও না বোঝার মূল কারণ।

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম

সুতরাং এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, ইসলামের সকল বিশ্বাস এবং বিধান মানবীয় চাহিদার (ফিতরাতের) অনুগামী এবং এর বিশ্বাসসমূহ পুরোপুরি যুক্তিগ্রাহ্য। ইসলামের সকল বিধানই মানুষের কল্যাণ ও বাস্তবিক চাহিদার পরিপূরক। ফলে আপনি এমন কোনো জ্ঞানীকে পাবেন না—ইসলামের নাম শুনেছেন এবং তার বাস্তবতা ঘেঁটে দেখেছেন; কিন্তু তারপরও তিনি কুযুক্তি, খাপছাড়া কোনো ব্যাপার বা অন্য কোনো কারণে কাফিরই থেকে গেছেন। এমন কারও কথা জানলে বুঝতে হবে, তিনি হয়তো দুটি জিনিসের মধ্যে একটির শিকার হয়েছেন—

- **এক.** হয়তো ইসলাম সম্পর্কে ঠিকভাবে শোনেননি। শুনেছেন শুধু প্রত্যাখ্যাত বাতিল কথাবার্তা। ঠিকভাবে জানেননি বা জানলেও তার বাস্তবতা অশুদ্ধতাভরা।

- **দুই.** অথবা ইসলামের বাস্তব রূপ সম্পর্কে জেনেছেন; কিন্তু মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো প্রিয় বস্তু হারানোর ভয়ে অস্বীকার করছেন।

০৫. আগন্তুক ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিধান

সাদ ইবনে মুআজ রা. যখন গাধার পিঠে চড়ে আনসারদের নিকট এলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবিদের আদেশ করলেন তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য। এই ব্যাখ্যার দলিল হলো এই উক্তি—

لسيدكم أو لخيركم

অর্থাৎ, তোমাদের নেতার সম্মানার্থে।

আর অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই হাদিস ও অন্যান্য দলিলের আলোকে প্রচলন বা সামাজিক রীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সালিহিন ও উলামায়ে কিরামকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর বৈধতা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম নববি রহ. এই হাদিসের একটি টীকা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—

> এতে জ্ঞানী-গুণীদের সম্মান ও তারা আগমন করলে তাদের দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর বৈধতা প্রমাণিত হয়। একইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো (কিয়ামে তাজিমি)-কে মুসতাহাব হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন।
>
> ইমাম কাজি আয়াজ রহ. বলেন—এটা নিষিদ্ধ কিয়ামের অন্তর্ভুক্ত না। নিষিদ্ধ হলো সেটা—একজন বসে থাকবে, আর বাকি সবাই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে যতক্ষণ বসে থাকবে, বাকিরা তার সামনে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। বসার সুযোগ পাবে না।

আমি (ইমাম নববি) বলি—কোনো জ্ঞানী-গুণী আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানো মুসতাহাব, এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে কোনো হাদিসেই (দাঁড়ানোকে) নিষেধ করা হয়নি।

কিয়ামে তাজিমি মুসতাহাব হওয়ার আরেকটি হাদিস *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কাব ইবনে মালিক রা. তাবুক যুদ্ধ থেকে তার পেছনে থাকার কাহিনি বর্ণনা করেন; তিনি বলেন—

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম; লোকেরা দলে দলে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। তারা বলতে লাগল—'لتهنئك توبة الله عليك' (অভিনন্দন, তোমার তাওবা কবুল করা হয়েছে)। আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেপাশে বসা লোকদের মধ্যে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আমার সাথে মুসাফাহা করতে, অভ্যর্থনা জানাতে দ্রুত দাঁড়িয়ে যান। তিনি ছাড়া মুহাজিরদের মধ্যে আর কেউ দাঁড়াননি। তালহা রা.-এর এই ব্যবহার কাব রা. ভুলতে পারেননি।

এ ছাড়াও ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম বুখারি রহ. তার কিতাব *আদাবুল মুফরাদ*-এ আয়িশা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

আমি ফাতিমা রা.-এর চেয়ে কথাবার্তায় ও বসায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।

এরপর তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে দেখতেন, দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন। অতঃপর কপালে চুমু দিতেন। এরপর হাতে ধরে নিজের জায়গায় বসাতেন। আবার ফাতিমা রা.-ও এমন করতেন।

আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, ' من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار অর্থাৎ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোকেরা তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে কুর্নিশ করুক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।' এই হাদিস এবং ও কিয়ামে-তাজিমিসংক্রান্ত ওপরে বর্ণিত হাদিসগুলো এই হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। দুটির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, যেসব লোক জ্ঞানী-গুণীদের ইজ্জত-সম্মান করার সময় নিজের থেকেই দাঁড়ায়, আর সেটা জায়িজ

ততক্ষণ, যতক্ষণ না গুণীরা তাদের দাঁড়ানোর হুকুম না দেবেন, বা মনে মনে তা কামনা না করবেন। হ্যাঁ, যদি বিপরীত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। তা আলোচনারই দরকার পড়ে না।

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন—ইসলামি শিষ্টাচার এতজন অভাবী ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় চাওয়ার ভান বা ক্ষুধা ও প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছে প্রকাশ না করতে। আবার একই ইসলামি শিষ্টাচার ধনীকে শিক্ষা দেয়—এসব সংযমশীল অভাবীদের খুঁজে বের করে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে। তাই প্রত্যেকেরই ভদ্রতা-শিষ্টাচার ও দায়িত্ব রয়েছে। আমাদের উচিত একটাকে আরেকটার সাথে মিশ্রিত না করা আর একটা দিয়ে আরেকটা রহিত না করে দেওয়া। কারণ, তা হলো ত্বরাপ্রবণতা ও মূর্খতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

বৈধ বলে সীমাও থাকবে না

তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা জানতে হবে, তা হলো—এ বৈধ সম্মানের একটি সীমারেখা আছে। সেটা অতিক্রম করলেই তা হারামে পরিণত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি তা করবেন, আর যে ব্যক্তি তার দেখেও চুপ থাকবেন—উভয়ই সমান গুনাহগার হবেন। যেমন : কোনো কোনো সুফিদের মজলিসে তাদের বসা অবস্থায় মুরিদদের তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ তাদের শাইখের সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে; শাইখ অনুমতি দেওয়ার আগপর্যন্ত বসে না। বা শাইখের আগমনের সময় হাতে চুম্বন করে কুর্নিশ করে আরও যা কিছু করে থাকে। এ কথা শুনে প্রতারিত হওয়া যাবে না যে, এগুলো করা হয় মুরিদদের তরবিয়তের জন্য। কেননা, ইসলাম তরবিয়তের কিছু পন্থা-পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে। সাথে সাথে মুসলিমদের এর সীমালঙ্ঘন করতেও নিষেধ করেছে। তরবিয়তে নববি পদ্ধতির পরে আর কোনো পদ্ধতি স্থির হতে পারে না।

০৬. সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এই যুদ্ধের মধ্যে সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। তা হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রথম কাউকে বনু কুরাইজার বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি বিচার করেছেন এবং তিনি তার সমর্থন দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের নির্দেশ দিয়েছেন—তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর জন্য। যখন তিনি আগমন করলেন, নবিজির এই নির্দেশই একটি বিশাল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ তখনই প্রমাণিত হয়ে গেছে। তিনি খন্দক যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর এ দুআ করেন—

> হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যারা আপনার রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে আমার কাছে প্রিয় কোনো জিনিস নেই। যদি আর কোনো যুদ্ধ থেকে থাকে, তাহলে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য।

সাদ রা.-এর দুআ কবুল করা হয়। তার ক্ষত সেরে যায়। বনু কুরাইজার যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করেন। তিনি যে বিচার করেছিলেন, তা নবিজির পছন্দ হয়। ইহুদিদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। মদিনা তাদের নাপাকি থেকে পবিত্র হয়ে যায়। ফলে দ্বিতীয়বার সাদ রা. হাত তুলে দুআ করেন—

হে আল্লাহ, আমার ধারণা—আপনি আমাদের ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন। যদি সত্যিই অবসান হয়ে থাকে, তাহলে এই ক্ষতের কারণেই আমার মৃত্যু দান করেন।

তার এ দুআও কবুল করা হয়। তিনি সে রাতেই মৃত্যুবরণ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহ. *ফাতহুল বারি*তে লেখেন—

আমার যা মনে হয়, সাদ রা.-এর ধারণা ঠিক ছিল। আর তার দুআ কবুল করা হয়েছিল। কারণ, খন্দক যুদ্ধের পর মুসলিমদের মধ্যে এমন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, যা শুরু হয়েছে মুশরিকদের পক্ষ থেকে।

কেননা, এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহর জন্য বের হয়েছেন। তারা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ থেকে বাধা দিয়েছে; কিন্তু তাদের মাঝে যুদ্ধ হবে হবে অবস্থায় পৌঁছেও হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

> হে বিশ্বাসীগণ, রাসুল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দাও; এবং জেনে রাখো—আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন; আর তাঁরই নিকট তোমাদের একত্র করা হবে।"[৫৬]

এর পরেই শান্তিচুক্তি সংঘটিত হয়—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামী বছর উমরাহ করবেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আগপর্যন্ত তা বহাল ছিল। এরপর তিনি মুশরিকদের অভিমুখে যোদ্ধাবেশে গিয়েছেন আর মক্কা বিজয় করেছেন।'"[৫৭]

বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহাজাব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে বলেন—

> এখন থেকে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব তারা আমাদের সাথে আর যুদ্ধ করবে না। আমরা তাদের কাছে যাব।

মুসনাদু বাজ্জার-এ হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, জাবির রা. বর্ণনা করেন—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহজাবের দিন বলেন, সামনে ছিলেন অনেক মানুষ, আজকের পর থেকে তারা আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না; বরং তোমরাই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

শেষ আলোচনার সারকথা

সর্বশেষ কথা—সাদ ইবনে মুআজ রা.-এর পুরো ঘটনাটি তার আনুষঙ্গিক ঘটনাটিসহ উল্লেখ করার কারণ হলো—এই সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয়, যা আমরা পূর্বেও বলে এসেছি—ইসলামে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ হলো দাওয়াতের একটি স্তরমাত্র; যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন।

এরপর থেকে শুরু হয়েছে সকল মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার স্তর। সেখানে নাস্তিক-মুশরিকদের থেকে শুরু করে প্রত্যেক লোককেই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে। আর তাদের থেকে শুধু ইসলামই গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া প্রকৃত আহলে কিতাব লোকেরা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা ইসলামের অধীনে তারা শাসিত হবে। এই দুটিই পথ। যারা এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, ইসলামি

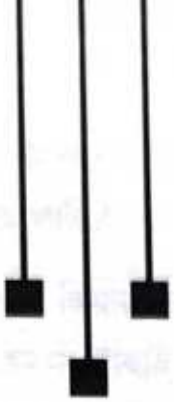
---

৫৬ সুরা আনফাল, আয়াত : ২৪

৫৭ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৯২

হুকুমত প্রতিষ্ঠার আগপর্যন্ত যতক্ষণ সম্ভব এবং দাওয়াতের প্রচলিত প্রসিদ্ধ মাধ্যমগুলোর পরে, তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে। ইসলামি হুকুমত পূর্ণতা লাভ করার পর আত্মরক্ষামূলক জিহাদ বলতে কিছু নেই—যা কোনো কোনো গবেষক বলে থাকেন। অন্যথায় ولكنكم أنتم تغزونهم-এর কী অর্থ হতে পারে?

* * *



ষষ্ঠ অধ্যায়

ফিকহুস সিরাহর সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায় এটি। এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে নবিজির যুদ্ধজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপসহ তার অন্তিম জীবনের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ের মাধ্যমেই লেখক বইটির সমাপ্তি টেনেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা যা যা পাচ্ছি, সংক্ষেপে সেগুলো হলো—

- হুদাইবিয়ার সন্ধি, উমরাহর সফরে বাধা প্রদানসংক্রান্ত আলোচনা, বাইয়াতে রিদওয়ান, ও হুদাইবিয়া সন্ধি-সংশ্লিষ্ট আহকাম।
- গাজওয়ায়ে খাইবার, খাইবার-সংশ্লিষ্ট আহকাম, গনিমতের সম্পদ বণ্টনে শরয়ি পদ্ধতি, 'মুসাকাত' চুক্তির বৈধতা, ভাগে জমি চাষের হুকুম, বিভিন্ন গোত্রে বাহিনী এবং বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ, পত্র-রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট আহকাম, কাজা উমরাহ আদায় ও কাজা উমরাহ-সংশ্লিষ্ট আহকামের আলোচনা।
- গাজওয়ায়ে মুতা, হাজওয়ায়ে মুতা থেকে আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ, মুতা-সংশ্লিষ্ট আহকামের আলোচনা। মক্কা বিজয়, বিজয়ের প্রেক্ষাপট, কুরাইশদের ভুল স্বীকার ও দৌড়ঝাঁপ, মক্কা বিজয়-সংশ্লিষ্ট আহকামের আলোচনা।
- গাজওয়ায়ে হুনাইন নবিজির যুদ্ধ প্রস্তুতি, হাওয়াজিনবাসীর অতর্কিত আক্রমণ, গাজওয়ায়ে তাবুক আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ, ৯ম হিজরিতে আবু বকর রা.-এর হজ পালন, মসজিদে জিরার, বনু সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমন, আদি ইবনে হাতিমের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদানে প্রতিনিধি প্রেরণ-সংশ্লিষ্ট আলোচনা।
- সবশেষ নবিজির অসুস্থতা, নবিজির অনন্তের পথে যাত্রা এবং খিলাফতে রাশেদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

সন্ধির প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে। এই সন্ধির প্রেক্ষাপট ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেন—তিনি উমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কা যাবেন। এ ঘোষণা শোনামাত্রই মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের থেকে এক এক করে প্রায় ১৪০০ সাহাবি উমরাহর নিয়তে একত্র হয়ে যান। নবিজি পথেই ইহরাম বেঁধে নেন এবং সাথে কুরবানির পশুও নিয়ে নেন। যাতে মক্কার কাফিররা তাঁর পক্ষ থেকে যুদ্ধাভিযানের আশঙ্কা না করে এবং তারা পরিষ্কার বুঝতে পারে—তিনি কেবলই বাইতুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই মক্কায় আসছেন।

উমরাহর সফরে বাধা প্রদান

বিশাল বহর নিয়ে চলতে চলতে নবিজি যখন জুলহুলাইফা পৌঁছেন, তখন খুজাআ গোত্রের বিশর ইবনে সুফিয়ানকে মক্কাবাসীর হাল-হাকিকত পর্যবেক্ষণ করতে মক্কায় পাঠান। এদিকে তিনিও একেবারে না থেমে সামনে এগোতে থাকেন। যেতে যেতে আশতাতের কূপের কাছে পৌঁছলে বিশর তার সাথে ফিরতি সাক্ষাৎ করে। বিশর জানায়—কুরাইশরা নিজেরা তো একজোট হয়েছেই, পার্শ্ববর্তী সকল গোত্রকেও একত্র করেছে আপনার সাথে লড়াই এবং বাইতুল্লাহ জিয়ারতে আপনাকে বাধা দেওয়ার জন্য।

বিবরণ শুনে সমবেত সাহাবিগণের উদ্দেশ্যে নবিজি বলেন—সাহাবিরা, পরামর্শ দাও—এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি?

সিদ্দিকে আকবর রা. বলেন—আপনি জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা ছেড়ে এতদূর এসেছেন। রক্তপাত বা লড়াইয়ের কোনো ইচ্ছাই আপনার নেই। সুতরাং এভাবেই আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলেন। তারা আমাদের আটকাতে চাইলে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

ভিন্ন পথে যাত্রা

নবিজি বলেন—ঠিক আছে। তবে আল্লাহর নামে তোমরা চলতে থাকো। তারপর তিনি জানতে চান—আচ্ছা, কাফিররা যেই পথে আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ কি কারও জানা আছে?

তৎক্ষণাৎ বনু আসলামের একজন সাড়া দিয়ে বলেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি আছি। আমি অন্য রাস্তা চিনি। সেটা দিয়েই নিয়ে যাব।

তারপর কাফিরদের ঘাঁটি ও প্রহরা এড়িয়ে অপরিচিত ও অজানা বিজন রাস্তা দিয়ে তিনি কাফেলার গাইডলাইন করেন।

কাসওয়ার আচরণ

নবিজি সবাইকে নিয়ে চলতে চলতে হুদাইবিয়ার নিকটবর্তী স্থান 'মিরার'-এ পৌঁছলে সেখানে তাঁর উটনী বসে যায়। সাহাবিগণ 'হাল হাল'[৫৮] বলে উটনীকে উঠানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরিশেষে তারা বলেন—একি! কাসওয়া তো 'বিদ্রোহী হয়ে গেছে। নবিজি বলেন—না, তোমরা যা বলছ, আসলে তা নয়। আমার এই কাসওয়া বিদ্রোহী হয়নি এবং এটা এর অভ্যাস বা চরিত্রও নয়; বরং একে সেই সত্তাই থামিয়ে দিয়েছেন—যিনি আসহাবে ফিলকেও থামিয়ে দিয়েছিলেন।'

এরপর তিনি বলেন—ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ—এই কুরাইশরা আল্লাহর হুরুমাতের (সম্মানিত বিষয়ের) তাজিম-সংশ্লিষ্ট যেই আবদারই আজ করবে, আমি তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মঞ্জুর করব।

---

৫৮ 'হাল হাল' হলো উটচালনার একটি বিশেষ ধ্বনি। উটকে হাঁকিয়ে নেওয়ার জন্য এটা উটের পা ফেলানোর ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে জোরে উচ্চারণ হয়।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীকে হাঁকান। উটনী ঝটপট উঠে দাঁড়ায় এবং তিনি রাস্তা থেকে কিছুটা সরে হুদাইবিয়ার এক কিনারায় একটি স্বল্প পানির কূপের ধারে ছাউনি ফেলেন। ক্ষণকাল পরেই সাহাবিগণ দেখলেন—কূপের পানি শেষ হয়ে গেছে। সাহাবিগণ নবিজির কাছে তীব্র পিপাসার অভিযোগ জানালে নবিজি তূণীর থেকে একটি তির নেন এবং নির্দেশ দেন—এটা তোমরা কূপে নিক্ষেপ করো। যেই না তিরটি নিক্ষেপ করা হলো, সাথে সাথে এত পানি উঠে আসে যে, সকল সাহাবি তৃপ্তির সাথে পানি পান করেন।"

কুরাইশ দূত বুদাইলের আগমন

সাহাবিগণ হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালেই বুদাইল ইবনে ওরাকা খুজায়ি কয়েকজন লোক নিয়ে নবিজির দরবারে উপস্থিত হয় এবং সংবাদ দেয়—'আমি কাব ইবনে লুয়াই ও আমর ইবনে লুয়াইকে হুদাইবিয়ার কূপগুলোর আশপাশে প্রস্তুত ও জড়ো হতে দেখে এসেছি। তাদের সাথে আছে দুগ্ধবতী উটনী এবং উটনীর বাচ্চাও। তারা দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানের পরিকল্পনা করে খাবারদাবার ও রসদের ব্যবস্থা করেই এসেছে। উদ্দেশ্য—আপনার সাথে লড়াই এবং বাইতুল্লাহ জিয়ারতে আপনাকে কঠোর বাধা প্রদান।'

নবিজি বলেন—'আমরা এখানে কোনোক্রমেই লড়াইয়ের জন্য আসিনি; বরং আমাদের উদ্দেশ্য তো কেবল উমরাহ আদায়। আসলে, লাগাতার সংঘর্ষের ফলে কুরাইশরা মানসিকভাবে খুবই বিধ্বস্ত এবং আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চাইলে আমার সাথে এক নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধিচুক্তি করতে পারে এই মর্মে যে, তারা আমার এবং অন্যদের মাঝে বাধা হবে না। জয় যদি আমাদের হয়, তবে তারা চাইলে অন্যদের মতো ইসলাম কবুল করতে পারে। আর যদি মুসলিম না হয়, তবুও এমনিতেই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারবে; কিন্তু এটাও যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে ওই খোদার কসম—যার হাতে আমার প্রাণ! আমি দেহ থেকে মস্তক আলাদা না হওয়া পর্যন্ত অথবা ইসলাম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ওদের বিপক্ষে লড়ে যাব।'

নবিজির কথা শুনে বুদাইল বলল—'আপনি যা কিছু বললেন, এর সবই আমি তাদের কাছে পৌঁছে দেবো।'

---

৫৯ সূত্র : *সহিহ বুখারি, সিরাতে ইবনে হিশাম*

বুদাইল কুরাইশদের কাছে গিয়ে বিস্তারিত সব বলল। তার বার্তা শুনে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফি উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'আমি অবশ্যই এবং এখনই তাঁর কাছে যাচ্ছি। বুদাইলের বার্তার বিষয়ে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব।' কুরাইশরা সমস্বরে বলে—'ঠিক আছে। তুমি যেমনটা বলছ করতে পারো এবং তুমি যেতে পারো।'

কুরাইশ প্রতিনিধি উরওয়ার

উরওয়া ইবনে মাসউদ বৈঠক থেকে উঠে এসে নবিজির দরবারে হাজির হয়। তখন নবিজি তার সাথেও সেই একই কথা বলেন, যা বলেছেন বুদাইলের সাথে। নবিজির ফরমান শুনে উরওয়া বলল—

'আপনার ধারণা কী—আপনি যদি এদের সাথে লড়াই করে এদের বরবাদ করে দেন, তাহলে আমাকে বলেন তো, ইতঃপূর্বে কোনো আরব গোত্র কি নিজেরাই নিজেদের বরবাদ করেছে? পক্ষান্তরে তারা যদি বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেয়, তাহলে খোদার পানাহ, আপনার এসব সঙ্গীসাথিদের চেহারায় তো আমি পলায়নের আলামত ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এরা তো আপনাকে ময়দানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে যাবে।'

উরওয়ার এসব উদ্ভট ও বিরক্তিকর কথা শুনে সিদ্দিকে আকবর রা. ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং এক গালি দিয়ে বলেন—'উরওয়া, তুই গিয়ে তোর ভগবান লাতের লজ্জাস্থান চুষতে থাক। আরে ব্যাটা, তুই বললিটা কী, আমরা আল্লাহর রাসুলকে ফেলে পালিয়ে যাব!'

এই ক্ষিপ্ত আওয়াজ শুনে উরওয়া আওয়াজকারী খুঁজতে লাগল। সে জিজ্ঞেস করল, কে এটা?

সাহাবিগণ জানালেন—'এটা সিদ্দিকে আকবর রা.-এর গর্জন।'

উরওয়া বলল—'আবু বকর, হায়! আমার ওপর যদি তোমার ওই অপরিশোধ্য অনুগ্রহ না থাকত (যার বিনিময় আমি তোমাকে কখনো দিতে পারব না), তাহলে ঠিকই এখন তোমার এই তিক্ত কথার জবাব দিয়ে দিতাম।'

তারপর উরওয়া নবিজির সাথে আরও আলোচনা করল। সে কথায় কথায় নবিজির দাড়ি মুবারকে হাত দিতে যাচ্ছিল। মুগিরা ইবনে শুবা রা. তখন বর্ম পরিহিত এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে নবিজির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উরওয়া যখনই নবিজির দাড়ি মুবারকের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, তখনই তিনি তার হাতের ওপর তরবারির হাতল

দিয়ে মৃদু আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন—'উরওয়া, নিজের হাত সামলা। নবিজির দাড়ির দিকে হাত বাড়ানোর সাহসটুকুও করিস না।'

উরওয়া মাথা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—'এটা আবার কে'

জনৈক সাহাবি বললেন—'ইনি মুগিরা ইবনে শুবা।'

উরওয়া বলল—'রে ধোঁকাবাজ! গতকালই আমি তোর শরীর থেকে নাপাকি পরিষ্কার করলাম (তোর তেরোটা খুনের দুইটার বদলা আমি দিয়ে দিলাম) আর তুই কিনা আজ আমার সাথে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করছিস!'

এরপর উরওয়া সাহাবিদের আড়চোখে দেখে পুরো বাহিনীর পরিসংখ্যান অনুমান করে নেয় এবং কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে—'হায় আমার জাতি! মুহাম্মাদ আর তাঁর অনুসারীদের কথা কী বলব! খোদার কসম, আমি তো দেখে এলাম। মুহাম্মাদ যখন খকখক করে থুতু ফেলে, তখন তা কোনো না কোনো সাহাবির হাতের তালুতে গিয়ে পড়ে। আর তারা মনোবিশ্বাসের প্রাবল্যে তাঁর থুতু নিজেদের চেহারা এবং গায়ে মেখে নেয়।

কী বলব—সে যখন কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, তখন ওই কাজ বাস্তবায়নে তাঁর সাহাবিরা প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। সে যখন অজু করে, তখন তাঁর অজুর ব্যবহৃত পানি নেওয়ার জন্য তারা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তোমরা দেখলে মনে করবে—ওরা বুঝি কোনো রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত। সে যখন কথা বলে, তখন সবাই নীরব-নিশ্চুপ হয়ে যায়। এমনকি তাঁর আদব ও সম্মানের দিক বিবেচনা করে ওরা তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়ও না।'

উরওয়া আরও বলল—'আমার জাতি, আমি বহু রাজা-বাদশাহর দরবার দেখেছি। কিসরা-কাইসার ও নাজ্জাশির দরবারেও গিয়েছি; কিন্তু খোদার কসম! মুহাম্মাদকে তাঁর সভাসদদের সম্মান প্রদর্শনের মতো তাজিম কোথাও দেখিনি।

সুতরাং আমি বলি কী, আর এদিক-সেদিক না দেখে এবং চার-পাঁচ না ভেবে তাঁর উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলো তোমরা চুপচাপ মেনে নাও।'

তারপর কুরাইশরা সুহাইল ইবনে আমরকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নবিজির দরবারে পাঠায়; যেন দু-পক্ষের মাঝে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুহাইল এসে নবিজির সামনে বসে এবং বলে—'আসো, আমরা তোমার মাঝে এবং আমাদের মাঝে এক সন্ধিচুক্তির দস্তাবেজ লিখে নিই।'

নবিজি সচিব তলব করেন। *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনা মোতাবেক নবিজি আলি রা.-কে ডেকে আনেন এবং সন্ধি লেখান। নবিজি বলেন—'আলি, লেখো—বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।'

সুহাইল আপত্তি তুলে বলল—'হায় ভগবান! এই রহমান আবার কে? আমরা তো তার ব্যাপারে জানি না; বরং তুমি লেখাও, বিসমিকা আল্লাহুম্মা।'

তার এই মন্তব্য শুনে সাহাবিরা গর্জে উঠে বলেন—'আল্লাহর কসম! আমরা "বিসমিল্লাহই" লেখব।' নবিজি বলেন—'আচ্ছা, ঠিক আছে "বিসমিকা আল্লাহুম্মা"-ই লেখো।' তারপর নবিজি লেখান—(هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله) অর্থাৎ, এই দস্তাবেজ ওইসব শর্ত সম্বন্ধে, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধির ফয়সালা করেছেন।

সুহাইল আবারও আপত্তি তুলে বলে—'আহা! আমরা যদি তোমাকে রাসুলুল্লাহ হিসেবে মেনেই নিতাম, তাহলে তো আমরা তোমাকে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে বাধাই দিতাম না। তোমার সাথে সংঘর্ষেও জড়াতাম না। কাজেই তুমি "মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ" লেখাও।'

নবিজি বলেন—'আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসুলই; তোমরা যদিও না মানো। এবং আমার রিসালাতকে মিথ্যা বলো না কেন।' তারপর নবিজি আলি রা.-কে বলেন—'লেখো মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ।'

সহিহ মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে—নবিজি আলি রা.-কে 'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ' মুছে দিতে বললে তিনি আদবের সাথে বলেন, 'না'। আল্লাহর কসম! এটা আমি পারব না।

নবিজি বলেন—'আচ্ছা ঠিক আছে। লেখাটা আমায় দেখিয়ে দাও।' আলি রা. দেখিয়ে দিলে নবিজি নিজেই 'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ' শব্দ দুটি মুছে দেন এবং 'আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ' লিখিয়ে দেন। তারপর বলেন—'এই সন্ধি এই শর্তের ওপর হয়েছে যে, আমাদের এবং বাইতুল্লাহর মাঝে কোনো বাধা থাকবে না। তোমরা আমাদের তাওয়াফের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে দেবে।'

সুহাইল বলল—'খোদার কসম! না। এমনটা কোনোভাবেই হবে না। কারণ, তাহলে গোটা আরব বলবে, মুসলিমরা শক্তির জোরে মক্কায় প্রবেশে সক্ষম হয়েছে। তবে হ্যাঁ, তোমাদের তাওয়াফের সুযোগ হবে আগামী বছর। অতএব, এই শর্ত

লিখে নাও—আগামী বছর মুসলিমরা আসবে, তবে তাদের তরবারি খাপবন্ধ থাকবে। আরও একটা শর্ত আছে, আমাদের এখান থেকে কেউ তোমাদের কাছে চলে গেলে তাকে তোমরা মক্কায় ফেরত পাঠাবে; সে যদিও তোমাদের ধর্মের অনুসারী হোক না কেন। বিপরীতে তোমাদের ওখান থেকে কেউ যদি আমাদের এখানে চলে আসে, তাহলে আমরা তাকে ফেরত পাঠাব না।'

সাহাবায়ে কিরাম এসব অযৌক্তিক শর্ত শুনে বলে ওঠেন—'সুবহানাল্লাহ। বাহ! কী চমৎকার শর্ত! বলি, কোনো মুসলিমকে তোদের কাছে ফেরত পাঠাব কেন রে?' তারা নবিজির প্রতি জিজ্ঞাসার সুরে আবেদন জানান—'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা কি এই শর্তটাও লিখব?'

নবিজি বলেন—'হ্যাঁ। আমাদের কেউ যদি তাদের কাছে চলে আসে, তাহলে আল্লাহ তাকে দূর করে দেবেন। আর যদি তাদের কেউ আমাদের কাছে চলে যায়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য প্রশস্ততা এবং মুক্তির পথ বের করে দেবেন।[৬০]

ইবনে ইসহাক (৮৫-১৫০হি.), ইবনে সাদ (১৬৮-৩০হি.) এবং হাকিম (৩২১-৪০৫হি.) রাহিমাহুমুল্লার বর্ণনা অনুযায়ী, উপর্যুক্ত শর্তভিত্তিক সন্ধি দীর্ঘ দশ বছর মেয়াদি বলে স্বাক্ষরিত হয়। পাশাপাশি আরবের প্রত্যেক গোত্রকে এই দুই দলের যে কারও পক্ষাবলম্বন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এভাবে বনু খুজাআ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বলে—'আমরা সন্ধিতে মুহাম্মাদের সাথে আছি।' অপরদিকে বনু বকর কুরাইশদের পক্ষে থাকার ঘোষণা দেয়। সন্ধিচুক্তি লেখার কাজ শেষ হলে মুসলিম-কাফির দু-পক্ষ থেকে কয়েকজন করে সাক্ষীর দস্তখত ও স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

সহিহ বুখারিও সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত আছে, উমর রা. নিজের ব্যাপারে বলেন—

'আমি সরাসরি নবিজির সামনে হাজির হলাম এবং তাকে একরকম অভিযোগের সুরেই বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, বলেন—আপনি কি আল্লাহর সত্য নবি নন?

নবিজি উত্তর দেন—কেন নয়, অবশ্যই।

আমি বললাম—আপনি সত্যের ওপর আর আপনার দুশমনরা কি মিথ্যার ওপর নয়?

---

৬০ সূত্র : *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

তিনি বলেন—কেন নয়, অবশ্যই।

আমি বললাম—আমাদের নিহতরা জান্নাতি আর আমাদের দুশমনের নিহতরা জাহান্নামি নয়?

তিনি বলেন—কেন নয়, অবশ্যই।

বললাম—আচ্ছা। সবকিছু যদি ঠিক হয়, তবে কেন আমাদের দ্বীনি বিষয়ে এসব লাঞ্ছনা ও লজ্জা হজম করতে হবে!

নবিজি শান্ত গলায় জবাব দেন—নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসুল। আমি তাঁর নাফরমানি করতে পারি না। তিনিই আমার সহায়ক।

বললাম—আচ্ছা, আপনি কি আমাদের বলেননি, অচিরেই আমরা বাইতুল্লাহয় পৌঁছব এবং তাওয়াফ করব?

নবিজি বলেন—কেন নয়, অবশ্যই! তবে তোমাকে তো আমি এভাবে বলিনি, এই বছরই আমরা প্রবেশ করব।

আমি বললাম—হ্যাঁ। এমনটা অবশ্য বলেননি। তারপর নবিজি নিজেই বলেন—উমর, আমি তোমাকে আবারও বলছি, তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তোমরা বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করবে এবং তাওয়াফও করবে।

ফারুকে আজম রা. সরাসরি নবিজির পবিত্র মুখ থেকে এসব কথা শুনেও নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। একপর্যায়ে তিনি সিদ্দিকে আকবর রা.-এর কাছে যান এবং তার সামনেও সেসব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন। সিদ্দিকে আকবর রা. বলেন—'হে খাত্তাবপুত্র, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসুল। তিনি কখনোই তাঁর রবের নাফরমানি করতে পারেন না এবং আল্লাহ তায়ালাও তাঁকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না।'

এরপর খুব অল্প সময়ই অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তায়ালা সুরা ফাতহের বিজয়ের সুসংবাদ বহনকারী আয়াতগুলো নাজিল করেন। নবিজি আয়াতগুলো উমর রা.-এর সামনে তিলাওয়াত করেন। শুনে ফারুকে আজম রা. বলেন—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এগুলো কি বিজয়ের সুসংবাদ?'

তিনি বলেন—হ্যাঁ।

শুনে ফারুকে আজম রা.-এর মন খুশি ও প্রশান্তিতে ভরে যায়।

তারপর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের অভিমুখী হোন এবং তাদের লক্ষ্যে বলেন—'ওঠো। কুরবানি করো। মাথা হলক করাও।'

এই কথা নবিজি তিনবার বলেন; কিন্তু সকল সাহাবি ভগ্ন হৃদয়ে নীরব-নিরুত্তাপ হয়ে বসে থাকেন। কেউই নিজ জায়গা থেকে নড়লেন না।

নবিজি তার সাথে থাকা স্ত্রী আম্মাজান উম্মে সালামা রা.-এর কাছে এসে অবস্থা বর্ণনা করেন। উম্মে সালামা রা. বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি তাদের থেকে এই আমলগুলোর বাস্তবায়ন কামনা করেন? তাহলে আমার পরামর্শ হলো—আপনি এখন বাইরে যান এবং কারও সাথে কথা না বলে নিজেই প্রথমে কুরবানি করেন এবং হলক করিয়ে নেন। স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী নবিজি তা-ই করেন। সাহাবায়ে কিরাম যখন নবিজিকে আমলগুলো করতে দেখেন, তখন তারাও একে একে সবাই ওঠেন এবং কুরবানি করেন। একজন আরেকজনের চুল কেটে দেন; কিন্তু মন এত ব্যথিত ও চিন্তিত ছিল এবং এত দ্রুত কাজ করছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল—তারা একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলবেন।

এরপর নবিজি সকল সাহাবিকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। মদিনায় এলে মক্কার কয়েকজন নারী শিরক ছেড়ে তাওহিদ তথা ইসলাম কবুল করে নবিজির দরবারে হাজির হন। তাদের মধ্যে উম্মে কুলসুম বিনতু উকবা রা.-ও ছিলেন। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

৬১ সূত্র : সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

ঈমানদারগণ, মুমিন নারীরা যখন হিজরত করে তোমাদের কাছে আগমন করে, তখন তাদের পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা যদি তাদের ঈমানের কথা জানতে পারো, তাহলে আর তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও।

তোমরা এই নারীদের প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নেবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬২]

ফলে নবিজি তাদের কাফিরদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন।[৬৩]

* * *

৬২ সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১০
৬৩ *সহিহ বুখারি*

বাইয়াতে রিদওয়ান

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজ জামাতা উসমান রা.-কে কুরাইশদের কাছে পাঠান। কুরাইশরা উল্লেখযোগ্য একটা সময় যাবৎ তাকে আটকে রাখে। ফলে ওদিকে খবর প্রচারিত হয় এবং নবিজির কানেও সংবাদ চলে যায়—কুরাইশরা উসমানকে শহিদ করে ফেলেছে।

এই মর্মান্তিক ও আকস্মিক খবর শুনে নবিজি ঘোষণা দেন—'যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওদের থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ না নেব, ততক্ষণ এখান থেকে একচুলও নড়ব না।'

অতঃপর উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর হাতে সাহাবিদের বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান করেন। একটি বাবলা গাছের নিচে এই বাইয়াত তিনি গ্রহণ করেন। নবিজি নিজের মুবারক ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে বাইয়াত নেন। উপস্থিত সকল সাহাবি 'কোনো অবস্থাতেই ময়দান ছেড়ে পালাবেন না এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ঘরে ফিরবেন'—এই কথার ওপর বাইয়াত হন। তারপর নবিজি তাঁর মুবারক বাম হাত অন্যদের হাতের ওপরে রেখে বলেন—'এটা উসমানের পক্ষ থেকে।'

এটিই ইসলামি ইতিহাসের ঐতিহাসিক 'বাইয়াতে রিদওয়ান'। অবশেষে বাইয়াত গ্রহণ সমাপ্তিতে খবর আসে—উসমান হত্যা আদতে একটা গুজব ছিল।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

সন্ধির কারণ সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট ধারণা

নিঃসন্দেহে এই সন্ধি ছিল তাদবিরে ইলাহির অন্যতম নিদর্শন। যেটার প্রতিফলে নবুয়তি আমল ও প্রভাব বিস্তার এই পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়, যা অন্য কোনো আমলে দেখা যায়নি। এই সন্ধির সাফল্য সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ইলমে গাইবের অংশ ছিল। এজন্য ঘটনার বিবরণে দেখা গেছে—সাহাবিগণ প্রাথমিকভাবে এর বাহ্যিক লোকসানগুলো ভেবে মারাত্মকভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তারপরও এর এবং এ জাতীয় ঘটনার পরবর্তী সুফল থেকে আমরা বুঝতে পারি, এই সন্ধি তার ভূমিকা, মূল বিষয় ও ফলাফলের বিবেচনায় ইসলামি আকিদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। তাই এখানে প্রথমে সন্ধির হিকমত বা গূঢ় রহস্যগুলো উল্লেখ করে, তারপর এ থেকে উৎসারিত কিছু শিক্ষা ও উপদেশ বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

হিকমত : ০১

এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়ের অগ্রণী ভূমিকা বা প্রথম বিজিত তাঁবু। যেমন : ইবনে কাইয়িম (৬৯১—৭৫১ হি.) রহ. বলেছেন—যুদ্ধবিরতির এই প্রতিশ্রুতি মক্কা বিজয়ের সদর দরজা এবং চাবিকাঠি বলেই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র একটি রীতি হলো, ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটানোর ইচ্ছা তিনি করেন, সেটার সত্যতা ফুটিয়ে তুলতে আগেই এবং শুরুতেই এমন কিছু ঘটনার অবতারণা করেন, যেগুলো ভবিষ্যৎ ঘটনার সুস্পষ্ট দলিল হয়ে থাকে। সে হিসেবে সন্ধির প্রস্তাবগুলোর নিগূঢ় রহস্য সাহাবায়ে কিরামের অজানা থাকায় যদিও তাদের কাছে পুরো সন্ধিটিই নিজেদের অনুপোযোগী মনে হচ্ছিল, তবুও তা-ই ছিল তাদের জন্য প্রভূত কল্যাণকর। কারণ, এর সম্পর্ক পুরোটাই ছিল ইলমে গাইবের সাথে। এজন্য অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা এর বিবিধ সুফল দেখতে পান। তাদের সামনে একের পর এক এই সন্ধির সুপ্ত কল্যাণ ও গচ্ছিত উপকার প্রকাশ পেতে থাকে। এই সন্ধির বিবেচনায় দুই পক্ষের মাঝে যখন দশ বছর মেয়াদি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়,

তখন মুসলিম ও কাফির উভয়ই নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অনুভব করতে শুরু করে। এর ওসিলায় মুসলিম-কাফিরদের মধ্যে যাতায়াত ও পারস্পরিক মোলাকাত হতে থাকে। এই সুযোগে মুসলিমরা কাফিরদের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাদের কুরআনে কারিম পাঠ করে শোনান। এতে কাফিররা প্রভাবিত হতে থাকে। মুসলিম ও ইসলামের খুব ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বহু লোক নতুন করে মুসলিম হয়। আর পুরোনো মুসলিমরা নিজেদের গোপন ইসলামকে জাহির করেন।

ইবনে হিশাম (মৃত্যু : ২১৮ হি.) ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন—

ইসলামে হুদাইবিয়ার সন্ধির চেয়ে বড়ো আর কোনো বিজয় ছিল না। কারণ, আগে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ ও বিদ্বেষী লড়াই চলতেই থাকত; কিন্তু সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর দু-পক্ষের লোকই পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে। পরস্পরে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার সুযোগ হয়। যেসব অমুসলিম ইসলামের সত্যতা অনুধাবনে সক্ষম হয়, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। সন্ধিচুক্তির পরবর্তী দু-বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা সন্ধির পূর্ববর্তী মোট মুসলিমদের সমপরিমাণ বা তার চেয়েও বেশি হয়ে যায়। ঠিক এ কারণেই কুরআনে কারিম এই সন্ধির কথা বলতে গিয়ে 'বিজয়' শব্দ ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালার বাণী—

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا.

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান তো অবশ্যই তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। তিনি জানেন, যা তোমরা জানো না। এ ছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদের একটি আসন্ন বিজয়।[৬৪]

হিকমত : ০২

এই সন্ধির বড়ো একটি হিকমত হলো, আল্লাহ তায়ালা এই সন্ধির মাধ্যমে ওহি ও মানবসুলভ চিন্তা-গবেষণার মাঝে পার্থক্য তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন

৬৪ সুরা ফাতহ, আয়াত : ২৭

একজন নির্বাচিত ও প্রেরিত রাসুলের সিদ্ধান্তের শক্তি এবং একজন সাধারণ ধীমান ও প্রাজ্ঞ চিন্তাবিদের সিদ্ধান্তের শক্তির মধ্যবর্তী ফারাক ও দূরত্ব স্পষ্ট করতে। যেন একটি অকাট্য বিষয় সবার সামনে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পার্থিব উপায়-উপকরণ বাদ দিয়ে ওহি ও ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত বিষয় এবং সাধারণ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দুটির মাঝে অবশ্যই পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পেয়ারা নবির নবুয়ত প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী ও বোদ্ধাসমাজ যেন নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই-বাছাই করে বুঝতে পারে। এটা যেন অনেকটা নিচের আয়াতের তাফসির ও বাস্তব প্রতিফলন ছিল—

و ينصرك الله نصرا عزيزا.

এবং তিনি যেন আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।"

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এমন অভিনব ও কল্পনাতীত বিজয় দান করবেন এবং এমন অভাবনীয় সাহায্য করবেন, যা মৃত চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলবে। গাফেল বিবেককে কাঁপিয়ে দেবে।

সন্ধির শর্তগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের ব্যাপারে যথেষ্ট নমনীয় ও সহজ শর্তগুলো আরোপ করেছেন এবং তাদের বিবেচনায় এমন হালকা ও সহজ শর্তগুলো কবুল করে নিয়েছেন; যেগুলো মুসলিমদের ক্ষেত্রে ছিল খুবই শক্ত ও কঠিন। (শর্তগুলো হজম করতে সাহাবায়ে কিরামের গলায় আটকে যাচ্ছিল; কিন্তু তারপরও নবিজি সেসব শর্তের ওপরই চুক্তি সম্পন্ন করেন। কারণ, তিনি আল্লাহর প্রেরিত। যার সামনে ওহির মাধ্যমে সবকিছু পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল। বিপরীতে সাহাবায়ে কিরাম মানবিক অভ্যাসগত চিন্তা-ফিকিরে তা বুঝতে অক্ষম ছিলেন।) নবিজি ও সাহাবিদের মাঝে মূলত এই পার্থক্যের কারণেই উমর রা.-কে চরম অস্বস্তি ও অত্যধিক পেরেশান বোধ করতে দেখা গেছে; কিন্তু অল্পদিন পরেই যখন তিনি তার তাড়াহুড়ো-প্রবণতার বিষয়টি বুঝতে পারেন, তখন থেকে জরিমানাস্বরূপ লাগাতার কয়েকটি কাজ করেন। *মুসনাদু আহমাদ*-এর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি বলেন—সেদিন আমি নবিজির সাথে যেই রূঢ় আচরণ করেছিলাম, সেটা থেকে মুক্তি পেতে পরে আমি লাগাতার সিয়াম পালন করা আরম্ভ করি। বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে

---

৬৫ সুরা ফাতহ, আয়াত : ৩

থাকি। অধিক পরিমাণে সদকা করতে থাকি এবং গোলামও আজাদ করি। (একপর্যায়ে বুঝতে পারলাম, আমি এখন কল্যাণের প্রত্যাশার উপযুক্ত হয়েছি।)

হিকমত : ০৩

দেখা গেছে—চুক্তি সম্পন্ন শেষে নবিজি যখন সবাইকে কুরবানি এবং মাথা হলকের নির্দেশ দেন, তখন সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসেই থাকেন। তিনি তিনবার নির্দেশ বাক্য উচ্চারণ করলেও কেউ উঠেও দাঁড়াননি। এর রহস্য অতি স্বাভাবিক। সাহাবায়ে কিরাম তাদের মানবিক বিবেক দিয়ে চিন্তা-ফিকির করছিলেন। তাদের সামনে সর্বোচ্চ যা ছিল, তা হলো—অভিজ্ঞতা ও অনুধাবিত জ্ঞান। এসব দুর্বল মাপকাঠিতেই তারা সবকিছু যাচাই-বাছাই করছিলেন; কিন্তু নবিজির কাছে ছিল এক্সট্রা ও সুপার পাওয়ার জ্ঞান। তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে ওহিরও ধারক-বাহক ছিলেন। ফলে ইলমে নবুয়তের মধ্যস্থতায় ভবিষ্যতের দূরবর্তী বিষয়ও তাঁর নখদর্পণে ছিল। কারণ, নবি-রাসুলগণকে ওহির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সবকিছুর স্বরূপ জানিয়ে দেওয়া হতো। এবং তাঁর সামনে ছিল আল্লাহ তায়ালার আদেশের বাস্তবায়ন। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে উমর রা.-কে লক্ষ করে তাঁর উত্তরে। নবিজি বলেছিলেন—'আমি আল্লাহর রাসুল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী।'

হিকমত : ০৪

নবিজির জ্ঞান ও পারদর্শিতার গভীরতার অনুমান করা যায় উসমান রা.-কে করা তাঁর নসিহত থেকেও। উসমান রা.-কে যখন তিনি প্রতিনিধি বা রাষ্ট্রদূত হিসেবে মক্কার কাফিরদের সভায় পাঠান, তখন তাকে অসিয়ত করেন—মক্কায় যেসব ঈমানদার নারী-পুরুষ অভিভাবকহীন জীবন কাটাচ্ছে, তাদের কাছেও যেয়ো এবং তাদের এই সুসংবাদ দিয়ে এসো, মক্কা বিজয় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে অচিরেই এখানে বিজয়ী করবেন। এমনকি সেদিন কেউ মুশরিকদের ভয়ে তার ঈমান গোপন করবে না।

হিকমত : ০৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নববি জ্ঞান ও পারদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে সন্ধিচুক্তিতে যেই দিক অবলম্বন করেছেন সাধারণ মুসলিম ও সাহাবিদের স্বাভাবিক বোধ ও বিবেকে তা কোনোভাবেই ধরছিল না। যে কারণে

তারা কিছুটা বিরক্তি বোধ করছিলেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরেই নবিজি সুরা ফাতহের আয়াতগুলো এক এক করে তাদের সামনে তিলাওয়াত করলে মুহূর্তেই তাদের যন্ত্রণা ও আঘাত, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি এবং ক্রোধ ও বিরক্তি সব দূর হয়ে যায়। আয়াতগুলো শোনার সাথে সাথেই সাহাবিদের সকল অস্পষ্টতা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়ে যায়। সন্ধির যেসব শর্ত নিয়ে এতক্ষণ তাদের সাবধানতা ও সতর্কতা ছিল, এখন সেগুলোর বিপরীতে তাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারেন, কাফিররা যেসব শর্তকে নিজেদের শক্তিমত্তা ও ইজ্জতের কারণ ভেবে রেখেছে, আসলে সেগুলোই তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক হবে। এমনকি তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা যতটা প্রকাশ করছে, ঠিক ততটাই তারা পরাজিত ও পরাভূত হবে। পরিশেষে আমাদেরই বিজয় পতাকা উড়বে।

এভাবেই বিবেক-বুদ্ধি ও আকলের ভাবনার মোকাবিলায় নবিজি এবং ঈমানদারদেরই সফলতা অর্জিত হয়। বলাবাহুল্য, নবিজির নবুয়ত-রিসালাত এবং তাঁর অকাট্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আকিদা প্রমাণে এর চেয়ে বড়ো ও সুস্পষ্ট দলিল আর কিছু কি হতে পারে?

মক্কার কেউ মদিনায় চলে যাওয়া এবং মদিনা থেকে কারও মক্কায় চলে আসা নিয়ে বৈষম্যমূলক যেই শর্তটি সুহাইল ইবনে আমর লিখিয়েছিল, সেটা লেখার সময়ও নবিজির মেনে নেওয়ার ওপরও সাহাবিদের প্রবল সংশয়-সন্দেহ ছিল। সাহাবিদের ভেতরের ক্ষোভ আক্রোশ ও মানসিক সংকীর্ণতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয় ঠিক ওই সময়, যখন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ দিয়েই সুহাইলের মুসলিম ছেলে আবু জান্দাল হাত-পায়ে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় গড়াতে গড়াতে মুসলিমদের শিবিরে চলে আসে। আর সুহাইল তার জামার কলার ধরে বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ, তোমার আর আমার মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। অতএব, একে চলে যেতে বলো।'

নবিজি বলেন—'তুমি ঠিকই বলেছ।' সুহাইল মারতে মারতে টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যেতে থাকে। তার উদ্দেশ্য, কুরাইশদের হাতে তুলে দেওয়া। এমতাবস্থায় নিরীহ আবু জান্দাল চিৎকার করে বলতে থাকেন—'হে মুমিন ভাইয়েরা, তোমাদের চোখের সামনেই কি আমাকে মুশরিক কুরাইশদের হাতে সঁপে দেওয়া হবে? ওরা তো আমাকে ইসলাম থেকে সরিয়ে মুরতাদ বানিয়ে ফেলবে। আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন ও বর্ণনাতীত অত্যাচার চালাবে। তখন নবিজি বলেন—'আবু জান্দাল, ধৈর্য ধরো। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। অচিরেই তিনি তোমার এবং তোমার মতো অক্ষম ঈমানদারদের জন্য একটা প্রশস্ত পথ খুলে দেবেন।

আমরা তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। তা আমরা ভাঙতে পারব না।' সাহাবিগণ নীরবে শুধু দেখেই যান। কেউ কিছু বলতে পারলেন না। কোনো কিছু করতেও পারলেন না। এই নির্মম ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে তাদের মনের দহন-যন্ত্রণাই শুধু বেড়েছে। কিন্তু শেষে ফলাফল কী ছিল?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিচুক্তির সকল কাজ শেষ করে সাহাবিদের নিয়ে মদিনায় ফিরে আসলে কুরাইশদের একজন আবু বুসাইর মুসলিম হয়ে মদিনায় চলে আসে। ওদিকে কুরাইশরাও তাকে ধরে নেওয়ার জন্য তার পেছনে অস্ত্রসহ দুজনকে পাঠায়। নবিজিও চুক্তি মোতাবেক তাকে তাদের কাছে সোপর্দ করে দেন। তারা তাকে বেঁধে নিয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে যখন জুলহুলাইফা পৌঁছে, তখন বিশ্রামের জন্য খানিক বিরতি নেয়। আর এরই মাঝে এক মুশরিকের উদাসীনতা ও বোকামির সুযোগে তিনি তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে দ্বিতীয় মুশরিক দৌড়ে এসে নবিজির দরবারে প্রাণ ভিক্ষা চায়। পিছু পিছু আবু বুসাইর রা.-ও নবিজির কাছে এসে পৌঁছেন এবং বলেন—'হে আল্লাহর নবি, আল্লাহর কসম, আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করেছেন। এবং আল্লাহও আপনার জিম্মার পূর্ণতা দিয়েছেন। আপনি চুক্তিমাফিক আমাকে আমার জাতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অপরদিকে আল্লাহ আমাকে ওদের নাপাক কবজা থেকে মুক্তির সুযোগ করে দিয়েছেন।'

তারপর তিনি মদিনা থেকে বেরিয়ে সমুদ্রোপকূলে 'সিফুল বাহর' নামক জায়গায় এসে আশ্রয় নেন। এদিকে আবু জান্দাল রা.-ও মক্কা থেকে এসে তার সাথে যোগ দেন। আবার মক্কার বেশ কিছু নওমুসলিম পালিয়ে এসে এখানে অবস্থান নেন। এবং এভাবেই এটা মুসলিমদের নতুন এক ঠিকানা ও আশ্রয় এবং 'নওমুসলিম পল্লি'-তে পরিণত হয়। এখন থেকে মক্কার যারাই মুসলিম হন, তারা আর মদিনায় না গিয়ে সোজা এখানে চলে আসেন। দেখতে দেখতে জায়গাটি সত্তরের মতো লোকের অভয়াআশ্রম ও ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

কুরাইশের উভয়সংকট

ওদিকে কুরাইশদের হয়েছে জ্বালা। তাদের বাণিজ্যপথ এখন বিপদসংকুল। কারণ, শামমুখী তাদের কোনো বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের খবর এই ঘাঁটিতে পৌঁছামাত্রই তারা তাদের শায়েস্তা করতেন। তারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করে বদলা নেওয়া এবং মালামাল কবজা করা শুরু করেন। নিরুপায় ও

অসহায় কুরাইশরা অবশেষে আল্লাহর কসম এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নবিজি বরাবর পত্র লিখতে বাধ্য হয়—'মুহাম্মাদ, মাফও চাই, দুআও চাই। এদের তুমি তোমার আশ্রয়ে নিয়ে নাও এবং মদিনাবাসীর সাথেই জায়গা দাও।' নবিজি কুরাইশদের করুণ আবদার রক্ষা করেন। সিফুল বাহর থেকে সবাইকে মদিনায় নিয়ে যান।"

মক্কা বিজয়কালে আবু জান্দাল রা. নিজেই বাবার জন্য নবিজির কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি (আবু জান্দাল) শাহাদাত বরণ করেন।

এভাবেই ধীরে ধীরে যখন সাহাবায়ে কিরামের দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণা লাঘব হয় এবং এসব উদ্ভূত ও কল্যাণকর পরিস্থিতি দেখে তাদের ঈমানে মজবুতি আসে এবং খোদায়ি ফয়সালা ও নবিজির নবুয়তের প্রতি তাদের ঈমান আরও প্রগাঢ় ও নিখুঁত হয়, তাদের ভেতর-বাইরে নবোদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে। বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে, এরই ফলশ্রুতিতে সুহাইল ইবনে সায়িদ রা. সিফফিনের যুদ্ধে বলেছিলেন—'ভাইয়েরা, আপনারা আপনার সিদ্ধান্তকে ভুল বলে স্বীকার করে নেন। (কারণ, বড়ো সিদ্ধান্তও অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে।) যেমন : আবু জান্দালের ঘটনার দিনটি আপনাদের মনে থাকার কথা। সেদিন আমিও কিন্তু আমার মতো ও সিদ্ধান্তকে ঠিক ও নির্ভুল মনে করেছিলাম। এমনকি সেদিন নবিজির সিদ্ধান্ত পালটে দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকলে তার সিদ্ধান্তকেই আমি পালটে দিতাম। (অথচ প্রকৃতপক্ষে আমারটাই ছিল ভুল।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পাঠকের কাছে আবারও জিজ্ঞাসা—বলুন তো, এরপরও নবিজির নবুয়ত ও রিসালাতের স্বপক্ষে এরচেয়ে বড়ো আর কোনো দলিল হতে পারে?

আরও একটি হিকমত

নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কুদরতেরই একটি ব্যতিক্রম বহিঃপ্রকাশ যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল পবিত্র নগরীকে তাঁর হাবিবের হাতে তুলে দেবেন রক্তপাত ও সংঘর্ষ ছাড়াই। বিজয়কে করবেন রহমত ও শান্তির, নিরাপদ ও নির্মল। এটা এমনই অভূতপূর্ব বিজয় ও বিষয় ছিল—যা দেখে চারপাশের লোকেরা দলে দলে ইসলামের প্রাসাদে প্রবেশ করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং যেসব কাফির দিনে-রাতে তাঁকে কষ্ট

---

৬৬ সূত্র : *সহিহ বুখারি*

দিয়েছে, জ্বালাতন করেছে এবং শেষ পর্যন্ত পিতৃভূমি ছেড়ে হিজরতে বাধ্য করেছে, তারা এখন তাঁর দরবারে হাজির হয়ে সন্ধি উপলক্ষ্যে উপহার পেশ করে। নিজেদের অজ্ঞতা-অপারগতা ও অক্ষমতার ওপর ওজরখাহি করে। দৃঢ়তার সাথে তাঁর ওপর ঈমান আনে। আন্তরিকভাবে আল্লাহমুখী হয়। তাওবা করে তাওহিদের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়।

মূলত এ কারণেই এবং এই দিনটির জন্যই আল্লাহ তায়ালা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে ভূমিকার রূপ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, কাফিররা নিজেরাই গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে উঠুক। নিজেদের মন ও বিবেকের হিসাব-নিকাশ করুক। মুসলিমদের সাথে তাদের সন্ধি এবং সন্ধির আগে-পরের সবকিছু দেখেশুনে শিক্ষা গ্রহণ করুক। যাতে তাদের মগজ পরিষ্কার হয় এবং সত্য বুঝতে ও সত্যকে আলিঙ্গান করতে কোনো জটিলতা না থাকে। সামনের বিস্তারিত বিবরণে এমনটাই আমরা দেখব, ইনশাআল্লাহ।

* * *

সন্ধি-সংশ্লিষ্ট আহকাম

এ পর্যন্ত আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধির নানা হিকমত জানলাম। এ পর্যায়ে সন্ধির আগে-পরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন শিক্ষা ও শরয়ি কিছু বিধান জানব। এখানে সংক্ষেপে আটটি বিষয় তুলে ধরা হলো—

এক. যুদ্ধ ছাড়া অন্য কাজে অমুসলিমদের সাহায্য নেওয়া

আমরা দেখলাম, নবিজি বিশর ইবনে সুফিয়ানকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন; অথচ সে ছিল বনু খুজাআর একজন মুশরিক। সুতরাং নবিজির এই আমল থেকে বোঝা যায়—অমুসলিমদের যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে।

এ থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—অমুসলিমদের থেকে সাহায্য নেওয়ার বিষয়টি যেই পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই পর্যন্ত তার নানাবিধ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি ও ঝোঁক এবং তার পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি সামনে রাখা অপরিহার্য। অর্থাৎ তার প্রতি যদি আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যায়, তার ওপর ভরসা করা যায় এবং তার থেকে গাদ্দারি-ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা ইত্যাদির কোনো আশঙ্কা না থাকে, তবেই তাকে কাজে লাগানো জায়িজ, অন্যথায় নয়।

মোটকথা, সিরাতের আলোচনা থেকে জানা যায়—নবিজি তাঁর হায়াতে মুবারকে বিভিন্ন সময় অমুসলিমদের থেকে সাহায্য নিয়েছেন। যেমন—শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে আরেক মুশরিককে গোয়েন্দা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আবার এক অমুসলিম থেকে যুদ্ধাস্ত্রও ধার নিয়েছিলেন ইত্যাদি।

এসব ঘটনা থেকে সার্বিক ও মৌলিক যেই মূলনীতিটি বের হয়, তা হলো—যুদ্ধ ও লড়াইয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কাজে যখন অমুসলিমদের থেকে সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আছে, তখন অন্যান্য সাধারণ বিষয় বা কাজকারবারেও তাদের কাজে লাগানো ভালোভাবেই এবং উত্তম পন্থায় জায়িজ।

দুই. ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য 'পরামর্শব্যবস্থা'

নবিজির সিরাত পাঠে জানা যায়—তিনি সাধারণ বিষয়েও পরামর্শ করতেন। ফলে এর দ্বারা পরামর্শ বিষয়টি শরিয়তসিদ্ধ হয়েছে।

আর বৈঠকের সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বা শাসকের জন্য জরুরি হলো, তিনি সভাসদদের মতামতকেও নিজের সিদ্ধান্তে স্থান দেবেন। কারণ, নবিজি এমন করেছেন। আবার নবিজি সব সময় সভাসদদের কারও মতের ওপরই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাও কিন্তু নয়; বরং কখনো কখনো সাহাবির মতামত ও অভিমতের ওপর ফয়সালা না দিয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

অতএব, সিদ্ধান্ত প্রদানে সাহাবিদের মতামতের ওপর নবিজির আমল করা বা না করা এটাই বোঝায়—ইসলামে পরামর্শ করা শরিয়তসম্মত এবং শরিয়ত কর্তৃক সমাদৃত হলেও শরিয়ত কর্তৃক আবশ্যক নয়।

এর মধ্যে হিকমত হলো, মুসলিমদের পরামর্শ ও মতামত নেওয়া এবং কোনো বিষয়ের কল্যাণকর দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা; যাতে অনবহিতরাও সেটা সম্পর্কে জানতে পারে। অথবা পরামর্শের উদ্দেশ্য হতে পারে সবার মনে সান্ত্বনা দেওয়া। তবে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বা শাসক যখন কোনো মতকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পাবেন, তখন সেটা তিনি গ্রহণ করবেন। অন্যথায় তার স্বাধীনতা রয়েছে তিনি প্রস্তাবিত যেকোনো মতের ওপর আমল করতে পারবেন। তবে শর্ত হলো—কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি না হওয়া এবং মুসলিমদের বিরোধী বা ক্ষতিকর না হওয়া।

আমরা পড়ে এসেছি—নবিজি গোয়েন্দা মারফত কাফিরদের অবস্থা জানার পর অগ্রসর বা প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শসভায় বসেছিলেন। সিদ্দিকে আকবর রা. মত দিয়েছিলেন লড়াই করে হলেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার এবং প্রথমদিকে নবিজি তা-ই করেছিলেনও বটে; কিন্তু পরে কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁর উটনী বসে গেলে তিনি বুঝতে পারেন—এই বাধা ও প্রতিবন্ধকতা ওপর থেকে।

ফলে তখন তিনি আগের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। পাশাপাশি এই ঘোষণা দিয়ে দেন—'ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আজ কুরাইশরা কাবা ও হারামের স্বপক্ষে যে কথাই বলবে, আমি তা কবুল ও মঞ্জুর করব।'

নবিজি সবার মাঝে এই ঘোষণা দিয়ে বুঝিয়ে দেন—আমি আবু বকরের মতানুযায়ী পূর্ব-সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। পরে দেখা যায়, তিনি কুরাইশদের আবেদনকৃত সন্ধির দরখাস্ত মঞ্জুর করেন এবং মুশরিকদের প্রস্তাবিত সব ধরনের শর্তে নিজস্ব ও একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নবিজি এ পর্যায়ে সন্ধির বিষয়ে কারও থেকে পরামর্শ তলবও করেননি। আবার শর্তের নানা অসংগতিতে কারও পছন্দ-অপছন্দ বা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দিকেও তাকাননি। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল, পরামর্শের বিষয়টি বিবেচিত হবে খোদায়ি সিদ্ধান্ত তথা ওহি শেষ হওয়ার পরে, আগে নয়।

ঠিক এ কারণেই বর্তমান সময়ে শরয়ি হুকুম-আহকাম কুরআন-সুন্নাহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের ইজমার ওপর নির্ভরশীল এবং পুস্তক আকারে সংকলিত—এগুলোই নবিজির ওপর নগদ নগদ অবতীর্ণ ওহির স্থলাভিষিক্ত।

সুতরাং এর দ্বারা এটাও পরিষ্কার যে, পরামর্শ করতে হবে আহকামের ওপর চিন্তা-ফিকির করার জন্য এবং মতামত প্রদান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। মজলিসের কোনো মতের ওপর সিদ্ধান্ত দেওয়া সব সময় আবশ্যক নয়; বরং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া ও ফয়সালা দেওয়ার সুযোগ ও অবকাশ ইসলামি শরিয়তে রয়েছে।

তিন. নবিজির ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওসিলা দিয়ে বরকত কামনা করা

আমরা পড়েছি, উরওয়া ইবনে মাসউদ হুদাইবিয়ায় সাহাবায়ে কিরামের চলাফেরা, ওঠাবসা ইত্যাদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখে কুরাইশদের কাছে গিয়ে বলেছিল—

'মুহাম্মাদ যখন খকখক করে থুতু ফেলে, তখন তা তার কোনো না কোনো অনুসারীর হাতের তালুতে গিয়ে পড়ে। সেই থুতু তারা মনোবিশ্বাসের প্রাবল্যে নিজেদের চেহারা এবং গায়ে মেখে নেয়। তাঁর যেকোনো নির্দেশ বাস্তবায়নে তারা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। অজুতে তাঁর হাত-মুখ ধোয়া পানি নেওয়ার জন্য তারা রণাঙ্গনে যুদ্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর কথা শুনতে সবাই নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এমনকি তার আদব ও সম্মানের দিক বিবেচনা করে তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে কেউ তাকায়ও না। তারা তাঁকে কিসরা-কাইসার ও নাজ্জাশির সামনে প্রদর্শিত সম্মানের চেয়েও বেশি তাজিম করে।'

উরওয়া ইবনে মাসউদ কুরাইশদের সামনে যেই চিত্র অঙ্কন করেছিল, সেটা এমন জিন্দা ও অমর ছবি—যা দ্বারা স্পষ্ট হয়, নবিজির প্রতি সাহাবায়ে কিরামের কত গভীর প্রেম এবং প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল! কাজেই প্রতিটি মুসলিমেরই এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সম্পর্কে সম্যক অবগতি অপরিহার্য।

প্রথম কথা হলো—সাহাবিদের আচরণ থেকে বোঝা যায়, নবিজির প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা ও হৃদ্যতা ছাড়া আমাদের ঈমানের কোনো মূল্যই নেই এবং আমাদের ঈমানও পূর্ণ হবে না। আর ভালোবাসা বা মহব্বত শুধুই যুক্তিনির্ভর বা মর্মগত কোনো বিষয় নয়; বরং ভালোবাসা এমন অনুভবের নাম, যার প্রভাব হৃদয়পটে অঙ্কিত হয়ে যায়। ফলে একজন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের প্রতিটি বস্তুই মনঃপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে নেয় এবং তার সান্নিধ্য লাভের আশায় সারাক্ষণ চেষ্টারত থাকে; ঠিক উরওয়া ইবনে মাসউদ সাহাবিদের কাজকর্মের চিত্র যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছে সেভাবেই।

দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়—নবিজির ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট ও ছোঁয়া লাগা বিষয়াদি দ্বারা বরকত ও মঙ্গল কামনা করা জায়িজ ও শরিয়তসম্মত। অসংখ্য সহিহ হাদিস দ্বারা সুপ্রমাণিত, সাহাবায়ে কিরাম নবিজির চুল মুবারক, পবিত্র ঘাম, অজুর পানি, বরকতময় থুতু এবং তাঁর পানি পান করার পাত্র ইত্যাদি দিয়ে বরকত হাসিল করেছেন। কয়েকটি হাদিস তো পেছনেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে আরেকটি বিষয় রয়েছে, তা হলো—পর্যালোচনায় যখন জানা গেল, নবিজির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দ্বারা বরকত কামনা করা এবং সেগুলোকে ওসিলা হিসেবে পেশ করা জায়িজ ও মুসতাহাব, তখন সরাসরি তাঁকে ওসিলা বানানো বা তাঁর দোহাই দিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে কল্যাণ কামনা উত্তমভাবে জায়িজ এবং সর্বোত্তম আমল হওয়ার কথা। এটা আরও ভালো করে এবং পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়। এক্ষেত্রে দুনিয়াতে তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কোনো পার্থক্যকারী ব্যাপার নয়। তার মাধ্যমে বরকত হাসিল বা তাঁকে ওসিলা বানানোয় তাঁর বাহ্যিক জীবন শর্ত নয়। এটা *সহিহ বুখারির* 'বাবু শিয়ারি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' (পরিচ্ছেদ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদর্শনাবলি) থেকে প্রমাণিত।

কিন্তু আফসোস! দিবালোকের মতো এমন জ্বলন্ত ও জাজ্বল্যমান দলিল-প্রমাণ থাকতেও সমাজের কিছু লোককে গোমরাহ দেখা যায়। যাদের হৃদয়ে নবিজির প্রতি ভালোবাসার প্রদীপ নিভে গেছে। তাই দুনিয়াতে নবিজির অনুপস্থিতি তাদের মতে ওসিলা বানানোর প্রতিবন্ধক। তারা দলিল দেয়—নবিজির ওফাতের সাথে সাথে তাঁর প্রভাব কার্যকর হওয়ার শক্তি ও ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেছে। ফলে এখন তাঁর ওসিলা দেওয়ার অর্থ হলো এমন কিছু দিয়ে ওসিলা দেওয়া, যার কোনো প্রভাব নেই। (নাউজুবিল্লাহ) তাদের এই ভ্রান্ত দলিল নিঃসন্দেহে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিরই প্রতীক।

আসলে তাদের বক্তব্য ও দলিল তো তখনই যথার্থ হতো, যখন কেউ নবিজির জীবদ্দশায় তাঁর সংশ্লিষ্ট বস্তু ও বিষয়াদির সত্তাগত কোনো প্রভাব প্রমাণ করতে চাইত। কারণ, তখনই বলা যেত, তিনি এখন দুনিয়াতে না থাকায় তাঁর সত্তাগত প্রভাবও আর বাকি নেই; কিন্তু বিষয়টি তো এমন নয়। কোনো মুসলিমই সত্তাগত প্রভাবকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও দিকেই সম্বন্ধ করে না। কারণ, এর বিপরীত আকিদা পোষণ করা স্পষ্ট কুফরি। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত।

তাঁকে ওসিলা বানানো বা তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দিয়ে বরকত কামনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সরাসরি তাঁর সত্তাকেই প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়; বরং প্রকৃত ও মূল কারণ হলো—তিনি যেহেতু নিঃশর্তভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে কুল মাখলুকাত থেকে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান এবং তিনি গোটা মানবজাতির পথপ্রদর্শকরূপে আগমন করেছিলেন, তাই আশা করা যায়, তাঁর ওসিলা দিলে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিল করা যাবে। কারণ, তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে কুল মাখলুকাতের জন্য রহমতে কুবরা অর্থাৎ সর্ববৃহৎ রহমত। যেমন : হাদিস শরিফে আছে—এক অন্ধ সাহাবি নবিজির ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করলে তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।[৬৭]

এই মর্ম বুঝেই সাহাবায়ে কিরাম ওসিলা প্রদানের ব্যাপারে একমত ছিলেন। তাই নবিজিও তাদের নিষেধ বা বারণ করতেন না। পেছনের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—আল্লাহওয়ালা ও খোদাভীরুদের ওসিলা দিয়ে রোগমুক্তি কামনা এবং আহলে বাইতের ওসিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা মুসতাহাব ও নেকির কাজ। এ মতের ওপর জমহুর আয়িম্মা ও ফুকাহার ঐকমত্য রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাওকানি

---

৬৭ সূত্র : *জামি তিরমিজি, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু বাইহাকি* প্রমুখ।

(১১৭৩-১২৫৫ হি.), ইবনে কুদামা হাম্বলি (৫৪১-৬২০ হি.) ও সানআনি (১০৯৯-১১৮২ হি.) রহ. প্রমুখ।

এত চাক্ষুষ ও প্রোজ্জ্বল দলিল-প্রমাণের পরও ওসিলা গ্রহণকে নবিজির জাগতিক ও পার্থিব জীবনের সাথে শর্তযুক্ত করে পার্থক্য সৃষ্টি এমনই আজব ও ভ্রান্ত বিষয়; যার ভিত্তিই হলো বদ নিয়ত এবং যা নিয়ে আলোচনারও কোনো অবকাশ এখানে নেই।

চার. বসা লোকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা

যেমন : আগে সন্ধিচুক্তির বিবরণে গিয়েছে, মুগিরা ইবনে শুবা রা. বর্ম পরিহিত এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে নবিজির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উরওয়া যখনই নবিজির দাড়ি মুবারকের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, তখনই তিনি তার হাতের ওপর তরবারির হাতল দিয়ে মৃদু আঘাত করছিলেন এবং নবিজির দাড়ির দিকে হাত বাড়াতে নিষেধ করছিলেন; কিন্তু বনু কুরাইজার ঘটনায় এর ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। তাতে আছে উপবিষ্ট লোকের পাশে কারও দাঁড়িয়ে থাকা জায়িজ নয়। কারণ, এটা অনারবদের প্রসিদ্ধ রীতি এবং শরিয়তে মুহাম্মাদি একে অপছন্দনীয় বলেছে। এটাই মূলত নবিজির ওই উক্তির প্রয়োগস্থল; যাতে তিনি ধমকির সাথে বলেছেন—নিজের সামনে মূর্তির মতো মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা যার মনের বাসনা হয়, সে যেন জাহান্নামকে আপন ঠিকানা বানিয়ে নেয়। সুতরাং প্রশ্ন আসে, তাহলে এই ঘটনায় এর বিপরীত কীভাবে হলো?

এর উত্তর হবে—সন্ধির ঘটনা হাদিসের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার বাইরে। কারণ, কখনো কখনো প্রেক্ষাপটের খাতিরে হুকুমে ব্যতিক্রমতা আসে। তাই বিশেষ অবস্থায় বসা লোকের সামনেও দাঁড়িয়ে থাকার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ কোনো মুসলিম শাসক বা নেতার সাক্ষাতে শত্রুপক্ষের কেউ এলে তার অনিষ্ট থেকে শাসক বা নেতার হিফাজতের উদ্দেশ্যে কোনো সৈনিক বা কোনো বাহিনীর দাঁড়িয়ে থাকা থাকা অবৈধ নয়। কারণ, তখন এর উদ্দেশ্য হয় ইসলামের ইজ্জত ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জানমাল হিফাজত করা।[৬৮]

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে শরিয়তের বিরোধিতা করে এ কাজ করা জায়িজ নয়। কারণ, মৌলিকভাবে কাজটি তাওহিদ ও ইসলামি আকিদার পরিপন্থি। এর মতো ব্যতিক্রম হুকুমের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে উহুদের যুদ্ধে। ঘটনাটি আবু

---

৬৮ *জাদুল মাআদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৪

দুজানা রা. থেকে বর্ণিত; সেখানে আরও বলা হয়েছে—এমনিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ভাব দেখিয়ে অহংকার ও গর্ব করে বুক ফুলিয়ে চলা নিষেধ। তবে যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে বীরদর্পে চলা জায়িজ ও কাম্য। দলিলস্বরূপ বলা হয়—উহুদের প্রান্তরে নবিজি আবু দুজানা রা.-এর হাতে তরবারি তুলে দিলে তিনি বীরদর্পে এগিয়ে যান। তাকে দেখে নবিজি বলেন—এভাবে মাথা উঁচু করে চলা আল্লাহর কাছে একেবারে অপছন্দনীয়। তবে এমন জায়গাতেই (রণাঙ্গনেই) শুধু জায়িজ।

পাঁচ. অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সন্ধির বৈধতা

উলামা ও ফুকাহায়ে কিরাম হুদাইবিয়ার সন্ধির আলোকে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি চুক্তির বৈধতা দিয়েছেন। তারপর এই সন্ধি বিনিময় ছাড়া যেমন হতে পারে, তেমনি কোনো কিছুর বিনিময়েও হতে পারে। যেমন—হুদাইবিয়ার সন্ধি বিনিময়হীন ছিল। অনুরূপ কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও সমস্যা নেই, জায়িজ হবে। কারণ, বিনিময় ছাড়া যখন এই সন্ধি জায়িজ, তখন বিনিময় নিয়ে করা তো উত্তম পন্থায় জায়িজ। তবে যদি এই শর্তে হয় যে, মুসলিমরা অমুসলিমদের কোনো বিনিময় দেবে, তাহলে জমহুর আলিমগণের মতে জায়িজ হবে না। কেননা, এতে মুসলিমদের লাঞ্ছনা ও ক্ষতি সুস্পষ্ট। পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর কোথাও এর কোনো প্রমাণ নেই।

অবশ্য আয়িম্মায়ে কিরাম এ-ও বলেছেন, কখনো যদি নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, বিনিময় না দিলে মুসলিমদের মেরে ফেলবে বা বন্দি করবে, তাহলে সম্পদের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার অবকাশ রয়েছে। যেমন—মুসলিম কয়েদি মালের বিনিময়ে কাফিরদের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হতে পারবে। এটা তার জন্য জায়িজ।

ছয়. সন্ধির সময় নির্ধারণ

ইমাম শাফিয়ি (১৫০-২০৪ হি.) ও ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হি.) রহ.-সহ আরও কয়েকজন ইমামের মতে, যুদ্ধবিরতি বা সন্ধিচুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা কাম্য। আর সেই নির্দিষ্ট সময়টা দশ বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশি হওয়া অনুচিত। কারণ, নবিজি কুরাইশদের সাথে দশ বছরের চুক্তি করেছিলেন।

সাত. সন্ধির শর্ত

যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও অংশগুলোকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিবেচনায় দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

০১. সহিহ বা শুদ্ধ শর্ত : সহিহ শর্ত সেগুলো, যেই শর্তগুলো কুরআন-সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিপরীত নয়। যেমন—চুক্তির সময় কাফিরদের পক্ষ থেকে শর্ত জুড়ে দেওয়া, চুক্তির সময় কাফিররা কিছু অর্থকড়ি দেবে অথবা প্রয়োজনের সময় মুসলিমদের সাহায্য করবে ইত্যাদি। এগুলো সহিহ শর্ত। অনুরূপ শর্ত করা যে, কাফিরদের থেকে কেউ মুসলিম হয়ে চলে এলে শর্তের নির্দিষ্ট সময়ে তাকে গ্রহণ বা বর্জন করা হবে না। ইমাম শাফিয়ি রহ. ছাড়া বাকি আয়িম্মায়ে কিরাম এই শেষ শর্তটিকে বিনা শর্তে সহিহ বলেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন—তাকে কেবল তখনই ফিরিয়ে আনার সুযোগ আছে, যখন কাফিরদের বেষ্টনীতে এই নওমুসলিমের এমন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আটক হয়, যাদের হিফাজতের দায়িত্ব তার কাঁধে। অন্য কেউ মুসলিম হয়ে এলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেন—নবিজি কুরাইশদের সুবিধার্থে এই শর্তটি মেনে নিয়েছিলেন। কারণ, নওমুসলিমদের আত্মীয়স্বজনও তখনও মক্কায় ছিল।

০২. বাতিল বা অশুদ্ধ শর্ত : বাতিল বা অশুদ্ধ শর্ত হলো—যেটা শরিয়তসিদ্ধ কোনো হুকুমের পরিপন্থি হয়। যেমন—শত্রুপক্ষ থেকে আগত মুসলিম নারী বা তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত করা। অথবা মুসলিমদের সম্পদ-সমরাস্ত্র ইত্যাদি যুদ্ধের সময় কাফিরদের সরবরাহ করার শর্ত করা। এসব শর্ত অশুদ্ধ ও বাতিল। এগুলোর অশুদ্ধতার সরাসরি দলিল হলো নবিজির ওই আমল—যা তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় করেছিলেন। কয়েকজন নারী মুসলিম হয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন এবং এটা কুরআনে বর্ণিত।

একটি প্রশ্ন

এখানে প্রশ্নের অবতারণা হয়, সন্ধিতে তো নবিজি কুরাইশদের এই শর্তের ওপর রাজি হয়েছিলেন, কেউ মুসলিম হয়ে মদিনায় চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং এই নারীদেরও ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি শর্ত মোতাবেক ছিল; কিন্তু নবিজি তো ফিরিয়ে দেননি। তবে কি তিনি শর্ত ভঙ্গ করেছিলেন?

প্রশ্নের উত্তর

এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো—সন্ধিচুক্তিতে শুধু পুরুষদের কথা ছিল। নারীদের নয়। প্রবল সম্ভাবনা ছিল যে, এই সন্ধি হচ্ছে পুরুষদের ব্যাপারে। অবশ্য এ ছাড়া আরও একটি বাস্তব কথা হলো, নবিজির যেকোনো কাজে যতক্ষণ কুরআনে কারিমের সত্যায়ন-সমর্থন অথবা খণ্ডন নাজিল না হতো, ততক্ষণ তা শরয়ি হুকুমের পর্যায়ে উন্নীত হতো না। অনুরূপ কখনো কখনো তাঁর কোনো কাজে কুরআনে কারিম নীরবতা পালন করত। এটাও তাঁর কর্মের সত্যায়নের একটি আলামত। সন্ধির সকল অংশকে কুরআনে কারিম সত্যায়ন করেছে। তবে নারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠিন ও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাই নবিজি তাদের সাদরে বরণ করে নেন এবং কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাননি।

আট. হজ-উমরাহর পথে বাধা এলে করণীয়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে উমরাহর নিয়তে মক্কা যাচ্ছিলেন। পথমধ্যে হুদাইবিয়া অতিক্রম করতে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। তারপর তিনি সন্ধি স্থাপন শেষে উমরাহ পালন না করা সত্ত্বেও সেখানেই ইহরাম খুলে ফেলেন। কুরবানি করেন এবং হলক করিয়ে নেন। নবিজির এই আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো—যদি কাউকে হজ-উমরাহয় যেতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সে বাধাপ্রাপ্ত স্থানেই কুরবানি করবে। হলক করাবে এবং শেষে ইহরাম খুলে ফেলবে।

আরও সাব্যস্ত হলো, হজ-উমরাহ যদি নফল হয়, তাহলে এর কাজাও লাগবে না। অবশ্য হানাফি ফুকাহায়ে কিরাম এতে দ্বিমত পোষণ করেন। তাদের মতে, বাধাপ্রাপ্ত হজ বা উমরাহর কাজা আদায় করা ওয়াজিব। দলিলস্বরূপ তারা বলেন—আগের বছর নবিজির সাথে যতজন সাহাবি উমরাহর উদ্দেশ্যে এসে বাধাগ্রস্ত হন, তাদের মধ্যে মৃত্যুবরণকারী ও খাইবার রণাঙ্গণের শহিদগণ ছাড়া বাকি সবাই পরের বছর কাজা আদায়ের জন্য আবার আসেন।

সুতরাং বোঝা যায়—কাজা যদি ওয়াজিব না হতো, তাহলে তারা সবাই আবার আসতেন না।

* * *

গাজওয়ায়ে খাইবার[৬৯]

খাইবার প্রান্তর

হুদাইবিয়া সন্ধির পর নবিজি খাইবার অভিমুখে রওনা হন। খাইবারের দিকে আর্মি-মার্চ হয় সপ্তম হিজরির মহররম মাসে। খাইবার একটি বড়ো নগরী। বড়ো বড়ো সব দুর্গ ও বিস্তৃত ফসলি জমির এলাকা। নগরটি মদিনার উত্তরে একশ মাইল দূরে বৃহত্তর শামের দিকে অবস্থিত।

যুদ্ধের সৈন্যসংখ্যাও নবিজির দুআ

এই অভিযানে নবিজির সাথে পদাতিক ও আরোহী সৈন্য, সব মিলিয়ে মোট ১৪০০ সাহাবি অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৭০] ইবনে হিশামের বর্ণনায় এসেছে—

নবিজি খাইবারের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বাহিনীর উদ্দেশে বলেন—'থামো।' সাহাবিগণ থেমে যাওয়ার পর তিনি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে দুআ করেন—'হে আল্লাহ, আসমানের রব, আসমানের ছায়াতলে আশ্রিত সৃষ্টির রব, হে জমিনের রব, জমিনের বুকে বিচরণকারী সকল সৃষ্টির রব, হে শয়তানের প্রভু, শয়তানি ষড়যন্ত্রের শিকার

---

৬৯ লেখক মদিনা থেকে খাইবারের দূরত্ব ১০০ মাইল মতো লিখেছেন। তবে আরও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে এর দূরত্ব মদিনা থেকে ৬০-৮০ মাইল বলা হয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিপরীতে বিপুলসংখ্যক ইহুদি যোদ্ধা ছিল। তাদের প্রায় ১৪ হাজার যোদ্ধা এতে অংশগ্রহণ করে। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে খাইবারে মুসলিমরা বিজয়ী হন। এই যুদ্ধে মুসলিমদের ২০ জনের মতো শাহাদাত বরণ করেন। এবং ৯৩ জন ইহুদি নিহত হয়। যুদ্ধটি ৭ম হিজরিতে ঘটেছিল। সূত্র : *ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ*, সাদিক ফারহান; প্রকাশক, মাকতাবাতুল আসলাফ।

৭০ অন্যদিকে ইহুদিদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০ হাজারেরও বেশি। বনু গাতফান মিলিয়ে তারা প্রায় ১৪ হাজার ছিল। সূত্র : *ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ*, সাদিক ফারহান : ৯৬; প্রকাশক, মাকতাবাতুল আসলাফ।

সকল পথহারা লোকদের প্রভু, হে বাতাসের রব, বাতাসে ভাসমান ও উড্ডয়মান পাখপাখালি ও সকল বস্তুর রব, আমরা আপনার কাছে এই নগরীর কল্যাণ, এর অধিবাসীদের কল্যাণ এবং এতে স্থিত-অবস্থিত সবকিছুর কল্যাণ কামনা করছি। পাশাপাশি এই নগরীর অকল্যাণ, এর অধিবাসীদের অকল্যাণ এবং এতে বিদ্যমান যাবতীয় বস্তুর অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।'

দুআ শেষ হলে এরপর নবিজি তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন—'এবার তোমরা এগিয়ে যাও।'

ফজরের আগে হামলা করতেন না

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ অভ্যাস ছিল, তিনি ভোরের আলো ফোটার আগে কোনো সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করতেন না। কোথাও আজানের শব্দ শুনলে হামলা থেকে বিরত থাকতেন। আজানের শব্দ না পেলে হামলা করতেন। এখানেও তিনি রাত কাটার অপেক্ষা করে সকালে আজান না পেয়ে হামলা করেন।

তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে পান, খাইবারের ইহুদি কৃষকরা মাঠের উদ্দেশ্যে কোদাল-কাস্তে-টুকরি ইত্যাদি নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে। নবিজিকে তাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্রই তারা চিৎকার দিয়ে ওঠে—'এটা মুহাম্মাদ ও তাঁর সেনাবাহিনী।' এ বলে তারা পেছনে ফিরে যায় এবং পজিশন ঠিক করে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়।

নবিজি বলেন—'আল্লাহু আকবার। খাইবার বরবাদ ও বিধ্বস্ত হওয়ার পথে। কারণ, আমরা যখন রণাঙ্গনে কোনো গোত্রের মোকাবিলায় নেমেছি, তখন তাদের সকালটা খুবই মন্দ ও অশুভ হয়েছে। আর এরা তো প্রথমেই ভয় পেয়ে গেছে এবং যুদ্ধের অগ্রিম বার্তা পেয়ে গেছে!'[৭১]

ইবনে সাদের বর্ণনায় আছে—নবিজি সেনাবাহিনীকে যাবতীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে পুরো বাহিনীকে আলাদা আলাদা পতাকাতলে ছোটো ছোটো প্লাটুনে ভাগ করেন। যেন প্রতিটি প্লাটুন সব দুর্গে একযোগে হামলা করে সবগুলো দুর্গ নিজেদের কবজায় নিয়ে নেয়।

---

৭১ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

যুদ্ধ শুরু হয়। খাইবারবাসী দুর্গের ফটক বন্ধ করে ভেতরে মোর্চা করে। কেল্লার ভেতরের খোলা জায়গায় লড়াই শুরু হয়। সাহাবায়ে কিরাম একের পর এক কেল্লা জয় করতে করতে শেষমেশ দুই কেল্লায় গিয়ে থামেন। ওয়াতিহ ও সুলালিম। নবিজি দশ দিন নাগাদ কেল্লা দুটি অবরোধ করে রাখেন।

কে সেই সৌভাগ্যবান

ইমাম আহমাদ, ইমাম নাসায়ি, ইমাম ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস বুরাইদা ইবনে খতিব রা. থেকে বর্ণনা করেন—

এই দুই কেল্লার বিজয়াভিযানে নবিজি প্রথমে সিদ্দিকে আকবর রা.-কে সেনাপ্রধান বানিয়ে প্রধান ঝান্ডা তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি বীরবিক্রমে তুমুল লড়াইও করেছেন বটে; কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বিফল হোন। তিনি ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিন নবিজি ফারুকে আজম রা.-এর হাতে পতাকা তুলে দেন; কিন্তু তিনিও সফল হননি। অবশেষে নবিজি বলেন—'আগামীকাল এই পতাকা এমন একজনের হাতে তুলে দেবো, যার হাতে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দান করবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে তার রয়েছে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা।'

বুরাইদা রা. বলেন—সাহাবায়ে কিরাম এই রাতটি খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটান। অর্থাৎ, তারা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন—আগামীকাল কার কপালে যেন আল্লাহ এই সৌভাগ্য লিখে রেখেছেন!

সকাল হওয়ার সাথে সাথেই সকল সাহাবি নবিজির দরবারে উপস্থিত। প্রত্যেকের মনের বাসনা—আজকের এই বিজয় অর্জনের সৌভাগ্যটা যেন তার কপালে জোটে!

একসময় পিনপতন নীরবতা ভেঙে যায় নবিজির উচ্চারণে—'আলি কোথায়?' উত্তর এলো—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আলির চোখ উঠেছে।'

নবিজি বললেন—'ডেকে আনো আমার কাছে।'

আলি রা.-কে নিয়ে আসা হলে নবিজি পবিত্র মুখের কিছু লালা তার চোখে মেখে দেন এবং দুআ করেন। আলি রা. সাথে সাথেই সুস্থতা লাভ করেন এবং এমন স্বস্তি বোধ করেন—যেন চোখে কোনো সমস্যাই ছিল না। তারপর নবিজি ঝান্ডাটি তার হাতে তুলে দেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন—'ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাব?'

আক্রমণের পূর্বনির্দশনা

নবিজি বলেন—'তুমি ধীরেসুস্থে তাদের ময়দানে নামবে। তাদের সামনে ছাউনি ফেলবে। তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। এবং তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার হকগুলোও তাদের সামনে তুলে ধরবে। আল্লাহর কসম, আলি, আল্লাহ যদি তোমার ওসিলায় একজনকেও হিদায়াত দান করেন, তাহলে এটাই তোমার জন্য লাল উটের বহর থেকেও কয়েক গুণ উত্তম।'

তারপর আলি রা. সামনে অগ্রসর হন এবং আল্লাহ তায়ালা তার হাতে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন।[৭২]

পরাজিতদের আবদার রক্ষা

খাইবারের বিজিত ছোটো-বড়ো দুর্গ থেকে যেসব সম্পদ হাতে আসে, সব গনিমত বলে হিসাব করা হয়। উল্লিখিত দুই কেল্লা অবরোধকালে ভেতরের ইহুদিরা যখন নিশ্চিত বুঝতে পারে—তাদের পতন ও বরবাদি অনিবার্য, তখন তারা নবিজি বরাবর সন্ধির আবেদনপত্র পাঠায় এই মর্মে যে, আমরা আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে এখান থেকে চলে যাব এবং বাকি সব কিছু এখানে রেখে যাব; যদি আমাদের মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

নবিজি তাদের এই শর্ত কবুল করে সন্ধিচুক্তিতে সম্মতি দেন। তারপর তারা আবার আবদার জানায়—আমাদের জমিজমার চাষের অধিকার আমাদেরই দিয়ে রাখেন। আমরা এসব জমির খবরাখবর ভালো জানি। উত্তমভাবে এগুলো আবাদ করব। আর উৎপাদিত শস্য ও ফসলের অর্ধেক আপনাকে দেবো।

নবিজি এই আবদার রক্ষা করেন; তবে একটি শর্তের ওপর তিনি ইহুদিদের উদ্দেশ্যে বলে দেন—

> আমাদের পক্ষ থেকেও এই শর্ত থাকল যে, আমরা যখনই চাইব, তোমাদের এখান থেকে দেশান্তরও করতে পারব।[৭৩]

---

৭২ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

৭৩ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

হত্যাচেষ্টা

ইবনে ইসহাক বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ থেকে অবসর হলে জাইনাব বিনতু হারিসা নামের এক ইহুদি নারী একটি ভুনা বকরি হাদিয়াস্বরূপ নবিজির সামনে পেশ করে। তার স্বামীর নাম সালাম ইবনে মিশকাম। নবিজির আগমনের আগেই সে বকরির গোশতের নবিজির সবচেয়ে প্রিয় ও আকর্ষণীয় অংশের খোঁজ নিয়ে নেয় এবং সেই অংশে বেশি করে বিষ মিশিয়ে তারপর তা নবিজির সামনে রাখে। নবিজি এক লোকমা মুখে দিয়ে হালকা চাবানোর সাথে সাথে হাত উঠিয়ে নেন। তারপর বমি করে লোকমাটি ফেলে দেন। নবিজির সাথে বিশর ইবনে বারা নামক একজন সাহাবি ছিলেন। তিনিও এক লোকমা মুখে পুরে দেন; কিন্তু নবিজির মতো বমি করে ফেলতে পারেননি; বরং গিলে ফেলেন।

নবিজি বলেন—'এই হাড় আমাকে অবগত করেছে, এতে বিষ মেশানো হয়েছে।'

নবিজি সেই নারীকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলে সে বিষ মেশানোর কথা স্বীকার করে। নবিজি তাকে জিজ্ঞেস করেন—'তুমি এতে বিষ মেশালে কেন?

সে জবাব দেয়—'আমার জাতির ওপর আসন্ন বিপদ কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। আমি চিন্তা করে দেখলাম—আপনি যদি বাদশাহ হন, তাহলে তাদের মুক্তি মিলবে। আর যদি নবি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে আগেভাগেই অবগত করা হবে।' তার এই বক্তব্য শুনে নবিজি তাকে মাফ করে দেন। ওদিকে বিশর রা. সেই বিষের ক্রিয়ায় শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম জুহরি (৫০-১২৫) এবং সুলাইমান আত-তাইমি (৪৬-১৪৩) রহ. দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সাথে বলেন—এই নারী পরে মুসলিম হয়ে যান। অবশ্য এরপর বিশর রা.-এর হত্যার কিসাসস্বরূপ তাকে নবিজি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে সিরাত বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে সাদ বিভিন্ন বর্ণনা একত্র করে সারাংশ হিসেবে বলেন—নবিজি ওই নারীকে বিশর রা.-এর আত্মীয়দের হাতে তুলে দিলে তারাই তার থেকে কিসাস নেয়।

সহিহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে—নবিজি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি এ কাজে (অর্থাৎ আমাকে খুন করতে) কখনোই সক্ষম হবে না।'

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করেন—'ইয়া রাসুলুল্লাহ, এই ডাইনিকে কি আমরা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবো না?'

নবিজি জবাব দেন—'না।'

গনিমত বণ্টন

তারপর নবিজি খাইবারে প্রাপ্ত গনিমতের সকল সম্পদ সেনাবাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দেন। পদাতিকদের এক ভাগ, আরোহীদের দুই ভাগ। এই বণ্টনপদ্ধতি ইমাম বুখারি রহ. নাফে রহ. থেকে স্পষ্ট শব্দে বর্ণনা করেছেন। নাফে রহ. ব্যাখ্যা করে বলেন—কোনো সৈনিকের সাথে ঘোড়া থাকলে তাকে তিন ভাগ দেওয়া হতো। এক ভাগ তার, দুই ভাগ তার ঘোড়ার। যার সাথে ঘোড়া থাকত না, সে নিজের এক ভাগই পেত।

খাইবারের বন্দি নারীদের মধ্যে হারুন আ.-এর বংশধর সুফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে নবিজি তাকে আজাদ করে নিজ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। এবং তার আজাদ হওয়াকেই বিয়ের মোহর ধার্য করেন।[৭৪]

* * *

৭৪ সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম

জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর প্রত্যাবর্তন

নবিজি খাইবারে থাকাবস্থাতেই জাফর রা. কয়েকজন সঙ্গীসাথিসহ হাবশা (বর্তমান ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে আসেন এবং নবিজির সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ করেন। তার সাথে মোট ষোলোজন নারী-পুরুষ ছিলেন। আসার পথে ইয়ামানের কয়েকজনও তাদের সাথে যোগ দেন। নবিজি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে হাবশাফেরত মুসলিমদেরও গনিমতের মাল থেকে কিছু কিছু দেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, জাফর রা. নবিজির কাছে পৌঁছলে নবিজি তার দু-চোখের মাঝখানে কপালে চুমু খান। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন—আমি জানি না কোনটাতে আমি বেশি খুশি হয়েছি; খাইবার জয়ে, না তোমার প্রত্যাবর্তনে!

তারপর নবিজি মদিনায় ফেরত আসার ইচ্ছা করলে সেখানে তার পক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তা ও আমলা নিযুক্ত করেন। কথিত আছে—তিনি ছিলেন বনু আদির সাওয়াদ ইবনে গাজিয়্যাহ রা.। পরে তিনি খাইবারের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোন্নত খেজুর নিয়ে নবিজির দরবারে হাজির হন। নবিজি জিজ্ঞেস করেন—

আচ্ছা, খাইবারের সব খেজুরই কি এত উন্নত?

তিনি জবাব দেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, না। সব খেজুর এমন হয়, তা নয়। আমরা দু-তিন সা' (صاع) অনুন্নতমানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা'[৭৫] উন্নতমানের খেজুর নিই। আবার তিন সা'-এর বিনিময়ে দুই সা' নিই।

নবিজি বললেন—না, না। তোমরা এমন করবে না; বরং অনুন্নত মানের খেজুরের বিনিময়ে প্রথমে দিরহাম নেবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উন্নত মানের খেজুর কিনবে।[৭৬]

* * *

৭৫ **বিশেষ দ্রষ্টব্য :** শরয়ি এক সা' বর্তমানে তিন কেজি ১৪৯ গ্রাম ৮০ মিলিগ্রাম। এটা মুফতি মুহাম্মাদ শাফি রহ.-এর মত। সূত্র : *আল আওজানুল মাহমুদা* : ৫০; দারুল উলুম দেওবন্দের অনলাইন ফাতওয়া অবলম্বনে।

৭৬ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৭

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

আক্রমণাত্মক জিহাদের সূচনা

আমাদের উচিত প্রথমে এই গাজওয়ার স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা। তারপর এই গাজওয়া এবং আগের সব গাজওয়ার স্বরূপ-ধরন ও প্রকৃতি ইত্যাদিতে প্রাপ্ত পার্থক্য তুলে ধরা।

আগের সকল যুদ্ধের ভিত্তি ছিল প্রতিরক্ষামূলক লড়াই (ডিফেন্সিভ ব্যাটেলস)-এর প্রকৃতির ওপর। খাইবারের আগের সকল যুদ্ধে মুসলিমদের লক্ষ্য ও টার্গেট ছিল শুধু প্রতিরক্ষা এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ কঠিনভাবে প্রতিহত ও দমন করা—যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজার পরে গাজওয়ায়ে খাইবারই সেই যুদ্ধ; যেটার প্রকৃতি ছিল ব্যতিক্রম। আগের যুদ্ধগুলোর বিবেচনায় গাজওয়ায়ে খাইবারে বুনিয়াদি ও মৌলিক প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এই গাজওয়ার প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বুনিয়াদি পার্থক্য বোঝায়, হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে ইসলামি দাওয়াত নতুন ধাপে প্রবেশ করে এবং নতুন রূপে রূপান্তরিত হয়।

এটাই প্রথম যুদ্ধ, যেটাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অগ্রসর হয়ে ময়দানে যান এবং নিজেই যুদ্ধের সূচনা করেন। খাইবার ও আশপাশের ইহুদিদের অজান্তে এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের ওপর হামলা করেন; অথচ ইতঃপূর্বে ইহুদিরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথায় ও আচরণে কুকর্ম করে থাকলেও সরাসরি যুদ্ধ বা সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়নি।

যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ

এই গাজওয়া পরিচালনার অন্যতম কারণ ছিল ইহুদিদের ভিন্ন আঙ্গিকে এবং বলতে গেলে—কিছুটা কঠোরভাবে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান; যা মূলত আগেই

অন্যদের মতো নম্রতার সাথে তাদেরও দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাদের কুফরি ও একগুঁয়েমি, সত্য প্রত্যাখ্যান, অভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ও বৈরিতা এবং নবিজির মোকাবিলাকরণে মক্কার কাফিরদের উসতাদগিরি ইত্যাদি কারণে তাদের ওপর আগ বেড়ে হামলা চালানো হয়েছে। নতুবা এই যুদ্ধাভিযানের আগপর্যন্ত দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি-দর্শন দিয়ে তাদের মাঝেও ইসলামের দাওয়াত জারি ছিল। এ কারণেই নবিজি খাইবার এলাকার সন্নিকটে পৌঁছে কারও সাথে লড়াই ছাড়া এবং কাউকেই নিজের উপস্থিতি বুঝতে না দিয়েই নগরীর প্রধান ফটকের বাইরে ভোরের অপেক্ষায় রাত অতিবাহিত করেন। এবং সকালে আজানের শব্দ না আসলে শত্রু এলাকা বলে নিশ্চিত হয়ে হামলা ও লড়াইয়ের নির্দেশ দেন।

কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ও সাধারণ অভ্যাস ছিল, কোনো এলাকায় হামলার আগে সেই এলাকার সন্নিকটে এক রাত কাটাতেন এবং ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। জনপদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে এলে হামলার পরিকল্পনা বাদ দিতেন। আজানের শব্দ না পেলে হামলা করতেন। কারণ, এভাবে তিনি যাচাই করতেন, জনপদবাসী মুসলিম না কাফির? আজানের শব্দ না পেয়ে যখন জনপদবাসীর কাফির হওয়া বলে নিশ্চিত হতেন, তখনই হামলা করতেন।

ব্যাখ্যাকৃত এই কারণটি আরও ভালো করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলি রা.-এর একটি প্রশ্ন এবং নবিজির উত্তর প্রদানে। অবিজিত দুর্গ দুটি জয়ের সময় নবিজি তার হাতে ঝান্ডা তুলে দিয়ে বলেছিলেন—তুমি ধীরে সুস্থে তাদের ময়দানে নামবে। তাদের সামনে ছাউনি ফেলবে। তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবে এবং তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার হকগুলোও তাদের সামনে তুলে ধরবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নিষ্কলুষ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—এই যুদ্ধাভিযানের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের দাওয়াত।

* * *

গাজওয়ায়ে খাইবার-সংশ্লিষ্ট আহকাম

উলামায়ে কিরাম গাজওয়ায়ে খাইবারের ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মাসয়ালা উদ্ভাবন করেছেন। সংক্ষেপে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসয়ালা উল্লেখ করা হলো—

এক. ইসলামের দাওয়াতপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের ওপর আকস্মিক হামলার বৈধতা

যেসব গোত্র বা এলাকায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, তাদের নতুন করে দাওয়াত না দিয়ে এবং নিজেদের অভিযানের গন্তব্য বুঝতে না দিয়ে সরাসরি এবং হঠাৎ আক্রমণ করে বসা জায়িজ।

শাফিয়ি ও জমহুর ফুকাহার মাজহাব এটিই। যেমনটি এই খাইবার অভিযানে ঘটেছে। তবে এ জাতীয় হামলা তখনই জায়িজ হবে, যখন ইসলামের দাওয়াত দাওয়াতের পদ্ধতিতে পৌঁছানো হবে। এই শর্তের ওপর সকল ফকিহর ঐকমত্য রয়েছে।

দুই. গনিমতের মাল বণ্টনে শরয়ি পদ্ধতি

যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গনিমতের মাল বলে। এই সম্পদ বণ্টনে শরিয়তের বিধান হলো প্রাপ্ত সম্পদ থেকে খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশ আলাদা রেখে বাকি চার অংশ সবার মাঝে বণ্টন করে দেওয়া।[৭৭]

---

৭৭ ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, অশ্বারোহীকে মোট দুই ভাগ দেওয়া হবে। এক ভাগ তার এবং আরেক ভাগ ঘোড়ার; কিন্তু খাইবারে নবিজি যেই বণ্টন করেছেন, তাতে তাঁর এই মতের কোনো সমর্থন পাওয়া যায়

এক্ষেত্রে পদাতিক সৈন্যকে এক ভাগ আর আরোহীকে তার এক ভাগ এবং তার বাহনের জন্য দুই ভাগ—মোট তিন ভাগ দিতে হবে। বাকি এক-পঞ্চমাংশ মাল নিম্ন পদ্ধতিতে বণ্টন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

তোমরা আরও জেনে রাখো, বস্তুসামগ্রীর মধ্যে গনিমত হিসেবে তোমরা যা পাবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসুলের, আত্মীয়স্বজনদের, এতিমদের, হতদরিদ্রদের এবং পথচারীদের..'[৭৮]

তিন. যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিক ব্যতীত রণাঙ্গনে উপস্থিত অন্যদেরও গনিমতের মাল দেওয়ার বৈধতা

এটা তখনই জায়িজ হবে, যখন আসল ও প্রকৃত হকদার যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকরা অনুমতি দেবে। হাবশা ও ইয়ামান থেকে সঙ্গীসাথি-সহ জাফর রা. যখন ফিরে আসেন এবং খাইবারে নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন নবিজি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেই তাদের গনিমত থেকে কিছু কিছু প্রদান করেছেন।

পরিষ্কার কথা হলো—*বুখারি শরিফ*-এর বর্ণনায় এ ব্যাপারে সবার অনুমতি লাভের শর্ত বর্ণিত না থাকলেও ইমাম বাইহাকি (৩৮৪-৪৫৮ হি.) রহ.-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ আছে—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনিমতের মাল বণ্টনের আগে সাহাবায়ে কিরামের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন এবং তারাও প্রদানের ব্যাপারে নিজেদের সম্মতি জানিয়েছিলেন।

এর ওপর ভিত্তি করেই নবিজি তাদের গনিমতে শরিক করেছেন। এই বণ্টন সবাই কবুল করেন। কারণ, ন্যায়পরায়ণ বণ্টনকারীর পক্ষ থেকে উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণযোগ্য।

না। রাসুলুল্লাহ সা.-এর ওফাতের পরে বর্তমানে এই এক-পঞ্চমাংশ মুসলিমদের সেবায় ব্যয় করা হবে। এটাই হানাফি-শাফিয়ি ফকিহদের মত।

আবার হানাফি ফকিহদের এই বক্তব্যও আছে—খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছাধিকার রয়েছে, তিনি যেখানে এবং যেই খাতে ব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেখানে করতে পারবেন।

আদতে তাদের আগের যৌথ মতের সাথে এই মতের তেমন কোনো পার্থক্য বা দূরত্ব নেই।

৭৮ সুরা আনফাল, আয়াত : ৪১

ইমাম বায়হাকি রহ.-এর উল্লিখিত পরামর্শের দিকটি আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় হয় এভাবে, এই খাইবারেই যুদ্ধের পর আবান ইবনে সায়িদ নামের এক সাহাবি হাজির হন। নবিজি তাকে নজদ অভিমুখে এক বাহিনীর সাথে পাঠানোর সময় তিনি নবিজির কাছে আবদার করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, খাইবারের এই গনিমত থেকে কি আমাকেও কিছু দেবেন? কিন্তু নবিজি তাকে তাতে শরিক করেননি।

উপর্যুক্ত দুই বর্ণনার সমন্বয়কৃত ফলাফল হলো—জাফর রা. ও তার সাথিদের গনিমত প্রদানে সৈনিকদের সম্মতি ও অনুমতি ছিল; কিন্তু আবান ইবনে সায়িদ রা.-এর ব্যাপারে অনুমতি ছিল না।[৮]

গনিমতসংক্রান্ত আধুনিক একটি প্রশ্ন

এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয়—বর্তমান সময়ে তো সামরিক সৈনিক ও বাহিনীর জন্য বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সরকারি অনুদান নির্ধারিত রয়েছেই। ফলত প্রাপ্ত গনিমত তাদের দেওয়ার বাহ্যিক কোনো কারণ নেই বললেই চলে। কাজেই বর্তমানে যুদ্ধপরবর্তী বিজয়ী সৈনিকদের মাঝে গনিমত বণ্টনের ধরন বা পদ্ধতি কী হবে?

প্রশ্নের উত্তর

এই প্রশ্নের উত্তর হলো—পেছনের বিভিন্ন বর্ণনায় জানা গিয়েছে, ইমামে আজম আবু হানিফা (৮০-১৫০ হি.) ও ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.) রহ.-এর মতে, স্থাবর সম্পত্তি সৈনিকদের মাঝে বিতরণ করা হবে না। যেমন : এ বিষয়ে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, অবশ্যপ্রয়োজন ও কল্যাণের খাতিরে স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য সম্পদও বিতরণ করতে পারবে।

আর অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ সৈনিকদের মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি অনুযায়ী শরিয়ত নির্ধারিত অংশ হিসেবে বণ্টন করে দেবে। তবে বর্তমান সময়ে যুদ্ধের নানা উপায় ও বিভিন্ন পদ্ধতি সামনে রেখে সৈনিকদের স্তরবিন্যাস অনুযায়ী কমবেশি করে বণ্টন করবে।

এ যুগে যুদ্ধের নানা দিক বিচার করে সৈনিকদের র‍্যাংক অনুযায়ী গনিমত বণ্টন করায় বাধা নেই। আবার প্রত্যেক সৈনিকের বেতন-ভাতা-অ্যালাওয়ান্স ইত্যাদির মধ্যে বাড়ানো ও ভাতা-বৃদ্ধির সুরতে তাদের অংশ বণ্টন করাও নিষিদ্ধ নয়।

---

৭৯ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪০-৩৪৯

কিন্তু যত কিছুই হোক না কেন, গনিমতের মাল সৈনিকদের মাঝে বিতরণ না করে নিজে খেয়ে ফেলা বা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখা কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যই জায়িজ বা অনুমোদিত নয়।

চার, 'মুসাকাত' চুক্তির বৈধতা

এর স্বরূপ হলো—জমি বা বাগানের মালিকের কারও সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, সে জমি বা বাগানে পানি সেচ দেবে, দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর বিনিময়ে মালিক তাকে উৎপাদিত ফল বা শস্যের নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করবে।

ইমাম মালিক, শাফিয়ি ও আহমাদ রহ.-এর মতে এই চুক্তি জায়িজ। তাদের সরাসরি দলিল খাইবারে কৃত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ও কর্ম। কারণ, তিনি বিজয় লাভ করে খাইবার ও তার আশপাশের জমিগুলো কবজা করেন এবং অধিবাসী ইহুদিদের সাথে এই চুক্তি করেন।

অন্যদিকে ইমামে আজম রহ. এ জাতীয় চুক্তির পক্ষে নন। তিনি বলেন—এ জাতীয় চুক্তির কোনো নজির হাদিসের ভান্ডারে নেই। আর আলোচ্য খাইবারের ঘটনা দিয়ে এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করাও সঠিক নয়। কারণ, নবিজি খাইবারবাসীর সাথে যেই আলোচনা করেছিলেন, সেটা বাহ্যিকভাবে চুক্তি মনে হলেও মূলত তা গোলামের প্রতি মনিবের দয়া ও দান। কারণ, যুদ্ধরীতি অনুযায়ী নবিজির হাতে খাইবারবাসীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তারা মূলত নবিজির গোলাম-বাঁদি হয়ে যায়। আর গোলাম-বাঁদির জানমাল সবই মনিবের। অতএব, এখন যদি মেনে নেওয়া হয়—তাদের সাথে নবিজি বিনিময় চুক্তি করেছিলেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়—নবিজি নিজের মালের ওপর নিজের সাথেই চুক্তি করেছেন, যা কিনা অযৌক্তিক।
সুতরাং বোঝা গেল, তিনি তাদের প্রতি করুণা করে উৎপাদিত ফল বা শস্যের অর্ধাংশ প্রদানের ওয়াদা দিয়েছিলেন মাত্র।

অন্যদিকে সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ, ১১৩-১৮২ হি., ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ১৩১-১৮৯ হি.) ইমামে আজম রহ.-এর সাথে মতবিরোধ করেছেন এবং তাদের মতের সাথে জমহুর ফুকাহা একমত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মতেও এ জাতীয় চুক্তি করায় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

মোটকথা, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো—এ জাতীয় চুক্তি করা জায়িজ।

দ্বিতীয় মতভেদ হলো—চুক্তির সীমারেখা নিয়ে। অর্থাৎ এই চুক্তি কি শুধু খেজুর ও আঙুর গাছে সীমাবদ্ধ, না সব ধরনের গাছে করা যাবে?

কারণ, খাইবারের গাছগুলো প্রায় সবই ছিল খেজুর ও আঙুরের। আর নবিজি যেহেতু সেগুলোর ওপরই চুক্তি করেছিলেন, তাই ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে ইখতেলাফ ও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারেও ব্যাপক আলোচনার পরে শেষ কথা হলো—অধিকাংশ ফকিহর মতে, সব ধরনের গাছে মুসাকাত চুক্তি জায়িজ। কারণ, এতে ব্যাপকতা রয়েছে।

ভাগে জমি চাষের হুকুম

যাহোক, এতক্ষণ আলোচনা গেল বাগানে পানি সেচ দেওয়া এবং দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের বিনিময় চুক্তির বিষয়ে; কিন্তু 'ভাগে জমি চাষ'-কে অধিকাংশ ফকিহ নিষেধ বলেছেন। তাদের মধ্যে শাফিয়ি ফুকাহায়ে কিরামও রয়েছেন।

'ভাগে জমি চাষ'-এর স্বরূপ হলো, জমির মালিক কারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো সে জমিতে চাষাবাদ করবে, জমির দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর বিনিময়ে মালিক তাকে ওই জমির উৎপাদিত ফসল বা শষ্যের নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করবে।

জমহুর শাফিয়ি ফকিহ একে নাজায়িজ বলেছেন। তাদের দলিল *সহিহ মুসলিমের* হাদিস। তাতে আছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে ভাগে জমি চাষ নিষেধ করেছেন; বরং পৃথক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে ইজারাতের পদ্ধতিতে কাজ করানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে শুধু 'মুজারাআত' চুক্তি 'মুসাকাত'-এর অধীন হওয়ার সুরতটিকে তারা ব্যতিক্রম বলেছেন। অর্থাৎ গাছে পানি সেচের চুক্তি স্থির হওয়ার সাথে সাথে গাছের মধ্যবর্তী খালি জায়গায় চাষের ওপরও দু-পক্ষের সম্মতি থাকলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। জায়িজ হবে; কিন্তু পৃথকভাবে উৎপাদিত ফসল বা শস্যেরই নির্দিষ্ট অংশে জমি চাষের চুক্তি জায়িজ হবে না। সর্বোপরি পর্যাপ্ত দলিল-প্রমাণ ঘাঁটাঘাঁটির পরে প্রণিধানযোগ্য মত এটাই বের হয়—চুক্তি দুটিই সঠিক ও জায়িজ।

উলামায়ে কিরাম এগুলোর বৈধতা-অবৈধতার কথা পরিষ্কারভাবে বলতে গিয়ে বলেন—প্রাথমিকভাবে মুজারাআতের নিষেধাজ্ঞা ছিল সবার জরুরত ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে।

প্রেক্ষাপট ছিল, ব্যবসায়ী শ্রেণি মুহাজির সাহাবিরা ভিটেমাটি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মদিনায় আসার কারণে তারা ছিলেন সহায়-সম্বলহীন, নিঃস্ব। বিপরীতে কৃষকশ্রেণি আনসারদের প্রত্যেকের চাষযোগ্য কিছু কিছু জমি ছিল। কারও কারও অতিরিক্ত জমিও ছিল। তারা সেগুলোর ওপর আগে থেকেই মুজারাআত চুক্তি করতেন; কিন্তু নবিজি মুহাজিরদের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের সাথে আনসারদের পারস্পরিক সহানুভূতি ও মহানুভবতার নির্দেশ দেন। তাই তাদের আশপাশের অন্যান্যদের সাথে মুজারাআত চুক্তি করতে নিষেধ করেন।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রমাণ পাওয়া যায় জাবির রা. থেকে বর্ণিত *সহিহ মুসলিম* -এর হাদিসে। তিনি বলেন—

কোনো কোনো আনসার সাহাবির অতিরিক্ত অনাবাদি জমি ছিল। তারা সেগুলোর উৎপাদিত শস্য বা ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে অন্যদের চাষ করতে দিতেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

> যার কাছে (অতিরিক্ত) জমি আছে, তা হয়তো সে নিজে চাষ করবে অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেবে। সে যদি নিতে অনাগ্রহ দেখায়, তাহলে নিজের কাছেই রেখে দেবে।

তারপর মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা ভালো হলে এবং তাদের বিনামূল্যে চাষের প্রয়োজন উঠে গেলে মুজারাআত জায়িজ সাব্যস্ত করা হয়। অবশ্য জমির মালিকদের ইচ্ছাধিকার রয়েছে, তারা মুজারাআত-ইজারত—দুটির মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজ নিতে পারে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে জমিজমা দুই চুক্তিতেই দেওয়া হতো।

পাঁচ. আগতদের চেহারায় চুমু খাওয়া ও মুআনাকার বৈধতা

আগত কেউ যদি একটানা দীর্ঘ সফর শেষে বা দীর্ঘদিন পর সাক্ষাতে আসে, তাহলে তার চেহারায় চুমু খাওয়া ও মুআনাকার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। উলামায়ে কিরাম এর বৈধতার স্বপক্ষে উল্লিখিত ঘটনায় জাফর রা.-এর কপালে নবিজির চুমু খাওয়া এবং তার সাথে নবিজির মুআনাকাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

অনুরূপ আরেকটি হাদিসেও একটি ঘটনা আছে। হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হি.) রহ. সহিহ সনদে ও ইমাম তিরমিজি (২০৯-২৭৯ হি.) রহ. আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আম্মাজান আয়িশা রা. বলেন—

> (একদিন) জায়িদ ইবনে হারিসা (কোনো অভিযান বা সফর থেকে) মদিনায় ফিরে আসে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। জায়িদ আমার ঘরের দরজায় এসে খটখট শব্দ করে। শব্দ শুনে কাপড় হ্যাঁচড়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং কপালে চুমু খান।[৮০]

চুমু ও মুআনাকার পক্ষে বর্ণিত হাদিস দুটি ছাড়া আরও একটি হাদিস আছে, যেটাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে সাংঘর্ষিক মনে হয় এবং কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ.-ই আনাস ইবনে মালিক রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

> এক লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কেউ কি তার ভাই-বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সময় তার সামনে ঝুঁকতে পারবে? নবিজি জবাব দেন—না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তার সাথে মুআনাকা করতে পারবে বা চুমু খেতে পারবে? নবিজি জবাব দেন—না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তার সাথে মুসাফাহা করতে পারবে? নবিজি জবাব দেন—হ্যাঁ।

একটি প্রশ্ন

এখান থেকে প্রশ্নোত্থাপিত হয়, নবিজি এখানে কেন নিষেধ করলেন অথচ আগের বর্ণনায় এসেছে তিনি নিজেই এই কাজগুলো করেছেন?

প্রশ্নের উত্তর

এই প্রশ্নের উত্তর হলো—নবিজি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। কারণ, ওই সাহাবির জিজ্ঞাসা ছিল, যে কারও সাথে দেখা হওয়ামাত্রই চুমু খাওয়া ও মুআনাকার ব্যাপারে—দিনে কয়েকবার হলেও। ফলে নবিজি যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে কারও সাথে দিনে পাঁচবার দেখা হলে পাঁচবারই চুমু খাওয়া ও মুআনাকার ব্যাপার

---

৮০ *সুনানু আবি দাউদ; জামি তিরমিজি*

চলে আসত। যা আদৌ কোনো সুশীল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মেজাজ নয় এবং এগুলোতে লেগে থাকা বিরক্তি ও কষ্টকর বটে। তাই নবিজি নিষেধ করেছেন। এবং সর্বোচ্চ মুসাফাহার অনুমতি দিয়েছেন; যা বেশ সহজসাধ্য ও রুচিসম্মত। আর পুরোপুরি বৈধতা দিয়েছেন দীর্ঘ সময় বা দীর্ঘ সফরের ফিরতি সাক্ষাতের ক্ষেত্রে। সুতরাং দুই অবস্থায় পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি কোনো সংঘর্ষও নেই।

ছয়. খাদ্যদ্রব্যে সুদের উপস্থিতি ও নিষেধাজ্ঞা

খাদ্যদ্রব্যে 'রিবাল ফজল' হারাম। রিবাল ফজল-এর স্বরূপ হলো, কমবেশি করে এক জাতীয় দ্রব্যের আদান-প্রদান। যেমন—এক কেজি খেজুরের বিনিময়ে দুই কেজি খেজুর বেচাকেনা। এই উদ্বৃত্ত অংশের নাম সুদ। অথবা এক কেজি আপেলের বিনিময়ে দুই কেজি আপেলের বেচাকেনা। এই লভ্যাংশের নাম সুদ। শরয়ি পরিভাষায় একে 'রিবাল ফজল' বলে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক হাদিসে এই লভ্যাংশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন—'নবিজি সোনার বিনিময়ে সোনা, রুপার বিনিময়ে রুপা, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, লবণের বিনিময়ে লবণ ইত্যাদি কমবেশি করে বেচাকেনা করাকে নাজায়িজ ও হারাম বলেছেন। তবে সমান সমান ও নগদ নগদ হলে জায়িজ বলেছেন। এবং বলেছেন—যে এসব দ্রব্যের সমজাতীয় লেনদেনে বেশি দেবে বা বেশি চাইবে, সে সুদ ও হারামে লিপ্ত হবে।'

এ বিষয়েরই আরেকটি হাদিস *বুখারি শরিফ*-এ আছে। তাতে আছে—নবিজি উন্নত মানের খেজুরের বিনিময়ে অনুন্নতমানের খেজুরের কমবেশি বেচাকেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর সমজাতীয় লেনদেনে সমতা ঠিক না রাখার পরিপ্রেক্ষিতে হারাম হওয়ার গূঢ় রহস্য ও কারণ এবং মূলনীতি ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটা নয়। এর সঠিক ও উপযুক্ত স্থান *হিদায়া, ফাতহুল কাদির, বাদাইউস সানায়ি, আল বাহরুর রায়িক, আশরাফুল হিদায়া* ইত্যাদি ফিকহশাস্ত্র তথা ইসলামিক ল'-এর বড়ো বড়ো কিতাব। সেগুলোতেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশদ বিবরণ রয়েছে। তবে এখানে ইঙ্গিতস্বরূপ সংক্ষেপে জরুরি কিছু কথা তুলে ধরা হলো—

সমজাতীয় বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধ পদ্ধতি

যে ব্যক্তি উন্নত জাতের কম পরিমাণ খেজুরের মোকাবিলায় অনুন্নত জাতের বেশি পরিমাণ খেজুরের বেচাকেনা করতে ইচ্ছুক অথবা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীতেও এ পদ্ধতিতেই লেনদেনের প্রতি আগ্রহী, তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরয়ি দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছেন—সমজাতীয় খাদ্যদ্রব্যে পরিমাণগত সমতা বজায় রেখেই লেনদেন করতে হবে। অন্যথায় ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। আর ভিন্ন পন্থা বলতে উদ্দেশ্য হলো, প্রথমে মুদ্রার বিনিময়ে অনুন্নত দ্রব্য বিক্রি করতে হবে। তারপর সেই মুদ্রা দিয়ে উন্নতমানের একই দ্রব্য কিনতে পারবে। এভাবে কমবেশি হলেও সঠিক ও জায়িজ হবে। তবে খারাপ দ্রব্য বেশি দিয়ে একই ভালো দ্রব্য কম নিলে বা উলটো লেনদেন করলে হারাম হবে; বরং টাকার বিনিময়ে খারাপ জিনিস বিক্রি করে সেই টাকায় একই ভালো জিনিস কেনায় কোনো সমস্যা নেই। এটা সহিহ তরিকা। উদাহরণস্বরূপ খেজুরের ব্যাপারে নবিজি বলেছেন।

কারণ, এখানে মূল হারাম বস্তুর বেচাকেনা উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রথম বেচাকেনাকে ওই বস্তু যেটা হারাম সাব্যস্ত হয়েছিল, সেটাকে অর্জনের মাধ্যম ও উপলক্ষ্য বানানো হয়েছে মাত্র। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে লক্ষণীয় ও বিবেচ্য একটি বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। কারণ, হারাম কাজ সেটাই, যেটার ওপর কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

হিলা করা যাবে কি

এ থেকে আরেকটি বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে—কোনো বিষয়ের যেই পথ ও পদ্ধতি হারাম, যদি সেই পথ ও পদ্ধতি পরিবর্তন করে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা হালাল করা যাবে। এবং সেই তরিকাকে 'হালাল করার হারাম কৌশল' বলা যাবে না, বা সেটা নিষিদ্ধ হিলা-বাহানা বলেও গণ্য হবে না। যেমন—তিন তালাকপ্রাপ্তা কোনো নারীকে আগের স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়তে কোনো প্রকারের শর্তারোপ ছাড়াই বিয়ে করা। অনুরূপ কোনো ধনী ঋণদাতার পক্ষ থেকে অসহায় ঋণীকে জাকাতের অর্থ হাতে দেওয়ার পর আবার ঋণ পরিশোধের আকৃতিতে ফেরত নেওয়া ইত্যাদি।

অবশ্য ইবনে কাইয়িম রহ. (৬৯১-৭৫১ হি.) এ ধরনের হিলা-বাহানাকে সরাসরি নাজায়িজ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি দলিল হিসেবে শরয়ি মূলনীতি পেশ করেছেন—

আমল তথা কর্মের ভিত্তি অন্তরের নিয়ত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর। সুতরাং শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে বাহানা খোঁজার অর্থ দাঁড়ায়—শরিয়তের চাহিদাকে পরিবর্তন করে দেওয়া।

উদাহরণস্বরূপ উক্ত দুটি কাজ করলে দুজনই ভুল কাজ করেছে বলে বিবেচিত হবে। কারণ, তারা শরয়ি বিধানকে তার উদ্দেশ্য থেকেই সরিয়ে ফেলেছে। এবং এর দ্বারা এমন উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছে, যা শরিয়তসম্মত নয়।

কিন্তু ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর উক্ত বক্তব্য বিবেচনার উপযুক্ত নয়। কারণ, প্রথমত তার বক্তব্য *সহিহ বুখারির* উপর্যুক্ত হাদিসের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক। আর ফিকহি মূলনীতিগুলো কুরআন-হাদিস থেকেই উদ্ভাবিত। কুরআন-হাদিসের উর্ধ্বে নয়। কাজেই যেই মূলনীতি কোনো স্থানে স্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি ধরা পড়বে, সেটা সেখানে পরিত্যাজ্য হবে।

দ্বিতীয়ত আলোচ্য বিষয়ে ইবনুল কাইয়িম রহ. তার *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন* গ্রন্থে যেই বিশদ আলোচনা করেছেন, তাতে চূড়ান্ত পর্যায়ের সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য এবং স্ববিরোধিতা রয়েছে। তিনি কোনো কোনো সুরতে হারাম হওয়ার নিন্দা জানিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন; সেগুলোর হারাম নাম দিয়েছেন এবং সেসব সুরতকে বিশুদ্ধ আখ্যা দানকারী আইম্মায়ে কিরামের মতামত সবিস্তারে উল্লেখ করে খণ্ডন করেছেন। পাশাপাশি তাদের ধমকি শুনিয়েছেন যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তায়ালার সামনে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনিই আবার কয়েক পৃষ্ঠা পরে সেগুলোকে জায়িজ বলেছেন এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে সহিহ ও বিশুদ্ধ হিলা বলে উপস্থাপন করেছেন। কেমন যেন তিনি নিজের বক্তব্যকে নিজ হাতে গলা টিপে ধরেছেন![৮১]

* * *

৮১ বিস্তারিত জানতে দেখুন—*ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯৩

গাজওয়াসংক্রান্ত আরও দুটি ঘটনা

এই গাজওয়ায় দুটি বড়ো বড়ো অলৌকিক ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়েছে; যা সংঘটিত হওয়ার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা হয়েছে। ঘটনা দুটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রথম ঘটনা

আলি রা.-এর চোখের প্রদাহ ছিল। নবিজি তাঁর মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে এমন সুস্থতা লাভ করেন—যেন আগে তার চোখে কোনো সমস্যাই ছিল না!

দ্বিতীয় ঘটনা

নবিজি বিষ মিশ্রিত ভুনা গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন। তবে নবিজি অন্যদের অবগত করার আগেই খোদায়ি ফয়সালা কার্যকর হয়ে যায়। বিশর রা. এক লোকমা খেয়ে ফেলেন। বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ঘটে।

বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয় এভাবে—আল্লাহ তায়ালা তাঁর পেয়ারা নবিকে মানুষের সকল ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই নিরাপত্তা ও সুরক্ষাদান তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন—

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ﴿٦٧﴾

আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখবেন।"[৮২]

আমরা আগেই বলে এসেছি—ওই নারীর ইসলাম গ্রহণ-অগ্রহণ নিয়ে বর্ণনাকারীদের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে প্রবল ধারণা সেটাই, যা ইমাম জুহরি ও অন্যান্যরা বলেছেন—সেই নারী মুসলিম হয়ে যায়। এবং এ কারণেই তাকে হত্যা করতে নবিজি বারণ করেছেন। যেমনটি *সহিহ মুসলিম*-এ বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর

'কিসাসের দাবি তো ছিল ওই নারীকে হত্যা করা অথচ তা করা হলো না; কিন্তু কেন?'—এখানে এই প্রশ্নোত্থাপন যথার্থ ও সজাগ দৃষ্টির আলামত হবে না। কারণ, শরিয়তের স্বতঃসিদ্ধ ও সার্বিক মূলনীতি হলো, 'ইসলাম ইসলামপূর্ব যাবতীয় অপরাধ ও ভুলত্রুটি মিটিয়ে দেয়।' মূলনীতিটি সহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি সহিহ হাদিস থেকে উদ্ভূত। সুতরাং সাহাবি-হত্যার দুষ্কর্মটি যেহেতু ইসলাম গ্রহণের আগে ছিল, তাই এখানে অভিযোগ উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে যেই হত্যার বিপরীতে কিসাস অপরিহার্য হয়, সেটা মুসলিম অবস্থায় হতে হবে। আর অমুসলিম অবস্থায় তার এই অপরাধের বিচার হতো 'হরবি' হওয়ার বিবেচনায়; কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণের কারণে সেই বিবেচনাও বাতিল হয়ে গেছে। ফলে তার শাস্তি না হওয়া নিয়ে এখানে আর কোনো জটিলতা নেই।

তারপর আরেকটি বিষয় ছিল—'খাইবারে ইহুদিদের অবস্থানকালের সময়সীমা' নিয়ে।[৮৩] প্রাচ্যবিদরা এটাকে ইস্যু করে ফারুকি সত্তার ওপর কলঙ্ক লেপনের চেষ্টায় মরিয়া। এই বিষয়ে আমাদের জবাব হলো—পরাজিত হিসেবে তো তারা নবিজির গোলাম-বাঁদিতে পরিণত হয়েছিল। তারপরও নবিজির কাছে আবেদন করে জমিজমা চাষ এবং উৎপাদিত ফসলের ভাগ প্রদানের শর্তে খাইবারেই থাকার অনুমতি লাভ করে। এবং নবিজির ওফাতের পরেও সিদ্দিকি শাসনের আরও দুই বছর থাকে। পরে ফারুকি যুগে তাদের কুকর্ম, দৌরাত্ম্য, উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতার হাত প্রসারিত হয়ে যায়। তারা এক আনসারি সাহাবিকে খুন করে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তার হাত ভেঙে দেয়।

---

৮২ সুরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

৮৩ এখানে মূলত যা প্রশ্ন হিসেবে উত্থাপন করা হয়, তা হলো—নবিজির সাথে ইহুদিদের চুক্তি থাকার কারণে আবু বকর রা. ইহুদিদের উৎখাত করেননি; কিন্তু উমর রা. কেন তাদের সময়সীমা অমান্য করে তাদের সেখান থেকে বিতাড়ন করেন? আরব থেকে কেন ইহুদিদের বের করে দেন?

এসব রাষ্ট্রবিরোধী ও সামাজিক অপরাধকে সামনে রেখে ফারুকে আজম রা. সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শসভার আহ্বান জানান। সভায় তিনি ইহুদিদের দেওয়া নবিজির শর্ত 'আমরা যখন চাইব তখন দেশান্তরও করতে পারব'-এর কথা মনে করিয়ে দেন। এবং বলেন—'আপনারা জানেন, এরা আবদুল্লাহর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তার হাত ভেঙে দিয়েছে। তার আগে আমাদের এক আনসারি ভাইকে খুন করেছে। লক্ষ করেন, এই নিহত (শহিদ) এবং আহতরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি এবং তাঁর হাতেগড়া প্রিয় শিষ্য। ওদিকে এই ভূখণ্ডে ইহুদিরা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোনো শত্রু নেই।

কাজেই সার্বিক বিবেচনায় আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি—ওই হতভাগা ও বদমাইশরদের উৎখাত ও দেশান্তর করব। খাইবারে আমাদের জমিজমা আমরা বুঝে নেব এবং আমরাই দেখাশোনা করব।'

এভাবে 'জাজিরাতুল আরব' (তথা আরব উপদ্বীপ) থেকে ইহুদিদের সমূলে উৎপাটন করা হয়। ওরা যদি অবাধ্যতা, উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা মনোভাব এবং অহংকার ও মিছে বড়াই ইত্যাদি না দেখাত, তাহলে হয়তো-বা আরবের বুকে স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার সুযোগ মিলত এবং বহিষ্কার বা দেশান্তরও করা হতো না; কিন্তু দুরাচাররা নিজেরাই নিজেদের লাঞ্ছিত করেছে।

অবশ্য বড়ো কথা হলো—আল্লাহর জমিনে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে থাকার সুযোগ দেবেন। মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন বাহ্যিক কারণ। তবে ঘোষণা তো আছেই—

والعاقبة للمتقين

উত্তম পরিণতি মুত্তাকিদের জন্য নির্ধারিত।"[৮৪]

* * *

৮৪ সুরা আরাফ, আয়াত : ১২৮



বিভিন্ন গোত্রে বাহিনী এবং বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাজিরাতুল আরবে প্রধান দুই বিরোধী পক্ষ মক্কার কাফির-মুশরিক ও মদিনার ইহুদিদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম শেষ করে দেশের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য এলাকা ও গোত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই ধারা শুরু হয় খাইবার অভিযান থেকে অবসর গ্রহণের পরপরই। বাহিনী পাঠানোর পার্থিব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকলেও প্রধান ও মুখ্য বিষয় ছিল ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। বাহিনী প্রেরণের সময় নবিজি বলেই দিতেন—তারা স্বাভাবিকভাবে মুসলিম হয়ে গেলে তো কথাই নেই। যদি মুসলিম না হয়ে জিজিয়া তথা বার্ষিক ট্যাক্স দিতে রাজি হয়, তাও চলবে; কিন্তু তারা যদি আগ বেড়ে রণপ্রস্তুতি নেয়, তাহলে তোমরাও লড়াই করবে জয় ছিনিয়ে আনা পর্যন্ত।

এসব বাহিনীতে নবিজি নিজে যেতেন না; বরং কোনো না কোনো সাহাবিকেই বাকি সেনাদের কমান্ডার ও বাহিনীপ্রধান বানিয়ে পাঠাতেন। এ কারণেই সিরাত বিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসিনে কিরাম নবিযুগের যুদ্ধাভিযানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

- ০১. গাজওয়া ও
- ০২. সারিয়্যা।

এক. গাজওয়া

যেসব যুদ্ধাভিযান সরাসরি নবিজির কমান্ডে ও তাঁর উপস্থিতিতে পরিচালিত হয়েছে, সেগুলোর নাম গাজওয়া।

দুই. সারিয়্যা

যে সকল যুদ্ধে নবিজি নিজে শরিক না হয়ে কাউকে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন, সেগুলোকে বলা হয় সারিয়্যা।

সারিয়্যার সংখ্যা ও সময়কাল

সপ্তম হিজরি সনের মাঝামাঝি সময়ে এসব সারিয়্যা প্রেরিত হয়। দশটি সারিয়্যা ভিন্ন ভিন্ন সাহাবির নেতৃত্বে ও কমান্ডে নবিজি প্রেরণ করেন।

একই সময়ে তিনি বহির্বিশ্বের রাজা-বাদশাহ, সম্রাট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বরাবর রাষ্ট্রীয় পত্র পাঠান। পত্র-বিবরণীর বিষয়বস্তু ছিল ইসলাম ও হকের দাওয়াত এবং ধর্ম নামক প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদ ও বাতিল ধ্যানধারণা বর্জনের আহ্বান।

নবিজির আংটি বানানোর কারণ

ইবনে সাআদ তার *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*-এ বর্ণনা করেছেন—নবিজি ষষ্ঠ হিজরির জিলহজ মাসে হুদাইবিয়া থেকে মদিনায় ফিরে বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন।

সাহাবায়ে কিরাম নবিজির সামনে আন্তর্জাতিক একটি রীতি উপস্থাপন করে বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, বাদশাহদের নিয়ম হলো, তারা সব পত্র গ্রহণ করেন না; বরং যেগুলোর ওপর প্রেরকের সিলমোহর লাগানো থাকে, শুধু সেগুলো গ্রহণ করেন এবং পড়েন।

তখন এরই পরিপ্রেক্ষিতে নবিজি রুপার একটি আংটি বানান। আংটিতে তিন লাইনে লেখা ছিল 'মুহাম্মাদ-রাসুল-আল্লাহ' (আল্লাহ ওপরে, তার নিচে রাসুল, তার নিচে মুহাম্মাদ)। নবিজি পত্রের ওপর আংটি দিয়ে সিল মেরে দূতদের হাতে হাতে দিয়ে দেন। এবং একই দিনে ছয়জন দূত ছয় গন্তব্যে প্রেরণ করেন। রওনার তারিখ ছিল সপ্তম হিজরির মহররম মাস। প্রত্যেক এলাকা ও গোত্রের কাজে তাকেই পাঠান, যে ওই এলাকার ভাষায় পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ।

বহির্বিশ্বে নবিজির প্রথম দূত

নবিজি প্রথম দূত হিসেবে উমর ইবনে উমাইয়া জমরি রা.-কে পাঠান হাবশার তৎকালীন নাজ্জাশি[৮৫]'র কাছে। বাদশাহ নাজ্জাশি নবিজির পত্র পাওয়ামাত্রই সাদরে বরণ করে নেন এবং চোখে লাগান। সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। বিনয়, সৌজন্য ও নিরহংকারিতা প্রকাশ করতে গিয়ে সরাসরি মাটিতে বসে পড়েন। তারপর ইসলাম কবুল করেন। সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং দূতের সামনে বলেন—'আমি যদি নবিজির দরবারে হাজির হওয়ার সুযোগ পেতাম, তাহলে অবশ্যই হাজির হতাম।'[৮৬]

পরাশক্তি রোমে নবিজির দ্বিতীয় দূত

নবিজি দ্বিতীয় দূত হিসেবে দিহয়া ইবনে খলিফা কালবি রা.-কে পাঠান তৎকালীন সুপার পাওয়ার বৃহত্তর শাম ও কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট হিরাকল[৮৭] বরাবর। দিহয়া কালবি রা. পত্র নিয়ে শামের এলাকা বুসরার গভর্নরের কাছে যান। গভর্নর তাকে সম্রাটের কাছে পৌঁছে দেয়। হিরাকল নবিজির প্রেরিত পবিত্র পত্র খুলে পড়ে। তাতে লেখা ছিল—

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

এই পত্র আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল বরাবর। শান্তি ও নিরাপত্তা হিদায়াতের অনুসারী ও অনুগতদের জন্য।

আম্মা বাদ, আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি যদি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন, তাহলে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবেন। আপনি যদি মুসলিম হন, তাহলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবেন। বিপরীতে যদি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনার সকল প্রজার গুনাহও আপনার কাঁধে পড়বে। হে আহলে কিতাব, আসেন ওই কালিমার দিকে—যেই

---

৮৫ নাজ্জাশি। রাষ্ট্রীয় উপাধি। মূল নাম আসহামা ইবনে আবজার (৫৬০-৬৩০খ্রি.)। তার রাজত্ব ছিল আধুনিক ইথিওপিয়ার আকসুমকেন্দ্রিক। তিনি পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি দুর্বল ও আকৃষ্ট ছিলেন।

৮৬ *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩

৮৭ হিরাকল। মূল নাম হিরাক্লিয়াস বা ফ্ল্যাভিয়াস হিরাক্লিয়াস অগাস্টাস (৫৭৫-৬৪১খৃ.)। রাষ্ট্রীয় উপাধি কাইসার। ইসলামি তথ্য লিপিসমূহে তাকে 'হেরাকল' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। একজন বাইজান্টাইনীয় এবং প্রাচ্যীয় রোমান সম্রাট—যিনি ৬১০ থেকে ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। পিতা হিরাক্লিয়াস দ্য অ্যান্ডারের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই প্রথম গ্রিক ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করেন। তিনি তৎকালীন স্যাসানিড/সাসানীয় সম্রাট দ্বিতীয় খসরুকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইসলামি ইতিহাসে তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

কালিমা নিয়ে আমাদের এবং আপনাদের মাঝে কোনো পার্থক্য বা বিরোধ নেই। তা হলো—আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করব না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ মানব না। এই দাওয়াত থেকে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দেন, তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।"

ইবনে সাআদ তার *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*-এ লেখেন—হিরাকল নবিজির পত্র পড়ে রাজ্যের সকল আমির-উমারা এবং রাষ্ট্রীয় সকল মন্ত্রী-উপদেষ্টাকে একত্র করেন। রাজসভায় তাদের উদ্দেশে বলেন—হে রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা, তোমরা কি তোমাদের সফলতা লাভে আগ্রহী আছ? তোমাদের রাজত্ব স্থায়ী ও দীর্ঘ হওয়া এবং মহান যিশুর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকা কি তোমাদের কাম্য?

বৈঠক থেকে জবাব আসে—জি। আমরা তো চাই-ই। তো এখন নতুন করে কী করা লাগবে?

হিরাকল শুনিয়ে দেয়—এই আরব নবির আনুগত্য করা লাগবে।

হিরাকলের এই শেষ কথাটি শুনতে সভার কেউ প্রস্তুত ছিল না। উপস্থিত সব আমলা জংলি ও বন্য গাধার মতো হইচই ও চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেয়। পরস্পরে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্রুশ উঁচিয়ে ধরে।

হিরাকল এই গাধা-গর্দভদের বেগতিক অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন—এরা কখনো মানুষই হবে না; ইসলাম গ্রহণ তো দূরের কথা। তিনিও আশাহত ও নিরাশ হন। এমনকি নিজের জীবন এবং রাজত্ব ও সিংহাসন হারানোর ভয় পেয়ে বসে তাকে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের চুপ করিয়ে দেন এবং কৌশল খাটিয়ে বলেন—আরে! আমি শুধু তোমাদের ভেতরের অবস্থাটা যাচাই করতে চাইলাম। দেখতে চেয়েছি, তোমরা তোমাদের আকিদা-বিশ্বাসে কতটুকু পোক্ত ও পরিপক্ব! যাহোক আকিদা ও ধর্মের সাথে তোমাদের এই গভীর আন্তরিকতা ও কঠোরতা আমাকে উৎফুল্ল করেছে।'

হিরাকলের কথা শুনে সভাসদরা তার সামনে সিজদা করে।'[৮৯]

---

৮৮ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

৮৯ এই সিজদা ছিল সম্মানসূচক। রোমক খ্রিষ্টানরা যদিও মৌলিকভাবে 'পৌলবাদী ঈসায়ি মতবাদে' বিশ্বাসী ছিল, তারপরও বনি ইসরাইলের কিছু রীতিনীতি তাদের মাঝে বহাল ও প্রচলিত ছিল। আর ইসরাইলি শরিয়তে এই সিজদার অনুমোদন ছিল; কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মাদিতে চিরতরে এবং স্পষ্টভাবে একে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পরাশক্তি পারস্যে তৃতীয় দূত

তৃতীয় দূত হিসেবে নবিজি আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমি রা.-কে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দ্বিতীয় পরাশক্তি পারস্য সম্রাট কিসরা[১] বরাবর পাঠান। নবিজি তার নামেও একটি পত্র লিখে দেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা রা. বলেন—

পত্রখানা আমার হাত থেকে তার সামনে পেশ করা হলে তাকে পড়ে শোনানো হয়; কিন্তু সে পত্রের বক্তব্য শোনামাত্রই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। পত্র মুবারক হাতে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

এই দুঃসংবাদ নবিজির কানে এলে তিনি বলেন—আল্লাহও তার বিশাল সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেবেন।

ওদিকে কিসরা ঔদ্ধত্য ও বাহাদুরি দেখিয়ে ইয়ামানে নিযুক্ত গভর্নর বাজানকে অধ্যাদেশ পাঠায়—সে যেন শক্তিশালী ও পালোয়ান দুজন লোক পাঠায় পত্র প্রেরক দুঃসাহসী হিজাজি নবিকে গ্রেফতার করে আনতে। রাজাজ্ঞা পালনে বাজান গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ দুজন পুলিশ পাঠায়। পুলিশ দুজন যখন মদিনায় এসে নবিজির সামনে নোটিশ পেশ করে, তখন নবিজি মুচকি হেসে উঠে বলেন—'আজ তোমরা যাও। কাল সাক্ষাতে এসো। তখনই আমি আমার ভবিষ্যৎ ইচ্ছার কথা তোমাদের জানাব।'

যেমনটি ইমাম জাসসাস (৩০৫-৩৭০ হি.) রহ. তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি নবিজির মুতাওয়াতির হাদিস।

কাজেই এখন বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসেবে শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকু-সিজদা এবং সালাতের মতো করে হাত বেঁধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, শরিয়তে মুহাম্মাদি অবিনশ্বর ও চিরন্তন শরিয়ত। তাই রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে যেহেতু নবুয়ত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তার শরিয়তই সর্বশেষ শরিয়ত যেহেতু একে বিকৃতি ও মৃত্যুতি থেকে বাঁচানোর জন্য এমন প্রতিটি ছিদ্র পথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে; যেগুলো দিয়ে শিরক ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করতে পারে।

অতএব বোঝা যায়, প্রাচীনকালের সিজদা ছিল আমাদের বর্তমানের সালাম-মুসাফা-মুআনাকা-হাতে চুমু খাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমর্থক ও সমতুল্য। সূত্র : তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ : ২১ ৯০ 'কিসরা'। রাষ্ট্রীয় উপাধি। মূল নাম দ্বিতীয় খসরু বা খসরু পারভেজ (৫৭০-৬২৮ খৃ.)। সাসানিড/সাসানীয় সাম্রাজ্যের শেষ মহারাজা। ৫৭৯ থেকে ৬২৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চতুর্থ হরমিজদের পুত্র এবং প্রথম খসরুর নাতি। তিনিই ইরানে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে দীর্ঘ সময় শাসনকারী পারস্যের শেষ রাজা। তার রাজত্বকালের অধিকাংশই ব্যয় হয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে কতিপয় যুদ্ধ এবং বাহরাম চবিন ও বিদ্রোহের মতো জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ঘাতক ছেলের হাতে তার মরণ হয়। নিহত হওয়ার পাঁচ বছর পর তার সাম্রাজ্যে মুসলিমদের বিজয়ের সূচনা ঘটে। ইসলামি ইতিহাসে খসরু পারভেজের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

পরদিন তারা নবিজির দরবারে হাজির হলে নবিজি তাদের বলেন—'তোমরা ফিরে যাও। গিয়ে তোমাদের গভর্নরকে সংবাদ দাও, গত রাতের সাত প্রহরে আমার রব তার রব কিসরাকে মরণের ঘাট পার করিয়ে দিয়েছেন।'

ইবনে সাদের বর্ণনায় এসেছে—দিনটি ছিল মঙ্গলবার। সপ্তম হিজরির জুমাদাল উলা মাস। আল্লাহ তায়ালা কিসরার ওপর তার ছেলে শেরওয়াকে চাপিয়ে দেন এবং ছেলের হাতেই বাপের প্রাণনাশ ঘটান। পুলিশ দুজন এই সংবাদ নিয়ে ইয়ামানে যাওয়ার পর তা শতভাগ সত্য ও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এতে বাজান ও ইয়ামানে বসবাসকারী তার ছেলেরাও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

শামে নবিজির দূতকে হত্যা

হারিস ইবনে উমাইর আজদি রা.-কে নবিজি দাওয়াতনামা দিয়ে পাঠান শামের বিখ্যাত প্রদেশ বুসরার[৯১] গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানির কাছে। শুরাহবিল রাষ্ট্রদূতকে আটক করে পরে খুন করে ফেলে।

ইতিহাস বর্ণনাকারীরা বলেন—শুরাহবিলের হাতে শাহাদাত বরণকারী দূত সাহাবি হারিস ইবনে উমাইর আজদি রা.-ই ছিলেন, অন্য কেউ নয়।

উপর্যুক্ত এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকা ও গোত্র এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও গোত্রপ্রধানদের কাছেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ বিরোধিতা করলেও অধিকাংশই তাঁর প্রেরিত দূত ও পত্র সাদরে বরণ করে নেয় এবং ইসলামের দাওয়াত সানন্দে কবুল করে। আবার কেউ কেউ বিরোধিতা না করে সমর্থন জানিয়ে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়।

যুদ্ধবিরতির এই সময়ে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত ও নানা দিকের বহু গোত্রপতি, এলাকার মাতব্বর, বীর-বাহাদুরের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়। অনেকেই এই বিরতিকে জীবনের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে পেয়ে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করে।

এভাবে পরিশেষে তারা ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করে ইসলামের সামনে মাথানত করে। একজন-দুজন করে আবার কখনো ছোটো-বড়ো জামাতবদ্ধ হয়ে নবিজির দরবারে উপস্থিত হয় এবং তাঁর হাতে হাত রেখে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ

---

৯১ আমাদের কাছে থাকা কিছু তথ্যমতে, শুরাহবিল ছিল 'বালকা'-এর আমলা। এই বিষয়ে ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের জন্য বিশদ গবেষণা প্রয়োজন।

করে। বীরপুরুষ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আমর ইবনে আস ছিলেন এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণকারীদের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব।

আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আমর ইবনে আস রা. বলেন—এটা মক্কা বিজয়ের আগের ঘটনা। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হই। পথে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সাথে দেখা। সেও মক্কা থেকে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম—কী হে আবু সুলাইমান, কোন দিকে যাও?

জবাব দিলো—অন্য কোনো দিকে যাচ্ছি না। ইসলাম গ্রহণ করতে সোজা মদিনা যাচ্ছি। কতদিন আর এভাবে থাকব?

আমি তাকে জানালাম না যে, আমিও মুসলিম হতে মদিনা যাচ্ছি।

তারপর গন্তব্য এক হওয়ায় একসাথেই দুজন নবিজির দরবারে উপস্থিত হই। প্রথমে খালিদ ইসলাম গ্রহণ করে নবিজির হাতে বাইয়াত হয়, তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে কালিমা পড়ে বাইয়াত হই।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

দাওয়াতের নতুন প্ল্যাটফরমের প্রভাব

সপ্তম হিজরিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রে সামরিক মিশন পরিচালনা শুরু করেন এবং নানা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে পত্র পাঠান। কাজের ধরন দু-রকম হলেও দুটিরই লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। সবার দ্বারে দ্বারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। এটা মূলত নবিজির দাওয়াত প্রদানের বিগত ধাপের তুলনায় নতুন ধাপের সূচনা। যা কিনা আগের ধাপগুলো থেকে নানাভাবে ভিন্ন ও ব্যতিক্রম ছিল। হিজরত থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ধাপের নাম 'প্রতিরক্ষামূলক ধাপের দাওয়াত'।

এই প্রতিরক্ষামূলক ধাপের দাওয়াতের সময়ে নবিজি বিভিন্ন গোত্রে যেসব প্রতিনিধিদল পাঠান, তাদের প্রতি এই দিকনির্দেশনাই দিয়েছেন, শুধু দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। কোনো গোত্র বা ব্যক্তি দাওয়াত অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বা যুদ্ধে জড়ানো যাবে না।

এই সময়ে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোনো গোত্রে বা এলাকায় এই বলে মিশন পরিচালিত হয়নি যে, তাদের দাওয়াত দেওয়ার পর অস্বীকার করলে লড়াই করবে।

তবে কুরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে যখন সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়, তখন মুসলিমদের মন থেকে কুরাইশদের হামলা ও ষড়যন্ত্রের ভীতি ও শঙ্কা দূর হয়ে স্বস্তি ও প্রশান্তি অর্জন হয়।

এবার নবিজি দাওয়াতের নতুন প্ল্যাটফরম তৈরি করেন। এমন প্ল্যাটফরম যা ছাড়া শরিয়তে ইসলামিয়াতে দ্বীনের আহকাম পৌঁছানো ও কার্যকরের দ্বিতীয় কোনো উপায় বা পথ ছিল না। সেটাই হলো আগ বেড়ে লড়াই ও যুদ্ধের প্ল্যাটফরম। এই লড়াই ও যুদ্ধের নির্দেশ সেসব অমুসলিমদের ব্যাপারেই ছিল, যাদের কাছে

ইসলামের দাওয়াত সহিহ তরিকায় পৌঁছানো হয়েছে। তবুও তারা জেনে-বুঝে অহংকার ও অহমিকা দেখিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করেছে। তো এমন চরম দুষ্ট-অবাধ্য ও উদ্ধতদের শায়েস্তা করতেই দাওয়াতের এই জবরদস্তিমূলক প্ল্যাটফরম তথা 'আক্রমণাত্মক অভিযান'-এর সূত্রপাত ঘটেছে।

দাওয়াতি কার্যক্রমের এই তরিকায় চলে নবিজি আল্লাহ তায়ালার মনোনীত ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীনের দাওয়াত চূড়ান্ত গন্তব্যে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত দাওয়াতি কার্যক্রমের এই নতুন মিশন অর্থাৎ আগ বেড়ে লড়াই ও সশস্ত্র সংগ্রামই (কুরআনে কারিমের পাশাপাশি) নবিজির কথা ও কাজের আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত শরয়ি অকাট্য ও অপরিহার্য হুকুম বলে সাব্যস্ত ও সুনির্ধারিত হয়েছে।

প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডার তথা প্রাচ্যবিদরা দাওয়াতি কার্যক্রমের এই প্ল্যাটফরমকে বিকৃত করা এবং এই মিশনের সত্যতা ও বাস্তবতাকে লুকিয়ে একে মানুষের চোখে কলুষিত ও কালিমা লেপন করার সাথে সাথে এই বলে সবার মগজধোলাই করছে—'ইসলামি শরিয়তে 'জিহাদ' ও 'সশস্ত্র সংগ্রাম' বলতে যা কিছু বলা হয়েছে, সবই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বলা হয়েছে। শুধু শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অন্যথায় অস্ত্রধারণের কোনো নির্দেশনা ইসলামে নেই। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে কোনো এলাকায় আগ বেড়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না!

তারপর বর্তমানে যেহেতু বিশ্বের সব দুর্বল জাতির সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা 'জাতিসংঘ' (Unitad Nations) রয়েছে, তখন মুসলিমদের আলাদাভাবে 'প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বা যুদ্ধ'-এর নামে কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা বিশৃঙ্খলারও প্রয়োজন নেই। কারণ, মুসলিমরাও যদি দুর্বল হিসেবে বিশ্বের কোথাও জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে তাদেরও নিরাপত্তাদানের দায়িত্ব জাতিসংঘের ওপর।

কিন্তু তাদের এসব বক্তব্য যে কতটা হাস্যকর ও বিনোদনমূলক এবং কত গভীর ষড়যন্ত্রমূলক, তা বিশেষ করে বর্তমান সময়ে বলার আর অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এতে কোনো সিক্রেট বা রহস্য নেই যে, বুদ্ধিবৃত্তিক এসব ক্রুসেডার কতটা ধূর্তামি ও শিয়ালিপনার সাথে জিহাদকে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে সরিয়ে প্রাণহীন করে দিচ্ছে।

এবং কতটা চাতুর্যের কৌশল অবলম্বন করে জিহাদের স্বরূপ ও বাস্তবতাকেই পালটে দিচ্ছে। বুদ্ধি খাটিয়ে কী চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে মুসলিমদের চোখে রঙিন চশমা পরিয়ে দিচ্ছে। আর এসব বিকৃতি তারা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে করছে।

কারণ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অমুসলিমদের মনে একটাই ভয় ও ত্রাস, মুসলিমদের মনে যদি জিহাদের সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য একবার চমকে ওঠে এবং সাথে সাথে তাদের অন্তরে ঈমানের অগ্নিশিখা কোনোভাবে জ্বলে ওঠে, তাহলে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে অসভ্যতা ও কুসংস্কৃতি যতদূর এগিয়ে যেয়ে থাকুক না কেন, তাকে লাগাম পরানোয় মুসলিমদের দমিয়ে রাখার শক্তি কারও নেই। পাশ্চাত্য প্রভাব-প্রতিপত্তি সমাজে যতই বিস্তৃত হোক না কেন, এক ফুঁ-তে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা কোথাও নেই। তাদের জোরজুলুম এবং বাতিল ও মিথ্যার বিষাক্ত শিকড় যতই গভীরে যাক না কেন, সেগুলোর মূলোৎপাটন করে সত্য ও হকের ঢলে এবং ন্যায় ও ইনসাফের স্রোতে সব আবর্জনারূপে ভেসে যেতে বাধ্য।

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, ইউরোপীয়রা ইসলামের খাঁটি ও প্রকৃত দাওয়াত শোনার সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করতে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠে। সুতরাং ভেবে দেখেন তো—এর পাশাপাশি যদি আমাদের কুরবানি ও আত্মত্যাগ এবং জিহাদ ও সশস্ত্র সংগ্রামও অতীতের মতো আজো জারি থাকত, তাহলে ইসলাম তাদের মাঝে কেমনভাবে এবং কত দ্রুত বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হতো!"

---

৯২ নিখিল জাহান বা বিশ্ব প্রকৃতিতে এমন কোনো জীবজন্তু নেই, যে নিজের জীবন বাঁচাতে চায় না। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কীটও জুলুমের মরণ তো দূরের কথা, স্বাভাবিক মরণের হাত থেকেও বাঁচতে চায়। জীবন বাঁচাতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। প্রয়োজনে আঘাত বা দংশন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সে বাঁচতে চায় সংগ্রাম করে হলেও।

এখন, কেউ কি তার আত্মরক্ষাকে অন্যায় বলে? আত্মরক্ষার্থে তার প্রতিঘাত বা দংশনকে অযৌক্তিক বলে? নিশ্চয়ই না; বরং তার বীরত্বগাথা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

আর সর্বজনবিদিত কথা হলো, এই থিওরি ও ন্যাচার অনুসারেই পৃথিবীর শুরু থেকে মানুষ লড়াই ও সংগ্রাম করে আসছে। কেউ আত্মরক্ষার্থে, কেউ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে। মহান থেকে মহানতর ব্যক্তিদেরও প্রয়োজনে মৌখিক সংগ্রাম ও অস্ত্রের লড়াই করতে হয়েছে।

অনস্বীকার্য সত্য হলো, পৃথিবীর রাজা-বাদশারা যুদ্ধ করে কেবলই নিজেদের স্বার্থে। নিজের অধীনতার শিকলে স্বাধীন মানবজাতিকে আবদ্ধ করতে। নিজের দাসত্ব ও গোলামি করাতে। বিপরীতে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের সংগ্রাম হয়েছে কেবলই মানুষের কল্যাণার্থে। কারণ, সশস্ত্র লড়াইকে তারা মানুষের দাসত্বের হাতিয়ার বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং পচে যাওয়া অংশকে পৃথক করে ভালো অংশকে বাঁচার ও সুস্থ থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন।

চিকিৎসা অমান্যকারী বলে কোনো মানুষের অস্তিত্ব আছে দুনিয়ায়? অসুস্থ হলে সুস্থ হতে চায় না, এমন কোনো আজিব প্রাণী খুঁজে পাওয়া যাবে? নিশ্চয়ই না। আবার যেই রোগ অপারেশনের মাধ্যমে নিরাময় করতে হবে, সেটাও কারও অসন্তুষ্টির কারণ নয়। কারণ, এই ক্ষণিকের যন্ত্রণা তাকে এনে দিতে যাচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী সুখ।

ইসলামে বিশেষ করে শরিয়তে মুহাম্মাদিতে জিহাদের স্বরূপ হলো এই অপারেশনের মতো। মানুষকে মানুষ বানাতে কখনো শুধু ওষুধ-পথ্য সেবন করিয়েই ভ্রান্ত ও বাতিল ধ্যানধারণায় সৃষ্ট মনের রোগ দূর করা যায়। আবার কখনো তরবারি দিয়ে কেটে-ছিঁড়ে তারপর ওষুধ খাওয়াতে হয়।

আর এভাবেই ইসলামি দাওয়াতের দুটি প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছে। একটি স্বাভাবিক মৌখিক দাওয়াত। আরেকটি সশস্ত্র দাওয়াত। অর্থাৎ বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইসলামের দ্যুতি ছড়ানোয় মৌখিক কথার ভূমিকা যেমন ছিল, তেমনই ছিল তরবারির সহযোগিতা। তরবারি বাদ দিয়ে শুধু মৌখিক দাওয়াতে ইসলাম প্রসারিত হয়নি।

আজ ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদরা উক্ত যৌথ বিষয়গুলোকে এককভাবে দুই দিক আলাদা করে ইসলামের নামে বিষোদগার করে থাকে। কোনো কোনো ওরিয়েন্টালিস্ট দাবি করে—'ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে।'

আবার প্রাচ্যবিদ থমাস আরনল্ড (১৭৯৫-১৮৪২) তার বিখ্যাত বই 'দ্য প্রিচিং অব ইসলাম' এ মাসির দরদ দেখিয়ে লিখেছেন—

> ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসারিত হয়নি; বরং প্রসারিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে। কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই।

আহা! আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রথম বক্তব্য মুসলিমদের বিপক্ষে আর দ্বিতীয়টি পক্ষে; কিন্তু আসলে দুটিই ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য। দুটিরই উদ্দেশ্য—

> মুসলিমদের মাঝে জিহাদি চেতনাকে বিনষ্ট করে প্রমাণ করা, ইসলাম প্রচারে তরবারির কোনো ভূমিকাই ছিল না। ইসলাম প্রসারে শক্তি প্রয়োগের কোনো বিষয়ই ছিল না।

আফসোস, অবুঝ সেক্যুলার মুসলিম সমাজ সহজেই তাদের সাজানো ফাঁদে ধরা দিয়েছে। বর্তমানে তারাও একদিকে যখন শুনতে পেল, প্রাচ্যবিদরা অভিযোগ করছে, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, তখন তারা লজ্জায় মুখ ঢেকে কলঙ্ক মুছতে বলে দিয়েছে—

> তোমরা ভুল করছ। বেঠিক বলছ। কারণ, তোমাদের নিজেদের লোকদের থেকেই তোমাদের কথার খণ্ডন আছে। তোমাদের লোকেরাই তোমাদের এই দাবির বিরোধিতা করেছে। এই যে দেখো থমাস আরনল্ড বলেছেন, ইসলাম গায়ের জোরে বিস্তৃত হয়নি।

অপরদিকে পরাজিত মানসিকতার মুসলিমরা এগিয়ে এলো ইসলামকে রক্ষা করতে। তারা ইসলামকে হানাহানির দোষমুক্ত করতে চাইল। তাই ইসলামে তরবারির বিষয়টি তারা অস্বীকার করে বলল—'ইসলামে জিহাদ বলে কিছু নেই। যেখানে লড়াই হয়েছে, সেখানে আত্মরক্ষার্থে হয়েছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম।'

তাদের দৃষ্টিতে ইসলামে নিজে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আগ বেড়ে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলে কিছু নেই। এটা সুস্পষ্ট পাপ। ইসলাম এই পাপ থেকে পবিত্র!

অথচ এ ধরনের মন্তব্য নিকৃষ্টতম বোকামির সাথে সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা সত্যনিষ্ঠ মুসলিম আলিমগণের বক্তব্যের ঘোর বিরোধী। কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি তো আরও দূরে।

হানাফিদের ভাষ্যমতে, জিহাদ হলো আল্লাহর পথে লড়াই ও সংগ্রাম করতে সরাসরি নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা অথবা সম্পদ সরবরাহ করে বা চিন্তা-ফিকির ও মতামত দিয়ে অথবা যুদ্ধের সরঞ্জাম-অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বৃদ্ধি করে সহযোগিতা করা।

মালিকি ফকিহদের মতে—

> জিহাদ হলো আল্লাহর কালিমা বুলন্দ ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে চুক্তির আওতার বহির্ভূত কাফিরদের সাথে মুসলিমদের লড়াই ও সংগ্রাম অথবা লড়াইয়ে তাদের উপস্থিতি কিংবা কাফিরদের ভূখণ্ডে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের প্রবেশ।

শাফিয়ি মাজহাব মতে—

> জিহাদ হলো আল্লাহর কালিমা বুলন্দ ও সমুন্নত করা এবং তাঁর দ্বীনের সহায়তার লক্ষ্যে তাঁরই নির্দেশিত ও বাতলানো পথে কাফিরদের সাথে লড়াই ও সংগ্রাম করা।

হাম্বলি ফকিহগণ বলেন—

> মুসলিম বিদ্রোহী ও ডাকাত ছাড়া নির্দিষ্টভাবে শুধু কাফিরদের সাথে লড়াই ও সংগ্রামের নাম জিহাদ।

ইসলাম যদি কেবল শান্তিপূর্ণ গোবেচারা নিরীহ উপায়েই বিস্তার লাভ করে থাকে, তাহলে ওই কারণ কী—যার ভয়ে কাফিররা ভীত-সন্তস্ত হয়ে থাকে? তাদের এতে ভীত হওয়ার কী আছে? তারা কি কেবল মুখনিঃসৃত কথা আর দাওয়াত শুনেই ভীত-সন্ত্রস্ত এবং ভয়ে জড়োসড়ো?

কস্মিনকালেও নয়। *সহিহ বুখারির* হাদিস—

> তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যানের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।
>
> সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১০

এই আয়াত সম্পর্কে আবু হুরায়রা রা. বলেন—

> মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণজনক তখনই হয়, যখন তাদের গলায় শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে। *সহিহ বুখারি*, তাফসির অধ্যায় : ৪৫৫৭

বলেন তো—জিহাদ ব্যতীত কি লোকদের ঘাড়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব? রবার্ট বেন বলেন—'মুসলিমরা আগেও একবার গোটা দুনিয়া জয় করে ছেড়েছে। এটা তারা আবারও করতে পারে।'

পাকিস্তান পিরিয়ডে বাংলাদেশের সদরুল উলামা মুজাহিদে মিল্লাত শামসুল হক ফরিদপুরী (১৮৯৬-১৯৬৯) রহ. করাচি দারুল উলুম মাদ্রাসায় ছাত্র ও সুধী সমাবেশে এক বক্তৃতা দেন। ভাষণে তিনি বলেন—

> ঈসায়ি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ব্রিটিশরা যখন মুসলিমদের থেকে সর্বপ্রথম জিব্রাল্টার (জাবালুত তারিক) প্রণালি দখল করে এবং ইউরোপের সকল সাম্রাজ্যবাদী খ্রিষ্টানশক্তি সমগ্র ভূমধ্যসাগরের ওপর অধিকার বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন তারা চিন্তা করে, মুসলিম জাতির সাথে ক্রুসেডযুদ্ধে কেন বারবার তাদের পরাজয় হয়েছে? এর মূল কারণ কী? মুসলিম জাতি কেন মরেও মরে না? কীভাবে আবার সতেজ হয়ে ওঠে? তাদের এই সঞ্জীবনী শক্তির মূল উৎস কোথায়?
>
> সবার আগে এটা চিন্তা ও গবেষণা করে বের করতে হবে এবং ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বের যে তিন-চতুর্থাংশের ওপর মুসলি মজাতির অধিকার রয়েছে, তার ওপর এমনভাবে আমাদের অধিকার জমাতে হবে, যেন মুসলিম জাতি পুনরায় সেখানে পুনরুজ্জীবিত হতে না পারে। এ অভিজ্ঞতা তাদের পূর্ণমাত্রায় ছিল, মুসলিম জাতি এমন কঠিন প্রাণ; যাদের মারলেও মরে না। আবার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
>
> এ উদ্দেশ্য হাসিল করতে তারা ইসলাম ও মুসলিম জাতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করে। এই কাজের জন্য তারা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়ে 'প্রাচ্যবিদ সংঘ' গঠন করে। ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টি পোপ তথা পাদরিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন একটি দল; যাদের কাজ হলো প্রকাশ্যে শত্রুতা করা নয়; কিন্তু গোপনে ইসলাম ও মুসলিম জাতির সাথে সূক্ষ্ম শত্রুতা করে তাদের সর্বদিক দিয়ে শক্তিহীন ও মর্যাদাহীন করা এবং এইভাবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিকে সর্বনিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত করা। তারা মুসলিম জাতির প্রচলিত সকল ভাষা ও বিষয় বিশেষত আরবি ভাষা এবং আরবি ভাষায় লিখিত হাদিস-তাফসির-ফিকহ-তাসাউফ-ইসলামি ইতিহাস-ইসলামি বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা করে।
>
> এই শিক্ষার মাধ্যমে তারা জানতে পারে, মুসলিম জাতির সর্বশক্তির মূল উৎস কোথায়? তাদের মন-মস্তিষ্ক, নৈতিক চরিত্র কোন অফুরন্ত শক্তি-উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত; যেখান থেকে তাদের মন-মস্তিষ্কে এবং নৈতিক চরিত্রে অনবরত শক্তি সঞ্চারিত হতে থাকে? এ শক্তিকে কিছুতেই বন্ধ করা যায় না কেন? কী উপায়ে এই অফুরন্ত শক্তির যোগসূত্র ছিন্ন করা যাবে?
>
> কারণ মূল শক্তি সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলে আপনা-আপনিই মন-মস্তিষ্ক শুষ্ক হয়ে যাবে এবং নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। তখনই বৃক্ষ ফল-ফুলশূন্য হয়ে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে জ্বালানি কাঠে পরিণত হবে; এই চিন্তাতেই তারা মগ্ন থাকে।
>
> পূর্ণ এক শতাব্দীকাল গবেষণার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, মুসলিম জাতির মধ্যে একটি অমর-অফুরন্ত সঞ্জীবনী শক্তি আছে। সে শক্তির নাম হলো 'জিহাদি প্রেরণা'। অর্থাৎ ইসলামের খেদমতের জন্য জীবন তাদের কাছে তুচ্ছ। ইসলামের খেদমতের খাতিরে, মুসলিম জাতির উন্নতি কল্পে

দাওয়াতের এই প্ল্যাটফরমের বৈধতার রহস্য

পাঠকের মনে কৌতূহল জাগতে পারে, একজন অমুসলিমকে কেন জোর করে বা আগ বেড়ে মুসলিম বানাতে হবে? উপরন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের পক্ষ থেকে এর অনুমোদনকে মেনে নেওয়া বা বোঝার লজিক বা যৌক্তিকতা কী?

জবাবের আগে আরেকটি প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন। বিশ্বের যেকোনো রাষ্ট্রের নাগরিকের ওপর সেই দেশের সংবিধান মানা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর তাকে কেন বাধ্য করা হয়? অথচ তারও রয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য

> ব্যক্তিগত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। এই জিহাদি প্রেরণা তারা লাভ করে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা থেকে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মন-মগজ এমনভাবে গঠন না করা যাবে, যার ফলে কুরআন-হাদিসের শিক্ষার আলো থেকে তাদের অন্ধকারে ফেলে রাখা যায়; অথচ তারা তা টেরও পাবে না, আফসোসও করবে না, আন্দোলনও করবে না; বরং কেউ কেউ আগ্রহ ও আনন্দও প্রকাশ করবে ততক্ষণ এই কঠিন প্রাণ জাতিটিকে পূর্ণরূপে একটি গোলাম জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হবে না।
>
> এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টি নানা দিক দিয়ে কাজ শুরু করে। একদিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিষয়বস্তু থেকে কোনোটি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করাতে আরম্ভ করে। আরেক দিকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তারা যেসব মুসলিম দেশ দখল করতে থাকবে, সেসব দেশে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ভাষা-সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়াবলির ভেতর দিয়েই যথাসম্ভব কুরআন প্রচারিত সনাতন সত্যের মূলে আস্তে আস্তে কুঠারাঘাত করতে থাকবে। এবং কুরআন-হাদিসের সত্যিকারের শিক্ষা থেকে শিক্ষিত যুবকদের অজ্ঞ ও বঞ্চিত রাখার সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। *শত্রু থেকে হুঁশিয়ার থাকো* : ১১-১৩

আমরা দেখি—বর্তমানে তারা তাদের মিশনে সফল। জনসমাজে তারা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে, জিহাদ মানেই সুশৃঙ্খল পরিস্থিতির বিঘ্নতা সৃষ্টি ও অহেতুক মারামারি। অথচ এটা এমন একটি বিষয়, যার জন্য ইসলাম প্রশংসার দাবিদার। মুসলিম জাতির অস্তিত্বের ভিত্তি।

তারা বলে—ইসলাম শান্তির ধর্ম। হ্যাঁ, ইসলাম অবশ্যই শান্তির ধর্ম। ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যাই এটা। তবে সেই শান্তি আপনা-আপনি আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে নামবে না কিংবা মাটি ভেদ করে চারাগাছ হয়ে উঠে আসবে না; বরং জিহাদই হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণতাদানের মাধ্যম। কারণ, এর পদ্ধতি হলো, সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত থেকে মুক্ত করে তাঁর বিধান ও অনুশাসনের সামনে আত্মসমর্পণ করানো।

ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ দাইমাহ, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৪-তে আছে—

> যারা ইসলামি দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়েছে এবং কর্ণপাত করেছে, তাদের মাঝে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে দলিল-প্রমাণ দিয়ে। আর যারা উদ্ধত, দাম্ভিক-অহংকারী ও গোঁয়ার তাদের মাঝে প্রসারিত হয়েছে শক্তি ও তরবারির মাধ্যমে; যে পর্যন্ত না তারা নত হয়েছে, অহংকার-দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করেছে এবং সবশেষে সত্য ও বাস্তবতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

মোটকথা, ইসলাম 'প্রাণীহত্যা মহাপাপ' বৌদ্ধধর্মের এই অযৌক্তিক বক্তব্য স্বীকার করে পাগলা কুকুর বা বিষধর গোখরাকেও যেমন ছেড়ে দিতে বলে না আবার 'কিছু মানুষের বাঁচার জন্য কিছু মানুষকে চুষে মারতে হবে' পুঁজিবাদের এই ভ্রান্ত থিওরি অনুযায়ী নির্বিচারে ও গণহারে হত্যা-লুণ্ঠনের অনুমতিও দেয়নি; বরং বুঝেশুনে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে। (অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত)

বি. দ্র. : বর্তমানে প্রকৃত ও খাঁটি 'আহলে কিতাব' বলতে গেলে নেই। নামকাওয়াস্তে যারা নিজেদের আহলে কিতাব বলে দাবি করে, তাদের ওপর মুশরিকদের হুকুম-আহকামই প্রযোজ্য হবে।

নাগরিক ও শাসকের সাথে তারও রয়েছে আধিকারিক সমতা। কাজেই সে কেন অন্যের প্রণীত আইনের অধীন হবে?

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব মনে মনে বোঝার পরে প্রথম প্রশ্নের জবাব হলো, নিঃসন্দেহে মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই ধরণির বুকে আল্লাহ তায়ালার রাজত্ব ও তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্যই। মানুষের অস্তিত্ব লাভ ও তার সৃষ্টির রহস্য এটাই এবং আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীতে 'খিলাফত' শব্দ দ্বারাও এটাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿٣٠﴾

> স্মরণ করেন ওই সময়কে—যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।[৯৩]

এই সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের ফালসাফাহ বা দর্শন আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং 'এই দুনিয়ার হুকুমত কেবল নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক আল্লাহর'—এই কথা মনে-প্রাণে মেনে নেওয়ার ওপর এর ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। কারণ, তিনি একাই মানবজাতির মহান স্রষ্টা। তিনি একাই নিখিল জাহানের একচ্ছত্র মালিক। এবং তিনিই আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পর থেকে অদ্যাবধি স্থির ও নিয়মমাফিক গতিশীল রেখেছেন।

কাজেই এই কথা মাথায় কীভাবে আসে যে, আল্লাহর গোলামের পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর সেই গোলামের প্রণীত ও বানানো নীতিমালা ও সংবিধানের পূর্ণ আনুগত্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক হবে; অথচ একই রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিজের হুকুম-আহকাম ও নিয়মনীতির আওতাধীন রাখার কোনো অধিকারই নিখিল জাহানের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র অধিপতির থাকবে না? তা কীভাবে হয়?

এই সকল বান্দা ওই প্রকৃত ও আসল মালিক ও স্রষ্টার অধীনতা গ্রহণ করবে এবং ছড়ানো-ছিটানো নানা বাদ-মতবাদ ও বিশ্বাস-দর্শন ছুড়ে ফেলে সেই অবিনশ্বর স্রষ্টা ও দয়াময় প্রতিপালকের মনোনীত ও প্রণীত দ্বীন ও অনুশাসন বরণ করবে—এতে অবাক হওয়ার কী আছে?

---

৯৩ সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০

পৃথিবীতে মানুষ যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান কার্যকর ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেহেতু মানুষকে মানুষের মাধ্যমেই অধীনতা ও আহকামের অনুগত করা হয়। সে যখনই এই দ্বীনে প্রবেশ করে, তখনই সে ইসলামি হুকুমত ও ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে জানমাল কুরবান ও বিসর্জন দেওয়ার ওপর অটোমেটিক আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এটা।

এ কথা বুঝে নেওয়ার পর এরও আর কোনো গুরুত্ব থাকল না যে, অত্যাধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই বিংশ বা একবিংশ শতাব্দীতেও এমন কোনো বুদ্ধিজীবী বা বিবেকবান মানুষ থাকতে পারে, যে এই সিম্পল অথচ বাস্তব কথাটা বুঝতে অনাগ্রহী বা অক্ষম কিংবা এর ওপর আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হতে অনিচ্ছুক। কারণ, পৃথিবীতে এমন লোকের উপস্থিতিও স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক বিষয়। ইসলামের খেলাফ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেডার শ্রেণি মানবসমাজে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তে এ ধরনের লোক থাকা অবাস্তব বা আশ্চর্যজনক নয়; বরং থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। এমন লোকদের কাছে মানবিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রতি এতটুকু দয়ামায়া নেই, যতটুকু প্রচেষ্টা ওরা এতে ক্ষতি করতে করে থাকে।

এমন লোকদের কাছে স্বাধীনতার মূল্য ও মর্যাদা কী, যারা নিজেদের সাথেই মিথ্যা বলে এবং স্বজাতির সামনে নির্জলা মিথ্যাচার করে? মানুষের সামনে ওরা ইসলাম নিয়ে মিথ্যাচার করে। ইসলামের ঘৃণ্য চিত্র প্রদর্শন করে এবং মুসলিমদের সম্পর্কে এমন বিশ্রী ও করুণ চিত্র তুলে ধরে, যেন আজও আরব মুসলিমরা ছন্নছাড়া হয়ে তাদের উট ও চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মতলব হলো— ইসলামকে অনুধাবনের চিন্তাচেতনা ও প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা এবং পর্যালোচনা ও গবেষণার উদ্দীপক প্রভাবকে মাকড়সার অতি দুর্বল জাল বিস্তার করে নিজেদের কবজায় বন্দি করা। যেন মানুষের ওপর এমন জুলুম ও জোরজবরদস্তির দুঃশাসন চরম ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত ও বজায় রাখতে পারে।

এখানে এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না, পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে দাওয়াতি কার্যক্রম চালানো, হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে আলাপ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করা এবং আন্তরিকতা ও হৃদ্যতার সাথে উপদেশ প্রদান ইত্যাদি হলো সর্বপ্রথম জরুরি ও অপরিহার্য বিষয়। মুসলিমরা যখন সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে, তখন প্রত্যেকের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাবে, ইসলাম শুধুই উপকারী ধর্ম

নয়, বরং ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। এবং ইসলামি অনুশাসনই প্রকৃতি ও বাস্তবতার অনুকূল ও উপযোগী। নওমুসলিম যেই এলাকার যেই ভাষার যেই জাতীয়তারই হোক না কেন, সে এই ধর্ম ও ব্যবস্থাপনায় তার হারানো ও সন্ধানী বিষয় খুঁজে পাবে। এবং অনস্বীকার্য সত্য ও বাস্তবতা হলো—এই ধর্ম থেকে সে-ই পিছুটান দেয় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, যার হৃদয় বিদ্বেষ ও বৈরিতায় ভরপুর এবং যে মুসলিমদের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার নজরে দেখে। এটাই দেশে দেশে ইসলাম ও ইসলামের মহান দায়িদের প্রতি তাদের অন্তর্জ্বালা ও মনোবেদনার বড়ো দলিল।

আবার এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না, যেই আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের আলোচনা পেছনে করা হয়েছে, সেটা নাস্তিক-মুরতাদ-মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজারি মুশরিক এবং তাদের অনুরূপ ও সমমনা জাতির সাথেই নির্দিষ্ট। সেহেতু আহলে কিতাবদের শুধু ইসলামি সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা মেনে নিতে বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রেখে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং মুসলিমদের সাথে বসবাস করা তাদের সঠিক পথের দিশা দেবে এবং তাদের আকিদা বিশুদ্ধকরণ ও দৃঢ়করণে উদ্বুদ্ধ করবে।

* * *

পত্র-রাষ্ট্রদূত সংশ্লিষ্ট আহকাম

রাষ্ট্রপ্রধান ও গোত্রীয় আমিরদের কাছে পত্র পাঠানোর ঘটনাবলি থেকে অসংখ্য মাসয়ালা উদ্ভাবিত ও নির্গত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো—

০১. নবিজি সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য শেষ নবি

নবিজির দাওয়াত সর্বব্যাপী ও সর্বজনীন। (এটা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম প্রধান আকিদা।) কারণ, তিনি গোটা মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরিত। (সুরা হজের শেষাংশে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে।) তাঁর দাওয়াতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তার দাওয়াত বিশেষ কোনো জাতির মধ্যে আবদ্ধ নয়; বরং পুরো মানবগোষ্ঠীই তাঁর দাওয়াতের প্ল্যাটফরম ও ক্ষেত্র। এমনকি জিনজাতিও তার দাওয়াতের অধীন। (এর প্রমাণ রয়েছে সুরা জিনে।) তার দাওয়াত নির্দিষ্ট কোনো গোত্রীয়-বংশীয় অথবা নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কোনো দলীয় প্রকৃতির নয়; যেমনটি বনি ইসরাইলের নবিদের বেলায় ছিল। এ কারণেই তিনি তাঁর দাওয়াতকে গোটা বিশ্বের সকল কর্ণধার ও শাসকদের কাছে পৌঁছাতে মনোনিবেশ করেন।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগের সুপার পাওয়ার কিসরা-কাইসার-নাজ্জাশিসহ অন্যান্য প্রতাপশালী ও ক্ষমতাধর রাজা-বাদশাহ ও স্থানীয় গোত্রপতিদের কাছে পত্র পাঠান এবং তাদের আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দেন।

০২. খ্রিষ্টানরা আর প্রকৃত আহলে কিতাব নয়

ঈসা আ.-এর শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত দাবিদার সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও তার পক্ষাবলম্বনকারী সভাসদ দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেই দিক অবলম্বন করেছে, তাতে পরিষ্কার হয়েছে, বহু আহলে কিতাব আত্মম্ভরিতা ও আত্মগরিমায় ডুবে গিয়ে সত্য ও হক গ্রহণে কতটা দূর ও গভীর পর্যন্ত মিথ্যা ও অবাস্তবতায় নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এরা সেসব লোক, যাদের কাছে ধর্মের সংজ্ঞা ছিল সামাজিক প্রথা ও অন্ধ অনুসরণ এবং অযৌক্তিক গোঁড়ামির মিশ্রিত রূপ। তারা ধর্মকে হক-বাতিলের দৃষ্টিতে দেখত না। ঐশী বাণীর নামে যতটুকুই তারা আঁকড়ে ধরে ছিল, ততটুকু ছিল তাদের বর্ণনার একাংশ এবং তাদের গোঁড়ামি ও পৃথক জাতিসত্তার প্রকাশস্থল।

০৩. আংটিসংক্রান্ত মাসয়ালা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি বানানো থেকে বোঝা যায়, সাধারণত আংটি পরা বৈধ। নবিজির আংটি ছিল রূপার। এই ঘটনা থেকে আরও বোঝা যায়—আংটির ওপর পরিধানকারীর নাম খোদাই করাও জায়িজ। এমনকি নবিজি হাতের যেই আঙুলে আংটি পরিধান করেছেন, সেই আঙুলে পরা মুসতাহাব বলেও অনেক আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নবিজি বাম হাতের[৯৪] কনিষ্ঠ আঙুলে পরতেন।

০৪. দাওয়াতের জন্য বিদেশি ভাষা শেখার গুরুত্ব

নবিজির এই আমল দ্বারা বোঝা যায়—ইসলামের দাওয়াত এবং তাঁর নবুয়ত-রিসালাতের সুসংবাদ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ও কোনায়-কোনায় পৌঁছাতে যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যত ধরনের মাধ্যম ও উপায় গ্রহণ করা যায়, তার সব করতে হবে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ভাষাজ্ঞান। যেসব সম্প্রদায় বা জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছানো প্রয়োজন এবং ইসলামের হুকুম-আহকাম ও মৌলিক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা দরকার প্রয়োজনে, তাদের ভাষাজ্ঞানও অর্জন করতে হবে। আমরা দেখেছি—নবিজি এক দিনে ছয় দিকে ছয়জন রাষ্ট্রীয় বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। ছয়জনের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ গন্তব্য-এলাকার ভাষাজ্ঞান ছিল।

---

৯৪ পুরুষদের জন্য বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল ছাড়া অন্য কোনো আঙুলে পরার অনুমতি নেই। অবশ্য নারীরা যেকোনো আঙুলে পরতে পারবে। [দারুল ইফতা বাননূরি টাউন-এর ফাতওয়া। তাদের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।]

০৫.আত্মশুদ্ধি, দাওয়াত ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা—তিন কাজ

মুসলিমদের সত্তাগত সংশোধন ও সংস্কারকর্মে নবিজির এই ধারাবাহিক কর্মসূচি বোঝায় যে, প্রথমে মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম আঞ্জাম দেওয়া এবং নিজেদের ঈমান-আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ করা মুসলিমদের ওপর আবশ্যক। আত্মসংশোধনের এই দৌড়ঝাঁপে যখন তারা বিশাল একটি ময়দান অতিক্রম করবে এবং ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে এবং সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে পারবে, তখন তাদের দ্বিতীয় প্ল্যাটফরম তৈরি হবে। অর্থাৎ এখন তারা অন্যদের মাঝেও দাওয়াতি মিশন পরিচালনা করতে পারবে। কারণ, নবিজি চাইলেই কিন্তু বহু আগেই রাজা-বাদশাহদের কাছে দূত পাঠাতে পারতেন; কিন্তু ওই অবস্থায় এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার উপযুক্ত মাঠ তৈরি ছিল না।

* * *

আমাদের ভালো করে জেনে রাখা উচিত, মুসলিমদের আত্মসংশোধন অন্যদের মাঝে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। কারণ, মানুষের মজ্জাগত স্বভাব হলো, মানুষ আখলাক ও ইমারত অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও নেতৃত্বদানে পবিত্র ও উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। যেন তারাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে। তার অনুগামী হতে পারে।

আজকে গোটা বিশ্বের মুসলিম জাতি যদি মুসলিম হওয়াকে গর্বের বিষয় নিশ্চিতভাবে জেনে ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি বিধিবিধান ও সংবিধান নিজেদের সমাজে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় বলা যায়—আগামীর আফ্রিকার সভ্যতাহীন ঘন বনজঙ্গল হবে ইসলামের প্রদীপ্ত আলোয় আলোকিত, ইউরোপের দূরদূরান্তের নগর-বন্দর ও নোংরামির আঁধারে নিমজ্জিত এলাকা হবে ইসলামের নির্মল আলোকচ্ছটায় ঝলমল।

এসব চিঠিপত্র সপ্তম হিজরিতে পাঠানো হয়েছে; যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের আগে এসব পত্র পাঠানো হয়। এর ওপর সাধারণত সকল সিরাত বিশেষজ্ঞের ঐকমত্য রয়েছে।

তবে ইমাম বুখারি ব্যতিক্রম মত পেশ করেছেন। তিনি *সহিহ বুখারি*-তে এই অধ্যায়টিকে অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয় ও নবম হিজরিতে সংঘটিত 'গাজওয়ায়ে তাবুক'-এর অধ্যায়ের পরে এনেছেন। ফলে বোঝা যায়—নবিজি পত্র-দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন নবম হিজরিতে।

তবে ইবনে হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) রহ. এই বৈপরীত্যের সমাধান হিসেবে লেখেন—উপর্যুক্ত মতভেদপূর্ণ দুই মতের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। তা এভাবে যে, নবিজি রোমক সম্রাট কাইসারের কাছে দুইবার পত্র পাঠিয়েছেন। প্রথমবার অর্থাৎ সপ্তম হিজরির কথা তো সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্বজনবিদিত। আর দ্বিতীয়বার অর্থাৎ নবম হিজরিতে পাঠানোর সুস্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে—*মুসনাদু আহমাদে*।

অনুরূপ হাবশার বাদশাহ মুসলিম নাজ্জাশিকে নবিজি এক পত্র দেন। তার ইন্তেকাল হলে নবিজি তার গায়েবানা জানাজার সালাতও আদায় করেন।[৯৫] তারপর পরবর্তী নতুন নাজ্জাশিকেও নবিজি আরেকটি পত্র পাঠান। সুতরাং দুই বর্ণনায় আর কোনো সংঘর্ষ থাকে না।

* * *

---

৯৫ গায়েবানা জানাজা ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত নয়। কারণ, এখানে হানাফি মাজহাব প্রচলিত। আর হানাফি ও মালিকি ফকিহগণের মতে, এ সালাত বৈধ নয়। কারণ, তাদের মতে, জানাজার সালাত সহিহ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো 'লাশ সামনে উপস্থিত থাকা'।

অবশ্য শাফিয়ি ও হাম্বলি ফকিহগণ একে বৈধ বলেছেন। তাদের দলিল সরাসরি উপর্যুক্ত ঘটনা; কিন্তু হানাফি ও মালিকি ফকিহদের পক্ষ থেকে এর একাধিক উত্তর রয়েছে, যেমন—

- **এক.** নবিজির মুজিজাস্বরূপ লাশ সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। তাহলে তো আর গায়েবানার বিষয় থাকে না।
- **দুই.** লাশ সামনে উপস্থিত করা হয়নি। তবে চারের অধিক বিয়ে যেমন নবিজির বিশেষত্ব, ঠিক তেমন এই সালাতও তার বিশেষত্ব।
- **তিন.** এটা খুজাইমা রা.-এর একাই দুজন সাক্ষীর স্থলবর্তী হওয়ার ঘটনার মতো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র। আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা সর্বজনীন আমল হওয়ার উপযুক্ত নয়। নতুবা নবিজির পবিত্র জীবদ্দশায় অন্যান্য প্রাঙ্গণে শাহাদাতের মতো মুতা রণাঙ্গনেও বিশেষ করে পরপর তিনজন সেনাপ্রধান শাহাদাত বরণ করেছেন। এর প্রতি নবিজি পূর্ব ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। তবুও তাদেরসহ অন্য কোনো সাহাবিরই গায়েবানা জানাজা পড়া নবিজি থেকে প্রমাণিত নয়।
- **চার.** খুলাফায়ে রাশেদিন তথা প্রধান চার খলিফার শাসনামলেও এর হদিস মিলে না।

[সূত্র : দারুল ইফতা দেওবন্দ ও দারুল ইফতা বাননরি টাউন, অনলাইন থেকে সংগৃহীত এবং অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।]

কাজা উমরাহ আদায়

অনাদায়ি উমরাহ কাজা আদায়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজওয়ায়ে খাইবার এবং দিকে দিকে বাহিনী পাঠানোর ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়েই এ বছরের জিলকদ মাসে আগের বছরের উমরাহর কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওনা হন। এটাই সেই মাস—এক বছর আগে যে মাসে মক্কার কাফিররা নবিজিকে উমরাহ পালনে বাধা দিয়েছিল; কিন্তু এবার তিনি সেই অনাদায়ি উমরাহর কাজা আদায় করেন।

উমরাহতুল কাজার সাহাবি সংখ্যা

ইবনে সাআদ তার *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*-এ লেখেন—

> এ বছর নবিজির সাথে দুই হাজার সাহাবি উমরাহ পালন করেন। স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী ও গাজওয়ায়ে খাইবারে শাহাদাত বরণকারীরা ছাড়া হুদাইবিয়া চুক্তিতে উপস্থিত সকল সাহাবি এই দুই হাজারের মধ্যে শরিক ছিলেন। উক্ত দুই শ্রেণি ছাড়া হুদাইবিয়া চুক্তিতে উপস্থিত কোনো সাহাবি এবার অনুপস্থিত ছিলেন না।[৯৬]

ইবনে ইসহাক বলেন—

---

৯৬ তাবাকাতু ইবনে সাদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬৭

কুরাইশরা পরস্পরে আলোচনা করতে থাকে, মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীরা দারিদ্র্য, কষ্ট-ক্লেশ ও নানা বিপদাপদের শিকার। ইবনে ইসহাক আরও লেখেন—মুশরিকরা দারুন নদওয়ার পাশে একত্র হয়ে কন্ট্রোল রুম থেকে পর্যবেক্ষণের মতো সবাই প্যাঁচার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে নবিজি ও সাহাবায়ে কিরামের চলাফেরার অবস্থা ও দৃশ্য দেখতে থাকে। তারপর নবিজি যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পরিহিত ইহরামের চাদরটি একটি বিশেষ অবস্থায় রাখেন। ডান বগলের নিচ থেকে বের করে বাম কাঁধের ওপর রাখেন। এবং ডান বাহু চাদরের ভেতর থেকে বের করে আনেন। তারপর বলেন—'আল্লাহ তায়ালা ওই বান্দার প্রতি রহম করবেন, যে আজ এই মুশরিকদের সামনে তার শক্তি-সামর্থ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করবে।'

তারপর তিনি রুকনে ইয়ামানিতে[৯৭] হাত লাগিয়ে দ্রুত চলা শুরু করেন। সাহাবায়ে কিরামও নবিজির সাথে সাথে দ্রুত চলতে থাকেন। নবিজি তিন চক্করেই ওভাবে কাঁধ উঁচু করে সিনা টানটান করে এবং দ্রুত কদম উঠিয়ে চলতে থাকেন। নবিজির দেখাদেখি সকল সাহাবিও সেভাবে চলেন।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন—সাহাবায়ে কিরাম মনে করছিলেন, 'রমল' বুঝি এবারের পর আর কখনো করা লাগবে না। কারণ, নবিজি সবাইকে রমলের নির্দেশ দিয়েছিলেন কাফিরদের বিদ্রুপাত্মক কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে। কারণ, সাহাবিদের প্রাথমিক চলাফেরা দেখে তারা বলা শুরু করে, 'হায়রে! ইয়াসরিবের (মদিনার) আবহাওয়া এই মুসলিমদের রোগা ও মরা বানিয়ে ফেলেছে।' কিন্তু পরে বিদায় হজেও যখন নবিজি রমল করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম স্পষ্ট বুঝে নেন—এটি হজেরই একটি সুন্নাত।[৯৮]

নবিজির সাথে মাইমুনা বিনতু হারিসের বিয়ে

নবিজি এই সময়েই মাইমুনা বিনতু হারিস রা.-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এক বর্ণনায় আছে—নবিজি ইহরাম অবস্থায়ই বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। আরেক বর্ণনায় আছে—নবিজি হালাল অবস্থায় বিয়ে সম্পন্ন করেছেন। বিয়ে পড়ান আব্বাস

---

৯৭ কাবাঘরের একটি কোনা। ইয়ামানের দিকে বলে একে রুকনে ইয়ামানি নাম দেওয়া হয়েছে। একে রুকনে জানুবিও বলে।

৯৮ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৭০

ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.। যিনি একদিকে নবিজির চাচা, আরেক দিকে মাইমুনা রা.-এর বোন উম্মে ফজলের স্বামী। অর্থাৎ, মাইমুনা রা.-এর দুলাভাই।"

কুরাইশদের বিগত বছরে বেধে দেওয়া নবিজির মক্কায় অবস্থানের তিন দিন যখন পূর্ণ হয়, তখন তারা আলি রা.-এর কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠায় এবং বলে দেয়, তোমরা আলিকে গিয়ে বলো—সে যেন তার গুরুকে গিয়ে বলে, নির্ধারিত তিন দিন কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। অতএব, এখন তুমি (বাহিনী নিয়ে) চলে যাও। আলি রা. নবিজিকে খবর দিলে তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে ফিরতি সফর শুরু করেন।[৯৯]

মদিনা ফেরার পথে 'তানয়িম'[১০১]-এর নিকটবর্তী 'সারিফ'[১০২] নামক স্থানে নবিজি মাইমুনা রা.-এর সাথে বাসর রাত উদযাপন করেন। তারপর জিলহজ মাসে নবিজি সাহাবিদের নিয়ে মদিনা এসে পৌঁছেন।

* * *

৯৯ *উয়ুনুল আসার*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৮

১০০ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৫

১০১ তানয়িম। মক্কা-মদিনার মাঝখানে দু-পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি উপত্যকা।

১০২ সারিফ। মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তানয়িম ও ওয়াদিয়ে ফাতিমার মধ্যবর্তী একটি বড়ো উপত্যকা। বর্তমানে 'আন নাওয়ারিয়্যাহ' নামে পরিচিত।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এই উমরাহর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ওই ওয়াদার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন, যেটার প্রতিশ্রুতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে সাহাবায়ে কিরামকে দিয়েছিলেন যে, তারা অচিরেই বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করবেন। বাইতুল্লাহ জিয়ারত ও তাওয়াফ করবেন।

পেছনে গিয়েছে, হুদাইবিয়া চুক্তির বছরেই মক্কায় প্রবেশ এবং বাইতুল্লাহ জিয়ারত ও তাওয়াফ নিয়ে ফারুকে আজম রা. নবিজিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। নবিজিও প্রবেশ ও জিয়ারতের ব্যাপারে নিশ্চয়তার সাথে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন। তবে তিনি চলতি বছরের ধারণার ভুল ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চলতি বছরের কথা তো আমি বলিনি। (কারণ, নির্ধারিত সময়টা আমার অজানা।)' এবার এক বছর পরে উমরাহ আদায় মূলত সেই ওয়াদারই বাস্তবায়ন এবং প্রতিফলিত রূপ। এব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا.

অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসুলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে—মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে, নির্ভয়ে। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) জেনেছেন যা তোমরা জানোনি। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।[১০৩]

১০৩ সুরা ফাতহ, আয়াত : ২৭

তারপর এটাই ওই উমরাহ, যা ওই মহাবিজয়ের দ্বারপ্রান্ত ও সূচনা বলে প্রমাণিত হয়েছে যেই বিজয় ও সাহায্য পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়েছে। নবিজির সাথে সাহাবায়ে কিরামের যেই বিশাল জনস্রোত এসেছিল এবং যেই উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জোশের সাথে তারা তাওয়াফ-সায়ি-সহ উমরাহর সব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, সেই জনসমাবেশ ও জনতার ঢল এবং জোশ-আবেগ-উদ্দীপনা দেখে মক্কার কাফিররা হতভম্ব ও পেরেশান হয়ে যায়। মুসলিমদের তেজোদীপ্ত আচরণে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এবং তাদের ভয় ও প্রভাব মনের গভীরে ঢুকে যায়। কারণ, এতদিন তাদের ধারণা ছিল, মুহাম্মাদের অনুসারীরা মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিব (মদিনা) গিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে, প্রতিকূল পরিবেশে থেকে এবং ইয়াসরিবের মৌসুমী কালাজ্বরে ভুগে জীর্ণশীর্ণ ও বল-শক্তিহীন হয়ে পড়েছে; কিন্তু এখন সাহাবায়ে কিরামের ফুরফুরে মেজাজ ও মানসিক অবস্থা এবং বুক ফুলিয়ে চলাফেরার চিত্র দেখে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ পালটে যায়। তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়; বরং সাহাবায়ে কিরামের জোশ ও কর্মোদ্দীপনা দ্বিগুণ হয়ে তাদের অন্তরে বসে যায়।

ইমাম মুসলিম (২০৬-২৬১ হি.) রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, মক্কার কাফিররা যখন সাহাবায়ে কিরামকে তাওয়াফের সময় রমল করতে এবং হৃষ্টপুষ্ট ও চঞ্চল অবস্থায় সায়ি করতে দেখে, তখন একজন আরেকজনকে বলতে থাকে—আরে! ভালো করে দেখো তো, এরাই কি সেই মুসলিম, যাদের ব্যাপারে তোমরা মনে করতে, ইয়াসরিবের কালাজ্বর এদের অক্ষম বলহীন ও কাবু করে ফেলেছে! খেয়াল করে দেখো তো, অমুক অমুকের চেয়ে কত শক্তিশালী![১০৪]

এতে কোনো সন্দেহ নেই, এই উমরাহ যেভাবে এবং যেই প্রদর্শনীতে সুসম্পন্ন হয়েছে, তা কাফিরদের অন্তরে গভীর রেখাপাত ও প্রবল প্রভাব বিস্তার করে এবং এই উমরাহ আগামীতে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সহজেই মক্কা জয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। অতি শীঘ্রই সেগুলো স্পষ্ট করে পর্যালোচনায় আনা হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

১০৪ সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৫



কাজা উমরাহ-সংশ্লিষ্ট আহকাম

এক. 'ইদতিবা' (اضطباع) ও 'রমল' (رمل) মুসতাহাব হওয়া। এগুলো শরয়ি দুটি পরিভাষা।

- **০১.** পরিহিত ইহরামের চাদরটি ডান বগলের নিচ থেকে বের করে বাম কাঁধের ওপর রাখাকে ফিকহশাস্ত্রের ভাষায় 'ইদতিবা' বলে।
- **০২.** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে তাওয়াফের সময় এভাবেই ইহরাম বাঁধতে হয়। এটা মুসতাহাব।
- **০৩.** তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে কাঁধ উঁচু করে সিনা টানটান করে এবং দ্রুত কদম উঠিয়ে চলার নাম 'রমল'। যেই তাওয়াফের পরে সায়ি (সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি) করা লাগে, সেই তাওয়াফে রমল করতে হয়। কারণ, নবিজি এমনটাই করেছেন। এটাও মুসতাহাব। তবে এগুলো নারীদের জন্য নয়। শুধু পুরুষদের করণীয়।

দুই. কোনো কোনো ফকিহর মতে, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা জায়িজ। তাদের দলিল উপর্যুক্ত ঘটনা। কিন্তু জমহুর ফুকাহার মতে, নিজে বিয়ে করা কিংবা অন্যের বিয়ের ওকালতি (ঘটকগিরি) কোনোটাই জায়িজ নয়।[১০৫]

---

১০৫ *মুগনিল মুহতাজ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৮

তবে হানাফিদের মতে, সার্বিকভাবে বিয়ে নাজায়িজ নয়। কারণ, তারা হাদিসে বর্ণিত 'নিকাহ' (نكاح) শব্দের অর্থ করেন 'জিমা' (جماع) (সহবাস)। যেমনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

أن المحرم لا يَنكِح ولا يُنكِح،

'মুহরিম (ইহরাম পরিধানকারী) নিকাহ করবে না এবং নিকাহ দেবেও না।'[১০৬]

সুতরাং হানাফিদের মতে, অবস্থা ভেদে বিয়ের অনুমতি রয়েছে। তবে সহবাস করা জায়িজ নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উমরাহসহ মোট চারটি উমরাহ ও একটি হজ করেছেন। ইমাম মুসলিম রহ. আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোট চারটি উমরাহ করেছেন। চতুর্থটি ছাড়া বাকি সবগুলোই তিনি (পৃথকভাবে) জিলকদ মাসে আদায় করেছেন। শেষেরটি বিদায় হজের সময় হজের সাথেই আদায় করেন। প্রথমটি হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে জিলকদ মাসে। দ্বিতীয়টি পরবর্তী বছর জিলকদ মাসে। তৃতীয়টি 'জিরানা'[১০৭] (جعرانة) থেকে হুনাইনে[১০৮]র (حنين) গনিমত বণ্টন করে জিলকদ মাসে। চতুর্থটি হজের সাথে মিলিয়ে। এটিও জিলকদ মাসে ছিল।[১০৯]

* * *

১০৬ *সহিহ মুসলিম* : ১৪০৯, অধ্যায় : নিকাহ পরিচ্ছেদ : মুহরিমের নিকাহ নিষিদ্ধ হওয়া।

১০৭ জিরানা। মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উপত্যকা। এখানে অতীতে একটি সাধারণ গ্রাম ছিল। বর্তমানে এটি নগরীতে পরিণত হয়েছে।

১০৮ হুনাইন। প্রাচীন আরবের বিখ্যাত বাজার 'জুল মাজাজ'-এর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক উপত্যকা। মক্কা ও হুনাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটার।

১০৯ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬০

গাজওয়ায়ে মুতা

সময়কাল ও প্রেক্ষাপট

এই গাজওয়া সংঘটিত হয় অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে। প্রাচীন বৃহত্তর শামের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম মুতা। বর্তমানে এটি জর্ডানের দক্ষিণাংশের জেলা 'কার্ক'-এর একটি অংশ।[১১০]

আরব উপদ্বীপের বাইরে এটাই মুসলিমদের প্রথম গাজওয়া। এত দূরে অভিযান পরিচালনার কারণ ও প্রেক্ষাপট পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম তথা রাষ্ট্রদূত হত্যার অপরাধ।

পেছনে গিয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারিস ইবনে উমাইর আজদি রা.-কে ইসলামের দাওয়াতনামা দিয়ে বাইজান্টাইন শাসিত শামের প্রদেশ বুসরার গভর্নর বরাবর পাঠিয়েছিলেন। অহংকার ও ঔদ্ধত্যে রোগাক্রান্ত গভর্নর আগপিছ না ভেবে সরাসরি দূতকে খুন করে ফেলে। (যা সে যুগেও সভ্য দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক অপরাধ বলে বিবেচিত ছিল।) নবিজির প্রেরিত এই একজন দূতকেই শহিদ করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরাম শাম অভিযানের টার্গেট নেন। ঘোষণার সাথে সাথে তিন হাজার সেনা রণসাজে প্রস্তুত ও জমা হয়ে যায়।

---

১১০ মুতা। রাজধানী আম্মান থেকে ১৪০ আর জেলাশহর কার্ক থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এই গাজওয়ায় নবিজি যদিও শরিক ছিলেন না, তবুও একে গাজওয়া বলে অভিহিত করা হয়। যদিও সংজ্ঞানুযায়ী একে সারিয়্যা বলা উচিত, তারপরও এই যুদ্ধের অপরিসীম গুরুত্ব এবং সাহাবিদের অংশগ্রহণের আধিক্যের দিকে তাকিয়ে সিরাত বিশেষজ্ঞরা একে গাজওয়া বলেই উল্লেখ করে থাকেন।

মুতা অভিমুখে প্রস্তুত সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ী নসিহত ও দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন—

> এই বাহিনীর সেনাপ্রধান জায়িদ ইবনে হারিসা। সে যদি শহিদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর ইবনে আবু তালিব। সেও যদি শহিদ হয়ে যায়, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তারপর সেও যদি শহিদ হয়ে যায়, তাহলে সবাই যাকে পছন্দ করবে, তাকে সেনাপতি বানিয়ে নেবে।[১১১]

নবিজি সেনাপ্রধানদের বলে দেন—

> তোমরা সেখানে গিয়ে প্রথমে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা যদি ভালোই ভালো দাওয়াত কবুল করে নেয়, তাহলে তো আলহামদু লিল্লাহ। অন্যথায় প্রথমে তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইবে, তারপর বীরবিক্রমে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ইবনে ইসহাক বলেন—মদিনা থেকে সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাথে থাকা সাহাবায়ে কিরাম বাহিনীকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. কান্নায় ভেঙে পড়েন। সাহাবারা কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, খোদার কসম, দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হবে বলেও আমি কাঁদছি না, আবার তোমাদের বিচ্ছেদেও কাঁদছি না; বরং আমি নবিজিকে এমন আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি, যেটাতে জাহান্নামের কথা রয়েছে। সেই ভয়েই আমি কাঁদছি। তিনি তিলাওয়াত করেছেন—

وإن منكم الا واردها، كان على ربك حتما مقضيا.

> তোমাদের প্রত্যেকেরই তাতে পৌঁছতে হবে। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা।[১১২]

---

১১১ *সহিহ বুখারি; মুসনাদু আহমদ; তাবাকাতু ইবনে সাআদ।*

১১২ সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৭১

এখন আমি জানি না—জাহান্নামে পৌঁছার পর কীভাবে পার হব?

বাহিনী যাত্রা শুরু করলে সাহাবায়ে কিরাম তার জন্য দুআ করেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আল্লাহ আছেন তোমার সাথে। তিনিই তোমার হিফাজত করবেন এবং সহিহ-সালামতে তোমাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনবেন। এসব কথা শুনে তিনি আবৃত্তি করেন—

لكنني أسأل الرحمن مغفرة *** وضربة ذات قرع تقذف الزبدا

কিন্তু আমি দয়াময় আল্লাহর কাছে চাই ক্ষমা এবং এমন প্রশস্ত আঘাত, যা ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরাবে।

أو طعنة بيدي حران مجهزة *** بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا

অথবা দ্রুত প্রাণসংহারী এমন বর্শার আঘাত চাই, যা রক্তপিয়াসী কাফিরের হাত দিয়ে আমার গায়ে লাগানো হবে। যে কিনা বর্শায় প্রবল শক্তি খাটিয়ে আঘাত করে আমার কলিজা এবং পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলবে।

حتى يقال إذا مروا على جدثي *** أرشده الله من غاز وقد رشدا

এমনকি মানুষ যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন বলবে—আল্লাহ তায়ালা তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন এবং সে সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে।

শত্রুপক্ষ রোমীয়রা যখন খবর পেল, মুসলিমরা মুতা অভিমুখে লংমার্চ শুরু করেছে, তখন তারাও জমা হতে শুরু করে। সম্রাট হিরাকল রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে এক লাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এদিকে গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমরও শাম এরিয়ার লখম-জুজাম-কিন-বাহরা ইত্যাদি আরব গোত্র থেকে আরও এক লাখ সৈন্য জোগাড় করে। এরা রোমকদের সাথে যোগ দেয়।

মুজাহিদরা যখন রোমকদের বিশাল রণপ্রস্তুতির কথা শোনেন, তখন তারা শামের এলাকা 'মাআন'[১১৩]-এ অবতরণ করেন এবং সেখানে দুই দিন অবস্থান করে রণকৌশল ও কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও সলাপরামর্শ করেন।

কোনো কোনো সাহাবি পরামর্শ দেন—আমরা এক কাজ করতে পারি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে রোমীয়দের সৈন্যসংখ্যার খবর দিয়ে চিঠি পাঠাতে পারি; কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বাধা দেন। এ ব্যাপারে তিনি মুজাহিদের সাহস ও উৎসাহ প্রদান করে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন—

> হে লোকসকল, খোদার কসম! যেই কাজ তোমাদের অপছন্দ, সেটা করতেই তো তোমরা ঘর ছেড়ে এতদূর এসেছ। তোমরা তো শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করতেই এসেছ। আমরা তো সংখ্যা ও জনবল বা বাহ্যিক শক্তি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে কাফিরদের মোকাবিলায় নামি না; বরং আমরা লড়াই করি ওই দ্বীনের জন্য এবং ওই দ্বীনের অদৃশ্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, যেই দ্বীন কায়েমের সাথে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মান ও ইজ্জত জড়িয়ে রেখেছেন। সুতরাং তোমরা বীরবিক্রমে এগিয়ে যাও। দুই কল্যাণের একটি তো হাসিল হবেই। হয়তো গাজি, নয়তো শহিদ। হয়তো ইহলৌকিক বিজয়, নতুবা পারলৌকিক সফলতা।

কার্কের অনতিদূরেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। শত্রুপক্ষ খ্রিষ্টান রোমীয়রা সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের এত বিপুল সমাহার ঘটায় যে, ইতঃপূর্বে আরব মুসলিম সেনারা এত আয়োজন ও প্রস্তুতি কোথাও দেখেনি।

সর্বপ্রথম জায়িদ ইবনে হারিসা রা. নবিজির তুলে দেওয়া প্রধান ঝান্ডা নিয়ে লড়াইয়ের সূচনা করেন। সবাই তার সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ে। যুদ্ধ করতে করতে একসময় তার গায়ে বর্শার আঘাত পড়তে থাকে। আঘাতে আঘাতে দেহ চালনির মতো হয়ে যায়। অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

তারপর জাফর ইবনে আবু তালিব রা. ঝান্ডা উঠিয়ে নেন। চিতারাজের মতো ক্ষিপ্রগতিতে তিনি হামলে পড়েন এবং তুমুল লড়াই চালিয়ে যান। শত্রুর ওপর গজব হয়ে তিনি আবর্তিত হন। রণাঙ্গন যখন উত্তপ্ত এবং যুদ্ধের চরম অবস্থা,

---

১১৩ মাআন। জর্ডানের আরেকটি শহর। আরব উপদ্বীপ থেকে লেভান্ট মরুভূমি পর্যন্ত মরুভূমির মালভূমির পশ্চিম উপকূলে ও জর্ডানের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। রাজধানী আম্মান থেকে এর দূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। নগরীটি বর্তমানে মাআন জেলার প্রধান নগরী।

তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে প্রথমে ঘোড়ার পায়ের নলাগুলো কেটে ফেলেন। তারপর সরাসরি পদাতিক লড়াই শুরু করেন এবং নিম্নোক্ত রণসংগীত মুখে আওড়াতে থাকেন—

يا حبذا الجنة واقترابها *** طيبة وبارد شرابها.

আহা! জান্নাত ও তার নৈকট্য কতই-না শান্তির! তার পানীয় কতই-না পবিত্র ও তৃপ্তির!

والروم روم قد دنا عذابها *** كافرة بعيدة أنسابها.

এরা তো ওইসব রোমীয়; আজাব যাদের মাথার ওপর ঝুলন্ত। এরা তো কাফির। এদের সাথে আমাদের বংশীয় তো দূরের কথা, দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

علي إذ لاقيتها ضرابها

আমার ওপর ওয়াজিব, এদের সাথে যদি লড়াইই করি, তাহলে যেন একের পর এক গর্দান উড়িয়ে দিই।

তিনি এভাবেই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে একসময় শহিদ হয়ে যান। শত্রুরা তার ওপর একযোগে হামলা করে তার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। তবে চিন্তা ও ভাবার বিষয়—তার দেহের সম্মুখভাগে পঞ্চাশটি আঘাত থাকলেও পিঠে ছিল না একটিও।[১১৪]

তার শূন্যতা পূরণে ইসলামের ঝান্ডা তুলে ধরেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. এবং নিচের রণসংগীত গাইতে গাইতে সামনে এগিয়ে যান—

أقسمت يا نفس لتنزلنه *** لتنزلن أو لتكرهنه

হে মন, আমি কসম খেয়ে এসেছি, তোকে রণাঙ্গনে নামতেই হবে। সুতরাং খুশি খুশি নিজেই নেমে যা, নতুবা জোর করে হলেও তোকে নামাব।

إن أجلب الناس وشدوا الرنة *** مالي أراك تكرهين الجنة

---

১১৪ সূত্র : *সহিহ বুখারি*

দুনিয়ার মানুষ যদি হা-হুতাশ করতে থাকে এবং ফুঁপিয়েও কাঁদতে থাকে থাকুক; কিন্তু আমার বুঝে আসছে না, তুই স্পষ্ট জান্নাত দেখেও কেন অপছন্দ করছিস?

قد طال ما قد كنت مطمئنة *** هل أنت إلا نطفة في شنة

লম্বা সময় তুই নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে কাটিয়েছিস। এরপরও তোর সাধ মিটে না? আরে, তুই তো পুরোনো মশকের এক কাপ বীর্য ছাড়া আর কিছুই না!

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. এভাবে যুদ্ধ করতে করতে একসময় তিনিও শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন। তার শাহাদাতে মুজাহিদরা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। নবিজির নির্দেশনা মোতাবেক সবাই খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব প্রদান করলে তিনি পতাকা তুলে নেন এবং প্রচণ্ড বেগে ছুটে যান। পরিশেষে রোমকরা পরাজিত হতে বাধ্য হয়। খালিদ রা. ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া পুরো বাহিনী একত্র করে মদিনা অভিমুখে ফিরতি যাত্রা করেন।

ইমাম বুখারি রহ. আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীর মদিনায় আসার আগেই প্রথম তিন সেনাপতির শাহাদাতের খবর দিয়ে দিয়েছিলেন। নবিজি তাদের খবরটা এভাবে দিয়েছিলেন, প্রথমে জায়িদ পতাকা হাতে নেয়। পরে সে শহিদ হয়ে যায়। তার পর জাফর পতাকা সামলায়। একসময় সেও শহিদ হয়ে যায়। তার পর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা উঠিয়ে নেয়। অবশেষে সেও শহিদ হয়ে যায়। (এই কথাগুলো বলার সময় নবিজির দুই চোখ অশ্রুতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়।) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য তরবারির মধ্যে এক তরবারি এই পবিত্র ঝান্ডার মান রক্ষা করেছে এবং তার হাতেই তিনি কাফিরদের মন্দ পরিণতি লিখে দিয়েছেন।

মুতায় কি মুসলিমরা পরাজিত হয়েছিল

দেখা যাচ্ছে—এই হাদিস শরিফের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে, আল্লাহ তায়ালা শেষ পর্যন্ত কিন্তু মুসলিমদের সাহায্য করেছেন। কাফিরদের পরাজিত আর মুসলিমদের বিজয়ী করেছেন। এ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয় হয়েছে, তারা বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে

গিয়েছে, তা কিন্তু নয়। অথচ কোনো কোনো সিরাত বিশ্লেষক এ কথাই লিখেছেন। এবং বলেছেন—'এরপর তারা পরাজিত অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসেন।'

আসলে সিরাত বিশ্লেষকদের যারাই পরাজয় ও ছত্রভঙ্গের কথা লিখেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো—রোমীয়দের শোচনীয় পরাজয়ের পর তাদের পেছনে মুসলিমদের ধাওয়া না করা, শত্রুপক্ষকে শুধু তাদের শিবির এলাকা ছাড়া করা এবং অতিরিক্ত ক্ষতি এড়াতে রণাঙ্গন ও ময়দান থেকে সরে এসে কৌশলে মদিনায় ফিরে আসা। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলো একজন অভিজ্ঞ পারদর্শী চৌকশ ও ঝানু জেনারেলেরই কৌশলগত দিক।

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন—

মাগাজিশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল মাগাজি'-এর লেখক ইমামুল মাগাজি মুসা ইবনে উকবা (আনুমানিক ৫৫/৬০-১৪১ হি.) রহ. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

> তারপর পতাকা তুলে নেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.। তিনি শহিদ হয়ে গেলে সৈনিকরা সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপ্রধান হিসেবে নির্বাচন করে নেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা রোমীয়দের ঘাড়ে শোচনীয় পরাজয়ের জোয়াল উঠিয়ে দেন আর মুসলিমদের উপহার দেন রহমত ও বরকতে ভরপুর এক মহাবিজয়।

আল্লামা ইবনে কাসির (৭০১-৭৭৪ হি.) রহ. বলেন—উক্ত দুই বর্ণনায় সমন্বয়ের সূরত হলো, তিনি সব সৈন্যকে জড়ো করে রাত পার করেন। তারপর সকালে শত্রুপক্ষের সামনে রণকৌশল খাটিয়ে বাহিনীর দুই প্লাটুনের মাঝে অদলবদল করেন। মায়মানা (Right Wing) কে মাইসারা (Left Winger) আর মাইসারাকে মাইমানায় রূপান্তর করেন।"[৩] এতে রোমীয়রা মনে করে বসে, পেছন থেকে বুঝি

---

১১৫ আরবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হতো। এগুলো নিম্নরূপ—

- ০১. কালব (قلب) : মধ্যভাগ (Centre)
- ০২. মাইমানাহ (ميمنة) : দক্ষিণ প্রান্ত (Right Wing)
- ০৩. মাইসারাহ (ميسرة) : বাম প্রান্ত (Left Winger)

প্রত্যেক ভাগের একজন করে আমির (امير) অধিনায়ক বা Commender থাকত এবং এগুলোর মধ্যে ১৫০ মিটারের দূরত্ব রাখা হতো। প্রত্যেক গোত্রীয় দলের নেতাদের বলা হতো আরিফ (عريف) নিম্নপদস্থ অধিনায়ক বা Corporal। এ ধরনের সেনাদলে ১০, ১০০ ও ১০০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকত।

বড়ো সেনাদল গঠনের জন্য এই রেজিমেন্টগুলোর গঠন সহজসাধ্য ছিল, সেইসাথে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করত। প্রত্যেক দল 'আমিরুল আশার' নামক কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। আমিরুল আশার থাকত সেকশন

মুসলিমদের আরও কয়েক প্লাটুন সৈন্য-সাহায্য এসেছে। তারপর তিনি প্রবল বেগে ছুটে যান এবং প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। রোমীয়রা দিগ্বিদিক পালাতে থাকে। পরে তিনি ওদের ধাওয়া করে সময় নষ্ট না করে সোজা মদিনায় ফিরে আসাকেই উপযোগী মনে করেন।[১১৬]

বাহিনী যখন মদিনার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগিয়ে গিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শিশুরাও দৌড়ে গিয়ে যার যার আত্মীয়ের সাথে মিলিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমরা তোমাদের শিশুদের বাহনের ওপর উঠিয়ে নাও। আর জাফরের ছেলেকে আমার কাছে দাও। সাহাবিরা আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে এনে নবিজির কাছে দেন। নবিজি তাকে বাহনের ওপর নিজের সামনে বসিয়ে নেন।

অন্যরা চিৎকার করে ওঠে, হে ফেরারির দল! তোমরা তো আল্লাহর রাস্তা থেকে পালিয়ে এসেছ! এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্যুত্তরে বলেন—না। তারা পালিয়ে আসেনি; বরং ইনশাআল্লাহ আগামীতে হামলার প্রস্তুতি নিতে এসেছে।

* * *

কমান্ডারের অধীন এবং সেকশন কমান্ডার 'আমিরুল জাইশ' (امير الجيش) সেনাপ্রধান Commender in chief-এর অধীনে থাকত।

সামরিক বাহিনীর অন্যান্য অংশ—

- রিজাল (رجال) : পদাতিক বাহিনী (Foot-Soldier)
- ফুরসান (فرسان) : অশ্বারোহী বাহিনী (Rangers/Knights)
- রুমাত (رماة) : তিরন্দাজ বাহিনী (Archer)
- তালিয়াহ (طليعة) : শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্যের জন্য টহলদল (Mobile Cutting Edge)
- রুকবান (ركبان)। উষ্ট্র বাহিনী (Passengers)
- নুহহাবুল মুয়ান (نهّاب المؤن) : রসদ সংগ্রহকারী দল (Supplies)

১১৬ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬১-৩৬২

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

দুই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যার পার্থক্য

এই গাজওয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার ছিল মুসলিম মুজাহিদ এবং রোমক খ্রিষ্টান ও আরবের মুশরিকদের যৌথ বাহিনীর সংখ্যার মাঝে আসমান-জমিনের পার্থক্যের দিক। রোমক খ্রিষ্টান ও আরবের মুশরিকদের সৈন্য ছিল প্রায় দুই লাখ। বিপরীতে মুসলিম মুজাহিদরা ছিল মাত্র তিন হাজার। সংখ্যার এই বিবরণ যে বানোয়াট বা আনুমানিক—তা মোটেও নয়; বরং এই সংখ্যা সিরাতশাস্ত্রের ইমাম ইবনে ইসহাক ও ইবনে সাদসহ অন্য সব বিশেষজ্ঞও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ দেখা যায়, রোমীয় খ্রিষ্টানরা আরব মুসলিমদের চেয়ে এক/দুই তো নয়-ই, দশ/বারো গুণও নয়; বরং পঞ্চাশ গুণের চেয়েও বেশি ছিল। (অর্থাৎ প্রায় ৬৭ গুণ বেশি।)

দুই পক্ষের এই বিরাট ও কল্পনাতীত পার্থক্য ও সমীকরণ ভাবনায় আনলে এবং খ্রিষ্টানদের বিশাল জনস্রোত আর মুসলিমদের গুটিকতকের চিত্র কল্পনা করলে এমন মনে হয়, যেন আটলান্টিকের সামনে পদ্মা। এক পাল নেকড়ের মোকাবিলায় এক জোড়া ছাগল!

তা ছাড়া মুসলিমরা সংখ্যাতেও যেমন হাতে গোনা, তেমনি তাদের ভারী অস্ত্র বলতেও কিছু তির-ধনুক, কিছু তরবারি আর কিছু লাঠিসোঁটা। যা দেখে বরাবরই যে কেউ হাসতে বাধ্য। (বর্তমানে ইসরাইলের মিসাইল সাবমেরিন ও রকেট লাঞ্চার ইত্যাদির মোকাবিলায় যেমন বাংলাদেশের কিছু রাইফেল, ট্যাংক আর কামান ইত্যাদি বলা যায়।) তবে আর যা-ই হোক, এই সমীকরণ থেকে এটা স্পষ্ট, এই যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষীয় শত্রুরা সামরিক সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রচুর ও বিপুল সমরাস্ত্র সরবরাহ, নিজেদের শান-শওকত ও আলিশান অবস্থা ফুটিয়ে তোলা এবং মুসলিমদের মনে ভয়, প্রভাব ও হীনম্মন্যতা প্রবেশ করানোকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল!

সবকিছু বাদ দিলেও বিস্ময়ে হা করে থাকার মতো কথা হলো—এটা ছিল সারিয়্যা। গাজওয়া নয়। অর্থাৎ নবিজি ছিলেন না। ফলে নবিজিকে দেখে যে মনে আগ্রহ-উদ্দীপনা আসবে এবং শত্রুকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে ফেলার বাসনা মনে জাগবে, এমন ব্যাপারও ছিল না। তারপরও সাহাবায়ে কিরাম সাহস করে এগিয়ে যান এবং পিছুটানের চিন্তাও মাথায় আসতে দেননি। এই বিশাল নেকড়ে বাহিনীকে তারা গণনাতেও ধরেননি। অথচ সামনের শত্রুপক্ষ ছিল বিশাল জালের মতো। তারা যদি তাদের চারদিক থেকে ঘিরে নিত, তাহলে মনে হতো—এক মুষ্টি শস্যদানা। বিশাল বিশাল রেজিমেন্টের সামনে এক প্লাটুন সৈন্য। যেন এক বিশাল ধু-ধু মরুপ্রান্তরের বুকে ফলের একটি ছোট্ট বীজ। সত্যি বলতে—ব্যাপারটি এতই হাস্যকর ছিল যে, যমদূত প্রাণ কেড়ে নিতে মানুষের কাছে আসলেও ওইদিন ওই মানুষগুলো যেন প্রাণ দিয়ে আসতে উলটো গিয়েছিল যমদূতের কাছে। তার চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—তবুও সাহাবায়ে কিরাম দমে না গিয়ে এবং ভয় না পেয়ে জিহাদের জজবা নিয়ে পাগলপারা হয়ে লাগাতার সফলতা ছিনিয়ে আনতে থাকেন।

এসব কিছুর পরেও আরেকটি বড়ো আশ্চর্যের কথা হলো—মুসলিম মুজাহিদরা কাফির বাহিনীর এই উত্তাল সমুদ্রের সামনে পূর্ণ সাহসিকতা বীরত্ব ও বাহাদুরির সাথে অটল-অবিচল ও অনড় অবস্থানে থাকেন। এমনকি তাদের সামনে একের পর এক তিনজন সেনাপতি হারিয়ে যান, তবুও তাদের দৃঢ়তা ও স্থিরতায় সামান্য কম্পনও সৃষ্টি হয়নি। তাদের উদ্যমতায় মুহূর্তের ভাটাও পড়েনি; বরং উলটো তারা শাহাদাতের দরজায় সজোরে কড়া নাড়তে থাকেন। ফলে একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বিপুলসংখ্যক কাফির বাহিনীর মনে তাদের ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দেন। অথচ এর বাহ্যিক কোনো কারণও ছিল না।

কারণ, সুস্পষ্টভাবে মুসলিমদের সংখ্যা তাদের তুলনায় নিতান্তই কম ছিল। তাই তাদের মনে গুটিকয়েক মুসলিমের ভয় ও প্রভাব ঢোকার সাথে সাথে শেষ পর্যন্ত তারা আর রণাঙ্গনে টিকে থাকার মতো কোনো আলো খুঁজে পায়নি; বরং ময়দান ছেড়ে পিঠ দেখিয়ে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। পরিশেষে ময়দানে পড়ে থাকে হাজার হাজার খ্রিষ্টান জাহান্নামির নাপাক দেহ।

অবশেষে সর্বপ্রকার পেরেশানি ও বিস্ময় দূর হয়ে চিন্তায় স্বস্তি আসে ওই সময়ই, যখন আল্লাহর প্রতি খালেস ঈমান ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসের শক্তি, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসার পাওয়ার এবং তাঁর দেওয়া প্রতিটি ওয়াদার ওপর নিশ্চিতভাবে আমল করাটাই মুসলিমদের এই কল্পনাতীত সাহায্য ও অভাবনীয় বিজয়ের কারণ হিসেবে দেখা হয় এবং এই দুটি বিষয়ই মূল ব্যাপার বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে।

বরং মুসলিমদের ব্যাপারে তো আরও পেরেশানির কথা হলো—তারা জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করে জিহাদ বা লড়াই করে না; বরং তারা জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে মাত্র। মূল ভরসা ও পূর্ণ আস্থা থাকে আল্লাহ তায়ালার ওই ওয়াদার ওপর; যেটাতে তিনি হকের পথে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত ও অশেষ নেয়ামত প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. বাহিনীর সামনে বক্তব্যে বলেছেন।

* * *

সংশ্লিষ্ট আহকাম: গাজওয়ায়ে মুতা

এই গাজওয়াতেও অসংখ্য শরয়ি মূলনীতি ও মাসয়ালা রয়েছে। নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো—

০১. একই সাথে একাধিক কমান্ডার নিয়োগ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট তিনজন সেনাপ্রধানের নাম উল্লেখ করে পরবর্তীজনের নির্বাচনের বিষয়টি বাহিনীর কাছে ছেড়ে দেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়—কারও নেতৃত্বপ্রাপ্তিকে শর্তযুক্ত করে দেওয়া মুসলিম খলিফা অথবা মুসলিমদের রাষ্ট্রপতির জন্য জায়িজ। কিংবা খলিফা নিজেই ধারাবাহিক একাধিক সেনাপতি বানিয়ে দিতে পারবেন।

উলামায়ে কিরাম বলেন—আসল কথা হলো, খলিফা বা রাষ্ট্রনায়ক যখন কয়েকজন কমান্ডার একসাথে বানিয়ে দেবেন, তখন সবাই নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে যাবে। তবে তারা নিজ নিজ অধিকার কার্যকর করবেন ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে।[১১৭]

০২. নেতার অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ

নবিজির উক্ত আমল থেকে এ ও বোঝা যায়—মুসলিমদের প্রধান বা খলিফা যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা খলিফার পক্ষ থেকে তাদের নেতা মনোনয়নের অধিকার প্রদান করা হয়, তাহলে দুই অবস্থাতেই তাদের সুযোগ ও অধিকার রয়েছে, তারা

---

১১৭ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬১

নিজেরাই ইজতিহাদ করে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতা বা বাহিনীপ্রধান বানাতে পারবে।

ইমাম তাহাবি (২২৯-৩২১ হি.) রহ. বলেন—

> এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই মাসয়ালা বের হয়েছে, মুসলিমদের নেতা যখন অনুপস্থিত থাকবে, তখন তার স্থলাভিষিক্ত ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাচন ও নির্ধারণ করা সকল মুসলিমের ওপর ওয়াজিব।[১১৮]

অনুরূপ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর্যুক্ত নসিহত ও নির্দেশ থেকে এ ও প্রমাণিত, তার পবিত্র জীবদ্দশাতেও ইজতিহাদ করা সম্পূর্ণ বৈধ ও সঠিক এবং শরিয়তসম্মত। (সুতরাং তাঁর ওফাতের পরে ইজতিহাদের অবৈধতার স্লোগান তোলা কি কালেভদ্রেও ঠিক ও যুক্তিসংগত হতে পারে?)

০৩. নবিজির আরেকটি মুজিজা

বর্ণিত ঘটনায় আমরা দেখেছি—নবিজি যখন বিশিষ্ট তিন সাহাবির একের পর এক শহিদ হওয়ার সংবাদ দেন, তখন তাঁর নয়ন যুগল কাঁদতে থাকে। অথচ নবিজি ও রণাঙ্গনের মাঝে ছিল কয়েক দশক মাইলের দূরত্ব। তবুও তিনি মদিনায় বসে বসে সব মনিটরিং করার মতো অনর্গল বলে দেন।

এ ঘটনায় প্রমাণিত—আল্লাহ তায়ালা জমিনকে নবিজির সামনে গুটিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি কয়েক শ মাইল দূর থেকেও মনিটরিং করতে পারেন। তিনি মদিনায় বসে সুদূর শামের রণাঙ্গনের খবরাখবর নিতে পারছিলেন।

এই হাদিস ছাড়াও সাহাবায়ে কিরাম থেকে আরও যেসব বর্ণনা আছে, সেগুলো দ্বারা স্পষ্ট, আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবের মাধ্যমে এ ধরনের অসংখ্য মুজিজা ও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।

এই হাদিস থেকে এ-ও বোঝা যায়—নবিজি তাঁর প্রতিজন সাহাবিকে কতটা গভীর ভালোবাসতেন এবং তাদের প্রতি তাঁর কী পরিমাণ মায়া-মমতা ছিল! সাহাবিদের

---

১১৮ এ থেকে কেউ যেন আবার আধুনিক গণতন্ত্রের বৈধতার দলিল গ্রহণ না করে। কারণ, বর্তমান বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের ভিত্তিই হলো শরিয়তবিরোধী থিওরি ও পশ্চিমাদের তৈরি মূলনীতির ওপর। পক্ষান্তরে যেই গণতন্ত্রের প্রবর্তকরা শরিয়তের ওপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের সেই গণতন্ত্রই বৈধ ও জায়িজ হবে এবং সেই ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়কের বিরোধিতা হবে হারাম। এটাই ছিল সাহাবায়ে কিরামের আমল।

সমাবেশে দাঁড়িয়ে শহিদদের আলোচনাকালে তাঁর দু-চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যাওয়া সহজ বা ছোটোখাটো কোনো ব্যাপার নয়!

আর পাঠকের তো অবশ্যই জানা আছে—শহিদদের শাহাদাতের মৃত্যুর কথা আলোচনা করে নবিজির অশ্রুসিক্ত হওয়া খোদায়ি ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বিরোধী কোনো বিষয় নয়। যেমন : নবিজি নিজেই বলেছেন—'নিঃসন্দেহে চোখ অশ্রু ফেলে আর মন দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকে।'

এটা প্রাকৃতিক ভাবাবেগ ও নম্রতা এবং স্বভাবগত রহমত; আল্লাহ তায়ালা যা মানবজাতির মজ্জায় গচ্ছিত রেখেছেন।

০৪. খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে 'সাইফুল্লাহ' ঘোষণা

যেই হাদিসে নবিজি তিন সাহাবির শাহাদাতের খবর দিয়েছেন, সেই হাদিসেই তিনি 'আল্লাহর এক তরবারি' বলে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে একটি বিশেষ গুণ ও উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এটাই মুসলিম সেনাবাহিনীতে খালিদ রা.-এর অংশগ্রহণের প্রথম সুযোগ। কারণ, তিনি কিছুকাল আগে মাত্র ইসলাম কবুল করেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, নবিজি নিজেই তাকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) উপাধি দিয়েছেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. এই যুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ইমাম বুখারি রহ. তার সূত্রেই বর্ণনা করেছেন—

> মুতার প্রান্তরে আমার হাতে একে একে নয়টি তরবারি ভেঙেছে। শেষ পর্যন্ত একটি ইয়ামানি চওড়া তরবারি টিকে থাকে।

ইবনে হাজার রহ. বলেন—এই হাদিস থেকে বোঝা যায় এই যুদ্ধে অসংখ্য ও অগণিত মুশরিক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়।

ইসলামি বাহিনী মদিনায় ফিরে আসলে কেউ কেউ 'ফেরারির দল' বলে তাদের সম্বোধন করে। তাদের এই সম্বোধনের কারণ ছিল, অন্যান্য যুদ্ধে মুসলিমরা জয় লাভের পর পরাজিত কাফিরদের পিছু ধাওয়া করে বহুদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিত। এবং গনিমতের মাল কুড়াত। তারপর ধীরে-সুস্থে ময়দান ত্যাগ করত। এটাই ছিল তাদের সাধারণ রীতি ও অভ্যাস; কিন্তু এই যুদ্ধে রীতি ও অভ্যাসের ব্যতিক্রম ও ব্যত্যয় ঘটায় তারা ওভাবে বলে ফেলেন। পক্ষান্তরে খালিদ ইবনে

ওয়ালিদ রা. কল্যাণের দিক চিন্তা করেই সেগুলো বাদ দিয়ে মদিনায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত স্থির করেন।

আসলে তিনি বাকি মুসলিম সেনাদের সুরক্ষা দান এবং রোমকদের মনে মুসলিমদের ভয়ভীতি ও আতঙ্ক জিইয়ে রাখতেই প্রজ্ঞাপূর্ণ এই সামরিক কৌশল অবলম্বন করেন। এ কারণেই নবিজি নিজেই তাদের কথার জবাবে বলেন—'না। তারা ফেরারি নয়; বরং তারা তো ইনশাআল্লাহ সামনের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে এসেছে।'

* * *

মক্কা বিজয়

বিজয়ের প্রেক্ষাপট

মক্কা বিজয় সংঘটিত হয় অষ্টম হিজরিতে। (ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত) হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় বনু বকর কুরাইশদের আর বনু খুজাআ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোগিতার ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়। মক্কার অদূরেই ছিল তাদের নিবাস। আরবের অন্যান্য গোত্রের মতো এই দুই গোত্রের মাঝেও যুগ যুগ ধরে দুশমনি ও শত্রুতা চলে আসছিল। এরই সূত্র ধরে বনু বকরের কিছু লোক বনু খুজাআর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে কুরাইশদের কাছে জনবল ও অস্ত্র চায়।

কুরাইশদের কিছু লোক চেহারায় নেকাব পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে সহযোগিতায় এগিয়ে যায়। বনু খুজাআ রাতে নিশ্চিন্তা ও প্রশান্তিতে নিজ নিজ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। এরই মধ্যে 'ওয়াতির'[১১৯] নামক জায়গা থেকে কুরাইশ ও বনু বকরের যৌথ বাহিনী বনু খুজাআর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলাকারীদের মধ্যে কুরাইশদের বড়ো বড়ো সরদার ও নেতৃস্থানীয় লোকও ছিল। তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, হুয়াইতাব ইবনে আবদুল উজ্জা ও মুকরিজ ইবনে হাফস। এই হামলাকারীরা বনু খুজাআর বিশজন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে।

এই সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ডের পরে বনু খুজাআর গোত্রপতি আমর ইবনে সালিম খুজায়ি নবিজিকে জানানোর লক্ষ্যে চল্লিশজনের একটি কাফেলা নিয়ে মদিনায় নবিজির দরবারে হাজির হয়। নবিজির সামনে যখন কুরাইশ ও বনু বকরের ওই বর্বর হামলা

---

১১৯ ওয়াতির। মক্কার পশ্চিম-দক্ষিণের একটি জায়গা।

ও নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে, তখন তিনি রাগে-ক্ষোভে এক ঝটকায় বসা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং গায়ের চাদর মুবারক ঠিক করতে করতে হুংকার ছাড়েন—

> আমি যদি বনু কাবের সহযোগিতা না করি, তাহলে তারাও আমার সহযোগিতা করবে না। আমি নিজেকে যেসব বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখি, তাদেরও সেসব বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখব।
>
> নবিজি আরও বলেন—ওই মেঘখণ্ড বনু কাবের সাহায্যপ্রাপ্তির সুসংবাদ দিচ্ছে।[১২০]

কুরাইশদের ভুল স্বীকার ও দৌড়ঝাঁপ

কুরাইশদের থেকে এই যে অন্যায় ও দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়েছে, এতে তারা অনুতপ্ত হয় এবং নিজেরাই নিজেদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে। এরপর তারা হুদাইবিয়ার চুক্তির নবায়ন এবং নতুন মেয়াদ ধার্যের উদ্দেশ্যে নেতা আবু সুফিয়ানকে নবিজির কাছে পাঠায়। আবু সুফিয়ান মদিনায় নবিজির দরবারে হাজির হয়। সে এই অন্যায়ের মন্দত্ব নিয়ে আলোচনা করে এবং চুক্তি নবায়নের আবেদন জানায়; কিন্তু নবিজি এ ব্যাপারে তাকে কোনো জবাব না দিয়ে আশাহত করেন। জবাব না পেয়ে সে আবু বকর রা.-এর কাছে যায় এবং এ বিষয়ে কথা বলে আবদার করে, তিনি যেন নবিজির কাছে সুপারিশ করেন।

তিনি বলেন—আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারব না। তারপর সে ফারুকে আজম রা.-এর কাছে আসে। এ বিষয়ে কথা বলে আবদার করে, তিনি যেন নবিজির কাছে সুপারিশ করেন।

তিনি বলেন—কী! আমি তোমার জন্য নবিজির কাছে সুপারিশ করব? আল্লাহর কসম! তোমাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য যদি আমি পিঁপড়ার দল পাই, তাহলে সেই পিঁপড়ার দল নিয়েই যুদ্ধ করব।

আবু সুফিয়ান কিছুই করার সুযোগ পায়নি; বরং বিফল ও ব্যর্থ মনোরথে মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ধরনের গোপনীয়তা ও নীরবতা বজায় রেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন এবং দুআ করেন—

---

১২০ *তাবাকাতু ইবনে সাআদ; সিরাতে ইবনে ইসহাক; মুসনাদু বাজ্জার; মুজামু তাবারানি*

হে আল্লাহ, কুরাইশদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দেন। তারা যেন আমাকে স্বাভাবিক দেখা না দেখতে পারে। তারা যেন আমাকে দেখে চমকে ও আঁতকে ওঠে।[১২১]

নবিজির যুদ্ধ ও আক্রমণ প্রস্তুতি শেষ হলে প্রখ্যাত সাহাবি হাতিব ইবনে আবু বালতাআ রা. কুরাইশদের বরাবর একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তাদের ওপর ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য হামলার খবর দিয়ে দেন।

গোয়েন্দা আটক

আলি রা. বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুবাইর, মিকদাদ এবং আমাকে বলেন, তোমরা তিনজন 'রওজায়ে খাখে'[১২২] যাও। সেখানে এক নারীকে পাবে। তার কাছে একটা চিঠি আছে। চিঠিটা তার থেকে নিয়ে আসো।

আলি রা. বলেন—আমরা তৎক্ষণাৎ রওনা হই। আমাদের ঘোড়া বাতাসের গতিতে চলতে থাকে। একপর্যায়ে আমরা রওজায়ে খাখে পৌঁছে যাই এবং নবিজির কথামতো ঠিক ঠিক সেখানেই উটে আরোহী এক নারীর সাক্ষাৎ পাই। আমরা তাকে বললাম—চিঠি বের করো। সে উত্তর দেয়—আমার কাছে চিঠি-মিঠি কিছু নেই। আমরা ধমক দিয়ে বললাম—এত কথা বুঝি না। হয়তো চিঠি বের করো, নতুবা আমরা তোমার জামা খুলে তালাশ করতে বাধ্য হব।

আলি রা. বলেন—তারপর সে তার চুলের খোঁপার ভেতর থেকে একটি চিঠি বের করে। চিঠিটি নিয়ে আমরা নবিজির দরবারে হাজির হই। চিঠিটি হাতিব ইবনে আবু বালতাআ মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি মুশরিকদের নবিজির যুদ্ধাভিযানের বিবরণ দিয়েছিলেন। নবিজি দেখেশুনে তাকে জিজ্ঞেস করেন—হাতিব, কী এটা?

হাতিব রা. বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, দয়া করে আমার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যাপারটা হলো, আমি কুরাইশদের সাথে ছিলাম বলে তাদের মিত্র হয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তো আর কুরাইশি না। আপনার সাথে আসা মুহাজিরদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো আত্মীয় মক্কায় রয়েছে। যারা রেখে আসা

---

১২১ *তাবাকাতু ইবনে সাআদ; সিরাতে ইবনে ইসহাক*

১২২ রওজায়ে খাখ। মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী 'নাকি'-এর নিচু এলাকার একটি জায়গা। মদিনার দিক থেকে হামরাউল আসাদের কাছাকাছি অবস্থিত।

পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে; কিন্তু আমার তো সেখানে কেউ নেই। তাই ভাবলাম—আমি তাদের ওপর একটু অনুগ্রহ করি, তাহলে তারাও এর বিনিময়ে আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি খেয়াল রাখবে। অন্তত তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। শুধু এতটুকুই। এ ছাড়া আমি আমার দ্বীনও ছাড়ি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পরে কুফরের প্রতি টান বা ঝোঁকও নেই।

সব শুনে নবিজি বলেন—নিঃসন্দেহে সে তোমাদের সত্য খবর দিয়েছে।

ফারুকে আজম রা. বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে অনুমতি দেন এই মুনাফিকের ধড় নামিয়ে দিই।

নবিজি বলেন—না, উমর। নিঃসন্দেহে সে বদরি সাহাবি। তোমার কী মনে হয়, আমার তো মনে হয় বদরি সাহাবিদের ভবিষ্যৎ সকল কর্মের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা অগ্রিম বলে দিয়েছেন—

اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم

তোমরা যা ইচ্ছা করো। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

তারপর আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তারা তোমাদের কাছে আগত সত্যকে অস্বীকার করছে। তারা রাসুলকে এবং তোমাদের বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো।

যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"[১২৩]

মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুলসুম ইবনে হুসাইন রা.-কে মদিনার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে দশই রামাদান বুধবার আসরের সালাতের পর মদিনা থেকে রওনা দেন। নবিজি আশপাশের আসলাম-গিফার-মুজাইনা-জুহাইনা প্রভৃতি গোত্রের কাছেও পত্র পাঠান। এসব গোত্র মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী 'জাহরান'[১২৪] নামক স্থানে নবিজির সাথে মিলিত হয় এবং এভাবে মুসলিমদের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারে।

তখনও কুরাইশরা কোনো টের পায়নি। তবে আবু সুফিয়ানের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসায় তারা এটা বুঝতে পেরেছে যে, শীঘ্রই হামলা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তারা আবার আবু সুফিয়ান, হাকিম ইবনে হিজাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা—এই তিনজনকে নবিজির দরবার থেকে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠায়। এরা যেতে যেতে 'মাররুজ জাহরান' পর্যন্ত গিয়েই হতবাক! সামনে প্রশস্ত মাঠজুড়ে আগুন জ্বালানো দেখা যায়। এরা সামনে না বেড়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এমন সময় নবিজির নিযুক্ত গার্ডদের চোখে পড়লে তারা তাদের গ্রেফতার করে সরাসরি নবিজির দরবারে হাজির করে। পরে এখানেই আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করেন।[১২৫]

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক আব্বাস রা. সূত্রে আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আব্বাস রা. বলেন—

সকালে আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে নবিজির দরবারে হাজির হই। নবিজি আবু সুফিয়ানকে দেখামাত্রই বলে ওঠেন—কী খবর আবু সুফিয়ান! আফসোস তোমার

---

১২৩ সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১; *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

১২৪ মাররুজ জাহরান। মক্কার এরিয়াস্থ অন্যতম বড়ো একটি উপত্যকা।

১২৫ *সহিহ বুখারি*

জন্য! বলো তো, এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ না থাকার বাস্তবতা তুমি মেনে নেবে না?

আবু সুফিয়ান বলে ওঠে—আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান! আপনি কত সহনশীল এবং কত দয়ালু! আপনার ক্ষমা ও মার্জনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি কতই-না চমৎকার! আল্লাহর কসম! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ যদি থাকতই, তাহলে কিছু না কিছু উপকার তো আমাদের করতই।

নবিজি বলেন—আবু সুফিয়ান, আফসোস তোমার জন্য! এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, আমি আল্লাহর রাসুল—এটা তোমার বুঝে আসছে না?

আবু সুফিয়ান বলে, আমার মা-বাবা আপনার ওপর কুরবান! আপনি কত সহনশীল! কত দয়ালু! আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় আপনি কত রক্ষণশীল! খোদার কসম! তবুও এ ব্যাপারে আমার মাথায় এখনও একটা জটলা রয়ে গেছে।

আব্বাস রা. তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন—আফসোস তোমার জন্য! তোমার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা আসার আগেই মুসলিম হয়ে সাক্ষ্য দিয়ে দাও—'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।' এ সময় আবু সুফিয়ান আর কালক্ষেপণ না করে কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে যায়।

আব্বাস রা. বলেন—আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ, গর্ব করা আবু সুফিয়ানের পছন্দ। সুতরাং গর্বের কোনো কাজ তার জন্য ঘোষণা করে দেন। নবিজি বলেন—ঠিক আছে। ঘোষণা দিয়ে দেন, যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ। যারা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে, তারাও নিরাপদ। এবং যারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা অভিমুখে রওনার ইচ্ছা করেন, তখন আব্বাস রা.-কে বলেন—হে আব্বাস, আপনি আবু সুফিয়ানকে উপত্যকার এমন একটি সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করাবেন, যেখান দিয়ে আল্লাহর সৈনিকরা অতিক্রমের সময় সে দেখতে পায়।

আব্বাস রা. বলেন—আমি বের হয়ে তাকে ওই জায়গায় দাঁড় করালাম, যেখানে দাঁড় করানোর কথা নবিজি বলেছেন। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পতাকা নিয়ে এগিয়ে

যেতে থাকে। যখনই কোনো গোত্র যেত আবু সুফিয়ান আমায় জিজ্ঞেস করত। একবার জিজ্ঞেস করল—আব্বাস, এরা কারা?

আমি বললাম—এরা বনু সুলাইম।

আবু সুফিয়ান বলে—বনু সুলাইমের সাথে আমার কী?

এভাবে গোত্রের পর গোত্র যায়। একপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারি সাহাবিদের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অতিক্রম করেন। প্রতিজন সৈনিক ছিলেন লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণে সুসজ্জিত। তাদের চোখের মণিগুলোই শুধু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বলে—সুবহানাল্লাহ! আব্বাস, এরা কারা?

আমি বললাম—এরা মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের সম্মিলিত বিশেষ ও অত্যাধুনিক ফোর্স। তাদের মাঝেই নবিজি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আবু সুফিয়ান বলে, হায়! ইতঃপূর্বে এদের কারোই তো এই শান-শওকত এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না! আর আজ এদের কী বিরাট ও আলিশান অবস্থা! হে আবুল ফজল, আজকের সকালে তো তোমার ভাতিজার বাদশাহি কত মহানতর হয়ে গেছে!

আব্বাস রা. বলেন—আবু সুফিয়ান, এটা নবুয়তের এক ঝলকমাত্র।

আবু সুফিয়ান বলে—হ্যাঁ। নবুয়তের কথাই বলো!

তারপর আব্বাস রা. আবু সুফিয়ানকে বলেন—তোমার জাতির মুক্তির চিন্তা করো। আবু সুফিয়ান দ্রুত অগ্রসর হন এবং নবিজির পৌঁছার আগেই তিনি মক্কায় পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন—

> হে কুরাইশ সম্প্রদায়, ওই যে দেখো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন। তাঁর সাথে এমন বিশাল সেনাবাহিনী আছে, যাদের মোকাবিলা করার শক্তি-সামর্থ্য তোমাদের নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।

এই ভাষণ শুনে তার স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা কাছে এসে তার গোঁফ টেনে ধরে বলে—

> ঘিয়ের এই অনোপকারী ও অপ্রয়োজনীয় মটকাটি ভেঙে ফেলো। এই অপদার্থটা জাতির কত নিকৃষ্ট নেতা!

আবু সুফিয়ান লোকদের বলে—

> সাবধান! এই নারীর কথা যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। অন্যথায় তোমরা বরবাদ হয়ে যাবে। কারণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছেন, যেই বাহিনীর মোকাবিলা তোমাদের পক্ষে আজ অসম্ভব। তোমাদের সেই শক্তি-সামর্থ্য নেই। সুতরাং যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ।

গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে বলল—

> তুমি ধ্বংস হও। তোমার এক ঘরে আমাদের কতজনের ঠাঁই হবে? আবু সুফিয়ান বলে—ঠিক আছে। যারা নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, তারাও নিরাপদ। এবং যারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ।

তার এই ঘোষণা শোনামাত্রই সবাই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ নিজ ঘরের দিকে দৌড়ে যায় আবার কেউ কেউ মসজিদের দিকে।[১২৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ পৌঁছল, আবু সুফিয়ান উপত্যকায় দাঁড়িয়ে ইসলামি বাহিনী দেখছে দেখে সাআদ ইবনে উবাদা রা. আক্রোশে স্লোগান তোলেন—

اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة.

> আজ যুদ্ধ ও লড়াইয়ের দিন। আজ কাবা শরিফে রক্তপাত সম্পূর্ণ বৈধ।

কিন্তু কথাগুলো নবিজির মনঃপূত হয়নি। তিনি বলেন—

اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة.

> না; বরং আজ রহমতের দিন। আজ আল্লাহ তায়ালা কাবার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীর কমান্ডারদের লক্ষ্যে নির্দেশ জারি করেন, তারা কারও সাথে লড়াই করবে না বা সংঘর্ষে জড়াবে না। তবে কাফিরদের

---

১২৬ *সিরাতে ইবনে ইসহাক*

কেউ আগ বেড়ে সংঘর্ষে জড়ালে তাদের ছাড়া যাবে না; বরং তাদের প্রতিহত ও দমন করে এগিয়ে যেতে হবে।

যাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়

নবিজি এভাবে আম (সাধারণ) ক্ষমার পরও দশজন নারী-পুরুষের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেন। তাদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। তারা হলো—ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল, হুবার ইবনে আসওয়াদ, আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবুস সারহ, মুকিস ইবনে সুবাবা লাইসি, হুওয়াইরিস ইবনে নাকিদ ও আবদুল্লাহ ইবনে হিলাল। আর হিন্দা বিনতু উতবা, আমর ইবনে হিশামের বাঁদি সারাহ এবং দুই কণ্ঠশিল্পী ফারতানি ও করিনা। শিল্পী দুজন সব সময় নবিজির শানে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপাত্মক নানা গান গাইত।[১২৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার উঁচু দিক 'কাদা' দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, আর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে নিচু দিক 'কুদা' দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ দেন। নবিজি আগমনি দলগুলোর যাকে যেদিক দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা সেদিক দিয়েই বিনা সংঘর্ষে মক্কায় প্রবেশ করে। শুধু খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর সাথে সামান্য লড়াই হয়েছে। তিনি তার বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার অধীন বাহিনী তার সাথে ঝামেলা বাঁধিয়ে দেয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তিনি প্রতিরোধ লড়াই করলে কুরাইশদের চব্বিশ আর হুজাইলের চারজন জাহান্নামের বাসিন্দা হয়। দূর থেকে তরবারির ঝলকানি নবিজির দৃষ্টিগোচর হলে তিনি তা অপছন্দ করেন। নবিজিকে জানানো হয়—ওটা খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বাহিনী। কুরাইশরা তাকে বাধা দিলে তিনি বাধ্য ও অপারগতাবশত পালটা জবাব দিতে গিয়ে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছেন। নবিজি তখন বলেন—'আল্লাহ যা করেন, তাতেই মঙ্গল।'[১২৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর থেকে ইবনে ইসহাক আর আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জু তুওয়া'[১২৯] নামক স্থানে পৌঁছলে নিজ বাহনের ওপরই থেমে যান। তিনি ইয়ামানি

---

১২৭ *তাবাকাতু ইবনে সাআদ, সিরাতে ইবনে ইসহাক, ইবনে হাজার*

১২৮ সূত্র : ইবনে সাআদ, ইবনে হাজার, ইবনে হিশাম

১২৯ জু তুওয়া। মক্কার অদূরেই প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরের একটি উপত্যকা। বর্তমানে এটি তানয়িম ও মক্কার পথের মাঝখানে।

চাদরের তৈরি পাগড়ি পরা ছিলেন। বিনয় ও আত্মতুচ্ছতাবশত মাথা নিচু করে ছিলেন। আল্লাহপ্রদত্ত বিজয় ও সাহায্য দেখে তিনি নিজেকে এই অবস্থায় পরিণত করেন। নবিজি মাথা মুবারক এত নুয়ে দেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক উটনীর হাওদার অগ্রভাগের উত্থিত অংশ ছুঁয়ে যায়।

ইমাম বুখারি রহ. মুয়াবিয়া ইবনে কুররা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. বলেছেন—মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উটনীর ওপর আরোহিত ও আনন্দিত অবস্থায় সুরা ফাতহ তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

মুয়াবিয়া ইবনে কুররা রা. বলেন—যদি আমার তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে আশপাশে ভিড় লেগে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে নবিজির মতো আমিও আনন্দে পড়তে থাকতাম।

নবিজি মহাবিজয় ও সাহায্য সাথে নিয়ে কাবামুখী হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন পর্যন্ত কাবা শরিফের আশপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। নবিজি হাতের ছোটো লাঠি দিয়ে একের পর এক মূর্তির গায়ে হালকা আঘাত করছিলেন আর তিলাওয়াত করছিলেন—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

> সত্য সমাগত, মিথ্যা বিদূরিত।) (সত্য সমাগত, মিথ্যা নতুন কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না এবং প্রত্যাবর্তনও করবে না।[১৩০]

সরাসরি কাবা শরিফের ভেতরেও বহু মূর্তি ছিল। নবিজি সেসব ছোটো ছোটো মূর্তির উপস্থিতিতেও কাবা শরিফে ঢুকতে অস্বীকৃতি জানান। সেগুলোকেও তিনি বের করতে বলেন। নবিজির নির্দেশ মোতাবেক সেগুলো বের করা হয়। ইবরাহিম ও ইসমাইল আ.-এর হাতে (ভালো-মন্দ নির্ণয়ের) তির ধারণ অবস্থার প্রতিকৃতিও ছিল। সেগুলোও বের করা হয়। তারপর নবিজি বলেন—

> আল্লাহ তায়ালা ওইসব কাফিরদের বরবাদ করুক, যারা ভালো করেই জানত—এই সম্মানিত দুই বুজুর্গ কখনো ভাগ্য নির্ণয়ের তির নিক্ষেপ করেননি; তবুও এমন প্রতিকৃতি বানিয়েছে!

---

১৩০ সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৮১; সুরা সাবা, আয়াত : ৪৯; *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

কাবাঘর সাফ-সুতরা শেষ হলে নবিজি ভেতরে প্রবেশ করেন এবং কোনায় কোনায় তাকবির ধ্বনি দেন। তবে সালাত আদায় করেননি। তারপর বেরিয়ে আসেন।[১৩১]

তারপর নবিজি কাবা শরিফের চাবিবাহক উসমান ইবনে তালহা রা.-কে চাবি নিয়ে আসতে বলেন। তিনি চাবি এনে তালা খুলে দেন। নবিজি ভেতরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর বের হয়ে উসমান রা.-কে আবার ডেকে এনে তার হাতেই চাবি তুলে দেন এবং বলেন—

> এই চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তুমি এবং তোমার বংশই বহন করবে। তবে কাবাঘরের দারোয়ানগিরির এই দায়িত্ব আমি তোমাকে দিচ্ছি না; বরং আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এবং এই চাবি তোমার থেকে সে-ই ছিনিয়ে নেবে, যে জালিম হবে।

নবিজি তাঁর এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ওই বাণীর দিকে ইশারা করেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

> অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন আমানতকে তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার।[১৩২]

নবিজি বেলাল রা.-কে সালাতের জন্য আজান দিতে বললে বেলাল রা. কাবাঘরের ছাদে উঠে আজান দেন। আজান শুনে চারদিক থেকে মানুষ দলে দলে এদিকে আসতে থাকে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরিফের দরজার দুই পাশের চৌকাঠ ধরেন। আর সবাই তাঁর চারপাশে এসে জমে যায়। সবাই বুঝতে পারছিল—আজ এবং এখন তাদের সাথে কী হতে যাচ্ছে।

নবিজি ঘোষণা দেন—

আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। মুমিন বান্দাদের সাহায্য করেছেন আর নিঃসঙ্গ কাফিরদের করেছেন পরাজিত।

---

১৩১ *সহিহ বুখারি*। বি. দ্র.: *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনায় আবার কাবা শরিফের ভেতরে নবিজির সালাত আদায়ের কথাও বর্ণিত আছে।

১৩২ সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮

সকল কৃতিত্ব ও গর্বের বিষয়, খুনের বদলা এবং জাহিলি যুগে দাবিকৃত ধনসম্পদ সব আমার এই দুই পায়ের নিচে। তবে বাইতুল্লাহ শরিফের খেদমত ও হাজিদের পানি পান করানো আমার দায়িত্বে।

হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আল্লাহ তায়ালা জাহিলিয়াতের বড়াই এবং বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব ও অহংকার সব মিটিয়ে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম আ.-এর সন্তান। আর আদম আ. মাটির তৈরি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .

> অবশ্যই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তোমাদের করেছি গোত্র গোত্র ও শাখা উপশাখায় বিভক্ত; যেন তারা পরস্পরে পরিচিত হতে পারে। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু।[১৩৩]

তারপর নবিজি বলেন—হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমাদের ধারণা কী? বলো তো, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করতে পারি?

সবাই সমস্বরে জবাব দেয়—কল্যাণকর আচরণ। কারণ, আপনি আমাদের দয়ালু ভাইয়ের দয়ালু ছেলে!

নবিজি শুনিয়ে দেন—ঠিক আছে। যাও তোমরা মুক্ত। তোমরা স্বাধীন।[১৩৪]

আবু শুরাইহ আদাবি রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন সবাইকে সম্বোধন করে বলেন—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। সেই সম্মান তিনিই দিয়েছেন, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য বৈধ হবে না এই হারামের সীমারেখায় কারও রক্ত ঝরানো

---

১৩৩ সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩; *তাবারানি, ইবনে আবু শাইবা, ইবনে ইসহাক*

১৩৪ *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*

বা কোনো গাছ মূল ছিন্ন করা। কেউ যদি আল্লাহর নবির লড়াইকে দলিল বানায়, তবে তাঁকে বলবে—আল্লাহ তার রাসুলকে এমন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে তোমাদের অনুমতি নেই। উপরন্তু তাঁর রাসুলকেও তিনি স্বল্প সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। তারপর আগের মতোই এর নিষিদ্ধতা ফিরে এসেছে। যা এখনও বহাল। সুতরাং উপস্থিত সকলের কর্তব্য এসব বার্তা অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।"[১৩৫]

তারপর মক্কায় সবাই একত্র হয়ে নবিজির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের একনিষ্ঠ অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। পুরুষদের বাইয়াত শেষ হলে নারীরা আসে। বেশ কিছু কুরাইশ নারী আসে। তাদের মধ্যে হিন্দা বিনতু উতবাও ছিল। সে চেহারায় নেকাব দিয়ে ছদ্মবেশে ছিল। তার ভয় ছিল—উহুদের যুদ্ধে সাইয়িদুশ শুহাদা হামজা রা.-এর দেহ মুবারকের সাথে সে যেই নির্মম, নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক ও পৈশাচিক আচরণ করেছে, তার বদলায় আজ না জানি তার সাথে কী করা হয়?

নবিজি নারীদের বললেন—তোমরা আমার এই কথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। ছদ্মবেশী হিন্দা বলে ওঠে, আল্লাহর কসম! এই স্বীকারোক্তি তো আপনি পুরুষদের থেকে নেননি। আচ্ছা, তবুও আমরা মেনে নিলাম।

নবিজি বলেন—তোমরা চুরি করবে না। হিন্দা বলে ওঠে, হায় আল্লাহ! আমি তো আবু সুফিয়ানের সম্পদ থেকে কিছু কিছু নিয়ে নিতাম। তখন আমি জানতাম না, এটা আমার জন্য হালাল ছিল নাকি হারাম?

সমাবেশে উপস্থিত আবু সুফিয়ান বলেন—ইতঃপূর্বে যা কিছু তুমি নিয়েছ, যাও সেগুলো তোমার জন্য হালাল।

নবিজি জিজ্ঞেস করলেন—কী, তুমি কি হিন্দা?

—জি, আমি হিন্দা বিনতু উতবা। আর আমার অতীতের সবকিছুই মার্জনা করেন। আল্লাহও আপনার ওপর থেকে সকল মিথ্যা অভিযোগের দায় মিটিয়ে দেবেন।
—তোমরা জিনা করবে না।

---

১৩৫ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

—আজাদ নারীও কি জিনা করতে পারে?

—তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না।

—আমরা আমাদের ছোটো ছোটো শিশুদের লালনপালন করে পরিণত বয়স্ক বানিয়েছি আর আপনি বদর প্রান্তরে তাদের বড়ো বড়ো অবস্থায় মেরে ফেলেছেন। এখন আপনি আর তারাই ভালো জানেন।

এ কথা শুনে ফারুকে আজম রা. এত জোরে হাসতে শুরু করেন যে, মাটিতে পড়ে লুটোপুটি খাওয়ার উপক্রম হন।

নবিজি বলেন—তোমরা কারও ওপর মিথ্যা অপবাদ দেবে না।

হিন্দা বলে—আল্লাহর কসম! কারও ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া খুবই খারাপ এবং কখনো কখনো এ থেকে এড়িয়ে চলা উত্তম।

নবিজি শেষ কথা বলেন—তোমরা আমার আনুগত্যে কখনো অবাধ্য হবে না।

এরপর নবিজি ফারুকে আজম রা.-কে বলেন—তুমি এদের থেকে বাইয়াত নিয়ে নাও। তারপর নবিজি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

বাইয়াতে নারীদের হাত স্পর্শ করা

এরপর ফারুকে আজম রা. তাদের থেকে বাইয়াত নেন। নবিজি বাইয়াত নিলে কোনো নারীর সাথে মুসাফাহা তো নয়ই; বরং কারও হাতও স্পর্শ করতেন না। আবার কোনো নারীও তাঁর হাত স্পর্শ করত না। নবিজি শুধু তাদের হাত স্পর্শ করতেন, যাদের তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে। অর্থাৎ নিজ স্ত্রী ও দাসীদের হাত।[১৩৬]

ইমাম বুখারি রহ. আম্মাজান আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের থেকে কথার মাধ্যমে বাইয়াত নিতেন এবং নিচের আয়াত মোতাবেক বিষয়ের ওপর বাইয়াত নিতেন—

الا يشركن بالله شيئا،

> এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।[১৩৭]

---

১৩৬ *সিরাতে ইবনে ইসহাক; তারিখুত তাবারি,* ইবনে জারির

১৩৭ সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১২

আম্মাজান আয়িশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী ও বাঁদিদের হাত ছাড়া আর কারও হাত কখনো তিনি স্পর্শ করেননি।

ইমাম মুসলিম রহ.-ও আম্মাজান সূত্রেই এ রকম বর্ণনা করেছেন।[১৩৮]

নারী অধিকার

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রা. এক মুশরিককে আশ্রয় দেন। লোকটাকে আলি রা. হত্যা করতে চেয়েছিলেন। উম্মে হানি রা. বলেন—

আমি ব্যাপারটা নিয়ে নবিজির কাছে যাই। তখন তিনি গোসল করছিলেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা বাইরে থেকে তাঁকে পর্দায় ঢেকে রেখেছিল। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করলেন—কে এই নারী?

জবাব দিলাম—আমি উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব।

নবিজি বলেন—ও, উম্মে হানি! খোশ আমদেদ! স্বাগত!

তারপর নবিজি গোসল সেরে একটি বড়ো কাপড় শরীরে জড়িয়ে নেন এবং সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তিনি আট রাকাত চাশতের সালাত আদায় করেন। তারপর আমার দিকে মনোনিবেশ করলে আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার সৎভাই আলি আমার আশ্রিত লোককে হত্যা করতে চায়। আবার অমুক চায় ইবনে হুবাইরাকে হত্যা করতে?

নবিজি বলেন—উম্মে হানি! তুমি যাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিলাম।[১৩৯]

দণ্ডপ্রাপ্তদের অবস্থা

দেখা যায়, নবিজি যাদের হত্যার বৈধতা ও অনুমতি দিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ মুসলিম হয়ে যায়; আবার কয়েকজনকে হত্যা করা হয়। নিহতরা হলো—আবদুল্লাহ ইবনে খতল, মুকিস ইবনে হুবাবা, এবং দুই কুৎসা রটনাকারী নারীর একজন। আর আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবুস সারহ-এর ব্যাপারে ছড়িয়ে পড়ে যে, সে মুসলিম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে; কিন্তু সে প্রকাশ্যে আবার ইসলামের ঘোষণা

---

১৩৮ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৩৫; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯

১৩৯ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

দেয়। নবিজি তার ব্যাপারে সুপারিশ কবুল করেন। সে খাঁটি মুসলিম প্রমাণিত হয়। তাদের মতোই ইকরিমা, হুবার ও হিন্দাও মুসলিম হয়ে যায়।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন—লাইস গোত্রের ফুজালা ইবনে উমাইর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাওয়াফের সময় খুন করবে। ইচ্ছানুযায়ী তাওয়াফের সময় সে ধীরে ধীরে নবিজির কাছাকাছি এলে নবিজিই তাকে জিজ্ঞেস করে বসেন—

—তুমি ফুজালা?
—জি। আমি ফুজালা।
—তুমি মনে মনে কী ভাবছিলে?
—কিছু না। আমি তো মনে মনে আল্লাহর জিকির করছিলাম।
—নবিজি হেসে বলেন—আসতাগফিরুল্লাহ।

তারপর নবিজি তার হাত মুবারক ফুজালার বুকের ওপর রাখেন। ফুজালা এক অনাবিল প্রশান্তি লাভ করে। সে বলে—আল্লাহর কসম! আপনার হাত আমার বুক থেকে সরানোর আগেই আপনি আমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে গেছেন।

এক মেয়ের সাথে ফুজালার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। প্রেমের খাতিরে সব গোপন ও সিক্রেট প্রেমালাপ চলত দুজনের মাঝে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত দুজন। মুসলিম নতুন ফুজালা যখন সেই প্রেমিকার বাড়ির পাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন প্রেমিকা তাকে দেখে ডাক দিয়ে বলল—ফুজালা, এদিকে আসো; কথা আছে। তখন ফুজালা নিচের পঙক্তিগুলো গুনগুন করে গাইতে শুরু করেন—

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا • يأبى عليك الله والإسلام

সে আমায় তার সাথে প্রেমালাপের আবদার জানায়। আমি তাকে বলি, না। আল্লাহ ও ইসলাম তোমার সাথে কথা বলাকে অপছন্দ করে।

لوما رأيت محمدًا وقبيله • بالفتح يوم تكسر الأصنام

তুমি যদি মূর্তি ভাঙার দিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বাহিনীকে দেখতে

لرأيت دين الله أضحى بينا • والشرك يغشى وجهه الإظلام

তাহলে অবশ্যই দেখতে পেতে—আল্লাহর দ্বীন আলোকজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত। আর শিরকের ওপর ছেয়ে গেছে আঁধারের কালো চাদর।[১৪০]

ইমাম বুখারি রহ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে মোট উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ কয়দিন তিনি সালাত কসর করেন।

* * *

১৪০ সিরাতে ইবনে হিশাম



মক্কা বিজয়-সংশ্লিষ্ট আহকাম

মক্কা বিজয়ের ঘটনাপ্রবাহে অসংখ্য মাসয়ালা ও জীবনের খোরাক রয়েছে। যেগুলোতে চিন্তা-ফিকির করে উপদেশ ও শিক্ষার্জন করা অবশ্যকর্তব্য। তাই এখানে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো—

০১. চুক্তি সম্পাদন ও ভঙ্গের বিভিন্ন হুকুম

◆ **এক.** মক্কা বিজয়ের ইস্যু ও প্রেক্ষাপটে ইশারা রয়েছে, মুসলিমদের মিত্র হিসেবে যারা চুক্তিবদ্ধ হয়, তাদের সাথে শত্রুপক্ষের লড়াই করা স্বয়ং মুসলিমদের সাথে লড়াই করারই নামান্তর। পাশাপাশি এতে মুসলিমদের সাথে কৃত তাদের পূর্ব চুক্তিও বাতিল ও ভঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। ওরা আগের মতোই হরবি বলে সাব্যস্ত হবে। জমহুর উলামায়ে কিরাম এই ফতোয়ার ওপর একমত।

◆ **দুই.** কুরাইশদের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ থেকে আমাদের জন্য দিকনির্দেশনা হলো—চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায় যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের এই খেয়ানতের বদলাস্বরূপ আকস্মিকভাবে তাদের ওপর হামলা করা মুসলিম শাসক বা রাষ্ট্রপতির জন্য জায়িজ।

মুসলিম সেনাপতির ওপর আবশ্যক নয়, এমতাবস্থায় তিনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণের আগাম বার্তা পাঠাবেন। যেমনটি পেছনের ঘটনায় জানা গিয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাভিমুখে অভিযানের প্রস্তুতি শেষ করে দুআ করেন—কাফিররা যেন কিছু জানতে না পারে এবং অভিযানটা যেন আকস্মিক হয়।

এই ফতোয়ার ওপরও জমহুর উলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন; কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে, তবে বিভিন্ন আলামত, গোয়েন্দা রিপোর্ট ও পূর্বাভাসের মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তাহলে কেবল আশঙ্কা ও সন্দেহের ভিত্তিতে আগাম আকস্মিক হামলা করে নিজ থেকে চুক্তি ভাঙা মুসলিম শাসকের জন্য জায়িজ বা বৈধ হবে না; বরং প্রথমে তাদের ব্যাপারে সৃষ্ট সন্দেহ ও আশঙ্কা-উদ্বেগ এবং চুক্তি ভঙ্গের বিষয়টি তাদের পরিষ্কারভাবে জানাবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা। তিনি বলেন—

و اما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علي سواء، إن الله لا يحب الخائنين.

> তবে যদি কোনো সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারে তোমাদের ভয় থাকে, তাহলে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুড়ে ফেলো এমনভাবে যে, তোমরা আর তারা সমান হয়ে যাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধোঁকাবাজদের পছন্দ করেন না।'[১৪১]

অর্থাৎ চুক্তি নিক্ষেপের অর্থ হলো এখন থেকে তোমাদের সাথে আমাদের আর কোনো চুক্তি-টুক্তি নেই—এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া।

♦ **তিন.** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আমল থেকে আরেকটি বিষয়ের দলিলও পাওয়া যায়। তা হলো—কোনো বড়ো গোষ্ঠী বা দলের কিছু লোক যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে পুরো গোষ্ঠী বা দলই চুক্তি ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হবে; যতক্ষণ বাকিরা ওই দোষী কিছু লোকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা না নেবে।

এজন্যই নবিজি যখন দেখেন—কুরাইশের কিছু লোক মুসলিমদের মিত্র গোত্রের ওপর রাতের আঁধারে ন্যক্কার ও ধিক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে এবং এই অন্যায়ের বিপক্ষে তাদের বাকি লোকেরাও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে, এমনকি এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রতিবাদ বা নিন্দা বার্তাও নেই—তখনই নবিজি বুঝতে পেরেছেন, এই কুকর্মে কুরাইশরা সবাই একমত ও সম্মত।

---

১৪১ সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৮

সুতরাং তিনিও এর ওপর ভিত্তি করে তাদের ওপর হামলার ইচ্ছা করেন। কারণ, তাদের নীরবতাই সাক্ষী চুক্তি ভঙ্গের খেয়ানতে তারা সবাই সহমত ও রাজি। সুতরাং মক্কার বড়ো বড়ো মাতব্বর ও শীর্ষস্থানীয় নেতারা যেখানে চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে একমত, সেখানে তাদের সহমনা সাধারণ পাবলিকও যে তাদের সাথে সহমত, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণেই চুক্তি ভঙ্গে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফলে এখন তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়াও অত্যাবশ্যক ও অতীব জরুরি।

অনুরূপ নবিজি বনু কুরাইজা চুক্তি ভঙ্গ করলে ভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে কে ছিল না ছিল—তা জিজ্ঞেস ছাড়াই যুদ্ধ-সমর্থ সকলকেই হত্যা করান। কারণ, তাদের কিছু লোক থেকে চুক্তি ভঙ্গের ওপর বাকিদের সন্তুষ্টির মাধ্যমেই সবার থেকে চুক্তি ভেঙে যায়। অনুরূপ বনু নাজিরের কিছু লোক চুক্তি ভঙ্গ করলে নবিজি সবাইকে মদিনা থেকে বহিষ্কার ও বিতাড়িত করেন আংশিক দুষ্কৃতিকারীর অপকর্মে বাকিদের অসম্মতি না পাওয়ায়।

০২. হাতিব ইবনে আবু বালতাআ রা.-এর ঘটনা-সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়

♦ **এক.** এই ঘটনায় ওহির মাধ্যমে সংঘটিত নবিজির নবুয়তের আরেকটি ঝলক ও মুজিজা সুস্পষ্ট রয়েছে। তা হলো—পত্রবাহক নারীর অবস্থানস্থল বলে দেওয়া। কারণ, জাগতিক কোনো মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ ব্যতীত এভাবে স্থানের নাম উল্লেখ করে কারও অবস্থান নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া কালক্রমেও কারও পক্ষে সম্ভব নয়; যদি তাঁর ওপর সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মদত ও সাহায্য না থাকে। আর নবিজি নবি হওয়ার কারণেই এই সাহায্য পেয়েছিলেন।

দুটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

☞ **ক.** এখানে প্রশ্ন হতে পারে—এই চিঠি সম্পর্কে নবিজিকে কে জানিয়েছে এবং হাতিব ইবনে আবু বালতাআ রা. ও ওই নারীর মাঝে সংঘটিত চুক্তির খবর নবিজিকে কে সরবরাহ করেছে?

উত্তর : এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই বার্তা প্রদান ওহির মাধ্যমে ছিল। কারণ, অসাধারণ ও অস্বাভাবিকভাবে অবহিত করাই নবুয়তের কাজ। এ থেকে পরিষ্কার, আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিব ও পেয়ারা নবিকে যথাসময়ে অবগত করার সুরতে নিজ সহযোগিতায় তাঁকে সুপ্রসন্ন করেছেন। এবং তারপর তিনি এই মহাবিজয় দান করে

তাঁর হাবিব ও মুসলিম জাতিকে সম্মানিত ও মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন। যেটা তিনি আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং যেটার প্রতিশ্রুতি আগেভাগেই দিয়েছিলেন।

☞ **খ.** অপরাধ স্বীকার করাতে কোনো অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজনকে রিমান্ডে নিয়ে নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া বা টর্চার সেলে বন্দি করে টর্চার করা জায়িজ?

উত্তর : কোনো কোনো ইমামের বক্তব্যে এর বৈধতা পাওয়া যায়। তারা ওই পত্রবাহক নারীকে আলি রা. কাপড় খুলে তল্লাশি চালানোর যেই ধমকি দিয়েছিলেন, সেটাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। কাজেই তাদের মতে মুসলিম শাসক নিজেই বা তার প্রতিনিধি অর্থাৎ অপরাধ দমনে নিযুক্ত বাহিনী অপরাধ স্বীকার করাতে উপযোগী যেকোনো ছলচাতুরী ও কৌশলের আশ্রয় নিতে পারবে।

এভাবে তারা এর পক্ষে খাইবারের ঘটনাকেও দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, ইহুদিরা খাইবারের যুদ্ধে যখন হুয়াই ইবনে আখতাবের সহায়-সম্পত্তি সব গায়েব করে ফেলে, তখন নবিজি তাঁর চাচাকে জিজ্ঞেস করেন, বনু নাজির থেকে হুয়াই যেই থলিটি এনেছিল, সেটা কোথায়?

সে জবাব দেয়—যুদ্ধ ও অন্যান্য খাতে খরচ হয়ে গেছে।

নবিজি বলেন—মাত্রই তো ওটা আনা হয়েছে এবং এর পরিমাণও অনেক ছিল। নবিজি তাকে জুবাইর রা.-এর কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি তাকে কঠিন জেরার মুখে ফেলেন। তখন সে স্বীকার করে—আসলে হুয়াইকে আমি অমুক নির্জন স্থানে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে দেখেছি।

তৎক্ষণাৎ সাহাবায়ে কিরাম সেখানে গিয়ে তল্লাশি ও অভিযান চালালে মাল বেরিয়ে আসে।

আমাদের সমকালীন কতক বিশ্লেষক এই মতকে ইমাম মালিক রহ.-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তবে আসল ও প্রকৃত কথা হলো—কোনো অপরাধ শরয়ি একাধিক মজবুত দলিল-প্রমাণের একটি দ্বারাও যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে অপরাধ স্বীকারে তার ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন চালানো জায়িজ নয়। এটাই আইম্মায়ে আরবাআ এবং জমহুর বিশ্লেষক ও আলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। যতক্ষণ কারও

ব্যাপারে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ স্বীকৃত না হবে, ততক্ষণ তাকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করা যাবে না। সে নিরপরাধ বলেই বিবেচিত হবে।[১৪২]

তবে উল্লিখিত ওই নারীর বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ, তার ব্যাপারে দুটি কারণ রয়েছে—

- **এক.** ওই অভিযুক্ত নারী শুধু অভিযুক্তই ছিল না; বরং সত্যিকার অর্থেই অপরাধী ছিল। যেই অপরাধকর্মের সত্যতা নিখিল জাহানের অতুলনীয় সত্যবাদী ও নিষ্পাপ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ প্রদান থেকে স্পষ্ট; বরং তার এই খবর ওই নারীর স্বীকার ও স্বীকৃতির চেয়েও মজবুত ও শক্তিশালী।

  সুতরাং কাউকে অপরাধী শনাক্ত করার ক্ষেত্রে পাপী-তাপী কিছু লোকের সন্দেহ ও অনুমানভিত্তিক বক্তব্যকে ওই সন্দেহাতীত অপরাধী নারীর ব্যাপারে নবিজির সংবাদ প্রদানের ওপর কিয়াস ও তুলনা করা কীভাবে যৌক্তিক হয়?

  তারপর এই নারীর ব্যাপারে যেই বক্তব্য সেই একই কথা হুয়াই ইবনে আখতাবের চাচার ব্যাপারেও।

- **দুই.** মহিলার কাপড় খুলে তল্লাশি চালানোকে রিমান্ডের জন্য গ্রেফতার বা বন্দি করার মতো বলা যাবে না। দুটির মাঝে পরিষ্কার ও বিস্তর ফারাক রয়েছে। কারণ, পত্র যখন তার কাছেই থাকা নিশ্চিত ও অকাট্য এবং দেখা যাচ্ছে তাকে বিবস্ত্র করা ছাড়া পত্র উদ্ধার সম্ভবও নয়, তখন তার মতো দুষ্ট নারীর সাথে এমন অশোভন আচরণও জায়িজ ও নিশ্চিত বিষয় ছিল। এবং এর জন্য সে নিজেই দায়ী। কারণ, পত্র উদ্ধারের যেই নির্দেশ নবিজি দিয়েছিলেন, তা পালন করা ওয়াজিব ছিল।

আর জুবাইর রা. হুয়াই ইবনে আখতাবের চাচাকে যতটুকু শারীরিক কষ্ট দিয়েছেন, তার দুটি ব্যাখ্যা—

- **এক.** হুয়াই ইবনে আখতাবের বিষয়টির ভিত্তি বাস্তব অবস্থার ওপর। মিথ্যা অপবাদ বা চাপানো দোষের ওপর নয়।

---

১৪২ এটা শরয়ি সিদ্ধান্ত। যা বর্তমান বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সাথে গরমিল। কারণ, বর্তমান বিচারব্যবস্থা শরয়ি তো নয়ই; বরং বলতে গেলে ভজ্জুর।

♦ **দুই.** ব্যাপারটি ছিল জিহাদ এবং মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে লড়াই সম্পর্কিত।

সুতরাং মুসলিমদের এই পৃথক পৃথক বিষয়গুলোর একটিকে আরেকটির ওপর প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব? অতএব, যারা উক্ত মতটি ইমাম মালিক রহ. তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন বলে মনে করেন, তাদের এই ধারণা ভুল ও বেঠিক। এবং তার অবস্থানেরও বিপরীত। কারণ, তিনি কিতাবে ভিন্ন মত পেশ করেছেন।

আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরা কিতাবে এসেছে—ইমাম মালিক রহ. থেকে সুহনুন বর্ণনা করেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়—কাউকে যদি ভয় দেখানো হয় বা জেলখানায় বন্দি করা হয় বা শাসানো হয় অথবা মারপিট করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে হদ আবশ্যক—এমন কোনো অপরাধ স্বীকার করে নেয়, তাহলে তার ওপর হদ কার্যকর করা জায়িজ, না নাজায়িজ?

ইমাম মালিক রহ. জবাব দেন—যে ব্যক্তি ভয় দেখানো বা ধমকাধমকির পরে স্বীকার করবে, তার দাবি ভিত্তিহীন। আর যাকে মারপিট করে স্বীকার করানো হবে, অথবা মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে বন্দি করে রাখা হবে, আমার মতে এসবই ধমকি ও জোরজবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এবং আমার দৃষ্টিতে এসবের কারণে হদ কার্যকর করা জায়িজ হবে না।

তারপর সুহনুন আবার জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা কাউকে যদি মারপিট বা ধমকানোর পরে সে নিহতের লাশ বা চুরিকৃত জিনিস উপস্থিত করে, তাহলে এর ভিত্তিতে কি তার ওপর হদ কার্যকর করা হবে, না হবে না?

ইমাম মালিক রহ. বলেন—ভয় দেখানো বা শাসানো ছাড়া অপরাধ স্বীকার না করলে বিনা দলিলে তার ওপর হদ কার্যকর করা যাবে না।

মারাত্মক ইস্যুতেও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব নয়

চিঠি সম্পর্কে হাতিব ইবনে আবু বালতাআ রা.-কে নবিজির জিজ্ঞেস করা, তার জবাব দেওয়া এবং এই প্রেক্ষাপটেই আয়াত নাজিল হওয়া—এসবের স্পষ্ট নির্দেশনা হলো কঠিন ও জটিলতর অবস্থাতেও আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব বা সখ্য গড়া বা আঁতাঁত করা মুসলিমদের জন্য কোনোভাবেই জায়িজ নয়। কোনো মুসলিমই ইসলামের শত্রুদের প্রতি বন্ধুত্ব বা সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারবে না।

তবে হাতিব রা.-এর বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ নবিজির প্রিয় এই বদরি সাহাবির জন্যও একই হুকুম; কিন্তু তার পত্র পাঠানোর ব্যাপারটি কিছুটা অন্যরকম। কারণ, তিনি কুরাইশদের সাথে দীর্ঘ একটা সময় কাটান। ব্যস তিনি এ কারণেই এমনটি করেছেন। নতুবা কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতিহত করা বা তাদের নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে আগাম বার্তা হিসেবে তিনি কুরাইশদের জানাতে চাননি। তিনি তাদের প্রতি কেবল একটু ইহসান ও অনুগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। যেই অনুগ্রহের বিনিময়ে ওরা তার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের কিছুটা খেয়াল রাখবে। তিনি নবিজির সামনে ওজরখাহিও করেছেন যে, কুরাইশদের সাথে তার বংশীয় কোনো সম্পর্ক নেই; বরং একসময় তিনি তাদের মিত্র ছিলেন বলে এমন করেছেন। মূলত তার উদ্দেশ্যই ছিল মক্কায় থাকা পরিবারের সুরক্ষা।

এরপর যেসব আয়াত নাজিল হয়েছে, সেগুলোর সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো—মুসলিমদের বন্ধুত্ব ও সখ্য শুধু এবং শুধুই আল্লাহর ওয়াস্তে হতে হবে। এ ছাড়া সর্বপ্রকার এবং সব ধরনের সম্পর্ক ও আন্তরিকতা সমাধিস্থ করতে হবে। তবে অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার বা দুঃসম্পর্ক রাখতে হবে এমন নয়; বরং তাদের সাথেও দ্বীনে হানিফ তথা শরিয়তে মুহাম্মাদির নীতিমালা ও সংবিধান অনুযায়ী সুসম্পর্ক ও সখ্য রাখবে। নতুবা মুসলিমদের জানমাল ও মনের চাহিদা সবকিছুই আল্লাহর রাস্তায় বিসর্জিত ও উৎসর্গিত বলে প্রমাণিত হবে কীভাবে, যদি তাদের মনে ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য না থাকে? এজন্যই এসব ত্যাগ-তিতিক্ষার সাথে সাথে ইখলাস ও নেক নিয়ত থাকা অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক।

বর্তমান সময়ে এবং এই আধুনিক যুগে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ বিশ্বের অসংখ্য-অগণিত মুসলিম সালাতের জন্য মসজিদমুখী হয়। লক্ষ-কোটি মুসলিমের উপস্থিতিতে জিকির-আজকারের মজলিসগুলো প্রাণবন্ত ও সরগরম থাকে। আধুনিক থেকে আধুনিক তাসবিহ ও জপমালা তাদের হাতে হাতে শোভা পায়। কিন্তু; তাদের কাছে সুসম্পর্ক ও সখ্যতার মাপকাঠি থাকে বংশীয় ও গোত্রীয় কিংবা আত্মীয় ও দলীয় লোক হওয়া। অথবা মাল বা দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ। অথবা কুপ্রবৃত্তি ও মনের কামনা-বাসনার পূর্ণতা দান। এ জাতীয় পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের অর্থ যে হকের বিনিময়ে বাতিল কেনা অথবা দুনিয়াবি তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট চাহিদা পূরণ করে দ্বীনের ওপর পর্দা ফেলা; সে বিষয়টি তাদের কাছে একেবারেই গৌণ ও গুরুত্বহীন।

প্রকৃতপক্ষে এদেরই বলে মুনাফিক। যুগে যুগে এদের কারণেই মুসলিম বিশ্ব লাঞ্ছনা-অনৈক্য আর দুর্বলতার শিকার হয়েছে। এদের ওপর ভর করেই চতুর্দিক থেকে ইসলাম ও মুসলিমের ওপর নগ্ন হামলা চলে। এরাই ওইসব লোক—যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে সকল ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা তৈরিতে আগে আগে থাকে এবং মুসলিমদের ঐ ও ভ্রাতৃত্বের শেকড় কাটতে শত্রুদের গাইডলাইন প্রদান করে।

০৩. আবু সুফিয়ান ও তার ব্যাপারে নবিজির অবস্থান

মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ানের ব্যাপারটি ছিল বেশ চমকপ্রদ। কারণ, তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যে কিনা এদিন কুরাইশদের নবিজির সাথে লড়াইয়ের বিপক্ষে ধমকি শুনিয়ে ভয় দেখান। এবং তিনিই এদিন দলে দলে ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকার সর্বশীর্ষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অথচ তিনিই ইতঃপূর্বে মক্কা থেকে বহির্গত ইসলামবিরোধী প্রতিটি কুরাইশ বাহিনীর গাইড ছিলেন। তার তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতাতেই ইসলামের বিপক্ষীয় সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এবং তার উসকানিতেই মুশরিকরা বারবার যুদ্ধে যায়; কিন্তু সম্ভবত এটাই ছিল খোদায়ি ফয়সালা যে, এখন মক্কা বিজয়টা যেন রক্তপাতহীন হয় এবং এখানকার বাসিন্দারা যেন কোনো ঝামেলা বা সংঘর্ষ ছাড়াই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয়নবির অনুগত হয়ে যায়।

অথচ কয়েক বছর আগে এরাই নবিজি ও সাহাবিদের ওপর নানা রকম জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে সীমাহীন কষ্ট ও যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত করেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে-সহ সবাইকে বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করেছে। উপরন্তু নতুন আশ্রয় ও আবাস মদিনার ওপর হামলে পড়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন ও নাস্তানাবুদ করার দুঃসাহসও দেখিয়েছে।

অতঃপর ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় আগে আগে এবং সামনে থেকে প্রধান ও মুখ্যের ভূমিকা পালনকারী এই আবু সুফিয়ানই আজ ইসলাম কবুলের দিনেও অগ্রগামিতার তির ছিনিয়ে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে তার ব্যাপারটি সত্যিই বিস্ময়কর। যাহোক, তার মুসলিম হওয়ার এই সৌভাগ্য হাসিল হয়েছে 'মাররুজ জাহরানে' নবিজির সাথে মোলাকাত ও সাক্ষাতের ওসিলায়।

এর প্রেক্ষাপট ছিল—আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে মক্কাবাসীকে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে বিপরীতে শতভাগ পরাজয়ের ভয় দেখান, মক্কাকে নিরাপত্তা ও মুক্তির আবাস হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন এবং তাদের মাথা থেকে সংঘাত-সংঘর্ষের ভূত

ছাড়ান। এতে জাহিলিয়াত ও শিরকি জীবনের অবসান ও সমাপ্তি ঘটে এবং একত্ববাদ ও ইসলামের প্রোজ্জ্বল আলোয় চারপাশ আলোকিত হয়।

এর প্রাথমিক চিত্রস্বরূপ তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে নবিজিও নগরীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখতে কার্যকর ও বাস্তবায়িত রূপ হিসেবে তার ঘরে প্রবেশ করাকেও নিরাপত্তা লাভের শর্ত ঘোষণা দেন। নবিজি তার মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে হিকমত অবলম্বন করে তার ঘরকে 'দারুল আমান' (House of Save-নিরাপত্তাকেন্দ্র)-এর মর্যাদা দেন।

কারণ সবাই জানে—ইসলামের সারকথা হলো, ইসলামের আকিদাগত ও আমলি—সব মৌলিক বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও কবুল করে নেওয়া। ইসলামের বিধিনিষেধের সামনে নিজের পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা। তারপর জরুরি হলো—প্রত্যেকের মনে ঈমানকে দৃঢ়ভাবে জমানো এবং হৃদয়ে প্রোথিত ও বদ্ধমূল করা। আর এটা হাসিল হয় ইসলামের মৌলিক ও প্রধান বিষয়গুলোর ওপর দৃঢ়তার সাথে যথাযথ আমলের মাধ্যমে। ফলত এ কারণেই বৈধ তরিকায় মুসলিমদের মনোতুষ্টির মাধ্যমে তাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা সৃষ্টি হয়। তাদের ঈমানের ভিতে কখনো কম্পন ধরে না।

নবিজি যখন আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশকে নিরাপত্তা বলে ঘোষণা দেন, তখন এই হিকমত ও গূঢ় তত্ত্বটি কোনো কোনো আনসারি সাহাবির মনে ছিল না। তাই নবিজির এই ঘোষণায় তাদের মনে খটকা লাগে; নবিজি মনে হয়, স্বজন ও স্বদেশ প্রীতির খাতিরে এবং তাদের প্রতি অতিরিক্ত দয়া দেখিয়ে এমন ঘোষণা দিয়েছেন। যে কারণে তিনি (প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে) তাদের সাথে সন্ধি ও ক্ষমার আচরণ করছেন।

এ বিষয়ে ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—নবিজি আবু সুফিয়ানের ঘরকে দারুল আমান ঘোষণা দিলে কোনো কোনো আনসারি সাহাবি বলতে থাকেন, নবিজি তাদের দিকে ঝুঁকে গেছেন এবং তার ওপর আত্মীয়তার বন্ধন প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন—তারপর নবিজির ওপর ওহি নাজিল হয়। ওহি নাজিল হওয়া আমরা বুঝতে পারতাম এবং নাজিলের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই তাঁর দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাত না। ওহি নাজিল শেষ হলে নবিজি ডাক দিয়ে বলেন,

—হে আনসারি সাহাবিরা!

—লাব্বাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ (ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা মনেপ্রাণে হাজির)। সবাই সমস্বরে বলে ওঠেন।

—তোমরা নাকি বলে ফেলেছ, আমার হৃদয়ে স্বদেশের টান প্রবল হয়ে গেছে?

—জি, এমনিই।

—কিন্তু বাস্তবে তো এমন নয়; বরং আমি তো আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। আমি আল্লাহর দিকে এবং তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। আমার জীবন-মরণ তোমাদের সাথেই জড়ানো।

নবিজির এই মন্তব্য শুনে আনসারি সাহাবিরা রোনাজারি করতে করতে নবিজির দিকে এগিয়ে এসে বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা যা কিছুই মন্তব্য করেছি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রেম-ভালোবাসা থেকে করেছি।

যেমনটি আমরা আগেই বলে এসেছি—এটা ওই ইসলাম ও ঈমানের মধ্যবর্তী পার্থক্য। এর দ্বারা ওই প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়, যা মাররুজ জাহরানে আবু সুফিয়ানকে নবিজির দাওয়াত অতঃপর তার সংশয় প্রকাশ এবং তারপর আব্বাস রা.-এর ধমক খেয়ে তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে করা যেতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন হতে পারে—ধমকি খেয়ে ইসলাম গ্রহণের মূল্য বা মূল্য কী? কারণ, আবু সুফিয়ান যেই না নবিজির নবুয়ত নিয়ে নিজের সংশয় ও দ্বিধার কথা বলেছেন, পরক্ষণেই আব্বাস রা. সংশয় দূর না করে তাকে ধমক দিয়ে ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী (বলতে গেলে একরকম বাধ্য) করে তোলেন।

এর উত্তর হলো—দুনিয়ার যেকোনো কাফির-মুশরিককে এভাবে ধমকের সাথে দাওয়াত দিলে সাময়িকভাবে ধমকির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সে যেন আপাতত বাহ্যিকভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল এবং মুখে তাওহিদ স্বীকার করে ইসলামের অনুসারীদের খাতায় নাম লেখায়। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের প্রবক্তা হয়। তাঁর রাসুলের নবুয়ত এবং তাঁর পক্ষ থেকে আনীত সকল কিছুর প্রাথমিক স্বীকারকারী হয়। তারপর সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ঈমানও যেন হৃদয়ের গভীরে মজবুত, দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে যায়।

এটাই ঈমান ও ইসলাম দুই শব্দের মাঝে পার্থক্য। ইসলাম হলো—বাহ্যিক আনুগত্য আর ঈমান অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই আল্লাহ তায়ালা গ্রাম্য অক্ষরজ্ঞানহীন কিছু মুসলিমের ব্যাপারে বলেন—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ

মরুবাসীরা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলেন—তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করোনি; বরং তোমরা বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি।[১৪৩]

যুদ্ধাবস্থায় 'মুসলিম নাটককারী'র হুকুম

এ কারণেই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোনো কাফির মুসলিম হলে তার ইসলাম গ্রহণকে মুসলিমদের হাতে নিহত হওয়ার ভয় বা গনিমতের লালসায় ইসলাম গ্রহণ অথবা ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা নাটক বলা কোনো মুসলিমের জন্য জায়িজ নয়। এমতাবস্থায় খাঁটি মনে ঈমান না আনার ওপর যতই দলিল বা ইশারা-ইঙ্গিত থাকুক না কেন। কারণ, অন্তরের ভেদ জানা উদ্দেশ্য নয়; বরং বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সংশোধনই মূল লক্ষ্য। এর দলিল হলো—একবার এক কাফির বাহিনীর জনৈক মুশরিক ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে এক সাহাবির মনে হয়, সে মরণ থেকে বাঁচতে মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এই মনে করে তিনি তাকে মেরে ফেলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করো, তখন যাচাই করে নাও এবং যে তোমাদের সালাম দেয়, তাকে বলো না, তুমি মুসলিম নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো, বস্তুত আল্লাহর কাছে

---

১৪৩ সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৪

অনেক সম্পদ রয়েছে। ইতঃপূর্বে তোমরাও তো এমনি ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন।[১৪৪]

লক্ষণীয়, আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কিরামকে কীভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারাও ইসলাম গ্রহণের শুরুতে আজকের মতো প্রগাঢ় ও দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না। তারপর তিনি তাদের প্রতি অশেষ দয়া ও সীমাহীন ইহসান করেছেন। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান বদ্ধমূল ও সুদৃঢ় হয়েছে এবং আমল করতে করতে সর্বপ্রকার নাপাকি ও বাতিল ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হয়েছেন।

আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে নবিজির হিকমত

আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও কত চমৎকার হিকমত অবলম্বন করেন! আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে তাকে একটি অপ্রশস্ত টিলার ওপর নিয়ে যেতে চাচা আব্বাস রা.-কে নির্দেশ দেন। যেন মুসলিম বাহিনীর যাত্রা দেখে ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে তার নতুন জ্ঞান হাসিল হয় এবং তার ধ্যানধারণায় পরিবর্তন ঘটে, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে এখন কতটা শক্তিশালী করেছেন! এবং যারা দুর্বল, নিঃস্ব ও সংখ্যালঘু হিসেবে মক্কা থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছে, তাদের আজ কত পরিবর্তন! আজ তারা সামরিক শক্তি ও সৈন্যসংখ্যায় কত ঊর্ধ্বে! এবং এই শিক্ষণীয় ঘটনা দ্বারা যেন তার আকিদা-বিশ্বাস ও দ্বীনের মজবুতি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

আবু সুফিয়ানকে টিলায় দাঁড় করালে তিনি ইসলামি বাহিনীর প্লাটুনের পর প্লাটুন যেতে দেখেন। সৈনিকের আধিক্য দেখে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হোন এবং তার মনে তাদের ভয় ঢুকে যায়। এ সময় তিনি জাহিলি যুগের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী রাজা-বাদশাহদের রাজত্বের মতো নবিজির বাদশাহির কথা বললে আব্বাস রা.-ও এটা নবুয়তের এক ঝলকমাত্র বলে তার গাফিলতির ঘুম ভাঙেন।

তিনি বলেন—তুমি কোন বাদশাহি বা রাজত্বের কথা বলছ? পার্থিব মান-মর্যাদা ও অঢেল অর্থকড়ির কথা বলছ? এসব তো তিনি সেদিনেই তাঁর পায়ের নিচে মাড়িয়েছেন, যেদিন তোমরা তাঁকে এসবের অফার দিয়ে লোভ দেখিয়েছিলে এবং

---

১৪৪ সুরা নিসা, আয়াত : ৯৪

তোমাদের পক্ষ থেকে চাপাচাপি ও সংকীর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি এবং নানা কষ্ট প্রদান তিনি নীরবে মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তোমরা এখানেই থেমে থাকোনি; বরং তোমাদের পাষাণ হৃদয় তাঁকে বহিষ্কারের প্ররোচনা দিয়েছে। বলো—তোমরা কি তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করোনি? আর নবুয়তের জিম্মাদারির বিপরীতে পার্থিব মান-মর্যাদা, অঢেল অর্থকড়ি এবং সাময়িক নেতৃত্ব ইত্যাদি অস্বীকার—এই তো ছিল তোমাদের দৃষ্টিতে তার অপরাধ, তাই না? সে ঈমান ও ইসলামের দিকে তোমাদের দাওয়াত দিত। এই তো ছিল তাঁর এত বছরের মেহনত! তুমি জানো এসব কী? এসবই নবুয়তের দায়দায়িত্ব।

আব্বাস রা.-এর মুখ থেকে এই কথাগুলো বের হওয়া আল্লাহ তায়ালারও ইচ্ছা ছিল। সবাই যেন জানতে পারে, নবিজির সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মেহনত-মুজাহাদা এই নববি পয়গাম প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যেই ছিল। এবং তিনি (আবু সুফিয়ান) ছাড়া কিয়ামত পর্যন্ত আগতদের মধ্যে আর কেউ যদি তাঁর নবুয়ত নিয়ে সন্দিহান ও দ্বিধাগ্রস্ত হয় বা থাকে, তাহলে এই ঐতিহাসিক বক্তব্য যেন হাশরের ময়দানে তার বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত ও পরিবেশিত হতে পারে।

কারণ স্পষ্ট। নবিজির দাওয়াত ক্ষণস্থায়ী ও মিছে রাজত্ব বা নেতৃত্ব লাভ কিংবা আরবদের গোঁড়ামি ও জাতীয়তাবাদ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ছিল না। (তাঁর দাওয়াত নতুন, অভিনব ও অশ্রুত কোনো পয়গামের ছিল না।) বরং প্রচলিত বিকৃত সত্য ধর্মের সত্যতা ও বাস্তবতাকে উঁচু করে তোলার জন্যই ছিল। আব্বাস রা.-এর উক্ত উক্তি নবিজির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা জীবনের সামগ্রিক ও সার্বিক শিরোনাম। কারণ, নবিজির গোটা জিন্দেগি ও জীবনের প্রতিটি ধাপই সুস্পষ্ট ও জীবন্ত দলিল যে, তাঁর দুনিয়ায় আগমনের অভীষ্ট লক্ষ্যই ছিল মানবজাতির মাঝে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার। এই নশ্বর ও তুচ্ছ পৃথিবীতে নিজের বাদশাহি বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা নয়। কারণ, তাঁর সর্বজনীন রাজত্ব নবুয়তেরই একটি উপশাখা মাত্র।

০৪. মক্কায় প্রবেশকালে নবিজির অবস্থা ও প্রকৃতি

নবিজির মক্কায় প্রবেশকালে আনন্দিত ও সুখকর অবস্থায় সুরা ফাতহ পড়ার যেই বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি রহ. উল্লেখ করেছেন, তাতে 'তারজি' (ترجيع) শব্দের উল্লেখও রয়েছে। আরবি শব্দ তারজির অর্থ সুর দিয়ে পড়া বা আবৃত্তি করা। আনন্দিত ও সুখকর অবস্থায় নবিজির তিলাওয়াত থেকে অনুমিত হয়, এ সময় তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে সশরীরে উপস্থিতির

অবস্থা ও প্রকৃতিতে ছিলেন। এই খোদায়ি মদত ও সাহায্য, অভাবনীয় বিজয় ও মহাসাফল্যের নেশায় দুনিয়াদারদের মতো আত্মহারা বা অস্বাভাবিক হওয়ার অবস্থা তাঁকে ছুঁতে পারেনি। এবং যেখানে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ জয়ী হয়ে বড়াই ও গর্বে ফেটে পড়ে (এবং প্রতিশোধস্পৃহায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে), সেখানে (স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে) তাঁর চিন্তাচেতনায় অহংকার-অহমিকার রেশমাত্রও ছিল না। উলটো তিনি মহামহিম রব ও প্রেমাস্পদ আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণ ও অকৃত্রিম অপারগতা ও আত্মতুচ্ছতায় জমে ছিলেন। এবং আপন প্রতিপালকের সীমাহীন ও অফুরন্ত সাহায্য-সহযোগিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ছিলেন নতশির ও বিনয়ী।

মক্কা বিজয়ে নবিজির বিনয়

এ সময়ের চিত্র আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায়। তাতে আছে—নবিজি জু তুওয়ায় পৌঁছেই আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অবলোকন করেন; যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। তখন তিনি মাথা মুবারক বিনয় ও নম্রতায় এত ঝুঁকিয়ে দেন যে, দাঁড়ির অগ্রভাগ হাওদার কাঠের মাথা ছুঁয়ে যায়।

এর উদ্দেশ্য হলো—নবিজি যখন আপন রবের হুকুমের অনুগত থাকার প্রতিফল স্বচক্ষে দেখেন এবং স্বজাতির জুলুম-নির্যাতন, যাতনা-যন্ত্রণা সহ্য ও হজমের পর আল্লাহর মদত ও বিজয়ের আকৃতিতে দৃঢ়তা ও স্থিরতার সুমিষ্ট ফল লাভ করেন, তখন তিনি প্রিয় প্রভুর সামনে পূর্ণাঙ্গ বন্দেগি প্রদর্শন করেন যে, মহান মালিক ও স্রষ্টা কত ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছেন। অথচ এখান থেকেই এবং নিজ ঘর থেকেই তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। সুতরাং এটাই কি চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বন্দেগি প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় ও মুহূর্ত নয়? এখানে তিনটি বিষয় উল্লেখ্য—

♦ **এক.** সকল মুসলিমের জন্যই জরুরি ও আবশ্যক, তারাও ভালো অবস্থা-দুরবস্থা, সহজ-কঠিন, প্রশস্ততা-সংকীর্ণতা, সবলতা-দুর্বলতা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগি পূর্ণভাবে সম্পাদন ও সমর্পণ করবে। মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য এটা নয়, বিপদাপদ বা দুর্যোগে পড়ে আল্লাহর সামনে নিজেদের অপারগতা, দীনতা এবং অভাব দেখাবে আর পরে সেই বিপদাপদ ও দুর্যোগ কেটে গেলে এবং কষ্ট ও সমস্যার নিরসন ঘটলে খুশিতে আত্মভোলা ও উন্মত্ত হয়ে যাবে। এমনকি এই খুশির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে দুনিয়া-আখিরাত সবকিছু ভুলে

যাবে। আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ ও হুকুম-আহকাম থেকে এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দায়মুক্ত হয়ে যাবে যে, এর কোনো কিছু সে টেরই পাবে না। উলটো তার মনেই থাকবে না বিপদের সময় সে কোথাও কোনো আবেদন করেছিল কি না!

◆ **দুই.** ইমাম বুখারি রহ. বর্ণিত হাদিস থেকে সুর দিয়ে তিলাওয়াত করার বৈধতা পাওয়া যায়। এটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ মত এবং হানাফি ও শাফিয়ি সাধারণ উলামা এবং অধিকাংশ মালিকিদের অভিমত। তবে কণ্ঠ ও সুর দিয়ে পড়ার বিপক্ষে বহু সাহাবি ও তাবিয়ি থেকে বর্ণিত কিছু বর্ণনাকে যারা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো—এমন সুর বা ঢঙে পড়া, যাতে হরফের সঠিক উচ্চারণ ও মাখরাজ আদায় বাধাগ্রস্ত হয়। তো এই রকম অবস্থায় নাজায়িজ শুধু তাদের মতেই নয়; বরং সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়িজ। কারণ, ভিন্ন মাখরাজ আদায়ে অর্থেও বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটে।

◆ **তিন.** নবিজি মক্কার বিভিন্ন রাস্তা ধরে মুজাহিদদের প্রবেশের নির্দেশ দিয়ে নিজের সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই নির্দেশের হিকমত হলো মক্কাবাসী লড়াই করতে চাইলেও যেন না পারে। কারণ, তারা যখন দেখবে মক্কার প্রতিটি প্রবেশপথ মুসলিমদের দখলে, তখন তারা না পারবে দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়ে সৈন্যসমাবেশ ঘটাতে এবং না পারবে লড়াই বা প্রতিরোধের সাহস করতে। এভাবে প্রতিরোধ ও বাধার উপায়-উপকরণও কম ও দুর্বল হয়ে যাবে এবং একপর্যায়ে তারা ঝামেলা করা ও হাতিয়ার তোলার আগ্রহও হারিয়ে ফেলবে।

সম্মানিত শহরের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং রক্তপাত থেকে পবিত্রতা বজায় রাখতেই নবিজি এমন করেন। এজন্যই তিনি সাহাবায়ে কিরামকে মক্কাবাসীর বাড়াবাড়ি না থাকলে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং সাথে সাথে ঘরবন্দি থাকাকেও নিরাপত্তা বলে ঘোষণা দেন।

০৫. মক্কার হারামসংক্রান্ত কিছু বিধান

হারামে মক্কার, অর্থাৎ, মক্কার নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে শিদ্ধ-অশিদ্ধ বিষয়ের বিশেষ কিছু হুকুম—

এক. হারামের সীমারেখায় লড়াই বা সংঘর্ষের নিষিদ্ধ

'সহিহ বুখারি'র বর্ণিত তথ্যমতে, হারামের সীমানায় নবিজি কোনো রকম লড়াই বা সংঘাতে জড়াতে নিষেধ করেন। এবং এই হুকুমের ব্যতিক্রমে শুধু আগ বেড়ে লড়াইকারী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছয় আসামির সাথে প্রয়োজনে লড়াইয়ের অনুমতি দেন।

আরও জানা যায়, এক স্থানে তরবারির ঝলকানি দেখে তিনি তা অপছন্দ করেন। অতঃপর জানতে পারেন, ওটা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর বাহিনী। তার সাথে যুদ্ধ বাঁধানো হয়েছে। তাই তিনি সংঘর্ষে জড়াতে বাধ্য হন। শেষে বলেন—আল্লাহর ফয়সালাতেই কল্যাণ।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, সেদিনের ঐতিহাসিক খুতবায় তিনি বলেন—

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। তার সম্মান মানুষের পক্ষ থেকে নয়। সুতরাং যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য অনুমতি নেই এখানে রক্তপাত ঘটানো বা কোনো উদ্ভিদ কাটা। কেউ যদি আল্লাহর নবির লড়াইকে দলিল বানায়, তবে তাকে বলবে—আল্লাহ তাঁর রাসুলকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদের অনুমতি নেই। উপরন্তু তাঁর রাসুলকেও তিনি স্বল্প সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আগের মতোই এর নিষিদ্ধতা ফিরে এসেছে। যেই নিষিদ্ধতা কালও ছিল এবং এখনও বহাল।

সাধারণ উলামায়ে কিরাম নবিজির এই খুতবা থেকে মাসয়ালা বের করে বলেন—মক্কা নগরী এবং সংযুক্ত হারামের সীমারেখায় কিয়ামত পর্যন্ত সব ধরনের লড়াই বা সংঘর্ষ নিষিদ্ধ। কারণ, নবিজি মক্কা বিজয়ের দিন সুস্পষ্ট শব্দে নিষিদ্ধতার ঘোষণা দিয়েছেন।

হারামে অমুসলিমদের প্রবেশ-নিষেধ কার্যকর করা

তারপর, হারামে মক্কায় কিছু মুশরিক, রাষ্ট্রদ্রোহী ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের রক্তপাতের বৈধতা দান আর খুতবায় শর্তহীনভাবে অবৈধ ঘোষণা বিপরীতমুখী এই দুই বিষয়ের সমাধান ও সুরাহা কী বা কীভাবে হবে, তা নিয়ে উলামায়ে কিরাম আলোচনা করেছেন।

তারা বলেন—মুশরিক (অংশীদার সাব্যস্তকারী) ও মুলহিদ (নাস্তিক)-এর সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তো নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ, শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশে আছে—মক্কা শরিফে মুসলিম ছাড়া দ্বিতীয় কারও বসবাস বা অবস্থানের সুযোগ বা অনুমতি নেই। এতে আইম্মায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এমনকি শাফিয়ি ফুকাহা ও অনেক মুজতাহিদের মতে, মক্কা শরিফের সীমানায় কোনো অমুসলিমের পা রাখাও হারাম। তারা সুরা তাওবার আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ، فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا،

> নিঃসন্দেহে মুশরিকরা আপাদমস্তক অপবিত্র। কাজেই ওরা এ বছরের পর আর যেন মসজিদে হারামের ধারেকাছেও না আসে।[১৪৫]

এই আয়াতের আলোকে মক্কাবাসীর (এলাকাবাসী ও প্রশাসন প্রমুখের) ওপর আবশ্যক হলো, কোনো অমুসলিম মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া এবং প্রয়োজনে তার সাথে লড়াই করা।

এই নির্দেশের উদ্দেশ্য—মক্কা শরিফকে কাফির-মুশরিকদের নাপাকি ও অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা। এটা ইসলামের অন্যতম মুজিজা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবের মুখনিঃসৃত প্রতিশ্রুতি বাক্যের বাস্তবায়ন ঘটান এবং নিজেও তাঁর বাণীতে এর স্বপক্ষে বলেছেন।[১৪৬]

---

১৪৫ সুরা তাওবা, আয়াত : ২৮

১৪৬ এ কারণেই যুগে যুগে এখানে অমুসলিম সন্দেহে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবং ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির আওতায় নেওয়া হতো। তবুও ইউরোপীয়ানরা প্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। স্যার রিচার্ড বার্টন (১৮২১-১৮৯০)। ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত। ভাষাবিদ্যায় দক্ষতা, মানচিত্র অঙ্কনবিদ্যায় পারদর্শিতা, ভূগোলবিদ্যায় অসামান্য দখলের কারণে তাকে 'সকল কাজের কাজি' সম্বোধন করা হয়। তিনি লেখালেখিও করতেন। লক্ষণীয়ভাবে তিনিই প্রথম অমুসলিম—যিনি সফলভাবে মক্কায় তীর্থযাত্রী হিসেবে প্রবেশের সুযোগ পান। যদিও নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকে মুসলিম তীর্থযাত্রী ছদ্মবেশ নিতে হয়েছিল। তবে ব্যাপারটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ যাত্রার আগেও তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে সফলভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যক্রমে তিনি আরবিতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন।
আর ভারতে সেনাবাহিনীতে কাজ করার সময় ইসলাম সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই শিক্ষা নিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কিংবদন্তি অনুযায়ী, মুসলিম ছদ্মবেশটাকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য করার জন্য তিনি নিজের খতনা পর্যন্ত করান। তবুও তার ভ্রমণ এতটা সহজ ছিল না। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশ আর্মি থেকে ছুটি নিয়ে মিশর হয়ে মক্কার দিকে তার ভ্রমণ শুরু হয়। পথমধ্যে তার দলটি অনেকবার দস্যুদলের কবলে ছিনতাইয়ের শিকার হয়। এতসব বিপদ সত্ত্বেও বার্টন সফলভাবে হজ সম্পন্ন করেন এবং দেশে ফিরে তার ভ্রমণ নিয়ে বইও লেখেন, যা ওই সময়ে তাকে ইউরোপে বেশ জনপ্রিয় বানিয়ে দেয়। সূত্র : *যুগান্তর পত্রিকা* অবলম্বনে।

রাষ্ট্রদ্রোহী আসলে কে

রাষ্ট্রদ্রোহ হলো—নেককার ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের অন্যায় বিরোধিতা। এ হিসেবে যারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরোধিতার ঘোষণা দেয়, তারাই রাষ্ট্রদ্রোহী। এদের ব্যাপারে জমহুর ফুকাহার অভিমত হলো—সংঘাত ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পন্থায় যতক্ষণ এদের প্রতিহত ও দমন করা না যাবে, ততক্ষণ এদের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই অব্যাহত থাকবে।

কারণ, রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাথে লড়াই করা আল্লাহ তায়ালারই একটি হক। যা কখনো নষ্ট করা যাবে না। কাজেই হারামে মক্কায় তাঁর এই অধিকার রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উত্তমভাবে জায়িজ।

ইমাম নববি রহ. বলেন—রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কিত জমহুর ফুকাহার যেই অবস্থান বর্ণিত আছে, তা-ই ঠিক ও শুদ্ধ। এবং ইমাম শাফিয়ি রহ.ও তার 'ইখতিলাফুল হাদিস' (اختلاف الحديث) গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন—

> যেসব হাদিসের বাহ্যিক অর্থে হারামে মক্কায় শর্তহীনভাবে কোনো রকম সংঘর্ষ এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহীদের সাথেও লড়াইয়ের নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে, সেসব হাদিসের উত্তরে বলা হয়েছে—হারাম সংঘর্ষ বলতে (রাজা-বাদশাহদের মতো) জয়-পরাজয়মূলক যুদ্ধ উদ্দেশ্য অথবা কামান-ট্যাংক-রকেট লাঞ্চার-মিসাইল-পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি ভারী ও বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যেগুলোর ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলো দিয়ে নিষেধ।
>
> আবার যুদ্ধও তখন করতে হবে, যখন দ্বিতীয় কোনো পন্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অসম্ভব হবে। তবে মক্কা ছাড়া অন্য যেকোনো স্থানে কাফির-মুশরিক বা রাষ্ট্রদ্রোহী আত্মগোপন করলে ওদের নির্মূল ও দমনে উপযোগী যেকোনো পন্থা অবলম্বন এবং যেকোনো অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে।
>
> অবশ্য কোনো কোনো ফকিহর অভিমত হলো—মক্কার অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষে না জড়িয়ে বরং সর্বপ্রকার চাপ ও প্রেসার দিয়ে

শহর ছাড়তে বাধ্য করা। এতে শেষ পর্যন্ত ওরা হয়তো শহর ছেড়ে যাবে, নয়তো আনুগাত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নেবে।[১৪৭]

প্রসঙ্গত হদ কায়েম : ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর অবস্থান মোতাবেক মক্কার অভ্যন্তরে হদ কায়েম করা জায়িজ। তাদের দলিল ইমাম বুখারি রহ. বর্ণিত একটি হাদিস। তাতে আছে নবিজি বলেন—

أن الحرم لا يعيذ عاصيا و لا فارا بدم و لا فارا بخربة،

কোনো বিদ্রোহী, পলাতক খুনি ও ছিনতাইকারীকে হারামে মক্কা আশ্রয় দেয় না।[১৪৮]

ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থান হলো—এরা যতক্ষণ হারামের ভেতরে থাকবে, ততক্ষণ নিরাপদ। তবে সর্বপ্রকার চাপ ও প্রেসার দিয়ে শহর ছাড়তে বাধ্য করা হবে। অতঃপর যখন শহরের বাইরে বেরিয়ে যাবে, তখন তাদের ওপর হদ কায়েম করা হবে বা তাদের থেকে কিসাস নেওয়া হবে। এটা ইমাম আহমাদ রহ.-এরও এক উক্তি। তারা নবিজির খুতবার ওপর ভিত্তি করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারণ, খুতবায় সাধারণ নিরাপত্তার উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম জারকাশি রহ. (৭৪৫-৭৯৪ হি.) বলেন—

এখানে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, হারামে মক্কা হওয়া। অর্থাৎ কাফির বা রাষ্ট্রদ্রোহী যদি মক্কা ছাড়া অন্য কোনো শহরে আত্মগোপন করে, তাহলে অবস্থা বুঝে যেকোনোভাবে এবং যেকোনো কঠিন অবস্থায় উপযোগী অস্ত্র ব্যবহার করে তার সাথে লড়াই করা জায়িজ; কিন্তু হারামে মক্কায় ঢুকে গেলে মক্কার সম্মানে লড়াই বা সংঘর্ষ জায়িজ হবে না।[১৪৯]

আমার মতে—আমরা জানি, আল্লাহ তায়ালা হারামে মক্কাকে শুধু মুসলিমদের জন্যই আশ্রয় ও নিরাপত্তাস্থল বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং এটাই যখন বাস্তবতা, তখন হদ কায়েম এবং রাষ্ট্রদ্রোহীদের শাস্তি প্রদান ছাড়া আর কোনো লড়াই বা সংঘর্ষ এখানে কীভাবে জায়িজ হতে পারে?

---

১৪৭ *শরহু মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫; *আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* : ১৬৬

১৪৮ 'আন-নিহায়া'-তে আছে, 'খিরবা' (خربة) শব্দের আসল অর্থ দোষ। হাদিসে উদ্দেশ্য হলো ওই ব্যক্তি—যে কিনা কারও জিনিস নিয়ে ভেগে যায় এবং জিনিসটা সে তার দখলেই রাখতে চায়। অথচ এটা শরিয়তবিরোধী।

১৪৯ *তারহুত তাসরিব*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৮৬; *ইলামুস সাজিদ ফি আহকামিল মাসাজিদ* : ১৬২

দুই. হারামের সীমারেখায় শিকার করার নিষিদ্ধতা

হারামের সীমারেখায় শিকারের নিষিদ্ধতা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। কারণ, নবিজি স্পষ্টভাবে বলেছেন—

لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده،

> এখানকার কোনো কাঁটাও ভাঙা যাবে না এবং কোনো শিকারের পিছুও ধাওয়া করা যাবে না।[১৫০]

এই হাদিসের আলোকে কোনো শিকারের পিছু ধাওয়া যখন হারাম সাব্যস্ত হলো, তখন একে প্রাণে মারা তো উত্তমভাবেই হারাম।

হারামের সীমারেখায় কোনো শিকার হাতে এসে পড়লে সেটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। যদি কারও হাতে শিকার ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে মুহরিমের মতো দম দেওয়া তার ওপরও ওয়াজিব। অবশ্য পাঁচ প্রকার প্রাণীকে ব্যতিক্রম হুকুমে রাখা হয়েছে। নবিজি সেগুলোকে সাধারণ হুকুম থেকে আলাদা রেখেছেন। কাক-চিল-বিচ্ছু-ইঁদুর ও পাগলা কুকুর। এগুলোকে ফাওয়াসেক (فواسق) বলে। এগুলোর ওপর কিয়াস করে উলামায়ে কিরাম সেসব প্রাণীকেও উক্ত হুকুম থেকে আলাদা রেখেছেন যেগুলো কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক। যেমন : সাপ ও কষ্ট দানকারী হিংস্র প্রাণী ইত্যাদি।

তিন. হারামের সীমারেখায় উদ্গত উদ্ভিদ কাটার নিষিদ্ধতা

হারামে মক্কার সীমারেখায় উদ্গত শেকড়বিশিষ্ট তৃণলতা বা চারাগাছ অথবা গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষেধ। দলিল নবিজির উক্ত বাণী—'এখানকার কোনো কাঁটাদার গাছও কাটা যাবে না।'

এই মাসয়ালার স্বরূপ হলো—যেই শেকড়বিশিষ্ট তৃণলতা আল্লাহর হুকুমে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে, সেটা সবুজ পত্রপল্লববিশিষ্ট অর্থাৎ সতেজ থাকা পর্যন্ত কাটা সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে রোপিত চারা এই হুকুমের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, সেটা কাটা বা উৎপাটন করা জায়িজ। যেমন—জায়িজ পশু জবাই করা, শুষ্ক গাছ কাটা এবং গবাদি পশু চরানো। অবশ্য ইমাম জারকাশি রহ. উক্ত হুকুমে কিছু মতবিরোধ করেন

---

১৫০ *সহিহ মুসলিম*, অধ্যায় : হজ, হাদিস নম্বর : ১৫৮৭

এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ রহ. সূত্রে উল্লেখ করেন, হারামের ভেতরে গবাদি পশু চরানোও নিষেধ।[১৫১]

ওদিকে জমহুর আইম্মা উপর্যুক্ত হুকুমের ওপর ভিত্তি করে এবং ফাওয়াসেক প্রাণীর হুকুমের ওপর কিয়াস করে বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক তৃণলতা কাটারও বৈধতা দিয়েছেন।[১৫২]

চার. ইহরাম পরিধান করে হারামে প্রবেশের বাধ্যবাধকতা

এ বিষয়ে বিধান হলো—যে কেউ মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করবে অথবা ইমাম নববির ভাষ্যমতে যে কেউ কোনো কাজে হারামে মক্কায় যেতে চাইবে, তাকে হজ বা উমরাহর ইহরাম পরিধান করতে হবে। ইহরাম বাঁধা তার ওপর ওয়াজিব। তবে যারা পেশা ও কর্মের খাতিরে বারবার মক্কায় যাতায়াতে বাধ্য, যেমন—ব্যবসায়ী ও শ্রমিক শ্রেণি, তারা ইমাম নববির এই হুকুম বহির্ভূত। তাদের জন্য ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব নয়।

ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব নাকি মুসতাহাব, তা নিয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত এবং আইম্মায়ে সালাসার সর্বসম্মত মত হলো, মক্কায় প্রবেশ করতে হলে ইহরাম বেঁধেই করতে হবে। এটা ওয়াজিব। এর ওপরই ফতোয়া। যদিও জমহুর শাফিয়িদের মতে মুসতাহাব।

মতবিরোধের ভিত্তি : এই মতানৈক্যের কারণ হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি ইহরাম পরিহিত ছিলেন না। এর দলিল ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণিত একটি হাদিস। তাতে আছে, মক্কায় প্রবেশের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা মুবারকে কালো পাগড়ি বাঁধা ছিল এবং তিনি ইহরামমুক্ত ছিলেন।

এখন যারা ইহরাম বাঁধাকে মুসতাহাব বলেন, তারা এই হাদিসের আলোকে বলেন। আর যারা ওয়াজিব বলেন, তাদের বক্তব্য হলো—নিঃসন্দেহে নবিজি মক্কায় প্রবেশকালে কাফিরদের গাদ্দারি করে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়ার বিষয়টি চিন্তায় রেখেছিলেন। তাই তিনিও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই (পাগড়ি বেঁধে) এসেছিলেন; কিন্তু এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এটা কিন্তু সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা থেকে

---

১৫১ *ইলামুস সাজিদ* : ১৫৭

১৫২ বিশেষ দ্রষ্টব্য : *দাওয়াবিতুল মাসলাহা ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ* : ২০০

আলাদা ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কারণ, সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করা ওয়াজিব।

পাঁচ. মক্কাকে বাসস্থান বানানো অমুসলিমদের জন্য হারাম

এই মাসয়ালা প্রথম হুকুমেই স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মক্কাকে বাসস্থান বানানো তো দূরের কথা, সেখানে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকারও নেই।

* * *

গাজওয়ায়ে হুনাইন...

এই তো, কিছুদিন আগেই মক্কা বিজিত হয়েছে মুসলিমদের হাতে। অষ্টম হিজরির শাউয়াল মাস। যুদ্ধের রেশ কাটেনি তখনও; এরই মধ্যে, এই মাসেই সংঘটিত হয়েছিল গাজওয়ায়ে হুনাইন।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

নবিজির হাতে মক্কা বিজিত হয়েছে। দলে দলে কুরাইশসহ আশেপাশের অন্যান্য গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই অবস্থা দেখে হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রপতিদের বুকে জ্বলে উঠল হিংসার আগুন। তারাও তাদের আশপাশের গোত্রের সাথে একতাবদ্ধ হতে শুরু করল। প্লান করে একজোট হয়ে মুসলিমদের ওপর হামলার গোপন প্রস্তুতি শুরু হলো হাওয়াজিনের। সৈন্য সংগ্রহ করতে করতে একপর্যায়ে তারা বিপুলসংখ্যক সৈন্যের সমাবেশও ঘটিয়ে ফেলল। তাদের সর্বসম্মতিক্রমে এই বিশাল বাহিনীর চিফ অব কমান্ডার হয় আউফ ইবনে মালিক। সে নির্দেশ দিলো—যুদ্ধে তো যাবে, তবে 'সবাই নিজ নিজ স্ত্রী, সন্তান ও সহায়-সম্পদ সাথে নিয়ে যুদ্ধে শরিক হবে।'

অভিনব কৌশল

হাওয়াজিনের লোকেরা কী ভাবছিল, আর কী বলছিল মনে মনে, সেই খবর না জানলেও, সেনাপ্রধান আউফ ইবনে মালিকের এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করে

---

১৫৩ হুনাইন। এটি মূলত একটি উপত্যকার নাম। উপত্যকাটি জাহিলি আরবের বিখ্যাত ও অন্যতম বৃহত্তর বাণিজ্যকেন্দ্র জুল মাজাজের দক্ষিণে অবস্থিত। মক্কা ও হুনাইনের মাঝে প্রায় সাতাইশ কিলোমিটারের দূরত্ব।

ঘর ছেড়ে বের হলো তারা। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী আউতাসে[১৫৪] পৌঁছলে আউফের নির্দেশে সেখানে ছাউনি ফেলল সকলে।

আউফ ইবনে মালিকের এই নির্দেশের পেছনে তার দর্শন ছিল—'সৈনিকদের মাথায় যখন চোখের সামনে স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদ হারানোর চিন্তা থাকবে, তখন লড়াইয়ে তাদের কোনো কমতি বা ঘাটতি থাকবে না। এবং তারা তখন পালানোর চিন্তা বাদ দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে শত্রুকে খতম করতে মরিয়া হয়ে উঠবে।' আর যুদ্ধটা অনিবার্য করে তুলতে এবং বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে তারা তাদের আশপাশের সমমনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকেও যুদ্ধে শরিক করে নিল।

নবিজির যুদ্ধ প্রস্তুতি

ওদিকে নবিজির কাছে তাদের সেনা অভিযানের সংবাদ এলো। তিনি তখন মক্কায় অবস্থান করছেন। সংবাদ আসামাত্রই তিনিও তাদের প্রতিহত ও দমন করার মনস্থ করলেন। অষ্টম হিজরির শাউয়াল মাস। প্রায় ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি ৬ই শাউয়াল মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সেনাদের দশ হাজার মদিনার, আর দুই হাজার মক্কার।[১৫৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাজরাজ আসলামি রা.। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠালেন। তাকে নির্দেশ দিলেন—তুমি প্রথমে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তারপর একেবারে তাদের মতো করেই তাদের সাথে মিশে যাবে। এবং পুরো তথ্য সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মবেশে সেখানেই অবস্থান করবে। আবদুল্লাহ রা. তার মিশনে নেমে পড়েন। তারপর কয়েক দিন সেখানে ঘুরেফিরে সব খবরাখবর নিয়ে ফিরে আসেন এবং নবিজিকে বিস্তারিত সংবাদ দেন।

মুসলিমদের সমরাস্ত্র ঘাটতি

গোয়েন্দা আবদুল্লাহ রা. থেকে সবকিছু শুনে নবিজি লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের ইচ্ছা করবেন—এমন সময় গুরুতর একটি বিষয় তাঁর সামনে উত্থাপন করা হলো। তাকে জানানো হলো—বাহিনীতে সামরিক অস্ত্রের বেশ ভালো রকম ঘাটতি আছে।

---

১৫৪ আউতাস। মক্কার পূর্ব দিকে হুনাইন ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। হুনাইন ও আউতাসের মাঝে দশ মাইল প্রায় ১৫/১৬ কিলোমিটার এর দূরত্ব। উপত্যকাটি হুনাইন উপত্যকার তুলনামূলক কাছাকাছি হওয়ায় অনেক স্থানে একেও হুনাইনের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয়।

১৫৫ *তাবাকাতু ইবনে সাদ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০০; *সিরাতে ইবনে হিশাম*

অপরদিকে মক্কার মুশরিক সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহবর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র আছে। এটা শুনে নবিজি তাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, সে যেন মুসলিমদের এগুলো সরবরাহ করে। সাফওয়ান এটাকে ছিনতাই বা জবরদখল মনে করল। সে সরাসরিই নবিজিকে জিজ্ঞেস করে বসল—মুহাম্মাদ, এটা কি তুমি জবরদখল হিসেবে দিয়ে দিতে বলছ?

নবিজি তাকে আশ্বস্ত করে বলেন—না; তোমার থেকে জোর করে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তুমি বরং ধার দাও। জামানতের সাথেই তোমার কাছে এগুলো ধার চাচ্ছি। যুদ্ধ শেষে আবার ফেরত দিয়ে দেবো। চুক্তি অনুযায়ী সাফওয়ান একশটি লৌহবর্ম এবং সেগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও প্রদান করল।[১৫৬]

হাওয়াজিনবাসীর অতর্কিত আক্রমণ

নবিজি যে মুসলিমদের নিয়ে হাওয়াজিনবাসীকে শায়েস্তা করতে আসছেন, এই খবর সেনাপ্রধান আউফ ইবনে মালিক, হাওয়াজিন গোত্রপতি ও অন্য কমান্ডারদের কানে পৌঁছল। নবিজি রণাঙ্গনের দিকে মার্চ করেছেন, এই খবর পৌঁছলে সকল সৈন্যকে আউফ উপত্যকার আশপাশে আত্মগোপন করে নিজ নিজ পজিশন নিয়ে বসে থাকার নির্দেশ দেয়। নির্দেশে বলা হয়—মুহাম্মাদের বাহিনী উদয় হওয়ামাত্রই একযোগে সবার ওপর আক্রমণ করতে হবে।

মুসলিম বাহিনী হুনাইন উপত্যকায় যখন পৌঁছল, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। তারা সবে নিচে নামা শুরু করেছেন, অমনি অতর্কিতে ছোটো ছোটো উপত্যকা, ঘাঁটি ও গুহায় লুকিয়ে থাকা কাফিরদের একাধিক প্লাটুন তাদের সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করে হামলা করে বসে। ফলে মুসলিমদের ঘোড়াগুলো ভয়ে লাফিয়ে ওঠে এবং তারাও হতবিহ্বল হয়ে পেছনের দিকে দৌড় দেয়। এমন আচমকা ও আকস্মিক আক্রমণে তারা এতটাই দিশেহারা হয়ে পড়ে যে, উলটো দিকে ঘুরে তাকানোও ভুলে যায় এবং নিজের জান বাঁচানোতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

---

১৫৬ 'সিরাতে ইবনে হিশাম', তাবারি ও ইবনে সাইয়িদিন নাস। আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাইয়িদিন নাসিআল আন্দালুসি আল মিশরি রহ.। ৬৭১-৭৩৪ হি.। একাধারে হাফিজে হাদিস। বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস। ফকিহ। কবি। সাহিত্যিক। লেখক। তার কালজয়ী অমর গ্রন্থ *উয়ুনিল আসার ফি ফুনুনিল মাগাজি ওয়াশ শামায়িলি ওয়াস সিয়ার*। দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়েবসাইট-সূত্রে অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত।।

ময়দানে নবিজির আহ্বান

এমন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নবিজি ডান দিকে ফিরে ডাক দেন—আল্লাহর বান্দারা, সবাই আমার দিকে ফিরে আসো (আমি এখনও ময়দানে আছি)। আমি সত্য নবি, মিথ্যুক নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের ছেলে।

সহিহ মুসলিম-এ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আব্বাস রা. বলেন—

হুনাইনের যুদ্ধে আমি নবিজির সাথে ছিলাম। আমি আর (আরেক ভাতিজা) আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস একেবারে তাঁর গায়ের সাথে লেপ্টে ছিলাম, সামান্যও সরে যাইনি। তিনি সেদিন তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর বসা ছিলেন। কাফিরদের অনাকাঙ্ক্ষিত হামলায় মুজাহিদরা যখন উলটো দিকে ছুটছিল, তিনি তখন খচ্চরের ওপর বসাবস্থায়ই কাফিরদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। আমি খচ্চরের লাগাম ধরে রাখি, যেন দ্রুত না চলে। আর আবু সুফিয়ান তার বাহনের পাদানি স্থির রাখে। তিনি নির্দেশ দেন—আব্বাস, বাবলাতলের বাইয়াতবদ্ধদের ডাক দেন।

আমার কণ্ঠ উঁচু ছিল। আমি জোরেশোরে ডাক দিই—হে বাবলাতলের বাইয়াতবদ্ধরা, (তোমরা কোথায়?)। আল্লাহর কসম, আমার এই ডাক শুনে তারা স্থির দাঁড়িয়ে যায় এবং এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, গাভি যেমন তার বাছুরের দিকে ঘুরে দেখে। তারা 'লাব্বাইক, লাব্বাইক' বলতে বলতে দৌড়ে আসতে থাকে এবং সোজা কাফিরদের কাতারের ভেতর ঢুকে যায়।

এরপর তিনি আনসার সাহাবিদের ডাক দেন—হে আনসার ভাইয়েরা!

কিছুক্ষণ পর যখন তিনি চুপিসারে তাদের লড়াইয়ের দৃশ্য দেখেন, তখন বলেন—হ্যাঁ। এখন মাঠ গরম হয়েছে!

এরপর তিনি কিছু কণা পাথর উঠিয়ে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মারেন এবং বলেন—মুহাম্মাদের রবের কসম, ওরা হেরে গেছে![১৫৭]

কাফিরদের ময়দান ত্যাগ

আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেন। তারা হার মানতে থাকে এবং হতাশায় পিঠ দেখিয়ে ভাগতে থাকে। নিজের জীবন বাঁচাতেই প্রত্যেকে পালাতে

---

১৫৭ *সহিহ মুসলিম*, সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম বুখারি রহ.-ও এই ঘটনাটি তাদের *সহিহ*-তে বর্ণনা করেছেন। আর সিরাত লেখকগণ এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

থাকে। মুজাহিদরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে অনেকের গর্দান উড়ান এবং বাকিদের বন্দি করেন। যুদ্ধ শেষে মুজাহিদরা সবাই একত্র হলে প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু জিনিস ছিলই। নবিজির সামনে বন্দিদের স্তূপ জমে যায়। এ সময় তিনি সাধারণ ঘোষণা দেন—যেকোনো কাফিরকে হত্যা করার প্রমাণ দেখাতে পারবে, সে ওই নিহত কাফিরের পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের অধিকারী হয়ে যাবে।[১৫৮]

উম্মু সুলাইমের টুকরো ঘটনা

ইবনে ইসহাকসহ অন্যরাও বর্ণনা করেছেন আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন—

> হুনাইনের যুদ্ধে আবু তালহা রা. একাই প্রমাণসহ বিশজন কাফিরের জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে সাদ সহিহ সনদে বর্ণনা করেন—

> নবিজি ঘুরে তাকালে উম্মে সুলাইম বিনতু মিলহান রা.-কে স্বামী আবু তালহা রা.-এর সাথে দেখতে পান। নবিজি জিজ্ঞেস করেন—উম্মু সুলাইম নাকি?
>
> তিনি বলেন—হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল (আমিই)। আমার মা-বাবা আপনার ওপর উৎসর্গ। যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে; তাদের যেমন হত্যা করা হয়, অনুরূপ এই যারা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করে ভেগে গেল, তাদেরও কি হত্যা করা হবে?
>
> উম্মু সুলাইম রা.-এর কাছে একটা খঞ্জরও ছিল। আবু তালহা রা. তাকে বলেন—তোমার সাথে এই খঞ্জর কেন?
>
> উম্মু সুলাইম রা. বলেন—এটা সাথে রাখার উদ্দেশ্য, কোনো মুশরিক যদি সামনে আসার বাহাদুরি দেখায়, তবে এটা দিয়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলব।

নারী ও শিশুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওয়ার পথে এক স্থানে সাহাবিদের ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে এখানে? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দেন—এক

---

১৫৮ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

কাফির নারীর মৃতদেহ। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের হাতে তার মরণ হয়েছে। শুনে নবিজি সাথে থাকা এক সাহাবিকে বলেন—তুমি খালেদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে, আল্লাহর রাসুল নাবালক শিশু, নারী ও শ্রমিকদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[১৫৯]

সম্পদ ফেলে মুশরিক সেনাপ্রধানের পলায়ন

চিফ অব কমান্ডার আউফ ইবনে মালিক কয়েকজন নেতাগোছের লোক নিয়ে লেজ গুটিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালায়। গিয়ে সোজা তায়েফের এক দুর্গে আত্মগোপন করে। যাওয়ার সময় বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলিমদের জন্য গনিমত হিসেবে ফেলে যায়।

নবিজি গনিমতের সব মাল জিরানায় নিয়ে জমা করতে বলেন। তিনি মাসউদ ইবনে আমর গিফারি রা.-কে জমাকৃত মালের তত্ত্বাবধায়ক ও অস্থায়ী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আর নিজে সঙ্গে থাকা সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন।

তায়েফ অবরোধ

তায়েফ পৌঁছে তিনি পুরো নগরী অবরোধের নির্দেশ দেন। নিরুপায় সাকিফ গোত্র দুর্গের ভেতর থেকে মুজাহিদদের ওপর বৃষ্টির মতো তির মারতে থাকে। এতে কিছুসংখ্যক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। নবিজি দশ দিন পর্যন্ত তায়েফ নগরী অবরোধ করে রাখেন।

এক বর্ণনায় আছে—

> এই অবরোধ ছিল বিশ দিন। এরপর তিনি অবরোধ উঠিয়ে সবাইকে নিয়ে সেখান থেকে যাত্রার ইচ্ছা করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন—

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের সামনে ঘোষণা দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা ফিরে যাব।

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করেন—তাহলে কি আমরা এই শহর জয় না করেই ফিরে যাব?

---

১৫৯ *সুনানু আবি দাউদ; সুনানু ইবনে মাজা, সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে* এই অর্থের একটি হাদিস রয়েছে।

তিনি বলেন—তোমরা যদি এদের সাথে লড়তে চাও, তাহলে আগামীকাল সকালে শুরু করো।

অবরোধ প্রত্যাহার

পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন সকালে লড়াইয়ে নামলে কয়েকজন সাহাবি আহত হন। তিনি তাদের বলেন—আগামীকাল আমরা ফিরে যাব।

শুনে তারা খুব খুশি হন। তাদের খুশি দেখে তিনি মুচকি হাসেন।[১৬০]

নবিজি ফিরে আসার প্রস্তুতি শুরু করলে সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলেন—

> সবাই একসাথে বলো—আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাঁর কাছে তাওবাকারী। আমরা আমাদের রবের ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনাকারী।

কোনো কোনো সাহাবি আবদার করেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, সাকিফ গোত্রের জন্য বদদুআ করেন। তিনি দুআ করেন—'হে আল্লাহ, আপনি সাকিফ গোত্রকে হিদায়াত দান করেন এবং তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।'[১৬১]

নবিজির এই দুআ কবুল হয়। অল্প কিছুদিন পরেই সাকিফ গোত্র হিদায়াত লাভ করে। তাদের একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

* * *

---

১৬০ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

১৬১ *তাবাকাতু ইবনে সাদ; জামি তিরমিজি*

গনিমত : নবিজির বণ্টনপদ্ধতি

দশ দিনের অপেক্ষা

নবিজি তায়েফ থেকে জিরানায় ফিরে সেখানে সম্পদের স্তূপ ও বন্দিদের সমাবেশ দেখতে পান। এইসব গনিমত হাওয়াজিন গোত্রের ফেলে রেখে যাওয়া। তিনি বন্দিদের আত্মীয়স্বজনের আগমনের জন্য অপেক্ষা করলেন। যেন তারা বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে বা মুসলিম হয়ে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে জিরানায় দশ দিন অবস্থান করেন। এরপর তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা না দেখে যোদ্ধাদের সবার মাঝে বন্দিদের বণ্টন করে দেন।

প্রতিনিধিদলের আগমন ও নবিজির ব্যবহার

এর কিছুদিন পর হাওয়াজিন গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মুসলিম হয়ে নবিজির দরবারে এসে আবেদন জানায়—আমাদের ধনসম্পদ ও বন্দি আত্মীয়স্বজনদের ফিরিয়ে দেন।

তিনি তাদের বলেন—তোমরা যা চাচ্ছ, তা এখন আমার কবজায়। আমার কাছে সত্যই (অর্থাৎ দ্বীনই) পছন্দ। কাজেই মাল ও বন্দি দুটোর যেকোনো একটি তোমরা বাছাই করো। এ কারণেই আমি মাল ও বন্দিদের বণ্টন করতে দেরি করেছি। আমার আশা ছিল—তোমরা মুসলিম হবে।

তারা বলে—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের ধনসম্পদ ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন। আমাদের কাছে আত্মীয়স্বজনই বেশি প্রিয়।

তাদের কথা শুনে তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ান। আল্লাহ তায়ালার হামদ-সানা পাঠ করেন। এরপর বলেন—

> ঈমানদারগণ, এই যে তোমাদের ভাইয়েরা তাওবা করে এসেছে। এখন আমার মত—তাদের সব আত্মীয়-স্বজন ফিরিয়ে দেবো। কাজেই তোমাদের যাদের ইচ্ছা—সন্তুষ্টচিত্তে এই মত গ্রহণ করে নিজ নিজ দাস-দাসী ফিরিয়ে দাও। আর যারা বদলার বিনিময়ে আজাদ করতে চাও, তারা জেনে রাখো, আমি ওয়াদা করছি যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমাকে যেই গনিমত দেবেন, তা থেকে একটি অংশ আমি তাঁকে দেবো। অর্থাৎ এখন দাস বা দাসী আজাদ করে দাও। পরে এর বিনিময় দিয়ে দেওয়া হবে।

নবিজির অভিব্যক্তি ও অভিমত শুনে সবাই সমস্বরে বলে ওঠেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে সবাইকে ফিরিয়ে দিলাম।

তিনি বলেন—না। এভাবে বোঝা যায় না, তোমাদের কে অনুমতি দিয়েছে আর কে অনুমতি দেয়নি। কাজেই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের গোত্রপ্রধানদের মাধ্যমে আমাকে জানাও।

সবাই ফিরে গিয়ে নিজ নিজ গোত্রপ্রধানকে সন্তুষ্টির কথা জানায়। এরপর গোত্রপ্রধানরা তাঁর কাছে এসে জানায় যে, গোত্রের লোকেরা সবাই রাজি আছে এবং তারা অনুমতিও দিয়েছে। পরিশেষে তিনি হাওয়াজিনের সকল বন্দিকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন।[১৬২]

আউফ ইবনে মালিকের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক, তিনি এই প্রতিনিধিদলকে জিজ্ঞেস করেন, আউফ ইবনে মালিক কোথায় আছে? তারা জানান—সে সাকিফ গোত্রের সাথে তায়েফেই অবস্থান করছে।

তিনি বলেন—তোমরা তাকে জানিয়ে দিয়ো, সে যদি মুসলিম হয়ে আমার কাছে আসে, তাহলে আমি তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ সব ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আরও একশ উট উপহার হিসেবে দেবো।

---

১৬২ *সহিহ বুখারি; তারিখুত তাবারি; সুনানু বাইহাকি; উয়ুনুল আসার লিবনি সাইয়িদিন নাস; সিরাতে ইবনে ইসহাক।*

আউফ ইবনে মালিক নবিজির পক্ষ থেকে এত চমৎকার ও আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ক্ষমার কথা শুনে ইসলাম কবুলের সমর্থন জানিয়ে নবিজির দরবারে হাজির হয়। জিরানা ও মক্কার মাঝখানে নবিজির সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তার মাল-সামানা ও পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দেন। এবং প্রতিশ্রুতিমাফিক অতিরিক্ত একশ উটও উপহার দেন। সে মুসলিম হয়ে যায় এবং তার ইসলাম কল্যাণকর হয়।

নবিজির আচরণে আনসারদের ভুল বোঝা

নবিজি মক্কার নওমুসলিমদের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে তাদের কিছু বেশি গনিমত ও অনুদান প্রদান করেন। এতে যেন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ও দৃঢ় হয় এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপক্কতা আসে। তার এই কাজে কোনো কোনো আনসার সাহাবির মনে কেমন যেন লাগে (অর্থাৎ বৈষম্যমূলক আচরণ মনে হয়)। তাই তারা বলেও ফেলেন—

> আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নিষ্পাপ রাখুন! তিনি কুরাইশদের তো বেশি দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু আমাদের রেখেছেন দৃষ্টির আড়ালে। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনও টপটপ করে রক্ত পড়ছে।[১৬৩]

সংবাদটি নবিজির কর্ণগোচর হলে তিনি শুধু আনসার সাহাবিদের নিয়ে সভা ডাকেন। অতঃপর সবার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা পাঠ করেন। তারপর বলেন—

> আমার আনসার সাহাবিরা, এ আমি কী শুনলাম? আমি কি তোমাদের কাছে সে সময় আসিনি, যখন তোমরা পথহারা ছিলে অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার মাধ্যমে তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা দলে দলে বিভক্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছিলে। অতঃপর তিনি কি আমার মাধ্যমে তোমাদের পারস্পরিক ঐক্য ও ভালোবাসার সুতায় গেঁথে দেননি? তোমরা হতদরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিলে। তিনি কি আমার মাধ্যমে তোমাদের ধনী বানাননি?

নবিজির সব কথার প্রত্যুত্তরে তারা বলেন—অবশ্যই। আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বড়ো অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে।

---

১৬৩ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আমার আনসার সাহাবিরা, তোমরা আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?

আনসার সাহাবিরা বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এর জবাবে আমরা কী বলতে পারি? আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগ্রহ ও দয়াই তো বড়ো বিষয়।

তিনি আবার বলা শুরু করেন—

> আমাকে আমার বংশীয় লোকেরা মিথ্যুক বলেছে; আর তোমরা সত্যায়ন করেছ। সবাই আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে আর তোমরা আমার সাহায্যকারী হয়েছ। সবাই আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে আর তোমরা সাদরে বরণ করে নিয়েছ। আমি নিঃস্ব ছিলাম, তোমরা আমার দুশ্চিন্তার ভাগীদার হয়েছ এবং আমার প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছ—তোমরা চাইলে এই কথাগুলো বলতে পারতে। এবং এতে তোমরা সত্যবাদীও হতে।

নবিজির কথাগুলো শুনে আনসার সাহাবিরা একসাথে বলে ওঠেন—না। কখনোই না; বরং আমাদের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগ্রহ ও দয়াই তো বড়ো বিষয়।

তারপর নবিজি বলেন—

> আমার আনসার সাহাবিরা, তোমরা কি ওই কিছু তুচ্ছ জিনিসপত্রের জন্য মনে দুঃখ পেয়েছ; যা দিয়ে কিছু নওমুসলিমের ঈমান দৃঢ় করা উদ্দেশ্য? আর তোমরা তো পাক্কা মুসলিম। তোমাদের ঈমানের দৃঢ়তায় আমি বিশ্বাসী ও নিশ্চিন্ত।
>
> আমার আনসার সাহাবিরা, অন্যদের উট-বকরি দিয়ে আল্লাহর রাসুলকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাওয়াটাই কি তোমাদের কাছে প্রিয় ও শ্রেয় নয়? আল্লাহর কসম! তোমরা যাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে, তার মূল্য এসব ধনসম্পদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। ওই সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, আমার জীবনে যদি হিজরত না থাকত, তাহলে আমি আনসারদের থেকেই আবির্ভূত হতাম। অন্য সবাই যদি এক পথে চলে, আর আনসার সাহাবিরা আরেক পথে চলে, তাহলে আমি আনসারদের পথেই চলব। নিঃসন্দেহে তোমরা এর মূল্য আমার পরে দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করো। তারপর তোমরা হাউজে কাউসারে আমার

সাথে সাক্ষাৎ করবে। হে আল্লাহ, আপনি আনসারদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতি রহম করেন!

নবিজির কথাগুলো শুনে আনসার সাহাবিরা অনিচ্ছায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। চোখের অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যায়। তারা বলেন—আমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের বণ্টন ও প্রদত্ত অংশে পুরোপুরি খুশি ও সন্তুষ্ট।[১৬৪]

বেদুইনদের অভব্য আচরণ

কিছু বেদুইন বা গ্রাম্য লোক নবিজির পিছু নেয় আর অতিরিক্ত মাল চাইতে থাকে। তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের দিকে যেতে বাধ্য করে। তিনি গাছের কাছে যেতেই গায়ে জড়ানো চাদর মুবারক একটি ডালে আটকে যায়। তিনি বলেন—

> হে লোকসকল, তোমরা আমার চাদরটি দিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, যদি মক্কার সবুজ-শ্যামল এলাকা তিহামায় উদ্গত গাছপালা সমপরিমাণ উট আমার কাছে থাকত, তাহলে সেগুলোও তোমাদের মাঝে ভাগ করে দিতাম। তাহলে মনে হয় তোমরা আমাকে মিথ্যুক, কৃপণ ও কাপুরুষ ভাবতে না।[১৬৫]

> হে লোকসকল, আল্লাহর কসম! তোমাদের গনিমত থেকে আমার জন্য মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। আর সেই অংশও ঘুরেফিরে তোমাদেরই দিয়ে দেওয়া হয়।[১৬৬]

এত বোঝানোর পরেও এক বেদুইন নবিজির মুখোমুখি হয়ে তাঁর চাদর মুবারক ধরে সজোরে টান মারে। তাঁর চাদরটি ছিল শক্ত ডোরাবিশিষ্ট নাজরানি চাদর। ফলে নবিজির ঘাড় মুবারকে তার টানের চাপে শক্ত ডোরার ছাপ বসে যায়।

সে আরও বলে—

> আল্লাহপ্রদত্ত যেই মাল আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে অংশ দেওয়ার বিধান জারি করেন। তিনি শান্তভাবে তার প্রতি মনোযোগ দেন এবং মুচকি হাসি দিয়ে তাকে আরও কিছু মাল দিতে নির্দেশ দেন।[১৬৭]

---

১৬৪ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সিরাতে ইবনে ইসহাক, তাবাকাতু ইবনে সাদ।*

১৬৫ *সহিহ বুখারি*

১৬৬ *সুনানু আবি দাউদ; সুনানুন নাসায়ি*

ইবনে ইসহাক বলেন—

এরপর নবিজি জিরানা থেকে উমরাহর নিয়তে ইহরাম বাঁধেন এবং মক্কায় গিয়ে পৌঁছেন। উমরাহ শেষে আত্তাব ইবনে উসাইদ রা.-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে মদিনায় ফিরে যান।

* * *

১৬৭ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

বদরের মতো হুনাইনের যুদ্ধ থেকেও গাইব-সংশ্লিষ্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইসলামি আকিদা ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়; বরং এ যুদ্ধের অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশ বলতে গেলে বদরের শিক্ষা ও উপদেশের পরিসমাপ্তি ও সম্পূরক।

সংখ্যাধিক্য বিজয়ের কারণ নয়

বদরের যুদ্ধ থেকে আমরা শিখেছিলাম—আমরা যদি ধৈর্য ও দৃঢ়পদের সাথে তীব্রভাবে শত্রুর মোকাবিলা করি, তাহলে জয়ের জন্য সংখ্যালঘু হওয়া কোনো ব্যাপারই না। আর এই যুদ্ধ থেকে শিক্ষা হলো—মুসলিমরা সংখ্যায় বিপুল হয়েও যদি ধৈর্য ও দৃঢ়পদের সাথে কঠোরভাবে মোকাবিলা না করে, তাহলে তাদের সংখ্যাধিক্যও কোনো কাজের নয়। আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধের মতো হুনাইনের যুদ্ধ থেকেও অর্জিত মানবজাতির জন্য নানা শিক্ষা ও উপদেশ রেখেছেন।

প্রাথমিক নাস্তানাবুদের কারণ

বদর যুদ্ধে অন্য সকল যুদ্ধের তুলনায় সৈন্য ও সামরিক শক্তি স্বল্প পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও তা মুসলিমদের ক্ষতির কারণ হয়নি। কারণ, বদরে অংশগ্রহণ করা সেইসব সাহাবির ঈমান ছিল সত্য ও খাঁটি। তাদের ঈমান ছিল মজবুত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে তারা ছিলেন শতভাগ বিশ্বস্ত। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে সংখ্যাধিক্য ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ—এই বিশাল বাহিনীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সৈনিকের ঈমানে তখনও পরিপক্বতা আসেনি। ইসলামের স্বরূপও তাদের অনুধাবন হয়নি। সৈন্যের এই বিশালতা শুধু গা-গতরেই ছিল, প্রকৃতপক্ষে খাঁটি ঈমানদার ছিল পুরোনো সাহাবিরাই। পাশাপাশি গনিমত হিসেবে পার্থিব ধনসম্পদ পাওয়ার একটা আশাও নওমুসলিমদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

তাহলে বলেন, শুধু দৈহিক ও আকৃতিগত বিশাল দেহ দিয়েও কি কোনো কাজের কাজ হবে? এ কারণেই শত্রুপক্ষ তাদের গুপ্ত ঘাঁটি থেকে একযোগে যখন তির

নিক্ষেপ শুরু করল, তখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে পালাতে শুরু করে। যদিও এরপরও বেশি সময় কাটেনি। নবিজির পবিত্র আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তারা ত্বরিত গতিতে তার দিকে ছুটে আসেন এবং তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে যান। এরপর এই কিছুসংখ্যকই পুরো শক্তি ও সাহসিকতার সাথে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মাঠ গরম করে তোলেন। তবে এই বীরপুরুষদের সংখ্যা তখন এবং মাত্র ২০০-এর চেয়ে বেশি ছিল না। তাদের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার বদৌলতেই গোটা মুসলিম বাহিনীর সাহায্য ও বিজয় অর্জন হয়। সবাই স্বস্তি ও প্রশান্তির শ্বাস ছাড়েন। এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নাস্তানাবুদ হয়। অথচ দৃঢ়তা ও ধৈর্য প্রদর্শনের অভাবেই কিন্তু শুরুতে বারো হাজার সৈন্য দিগ্বিদিক পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারেনি।

এই অনন্য ও অমূল্য বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কারিমে উল্লেখ করেন—

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

(আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে) এবং হুনাইনের দিনে; যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের খুব উৎফুল্ল করেছিল; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালাচ্ছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মুমিন বান্দাদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাজিল করেন। এবং নাজিল করেন এমন এক সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি দেন কাফিরদের। এটাই কাফিরদের কর্মফল। এরপরও আল্লাহ যাদের তাওবা কবুলের ইচ্ছা কবুল করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, চির দয়ালু।[১৬৮]

১৬৮ সূরা তাওবা, আয়াত : ২৫-২৭

এ পর্যায়ে হুনাইনের এই যুদ্ধ থেকে আমাদের জন্য যে সকল শিক্ষা অর্জন করার মতো আছে, আমরা সেই সকল শিক্ষা ও হুকুম-আহকামের পর্যালোচনা করা করব—

০১. গোয়েন্দা মোতায়েন

এ বিষয়ে আগেও আলোচনা গিয়েছে—সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তো শত্রুর ওপর নজরদারি ও তাদের অবস্থার খোঁজখবর রাখার জন্য গোয়েন্দা মোতায়েন জায়িজই; কখনো কোনো কারণে যদি পরিস্থিতি হুমকি হিসেবে দেখা দেয়, তাহলে সেই অবস্থায় গোয়েন্দাসেবা চালু করা ওয়াজিব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিকবার শত্রুপক্ষের ওপর গোয়েন্দা মোতায়েন করেছেন। এই মাসয়ালায় কোনো মতবিরোধ নেই।

০২. কাফিরদের থেকে সমরাস্ত্র গ্রহণ

মুসলিম বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক ইকুইপমেন্টে যদি কখনো ঘাটতি বা কমতি দেখা দেয়, সেই অবস্থায় অমুসলিমদের থেকে প্রয়োজনীয় সামরিক সাজসরঞ্জাম ভাড়া করা বা ধার নেওয়া জায়িজ। এগুলো জামানতের সাথে ধার নেওয়াও জায়িজ। এককথায়, মুসলিম নাগরিক বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে নেওয়ায় যেমন কোনো সমস্যা নেই, তেমনি অমুসলিমদের থেকেও নেওয়া যেতে পারে। মূলত যুদ্ধের সময় সাধারণভাবে অমুসলিমদের থেকে সাহায্য গ্রহণ হিসেবে এই মাসয়ালাও চলে আসে। তাই ইতঃপূর্বে উহুদ যুদ্ধের আলোচনাতেও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তবে এখানে নতুন করে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা হচ্ছে, অমুসলিমদের থেকে সাহায্য গ্রহণটা মূলত দুইভাবে হতে পারে—

পদ্ধতি-০১ : যুদ্ধে তাদের শরিক করা

এ প্রসঙ্গে উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় একটি হাদিস পেশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ের মতো প্রয়োজনে কাফিরদের দৈহিক শক্তিও যুদ্ধে কাজে লাগানো যাবে। শর্ত হলো—তাদের আমানত, ধার্মিকতা ও সততার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চয়তা অর্জন হওয়া এবং মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি বা প্রতারণার আশঙ্কা না থাকা।

পদ্ধতি-০২ : তাদের থেকে সমরাস্ত্র নেওয়া

অমুসলিমদের থেকে সমরাস্ত্রবিষয়ে সাহায্য নেওয়ার বৈধতার ব্যাপারেও কারও কোনো দ্বিমত নেই। তবে শর্ত হলো—এতে যেন মুসলিমদের মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি শঙ্কায় না পড়ে। অর্থাৎ এমন যেন না হয়, তাদের থেকে সাহায্য নিতে গিয়ে তাদের বা অন্যদের অধীন বা মুখাপেক্ষী হয়ে যেতে হয় অথবা তাদের কোনো শর্ত পূরণে শরিয়তের বিরোধিতা করতে হয়।

আমরা জেনেছি, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া থেকে ধার নেওয়ার সময় সে ছিল অধীন নাগরিক ও দুর্বল। তার কাছে অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম ছিল আরকি। বিপরীতে নবিজি ছিলেন তখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি।[১৬৯]

০৩. যুদ্ধে নবিজির বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন

আমরা দেখেছি, শত্রুপক্ষের তিরবৃষ্টির মধ্যে মুজাহিদরা টিকতে না পেরে দিশেহারা হয়ে যখন চারদিকে ছোটাছুটি করছিলেন, সেই অবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অটল-অবিচল, স্থিরতা-দৃঢ়তা ও ইস্পাতকঠিন পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে যান। এমনকি তিনি বুক ফুলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এই কঠিন ও অসম্ভব মুহূর্তে তাঁর পূর্ণ দৃঢ়তা ও অবিচলতাই মুজাহিদদের মনে প্রভাব ফেলে এবং তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃশ্য দেখার সাথে সাথেই তারা বাজপাখির মতো উড়ে আসেন। তাদের মনেও বিদ্যুৎগতিতে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পুনর্জাগরণ ঘটে। নবিজির এই বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ও দুর্লভ চিত্র।

ইবনে কাসির রহ. এই যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখের পর লেখেন—সুবহানাল্লাহ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ সাহসিকতা ও পূর্ণাঙ্গ বীরত্বের অবস্থা ও দৃশ্যটি চিন্তা বা কল্পনা করা যায়! যেই আকস্মিক তিরবৃষ্টির মুখে দাঁড়াতে না পেরে পুরো বাহিনী পিঠ ফিরিয়ে দৌড়ে পালাতে ব্যস্ত, সেই তিরের গতিমুখ বরাবর তিনি স্থির, অটল, অনড়! এমনকি স্বাভাবিক গতিতে সামনে অগ্রগামী! আর এমতাবস্থায় তাঁর বাহন কী ছিল? খচ্চর। যেটা ঘোড়ার গতিতে দৌড়ে পালানোর মতো কোনো পশু নয়। তিনি নিজেকে গোপনও করছিলেন না; বরং উচ্চৈঃস্বরে নিজের উপস্থিতি ও অবস্থান জানাচ্ছিলেন। যেন অপরিচিতরাও তাঁকে চিনতে পারে।

---

১৬৯ *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯০; *মুগনিল মুহতাজ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২১

লক্ষণীয়—আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর ভরসা ও আস্থা কেমন ছিল! আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে তার কত প্রগাঢ়, অকাট্য ও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল! তিনি কত গভীরতার সাথে জানতেন যে, আল্লাহ তাঁর রিসালাতকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেনই এবং তাঁর আনীত ধর্ম ও শরিয়তকে গোটা দুনিয়ার সকল প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয়ী ও অগ্রগামী বানাবেনই। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর শতসহস্র রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন![১৭০]

০৪. যুদ্ধে নারীর উপস্থিতি

যুদ্ধের ময়দানে আহত সৈনিকদের সেবা-সুশ্রূষা, চিকিৎসা প্রদান ও পানি পান করানো ইত্যাদি কাজের উদ্দেশ্যে নারীদের সঙ্গে নেওয়া এবং তাদের উপস্থিতির প্রমাণ নবিজির একাধিক অভিযান থেকে পাওয়া যায়; কিন্তু লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি নবিজি বা পরবর্তী কোনো সাহাবির আমল থেকে প্রমাণিত নয়।

নারীর উপস্থিতির স্বপক্ষে ইমাম বুখারি রহ. তার *সহিহ বুখারি*-তে 'যুদ্ধের ময়দানে নারীদের উপস্থিতি ও পুরুষদের সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ' নামে একটি শিরোনাম স্থাপন করেছেন; কিন্তু এর অধীনে তার উল্লিখিত কোনো হাদিসেই লড়াইয়ে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো কথা নেই।

ইবনে হাজার রহ. বলেন—

> আমি উল্লিখিত শিরোনামের অধীন সবগুলো হাদিস দেখেছি; কিন্তু কোথাও স্পষ্টভাবে নেই যে—কোনো যুদ্ধে নারীরাও পুরুষদের মতো লড়াই করেছেন।[১৭১]

ফুকাহায়ে কিরাম নারীদের লড়াইয়ের যেই বৈধতার কথা স্বীকার করেছেন, তা অবস্থা ও শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার। তারা বলেন—পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীরাও যুদ্ধ করতে পারবে, যখন গোটা বসতি, নগরী বা দেশ শত্রু আক্রান্ত হয়ে যাবে। যেই অবস্থায় শত্রুদের থেকে আবাসভূমি রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে লড়াই করা তাদের জন্য শুধু বৈধই না, বরং ওয়াজিব।

---

১৭০ *তাফসিরু ইবনে কাসির*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫

১৭১ *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫১

ফুকাহায়ে কিরামের এই ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, নারীরা শুধু দমন ও প্রতিহত করায় শরিক হতে পারবে। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে যদি আশা করা যায়, লড়াই করে তারা শত্রু থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে, তাহলেই জায়িজ। অন্যথায় নয়।[১৭২]

উম্মু সুলাইম রা.-এর কাছে থাকা খঞ্জরটিও দমন ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই ছিল। যা তার নিজের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট ও পরিষ্কার। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস *সহিহ বুখারি*সহ অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে। একবার আম্মাজান আয়িশা রা. নবিজির কাছে জিহাদের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি না দিয়ে বলেন—'হজ করাই তোমাদের জন্য জিহাদ।'

আম্মাজানের জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল লড়াইয়ে অংশগ্রহণ। আহত বা অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা বা পানি পান করানো ইত্যাদির অনুমতি চাননি। কারণ, এসব কাজ নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এমনিতেই জায়িজ।

মোটকথা, যুদ্ধের ময়দানে নারীদের লড়াইয়ের বৈধতা নেই; বরং পুরোপুরি পর্দা ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার সাথে শুধু সেবা-শুশ্রূষা বা পানি পান করানো ইত্যাদি কাজের অনুমতি আছে। পাশাপাশি তাদের যাওয়ার পেছনে বাস্তবিক কোনো কারণও থাকতে হবে।

সুতরাং যদি বাস্তবিক কোনো কারণ না থাকে অথবা এসব কাজের নাম দিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সৈনিকদের সাথে তাদের অবস্থান বা গমন কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়।

সবচেয়ে বড়ো কথা হলো—ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে এবং আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। প্রতিটি বিধিনিষেধ বিশুদ্ধ তরিকায় সঠিক ধারক-বাহকের কাছ থেকে জানতে হবে এবং পুরোপুরি আমল করতে হবে। নিজের ইচ্ছেমতো কোনো হুকুম মানা আবার কোনো হুকুম ছাড়া—এমনটা করার সুযোগ ইসলামে নেই। এটা সরাসরি কুরআনবিরোধী। এমন অবস্থার কথাই আল্লাহ তায়ালা তার কালামে পাকে বলেন—

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

---

১৭২ *মুগনিল মুহতাজ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১৯

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো, আর কিছু অবিশ্বাস করো? তোমাদের যারাই এ ধরনের আচরণ করবে, তাদের কর্মফল দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে উদাসীন নন।[১৭৩]

বর্তমানে কিছু নামধারী আলিম ও মুফতি সাহেব আছেন, যারা পার্থিব কিছু তুচ্ছ ও নিম্নমানের চাহিদা পূরণে এমন সব ফাতওয়া দিয়ে দেন, যেগুলোতে শরয়ি কোনো শর্ত ও মূলনীতির তোয়াক্কা করে না। শুধু আবেদনকারী ব্যক্তি বা শাসকবর্গের উদ্যেশ্য পূরণই তাদের কাজ।

০৫. যুদ্ধে নারী-শিশু-শ্রমিক, দাস-দাসী ও সন্ন্যাসীদের হত্যা

এই মাসয়ালার প্রমাণ পাওয়া যায় ওপরে বর্ণিত নবিজির হাদিস থেকে। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর হাতে নিহত নারীর মৃতদেহ দেখে যুদ্ধ করতে গিয়ে নারীদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। এই মাসয়ালায় সকল ইমাম একমত। তবে মনে রাখতে হবে—শত্রুপক্ষের নারীরা যদি তাদের পুরুষদের সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের তো হত্যা করতে হবেই। কারণ, এখন তো তারা সাধারণ অবলা নারী নয়; বরং বীরাঙ্গানা খেতাব পেতে এসেছে। কাজেই তাদের সাথেও যোদ্ধাদের আচরণ করা হবে।

আবার কাফিররা ওপরের মাসয়ালা জেনে যদি সেটার ফায়দা নেওয়ার উদ্দেশ্যে নারী ও নাবালক বাচ্চাদের সামনে দাঁড় করিয়ে ঢাল বা প্রতিরক্ষাপ্রাচীর বানায়, এবং তা না ভেঙে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা না যায়, তাহলে এই নারী ও বাচ্চাদের আঘাত করাও জায়িজ। অবশ্য এক্ষেত্রে বিষয়টি শাসক বা সেনাপ্রধানের বিচার-বিবেচনার মধ্যে থাকবে।[১৭৪]

০৬. নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্রের বিধান

পূর্বে এই আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই যুদ্ধে সৈনিকদের মাঝে সাধারণ ঘোষণা দেন—যেই মুজাহিদ যেই কাফিরকে

---

১৭৩ সুরা বাকারা, আয়াত : ৮৫

১৭৪ *আল আহকামুস সুলতানিয়া* : ৪; *মুগনিল মুহতাজ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২২৩

হত্যা করেছে, সেই কাফিরের সব জিনিস তার। ইবনে সাইয়িদিন নাস রহ. বলেন—নবিজির এই হুকুম স্থায়ী ও সব সময় কার্যকর।

আমার (লেখকের) মতে, এটাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে এই স্থায়ী বিধানের প্রামাণ্যতার ধরন অর্থাৎ নবিজি কি এই হুকুম সালাত-সিয়ামের মতো স্থায়ী বিধানরূপে সরাসরি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সবাইকে জানিয়েছেন, নাকি তিনি শাসক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হুকুম জারি করেছেন—তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতে—এই হুকুমও সালাত-সিয়ামের মতো স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিধান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফাতওয়ারূপে শুধু শুনিয়ে দিয়েছেন। এতে রদবদলের কোনো সুযোগ নেই। কাজেই যেকোনো যুগে যেকোনো রণাঙ্গনে কোনো মুজাহিদের হাতে কাফির নিহত হলে তার সকল জিনিসপত্রের মালিক সে-ই হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে শাসক বা সেনাপ্রধানের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রহ.-এর মতে, এটি একটি জুডিশিয়াল রায়। অর্থাৎ কোনো কাজে মুসলিমদের কল্যাণ ও লাভ থাকলে সেই কাজের অনুমতি দেওয়ার অধিকার শাসক বা সেনাপ্রধানের থাকে। আলোচ্য হুকুমটিও সেই অধিকার থেকে জারি করা। কাজেই সর্বযুগে যেই সৈনিকের হাতে কোনো কাফির নিহত হোক না কেন, তার জিনিসপত্রের ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন শাসক বা রাষ্ট্রপতি। শাসক বা রাষ্ট্রপতি যদি হত্যাকারী মুজাহিদকে নেওয়ার অনুমতি দেন, তাহলে সে-ই নেবে। আর যদি অনুমতি না দেন, তাহলে এই মালও গনিমতের মাল হয়ে যাবে। এর ওপর গনিমতের বিধান আরোপিত হবে।[১৭৫]

০৭. জিহাদ মানে কি কাফিরদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ

ওপরে বর্ণিত হাদিসে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা রয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে—তায়েফ থেকে ফেরার সময় কয়েকজন সাহাবি নবিজির কাছে তায়েফবাসীর জন্য বদদুআর আবেদন করলে তিনি তাদের জন্য হিদায়াতের দুআ করেন। এর উদ্দেশ্য হলো—জিহাদ তো 'আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার'-এর লক্ষ্যে চালিয়ে যাওয়া এক কঠোর সংগ্রাম ও সাধনার নাম। এটি একটি মহাদায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

১৭৫ *আল আহকামুস সুলতানিয়া* : ১৩৯; *আল ইহকাম ফি তামযিজিল ফাতাওয়া আনিল আহকাম* : ৩৮

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর অবাধ্য গোলামদের শায়েস্তা করতে অনুগত বান্দাদের ওপর তাঁরই জারিকৃত এক চিরন্তন ও অপরিহার্য বিধান। উদ্দেশ্য, নিজেদের এবং অন্যদেরও জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন থেকে বাঁচানো।

যাহোক, মুসলিমদের থেকে অমুসলিমদের জন্য সর্বদা হিদায়াত ও সংশোধনের দুআ জারি থাকা উচিত ও কর্তব্য। কারণ, জিহাদ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার হিকমত ও দাবি এটাই।

০৮. সেনাবাহিনীর গনিমতের হকদার হওয়ার সময়

ঘটনায় এ প্রসঙ্গে ওপরে আমরা জেনেছি—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাওয়াজিন গোত্রকে বলেছিলেন, তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় গনিমত বণ্টনে দেরি করেছেন। প্রায় ১০ দিন পর্যন্ত নবিজি জিরানায় অবস্থান করেছেন, যেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে আসে। এবং তাদের সম্পদ ও পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

এ থেকে বোঝা যায়—যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সৈনিকরা গনিমতের মালিক হয়ে যায় না; বরং শাসক বা রাষ্ট্রপতি যখন তাদের মাঝে গনিমত বণ্টন করে দেন তখনই তারা প্রাপ্ত অংশের মালিক সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপ হাদিস থেকে এও প্রমাণিত, মাল বণ্টনের আগে যদি শত্রুপক্ষ মুসলিম হয়ে সেগুলো ফেরত নিতে আসে, তাহলে শাসক বা রাষ্ট্রপতি তার ইচ্ছাধিকার বলে ফেরত দিতে পারবেন; যেমনটি নবিজি করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, বণ্টিত মালের ওপর নবিজি কোনো অধিকার খাটাননি; বরং সৈনিকদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

গনিমত বণ্টনের পর আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না

এ থেকে আরেকটি মাসয়ালাও পরিষ্কার হয়। মাল বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর তাতে শাসক বা রাষ্ট্রপতির আর কোনো ইচ্ছাধিকার থাকে না। তিনি চাইলেও বিনিময় ছাড়া ফেরত নিতে পারবেন না। অবশ্য তার আবদার বা আবেদনে অথবা এমনিতেই সৈনিক যদি সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তা সৈনিকের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এই মাসয়ালায় নবিজির কালক্ষেপণে একটু চিন্তাভাবনা করা দরকার। বণ্টিত মালের মালিকদের থেকে অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কতটা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি তাদের সম্মিলিত অনুমতি প্রদানের ওপর ভরসা না করে

প্রত্যেককে নিজ নিজ গোত্রপ্রধানের কাছে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে বলেন। তারপর তারা এসে প্রত্যেকের অভিমত জানায়।

তার এই আমল দ্বারা উদ্দেশ্য—উম্মতকে একটি আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। কোনো শাসক যেন তার প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরে জনগণ ও নাগরিকদের ব্যক্তি, মালিকানাধীন বস্তুসামগ্রী ত্যাগ করতে বা ছেড়ে দিতে চাপ প্রয়োগ না করে; বরং সাধারণ মানব শাসক তো দূরের কথা, বিশেষ মানব নবি-রাসুলের জন্যও এ কাজ জায়িজ নয়। এটাই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা, বাস্তবিক সমতা বিধান এবং আসল ইনসাফ।

আল্লাহ তায়ালার এই মহামূল্যায়ন ও বিবেচনা থাকতে চমৎকার শব্দে ও আকর্ষণীয় স্লোগানে রাজপথ উত্তপ্তকারী সব মিথ্যা বক্তব্য ও ভিত্তিহীন আওয়াজ কি মাটিতে দাফন হওয়া উচিত নয়?

০৯. মানুষের মনোতুষ্টির ব্যাপারে কৌশল

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওমুসলিম মক্কাবাসীকে ইসলামের প্রতি তাদের প্রেম-ভালোবাসা বাড়াতে এবং অন্তরে ঈমান পরিপক্ব হতে পুরোনো সৈনিক ও মুসলিমদের চেয়ে বেশি করে গনিমতের মাল দেন। এমনকি এই বণ্টনে সৈনিকদের মাঝে সমান অংশ বণ্টনের নিয়ম ও মূলনীতিকেও বিবেচনায় রাখেননি।

আইম্মায়ে মুজতাহিদিন ও ফুকাহায়ে কিরাম নবিজির এই আমল থেকে একটি মাসয়ালা উদ্ভাবন করেছেন। তারা বলেন—শাসক বা রাষ্ট্রপতির জন্য নওমুসলিমদের মনোতুষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য সৈনিকের চেয়ে কিছু বেশি গনিমত প্রদান করা জায়িজ ও অনুমোদিত; বরং কখনো এর বিকল্প যদি কিছু না থাকে, তাহলে তখন এটি ওয়াজিব। এবং তাদের মনোতুষ্টির জন্য যুদ্ধে অংশ না নিলেও গনিমতের মাল দেওয়ায় কোনো নিষেধাজ্ঞা বা সমস্যা নেই।

কারণ (ইসলামি রাষ্ট্রে) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে থাকা জাকাত ফান্ডেও এই খাতের একটি অংশ থাকে। সেখান থেকে ইসলামের নানা কল্যাণের দিকে তাকিয়ে কাউকে তার মনোতুষ্টির জন্য প্রয়োজন মোতাবেক মাল দেওয়া জায়িজ।

১০. আনসারদের মর্যাদা ও তাদের প্রতি নবিজির ভালোবাসা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চারিত প্রতিটি শব্দই অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও নির্ভুল। তিনি বলেন—'নিঃসন্দেহে শয়তান আদমসন্তানের শরীরে রক্তের

মতো চলে।' সন্দেহ নেই, শয়তান চেয়েছিল আনসার সাহাবিদের মনে নবিজির বণ্টন নিয়ে ভুল ধরাবে এবং তাদের মনে জাগিয়ে দেবে, (তোমাদের প্রাণের) নবি স্বজাতির ভালোবাসা ও টানে অন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একেবারে ভুলেই গেছে। (তাইতো গনিমতের মাল তোমাদের কম কম দিয়ে স্বজাতিকে দিয়েছে বেশি বেশি (নাউজুবিল্লাহ!); কিন্তু নবিজি শয়তানের এই চক্রান্ত বুঝতে পেরে কী বলেছেন?

তাদের মনে শয়তানের নিক্ষিপ্ত কুমন্ত্রণার প্রত্যুত্তরে তিনি যেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছেন, তাতে হৃদয় গলানো নম্রতা, উঁচু মানের রুচিবোধ এবং আনসার সাহাবিদের সাথে তাঁর গভীর প্রেম-ভালোবাসার অনুভূতিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি এতে ইঙ্গিত রয়েছে, মাল বণ্টনের সময় তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠজনদের ভুলে গেছেন এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বলে যেই মন্দ ধারণা তাদের মনে উদয় হয়েছে, তাতে তাঁর মনে বড়ো চোট লেগেছে।

নবিজির বক্তব্য বারবার পড়ে চিন্তা করলে জানা যাবে—ওই কয়েকটি কথায় তিনি মনের সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতির বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। হৃদয় গলানো অভিব্যক্তি, সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি তাদের ভেতরে নাড়া দিলে তারা মাথা নাড়িয়ে শুধু সায় দিতে থাকেন। মুহূর্তেই তাদের মন থেকে সব কুমন্ত্রণা ও মন্দ ধারণা দূর হয়ে যায়। এবং তাঁর সঠিক বণ্টন ও নিজেদের প্রাপ্ত অংশে সন্তুষ্ট হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

সেসব ধনদৌলত, পশু-প্রাণী ও অন্যান্য জিনিসপত্র তাদের দৃষ্টিতে কেমন ছিল? কোনো মূল্যেরই ছিল না। তারা তাঁকে নিয়ে ফিরে আসার আনন্দে সেগুলো বর্জন করেন। তাদের সাথে নবিজির ফিরে আসা তাদের প্রতি তাঁর প্রেম-ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উঁচু মানের দলিল আর কী হতে পারে?

নবিজির মানদণ্ডে পার্থিব ধনদৌলত প্রেম-ভালবাসা ও মূল্যায়ন বৃদ্ধির কোনো বিষয় ছিল? কুরাইশ নওমুসলিমদের বেশি করে গনিমত দেওয়ার সময় কি নিজের জন্য আলাদা করে কিছু রেখেছেন?

বরং আল্লাহ তায়ালা যেই এক-পঞ্চমাংশ তাঁর এবং তাঁর রাসুলের জন্য নির্ধারণ করেছেন, সেই অংশও তো তিনি শেষ পর্যন্ত আশপাশের বেদুইন বা গ্রাম্য সাহাবিদের মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছেন।

পাঠক একটু চিন্তা করেন তো, সব মাল বণ্টনের পরেও কিছু বেদুইন পিছে লেগে থাকলে তিনি বলেন, তার অংশ এক-পঞ্চমাংশ। তাও আবার তাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেন। তাঁর এভাবে বলা ও করা কি চাট্টিখানি কথা!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর অগণিত রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন। তাঁর পতাকাতলে আমাদের আশ্রয় দেন এবং হাউজে কাউসারে তাঁর হাতে পানি পানের সৌভাগ্য নসিব করেন, আমিন!

* * *

গাজওয়ায়ে তাবুক[১৭৬]

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইবনে সাদ ও অন্যান্য সিরাত বিশেষজ্ঞের বর্ণনা মোতাবেক এই অভিযানের কারণ ছিল এক নাবতি[১৭৭] বণিকদলের আগাম সংবাদ প্রদান। তারা মদিনা ও শামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তারাই মদিনায় সংবাদ প্রচার করে—রোমকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী গঠন করছে। বাহিনীতে অনারব রোমক ও শামীয় সৈন্য ছাড়াও শামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী আরব গোত্র লাখম, জুজাম ও অন্যান্য খ্রিষ্টানরাও রয়েছে। এমনকি এদের অগ্রবর্তী দল বালকা[১৭৮] পর্যন্ত চলেও এসেছে।

এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নবিজি সবাইকে শাম অভিমুখে অভিযান পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন।

---

১৭৬ তাবুক। বর্তমান সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমে ও জর্ডানের কাছাকাছি একটি নগরী। এটি সৌদির তাবুক প্রদেশের রাজধানী। মদিনা থেকে তাবুকের দূরত্ব প্রায় সাতশত কিলোমিটার। মোটামুটি বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের সমান। অঞ্চলটি সৌদি আরবের অন্যতম একটি কৃষি অঞ্চল।

১৭৭ নাবতি। নাকাব মরুভূমি, সিনাই উপত্যকা, বর্তমান জর্ডান এবং আরব উপদ্বীপের উত্তরের কিছু অংশ নিয়ে অতীতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর রাজধানী ছিল আধুনিক পেট্রা শহর। এটি ইয়ামান থেকে আসা কাফেলা রুটের মোড়ে অবস্থিত। এটি শাম, মিশর ও ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 'নাবতি' বলা হতো।

১৭৮ বালকা। বর্তমান জর্ডানের একটি বড়ো এলাকা। আরব উপদ্বীপের উত্তরে ওয়াদিউল কুরা ও প্রাচীন শামের মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল। ছোটো ছোটো অনেক গ্রাম এবং বড়ো বড়ো খেতখামারের জন্য এটি বিখ্যাত। এখানকার উৎপাদিত গমকে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে লুত আ.-এর ছেলে আম্মানের উত্তরসূরি 'বালিক'-এর নাম থেকে।

রোম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা

ইমাম তাবারানি রহ. ইবনে হুসাইন (حصين) রা. সূত্রে বর্ণনা করেন—রোমকদের এই বাহিনীতে সৈন্য ছিল চল্লিশ হাজার।[১৭৯]

মদিনার তখনকার অবস্থা

এই অভিযান পরিচালিত হয় নবম হিজরির রজব মাসে। আরবে তখন গ্রীষ্মকাল আর গরমটাও ছিল অগ্নিঝরা। সাহাবায়ে কিরামের আর্থিক অবস্থাও ছিল টানাপোড়েন। এবং ঠিক সেই সময় অর্থনীতির চাকা সচল করার মাধ্যম ও মদিনার একমাত্র অর্থকরী ফসল 'খেজুর' গাছে গাছে পাক ধরেছে। সারি সারি গাছে তখন পাকা খেজুর ঝুলে আছে; শুধু সংগ্রহ ও আহরণটাই বাকি।

বাগানের মালিকরা সবাই নিজ নিজ গাছের ছায়ায় বসে থাকতেই সুখ বোধ করছিল। দীর্ঘ আর্থিক অসংগতির সামনে টসটসে পাকা খেজুরের কাঁদি যেন চলমান অভাব মোচন ও আশা পূরণের স্বপ্ন বুনে চলছিল; কিন্তু এমন আনন্দঘন মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযানের ঘোষণা দেন এবং রওনার দিনের আগেই যাত্রার ধরন ও পদ্ধতি সব পরিষ্কার বলে দেন। অথচ অন্যান্য অভিযানে আগেভাগেই কিছু বলেননি।

কাব ইবনে মালিক রা. বলেন—নবিজি সাধারণত কোনো অভিযানে রওনার দিনের আগে যাত্রার ধরন-পদ্ধতির ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা দিতেন না; কিন্তু এই অভিযানে মাত্রাতিরিক্ত গরম সইতে হবে। দীর্ঘ যাত্রা। তার ওপর অনাবাদি বন-জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। ওদিকে প্রতিপক্ষ শত্রুরা সংখ্যাধিক্যে হাতির মতো বিশাল। নানাবিধ কারণেই তিনি সবাইকে ভালো করে বুঝিয়ে দেন যে, কী পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং কতটুকু প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে![১৮০]

উপর্যুক্ত নানা কারণে অভিযানে যাওয়া মুজাহিদদের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে খুব কষ্টের ছিল। কারণ, এই অভিযানের প্রতিটি স্থান ও মনজিলে পরীক্ষা ও বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ফলে এবার মুখোশধারী ও খাঁটি ঈমানের দাবিদার মুনাফিকদের চেহারা ফুটে ওঠে। অপরদিকে প্রকৃত মুমিন ও নির্ভেজাল মুসলিমদের পরিচিতিও প্রকাশ পায়। মুনাফিকরা একজন আরেকজনকে বলতে

---

১৭৯ *তাবাকাতু ইবনে সাদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৮; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৭

১৮০ *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*

থাকে—এই শোনো! যে গরম, এই আগুনের মতো গরমে কোথাও যেয়ো না, বুঝলে!

মুনাফিকদের অবস্থা

জাদ্দ ইবনে কাইস নামের এক মুনাফিক নবিজির কাছে এসে আবদার করে—আমাকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। আল্লাহর কসম! আমার গোত্রের লোকেরা ভালো করেই জানে, আমার গোত্রে আমার মতো নারীলোলুপ ও সুন্দরী পাগল দ্বিতীয় কেউ নেই। আমার আশঙ্কা, বনু আসফার[১৮১]-এর (ফিরিঙ্গিদের) কোনো মেয়ে চোখে পড়লে নিজেকে সামলে রাখতে পারব না।

নবিজি তাকে গণনা থেকে বাদ দেন এবং তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন।[১৮২]

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তার বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে প্রথমে মদিনার উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলে; কিন্তু নবিজি যখন সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হন, তখন সে পেছন থেকে তার পক্ষীয়দের নিয়ে মদিনায় ফেরত আসে।

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.

যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তারা আল্লাহর রাসুলের বিরোধিতা করে বসে থাকাতেই আনন্দ বোধ করেছে এবং আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করা তাদের কাছে অপ্রীতিকর লেগেছে। তারা বলেছে—এই

---

১৮১ বনু আসফার। আরবদের সমাজে প্রচলিত একটি পরিভাষা। ইউরোপিয়ানদের বোঝাতে তারা ব্যবহার করত। যেমন : আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত হাদিসেও ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮২ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, ইবনে মারদুয়াহ; *মুসনাদু আবদির রাজ্জাক*, *আল ইসাবাহ ফি তামযিযিস সাহাবাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩০

তীব্র গরমে তোমরা অভিযানে বের হয়ো না। আপনি বলে দেন, জাহান্নামের আগুন সবচেয়ে গরম, যদি ওরা বুঝত![১৮৩]

তিনি আরও বলেন—

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.

তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বলেছে—আমাকে অব্যাহতি দেন। আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। শুনে রাখো, পরীক্ষায় তো ওরা পড়েই আছে। নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টনকারী।[১৮৪]

এই ছিল মুনাফিকদের অবস্থা।

উসমান ইবনে আফফানের অনুদান

বিপরীতে খাঁটি ঈমানদার সাহাবায়ে কিরাম নবিজির দিকনির্দেশনা মোতাবেক নিজ নিজ প্রস্তুতি নিয়ে একত্র হতে থাকেন। তিনি ধনী ও সচ্ছল সাহাবিদের রসদসামগ্রী ও বাহনব্যবস্থার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করলে তারা সাধ্যমতো অর্থসম্পদ সামনে এনে পেশ করেন।

এই যুদ্ধে মুজাহিদদের রসদ-ঘাটতি মেটাতে উসমান ইবনে আফফান রা. একাই গদি ও জিনপোশ-সহ তিনশত উট অনুদান প্রদান করেন।[১৮৫] এ ছাড়াও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নবিজির হাতে তুলে দেন। নবিজি এতে খুবই খুশি হন এবং বলেন—এরপরে উসমান যা কিছু (ভুলত্রুটি) করবে, তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি বা সমস্যা হবে না।[১৮৬]

উমরের প্রতিযোগিতা

আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ঘরে উপস্থিত করার মতো যত সম্পদ ছিল, তিনি তার সবটাই নবিজির সামনে পেশ করেন। আর উমর রা. তার ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে নবিজির সামনে আসেন।

---

১৮৩ সূরা তাওবা, আয়াত : ৮১

১৮৪ সূরা তাওবা, আয়াত : ৪৯

১৮৫ *তাবারানি; জামি তিরমিজি; মুস্তাদরাক আল হাকিম; মুসনাদু আহমাদ*

১৮৬ *জামি তিরমিজি; মুসনাদু আহমাদ*

ইমাম তিরমিজি রহ. জায়িদ ইবনে আসলাম রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন—তিনি তার বাবাকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর রা.-এর মুখে শুনেছি তিনি বলেন—

> নবিজি একবার আমাদের সাদাকা করার নির্দেশ দেন। আমার কাছে তখন বেশ ভালোই সম্পদ ছিল। মনে মনে ভাবলাম—আজকে যদি আবু বকরকে টপকে যেতে পারি, তার মানে হলো, ভবিষ্যতেও আশা করা যায়—আমি তার আগেই থাকতে পারব। ভাবনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হলাম।
>
> নবিজি জিজ্ঞেস করলেন—পরিবারের জন্য কী বা কতটুকু রেখে এসেছ?
>
> আমি বললাম—অর্ধেক এই যে আপনার সামনে, বাকি অর্ধেক পরিবারের জন্য রেখে এসেছি।
>
> একটু পরেই আবু বকর তার সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন। আমার মতো করে তাকেও নবিজি জিজ্ঞেস করেন—পরিবারের জন্য কী বা কতটুকু রেখে এসেছ?
>
> জবাবে তিনি বললেন—তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছি।
>
> শুনে আমি মনে মনে বললাম—আহ! সত্যিই আমি আবু বকরকে কখনো ছাড়িয়ে যেতে পারব না।[১৮৭]

হাদিস সহিহ হয়ে থাকলে এটি তাবুক অভিযানের ঘটনা বলেই পরিষ্কার বোঝা যায় এবং একদল উলামায়ে কিরাম এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা

প্রস্তুতিকালে একদিন 'ক্রন্দনকারী' বলে পরিচিত কয়েকজন মুসলিম নবিজির কাছে আসে এবং জিহাদে যোগ দিতে বাহনের ব্যবস্থা করে দিতে বলে। তিনি বলেন—আমি তোমাদের বাহনের ব্যবস্থা করার মতো কোনো উপায় দেখছি না। শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত ছিল এবং তাদের সম্পদ না

---

১৮৭ *জামি তিরমিজি, মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু আবি দাউদ*

থাকা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। নবিজি পূর্ণ প্রস্তুতি শেষে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন।[১৮৮]

কয়েকজন মুসলিম বিনা কারণে এই অভিযান থেকে মাহরুম হয়। কাব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনে রবি, হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং আবু খাইসামা রা.। ইবনে ইসহাকের উক্তি অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন খাঁটি মুসলিম। তাদের ঈমান-ইসলামে কোনো সন্দেহ-সংশয় ছিল না। শুধুই খামখেয়ালি ও মনের কাছে পরাজিত হয়ে বাড়িতে থেকে যান। তবে আবু খাইসামা রা. পরে তাবুকে গিয়ে নবিজির সাথে মিলিত হন।

আবু খাইসামা রা.-এর প্রত্যাবর্তন

ইমাম তাবারানি, ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদি রহ. বর্ণনা করেন—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনা থেকে রওনার কয়েক দিন পর আবু খাইসামা রা. বাড়ি আসেন। তার দুই স্ত্রী ছিল। দুজনকেই তিনি খেজুর বাগানে তাঁবুতে দেখেন। দুই স্ত্রীই নিজ নিজ তাঁবুতে উষ্ণতা কমাতে হালকা পানি ছিটিয়ে রাখে। দুজনেই স্বামীর জন্য তৃষ্ণা নিবারক ঠান্ডা পানি ও সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে।

আবু খাইসামা রা. প্রবেশের ইচ্ছায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দাঁড়িয়ে যান। ভেতরে দুই স্ত্রী এবং তাদের জোগাড় করে রাখা খাদ্যদ্রব্য দেখে মুখ ফুটে বলেই ফেলেন, আল্লাহর রাসুল কাঠফাটা রোদ, অগ্নিঝরা বাতাস আর ক্ষুৎপিপাসায় ভুগছেন আর সেখানে আবু খাইসামা কি না ঠান্ডা পানি, তাজা ও সুস্বাদু খাবার আর রূপসী স্ত্রীদের নিয়ে বাগানে ফুর্তিতে মেতে থাকবে? আল্লাহর কসম, এ তো কোনো সুবিচার নয়। আল্লাহর কসম! নবিজির সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের কারও ঘরেই প্রবেশ করব না। স্ত্রী দুজন তার যাত্রাপথের রসদ-সামগ্রী প্রস্তুত করে দেয়। তিনি নিজের উট এনে যাত্রা শুরু করেন। নবিজির সন্ধানে যেতে যেতে একসময় গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন।

নবিজি তখন তাবুক গিয়ে পৌঁছেন মাত্র। আবু খাইসামা রা. বাহিনীর কাছাকাছি উপনীত হলে সাহাবায়ে কিরাম নবিজিকে বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, দূরে একজন আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, আল্লাহ করেন, আবু খাইসামা কি না!

---

১৮৮ *তাবাকাতু ইবনে সাদ, সিরাতে ইবনে ইসহাক* ও অন্যান্য সিরাতগ্রন্থ

অতঃপর একেবারে সবার সামনে এসে পড়লে তারা বলে ওঠেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আপনার কথাই সত্য! এ তো আবু খাইসামাই।

আবু খাইসামা রা. উট বসিয়ে নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করেন। নবিজি বলেন, তুমি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলে!

এরপর আবু খাইসামা রা. বিস্তারিত ঘটনা শোনান। সব শুনে নবিজি তার জন্য দুআ করেন। সাহাবায়ে কিরাম এই অভিযানে বর্ণনাতীত কষ্ট-ক্লেশ ও শারীরিক যাতনার সম্মুখীন হয়েছেন।

মুসলিমদের খাদ্য সংকট

ইমাম আহমাদসহ অন্যরাও বর্ণনা করেন—আর্থিক অভাব-অনটন ও অসচ্ছলতার এমন করুণ অবস্থা ছিল যে, এক উটের ওপর পালাক্রমে দুজন তিনজন করে আরোহণ করতে থাকেন। পথে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলে উট জবাই করে ভেতর থেকে পানি বের করে পিপাসা মেটাতেন।[১৮৯]

ইমাম আহমাদ রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, এই যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন। দিনগুলোও ছিল দুর্ভিক্ষের। তারা আবেদন করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি অনুমতি দিলে আমরা উট জবাই করে মাংস খেতে পারি এবং চর্বি দিয়ে তেল বানাতে পারি। ওজর শুনে তিনি অনুমতি দেন। এমন সময় উমর রা. এসে বলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাহলে তো বাহন সংকট দেখা দেবে। আপনি বরং তাদের তাদের অবশিষ্ট খাবার আনতে বলেন এবং আপনি সেগুলো দেখিয়ে আল্লাহর কাছে বরকতের দুআ করেন। আমার আশা—তিনি আপনার দুআ ফিরিয়ে দেবেন না। অবশ্যই বরকত দেবেন।

নবিজির মুজিজা

এবার উমর রা.-এর সুচিন্তিত পরামর্শ অনুযায়ী নবিজি সবাইকে উট জবাই করতে নিষেধ করেন। প্রত্যেককে নিজ নিজ অবশিষ্ট খাবার নিয়ে আসতে বলেন। কেউ হাতের তালুতে করে কয়েকটি ভুট্টা দানা, কেউ কিছু খেজুর আবার কেউ রুটির এক-দুই টুকরো নিয়ে হাজির হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি চামড়ার বড়ো দস্তরখানে সব জমা করা হয়। অতঃপর নবিজি খাবার দেখিয়ে আল্লাহ তায়ালার

---

১৮৯ *মুসনাদু আহমাদ; তাবাকাতু ইবনে সাদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২০

কাছে বরকতের দুআ করেন। দুআ শেষে সবাইকে নিজ নিজ পাত্র ভরে নিতে বলেন।

প্রত্যেকেই পাত্র ভরে নেন। সেখান থেকে তৃপ্তি সহকারে আহারও করেন। এরপরও খাবার শেষই হয় না। তা দেখে নবিজি ঘোষণা দেন—

> আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং আমি তাঁর রাসুল।
>
> আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—যে ব্যক্তি এই কালিমার প্রতি অকাট্য ও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখাবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সে জান্নাতি।[১৯০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী নিয়ে তাবুক পৌঁছে ছাউনি ফেলেন। আশপাশে দৃষ্টিসীমার ভেতরে কোথাও কোনো সৈন্য নজরে পড়েনি। কারণ, রোমকরা যখন নবিজির বিশাল বাহিনী নিয়ে আগমনের খবর পায়, তখনই ওরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। নবিজির তাবুক অবস্থাকালেই কয়েক দিন পর আইলার[১৯১] খ্রিষ্টান গভর্নর ইউহান্না[১৯২] তার কাছে গিয়ে জিজিয়া (বাৎসরিক ট্যাক্স) প্রদানের শর্তে সন্ধি করে আসে।

এভাবে জারবা[১৯৩] ও আজরাহ[১৯৪]-এর খ্রিষ্টানরাও তাঁর কাছে গিয়ে জিজিয়ার শর্তে সন্ধি করে। তিনি তাদের একটি দস্তাবেজ বা চুক্তিনামা লিখিয়ে দিয়ে দেন।

সামুদ গোত্রের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম

এ সফরেরই ঘটনা। তাবুক যাওয়ার পথে হিজর[১৯৫] নামক স্থান পড়ে। তিনি যখন বাহিনী নিয়ে এই স্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে

---

১৯০ *মুসনাদু আহমাদ, সহিহ মুসলিম, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া।*

১৯১ আইলা। বর্তমান জর্ডানের দক্ষিণে অবস্থিত আকাবা নগরীর প্রাচীন নাম আয়লা। অর্থাৎ অতীতের আইলাতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক আকাবা নগরী। রাজধানী আম্মান থেকে এর দূরত্ব প্রায় তিনশ ত্রিশ কিলোমিটার।

১৯২ ইউহান্না ইবনে রুবা।

১৯৩ জারবা। বর্তমান ফিলিস্তিনের জানিন জেলায় অবস্থিত মাসলিয়া ও সানুর-এর মধ্যবর্তী গ্রামের নাম। গ্রামটি জানিন জেলাসদর থেকে একুশ কিলোমিটার দক্ষিণে। এটি সবুজ শ্যামলিমা ও আবাদি জমির জন্য বিখ্যাত।

১৯৪ আজরাহ। জর্ডানের রাজধানী আম্মানের দক্ষিণে মাআন জেলার একটি গ্রাম। গ্রামটি সবুজ-শ্যামল হিসেবে বিখ্যাত। এখানে মিষ্টি পানি থাকায় বড়ো বড়ো বাগানও ছিল। এখানকার ফলমূলের মধ্যে ছিল জয়তুন, বাদাম, ডুমুর, খেজুর ও ডালিম।

১৯৫ হিজর। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক একটি এলাকা। এখানে বসবাস ছিল শক্তিশালী সামুদ সম্প্রদায়ের। এলাকাটি ওয়াদিউল কুরা ও তাবুকের মাঝখানে অবস্থিত। বর্তমান নাম মাদায়েনে সালিহ।

বলেন—সাবধান! তোমরা কেউ এখানে ধ্বংস হওয়া পাপিষ্ঠ ও অভিশপ্ত সামুদ গোত্রের ধ্বংসাবশেষ ঘরে যাবে না। এরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। তোমাদের ওপর যেন ওদের আজাব চলে না আসে; বরং এ ধ্বংসস্থল অতিক্রমের সময় আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলো। এরপর তিনি মাথা ঢেকে নেন এবং দ্রুত পায়ে এই বসতি অতিক্রম করে সামনে চলে যান।[১৯৬]

তাবুক প্রান্তরে তিনি দশ দিন অবস্থান করেন। এগারোতম দিনে মদিনায় ফিরে আসার নিয়তে সবাইকে প্রস্তুত হতে বলেন।

আসতে আসতে যখন মদিনার সীমারেখায় প্রবেশ করেন, তখন সাহাবিদের লক্ষ করে বলেন—এটা মদিনা আর ওই যে দেখা যায় উহুদ পাহাড়। উহুদ পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি।[১৯৭]

তিনি আরও বলেন—শোনো, মদিনায় এমন লোকও আছে, যখন তোমরা দীর্ঘ সফরের পথ মাড়াচ্ছিলে এবং উপত্যকার পর উপত্যকা পার করে যাচ্ছিলে, তখন তারাও তোমাদের সঙ্গে ছিল। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা কীভাবে? তারা তো এখানেই ছিল।

তিনি বলেন—হ্যাঁ, তোমাদের কথা ঠিক। তারা এখানেই ছিল; কিন্তু তাদেরকে তাদের অপারগতা ও ওজর এখান থাকতে বাধ্য করেছে।[১৯৮]

নবিজি রজব মাসে (শুরুতে) মদিনা থেকে বের হয়ে রামাদান মাসে ফিরে আসেন। মাঝের প্রায় দুই মাস বাইরে ছিলেন।

* * *

১৯৬ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*
১৯৭ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*
১৯৮ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

মনের কাছে পরাজিত তিন সৈনিক

নবিজির মদিনায় প্রত্যাবর্তন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মসজিদে যান এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে সবার সাথে দেখাসাক্ষাৎ শুরু করেন।

এ সময় অভিযানে শরিক হয়নি—এমন লোকেরা একের পর এক তাঁর সামনে আসতে থাকে এবং না যাওয়ার কারণ ও ইস্যু পেশ করতে থাকে। এমনকি কসম করতেও দেরি করছে না। এমন লোক ছিল আশিজন। তিনি তাদের ওজর ও অপারগতা মেনে নেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন; কিন্তু কাব ইবনে মালিক ও তার দুজন সাথির তাওবার বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার ওহি নাজিলের ওপর ছেড়ে দেন।

কাব ইবনে মালিকের ঘটনা

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এর দীর্ঘ হাদিসে কাব ইবনে মালিক রা. নিজের ঘটনা নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

আমার আসলে অভিযানে না যাওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ বা ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! নবিজির যাত্রার সময় (সামরিক) সক্ষমতা ও সম্পদ আমার চেয়ে বেশি আর কারও ছিল না। দেখতে দেখতে নবিজির এবং মুজাহিদদের সবার প্রস্তুতি সম্পন্ন। আর আমি প্রতিদিন নিয়ত করি, আমিও সবার সাথে প্রস্তুতি নিয়ে নেব।

দিন গড়াতে থাকে। আমিও মনের ধোঁকায় পড়ে থাকি। এমতাবস্থায় আরও মারাত্মক ধোঁকায় পড়ি। মন আমাকে বলে—আরে, আমার প্রস্তুতি আর কতক্ষণ লাগবে? চোখের পলকেই সব গোছানো হয়ে যাবে। ওদিকে সবাই নিজ নিজ রসদ-পাথেয় ও সাজসরঞ্জাম জোগাড় করে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

এভাবে নির্দিষ্ট দিন সকালে নবিজি মুজাহিদদের নিয়ে রওনা দেন। আর এদিকে আমি প্রস্তুতির বিসমিল্লাহও করিনি। এরপর নিয়ত করি—সমস্যা নেই, আমি দ্রুত গতিতে গিয়ে তাদের সাথে যোগ দেবো; কিন্তু আমার মনের অবস্থা আগের অবস্থান থেকে একচুলও নড়েনি। ওদিকে তারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতেই থাকেন। আমি দৃঢ় প্রত্যয় করি, গিয়ে তাদের ধরে ফেলব। আফসোস! যদি আমি এমনটি করতাম; কিন্তু এই সৌভাগ্য মূলত আমার তাকদির থেকে আমি হারিয়ে ফেলি।

নবিজির চলে যাওয়ার পর ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই হয়তো মুনাফিক অথবা অপারগদের চেহারা চোখে পড়ত। এতে আমি খুব দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতাম।

এরপর একদিন নবিজির ফেরত আসার খবর শুনে পেরেশানি আরও বেড়ে যায়। মিথ্যা ও ভুয়া সব ধারণা মনে জাগতে থাকে। এ ব্যাপারে আমার পরিবারের বুঝমানদের সাথে সলাপরামর্শও করি; কিন্তু নবিজির মদিনার কাছাকাছি পৌঁছার সংবাদ শোনার সাথে সাথে সব মিথ্যা ওজর-আপত্তি মন থেকে বেরিয়ে যায় এবং সত্যটাই বলার দৃঢ় অঙ্গীকার করি।

ভাবনা অনুযায়ী তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হই। প্রথমে সালাম দিই। তিনি মুচকি হাসেন। হাসির ভেতরে ক্রোধ ছিল। তিনি বলেন—এদিকে আসো।

আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়ি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন—তুমি কোন কারণে থেকে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করেছিলে না?

জবাব দিলাম—হ্যাঁ। অবশ্যই কিনেছিলাম। আল্লাহর কসম! কোনো দুনিয়াদারের সামনে যদি বসতাম, তাহলে নিশ্চিত তাকে এমন ওজর বলে দিতাম, যাতে তার রাগ পানি হয়ে যেত। কারণ, আল্লাহ আমাকে সেই দক্ষতা ও বুদ্ধি দিয়েছেন; কিন্তু আমি জানতাম, আজ যদি মিথ্যা বলে তাঁর থেকে ছুটে যাই, তাহলে আগামীকাল অবশ্যই আল্লাহ সত্যটা তাঁকে জানিয়ে দেবেন।

বিপরীতে আজকে যদি সত্য বলার কারণে তিনি নারাজ হন তাহলে আমার আশা, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাকে মাফ করে দেবেন। তা ছাড়া যৌক্তিক কোনো কারণও আমার কাছে ছিল না।

আমি বললাম—আল্লাহর কসম! আপনার যাত্রার সময় (সামরিক) সক্ষমতা ও সম্পদ আমার চেয়ে বেশি আর কারও ছিল না।

তিনি বলেন—ঠিক আছে। তুমি যেহেতু সত্য কথাই বলেছ, তাই এখন উঠে যাও। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

বনু সালামার কয়েকজন আমার পেছন থেকে এসে আমাকে তিরস্কার করে বলল, বোকা কোথাকার, তুমি তো কোনো ওজর পেশ করলেই পারতে! তারা আমাকে পীড়াপীড়ি করতেই থাকে, আমি যেন নবিজিকে কোনো ওজরের কথা জানিয়ে আসি। একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, আমার মতো কেউ কি তার ভুল স্বীকার করেছে?

তারা জবাব দেয়—হ্যাঁ। তোমার মতো আরও দুজন আছে। তাদেরও একই কথা বলা হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে? তারা জবাব দেয়, মুরারা ইবনে রবি ও হিলাল ইবনে উমাইয়া।

এই দুজন এমন নেককার লোক—যাদের দুজনই বদরি সাহাবি। তাদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ও শিক্ষা রয়েছে। নবিজি আমাদের তিনজনের সাথে কথা বলতে সবাইকে নিষেধ করেন। সবাই আমাদের থেকে কেমন যেন দূরে দূরে থাকে এবং অপরিচিতের মতো আচরণ করে। আমার মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটাই যেন আমার জন্য বদলে গেছে। দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এই অবস্থায় কাটাই। তারা দুজন ঘরে বসে অঝোরে কাঁদতে থাকে; কিন্তু আমি একটু শক্ত মনের হওয়ায় আগের মতোই বাইরে বের হই। সবার সাথে সালাত আদায় করতে মসজিদে যাই। বাজারঘাটেও যাওয়া-আসা করি। তবে কেউই কথা বলে না।

সালাত শেষে নবিজিকে সালাম দিতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট মুবারক নড়ে কি না দেখতে। আবার তার কাছাকাছি সালাতে দাঁড়াতাম; যেন তার নুরানি চেহারা দেখতে পারি। আমি সালাতে দাঁড়ালে তিনি আমার দিকে দেখতেন, আর অন্য সময় আমি তাঁর প্রতি মুখ করলে তিনি উপেক্ষা করতেন। এভাবেই কেটে যায় কয়েক দিন।

একদিন বাজারে গেলে শামের এক ব্যবসায়ীর সাথে দেখা হয়। সে তরিতরকারি বেচতে এসেছিল। সে আসার পর থেকে অনেকের কাছে আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছে। আমাকে দেখামাত্রই একজন দেখিয়ে দেই। সে আমার কাছে এসে গাসসান সম্রাটের নামে একটি পত্র দেয়। তাতে লেখা ছিল—

> আমি জানতে পেরেছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে রেহাই দিলেও আপনার নবি আপনার প্রতি বাড়াবাড়ি করছে। এমতাবস্থায় আপনি যদি আমাদের কাছে চলে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে সুখ-শান্তিতে রাখব।

এটা পড়ার সাথে সাথে আরেকটি বিপদ আমার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। পত্রটি চুলায় ফেলে জ্বালিয়ে দিই। চল্লিশ দিন গেলে নবিজির দূত এসে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ শুনিয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম—তালাক দিয়ে দেবো না অন্য কোনো উদ্দেশ্য? জবাব দিলেন, না। তালাক নয়; বরং স্ত্রীর কাছে যাবে না। তার থেকে দূরে থাকবে। তোমার সেই দুজন সাথিকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাবার বাড়ি চলে যাও এবং আমার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত ওখানেই থাকো।

এভাবে আরও দশ দিন কাটে। আমার সাথে সবার কথাবার্তা বন্ধের পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হয়। পঞ্চাশতম দিনে ফজরের সালাত পড়ে ঘরের ছাদে বসে দুশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম। পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় সালা পাহাড়[১৯৯]-এর চূড়ায় এক আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনতে পাই। সে উচ্চৈঃস্বরে বলছে—হে কাব ইবনে মালিক! তোমার জন্য সুসংবাদ!

আওয়াজটি শোনামাত্রই আমি সিজদায় পড়ে যাই। আমি বুঝতে পারি, অবশ্যই খুশির সময় এসেছে। কারণ, সালাতের পরে নবিজি অন্যদের আমাদের তাওবা কবুলের এক রকম সংবাদ দেন। এবার সবাই আমাদের সুসংবাদ শোনাতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ওই ঘোষণাকারী আমার কাছে এলে আমি তাকে পরিধানের দুটি কাপড়ই খুলে দিয়ে দিই। আল্লাহর কসম! সেদিন আমার ওই দুইটি কাপড় ছাড়া আর কোনো

---

১৯৯ সালা পাহাড়। মদিনার অন্যতম পাহাড়। এর অবস্থান মসজিদে নববির পশ্চিমে পাঁচশত মিটার দূরে। পাহাড়টির দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার, প্রস্থ ৩০০-৮০০ মিটার আর উচ্চতা ৮০ মিটার। উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত।

কাপড়ই ছিল না। তাই আমি দুটি কাপড় ধার নিয়ে সেগুলো পরে নবিজির উদ্দেশে রওনা হই। পথে দলে দলে আমাকে তাওবা কবুল হওয়ায় অভিনন্দন জানাতে থাকে। অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে বৈঠকে বসা আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁর চারপাশে উপস্থিত। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আমাকে দেখামাত্র লাফ দিয়ে আমার দিকে উঠে আসে এবং আমার সাথে মুসাফাহা করে স্বাগত জানায়। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউই আমার সাক্ষাতের জন্য ওঠেনি। তার এই সহমর্মিতার আচরণ আমি কখনোই ভুলব না।

আমি নবিজির সামনে গিয়ে সালাম দিলে তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বলেন—তোমার আজকের দিনটি বরকতময় হোক। জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো দিন তোমার কাটেনি।

আমি দাঁড়িয়ে থেকেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই ক্ষমা ঘোষণা কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে?

তিনি জবাব দেন—আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে।

এরপর আমি তার সামনে বসে যাই। জিজ্ঞেস করি, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই খুশিতে কি আমি আমার সব অর্থসম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উদ্দেশ্যে সাদাকা করে দিতে পারব?

তিনি বলেন—নিজের জন্য কিছু রেখে দাও, তা তোমার কল্যাণের জন্য।

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার সত্য বলার কারণেই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আর আমার তাওবার চিহ্নস্বরূপ আমি বাকি জীবনেও সত্য ছাড়া কথা বলব না। আল্লাহ তায়ালা নবিজির ওপর নাজিল করেন—

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

আল্লাহ অবশ্যই নবি, মুহাজির এবং আনসারদের প্রতি দয়াশীল হয়েছেন; যারা কঠিন মুহূর্তেও তার নবির অনুসরণ করেছে—যখন তাদেরই একটি দল ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারপর তিনি তাদের ওপর রহম করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, চির দয়ালু।

এবং তিনজনের প্রতি; যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল এমনকি একসময় পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং তারা বুঝতে পারে—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হন, যেন তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওবা কবুলকারী এবং চির দয়ালু। ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।[২০০]

* * *

২০০ সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৭-১১৯

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

অভিযান প্রসঙ্গে কিছু স্পষ্ট ধারণা

আরব উপদ্বীপে যখন ইসলামের শেকড় মজবুত হতে থাকে এবং মানুষের মনে এর প্রভাব ও চিহ্ন পড়তে থাকে, তখন রোমের খ্রিষ্টানরাও ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

রোমকরা খাঁটি মনে ঈসায়ি মতাদর্শ ও শরিয়তের ওপরও ঈমান আনেনি; বরং তাদের ঈমান আনয়ন ও ঐক্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা এবং আশপাশের এলাকায় চুরি-ডাকাতি ও লুটপাটের লক্ষ্যে তাদের সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল। এ কারণেই তারা নিজেদের মনমতো ধর্মীয় অনুশাসন চালাত। একই উদ্দেশ্যে ধর্মীয় আইনকানুনে অগণিত সংযোজন-বিয়োজন তারা করেছিল। ফলত বর্তমান ঈসায়ি শিক্ষা ও নীতিমালা যেন পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ভান্ডার। তাদের হিদায়াত বদলে গেছে ভ্রষ্টতায় আর মূর্তিপূজা হয়ে গেছে ধর্মীয় রীতি।

অন্যদিকে ইসলাম তো সেই ধর্মের নাম, যেই ধর্মের দিকে সর্বযুগে সকল নবি-রাসুল দাওয়াত দিয়েছেন এবং যেই ধর্মের প্রচার-প্রসার তারা করে গেছেন। এই ধর্মের লক্ষ্যই হলো মানবজাতি যেন হাজারো সৃষ্টির পূজা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এক স্রষ্টার ইবাদতকারী হয়। এবং জগতের শাসন-কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে শুধু এবং শুধু আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধের অনুসারী ও গোলাম হয়ে যায়।

ঈসায়ি ধর্মের এসব অনুসারীরা ঈসা আ.-এর শরিয়ত ভালো করেই জানত। এই সর্বশেষ নবির পয়গামের ব্যাপারেও যথেষ্ট জ্ঞান তাদের ছিল। তাই এখন তারা ইসলামের প্রসারিত ও বিস্তৃত পয়গামকে নিজেদের মিথ্যা প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আল্লাহর বিরোধিতা ও অবাধ্যতার ক্ষেত্রে শঙ্কা ও অশনিসংকেত মনে করত। কারণ, আরব উপদ্বীপে যখন ইসলাম মজবুত ও সুদৃঢ় হয়ে গেছে, তখন রোমকদের

জুলুম-নির্যাতন ও অন্যায় লুটপাটের অবসান ঘটাতে যে সে অগ্রগামী হবে, এতে অন্তত তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

এ ব্যাপারটি ওইসব অবাধ্য ও জালিমদের জন্য অত্যন্ত আতঙ্ক ও পেরেশানির কারণ ছিল। কেননা, সেসব দাঙ্গাবাজ গোত্র ঈসায়ি ধর্মের অনুসরণও শুধু ওপরে ওপরে দেখাত। যাতে করে রোম সম্রাট তাদের তত্ত্বাবধান করে এবং এরা দুর্বল ও সাধারণ লোকদের ওপর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারে।

ফলত মক্কা বিজয় এবং আরব উপদ্বীপে ইসলামের মজবুতি ও দৃঢ় অবস্থানের খবর শুনে প্রথমত ওই শ্রেণির লোকরাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। শাম ও হিজাজের মাঝখানে এক জায়গায় আশপাশের সব অনুগত গোত্র ও গোষ্ঠীদের একত্র করতে থাকে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়—এই যে নতুন ধর্ম ইসলাম আরবের বুকে শিকড় গেড়েছে, যেকোনোভাবেই এর মূলোৎপাটন করতে হবে এবং এর অগ্রগতি ও অগ্রযাত্রাকে যেকোনো পদ্ধতিতেই হোক থামাতে হবে।

কারণ, ইসলামের বিস্তৃতি মানে তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সলিলসমাধি। ইসলামের উত্থানকে রোমীয়দের গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদের এবং মুসলিমদের মাঝে সংঘর্ষ লেগে মুসলিমদের কোমর যেন ভেঙে যায়। এবং ইসলামের বিস্তৃতিতে ভাটা পড়ে শুকিয়ে যায়।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। খোদায়ি হিকমত ছিল—মুসলিম ও রোমকদের মধ্যে এত বড়ো সংঘর্ষ না হোক, যেটাতে মুসলিমদের কোনো ক্ষতি হয়; বরং রাস্তার কষ্ট-ক্লেশ ও শারীরিক যাতনা সহ্য করাই মুসলিমদের পক্ষ থেকে জিহাদ বলে গণ্য হয়।

মুসলিমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য প্রদর্শন করে তীব্র গরমে এবং দৈন্যদশাতেও লম্বা সফরে নেমে পড়েন। যেই সফরের পদে পদে কঠিন পরিস্থিতি ও জটিল পরীক্ষায় ভরপুর ছিল। মুসলিমরা এই বিস্ময়কর ও বিচিত্র সফরে ক্ষুৎপিপাসা, শারীরিক কষ্ট-ক্লেশ সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের খাতিরে সহ্য করে নেন।

কেননা, আল্লাহ তায়ালা যেই জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, সেটা তো এই দ্বীন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় নিজের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও জান-প্রাণ উৎসর্গ করে দেওয়ার নামই। মূলত এটাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের থেকে দাবি করেন। নিশ্চিত তিনি বান্দাদের থেকে এর ভিন্ন কিছু কামনা করেন না। (আল্লাহ মাফ করেন) এর

মাধ্যমে কাফিরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা বা অস্বীকারকারীদের অন্তরে ঈমান ও হিদায়াত প্রবেশ করানোর জন্য ঈমানদারদের সাহায্য নেওয়া আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য নয়।

মুসলিমদের সাজসরঞ্জামের সংকটপূর্ণ বাহিনী এই কষ্ট-ক্লেশে জর্জরিত অভিযানে নিজেদের সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করেন। তারা জাগতিক আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাস সব মাটি করে দেন। দীর্ঘ যাত্রার সব কঠিন ও জটিল পরিস্থিতি সহ্য করেন। এগুলো সবই তাদের খাঁটি ঈমান ও ইসলামের সাথে ভালোবাসার স্পষ্ট দলিল। বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বিজয় ও সাহায্য সুনিশ্চিত করে দেন। শত্রুদের মোকাবিলায় নামার প্রয়োজনই পড়েনি। তিনিই তাদের পক্ষ থেকে কাজ সম্পন্ন করে দেন। তিনি আগেই ওদের মনে ভীতি ও আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেন। ওরা ভয়ে ও শঙ্কায় পালিয়ে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

মুসলিমরা যখন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে সব দুঃখ-কষ্ট মনে-প্রাণে মেনে নেন, রোমীয়রাও তৎক্ষণাৎ আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে এবং জিজিয়া প্রদান ও সকল শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

* * *

গাজওয়া-সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও বিধিবিধান

এই যুদ্ধে আমাদের জন্য অসংখ্য নির্দেশনা ও বিধিবিধান রয়েছে, যেগুলো এই পর্যায়ে সংক্ষেপে তুলে ধরছি—

০১. সম্পদের মাধ্যমে জিহাদে অংশগ্রহণ

আমাদের সামনে স্পষ্ট হলো যে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা শুধু 'জিহাদের উদ্দেশ্য ময়দানে বেরিয়ে পড়া'র ওপরই সীমাবদ্ধ নয়। আবার শুধু জিহাদের জন্য বেরিয়ে যাওয়াটাই যথেষ্টও নয়। কেননা, অবস্থা ভেদে জিহাদের কৌশল ও হুকমের তারতম্য হয়। সুতরাং যেখানেই অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদের হুকুমটা মালের ওপর নির্ভর করে, তখন সকল মুসলিমের জন্য যার যার সাধ্যানুযায়ী জিহাদের জন্য সম্পদ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

জিহাদে জনগণের সম্পদ জোর করে নেওয়ার বিধান

ফকিহগণ বলেন—রাষ্ট্র যদি জিহাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, তখন রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার আছে, পূর্বোল্লেখিত পদ্ধতিতে সবার ওপর খরচের বিষয়টা আবশ্যক করে দেওয়া। তবে ফকিহগণ এ বিষয়ের ওপরও ঐকমত্য পোষণ করেছেন—

যেহেতু রাষ্ট্রীয় আধিকারিক দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের চাইতে জনগণের সম্পদ রাষ্ট্রের বেশি উপযোগী নয়, তাই জনগণের সম্পদ সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে এবং জিহাদের খাতে ব্যয় করা হবে না; বরং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই জিহাদের যাবতীয় খরচ বহন

করতে হবে। তবে হ্যাঁ, 'বাইতুল মাল' জিহাদের খাতে ব্যয়ে পর্যাপ্ত না হলে তখন রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে জনগণের সকলের ওপর যার যার সাধ্যানুযায়ী সম্পদ পেশ করা আবশ্যক করে দিতে পারে। যেমনটি তাবুক যুদ্ধের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার যতটুকু সাধ্য, জিহাদের জন্য সম্পদ পেশ করতে বলেছিলেন।

উসমান ইবনে আফফান রা.-এর মাহাত্ম্য

উসমান গনি রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে একশত উট এবং উটের জন্য যা প্রয়োজন তা এবং দুই শ উকিয়া রুপা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এমনকি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন—'আজকের পর উসমান যা করবে, তা তার কোনো ক্ষতি করবে না।' আল্লাহর রাসুলের ঐতিহাসিক এই উক্তির মধ্যে উসমান রা.-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রয়েছে।

আমি বরং বলতে চাই—এই বাক্যেটির মধ্যে তাদের জন্য ধমকি ও শিক্ষা রয়েছে, যারা তাকে নিয়ে কটাক্ষ করতে চায়, যারা বড়ো মুখে নির্লজ্জভাবে খিলাফতের জামানায় তার রাজনীতির নিন্দা করে এবং তার রাজনীতিকে দুর্বল অথবা স্বজনপ্রীতি বলে আখ্যা দিয়ে শতশত পৃষ্ঠা লিখে ভরে ফেলে। যেগুলো সুযোগসন্ধানী পশ্চিমাদের পাথেয় তৈরি করে দেয়—তাদের নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে চরিতার্থের জন্য। ইসলামি ইতিহাসের ওপর মিথ্যাচার, নিন্দা ও বিভ্রান্তির তির বর্ষণের একটা পথ তারা করে দেয় এগুলোর মাধ্যমে।

যারা নিজেদের সাত ধোয়া তুলসিপাতা জ্ঞান করে উসমান রা.-এর শানে বেয়াদবি করে এবং তার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে নিন্দা করে, তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হলো—আগে নিজের রোগ নির্ণয় করে এই মহান খলিফার জীবনী ও তার নৈতিক গুণাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে সে রোগের চিকিৎসা করা। আর খিলাফতকালে তার অবস্থা যা-ই থাকুক, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বলেছেন 'উসমানের কোনোই ক্ষতি করবে না আজকের পর সে যা করবে'—এরপরেও তার রাজনীতির ব্যাপারে কটূক্তি করা এবং তার শানে যা ইচ্ছা তা বলা কোন ধরনের শিষ্টাচার হতে পারে?

০২. আবু বকর রা.-এর ব্যাপারে একটি হাদিস ও মিথ্যাচার

আবু দাউদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি আমরা উল্লেখ করেছি, যে হাদিসটিতে বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর রা.-এর সমস্ত মাল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের খেদমতে পেশ করেন এবং নবিজি যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন—তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?

জবাবে তিনি বলেছিলেন—তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুল-কে রেখে এসেছি।

কেউ কেউ হাদিসটিতে এ কথাটি বাড়িয়েছে—

> নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে আবু বকর, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তুমিও কি তাঁর প্রতি খুশি?
>
> আবু বকর রা. কথাটি শুনে আনন্দে আবেগতাড়িত হয়ে এই বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নাচা আরম্ভ করলেন—কী করে আল্লাহর প্রতি আমি সন্তুষ্ট হব না?

হাদিসটার মনগড়া বর্ধিত এই অংশটুকু দিয়ে তারা জিকিরের হালাকায় নাচা ও লাফালাফি করার বৈধতার দলিল পেশ করে, যেমনটি বিভিন্ন ভন্ড সুফিরা করে থাকে। মূলত তারা যা দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে, তা মনগড়া বানোয়াট—যেমনটি উল্লেখ করেছি। কোনো সহিহ কিংবা দুর্বল হাদিসেও প্রমাণ নেই যে, আবু বকর সিদ্দিক রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এরূপ করেছেন।

বিষয়টিতে যা উল্লেখ হয়েছে তা *সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিজি ও মুসতাদরাক আল হাকিম*-এর ইবারত, তবে তাতে জয়িফ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, যেমনটি হাদিসটির সনদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছি। আর দলিল পেশকৃত বিষয়টির ক্ষেত্রে এ কথা বলব না যে, বিষয়টির কোনো দলিল নেই। বরং বাস্তব কথা হলো—বিষয়টি শরিয়তসম্মত না হওয়ার ব্যাপারেই দলিলটি সাব্যস্ত হয়েছে। নিম্নে বিষয়টির ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ পেশ করা হলো—

জুমহুর আলিমগণের মতে নাচানাচি 'হারাম', যদি তা হেলেদুলে করা হয়; অন্যথায় ফকিহগণের মতে, তা মাকরুহ।

সারকথা হলো—নাচাটা যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, তা হারাম বা মাকরুহ। এর ওপর তার প্রবেশ আল্লাহর জিকিরের মধ্যে ঘটানো চরম ধৃষ্টতা, এবং আল্লাহর জিকিরের বিকৃতি ঘটিয়ে এমন একে ইবাদতে রূপান্তরিত করা, শরিয়তে এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই।

আর ওই সকল সুফি, যাদের জিকিরে তারা উচ্চ আওয়াজে গ্যাঁ-গুঁ, হ্যাঁ-হুঁ শব্দ করে এমন কিছু বলে—যার না আছে কোনো অর্থ, আর না তার মর্ম। তারা এগুলো করে থাকে; সাথে ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র তাদের তাল ও মাতলামি আরও বাড়িয়ে দেয় এগুলো স্রেফ ভণ্ডামি।

অতএব, এগুলো কস্মিনকালেও ওই জিকির হতে পারে না, যার আদেশ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন এবং যে জিকির নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ করতেন। তাহলে এগুলো কী করে ইবাদত হতে পারে? অথচ ইবাদত তো তা-ই, যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অনুমোদন দিয়েছেন। কিংবা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা যা অনুমোদিত, যাতে কোনো প্রকার বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করা হয়নি। সুতরাং জেনে রাখা জরুরি—যা কিছু বলছি, তার ওপর স্বল্পসংখ্যক বিদআতি ছাড়া যুগে যুগে সকল ফুকাহাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ওই বিদআতিরা এমন কিছু বিষয়ের প্রবর্তন ঘটিয়েছে, যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো আদেশ দেননি। তারা আবেগের দোহাই দিয়ে এবং দায়মুক্ত হওয়ার নামে দুনিয়াবি স্বার্থোদ্ধারে ও কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য কত হারাম বিষয়কে হালাল সাব্যস্ত করেছে, এবং কত ধ্বংসাত্মক বিষয়ে যে লিপ্ত হয়েছে, যার কোনো ইয়ত্তা নেই। দেখুন, এ বিষয়ে ইলম তাকওয়া এবং তাসাউফের লাইনে মুসলিমদের বড়ো একজন ইমাম ইজ ইবনে আবদিস সালাম কী বলেন—

> সুতরাং নাচ, করতালি, অহংকার, নারীদের মতো অঙ্গ দুলিয়ে নাচার ভঙ্গিতে হেলাদুলা শুধু মিথ্যাবাদী অভিনয়কারী এবং ধূর্ত লম্পট লোকেরাই করে থাকে। গানবাজনার তালে তালে বিবেক-বুদ্ধিহীন ওইসব লোকেরা এমন কাজ কী করে করে?
>
> অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'সবচেয়ে উত্তম যুগ হচ্ছে আমার যুগ, তারপর তার পরের (তাবিয়িদের) যুগ, তারপর তার পরের (তাবে তাবিয়িদের) যুগ।' অথচ এই তিন যুগের কেউই এসব করেনি।[২০১] এরপরও তারা কী করে এসব বৈধ বলে!

---

২০১ *কাওয়াইদুল আহকাম ফি মাসালিহিল আনাম*, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা : ১৮৬

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তার কিতাব *কাফফুর রিআ,* এবং ইবনে আবুদিন তার কিতাবের *হাশিয়ায়*[২০২] এরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আর ইমাম কুরতুবি রহ. এ ধরনের বিদআত থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। পাঠক চাইলে তার কিতাবে সুরা আলে ইমরানের ১৯১ নং আয়াত এবং সুরা বনি ইসরাইলের ১৭/৩৭ নং আয়াতের তাফসির দেখে নিতে পারেন। যদি কিতাবটি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে এই বিষয়ে বড়ো বড়ো ইমাম ও ফকিহদের অনেক বর্ণনা উল্লেখ করতাম। তাহলে আরও স্পষ্ট হয়ে যেত যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জুমহুর উলামা ও ফুকাহায়ে কিরাম যে বিষয়টিতে ঐকমত্যে পোষণ করেছেন, সেটাই ঠিক। তাতে কোনো দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্যে নেই।[২০৩]

---

২০২ 'হাশিয়া' কিতাবটি হলো 'হাশিয়ায়ে ইবনে আবুদিন'; যেটি ফিকহে হানাফির ফাতওয়া-বিষয়ক একটি গ্রহণযোগ্য প্রধান কিতাব। উপমহাদেশীয় আলিমসমাজ ও সাধারণ মুসলিমরা একে *ফাতওয়ায়ে শামি* নামে চিনে থাকেন।

২০৩ এখানে কেউ হয়তো এ ধারণা করে বসতে পারে যে, আমি তাদের অনেক মতকে অস্বীকার করছি। আবার কখনো তাদের পক্ষও নিচ্ছি অন্যদের মতকে অস্বীকার করার জন্য। আমি বলব—এটা নিছক ভুল ধারণা বৈ কিছু নয়, যা একজন মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়। এবং একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য মাজহাব কিংবা দলের টানে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রতিপক্ষকে দুশমন ভাবাও উচিত নয়।

মনে রাখতে হবে—'সত্য'-কে সকল দল-মত ও মাজহাবের উর্ধ্বে রাখতে হবে। ইসলামে অবৈধভাবে স্বজনপ্রীতি ও দলীয় টানের কোনোই স্থান নেই। একজন মুসলিমের জন্য ইলমি আলোচনার সময় উচিত নয় কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্যকিছু সামনে রাখা। এবং কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা তার মন-মগজ প্রভাবিত হওয়া ও বৈধ নয়। আর যখন কোনো মুসলিম হককে আঁকড়ে সামনে রেখে বাস্তব দলিলভিত্তিক কথা বলে, তখন কোনো মুসলিমের জন্য উচিত তার কথায় বিরক্ত হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে শত্রুতায় মেতে ওঠা। আর এই কিতাবটিতে মাসয়ালা আলোচনা করতে গিয়ে কারও সাথে মতানৈক্যের পর্যায়ে চলে গেছি; মূলত তা এজন্য নয় যে, আমি মতানৈক্যে করতে পছন্দ করি। বরং আল্লাহ স্বাক্ষী, তা করেছি শুধু কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার খাতিরে। এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য।

হ্যাঁ, হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হতে পারে; আমি যদি তা করে থাকি, তাহলে তা আলোচনাযোগ্য। আমি এখানে শুধু আমার মতানৈক্যর কারণ যা, তাই-ই বলেছি। আর এখন যদি কোনো মাসয়ালা আলোচনা করতে গিয়ে কারও অনুকূলে এবং সাধারণ মুসলিম অথবা সুফিদের প্রতিকূলে চলে যাই, তাহলে এটাও এজন্য নয় যে, আমি তাদের সাথে মতানৈক্যেপরায়ণ ও তাদের নিন্দাপরায়ণ; বরং মতানৈক্য করেছি শুধু এজন্য যে, কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ থেকে যেন বিচ্যুত না হই। তবে সাথে সাথে তাদের অনেকেরই প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখেছি—তাদের সংশোধনের বিষয়ের প্রতি এবং তাদের খালেছ নিয়তের প্রতি বিশ্বাস রেখে।

তবে হ্যাঁ, আমার ওজর হলো, আমি তাদের সম্মানার্থে কুরআন-সুন্নাহ, মূলনীতি এবং ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে যদি মুসলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এবং তার মাপকাঠিতে সত্যকে অনুসন্ধান করত, তাহলে পরস্পরে মাঝে এত মতানৈক্যে, মনকষাকষি ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো না। মত ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হতে পারে, এটা স্বাভাবিক; কিন্তু পক্ষপাতিত্ব এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িই মূলত মুসলিম জাতিকে এই কঠিন পর্যায় এনে পৌঁছিয়েছেন।—লেখক।

সুফিরা ধারণা করে—তাদের প্রতিপক্ষরা তাদের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতিত্ব করছে। অথচ তারা এ বিষয়টি একটু ভেবে দেখে না যে—তারা কী পরিমাণ বাড়াবাড়ি ও বিদআতমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছে; ইসলামে যার কোনো ঠাঁই নেই!

আর হক যেরূপ হওয়া উচিত, তাদের এই মতাদর্শই কি সেই হক? তারা কি দলীয় টান ও পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে আমানতের সাথে কুরআন-সুন্নাহর দলিল দিয়ে বলতে পারবে যে—তাদের মত ঠিক?

আসলে কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাতে আরও বাড়াবাড়িরই সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে আল্লাহর দ্বীন ও রাসুলের আদর্শের বিজয় চায়, সে যেন সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, স্বজনপ্রীতি ও বিদআতের শিকড় কেটে দেয়। কেননা এটাই হলো মূলত সঠিক চিকিৎসা।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, জিকিরকারী যদি নিজ স্বাভাবিক অবস্থা হতে বেরিয়ে এমন পর্যায় পৌঁছে যায় যে, অনুভুতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। যেহেতু উক্তাবস্থায় তার ওপর শরয়ি হুকুম থাকে না। আর ইজ্জ ইবনে আবদিস সালামকেও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কেননা, কেউ কেউ বলে—একবার তিনি কোনো কারণবশত উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে লাফাতে শুরু করেছিলেন। পাঠক হয়তো বলতে পারেন, তার কিতাব থেকে আমি বিভিন্ন উদ্বৃতি দিয়েছি, এমন একজন ব্যক্তি কী করে এরূপ করতে পারে। সুতরাং, তাদের অবগতির জন্যই বলছি—তিনি ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করেননি।[২০৪]

০৩.মুনাফিকদের ক্ষতিকর স্বভাব

এই যুদ্ধের বিষয়ে এত পরিমাণ আয়াত, হাদিস এবং মন্তব্য রয়েছে—যা অন্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে নেই। সুরা তাওবার অনেক আয়াতে, বরং অনেক পৃষ্ঠাজুড়ে এ যুদ্ধের আলোচনা রয়েছে। আর এর অধিকাংশ আয়াতই আল্লাহর রাস্তায় জানমাল দিয়ে জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা করেছে। আর এই জিহাদই একমাত্র প্রমাণ মুসলিমের ঈমানের সত্যতার ক্ষেত্রে। এবং এটাই মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে বড়ো পার্থক্যকারী। মুসলিম যদি প্রকৃতই মুমিন হয়ে থাকে, তাহলে তার ওপর আবশ্যক হলো—আরাম-আয়েশে জড়িয়ে না পড়া, এবং আল্লাহর রাহে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হলে হীনবল না হওয়া, ভেঙে না পড়া।

---

২০৪ আল্লামা ইবনে হাজার রচিত *কাফফুর রিআ* : ৪৮

আর সাথে সাথে এই সুরাটি মুনাফিকদের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছে। তাদের খারাপ নিয়ত এবং অসৎ উদ্দেশ্যে ও গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছে। প্রতি যুগে মুমিনদের জন্য মুনাফিকরা কতটা বিপজ্জনক এবং তাদের নিফাকের বিষয়টা কতটা ভয়াবহ—সেটাও খোলাসা করে দিয়েছে। আর এটাও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে—ইসলাম হলো এমন একটি দাবি, যাকে সত্যায়ন করবে জিহাদ এবং কঠিন পরীক্ষা ও বিপদাপদ। যাতে করে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে এবং মুমিনদের ঈমান ও মুনাফিকদের প্রতারণার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তাবুক যুদ্ধটা মূলত এই কুরআনি শিক্ষার জন্য বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ একটা উপকরণ।

কেননা, এই তাবুক যুদ্ধের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের থেকে এমন এক মহাপরীক্ষা নিয়েছেন, যার দ্বারা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মদিনায় কে খাঁটি মুমিন আর কে মুনাফিক। এরপর আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে আয়াত নাজিল করে একে একে তাদের সকল অপরাধগুলো স্পষ্ট করে দেন এবং তাদের গোপন ভেদও প্রকাশ করে দেন। সাথে সাথে মুমিনদের প্রতিটা সময়, প্রতিটা যুগে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে বলেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা—

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল, তারা রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতে আনন্দবোধ করল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল। অধিকন্তু বলতে লাগল—'তোমরা গরমে (জিহাদে) বের হয়ো না।' তুমি বলে দাও—'জাহান্নামের আগুন (এরচেয়ে) অধিকতর গরম'; যদি তারা বুঝতে পারত!

অতএব, তারা (দুনিয়াতে) অল্প হাসি হাসুক, আর (আখিরাতে) অনেক কাঁদা কাঁদতে থাকুক, সেই কাজের প্রতিফলস্বরূপ—যা তারা করত। আল্লাহ যদি তোমাকে (মদিনায়) তাদের কোনো সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা (কোনো জিহাদে) বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি (তাদের) বলো—'তোমরা কখনো আমার সাথে (কোনো জিহাদে) বের হবে না এবং আমার সাথি হয়ে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না; তোমরা প্রথমবারে বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে; অতএব, তোমরা ওইসব লোকেদের সাথে বসে থাকো, যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।'[২০৫]

আয়াতগুলোর পূর্বাপর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তাতে মুনাফিকদের বিষয়টি নিয়ে এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব ও জোরালোভাবে আলোচনা করেছে। এটা মূলত এজন্য যে, মুসলিমরা বেশির ভাগ সময়ে মুনাফিকদের থেকেই বিপদাপদের শিকার হয়েছে। আর শত্রুরাও মুনাফিকদের সহায়তায় নিফাকের ফাঁক গলিয়ে মুসলিমদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে অনেক ক্ষতিসাধন করেছে। বাস্তবিকভাবে মুসলিমগণ শত্রুর তুলনায় মুনফিকদের দ্বারা বেশি প্রতারিত হয়। আর মুসলিমদের যত দুর্গতি ও বিপদাপদ এবং পরস্পরে দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদ—তা মুনাফিকদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন—

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করত না, আর অশ্ব ছুটাত তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ জালিমদের ভালোভাবেই জানেন।[২০৬]

বলতে গেলে (তারাই) মুনাফিকরাই হলো ফিতনা-ফ্যাসাদের উৎস ও মূল হোতা। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় কুরআনের নামে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কুরআনের অস্ত্র দিয়ে। এবং কুরআনে যেই বিধিবিধান রয়েছে, সংশোধন, চর্চা

---

২০৫ সুরা তাওবা, আয়াত : ৮১, ৮২ ও ৮৩

২০৬ সুরা তাওবা, আয়াত : ৪৮

ও শরিয়তকে আঁকড়ে ধরার নামে তারা তা নিয়ে তামাশা করে। এবং তা থেকে তারা মনগড়া ফতওয়া বের করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, কিংবা তাদের লিডার ও ধনবানদের নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে। সুতরাং কুরআনি এই আলোচনা থেকে মুসলিমদের যেই শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, তা হলো—বহিরাগত শত্রুদের থেকে যদি তারা একবার সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে, তাহলে মুনাফিকদের ব্যাপারে যেন তারা হাজারবার সতর্ক থাকে। বাইরের শত্রুদের পূর্বে মুনাফিকদের সাথে যেন প্রথম যুদ্ধ করে, যখন তাদের থেকে নিফাক প্রকাশ পায়।

০৪. জিজিয়া আদায় ও আহলে কিতাব

আহলে কিতাবদের থেকে ট্যাক্স নেওয়ার বৈধতার ব্যাপারে এ যুদ্ধ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে তারা জান ও মাল রক্ষা করে। সকলের হয়তো ইতিহাসটা জানা আছে যে, নবিজি তাবুক প্রান্তে পৌঁছতেই ভয়ে রোম সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছিল। অতঃপর, তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিনামা লিখে তাদের প্রদান করেন।

জিজিয়া আসলে কী

জিজিয়া হলো আর্থিক ট্যাক্স—যা আহলে কিতাবদের জন্য জাকাতস্বরূপ, মুসলিমদের সম্পদের জাকাতের মতো। তবে ট্যাক্স ও জাকাতের মাঝে পার্থক্য হলো, ট্যাক্স দেওয়া হয় বিচারিক ভিত্তিতে, আর জাকাত হলো বিচারিক ও ধর্মীয় উভয় ভিত্তিতে। জিজিয়া প্রদানকারীদের ইসলামি সমাজে ইসলামের বিচারিক হুকুমের আওতায় গণ্য করা হয়; যদিও বিশ্বাসগতভাবে তারা ইসলাম কবুল করেনি। এজন্য তাদের জন্য আবশ্যক হলো—প্রকাশ্যভাবে ইসলামি সাধারণ নিয়মকানুনের সাংঘর্ষিক কিছু না করা। তবে যে সকল জিনিস তাদের ধর্মে বৈধ, তা করতে করতে পারে। যেমন : মদপান ইত্যাদি।

আর জিজিয়ার ক্ষেত্রে আহলে কিতাব এবং অগ্নিপূজক ও নাস্তিক-মুরতাদদের মাঝে পার্থক্য হলো—আহলে কিতাবরা নিজ ধর্ম মেনে চলার সাথে সাথে ইসলামি সমাজ ও ইসলামি আইনকানুনের সাথে সংগতি বজায় রেখে চলতে পারে। পক্ষান্তরে নাস্তিক-মুরতাদ, অগ্নি ও প্রতিমাপূজকেরা তা পারে না। কেননা, তাদের চিন্তাধারা ইসলামি সরকার ও ইসলামি নিয়মনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। আর ইসলামের প্রতি ঘৃণা শত্রুতা তাদের শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে রয়েছে।

০৫. আজাবে ধ্বংস হওয়া এলাকায় গমনাগমন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামুদ জাতির বাসস্থান এলাকা অতিক্রম করার সময় যে কথাটি বলেছিলেন—তা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, কুফরির কারণে আল্লাহর গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো জাতির বিরান ঘরবাড়িতে প্রবেশ করা কিংবা তাদের কোনো চিহ্ন বা নিদর্শনের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় যদি কোনো মুসলিম তাদের এই অবস্থা ও পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং আল্লাহর কাছে নিজের এবং সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ও রহমত কামনা না করে, তাহলে মাকরুহ হবে। যেহেতু তাদের অবশিষ্ট চিহ্ন ও ঘরবাড়িগুলো আল্লাহর গজবের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। এবং প্রতিটি ধ্বংসাবশেষে আল্লাহর গজবের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে, আর তা কিয়ামত অবধি বাকি থাকবে। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মহান আল্লাহ এ সকল নিদর্শন জমিনে রেখে দিয়েছেন; যেন জ্ঞানীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, যেভাবে এই বিষয়টি তিনি পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ উপদেশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া ভ্রমন ও তামাশাচ্ছলে ওখান দিয়ে অতিক্রম করে এবং ওইগুলোকে নিছক চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ মনে করে, তাহলে তা কত বড়ো ভুল—যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটু লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে কতই-না নিদর্শন রয়েছে! যার প্রতিধ্বনি মানুষের কানে যেন অবিরাম গুঞ্জরিত হচ্ছে—'হে জ্ঞানীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' কিন্তু মানুষ তা শোনে না। সে ওগুলোর ভাষায় শুনতে পায় শয়তানের কুমন্ত্রণা! তারা তা থেকে গ্রহণ করে তার শিল্পনৈপুণ্য এবং প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য।

০৬. সাহাবি ও মুনাফিকের সাথে নবিজির নীতির পার্থক্য

পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, অনেক মুনাফিক যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিল। নবিজির যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তারা এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত পেশ করতে থাকে। তবুও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং বাহ্যিক বিষয়গুলো গ্রহণ করে গোপন ভেদগুলো আল্লাহর কাছে সঁপে দেন।

অল্পসংখ্যক খাঁটি মুমিনও মদিনায় রয়ে গিয়েছিল, তবে তাদের মনে কোনো নিফাক ছিল না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তারাও তাঁর দরবারে হাজির হলো। তবে তারা মুনাফিকদের মতো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা ওজর

পেশ করেনি। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমা চাইল, এতৎত্ত্বেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমা করলেন না। শাস্তি দিলেন।

আপনার অবশ্যই জানা আছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কত কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন! কিন্তু কেন? কেন তিনি মুনাফিকদের সাথে কোমল আচরণ করলেন এবং তাদের ক্ষমা করে দিলেন? আর খাঁটি মুসলিমদের তো মাফ করলেনই না, উলটো বরং তাদের সাথে কঠোরতা করলেন, তাদের শাস্তি দিলেন?

এর জবাব হলো—এ স্থানে তাদের সাথে কঠোরতা করাটা মূলত তাদের সম্মানের বহিঃপ্রকাশ। মুনাফিকরা তো এর যোগ্যই না। সুতরাং তাদের তাওবা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের ক্ষমার ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাজিল হবে—এর যোগ্য তারা কী করে হতে পারে?

বিধানমতে, সর্বাবস্থায় মুনাফিকরা কাফির। দুনিয়াতে তাদের ছদ্ম ঈমান কিয়ামাতের দিন জাহান্নামের তলদেশ থেকে কিছুতেই তাদের রক্ষা করবে না। যদিও তাদের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ করে আল্লাহ তাদের মুনাফিক বলে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এবং তাদের বাহ্যিক অবস্থানুযায়ী তাদের ওপর দুনিয়াবি হুকুম প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। আর যা তাদের গোপনীয় বিষয়, তার মুআমালা আল্লাহর সাথে।
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাউজি রহ. বলেন—

> আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে অপরাধের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এরূপই করেন। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাকে তিনি সামান্য পদস্খলনের কারণে একটু শাস্তি দিয়ে থাকেন, ফলে মুমিন বান্দা সতর্ক ও চৌকান্না হয়ে যায়।
>
> পক্ষান্তরে যে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়, তথা যার প্রতি তিনি রাগান্বিত, তিনি তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেন। ফলে যখনই সে একটা পাপ করে, তার জন্য একটা নিয়ামতের ব্যবস্থা করে দেন।[২০৭]

অর্থাৎ তার প্রাপ্য সে দুনিয়াতে পেয়ে যায়। আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকে না; কিন্তু তিনি যাকে ভালোবাসেন, দুনিয়াতেই তাকে সামান্য শাস্তি দিয়ে সতর্ক করে দেন—যেন তাওবা করে তার দিকে ফিরে আসে।

---

২০৭ *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০

কাব ইবনে মালিক রা.-এর ব্যাপারে যে দীর্ঘ হাদিসটি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাতে প্রচুর শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতও রয়েছে, যার কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

প্রথমত : দ্বীনের খাতিরে বয়কট এবং কাউকে ত্যাগ করা বৈধ। যেমন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাব রা. এবং তার আরও দুজন সঙ্গীর সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ কথা বলতে সকল সাহাবিকে নিষেধ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন—

> এতে এটাও প্রমাণ হয় যে, যাকে পরিত্যাগ করা হবে, তার সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়।[২০৮]

ইবনুল কাইয়িম রহ. কাব রা.-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকে বিষয়টি সাব্যস্ত করেন—

> কাব রা. বলেন—আমি বাইরে বের হতাম এবং মুসলিমদের সাথে জামাতে সালাত আদায় করতাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করে বসলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে লক্ষ করতে লাগলাম যে, হুজুরের ঠোঁট নড়ে কি না? তিনি সালামের জবাব দিচ্ছেন কি না!
>
> অতএব, জবাব দেওয়া ওয়াজিব হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তাকে শুনিয়ে তার সালামের জবাব দিতেন।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর পক্ষ থেকে কাব রা.-এর আরেকটি পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষাটি ঠিক কেমন ছিল, তা গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত—যাতে শেখা যায় যে, আল্লাহর প্রতি একজন মুসলিমের ঈমান কেমন হওয়া উচিত।

পাঠক লক্ষ করেছেন—

> 'গাস্সানের' বাদশাহ তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন এই বলে—কাব, তোমার থেকে বিমুখ হয়ে সবাই তোমাকে ত্যাগ করেছে। এবং কষ্ট দিয়েছে তোমাকে। আমার কাছে আমাদের দেশে চলে আসো, তুমি এখানে অনেক সম্মান পাবে। অনেক সুখে থাকতে পারবে।

---

২০৮ *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০

এই পরীক্ষা কাবের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন ছিল; কিন্তু এই কঠিন পরীক্ষা তার ঈমান কিঞ্চিৎ পরিমাণও কমাতে পারেনি; বরং তার প্রতিপালকের প্রতি তার ঈমান আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তার প্রতি একনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা আরও দ্বিগুণ এবং মজবুত করেছে।

কাব রা. থেকে যেরূপ পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, এই রকম পরীক্ষার পিচ্ছিল পথে কত পা যে পিছলে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই; কিন্তু কাব রা. সীমাহীন ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সামান্যতম তার পদস্খলন ঘটেনি।

তৃতীয়ত : সিজদায়ে শোকর শরিয়ত স্বীকৃত হওয়া। কাব রা. যখন শুনতে পেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেছেন, তখন তিনি সিজদা করেছিলেন, সিজদায়ে শোকর। এখানে সিজদায়ে শোকরের বৈধতা প্রমাণ হয়। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন—

মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে আবু বকর রা. সিজদায়ে শোকর করেছিলেন। আলি রা. জু-স সাদইয়াইনকে খারিজি সম্প্রদায়ের মাঝে নিহত পেয়ে সিজদায়ে শোকর আদায় করেছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন জিবরাইল সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি একবার যে দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।[২০৯]

চতুর্থত : আরও একটি মাসয়ালা এখান থেকে প্রতীয়মান হয়, তা হলো—ইমাম জুফার ব্যতীত সকল হানাফি ইমামদের মত হলো—কেউ তার পুরো সম্পদ সাদাকা করে দেওয়ার মান্নত করলে তার ওপর সব দেওয়া আবশ্যক হবে না। (জাকাত পরিমাণ আবশ্যক হবে।)

এক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো—কাব রা. তার তাওবা কবুল হওয়ার কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেছিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য সাদাকা করে দেওয়ার ইচ্ছে করেছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন—কিছু সম্পদ রেখে দাও।

---

২০৯ জাদুল মাআদ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা : ২২

আর যারা বলেন—মান্নত করার কারণে তার সমস্ত সম্পদ সাদাকা করে দেওয়া আবশ্যক হয়ে গেছে, তাদের দলিল হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে সাদাকা করার জন্য মান্নত করাটা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং উদ্দেশ্যে ছিল পরামর্শ করা। ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন—কিছু সম্পদ সাদাকা করলেই হবে।[২১০]

কাব ইবনে মালিক রা.-এর কথার পূর্বাপর এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব বোঝার ক্ষেত্রে এ মতটাই হয়তো সঠিকের সবচেয়ে কাছাকাছি।

* * *

২১০ ইমাম সারাখসি রহ.-এর *মাবসুত*, খণ্ড : ১২ পৃষ্ঠা : ৯৩; এবং ইবনে কাইয়িম রহ.-এর *জাদুল মাআদ*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা : ২৩; আরও দেখুন—লেখকের কিতাব *জাওয়াবিতুল মাসলাহা* : ২৪৪ ও ৩৮৪

৯ম হিজরি : আবু বকর রা.-এর হজ পালন

মক্কায় মুশরিকদের হজ বন্ধ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক প্রান্তর থেকে ফিরে এসে হজ পালন করার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন—মুশরিকরা কাবা শরিফে এসে বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করে। অতএব, এমন কাজ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হজ করাটা আমার পছন্দ হয় না।

এরপর তিনি আলি রা.-কে সঙ্গী আবু বকর রা.-কে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠালেন যে, তিনি যেন গিয়ে মক্কায় ঘোষণা করেন—মুশরিকদের এ বছরের পর থেকে হজ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। এবং তাদের ইসলামে প্রবেশের জন্য চার মাস সময় বেধে দেওয়া হচ্ছে। চার মাস পর যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ তাদের সামনে থাকবে না।

ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল মাগাজি অধ্যায়ে আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

> আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে একদল মুসলিমসহ বিদায় হজের পূর্বে কুরবানির দিন মক্কায় পাঠানো হয় মানুষের মাঝে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য—'কোনো মুশরিক যেন এই বছরের পর থেকে আর হজ না করে এবং বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ যেন না করে।'

মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরজি প্রমুখ রাবিদের থেকে বর্ণিত আছে, ৯ম হিজরির হজের মৌসুমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রা.-কে আমির বানিয়ে পাঠালেন। এবং আলি রা.-কে পাঠালেন সুরা তাওবার ৩০ কিংবা ৪০টি আয়াতের ঘোষণা মানুষকে শোনানোর জন্য। আলি রা. আরাফার দিন তা লোকদের পাঠ করে শোনালেন। তাতে মুশরিকদের চার মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। অর্থাৎ জিলহজ মাসের ২০ দিন, মুহাররম, সফর, রবিউল আওয়াল, আর রবিউস সানির ১০ দিন। আলি রা. আয়াতগুলো তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে পাঠ করে শোনান এবং ঘোষণা দেন—'এ বছরের পর থেকে কোনো মুশরিক যেন হজ না করে এবং বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ ও যেন না করে।'

সারকথা হলো—আল্লাহ মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দায়িত্ব প্রদান করলেন—তিনি যেন হজের মৌসুমে চার ধারাসংবলিত ঘোষণাপত্রসহ এ আয়াতগুলো পাঠ করার জন্য এক ব্যক্তিকে পবিত্র মক্কায় পাঠান। এসব আয়াতে মুশরিকদের যে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয় এবং (চুক্তি সম্পাদনকারীরা যেসব চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে এবং কার্যত লঙ্ঘন করেনি, কেবল সেসব চুক্তি ছাড়া) সব চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং মুশরিক নেতারা ও তাদের অনুসারীদের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়—চার মাসের মধ্যে তাওহিদি আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি হুকুমতের সাথে যেন নিজেদের সম্পর্ক ও দায়িত্বটা সুস্পষ্ট করে নেয় এবং তারা যদি এ চার মাস সময়সীমার মধ্যে শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ না করে, তাহলে তাদের থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হবে। সুরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এ বিষয়টিই প্রমাণ করে—

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾

আর হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্যও কল্যাণকর; আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে

তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।[২১১]

ইবনে সাআদ বর্ণনা করেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু বকর রা.-কে হজের জন্য আমির নির্বাচন করেন, তখন তিনি তিনশত মদিনাবাসীকে সাথে নিয়ে বের হন। এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানির জন্য বিশটি উটকে মালা পরিয়ে এবং নিদর্শন লাগিয়ে তার সঙ্গে দেন।

* * *

২১১ সুরা তাওবা, আয়াত : ৩

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

০১. মুশরিকদের হজ পালনে বাধা দেওয়ার কারণ

পাঠক নিশ্চয়ই জেনেছেন—হজ এমন একটি ইবাদত, যা আরবরা ইবরাহিম আ. থেকে ওয়ারিশসূত্রে পেয়েছে। ফলে তাদের মাঝে অবশিষ্ট থাকা এই হজটাই নিরঙ্কুশ একটা ইবাদত ছিল, যা তারা অব্যাহতভাবে পালন করে আসছিল।

তবে জাহিলিয়াতের অনেক নোংরা প্রথা পৌত্তলিকতা এবং শিরক তাতে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে হজটা তাওহিদি আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত ইবাদতের চেয়ে শিরকের সাথে অত্যধিক সাদৃশপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

ইবনে আয়িজ উল্লেখ করেন—

> মুশরিকরা মুসলিমদের সাথেই হজ আদায় করত। তবে তারা মুসলিমদের বিরোধিতা এবং তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য উচ্চ আওয়াজে পড়ত 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, তোমার কোনো শরিক নেই। তবে শুধু ওই শরিক, যার মালিক তুমি এবং যার সকল ক্ষমতা ও অধীনদেরও মালিক তুমি।'

ইবনে আয়েজ আরও উল্লেখ করে বলেন—

> মক্কার মুশরকিরা হজ করার সময় বিবস্ত্র হয়ে হজ করত। তারা মনে করত যে, এই কাপড় পরে তারা বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হয়, সুতরাং এই কাপড় পরে বাইতুল্লায় প্রবেশ করাটা বাইতুল্লাহর সাথে চরম বেয়াদবি। তাই তারা বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করাটা বাইতুল্লার জন্য সম্মান মনে করত। তারা বলত—আমরা যেভাবে জন্মলাভ করেছি, সেভাবেই

হজ করতে এসেছি। আমাদের পরনে কোনো কাপড় নেই, যাতে গুনাহ ও জুলুমের সংমিশ্রণ ঘটেছে।"[২১২]

নোংরামি শিরক ও পৌত্তলিকতার এই ধারা হিজরতের নবম বর্ষ পর্যন্ত অব্যাহত রইল। এরপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রা.-কে মক্কাভিমুখে পাঠালেন মুশরিকদের ঘোষণাপত্র শোনানোর জন্য। এবং কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত কুপ্রথা ও নোংরামি থেকে মাসজিদে হারামকে পবিত্র করার জন্য।

০২. যুদ্ধের ঘোষণার মাধ্যমে সন্ধিচুক্তির সমাপ্তি

জ্ঞাতব্য যে, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও অন্য সিরাতবিশারদদের বর্ণনামতে, তৎকালীন যুগে মুশরিকদের দুটি প্রকার ছিল—

- **এক.** ওই সকল মুশরিক, যাদের মাঝে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে চার মাসের চেয়েও কম সময়ের জন্য চুক্তি ছিল। এ প্রকারের মুশরিকদের মাঝে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।
- **দুই.** ওই সকল মুশরিক, যাদের মাঝে ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি ছিল।

অতঃপর সুরা তাওবায় তাদের চুক্তির সময়সীমা চার মাস বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর চুক্তির মেয়াদ শেষে যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদের ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে। আর এই চুক্তির মেয়াদটা নবম হিজরির আরাফার দিন থেকে শুরু করে রবিউস সানির ১০ তারিখ পর্যন্ত ছিল।

কালবি রহ. বলেন—চার মাসের সময় ওই সকল মুশরিকদের দেওয়া হয়েছিল, যাদের মাঝে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে চার মাসের কম মেয়াদে চুক্তি ছিল। আর যে সকল মুশরিকদের মাঝে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে চুক্তির মেয়াদ ছিল চার মাসের চেয়ে বেশি, আল্লাহ তায়ালা তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ঘোষণা দেন। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা—

---

২১২ বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইবনে সায়্যিদিন নাসের 'উয়ূনুল আসার' কিতাবটি।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।[৩৩]

তবে প্রথম মতটাই ঠিক। কারণ, তার মতের সমর্থনে সুরা তাওবায় নতুন কিছু নেই; বরং তাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুশরিকদের মাঝে চলমান চুক্তির ক্ষেত্রে তাকিদ পাওয়া যায়, সুতরাং সুরা তাওবা চুক্তির মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটায়নি এবং তাতে নতুন কিছু সংযোজনও করেনি।

০৩. আক্রমণাত্মক জিহাদের মাসয়ালা

অবশ্যই লক্ষ করেছেন—সুরা তাওবায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বোঝানো হয়েছে—ইসলামি শরিয়তে জিহাদ মানে শুধু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকেই বোঝায় না; যেমনটি প্রাচ্যবিদরা ধারণা করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা মুশরিক এবং মক্কার আশেপাশে থাকা নজদ ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিকদের সতর্ক করে ঘোষণা করে—

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

---

৩৩ সুরা তাওবা, আয়াত : ৪

الْمُتَّقِينَ ۝١ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٥

সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ করো এ দেশে চার মাস কাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্যও কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেওয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ করো। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাকো; কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চিয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২১৪]

স্পষ্ট ও অকাট্য এ আয়াতগুলো কারও মনে এ অবকাশ রাখেনি যে, সে ইসলামে জিহাদকে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ভাববে। আর পাঠকেরও নিশ্চয়ই জানা আছে—

---

২১৪ সূরা তাওবা, আয়াত : ১-৫

সুরা তাওবা সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তার অধিকাংশ বিধানই জিহাদসংক্রান্ত।

অনেকে বলে থাকে যে, সুরা তাওবার উল্লেখিত আয়াত, যেগুলো দ্বারা ইকদামি জিহাদ প্রমাণিত হয়, তা সুরা হজের ৩৯ নং আয়াত দ্বারা আবার মানসুখ তথা রহিত হয়ে গেছে। আয়াতটি এই—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

> অনুমতি দেওয়া হলো তাদের, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে; কেননা, তারা মজলুম এবং আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।[২১৫]

আমি মনে করি, তাদের দাবিটা নিতান্তই ভুল। কেননা, জিহাদটা মৌলিকভাবে শরিয়তস্বীকৃত হওয়ার সময় প্রতিরক্ষামূলক ও ইকদামি জিহাদের দিকে লক্ষ্যে করে শরিয়তস্বীকৃত হয়নি; বরং তা শরিয়তস্বীকৃত হয়েছে ইলায়ে কালিমাতিল্লাহ তথা দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে। এবং ইসলামি সমাজের অবকাঠামো মজবুতকরণ এবং জমিনে আল্লাহর আইন জারি করার জন্য। অতএব, উক্ত বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্য যেই মাধ্যম গ্রহণ করা জরুরি, তা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক।

কখনো কখনো কোনো পরিস্থিতির কারণে জিহাদের মাধ্যমটা হয় সন্ধিচুক্তি, কিংবা ওয়াজ-নসিহত ও শিক্ষার প্রচার। তাই মাধ্যমগুলোকেই কখনো কখনো জিহাদ বলে গণ্য করা হয়। আবার কখনো অবস্থাভেদে তালিম-ওয়াজ-নসিহত এবং প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধই জিহাদের মাধ্যম হয়, আর এটাই তখন শরিয়তসিদ্ধ জিহাদ। আবার কখনো পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে আক্রমণাত্মক যুদ্ধই জিহাদের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তখন এটা হয় জিহাদের সর্বোচ্চ চূড়া, সর্বোত্তম জিহাদ। তবে পরিস্থিতির অনুমান ও পর্যবেক্ষণ করে জিহাদের মাধ্যম নির্ধারণ করার দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের। তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। এবং অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ও মুসলিমদের জন্য মুখলিস হতে হবে।

---

২১৫ সুরা হজ, আয়াত : ৩৯

সুতরাং বোঝা গেল, জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই মাধ্যম তিনটি শরিয়তস্বীকৃত। তবে অবস্থাভেদে, প্রেক্ষাপট বুঝে মুসলিম বিচক্ষণ শাসক তার কোনো একটি নির্ধারণ করে জিহাদের বাস্তবায়ন ঘটাবে। সুতরাং বোঝা গেল, আক্রমণাত্মক জিহাদ রহিত হয়নি।...

আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর হজ মুসলিমদের জন্য শিক্ষা এবং কুরবানির মূলনীতি ও পদ্ধতিস্বরূপ। এ ছাড়া ও তা ইসলামের হজ ও বিদায় হজের (যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য ভূমিকা ছিল।

* * *

মসজিদে জিরার

আবু আমির রাহিব

ইবনে কাসির রহ. সায়িদ ইবনে জুবাইর এবং কাতাদা ও উরওয়া প্রমুখ রাবিদের সূত্রে বর্ণনা করেন—মদিনায় খাজরাজ গোত্রের একজন লোক ছিল। নাম আবু আমির রাহিব। সে জাহিলি যুগে নাসারা হয়ে যায়। খাজরাজ গোত্রে তার খুব দাপট ও সম্মান ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় তাশরিফ আনার ফলে তখন মুসলিমগণ তাঁর নিকট সমবেত হয় এবং ইসলাম দ্রুতবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করল।

এরপর একদিন সে মক্কাভিমুখে পালিয়ে গিয়ে কুরাইশদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উসকানি দেওয়া আরম্ভ করল। অতঃপর যখন সে দেখতে পেল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি মিশন দিনদিন এগিয়ে যাচ্ছে, সমুন্নত হচ্ছে ইসলামের কালিমা, তখন দ্রুত সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে পৌঁছে এবং নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তার সাহায্য চায়; সে তাকে সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দিলে তার কাছে সে অবস্থান করে। অতঃপর মদিনায় তার গোত্রেরই একদল মুনাফিকের কাছে চিঠি লিখে হিরাক্লিয়াসের সাহায্যর বিষয়টি জানায় এবং তাদের একটা ঘাঁটি স্থাপন করারও নির্দেশ দেয়। যাতে করে সেখানে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সলাপরামর্শ এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারে।

ষড়যন্ত্রের মসজিদ নির্মাণ

অতঃপর মুনাফিকের দলটি মসজিদে কুবার নিকটেই একটা মসজিদ নির্মাণ শুরু করে দেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের প্রান্তে রওনা হওয়ার পূর্বেই তারা মসজিদ নির্মাণকাজ শেষ করে ফেলে। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায়ের মাধ্যমে মসজিদটি উদ্বোধন করে দেওয়ার আবেদন জানায়।

তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানায় যে, মসজিদটি তারা ওই সকল দুর্বল ও অসুস্থ মুসলিমদের জন্য নির্মাণ করেছে; শীতের রাতে যাদের দূরের মসজিদে যেতে কষ্ট হয়, তাদের জন্য বানানো হয়েছে এই মসজিদ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উক্ত মসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করেন। ফলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন—আমার এখন গুরুত্বপূর্ণ একটা সফরের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে, সফর থেকে ফিরে এসে দেখা যাবে, ইনশাআল্লাহ। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক প্রান্ত হতে মদিনাভিমুখে রওনা করেন। মদিনায় পৌঁছতে মাত্র এক দিন বা তার চেয়ে একটু বেশি সময় বাকি, তখন জিবরাইল আ. তাঁর নিকট ওহি নিয়ে এলেন। এবং মসজিদে জিরারের বিস্তারিত এবং এর নির্মাণকারীরা মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির জন্য কী কী দুরভিসন্ধি এঁটেছে—তা জানিয়ে দিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমনের পূর্বেই তৎক্ষণাৎ একটা দল পাঠালেন মসজিদটি ভেঙে ফেলার জন্য। এ মর্মে কুরআনের ঘোষণা—

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ, যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর

তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক।

তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়ানোর যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।[২১৬]

জিরার : কুরআনে বর্ণিত 'জিরার'-এর অর্থ হলো—ক্ষতি, কষ্ট, দুরভিসন্ধি। এ মসজিদটি মসজিদে কুবা ও মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের জন্য নির্মাণ করেছে বলে একে মসজিদে জিরার বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনের এ আয়াতটি—

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর। এই আয়াত মসজিদে কুবার দিকেই ইঙ্গিত করে।[২১৭]

* * *

২১৬ সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৭-১০৮

২১৭ *তাফসিরু ইবনে কাসির*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৭-৩৮৮; এবং *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৩২২

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

মসজিদে জিরার ধ্বংসকরণ

মসজিদে জিরারের ঘটনাটি মুনাফিকদের পক্ষ হতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের জন্য বড়ো ধরনের একটা ভয়াবহ চক্রান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

এটা শুধু তাদের অন্তরের নিফাকেরই বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পিত ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র বটে! এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অব্যাহতভাবে বিষয়টিকে এড়িয়ে চলার ভূমিকা পালন করেননি; বরং তাঁর পদক্ষেপ ছিল একদম ভিন্ন। তিনি চাইছিলেন—মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাক এবং তাদের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত থেকে পর্দা উঠে গিয়ে বিষয়টি খোলাসা হয়ে সামনে আসুক। যাতে কেউ এ অভিযোগ করতে না পারে যে, মুহাম্মাদ এখন মসজিদ ভাঙা শুরু করেছে। ফলে তিনি ওহির অপেক্ষা করছিলেন। যখন ওহির মাধ্যমে বিষয়টি খোলাসা হয়ে গেল, তখন তিনি মসজিদ নামক মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এই ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে দেন এবং দেওয়ালগুলো জ্বালিয়ে দেন।

মুনাফিকদের সাথে আচরণ

মুনাফিকদের চক্রান্তের এই ঘটনা এবং পূর্বের নিফাক ও ষড়যন্ত্রের ঘটনা আমাদের সামনে তাদের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের বিধানগুলোর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পেশ করে। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে কী বিধান প্রয়োগ করতে হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। অতএব, তাদের থেকে কোনো নিফাক এবং মিথ্যা প্রকাশ পেলেও যেহেতু তারা মুসলিম দাবি করে, সে হিসেবে দুনিয়াতে তাদের ছেড়ে দিতে হবে, তাদের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে, আর তাদের লুক্কায়িত গোপন বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করে দিতে হবে। আর যদি তাদের থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো

ক্ষতিকর পদক্ষেপ এবং কোনো ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়, তাহলে অপরাধে জড়িত থাকাবস্থায় তাদের কঠিনভাবে পাকড়াও করতে হবে। সাথে সাথে তাদের সকল চক্রান্ত্র ও নস্যাৎ করে দিতে হবে। এবং গুঁড়িয়ে দিতে হবে তাদের ষড়যন্ত্রের সকল আড্ডা ও ঘাঁটি।

মুনাফিকদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল নীতি ও ব্যবহার এ বিষয়টার প্রতিই ইঙ্গিত করে। এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পন্থা সকল ফুকাহায়ে কিরাম দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এ মতের ওপরই ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

মুনাফিকদের চক্রান্তের এই পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্রের পদ্ধতি ও মাধ্যমগুলো একটু ভেবে দেখলে বুঝে আসে যে, প্রতিটি যুগে নিফাকের প্রকৃতিটা এক ও অভিন্ন। এবং মুনাফিকদের পন্থা ও কৌশল এবং তাদের মাধ্যমগুলো কখনো ভিন্ন হয় না এবং পরিবর্তনও হয় না। সর্বদাই তারা লাঞ্ছনাকর ভীরুতায় ভোগে এবং চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রেই মেতে থাকে। ঈমানের নুর থেকে সদা দূরে থাকে, এবং নিমজ্জিত থাকে সর্বদা নিফাক ও কুফরের নিকষকালো অন্ধকারের মাঝে। আর সর্বদাই তারা সাম্রাজ্যবাদী দখলদার ভিনদেশি প্রভুদের পদলেহন করতে থাকে, যেন স্বদেশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকতে তারা তাদের সহযোগিতা করে। এমনকি যখন তারা স্বগোত্রের মুসলিমদের নিকট আসে, তখন ওপরে ওপরে ইসলাম প্রকাশ করে। ইসলামের দাওয়াতের প্রতি কৃত্রিম মুগ্ধভাব দেখায়; কিন্তু যখন তারা ইসলামের ক্ষতিসাধন এবং ইসলামের দায়িদের হত্যার সুযোগ পায়, তখন তাড়া এ সুযোগকে মোটেও হাতছাড়া করে না।

সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে

মসজিদে জিরারের ঘটনা এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদক্ষেপ থেকে যে বিষয়টা প্রমাণিত হয়, তা হলো—যে সকল স্থানে প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতা ও আল্লাহর সাথে নাফরমানি চলে, সে স্থানকে বন্ধ করে দিতে হবে কিংবা তা ধ্বংস করে দিতে হবে। অথবা পুড়িয়ে দিতে হবে।

উমর রা. পুরো একটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে মদ ক্রয়-বিক্রয় হতো। এবং রুওয়াইশদ আস-সাকাফির দোকানও তিনি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—'এটা হলো পাপের আড্ডাখানা।'[২১৮]

আর এ সকল বিষয়ে উলামায়ে কিরাম কোনো মতানৈক্য করেননি।

২১৮ দেখুন, ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর রচিত *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭

বনু সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমন

ইবনে ইসহাক রহ. বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক প্রান্তর হতে রামাদানে মদিনায় আগমন করেন। আর এই মাসেই সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁর নিকট আসে। এরপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

মদিনায় আসার আগে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তারা গোত্রের সকলে পরস্পরে পরামর্শ করে। এরপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিমদের সাথে যেহেতু লড়াই করার মতো তাদের শক্তি নেই। কারণ, আরবের অধিকাংশ গোত্রই তখন ইসলাম গ্রহণ ফেলেছে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত ও করেছে। তাই আপাতত তাদের কোনো প্রতিনিধিদল মদিনায় যাক। তারা অবস্থা দেখে আসুক।

সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা কিনানা ইবনে আবদুল ইয়ালিলের নেতৃত্বে একটা প্রতিনিধিদল মদিনায় পাঠায়। মদিনার নিকটবর্তী হলে মুগিরা ইবনে শুবা রা.-এর (তিনিও বনি সাকিফ গোত্রের ছিলেন) সাথে তাদের দেখা হয়। তিনি তাদের স্বাগত জানান এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে কীভাবে তাঁকে সালাম দেবে, তাও শিখিয়ে দেন; কিন্তু তারা তা করল না; বরং তাদের জাহিলি প্রথামতোই সালাম দিলো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মসজিদে নিয়ে যান এবং তাদের জন্য তাঁবু টানিয়ে দেন, যাতে করে তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারে এবং সাহাবিদের সালাত আদায় করা দেখতে পারে।

দলটি মদিনায় বেশ কয়েক দিন অবস্থান করল এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বারবার যাওয়া-আসা করতে লাগল, আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকেন।[২১৯]

ইবনে সাআদ রহ. বর্ণনা করেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে ইশার পর তাদের কাছে তাশরিফ আনতেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলতেন।[২২০]

কয়েকটি বিস্ময়কর প্রশ্ন

মুসা ইবনে উকবা তার *কিতাবুল মাগাজি*তে বর্ণনা করেন—উসমান ইবনে আবুল আস রা. এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন। বয়সে সবার ছোটো ছিলেন তিনি। প্রতিনিধিদলটি যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যেত, তখন তারা তাকে তাঁবুতে রেখে যেত। অতঃপর দলটি যখনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে ফিরে আসত, উসমান ইবনে আবুল আস তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে হাজির হতো এবং দ্বীন সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করত, তাঁকে কুরআন পড়তে বলত। এভাবে সে বারবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যেতে থাকে। একপর্যায় সে দ্বীনের বিষয়ে অনেক ইলম অর্জন করে ফেলে। সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো ঘুমন্ত পেলে আবু বকর রা.-এর কাছে চলে যেত; কিন্তু সে এ বিষয়গুলো তার সাথিদের থেকে গোপন রাখত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি খুব মুগ্ধ করে, ফলে তিনি তাকে অনেক ভালোবাসেন।

অবশেষে দলটি ইসলামে সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু কিনানা ইবনে আবদুল ইয়ালিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করল—আমাদের জন্য কি জিনা করার অনুমতি আছে? কেননা, আমরা সব সময় সফরেই থাকি। ফলে আমাদের জন্য ব্যভিচারের প্রয়োজন পড়ে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিনা তোমাদের জন্য হারাম। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

২১৯ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৪
২২০ *তাবাকাতু ইবনে সাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৮

আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।[২২১]

অতঃপর তারা আবার বলল—আমাদের জন্য সুদ খাওয়ার অনুমতি আছে কি?

কেননা, তার সবই আমাদের মাল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের জন্য শুধু তোমাদের মূলধনটাই বৈধ। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদ বাবদ মানুষের কাছে যা তোমাদের পাওনা আছে, তা পরিত্যাগ করো; যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।[২২২]

তারা পুনরায় বলল—মদপান করা কি বৈধ? কেননা তা আমাদের জমিনেরই রস। আর তা আমাদের খুব প্রয়োজন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আল্লাহ তা হারাম করেছেন। এরপর তিনি মদ হারাম হওয়ার আয়াত তাদের পড়ে শোনালেন।[২২৩]

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন—তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের সালাত মাফ করে দেওয়ারও আবেদন করেছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেছিলেন—ওই ধর্মে কোনোই কল্যাণ নেই, যে ধর্মে সালাত নেই। এরপর তারা পরস্পরে পরামর্শ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবার ফিরে এলো এবং সবকিছুই মেনে নিল; কিন্তু এরপর তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করল—তারা যেই (লাত) মূর্তির পুজো করে, তা তিন বছরের জন্য যেন তাদের রাখতে দেন এবং তা না ভাঙেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা মেনে নিলেন না। এভাবে তারা দুই বছরের জন্য, তারপর এক বছরের জন্য অনুমতি চাইতে লাগল, আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাখ্যান করছিলেন। পরিশেষে তারা এক মাসের অনুমতি চাইল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্য সময়ের জন্যও অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

---

২২১ সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩২

২২২ সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮

২২৩ দেখুন, *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬-২৮

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন—এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের গোত্রের মূর্খ বেকুব এবং নারীদের জ্বালাতন, কষ্ট ও ঘৃণা থেকে মুক্তি পাওয়া। কেননা, এক্ষুনি তারা মূর্তি ভাঙতে গেলে তারা তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তাই তারা ভেবেছিল—তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে ইসলামে প্রবেশ করাতে পারলে পরবর্তী সময়ে মূর্তি ভেঙে ফেলা যাবে। তাই তারা সময় চেয়েছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের আবেদন না মঞ্জুর করলেন, তখন তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল—আপনি তাহলে নিজেই তা ভাঙার দায়িত্ব নেন। আমরা কখনো তা ভাঙতে সক্ষম না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—আমি তোমাদের সাথে লোক পাঠাব, তারা তোমাদের পক্ষ থেকে তা ভেঙে দেবে। এরপর তারা গোত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চাইল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিলেন, এবং তাদের খুব আপ্যায়ন ও যত্ন করলেন, এরপর সালাম দিয়ে বিদায় দিলেন।

অন্যদিকে উসমান ইবনে আবুল আসকে তাদের আমির বানিয়ে দিলেন। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ ও টান অনুভব করেছিলেন। আর সে মদিনা থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে অনেকগুলো সুরাও শিখে ফেলেছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে আমির নিযুক্ত করে তাদের পেছনে একটা প্রতিনিধিদল পাঠালেন। মুগিরা ইবনে শুবা ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারবও এ দলে ছিল। অতঃপর তারা সরাসরি লাত নামক মূর্তির কাছে গেল এবং তা ভেঙে ফেলল। এ দৃশ্য দেখে সাকিফ গোত্রের নারীরা আফসোস করতে করতে দৌড়ে আসে এবং মূর্তিভাঙার দুঃখে ভীষণ কান্না জুড়ে দেয়। মুগিরা ইবনে শুবা যখনি কুড়াল দিয়ে মূর্তির ওপর আঘাত হানে, তখনি আবু সুফিয়ান ঠাট্টা করে এবং কান্নারত নারীদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশের ভান করে মূর্তির উদ্দেশে বলছিল—আহারে! সর্বনাশ করে দিলো রে..! আহারে![২২৪]

ইবনে ইসহাক রহ. তার *তাবাকাত* নামক গ্রন্থে মুগিরা ইবনে শুবা রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

---

২২৪ *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৭

সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল। আমার মনে হয় না যে, আরবে কোনো সম্প্রদায় আছে, যারা সাকিফ গোত্রের মতো এত খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য এত একনিষ্ঠ ও মুখলিস হতে পেরেছে।[২২৫]

* * *

২২৫ তাবকাতু ইবনে সাআদ, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৭৮

আরবের বিভিন্ন গোত্রের ধারাবাহিক আগমন

ইবনে ইসহাক বলেন—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করলেন। তাবুক যুদ্ধও শেষ হওয়ায় সেখান থেকেও অবসর হলেন। এদিকে সাকিফ গোত্র ও যখন ইসলাম গ্রহণ করল এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হলো। এরপর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরব-গোত্রের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আসতে শুরু করল।

এ সকল গোত্র পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে মক্কার কুরাইশদের অপেক্ষা করছিল। যেহেতু তারা ছিল সব মানুষের লিডার, পবিত্র কাবার খাদেম, ইসমাইল আ.-এর বংশধর। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যেহেতু তাদের গোত্রের ছিলেন; ফলে যখন মক্কা যখন বিজয় হলো, কুরাইশরা ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে স্বীকার করে নিল। মক্কায় ইসলামের শেকড় মজবুত হলো। এই সময় আরবের অন্যান্য গোত্র বুঝতে পারল—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করার এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো শক্তি তাদের নেই। ফলে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।"[২২৬]

এখানে আরবদের প্রতিনিধিদলগুলোর ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা পেশ করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু তাদের ঘটনা নিয়ে ব্যাখ্যা ও আলচনা করা এখানে উদ্দেশ্য না।

* * *

২২৬ সূরা নাসর, আয়াত : ১-৩

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

এই সেই তায়েফবাসী

পাঠকদের কি মনে আছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়েফে গিয়েছিলেন, তখন তায়েফবাসী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছিল? কীভাবে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিল? এবং কীভাবে তাঁর পেছনে বোকা ও শিশুদের লেলিয়ে দিয়েছিল তাঁকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করার জন্য এবং তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য? তারাই এই সাকিফ গোত্র, যারা আজ তাঁর নিকট ছুটে এসেছে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে।

আপনার কি খেয়াল আছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে যখন মক্কায় ফিরে এসেছিলেন, তখন জায়িদ ইবনে হারিসা রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কীভাবে তায়েফে প্রবেশ করলেন; অথচ তারা আপনাকে সেখান থেকে বের করে দিলো?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জবাবে বলেছিলেন—জায়িদ, আল্লাহ তায়ালা সব মুশকিল সহজকারী, তিনি তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য পথ খুলে দেবেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী এবং তাঁর নবিকে বিজয় দানকারী।

আজ যা ঘটেছে, নিঃসন্দেহে তা জায়িদ ইবনে হারিসাকে তিনি যা বলেছিলেন, সে কথার বাস্তব রূপ। এই তো আজ সেই তায়েফবাসী, মক্কাবাসী এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে।

আচ্ছা, একটু চিন্তা করুন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত কষ্ট করে দূরদূরান্তের উপত্যকা ও দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে তাদের কাছে গিয়েছিলেন; শুধু এই আশায়—তারা তাঁকে স্বাগত জানাবে, হাসিমুখে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত

কবুল করবে; কিন্তু তারা বিনিময়ে তাঁর সাথে কেমন দুর্ব্যবহার করেছে এবং কতটা কষ্ট তাঁকে দিয়েছে! এর কিঞ্চিৎ কষ্ট ও যদি অন্য কাউকে দেওয়া হতো, তাহলে সে যে-ই হোক না কেন, অবশ্যই প্রতিশোধ নিত। আজ সাকিফ গোত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকিফ গোত্র থেকে আজ প্রতিশোধ নেবেন—এটা কি কল্পনা করা যায়? কক্ষনো না।

সেই দুআর ফলাফল

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুদিন যাবৎ তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন, অতঃপর সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যেতে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো—হে আল্লাহর রাসুল, আপনি সাকিফ গোত্রের জন্য বদদুআ করুন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদুআ করলেন না; বরং হাত তুলে বললেন—

> হে আল্লাহ, আপনি সাকিফ গোত্রের লোকদের হিদায়াত দেন; বিশ্বাসী হিসেবে আমার কাছে তাদের নিয়ে আসেন।

আল্লাহ যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ কবুল করলেন, তখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল মদিনায় এলো, আবু বকর ও মুগিরা ইবনে শুবা রা. তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ছুটে গেলেন দুআ কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়ার জন্য।

সুসংবাদ শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানানোর জন্য বের হলেন। এরপর প্রতিদিন দীর্ঘ সময় তাদের সাথে কাটাতেন, তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও উপদেশ দিতেন এবং নসিহত করতেন।

কী অনুপম ছিল রাসুলের চরিত্র! যেখানে সর্বদা তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে থাকত। বিভিন্নভাবে তাঁকে কষ্ট দিয়ে মনের হিংসার তৃষ্ণা মিটাত। অথচ তিনি সদাসর্বদা তাদের জন্য কামনা করতেন উভয় জগতের কল্যাণ, সুখ ও সঠিক পথের দিশা। তারা তাঁর কষ্ট, বিপদ ও ক্ষতি দেখলে খুশি হতো, মেতে উঠত মহা উল্লাসে। আর তিনি তাদের বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। কেঁদে উঠত তাঁর হৃদয়। দু-হাত তুলে দুআ করতেন বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে তাদের

কল্যাণ সুখ ও হিদায়াত চেয়ে। তাঁর দুআর ফসলেই সাকিফ ও তায়েফ গোত্র ধন্য হলো ঈমানের নুরে।

এত জুলুম! এত নির্যাতন সহ্য করার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, দ্বীনের দাওয়াত সফল করা। পথহারা উম্মতকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসা। ফলে তিনি মহান প্রভুর দরবারে হাজির হবেন তাঁকে খুশি করে, সন্তুষ্ট করে।

দ্বীনের পথে সকল কষ্ট সয়ে যাওয়া কতই-না সহজ! কতই-না ভালো লাগে তখন, যখন সফল হয় দ্বীনের পথে সকল প্রচেষ্টা! আহ! কতই-না তৃপ্তি এই মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে কুরবানি পেশ করা, সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া! আর এই তো সেই মহান ইসলাম, যে চেনে না হিংসা কী? বিদ্বেষ কী? আর মানুষের সামান্যতম ক্ষতিও যে চায় না।

এই তো সেই মহান ইসলাম, যে জিহাদের আদেশ দেয়; কিন্তু হিংসা ও জুলুমকে প্রশ্রয় দেয় না। শক্তি অর্জন করতে শেখায়; কিন্তু আমিত্ব ও অহংকারকে কোনো জায়গা দেয় না। দয়া ও রহমতের প্রতি ডাকে; কিন্তু লাঞ্ছনা করে এবং অপমানিত হয়ে নয়। ভালোবাসার দিকে ডাকে; কিন্তু সে ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য।

সন্দেহ নেই—বনু সাকিফ ও অন্য সকল প্রতিনিধিদলের মদিনায় আগমন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়া—আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্যর যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, সেই ওয়াদা পূরণেরই ফল। প্রিয় পাঠক, যা আলোচনা করা হলো, এসব আমাদের জন্য শিক্ষা উপদেশ—যা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য।

* * *

ঘটনা-সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা

বনু সাকিফ ও অন্যান্য গোত্রের আগমনের ঘটনাগুলো থেকে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু বিধিবিধান এসেছে। সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব—

০১. প্রয়োজনে মুশরিকদের মসজিদে বসতে দেওয়া বৈধ

আপনি জেনে থাকবেন, সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে থাকতে দিয়েছিলেন। তাদের সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সুতরাং বিষয়টি মুশরিকদের জন্য যেহেতু বৈধ হয়েছে, তাহলে আহলে কিতাবদের জন্য অবশ্যই বৈধ। অবশ্য এখানে একটা বিষয় আছে লক্ষণীয়, তা হলো—তাদের হিদায়াতের সম্ভাবনা থাকতে হবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাসারা গোত্র নাজরানের প্রতিনিধিদলকেও মসজিদে বসতে দিয়েছিলেন যখন তারা হকের কথা শোনার জন্য এবং ইসলামকে জানার জন্য এসেছিল। আল্লামা জারকাশি রহ বলেন, ইমাম রাফিয়ি ও নববি রহ. বলেছেন—মুসলিমের অনুমতি নিয়ে কাফিরদের জন্য খানায়ে কাবা ব্যতীত যেকোনো মসজিদে প্রবেশ বৈধ, তবে কিছু শর্তসাপেক্ষে ব্যাপার আছে, যেমন—

- **এক.** ইসলামি রাষ্ট্রে থাকার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে চুক্তির সময় সেই চুক্তিনামায় মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা না থাকা। নিষেধাজ্ঞা থাকলে প্রবেশ করতে পারবে না।

- **দুই.** যেই মুসলিম মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেবে, তাকে অবশ্যই জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।

- **তিন.** কুরআন শ্রবণ কিংবা ইলমি আলোচনা শোনার জন্য প্রবেশ করতে হবে এবং তার থেকে ইসলামের আশা পাওয়া যেতে হবে। অথবা মসজিদের দেওয়াল কিংবা অন্য কোনো জিনিস মেরামত করার জন্য প্রবেশ করতে পারবে।

কাজি আবু আলি আল ফারিকির মতে—যদি তার থেকে ইসলামের আশা করা না যায়, তাহলে কুরআন ও ইলমি আলোচনা শোনার জন্য ও প্রবেশের অনুমতি নেই। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে দেখা যায় যে, তাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়—যা খুবই খারাপ কাজ।

কাজি আবু আলি তার *রওজা* নামক গ্রন্থে লেখেন—ঘুম কিংবা পানাহারের উদ্দেশ্যে যদি মসজিদে প্রবেশের অনুমতি চায়, তাহলে উচিত হলো—অনুমতি না দেওয়া। আর অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে, অনুমতি দেওয়া যাবে না।

সারকথা হলো—মসজিদের কোনো ক্ষতি এবং নাপাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যদি না থাকে, মুসল্লিদের কোনো সমস্যা না হয় এবং গন্ডগোল লাগার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে কাফির নারীকে অনুমতি দেওয়াই যাবে না। কারণ, এতে ক্ষতি ও ফিতনার আশঙ্কা বেশি—এতে কোনো সন্দেহ নেই।[২২৭]

০২. নিরাপত্তাকামী ও প্রতিনিধিদলের সাথে ব্যবহার

নিরাপত্তাকামী ও প্রতিনিধিদলের মাঝে পার্থক্য হলো—'প্রতিনিধি'-দলটা নিজ গোত্রের দূত তথা বার্তাবাহক হিসেবে আসে; আর তাদের সংখ্যা ও সর্বদা একাধিক সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। পক্ষান্তরে 'নিরাপত্তাকামী' হলো—যে মুসলিমদেশে নিজের নিরাপত্তা চাইতে আসে এবং সে সময়ের মধ্যে সে তাদের থেকে এবং ইসলাম থেকে ইলম শিক্ষা লাভ করে।

---

২২৭ আল্লামা জারকাশি রহ.-এর *ই'লামুস সাজিদ*, পৃষ্ঠা : ৩১৯-৩২১

সুতরাং ইসলাম নিরাপত্তাকামীর সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাকে হিফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। অতঃপর সে চাইলে তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে বলেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾[২২৮]

> আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্য যে, এরা জ্ঞান রাখে না।[২২৯]

আর নিরাপত্তাকামীর বিধান থেকে এটাও প্রমাণিত হয়—প্রতিনিধিদলের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে। কেননা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সাকিফ গোত্রের সাথে কেমন আচরণ করেছেন এবং কীভাবে তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেছেন, তা পাঠক নিশ্চয়ই জেনেছেন।

০৩. নেতৃত্বের কে পাবে

আর এ কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে আবুল আসকে সাকিফ গোত্রের আমির বানিয়ে দিয়েছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে ছিলেন, তার মধ্যে পবিত্র কুরআন শেখার ও বোঝার প্রবল আগ্রহ দেখে। সে তার সঙ্গীদের সাথে মদিনায় থাকাকালীন কুরআন ও ইসলামের জ্ঞানে সকল সাথি থেকে অগ্রগামী ছিল।

আর নেতৃত্ব ও জিম্মাদারি হলো ধর্মীয় এমন এক দায়িত্ব, যার দ্বারা ইসলামি শাসন ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং নেতৃত্ব ও জিম্মাদারির জন্য এ শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। আবার ইলম, আমল ও বিচক্ষণতায়ও অনন্য হতে হবে।

---

২২৮ সূরা তাওবা, আয়াত : ৬

০৪. মূর্তি ও ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা

মূর্তি ভেঙে ফেলা ওয়াজিব হওয়ার জন্য মূর্তির সম্মান ও পূজা হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ মূর্তির পূজা করা হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় তা ভেঙে ফেলতে হবে, যেহেতু দলিলটা এখানে ব্যাপক।

আর আরেকটা দলিল হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরে থাকা মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ অন্যান্য মূর্তির মতো সেগুলোর কোনো ইবাদত করা হতো না। এখানে আরও প্রমাণিত হয় (যেমন পূর্বে আলোচনা হয়েছে)—যেকোনো উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার মূর্তি বানানো এবং তা সংগ্রহ করা হারাম। এই বইয়ের ভেতরও পূর্বে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। (তবে প্রাণহীন জিনিষের ভাস্কর্য বানানো যেতে পারে।)

সাকিফ গোত্রের ঘটনা নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়েছে, তা যথেষ্ট। তবে একটা বিষয় জেনে রাখা ভালো যে, এই প্রতিনিধিদলের ভেতরে দুটি দল ছিল—'মুশরিক' ও 'আহলে কিতাব'।

মুবাহালার আহ্বান

মুশরিকদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান ও তাওহিদের মশাল নিয়ে তারা স্বগোত্রে ফিরে গিয়েছিল। আর আহলে কিতাবের অধিকাংশই নিজ নিজ ধর্ম তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মেই থেকে যায়।

আর নাসারা গোত্র নাজরানের যে প্রতিনিধিদলটি এসেছিল, তারা ছিল ৭০ জন লোক। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বেশ কয়েক দিন ছিল। এ সময় ঈসা আ.-এর বিষয় এবং আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মাঝে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। তবে সর্বশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন, তা হলো—তিনি পবিত্র কুরআনে কারিমের এ আয়াতগুলো দলিল হিসেবে তিলাওয়াত করে তাদের শোনান—

> নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন—'হয়ে যাও'; সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালনকর্তা বলেন, তা-ই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। অতঃপর

তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনি সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো—এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো—আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি, যারা মিথ্যাবাদী।[২২৯]

যখন তারা স্বীকার করতে চাইল না, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মুবাহালার[২৩০] জন্য ডাকলেন, যেমনটি আল্লাহ আদেশ করেছেন। এই আয়াতগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলকে শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হাসান, হুসাইন ও ফাতিমাকে নিয়ে মুবাহালার জন্য বেরিয়ে এলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দৃঢ় প্রত্যয় দেখে প্রতিনিধিদলের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। ফলে প্রতিনিধিদলের লিডার শুরাহবিল ইবনে ওয়াদাআহ মুবাহালা করতে অস্বীকার করল এবং সাথিদের এর অশুভ পরিণামের ব্যাপারে সতর্কও করে দিলেন। পরের দিন রাতের বেলা তারা একান্তে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো—মুবাহালা করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার চাইতে তাঁর অধীনতা স্বীকার করার মধ্যেই আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। অতএব, সকালে এসে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং সন্ধিচুক্তির আগ্রহ ব্যক্ত করে। অতঃপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জিজিয়া কর দেওয়ার শর্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর দিয়ে বলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শর্ত মেনে চলবে, সন্ধিচুক্তি না ভাঙবে, সুদ না খাবে, প্রতারণা না করবে, ততদিন তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় থাকবে, সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।[২৩১]

---

২২৯ সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৫৯, ৬০, ৬১

২৩০ মুবাহালা অর্থ হলো—পরস্পরকে ধ্বংসের অভিশাপ দিয়ে আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করা'। অর্থাৎ উভয়পক্ষ তার মিথ্যাবাদী প্রতিপক্ষের ওপর ধ্বংসের অভিশাপ করে আল্লাহর কাছে দুআ করা।

২৩১ ইমাম হাকিম ও ইমাম বাইহাকি রহ. *দালায়িলুন নুবুওয়াতে* বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং ইমাম আবু দাউদ 'কিতাবুল খিরাজ' অর্থাৎ খিরাজ তথা ট্যাক্স অধ্যায়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এবং দেখুন—*তাফসিরু ইবনে কাসির*, খণ্ড : ১, আয়াত : ৩৬৮ ও ৩৬৯ নং আয়াত।

আদি ইবনে হাতিমের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

ইসলাম গ্রহণের ইতিবৃত্ত

আদি ইবনে হাতিম খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হলেন বিখ্যাত দানশীল হাতিম তায়ির ছেলে। তিনি নিজ গোত্রে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি তার গোত্র থেকে যুদ্ধলব্ধ গনিমতের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করতেন। গোত্রপ্রধানকে এই অংশটা দেওয়া তৎকালীন যুগে আরবদের বিশেষ প্রথা ছিল। আদি ইবনে হাতিম যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত এবং তাঁর দাওয়াতের বিষয়টি শুনল, তখন সে তাঁর দাওয়াত খুব অপছন্দ করল। এরপর সে একদিন গোত্র ছেড়ে সিরিয়ার নাসারাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

ইবনে হাতিমের জবানবন্দি

আদি বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি যতটা ঘৃণা করতাম, সিরিয়ায় গিয়ে তার বেশি খারাপ লাগছিল। ফলে আমি মনে মনে বলতে লাগলাম—তিনি রাজা হন বা মিথ্যাবাদী, তাতে আমার ক্ষতি কী? তিনি মিথ্যাবাদী হলে বিষয়টা তো জানতেই পারব। আর যদি তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে তার অনুসরণ করব। অতঃপর আমি সিরিয়া ত্যাগ করে মদিনায় গিয়ে পৌঁছলাম এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, লোকটি কে? জবাবে বললাম—আমি আদি ইবনে হাতিম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন; এর মধ্যে এক দুর্বল বৃদ্ধা তাঁকে থামতে বলল। তিনি থেমে গেলেন। বৃদ্ধা তাঁর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলল। তিনি তার প্রয়োজনের কথা শুনলেন। আমি তখন মনে মনে বললাম—আল্লাহর কসম! ইনি কোনো বাদশাহ নন! অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন এবং বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি খেজুরের আঁশভরা চামড়ার তৈরি একটা বালিশ আমাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এটার ওপর বসো।

আমি বললাম—না, বরং আপনি বসেন। তিনি বললেন—না তুমিই বসো। এরপর আমি তাতে বসলাম, আর তিনি মাটিতেই বসে গেলেন।

আমি মনে মনে বললাম—আল্লাহর কসম! এমন আচরণ কোনো বাদশার হতে পারে না। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আদি ইবনে হাতিম, তুমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ বিশ্বাস করো? আমি বললাম, না। অতঃপর তিনি বললেন—তুমি কি আল্লাহর চাইতে অন্য কোনো কিছুকে বড়ো মনে করো? আমি বললাম—না।

এরপর তিনি বললেন—তুমি 'রাকুসিয়্যা'[২৩২] নও কি?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

তিনি বললেন—তুমি কওম থেকে গনিমতের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করো, তাই না?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

তিনি বললেন—এটা তো তোমাদের ধর্মে বৈধ নয়।

আমি বললাম—আল্লাহর কসম, হ্যাঁ।

এরপর তিনি বললেন—আদি, সম্ভবত তুমি মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা ও দরিদ্রতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে ইসলাম গ্রহণে ইতস্তত করছ, তাই না? আল্লাহর কসম! মুসলিমদের এমন একটা সময় আসবে—যখন প্রাচুর্য ও ধনদৌলত এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যাবে না। এবং তখন এ রকম শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে যে, কাদিসিয়া নগরী থেকে যুবতি নারী একাকিনী উটে চড়ে বাইতুল্লাহয়

---

২৩২ রাকুসিয়্যা হলো—নাসারা ও সাবিয়ি সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি ভিন্ন মতাবলম্বী এক জাতি।

হজ করতে আসবে, অথচ তার মনে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর ভয় থাকবে না।

হয়তো তুমি এই ভেবে ঈমান আনতে চাচ্ছ না যে, মুসলিমদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ক্ষমতা ও রাজত্ব অন্যদের হাতে। আল্লাহর কসম! এমন একটা সময় আসবে, যখন শুনতে পাবে—বাবেলের শ্বেত প্রাসাদ মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়েছে এবং কাইসার ও কিসরার সমস্ত ধনভান্ডার মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে।...

আদি বলেন—এরপর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

তিনি আরও বলেন—আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাবাণীর তিনটির দুটি বাস্তব হতে দেখেছি। অর্থাৎ কাদিসিয়া নগরী থেকে আসা যুবতি নারীর নিরাপদে হজ করে যেতে দেখেছি। এবং আমি কিসরার ধনভান্ডারের ওপর হামলাকারী প্রথম ঘোড়ায় আরোহী ছিলাম। আল্লাহর কসম! তৃতীয়টিও (ধনসম্পদ বেড়ে যাওয়া, তা গ্রহণের লোক না থাকা) অবশ্যই ঘটবে।[২৩৩]

* * *

২৩৩ ইমাম ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম বাগবি রহ. নিজ 'মুজাম' নামক গ্রন্থে প্রায় হুবহু শব্দেই বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও বিস্তারিত জানতে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর *আল ইসাবা* নামক গ্রন্থের ২নং খন্ডের ৪৬১ নং পৃষ্ঠা দেখুন।

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

আদি ইবনে হাতিমের ঘটনা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আদি ইবনে হাতিমের আগমন এবং তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এমন একসময় ঘটেছে, যেই সময়টিতে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসছিল। ফলে আমরা তার আগমনটাকেও ওই অসংখ্য প্রতিনিধিদলের একটা হিসেবে গণ্য করতে পারি, যেই প্রতিনিধিদল এসেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে।

তবে এখানে আদি ইবনে হাতিমের ঘটনা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব, যেহেতু তাতে ইসলামি আকিদার ভিত্তিসংক্রান্ত প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও বিধিবিধান রয়েছে। এবং সূক্ষ্ম কিছু বিশ্লেষণও রয়েছে। আদি ইবনে হাতিমের সাথে নবিজির আচরণ থেকে তাঁর উত্তম আদর্শ ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে, যাতে কোনো অহংকার ক্ষমতা এবং সম্মানের লোভের লেশমাত্র নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অনুমপম চরিত্র এ কথারই জানান দেয় যে, তিনি উভয় জাহানের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত একজন রাসুল। আর তিনি ছিলেন ঈমান ও হিদায়েতের ভিত্তি।

আদি ইবনে হাতিম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, আমরাও তা নিয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করি এবং সে যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আমরাও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, তবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তির প্রতি আমাদের দৃঢ় ঈমান জন্মাবে। পাশাপাশি ইসলামি বিশ্বে যারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ উসকে দিয়েছে এবং সিরাতের নামে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতকে এবং ইসলামের নামে ইসলামকে বিকৃত করে প্রাচ্যবিদরা যেই বই লিখেছে, তাদের চক্রান্ত ও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রিয় পাঠক, আমরা তাহলে এখানে একটু থামি এবং আদি ইবনে হাতিমের মুখেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক মাধুর্যের কথা শুনি—যেই চরিত্রে প্রভাবিত ও মুগ্ধ হয়ে সে ঈমান এনেছে।

আদি ইবনে হাতিম বলেছেন—

> আল্লাহর কসম! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিয়ে নিজ ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন; এরই মধ্যে এক দুর্বল বৃদ্ধার সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা হয়। বৃদ্ধা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে থামতে বলে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেমে যান এবং বৃদ্ধার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যার কথা শোনেন। তখন আমি মনে মনে বললাম—আল্লাহর কসম! ইনি কোনো বাদশাহ নন। (কোনো বাদশার চরিত্র এত সুন্দর হতে পারে না। আর কোনো বাদশাহ একজন সাধারণ বৃদ্ধার সাথে এভাবে কথা বলবে, তার প্রয়োজন ও সমস্যার কথা শুনবে—এটা হতেই পারে না।)
>
> রাষ্ট্র, নেতৃত্ব, দুনিয়ার সুনাম-সুখ্যাতি এবং ক্ষমতালোভী ব্যক্তির আচরণ এ ধরনের পরিস্থিতিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধৈর্য থেকে কত দূরে! পারবে কি সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো এভাবে ধৈর্য ধরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে একজন সাধারণ বৃদ্ধাকে সময় দিতে? কক্ষনো না! আর হ্যাঁ, যদিও পারে, তাহলে তা হবে কৃত্রিম ও দায় ঠেকে। মনে মনে তার ভীষণ খারাপ লাগবে, কিন্তু জোর করে ধৈর্য ধরে নিজেকে সংবরণ করবে। তবে অতি দ্রুতই তার এই কৃত্রিমতা, লৌকিকতা এবং বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেয়ে তার চোখে মুখেই তা ফুটে উঠবে।
>
> পক্ষান্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ধৈর্য, বৈশিষ্ট্য ও সরলতা—সর্বাবস্থায়ই সেগুলো তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাবগত। তিনি সাহাবিদের সাথে বসার ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য করতেন না। সাধারণভাবে তিনি তাদের মতোই বসে যেতেন।
>
> অসহায় দরিদ্রশ্রেণির সাহাবিদের থেকে নিজের জীবনকে প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশে ভিন্নরূপে গড়ে তোলেননি। এবং এ রকমও কোনো প্রমাণ নেই যে, তিনি আড়ম্বরপূর্ণ দস্তরখানে খেয়েছেন। আর তিনি কখনো টেবিলে আহার করেননি এবং ছোটো পেয়ালাবিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খাননি। তিনি রফিকে

আলার সাথে মিলিত হলেন এমতাবস্থায় যে, এসব গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। এমন গুণাবলি নবি ছাড়া অন্য কারও মধ্যে কখনো পাওয়া যাবে— এটা কল্পনাই করা যায় না।

আদি ইবনে হাতিম বলেন—

তিনি আমাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং খেজুরের আঁশভরা চামড়ার তৈরি একটা বালিশ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এটার ওপর বসো...আমি ওটার ওপর বসলাম। আর তিনি নিজে মাটিতে বসলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম—আল্লাহর কসম! এমন ব্যবহার কোনো বাদশার হতে পারে না।

সম্ভবত আদি ইবনে হাতিম (যে নিজ গোত্রে বড়ো সম্মানের পাত্র ছিল) ভেবেছিল যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর তার ঘরের মতো আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসবহুল হবে; কিন্তু এর বিপরীত দেখে সে চমকে উঠেছে। আরও অবাক হয়েছে নবিজিকে তার সামনে শুধু মাটিতে বসতে দেখে। তো, এটা কী করে হতে পারে যে, তিনি সত্যের দাওয়াতের আড়ালে রাজত্বের লোভ করবেন এবং সম্পদের পেছনে ছুটবেন?

নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী

এরপর আদি ইবনে হাতিম ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীসংবলিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন—

একসময় মুসলিমদের কাছে এত সম্পদ হবে যে, তা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যাবে না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. জাকাতের সম্পদ দিয়ে একজন কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন আফ্রিকার এক অঞ্চলে; সেখানে জাকাতের হকদারদের মাঝে তা বণ্টন করার জন্য; কিন্তু সে জাকাতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। কারণ, সে সেখানে জাকাত গ্রহণ করার মতো কোনো হকদার লোক পায়নি। অতঃপর তিনি এই মাল দিয়ে কিছু দাস ক্রয় করে আজাদ করে দেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন—

> কাদিসিয়া নগরী থেকে যুবতি মহিলা একাকী উটে চড়ে বাইতুল্লায় হজ্জ করতে আসবে, অথচ তার মনে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর ভয় থাকবে না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণীটিও সত্য হয়েছে। ফলে তখন মুসলিম বিশ্বে এত নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল যে, নিরাপদে সবাই পথ চলতে পারত। কোনো পথচারীই আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করত না। এবং রাখালও তার বকরির পালের ব্যাপারে নেকড়ের ভয় করত না।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও বলেন—

> আল্লাহর কসম! এমন একটা সময় আসবে, যখন মুসলিমদের হাতে বাবেল শহরের শ্বেত প্রাসাদ বিজিত হবে।

আদি ইবনে হাতিম বলেন—

> নবিজির এ ভবিষ্যদ্বাণীটিও সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। সকল প্রশংসা ওই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসুলের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

আদি ইবনে হাতিম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনযাপন, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে নবুয়তের সত্য আলামত এবং বাস্তব চিত্র অবলোকন করেছে। এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসংবলিত হাদিসে ও নবুয়তের সত্যায়ন সে পেয়েছে। কারণ, এই প্রত্যেকটা হাদিস যুগে যুগে বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এসব কিছুই তাঁর ইসলাম গ্রহণ এবং দুনিয়ার আনন্দ-ফুর্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাস পরিত্যাগ করার কারণ হয়েছিল।

যদি কারও স্বাধীন চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ বিবেক থেকে থাকে, আর তা দ্বারা উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে ভাবে, তাহলে সে সত্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আর যদি তার এমন বিবেক-বুদ্ধি না থাকে, বিবেকের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা হারিয়ে তাতে যদি ঠাঁই নেয় হিংসা-বিদ্বেষ, তাহলে সে ভ্রষ্টতার ওপরই অটল থাকবে এবং নিমজ্জিত থাকবে মূর্খতার অন্ধকারে। বাস্তব কথা হলো—যে মূর্খতার ভান করে, তাকে শেখানো যায় না। আর যে ভান করে না দেখার, তাকে দেখানো কখনো সম্ভব হয় না। আল্লাহ তায়ালা এ সকল লোকদের বৈশিষ্ট্যাবলি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন—

তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদের কে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবৃত রয়েছে, আমাদের কর্ণে আছে সিঁপি, এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করেন এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'[২৩৪]

* * *

২৩৪ সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৫

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদানে প্রতিনিধি প্রেরণ

প্রতিনিধি প্রেরণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বিভিন্ন প্রতিনিধিদল যেভাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য আসছিল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে দক্ষিণ উপদ্বীপে প্রতিনিধি পাঠাতে লাগলেন মানুষকে দ্বীনের বিধিবিধান ও প্রাথমিক মৌলিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আরব উপদ্বীপ ও তার বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। ফলে ইসলাম শিক্ষা ও ইসলামের বাস্তবতা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য পথপ্রদর্শক, দায়ি ও মুআল্লিমদের প্রয়োজন বেড়ে গেল। এমনকি ইসলাম মানুষের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ার পর মানুষের অন্তরে গেঁথে গেল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে নাজরানের দিকে পাঠান সেখানের অধিবাসীদের ইসলামের দিকে আহ্বান এবং দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান ও বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেভাবে তিনি আলি রা.-কে পাঠান ইয়ামানের দিকে।[২৩৫]

আবু মুসা আশআরি ও মুআজ ইবনে জাবাল রা.-কেও ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই ইয়ামানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের রওনা করে দিয়ে উপদেশ দিয়ে বলেন—

---

২৩৫ দেখুন *সহিহ বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১০; *তাবাকাতু ইবনে সাআদ* এবং *সিরাতে ইবনে হিশাম*। আর ইমাম বুখারির বর্ণনায় রয়েছে—নবিজি সা. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আলি রা.-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন।

তোমারা সহজ করবে, কঠিন করবে না। সুসংবাদ শোনাবে, পালিয়ে যেতে বাধ্য করবে না এবং পরস্পরে ঐকমত্য (ও সহানুভূতি) বজায় রাখবে।[২৩৬]

আর মুআজ ইবনে জাবাল রা.-কে তিনি বলেছিলেন—

মুআজ, তুমি আহলে কিতাবদের এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। অতএব, তুমি তাদের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছবে, তখন তাদের তুমি আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকবে। তাদের সাক্ষ্য দিতে বলবে যে., আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

এরপর যদি তারা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করে, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে—আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের বলবে—আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন, যা ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদের দেওয়া হয়।

যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে সাবধান! তাদের মাল আত্মসাৎ করবে না। মজলুমের বদদুআকে ভয় করবে; কেননা, মজলুমের দুআ ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোনো পর্দা নেই। অর্থাৎ মজলুমের দুআ কবুল হয়।[২৩৭]

মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজকে বিদায় দিতে গিয়ে মদিনার বাহির পর্যন্ত আসলেন, মুআজ রা. ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশে পাশে হাঁটছিলেন আর উপদেশ দিচ্ছিলেন। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—

মুআজ, হতে পারে এ বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হয়তো তুমি ফিরে এসে আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের

---

২৩৬ *সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম*

২৩৭ *সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম*

পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে...মুআজ রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদ-বেদনায় কেঁদে ফেললেন।"[২৩৮]

মুআজ ইবনে জাবাল রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরেও ইয়ামানে অবস্থানরত ছিলেন। দেখা গেল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ রা.-কে যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তা-ই হয়েছে।

* * *

২৩৮ *মুসনাদু ইমাম আহমাদ*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ২১৪

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

দাওয়াতের জিম্মাদারি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল প্রতিনিধি এবং তাদের মতো আরও যাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া এবং ইসলামের বিধিবিধান ও তার মৌলিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন, তাদের এই বিষয় থেকে যেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা প্রতিটা মুসলিমের জন্য বুঝে নেওয়া উচিত, তা হলো—মুসলিমের কাঁধে ইসলামের জিম্মাদারিটা প্রতিটি যুগে সহজ নয়, যেমনটি তাদের অধিকাংশরা ধারণা করে থাকে।

সুতরাং শুধু মুখে মুখে ইসলাম দাবি করাটাই যথেষ্ট নয়। আবার ইসলাম গ্রহণ করে অন্যকে দাওয়াত না দিয়ে শুধু বসে থাকা, কিংবা শুধু নিজে নিজেই আমল করাও যথেষ্ট নয়।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ দাওয়াতি দায়িত্ব পালন না করবে, ইসলামের মাধ্যমে সুসংবাদ না দেবে, দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দায়মুক্ত হতে পারবে না। তাদের কাঁধে দ্বীনের জিম্মাদারি থেকেই যাবে।

আমাদের আমানত

আর এটা আমাদের কাঁধে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আমানত। এবং এটা এমন এক দায়িত্ব—যা কোনো যুগে, কোনো স্থানে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। চার ইমাম এবং উলামায়ে কিরাম এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার স্বদেশ ও তার বাহিরের দেশে দাওয়াতি কাজ করা ফরজে কিফায়া। সুতরাং তারা ততক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে থেকে একটা দল এই কাজ নিয়ে তাদের সাধ্যানুযায়ী

দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে না পড়বে এবং মানুষের মনে ইসলামের প্রতি সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ এবং ওয়াসওসার অবসান না ঘটাবে।

দায়িত্ব কি শুধু পুরুষের?

সুতরাং প্রতিটা দেশে এ রকম একটা দলও যদি কাজ না করে, তাহলে ওই সকল দেশের সবাই গুনাহগার হবে। জমহুর উলামায়ে কিরামের বিশুদ্ধমতে, এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব শুধু পুরুষের জন্যই আবশ্যক তা নয়; বরং নারী-পুরুষ স্বাধীন-গোলাম সবার জন্য তাদের সাধ্যনুযায়ী ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত সে শরয়ি বিধিবিধান পালনে আদিষ্ট থাকবে, দাওয়াত ও ইসলাহমূলক কাজের শক্তি ও সক্ষমতা থাকবে।[২৩৯]

দায়ির (প্রচারকের) গুণাবলি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ ইবনে জাবাল ও আবু মুসা আশআরি রা.-কে যেই উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, তা এ কথার প্রমাণ করে যে, একজন দায়ির জন্য অবশ্যই বিশেষ কিছু গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। যেমন—

একজন দায়ির জন্য আবশ্যক হলো, কঠিন ও কঠোরতা পরিহার করে সহজকে প্রাধান্য দেওয়া, সতর্কতা ও হুমক-ধমকির চেয়ে বেশি সুসংবাদ শোনানো। আর এটাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম تنفير(বিতাড়ন ও ঘৃণা সৃষ্টি করা) বলে ব্যক্ত করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ রা.-কে আদেশ করেছিলেন—মানুষকে প্রথমত তাওহিদের দিকে ডাকবে; তারা এতে সাড়া দিলে এরপর তাদের সালাতের প্রতি আহ্বান করবে; এটা যদি তারা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জাকাত দিতে বলবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আদেশগুলোর মধ্যে দায়ির দাওয়াতের পদ্ধতি কী হবে? তার মধ্যে কী কী গুণ থাকতে হবে—তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তবে সহজকরণ এবং সুসংবাদ শোনানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, শরিয়ত এবং বৈধতার সীমা যেন ছাড়িয়ে না যায়। শরয়িতের বৈধতার গন্ডির মধ্যে থেকেই

---

২৩৯ দেখুন—*মুগনিল মুহতাজ* খণ্ড :৪, পৃষ্ঠা : ২১১; আরও দেখুন—মাওয়ারদি রহ.-এর রচিত *আল আহকামুস সুলতানিয়া।*

সুসংবাদ শোনাতে হবে। সুতরাং সহজকরণ ও সুসংবাদ শোনানোর অর্থ এই নয় যে, শরয়ি কোনো বিধানকে পরিবর্তন করে দেওয়া কিংবা দ্বীনের কোনো অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে তামাশা করা। এবং বৈধ কে অবৈধ ও অবৈধকে বৈধ সাব্যস্ত করা।

দাওয়াতের আদব

আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের আদব হলো—(এটা রাষ্ট্র পরিচালনা এবং নেতৃত্বের ও আদব) জুলুম পরিহার করা। বিশেষ করে অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ গ্রহণ করার মাধ্যমে জুলুম না করা। এটা জুলুমের ভয়ংকর একটা প্রকার। কেননা, দায়ি অনেক সময় নিজের দায়িত্ববোধ ভুলে গিয়ে এবং আল্লাহর ভয় থেকে গাফেল হয়ে এ ধরনের জুলুমে লিপ্ত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বাদশাহ, বিচারক ও নেতারাও এ রকম জুলুম করে থাকে। যা তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়।

একজন দায়ির মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ দাওয়াত ও নেতৃত্বের গুণাবলি, মুআজ ইবনে জাবাল রা. যেহেতু সে সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন, তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় জুলুম থেকে সতর্ক থাকার ওপর এই বলে জোর দিয়েছেন—

> মাজলুমের বদদুআকে ভয় করো! কেননা, তার দুআ ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে কোনো অন্তরাল নেই।

অর্থাৎ, মাজলুমের দুআ অতি দ্রুত কবুল হয়।

* * *

বিদায় হজের অপূর্ব ভাষণ

জাবির রা থেকে বর্ণিত—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় নয় বছর অবস্থান করলেও এ সময়ের ভেতর কোনো হজ করেননি। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির দশম বছর তিনি তাঁর হজ করার ব্যাপারে মানুষদের জানালেন। তাই (ওই বছর) বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম হলো। প্রত্যেকেরই একান্ত কামনা ছিল, সে নবিজির অনুসরণ করবে, তাঁর মতো কাজ করবে। (অর্থাৎ নবিজি থেকে হজের বিধিবিধান শিখবে।)

জিলকদ মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন বাকি আছে, এমন সময় নবিজি মদিনা থেকে বের হলেন।[২৪০]

জাবির রা. বলেন—

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীতে সওয়ার হওয়ার পর সেটা যখন তাঁকে নিয়ে থামল, তখন আমি আমার দৃষ্টিসীমায় যতদূর দেখা যায় ততদূর চেয়ে দেখলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আরোহী আর আরোহী, পদাতিক আর পদাতিক; তাঁর ডান পাশেও ওরকম এবং তাঁর বাম পাশেও অনুরূপ;

---

২৪০ নবিজি যেদিন বের হয়েছিলেন, সেদিনের নাম নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। ইবনে হাজমের মতে বৃহস্পতিবার। অন্যরা বলেন শুক্রবার। তবে ইবনে সাআদ তাবাকাতু ইবনি সাআদ-এ যে শনিবারের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা সহিহ। এবং ইবনে হাজার ফাতহুল বারি-তে এ ব্যাপারটা সুনিশ্চিত হিসাবে প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার ছিল জিলহজের এক তারিখ। এটা ধরলে জিলকদ ২৯ দিনে হবে। যারা জিলকদের পঁচিশ তারিখ বের হওয়ার কথা বলেছেন; এ সম্পর্কে বলা হবে, মাস ত্রিশ দিনে হবে, তা ধারণা করে এটা বলা হয়েছে।

পেছনেও একই রকম। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে। তখন তাঁর নিকট ওহি নাজিল হচ্ছিল।

ওই বছর করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজের ধরন নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। আহলুল মাদিনা মনে করেন, সে হজটি ছিল 'হজে ইফরাদ' (যে হজে শুধু হজই করা হয়, সাথে কোনো উমরাহ করা হয় না)।

অন্যরা মনে করেন, নবিজি তাঁর হজের সাথে উমরাহ করেছেন (ফিকহের পরিভাষায় যাকে হজে কিরান বলে)। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তিনি প্রথমে উমরা করেন, তারপর হজ। (ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় যেটাকে হজ্জো তামাত্তু' বলে)

উঁচু ভূমি দিয়ে নবিজি মক্কায় প্রবেশ করেন। এবং বনু শাইবার ফটকের নিকট গিয়ে উপনীত হন। এরপর যখন তিনি বাইতুল্লাহ দেখতে পেলেন, তখন বললেন—

اللّٰهُمَّ زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما و برا

"হে আল্লাহ! আপনি এই ঘরের ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও মহিমা বাড়িয়ে দিন। এখানে হজ ও উমরাহ করতে এসে যারা তাকে সম্মান করে, আপনি তারও ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, মহিমা ও পুণ্য বাড়িয়ে দিন।[২৪১]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজের কাজ করতে গেলেন। এবং মানুষকে মানাসিকুল হজ'(হজের বিধিবিধান), হজের নীতিমালা শেখালেন।

আরাফার দিন নবিজি তাঁর পাশে থাকা বিপুলসংখ্যক মানুষের মাঝে অনন্য এক বক্তৃতা করলেন :

হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা (মনোযোগ দিয়ে) শোনো। এ বছরের পর চিরদিনের জন্য এখানে আর তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব কি না, তা জানি না।

হে লোকসকল! তোমাদের এই দিনটি যেমন হারাম (অর্থাৎ এতে অন্যায় কাজ করা যেমন হারাম), তোমাদের এই মাসটি যেমন হারাম, তোমাদের এই শহরটি যেমন

২৪১ তাবারানি, ইবনে সাআদ

হারাম, ঠিক একইভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের জন্য হারাম (অর্থাৎ এসবের ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ হারাম)।

জেনে রাখো! জাহেলি যুগের প্রত্যেক জিনিসই আমার পায়ের নিচে দলিত। (ইসলাম আসার পর) জাহেলি যুগের রক্তপণের কোনো মূল্য নেই। সর্বপ্রথম আমাদের রক্তপণ থেকে আমি ইবনে রাবিআ ইবনুল হারিসের রক্তপণ বাদ করে দিচ্ছি। জাহেলি যুগের রিবারও (সুদ) কোনো মূল্য নেই। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রিবা বাদ করে দিচ্ছি। কারণ, এর পুরোটাই অবান্তর।

হে লোকসকল! শয়তান চিরকালের জন্য তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যদি তার অনুসরণ করা হয়, তাহলে তোমরা নিতান্তই ছোটো ভাবো—তোমাদের এমন কাজেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা তাকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে ভয় করো।

হে লোকসকল! এই মাস পিছিয়ে দেওয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফিরগণ গোমরাহিতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে হালাল করে এবং আল্লাহর হালালকৃত মাসগুলোকে হারাম করে।

হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আসমান-জমিন সৃষ্টির শুরুর দিন থেকে সময় (হজের সময়) যেই অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় আবার ফিরে এসেছে। মাস বারোটি। এর মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস। সেই চারটির তিনটি একাধারে জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম। আরেকটি রজব; যা জুমাদা ও শাবান মাসের মাঝে হয়ে থাকে।

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তোমরা তাদের আল্লাহর নিরাপত্তায় নিজেদের করে নিয়েছ। আল্লাহর কালিমার (বিবাহ) মাধ্যমে তোমরা তাদের সম্ভোগের মালিক হয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের হক রয়েছে এবং তোমাদের ওপরও তাদের হক রয়েছে। তাদের ওপর তোমাদের হক হলো, তারা এমন কাউকে তোমাদের বিছানায় আসতে দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ করো।[২৪২]

---

২৪২ এখানে বিছানায় আসা মানে জিনা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, সে কাউকে অন্যায় অনুপ্রবেশের অনুমতি দেবে না।

যদি তারা এ রকম করে, তাহলে তোমরা তাদের আলতো প্রহার করো।

আর তোমাদের ওপর তাদের হক হলো, উত্তমরূপে তাদের ভরণপোষণ করা।

হে মানুষেরা! তোমরা আমার কথাকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। কারণ, আমি (তোমাদের কাছে সত্যের বাণী) পৌঁছে দিচ্ছি। তোমাদের সামনে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নত।

হে লোকসকল! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের শাসকদের কথা শোনো এবং তাদের অনুসরণ করতে থাকো; যদিও কুৎসিত হাবশি গোলামকে তোমাদের দায়িত্বশীল শাসক বানানো হয়—যতক্ষণ পর্যন্ত সে কিতাবুল্লাহর ওপর অটল থাকবে।

তোমাদের গোলাম..তোমাদের গোলাম...!

(অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোলদের সাথে সদাচার করো।) তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরও তা পরিধান করাবে। যদি তারা অমার্জনীয় কোনো অপরাধ করে, তাহলে তাদের বিক্রি করে দেবে; কিন্তু শাস্তি দেবে না।[২৪৩]

হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। কারও জন্য তার ভাই খুশিমনে যতটুকু দেয়, সেটুকু ছাড়া অতিরিক্ত কিছু (মাল) জায়েজ হব না।

তোমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আমি কি বোঝাতে পেরেছি?

তোমাদের তো অচিরেই তোমাদের রবের সাথে মিলিত হতে হবে, সুতরাং আমার মৃত্যুর পর তোমরা (আগের) ভ্রান্তিতে ফিরে যেয়ো না। (তোমাদের মাঝে) যে উপস্থিত, সে যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়। এমনও হতে পারে, যার কাছে পৌঁছানো হবে, সে (এখানে থাকা) শ্রবণকারী ব্যক্তি থেকে বেশি সংরক্ষণকারী হবে। কিয়ামতের দিন আমার দায়িত্ব আদায় সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হলে তোমরা কী বলবে?

---

২৪৩ এ দুটি অংশ তাবাকাতু ইবনি সাদ-এর রেওয়াতে এসেছে

তারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দেবো, আপনি আমাদের নিকট (আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ) পৌঁছিয়েছেন। আপনি (আপনার দায়িত্ব) আদায় করেছেন। এবং আপনি নসিহত করেছেন। এরপর তিনি তাঁর শাহাদাত আঙুল আকাশের দিকে ওঠালেন। এরপর মানুষের দিকে ইশারা করে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[২৪৪]

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে থাকেন। সূর্যাস্তের পর তিনি তাঁর সাথে থাকা লোকজনকে নিয়ে মুজদালিফার দিকে রওনা হলেন।

তিনি তখন ডান হাতে ইশারা করে বলছিলেন—

ايها الناس، السكينه، السكينه

হে লোকসকল! স্থির থাকো। স্থির থাকো। (অর্থাৎ ধীরেসুস্থে চলো।)

মুজদালিফায় মাগরিব ও ইশা ('জামউ তাখির' হিসেবে) একসাথে পড়লেন। ওই রাতটা মুজদালিফায় কাটালেন। এরপর সূর্য ওঠার পূর্বেই মিনায় চলে গেলেন। জামরাতুল আকাবাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন; প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবির পাঠ করছিলেন। এরপর তিনি কুরবানির স্থলে ফিরে এসে নিজে ৬৩টি উট কুরবানি করেন। এরপর সংখ্যা (১০০) পূর্ণ করার জন্য আলি রা.-কে দায়িত্ব দেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীতে আরোহণ করে 'তাওয়াফে ইফাদা' করেন। এবং মক্কাতেই জোহরের সালাত পড়েন।

এরপর তিনি বনু আবদুল মুত্তালিবের নিকট এলেন। তারা তখন জমজমের নিকটে মানুষকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন, বনু আবদুল মুত্তালিব! তোমরা (বেশি করে) পানি তুলতে থাকো।

যদি পানি পান করানোতে অন্যান্য মানুষ তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে ওঠাতাম।

---

২৪৪ এই বক্তৃতার শব্দ ও বাক্যমালা সহিহ মুসলিম থেকে নিয়েছি। তবে সহিহ বুখারির বর্ণনায় আছে, এমন অতিরিক্ত কিছুও যোগ করেছি। এ ছাড়াও ইবনে ইসহাক, তাবাকাতু ইবনি সাদসহ বিভিন্ন কিতাবে এ ব্যাপারে বর্ণিত অতিরিক্ত অংশও যোগ করা হয়েছে।

এরপর তারা তাঁর হাতে (জমজমের পানিভর্তি) একটি বালতি তুলে দিলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে পান করলেন।[২৪৫]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসার জন্য রওনা করলেন।

* * *

২৪৫ নবিজির হজের ব্যাপারে জাবের রা.-এর বর্ণনা; মুসলিমসহ অনেকে তা উল্লেখ করেছেন।

আমাদের পাঠ ও শিক্ষা

(এক.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়টি হজ করেছেন? হজ ফরজ যখন হয়েছিল?

ইসলাম আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরির হজ ছাড়া অন্য কোনো হজ করেছেন কি না? এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে ইখতেলাফ রয়েছে।

ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরতের পূর্বে তিনটি হজ করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার *ফাতহুল বারি*-তে লিখেছেন, এ ব্যাপারটা (হিজরতের আগে নবিজির হজ) নবিজির কাছে আসা আনসারদের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের ওপর নির্ভরশীল। তারা হজ আদায়ান্তে মিনার সন্নিকটে যতবার নবিজির কাছে এসেছিল ততবার। (অর্থাৎ তারা যতবার এসেছিল, ততবার হজ করেছেন।) তারা প্রথমবার এসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়বার এসে বাইয়াতুল উলা'র কাজ সম্পন্ন করেছে। তৃতীয়বার এসে বাইয়াতুস সানিয়া'র কাজ সম্পন্ন করেছে।[246]

কেউ কেউ বর্ণনা করেন, হিজরতের পূর্বে প্রত্যেক বছরই নবিজি হজ করেছেন।

বাস্তবতা যেটাই হোক, হজ দশম হিজরিতে শরিয়তে বিধিবদ্ধ হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। দশম হিজরির পূর্বে হজ আবশ্যক ছিল না। দশম হিজরিতেই হজ ফরজ হয়েছে।

দশম হিজরির পরে যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর নতুন কোন হজ করেননি, সে কারণে অনেক সাহাবায়ে কেরাম দশম হিজরির হাজ্জাতুল বিদা'

---

২৪৬ (সুতরাং হিজরতের পূর্বে নবিজির হজের সংখ্যা তিনটি হলো।)

(বিদায় হজ)-কে 'হাজ্জাতুল ইসলাম' বা 'হাজ্জাতু রাসুলিল্লাহ সা' বলে থাকেন। ইমাম মুসলিমও এই নামেই এ হাদিসের শিরোনাম করেছেন।

দশম হিজরির আগে হজ ফরজ ছিল না, এর সবচেয়ে বড়ো দলিল আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল আসার বর্ণনা। ইমাম বুখারি ও মুসলিম দুজনই বর্ণনা করেছেন—তারা (আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমাদের 'সিদ্ধান্তমূলক কিছু বিষয়' (স্পষ্ট কিছু বিধিবিধান)-এর আদেশ করুন; যেগুলোকে আমরা আঁকড়ে ধরব। এবং আমাদের যারা এখানে আসেনি, তাদের এ ব্যাপারে আদেশ করব আর এসবের মাধ্যমে জান্নাতে যাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদের চারটি বিষয়ের আদেশ করব। এবং চারটি বিষয় থেকে নিষেধ করব। আদেশের চারটি বিষয় বর্ণনা করে তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহর ব্যাপারে ঈমান আনার, সালাত প্রতিষ্ঠার, জাকাত আদায়ের, রমজানের রোজা আদায়ের এবং গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করে দেওয়ার আদেশ করছি।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, এখানে যে ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, এটা অতিরিক্ত; যেহেতু এটা তাদের নিকট নিতান্তই প্রসিদ্ধ। আর এটাকে উল্লেখ করেছেন অন্যান্য বিষয়—যেগুলো এর ওপরই নির্ভরশীল—সমূহে তাকিদের জন্য।

যাক, যেটা বলছিলাম, এই প্রতিনিধিদল এসেছিল নবম হিজরিতে। আর তখন যদি হজ ফরজ থাকত, তাহলে অবশ্যই এটাকে আদেশকৃত বিষয়াবলির মধ্যে গণ্য করতেন।

(দুই.) নবিজির হজের ব্যাপক অর্থ

নবিজির এই হজে ইসলামি দাওয়াত, নবিজীবন এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার সাধারণ রূপরেখা সম্পৃক্ত বিশেষ অর্থ রয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুসলমানরা সালাত, সিয়াম, জাকাতসহ তাদের দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যকীয় ইবাদতসমূহ শিখেছেন। এবং হজ আদায়ের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে চলে আসা জাহেলি সব ভ্রান্ত বিশ্বাস— তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা, শিস দেওয়া, হাততালি দেওয়া ইত্যাদি অপনোদনের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হজের বিশুদ্ধ বিধিবিধান ও তা আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বাইতুল্লাহকে মূর্তি থেকে নিষ্কলুষ করার অভিযানের মতো হজ সম্পৃক্ত এসব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়েছেন।

বাইতুল্লাহর ডাক, হজের আহ্বান

কিয়ামত পর্যন্ত চলমান। এটা তো আবুল আম্বিয়া ইবরাহিম আ.-এর ডাক। কিন্তু জাহেলি ভ্রান্ত সব বিশ্বাস, ও মূর্তিময় সংস্কৃতি এতে কুফর-শিরকের বাষ্প ছড়িয়েছে। আর ইসলাম এসেছে এসব পঙ্কিলতা থেকে ধুয়েমুছে নির্মল করে মানুষকে সমাজকে তাওহিদের আলোয় আলোকিত করার জন্য।

এ কারণে নবিজি হজ করবেন বলে মানুষকে জানিয়ে দিলেন। নবিজির ঘোষণা শুনে, জাহেলি কলুষতা থেকে মুক্ত ও বিশুদ্ধ আমল শিখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসল।

নবিজির এটা জানা ছিল যে, তাঁর মহান দায়িত্ব দাওয়াতের কাজ পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। কারণ, তিনি তাঁর সেই মহান দায়িত্বটি আদায় করে ফেলেছেন। জাজিরাতুল আরব তাওহিদের সজীবতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই হয়েছে ইসলামের বিজয়। ইসলাম সবখানেই মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করে চলছে।

এখন বিপুলসংখ্যক মানুষ নবিজির সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎ এবং তাঁর নির্দেশনা ও উপদেশ থেকে কল্যাণ লাভের ব্যাপারে সবিশেষ আগ্রহী। নবিজিও সে ব্যাপারে আগ্রহী। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের (আরব উপদ্বীপ) বিভিন্ন অঞ্চলের যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, নবিজির সাথে যথেষ্ট পরিমাণের সাক্ষাতের সুযোগ যাদের হয়নি, তাদের দীর্ঘ সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ এই হজে— বাইতুল্লাহর নিকটে, আরাফা প্রান্তরে। এবং এই সাক্ষাৎটা হবে ইসলামে অনন্য নিদর্শন হজে উম্মত ও স্বয়ং রাসুলের মাঝে সাক্ষাৎ!

আল্লাহ তায়ালার তো ভালো করেই জানা ছিল, এটা রাসুলের বিদায়ী সাক্ষাৎ। এ ব্যাপারটা তিনি রাসুলকেও জানিয়ে দেন, যেন তিনি উম্মতকে বিদায়ী নসিহত করে যেতে পারেন।

এ ছাড়া নবিজির ইচ্ছে ছিল, তেইশ বছরে অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে আসা একটি দলের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও ইসলামি জীবনব্যবস্থা

হৃদয়ের গহিনে লুক্কায়িত আবেগ ও চরম ভালোবাসাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত নসিহতে,

অর্থপূর্ণ কথায় তুলে ধরবেন। এবং তাদের মাধ্যমে বহু যুগের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সেসব নসিহত ও অসিয়ত পৌঁছে দেবেন ।

এই তো গেল, নবিজির হজ—বিদায় হজের বিশেষ কিছু অর্থ। আপনি আরাফার দিন 'ওয়াদি উরনাহ'-তে নবিজি যেই গুরত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণ নিয়ে ভাবতে বসলে আপনার সামনে এসব বাস্তবতাই ফুটে উঠবে।

(তিন.) বিদায় হজের খুতবা : কিছু ভাবনা

উম্মতের কল্যাণকামী হয়ে টানা ২৩টি বছর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকে মহান দায়িত্ব পালন করে আরাফার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই খুতবা দিয়েছিলেন, আল্লাহর শপথ! কতই-না চমৎকার! সেই সময়টা কতই-না স্মৃতিময়; একসময় তাঁর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা মানুষজন তারাই আজ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তাঁর আশপাশ ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অমূল্য রতনগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে! হাজার হাজার মানুষের ঢল। যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষ আর মানুষ! সর্বত্র যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল :

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنا وَالَّذينَ ءامَنوا فِي الحَيوٰةِ الدُّنيا وَيَومَ يَقومُ الأَشهٰدُ

> আমি সাহায্য করব রাসুলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। [২৪৭]

নবিজি জনতার উপস্থিতির এই স্রোতের মধ্য দিয়ে সুদূর আগামীর পথপানে দৃষ্টি মেললেন। যেখানে নতুন প্রজন্ম, নতুন ইসলামি দুনিয়া—পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। তিনি নতুন পৃথিবীর শ্রোতাদের উদ্দেশ করে বিদায়ী ভাষণ দিচ্ছেন :

'হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা (মনোযোগ দিয়ে) শোনো। এ বছরের পর চিরদিনের জন্য এখানে আর তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব কি না, তা জানি না।'

যার তেইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে

পাহাড়-পর্বত নির্জন প্রান্তর, সরব জনপদে সর্বত্র সৌভাগ্যের ফোয়ারা ছুটছিল, যিনি পৃথিবীময় ঈমানের চারা রোপণ করেছিলেন, তিনিই আজ বিষাদময় যাত্রার আয়োজন করছেন! তাই আজ সবাই তাঁর বিদায়ী ভাষণে নিশ্চুপ! বাক্‌হারা! সবাই বিদায়ী কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে।

---

২৪৭ সুরা গাফির : ৫১

নিচের কয়েকটি অনুচ্ছেদে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তাঁর আনীত যেসব আদর্শের—যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন—সেগুলো তুলে ধরব :

❀ সুবহানাল্লাহ! তাঁর দৃষ্টি কতই-না সুদূরপ্রসারী! তিনি বাস্তবতার আয়নায় অসিয়ত করছেন। বাস্তবতার আয়নায় তিনি দেখেছিলেন, যুগে যুগে তাঁর উম্মতেরা তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ থেকে সটকে পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্যের রক্ত খেলায় মেতে উঠবে। তাই সতর্ক করে তিনি বলেছিলেন :

'হে লোকসকল! তোমাদের এই দিনটি যেমন হারাম অর্থাৎ এতে অন্যায় কাজ করা যেমন হারাম, তোমাদের এই মাসটি যেমন হারাম; তোমাদের এই শহরটি যেমন হারাম, ঠিক একইভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের জন্য হারাম। অর্থাৎ এসবের ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণ হারাম।'

তিনি এই কথাটাই তাঁর বক্তব্যের শেষে পুনরাবৃত্তি করেন এবং এর গুরুত্বকে আরও ফুটিয়ে তুলেন :

'হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, প্রত্যেক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। কারও জন্য তার ভাই খুশিমনে যতটুকু দেয়, সেটুকু ছাড়া অতিরিক্ত কিছু (মাল) জায়েজ হবে না।'

ওগো প্রিয়তম! হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আপনি আপনার বার্তা পৌঁছেছেন...

আপনি আপনার বার্তা পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছেন...সম্ভবত আজ আমরা আপনাকে এ স্বীকারোক্তি দেওয়ার অধিক উপযুক্ত। যদিও আমরা আমাদের ওপর দেওয়া দায়িত্বপালনে সব ধরনের কসুর করছি!

তিনি এখানে শুধু নসিহতই করছেন না; সঙ্গে তিনি উপস্থিত জনতাসহ পরবর্তী প্রজন্ম সবাইকে হুঁশিয়ার করে স্পষ্ট বার্তা শোনাচ্ছেন :

'সাবধান! জেনে রাখো! জাহেলি যুগের প্রত্যেক জিনিসই আমার পায়ের নিচে দলিত। (ইসলাম আসার পর) জাহেলি যুগের রক্তপণের কোনো মূল্য নেই। সর্বপ্রথম আমাদের রক্তপণ থেকে আমি ইবনে রবিয়া ইবনুল হারিসের রক্তপণ বাদ করে দিচ্ছি। জাহেলি যুগের রিবারও (সুদ) কোনো মূল্য নেই। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রিবা বাদ করে দিচ্ছি। কারণ, এর পুরোটাই অবান্তর।'

এর মানে কী? তিনি বলতে চাচ্ছেন—

জাহেলি সমাজের যত গৌরব—নানা রঙের আসাবিয়্যাত—অন্ধ স্বজনপ্রীতি, বর্ণ-ভাষার পার্থক্যের গৌরব, নিদারুণ জুলুম-নিপীড়ন, মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবন্ধকরণ—আজ সব নিশ্চিহ্ন; আজ যেসবের কোনো মূল্য নেই। আজ তা দুর্গন্ধময় মৃত দেহ, আজ ইসলাম যাকে মাটির গর্ভে ঢুকিয়েছে। জাহেলি ওসব গৌরব একজন মুসলিমের কাছে যা আজ নিদারুণভাবে পদদলিত। আজ নিতান্তই তা অপাঙক্তেয়।

কে সেই মাটি খুঁড়ে মৃত দেহের দুর্গন্ধ ছড়াবে? গতকাল যেই দাসত্বের যেই শৃঙ্খলকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল, কে আজ তাতে আবার বন্দি হবে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবতা, উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাঠ থেকে জাহেলি সমাজের দুর্গন্ধময় অপসংস্কৃতিকে ঝেড়ে ফেলেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, ওসব পঙ্কিলতা আজ পদদলিত এবং মাটির গর্ভে লুক্কায়িত। এখানে যুগ-যুগান্তরে পরবর্তী সব প্রজন্মের পাঠ রয়েছে। যে-ই উন্নত চিন্তার নামে মাটির গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ওসব পঙ্কিলতা খুঁড়ে বের করবে, সে-ই পশ্চাৎগামী হয়ে আবার ইতিহাসের সেই ঘোরতম অন্ধকারে ফিরে যাবে; যদিও এটাকে উন্নতি-অগ্রগতির তকমা লাগানো হয়।

❀ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বছর হজের মাসের ক্ষেত্রে মৌলিক সময় ফিরে আসার ব্যাপারে ঘোষণা করলেন। কারণ, জাহিলে যুগে এমনকি ইসলামের শুরুর দিকেও হজের মাসসমূহের ব্যাপারে যথেচ্ছা বিধান করা হতো। তারা—মুজাহিদ প্রমুখ যেমনটা বলেছেন—প্রত্যেক দুই বছরে বছরের একটি নির্দিষ্ট মাসে হজ আদায় করত। সে মতে, তারা দুই বছর হজ করত জিলহজ মাসে। আবার দুই বছর হজ আদায় করত মহররম মাসে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বছর হজ করেন, সে বছর হজটা জিলহজ মাসে এসে মিলল। তখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, আসমান-জমিন সৃষ্টির দিন থেকে সময়ের যেই অবস্থা ছিল, সময় সেই আপন অবস্থায় ফিরে এসেছে।

সুতরাং মাসকে উলটপালট করে খেলার বস্তু বানানো যাবে না। আজকের পর থেকে কেবল জিলহজেই হজ আদায় করা হবে।

কারও কারও বর্ণনামতে, মুশরিকদের হিসেবে বছর ছিল ১২ মাস ১৫ দিনে। পনেরো দিনের এ বৃদ্ধির কারণে মাসের ঘূর্ণায়নে বছরের প্রত্যেক মাসেই হজ পড়ত। সে হিসাবেই আবু বকর রা. যখন নবম হিজরিতে হজ করলেন, তখন সেটা জিলকদ মাসে পড়ল। কিন্তু দশম হিজরিতে যখন নবিজি হজ করেন, তখন সেটা গিয়ে পড়ল জিলহজ মাসে । তখনই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, আজকের পর থেকে মাসের ব্যাপারে আরবের সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে শুধু বারো মাসের হিসাব করা হবে। আজকের পর থেকে অতিরিক্ত হিসাবটুকুর সুযোগ নেই।

কুরতুবি বলেন, এটা 'নিশ্চয়ই সময়...' এ কথার সাথে বেশি মিলে। অর্থাৎ শরিয়ত বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী আসমান-জমিন সৃষ্টির পর থেকে হজের যে মৌলিক সময় ছিল, সে মৌলিক সময়ে হজ আবার ফিরে এসেছে।[৪]

❀ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের সাথে সদাচার করতে করতে বলেন। জাহেলি যুগে মহিলাদের ওপর বয়ে চলা জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন এবং শরিয়ত নির্ধারিত মহিলার হক (প্রাপ্য অধিকার) ও তার মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে কথা বলেন।

জাহেলি সমাজে বেড়ে ওঠা নওমুসলিম—জাহেলি যুগে যাদের কাছে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার ছিল না, তাদের জন্য এ নসিহতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল আরও বেশি। এ প্রয়োজনীয়তা সব যুগেই সমান। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক কালেই মুসলমানরা নারীদের অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে বিশাল পার্থক্য করে থাকে। কেউ কেউ আবার নারী-সম্ভোগের বিভিন্ন উপকরণকে বৈধতাদানের চেষ্টা করেন।

❀ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে সব সংকট সমাধানে দুটি বিষয় (কুরআন ও সুন্নাহ)-কে সামনে রাখার কথা বলেন। এ দুটিকে আঁকড়ে ধরলে সব ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারটা নিশ্চিত করেন।

এটা নির্দিষ্ট কোনো গন্ডির ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়; প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য সমান বাস্তবতা। অন্য যেকোনো শক্তি এ দুটির ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে না।

❀ তিনি এখানে শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজার সম্পর্কের ধরন উল্লেখ করেন। প্রজা বা শাসিতকে শাসক—সে যেমনই হোক এবং তার বংশমর্যাদা যেমনই

হোক— যতক্ষণ কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে, ততক্ষণ তাকে মানতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে গেলে তখন আর অনুসরণের দায় থাকে না। একজন শাসক যখন কুরআন-সুন্নাহর ধারার ওপর থাকে, তখন তার শাসন মানতে কোনো বাধা নেই; এখন সে যেমনই হোক, চাই সে কুৎসিত হাবশি গোলামই হোক না কেন।

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করেছেন, কুরআন-সুন্নাহর সীমার ক্ষেত্রে শাসকের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ইসলামি শাসনের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। সে তো প্রকৃত শাসক নয়। প্রকৃতপক্ষে তার কোনো ক্ষমতা নেই। সে তো কেবল মুসলমানদের পক্ষে একজন দায়িত্বশীল; যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে।

অবশেষে নবিজি নিশ্চিত হতে পারলেন, তিনি তাঁর দাওয়াতের কাজ পুরোপুরি আঞ্জাম দিয়েছেন। ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে, জাহেলি ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, শিরক মাটির নিচে চাপা পড়েছে। শরিয়তের বিধিবিধানও পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। এ ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা আয়াতও নাজিল করেছেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

> 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[২৪৮]

কিন্তু তিনি উম্মতের সাক্ষ্যের মাধ্যমে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছেন, যারা কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। তাই বক্তৃতা শেষে বললেন, 'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তোমরা কী বলবে?'

চারপাশ থেকে উচ্চ আওয়াজ ভেসে এলো, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, আপনি আমাদের নিকট (আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ) পৌঁছিয়েছেন। আপনি (আপনার দায়িত্ব) আদায় করেছেন এবং আপনি নসিহত করেছেন।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন। তাঁর মন প্রশান্ত হলো।

---

২৪৮ সুরা মায়িদা : ০৩

তার চোখে-মুখে খুশিরা ঝিলিক দিয়ে উঠল। তিনি শাহাদাত আঙুলে ইশারা করে আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর মানুষের দিকে তাকালেন। বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন...হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন...হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

নবিজির কতই-না সৌভাগ্য! নবিজি—যিনি তাঁর জীবন-যৌবন আল্লাহর শরিয়া প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করেছেন—তাঁর চোখের সামনে দেখছেন ফেলে আসা অতীতের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলাফল! কিছু সুর; যা একত্ববাদের স্লোগানে দোলায়িত হচ্ছে। কিছু ললাট, যা মাওলার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে উন্মুখ! কিছু হৃদয়; যাতে আল্লাহ প্রেমের ধারা উতলে উঠছে!

ঈমান প্রসারের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অতীতের বিষাদময় কত স্মৃতি—তপ্ত দুপুরে পিপাসার্ত হওয়া, মরুর বুকে অজস্র সফর, হাসি-ঠাট্টা কটু কথার তির ইত্যাদি!

অথচ সেই ইসলামেরই আজ জয়জয়কার। ওগো প্রিয়তম! আপনার দু-চোখ আনন্দের অশ্রুতে আরও শীতল হোক!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ সমাপন করলেন। জমজমের পানি পান করলেন। মানুষকে হজের বিধানাবলি শেখালেন। এরপর মদিনায় ফিরে এলেন। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে, উৎফুল্লে আপনার হৃদয়-মন ভরে উঠুক।

ওগো প্রিয়তম! আল্লাহর শপথ! এটা শুধু আপনার পাশে জড়ো হওয়া মানুষজনের সাক্ষ্য নয়; প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক সময়ের মুসলমানদের সাক্ষ্য। যাদের মুখে প্রতিধ্বনিত হবে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। উম্মাহর কল্যাণ করেছেন। একজন নবিকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যে রকম জাজা দেওয়া হয়, আল্লাহ তায়ালা সে রকম জাজা আপনাকে দিন।

আপনার পরে এই গুরুভার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে আমরা কতটা পিছিয়ে! আমাদের মাঝে কত অলসতা! কত গুরুত্বহীনতা, চোখ ধাঁধানো দুনিয়ার চাকচিক্য হারিয়ে যাওয়া...হে প্রিয়তম! অথচ আপনার পাশে জড়ো হওয়া পবিত্র মানুষগুলো কতটা আপনার জন্য উৎসর্গিত ছিলেন! আপনার দ্বীন রক্ষার জন্য তারা কতটা বিসর্জন দিয়েছেন নিজেদের!

আপনার দাওয়াতের পক্ষে মোকাবিলায়, আপনার দ্বীনে সাহায্য করতে তারা কতটা পরিশ্রম করেছেন! দুনিয়াকে কতটা বিসর্জন দিয়েছেন! তারা কত বিপুল রক্ত ঝরিয়েছেন!

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এবং সমস্ত মুসলমানদের অবস্থা বিশুদ্ধ করে দিন।

দুনিয়ার মাদকতায় বুঁদ হয়ে থাকা, প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলা থেকে আমাদের রক্ষা করেন। আমাদের হুঁশ ফিরিয়ে দিন। তাঁর দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় আমাদের ভরিয়ে দিন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ সমাপন করলেন। মানুষকে হজের বিধানাবলি শেখালেন। জমজমের পানি পান করলেন। এরপর মদিনায় ফিরে এলেন।

নবিজির অসুস্থতা : অনন্তের পথে যাত্রা

উসমা ইবনে জায়িদকে বলকার দিকে প্রেরণ

(বিদায় হজের সমাপন করে) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসতে না-আসতেই মুসলিমদের রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আদেশ করলেন। এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন উসামা ইবনে জায়িদ রা.-কে। তিনি তখন সদ্য বেড়ে ওঠা যুবক। তার পিতা যেখানে শহিদ হয়েছিলেন, নবিজি তাকে সেখানেই লড়াইয়ের জন্য যেতে আদেশ দিলেন। এবং তিনি ফিলিস্তিনের দুটি অঞ্চল Balqa ও Darom বিজয় করেন।

মুনাফিকদের আপত্তি

তখন নবিজির মৃত্যুরোগ (যেই রোগে আক্রান্তবস্থায় নবিজি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সে) শুরু হয়ে গেছে। নবিজি উসামা ইবনে জায়িদকে সেনাপ্রধান বানালেন; কিন্তু মুনাফিকদের কাছে নবিজির এই সেনাপ্রধান নির্বাচন পছন্দ হচ্ছিল না। তারা বলছিল—ইয়া রাসুলাল্লাহ, মুহাজির-আনসারদের মাঝে মুরুব্বি সাহাবিরা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অল্পবয়সি- একটি ছেলেকে প্রধান বানালেন?

নবিজি বের হয়ে, তখন মাথায় পট্টি প্যাঁচানো ছিল, বক্তৃতা করলেন—

তোমরা যদি উসামা ইবনে জায়িদের 'ইমারত' (আমিরের পদ) এর ব্যাপারে দোষারোপ করো, তাহলে ইতঃপূর্বে তোমরা তার পিতার ইমারতের ব্যাপারে

---

২৪৯ উসামা রা.-এর বয়স তখন ১৮/২০

দোষারোপ করেছ। আল্লাহর শপথ! সে (তার পিতা জায়িদ)-এর উপযুক্ত ছিল। আল্লাহর শপথ! সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল। আল্লাহর শপথ! আর এখন সে (উসামা) এর উপযুক্ত। এবং তার (জায়িদ) পরে সেই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। সুতরাং আমি তার অনুসরণের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। কারণ, সে তোমাদের সৎলোকদের একজন।[২৫০]

এরপর সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। মুহাজির ও আনসারদের বড়ো বড়ো সাহাবি তার সাথে বের হলেন। উসামা তার বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে 'জারফ' (মদিনা থেকে এক ফরসখ দূরে) নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেলেন

নবিজির অন্তিম অসুস্থতা

এ সময়টাতে এসে নবিজির অসুস্থতা—যা থেকে তিনি আর সেরে ওঠেননি, যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন—বেড়ে গেল। ওদিকে তিনি সৈন্য পাঠিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার (জয়-পরাজয়) অপেক্ষা করছিলেন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে সাআদের বর্ণনা থেকে আমরা নবিজি এই অসুখ শুরু হওয়ার ব্যাপারটা জানতে পারি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম আবু মুওইহিবা থেকে বর্ণিত—

রাতের আঁধারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু মুওয়াইহিবা, এই বাকির[২৫১] (ঘন গাছপালাবিশিষ্ট স্থান) অধিবাসীদের জন্য (অর্থাৎ এখানে যাদের দাফন করা হয়েছে) আমি ইসতিগফার করতে আদিষ্ট হয়েছি। এরপর তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। আমি তাঁর সাথে চললাম। আমরা যখন তাদের সামনে দাঁড়ালাম, তখন তিনি বললেন—হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যেই অবস্থাতেই থাকো, ভালো থেকো। কারণ, আজ মানুষ যেই কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এরচেয়ে তা ভালো। আজকাল অন্ধকার রাতের অংশগুলোর মতো—যে রাতগুলোতে পরে আসা অংশগুলো প্রথম আসা অংশের পেছনে আসে এবং যার অন্ধকার হয় প্রথমের চেয়ে আরও ভয়াল; ফিতনা ধেয়ে ধেয়ে আসছে!

---

২৫০ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম,* শব্দচয়ন : *সহিহ মুসলিম,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩১

২৫১ জান্নাতুল বাকির কথা বলা হচ্ছে।

এরপর তিনি আমার কাছে এসে বললেন—আমাকে দুনিয়ার ধনভান্ডারের চাবিকাঠি এবং চিরজীবন দান করা হয়েছে। আমাকে এসব এবং আমার রবের সাক্ষাৎ ও জান্নাত—এ দুটোর মাঝে কোনো একটা নির্বাচনের ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে। (বর্ণনকারী বললেন,) আমি বললাম—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হন। আপনি দুনিয়া ধনভান্ডারের চাবিকাঠি এবং চিরজীবন বেছে নিন। এরপর জান্নাত।

তিনি বললেন—আবু মুওয়াইহিবা, আল্লাহর শপথ! না। এটা না। আমি আমার রবের সাক্ষাৎ ও জান্নাত বেছে নিলাম। এরপর তিনি বাকিবাসীদের জন্য ইসতিগফার করে ঘরে ফিরলেন। এরপর থেকে তার অসুস্থতা শুরু হয়, যাতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৪৩]

প্রথমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচণ্ড মাথাব্যথা হলো। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকি থেকে যখন ফিরলেন, তখন আয়িশা রা. এগিয়ে এসে নবিজিকে বলছিলেন—হায় মাথাব্যথা! (অর্থাৎ আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা হচ্ছে!) নবিজি তাকে বললেন—আয়িশা, আল্লাহর শপথ! বরং আমারও প্রচণ্ড মাথাব্যথা হচ্ছে![২৪৪]

এরপর সেই মাথাব্যথা বেড়ে প্রচণ্ড জ্বর হলো। এটা শুরু হয়ে ছিল ১১ হিজরির সফরের শেষের দিকে। অসুস্থতার এ সময়টাতে আয়িশা রা. কুরআনে বর্ণিত মুয়াওওয়াজাত (আউজুবিল্লাহ-বিশিষ্ট সুরাসমূহ) দিয়ে 'রুকইয়া' (দম করা) করতেন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হতেন তখন 'মুয়াওওয়াজাত' (কুরআনুল কারিমের আউজুবিল্লাহ-বিশিষ্ট সুরাসমূহ) পড়ে নিজের গায়ে নিজেই ফুঁ দিতেন এবং হাত দিয়ে শরীর মুছতেন। যেই অসুস্থতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন,

---

২৪৩ এটি ইবনে ইসহাক, ইবনে সাআদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ, তারা আম্মাজান আয়িশা রা. ও আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় এ রকমই উল্লেখ করেছেন। তাদের সবার বর্ণনাই নিচে বর্ণিত ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিকের বর্ণনার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওই বর্ণনাটা এ রকম, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত—

> নবিজি সা. বের হয়ে কবরস্থানে গেলেন। এবং বললেন—মুমিনদের কবরে শান্তি বর্ষিত হোক, আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো...

অনেকেই ইমাম মুসলিম ও মালিকের এই বর্ণনাকে (বাকিতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য দুআ করার বর্ণনা) নবিজির মৃত্যুর পূর্বের বর্ণনার (বাকির অধিবাসীদের জন্য দুআর বর্ণনা) সাথে গুলিয়ে ফেলে ভুল করেন। উল্লেখ্য, প্রতি রাতে বাকিতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য দুআ ইস্তেগফার করা ছিল নবিজির অভ্যাস।

২৫৩ ইবনে ইসহাক, ইবনে সাআদ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদও দীর্ঘ বর্ণনায় তা এনেছেন।

সেটা যখন শুরু হলো, তখনও তিনি মুয়াওয়াজাত পড়ে নিজের গায়ে নিজে ফুঁ দিচ্ছিলেন এবং হাত দিয়ে শরীর মুছছিলেন।

আয়িশার ঘরে নবিজি

আয়িশা রা.-কে বেশি মহব্বতের কারণে এবং তার প্রতি নবিজির বিশেষ টান থাকার কারণে অন্যান্য স্ত্রীরা বুঝতে পারলেন, নবিজি অসুস্থতার দিনগুলো তার ঘরে যাপন করতে চাচ্ছেন। নবিজিকে সেই অনুমতি দেওয়া হলো। মাইমুনা রা.-এর ঘর থেকে নবিজি ফজল ইবনে আব্বাস ও আলি রা.-এর ওপর ভর করে আয়িশা রা.-এর ঘরে গেলেন।

আয়িশা রা.-এর ঘরে যখন তিনি গেলেন, তখন তার ব্যথাটা আরও বেড়ে গেল। সাহাবায়ে কিরামেরও দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। নবিজি এটা অনুভব করতে পেরে বললেন—

> তোমরা আমার ওপর সাত মশক পানি ঢালো, সম্ভবত এর মাধ্যমে আমার অবস্থা কিছুটা ভালো হবে। সম্ভবত আমি তাদের (সাহাবায়ে কিরামকে) অসিয়ত করতে পারব।

আয়িশা রা. বলেন—আমরা তাঁকে একটি (সে যুগে প্রচলিত কাপড় ধোয়ার পাত্রের মতো) পাত্রে বসালাম। এবং আমরা তাঁর ওপর পানি ঢালতে লাগলাম। একসময় তিনি নিজেই ইশারা করে তা বন্ধ করতে বললেন।

এরপর তিনি মানুষের কাছে গিয়ে বক্তৃতা করলেন।[২৫৪]

নবিজির শেষ আলোচনা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা বাঁধাবস্থায় বের হলেন এবং মিম্বরে বসলেন। তখন সর্বপ্রথম তিনি উহুদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারী সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইসতিগফার করলেন এবং রহমতের দুআ করলেন। এরপর বললেন—

> এক বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার চাকচিক্য এবং তার নিকট যা আছে—দুটির যেকোনো একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা আছে, সেটাকেই গ্রহণ করেছে।

---

২৫৪ *সহিহ বুখারি*

আবু বকর রা. (নবিজির এই কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরে) কেঁদে ফেললেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর, আরে একটু থামো! মানুষের মাঝে নিজ মাল ও সোহবতের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মাল ও সঙ্গ দিয়ে)

আমাকে সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে যে, সে হচ্ছে আবু বকর। আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম; কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্ব তো বিদ্যমান। আবু বকরের ছোট্ট দরজাটি ছাড়া মসজিদের দিকে থাকা অন্যদের সব দরজা বন্ধ থাকবে।[২৫৫]

আমি হাউজে কাউসারের পাড়ে তোমাদের পাশে থাকব, তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবো। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরে তোমরা শিরক করবে—এ ভয় করি না; কিন্তু আমি তোমাদের ব্যাপারে দুনিয়ার ভয় করি যে, তোমরা তাতে (দুনিয়াপ্রাপ্তির) প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।[২৫৬]

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে চলে এলেন। এরপর তাঁর অসুস্থতা বেড়েই চলল এবং দুঃসহনীয় হয়ে উঠল। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুকালীন অসুস্থতায় বললেন—তুমি তোমার ভাই ও বাবাকে গিয়ে বলো, আমি ডেকেছি। আমি কিছু লিখে দেবো। আমি ভয় করি, কোনো আশাবাদী (নিজের ব্যাপারে) আশা করবে, কোনো কথক (নিজের ব্যাপারে) বলবে—আমি (আবু বকরের চেয়ে খিলাফতের ব্যাপারে বেশি) উত্তম। অথচ আল্লাহ ও মুমিনরা আবু বকরকেই কেবল অধিক হকদার মনে করেন।[২৫৭]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত—

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (মৃত্যুকালীন) অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি তাঁর ঘরে থাকা লোকজনকে বলেন—তোমরা এদিকে আসো

---

২৫৫ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম* : শব্দচয়ন : *সহিহ মুসলিম*

২৫৬ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

২৫৭ *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১১০; ইমাম বুখারিও এ রকমই বর্ণনা করেছেন।

তো। আমি এমন কিছু লিখে দেবো, যার পরে আর তোমরা গোমরাহ হবে না। তাদের কেউ বলতে লাগল, তাঁর ব্যথা তো অনেক বেশি বেড়ে গেছে! (এজন্য বেখেয়ালে তিনি এসব কথা বলছেন) আর তোমাদের নিকট তো কুরআন আছে, আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। ঘরে থাকা লোকজনের মাঝে পরস্পর মতনৈক্য ও ইখতিলাফ শুরু হলো। কেউ কেউ বলতে লাগলেন—তোমরা কাগজ নিয়ে এসো। তিনি কিছু লিখে দেবেন। এরপর আর তোমরা গোমরাহ হবে না। কেউ কেউ আবার তার ভিন্নটা বলছিলেন। এভাবে তাদের শোরগোল বেড়ে গেলে নবিজি বললেন, যাও। (অর্থাৎ চলে যাও, বিভেদ করো না)।[২৫৮]

আবু বকরকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান

অসুস্থতার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতে সালাত আদায়ে সক্ষম ছিলেন না। তাই বললেন—তোমরা আবু বকরকে মানুষকে নিয়ে জামাতে সালাত আদায় করতে বলো। আয়িশা রা. বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আবু বকর তো কোমল হৃদয়ের মানুষ।

তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। তার আওয়াজও মানুষ শুনবে না। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমরা তো ইউসুফ আ.-এর যুগের নারীদের মতো। (যেটা বলছি সেটা করো) আবু বকরকে মানুষকে নিয়ে জামাতে সালাত আদায় করতে বলো।[২৫৯]

এরপর থেকে আবু বকর রা. মানুষকে নিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। একবার নবিজির অসুস্থতা কিছুটা হালকা অনুভব করলে তিনি বের হয়ে দেখতে পেলেন, আবু মানুষকে নিয়ে সালাত আদায় করছেন। (নবিজিকে দেখে) আবু বকর রা. কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার মনস্থ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করে বললেন—যেভাবে আছ, সেভাবেই থাকো। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের একপাশে বসে পড়লেন। রাসুল

---

২৫৮ *সহিহ বুখারি*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা : ১৩৮

২৫৯ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা। আর আবু বকর রা. তার ইমামতি করে সালাত পড়ছেন। লোকেরাও আবু বকরের ইমামতিতে সালাত আদায় করছে।[২৬০]

নবিজির বের হওয়াতে (সুস্থ হয়ে উঠছেন ভেবে) মানুষ খুশি হলো; কিন্তু তিনি সেরে ওঠেননি। রোগের প্রকোপ বেড়ে চলল। এটাই ছিল নবিজির জামাতের সাথে আদায় করা শেষ সালাত। ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন—

> আমি নবিজির নিকট গেলাম। নবিজি তখন প্রচণ্ড জ্বরাক্রান্ত। এরপর আমি হাতে স্পর্শ করে তাঁকে বলালাম, নিশ্চয়ই আপনি প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন—হ্যাঁ, তোমাদের কারও দুজনের মিলে যত জ্বর আসে, আমি একাই ওরকম জ্বরে ভুগছি।
>
> আমি বললাম, তাহলে তো আপনার জন্য দুটি প্রতিদান?
>
> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—হ্যাঁ, যেকোনো মুসলিমই যদি কোনো অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে কোনো কষ্ট পায়, আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তার গুনাহগুলো মুছে দেন। তার পাপসমূহ সেভাবে ঝরে পড়ে, যেমনভাবে ঝরে পড়ে গাছের পাতা।[২৬১]
>
> এই কষ্টকর অবস্থায় নবিজি তাঁর চেহারায় চাদর টেনে নিতেন, এরপর যখন ঘাবড়ে যেতেন, ব্যথা খুব বেড়ে যেত, তখন তা চেহারা থেকে সরিয়ে নিতেন। এবং বলতেন—আল্লাহ তায়ালা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ওপর লানত বর্ষণ করেন।[২৬২]

এর মাধ্যমে নবিজি সম্ভবত উম্মতকে সতর্ক করেছেন। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মতো তারা যেন নিজেদের নবির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি না করে।

---

২৬০ *সহিহ বুখারি*, ও *সহিহ মুসলিম*, *মুআত্তা মালিক* প্রমুখ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো—শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি গাজালি রচিত *ফিকহুস সিরাহ*-এর তাখরিজে এ হাদিসটিরও তাখরিজ করেছেন। সেখানে তিনি শুধু ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এবং আবু ইসহাক আস-সাবিয়ির কারণে হাদিসটিকে 'দুর্বল' বলার চেষ্টা করেছেন। অথচ ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম—দুজনই হাদিসটি তাদের কিতাবে এনেছেন। তিনি যেই তরিকে (বর্ণনাগত পদ্ধতি কথা বলেছেন) হাদিসটি এনেছেন, সেটা ছাড়াও অন্যান্য তুরুক অনেক বর্ণনাপদ্ধতি রয়েছে!

২৬১ *সহিহ বুখারি*, *সহিহ মুসলিম*

২৬২ *সহিহ বুখারি*; *সহিহ মুসলিম*

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত

'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করবে'[২৬৩]—প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এটাই শাশ্বত বিধান। ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল। সোমবার। ফজরের সময়। লোকজন তখন মসজিদে আবু বকরের পেছনে সালাত আদায় করছে। আয়িশা রা.-এর কামরায় থাকা পর্দাটি ঈষৎ সরিয়ে উঁকি দিলেন নবিজি। সাহাবায়ে কিরাম তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। নবিজি মুচকি হাসলেন। আবু বকর রা. মনে করলেন, নবিজি সালাতের জন্য বের হবেন। আবু বকর রা. ইমাম হয়ে সালাত আদায় করাবস্থায়ই একটু পেছনে সরে যেতে মনস্থ করলেন। মুসলিমরাও নবিজির উপস্থিতি দেখে খুশিতে তাদের সালাত ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হলো। নবিজি তাদের ইশারা করে বললেন, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করো। এরপর তিনি কামরায় ঢুকে পর্দা নামিয়ে দিলেন।[২৬৪]

সালাত শেষ হলো। নবিজি সুস্থ হতে চলছেন—এটা মনে করে সবাই যার যার বাড়ি ফিরল; কিন্তু এটাই ছিল সাহাবায়ে কিরামের সাথে নবিজির শেষ দৃষ্টিবিনিময়। নবিজি ফিরে আয়িশার কামরায় শুয়ে পড়লেন। নিজের মাথা আয়িশা রা.-এর বুকের ওপর রাখলেন। তখন 'সাকরাতুল মাউত' (মৃত্যুকালীন কষ্ট) তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আয়িশা রা. বলেন—তখন তাঁর সামনে ছোটো পাত্রতে পানি রাখা ছিল। তিনি পানির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তা দ্বারা চেহারা মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন—

لا اله الا الله ، إن للموت سكرات

লা ইলাহা ইল্লালাহ, নিশ্চই মৃত্যুর রয়েছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা।[২৬৫]

---

২৬৩ সুরা জুমার, আয়াত : ৩০

২৬৪ *সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম*

২৬৫ বুখারি এ বর্ণনাটি দুটি বাবে (অধ্যায়) এনেছেন। তিরমিজি, নাসায়ি, আহমাদ অন্য তরিকে (বর্ণনাপদ্ধতি) এনেছেন। তাদের বর্ণনায় শব্দ হলো—

اللّٰهُمَّ أعني على سكرات الموت

শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি হাদিসটির তাখরিজের সময় 'জয়িফ' বলেছেন। বাস্তবতা হলো—এখানে তিনি যে জয়িফ বলেছেন, এটা এখানে বর্ণিত লফজের (শব্দ) বিবেচনায়; কিন্তু মূল হাদিসটি বিশুদ্ধ পন্থায় ইমাম বুখারিও বর্ণনা করেছেন। একটা হাদিসের দুটি তরিক থাকলে স্রেফ দুর্বল তরিকটা উল্লেখ করা সমীচীন নয়। (এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বেও গিয়েছে)।

ফাতিমা রা. এই অবস্থা দেখে বলতে লাগলেন—হায়! আমার বাবার ওপর কী বিপদ এলো! তখন নবিজি তাকে বললেন—এ দিনের পর তোমার বাবার আর কোনো বিপদ হবে না।[২৬৬]

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

আয়িশা রা. বলেন—আল্লাহ তায়ালা তাঁর মৃত্যুর সময় আমার ও তাঁর লালাকে একত্র করেছেন। আবদুর রহমান আমার নিকট এলো। তার হাতে মিসওয়াক। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছি। আমি লক্ষ করে দেখলাম—তিনি এর (আবদুর রহমানের হাতে থাকা মিসওয়াক) দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম—তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। আমি বললাম—ওটা কি আপনার জন্য এনে দেবো? তিনি মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ। এরপর আমি তা (চিবিয়ে) নরম করলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সামনে থাকা পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিনি চেহারা মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন—

লা ইলাহা ইল্লালাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে প্রচণ্ড যন্ত্রণা।

এরপর তিনি হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন—

আর রাফিকুল আ'লা (পরম বন্ধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-এর সাথে মিলিত হতে চাচ্ছি। একসময় তাঁর ইন্তেকাল হলো এবং একদিকে তার হাত ঝুঁকে গেল।'[২৬৭]

আবু বকরের আগমন

নবিজির ইন্তেকালের খবর মুহূর্তেই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। আবু বকর রা. তার বাসস্থান 'সুনহ' (নবিজি সুস্থ হয়ে পড়েছেন ভেবে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন) থেকে ঘোড়ায় চড়ে এলেন, মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি কারও সাথে কোনো কথা না বলে সোজা আয়িশা রা.-এর কাছে চলে গেলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কাপড়ে ঢাকা। আবু বকর রা. নবিজির চেহারা খুলে ঝুঁকে পড়ে তাঁতে চুমু খেলেন। কাঁদলেন এবং বললেন—আমার পিতা-মাতা

---

২৬৬ *সহিহ বুখারি*

২৬৭ *সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, শব্দচয়ন, সহিহ বুখারি*

আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনার ওপর দুটি মৃত্যুকে আল্লাহ তায়ালা একত্র করবেন না। যে মৃত্যু আপনার ব্যাপারে নির্ধারিত হয়েছিল, তা হয়ে গেছে।[২৬৮]

আবু বকর রা. এরপর বাইরে বেরোলেন। উমর রা. তখন মানুষকে বলছেন—

> তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। মুসা ইবনে ইমরান যেমন তার প্রভুর নিকট গিয়েছিলেন, তিনিও তেমন গিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের ধ্বংস করা পর্যন্ত তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না।

আবু বকর রা. তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন—উমর, থামো, চুপ করো; কিন্তু উমর রা. কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবু বকর রা. যখন দেখলেন তিনি কোনোভাবেই চুপ করছেন না, তখন তিনি মানুষের সামনে গেলেন। উমরকে ছেড়ে সবাই তার দিকে ছুটে গেল। আবু বকর রা. বলেন—

আম্মা বা'দ, হে লোকসকল, আপনাদের মধ্য থেকে যে মুহাম্মাদের ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ١٤٤﴾

> আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন।'[২৬৯]

মানুষের কাছে কেমন যেন মনে হলো—এই আয়াত আগে নাজিল হয়নি। (সবে নাজিল হয়েছে,) আর আবু বকর রা. তিলাওয়াত করেছেন; কিন্তু শোনার পর এ আয়াতটিই আগে নাজিল হওয়ার কথা সবার মনে পড়ে গেল। তখন যেই আয়াতটি শুনেছিল, সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে লাগল। উমর রা. তখন বললেন—আল্লাহর শপথ! আমার অনুভব এমন হলো—যেন আমি এই আয়াত আগে শুনিনি,

---

২৬৮ *সহিহ বুখারি*

২৬৯ সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪

এই প্রথম আবু বকরকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আবু বকর রা. যখন আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, আমার ভয় হলো। আমার পা কেমন কাঁপতে লাগল। আমি যেন পড়ে যাব। এবার আমি বিশ্বাস করলাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৭০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেষট্টি বছরে ইন্তেকাল করেছেন, এ ব্যাপারে সবাই একমত। নবুয়তের পূর্বে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তেরো বছর মক্কায় মানুষকে আল্লাহর দাওয়াত দিয়েছেন। হিজরতের পরে দশ বছর কাটিয়েছেন মদিনায়। এগারো হিজরির শুরুতে তাঁর মৃত্যু হয়।

নবিজির পরিত্যক্ত মিরাস

ইমাম বুখারি আমর ইবনে হারিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

(ইন্তেকালের সময়) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাদা খচ্চর—যাতে তিনি আরোহণ করতেন, অস্ত্র ও একখণ্ড ভূমি—যা তিনি মুসাফিরদের কাজে সদকা করে গিয়েছিলেন—ছাড়া কোনো দিনার-দিরহাম বা দাস-দাসী রেখে যাননি।

* * *

২৭০ [ইবনে ইসহাক প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। বুখারি অনুরূপ বর্ণনা করলেও শব্দগত কিছু পার্থক্য আছে]

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

মৃত্যু : জীবনের অমোঘ বাস্তবতা

নবি-জীবনের এই পড়ন্ত বেলা থেকে আমাদের সামনে মৃত্যু নামক নিদারুণ একটি বাস্তবতা ফুটে ওঠে। এই বাস্তবতার সামনে অহংকারীদের অহংকার, প্রতাপশালীদের প্রতাপ, ধর্মবিদ্বেষীদের বিদ্বেষ, বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ, প্রভুদের প্রভুত্ব—সবই ম্লান হয়ে যায়। এটাই সেই বাস্তবতা; নিঃশেষ ও লীন হয়ে যাওয়াতে যার বহিঃপ্রকাশ। যেই বাস্তবতার সামনে—ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—নেককার-পাপিষ্ঠ, শাসিত-শাসক, ধনী-গরিব, নবি-রাসুল, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা, বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী সবাই সমান।

এটাই সে বাস্তবতা; যা স্থান-কালের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে প্রত্যেক চিন্তাশীলের নিকট এ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে—কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। যেই সত্তা চিরঞ্জীব, তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারও কর্তত্ব নেই। তাঁর ফয়সালা থেকে গা বাঁচানোর সুযোগ নেই। তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করার সুযোগ নেই। তাঁর আদেশ না মানার সুযোগ নেই। তাঁর আদেশের ওপর কোনো কর্তৃত্বকারী নেই।

এরচেয়ে নিদারুণ বাস্তবতা আর কী আছে? যেই বিষাদময় বাস্তবতা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকালেই, সব যুগেই সমান কার্যকর। প্রচণ্ড প্রতাপশালী কত বিরুদ্ধবাদী, জ্ঞানবিজ্ঞান, আবিষ্কারের কত ধারক-বাহক, কত বলশালী ব্যক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে; যাদের প্রতাপ, শক্তি ও বলে একসময় পুরো দুনিয়া কাঁপত; কিন্তু নিদারুণ এই বাস্তবতার সামনে ওসবই ছিল ঠুনকো। বিষাদময় এই বাস্তবতাটি আসমান-জমিনের অধিপতির সামনে সবাইকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছে।

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে'—এটাতে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই, এটা ব্যাপক। এটা এতটাই বিশাল যে, সারা দুনিয়া মিলেও যার কোনো

সীমানা আঁকতে অক্ষম। সুতরাং জ্ঞানবিজ্ঞান, উন্নতি ও আবিষ্কারের ধ্বজাধারীরা আসুক, সবাই একাট্টা হয়ে তাদের সর্বশক্তি—অত্যাধুনিক সব আবিষ্কার, উন্নত সব প্রযুক্তি—প্রয়োগ করুক এবং এর মাধ্যমে নিদারুণ মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করুক।

আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ—'প্রত্যেক প্রাণীকেই...'—থেকে সামান্য একটু পালাক। যদি তারা এটা করতে সক্ষম হয়, তাহলে অবাধ্যতা, কুফরি ও সীমালঙ্ঘনের প্রাসাদ গড়ুক। অন্যথায় মাটির ঘরের কথা ভাবুক। এবং ভয়াল সেই থাবার কথা ভাবুক—যার থেকে কারও নিস্তার নেই।

কেউই বাঁচবে না

আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে নবিজিকে মৃত্যুর ঊর্ধ্বে রাখতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহর হিকমতের দাবি হলো, ব্যক্তির মর্যাদা যতই উঁচু হোক, তাকে মৃত্যুর বিষাদময় স্বাদ আস্বাদন করতেই হবে। সবাইকে একই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। আসমান-জমিনের অধিবাসী সবাইকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে নতশিরে। ব্যক্তি যতই উঁচু মর্যাদার হোক, সে দাসত্বের গণ্ডি থেকে বেরোতে পারবে না। তাই সেই নবিজিকেও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হয়েছে, যিনি তাঁর রবের হুকুমের সামনে ছিলেন বিনয়াবনত, তার চেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা কেউ স্মরণ করত না। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে প্রকাশ করেছেন—

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتونَ

নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।[২৭১]

وَما جَعَلنا لِبَشَرٍ مِن قَبلِكَ الخُلدَ ۖ أَفَإِي۟ن مِتَّ فَهُمُ الخـٰلِدونَ

আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?[২৭২]

كُلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوتِ ۗ وَنَبلوكُم بِالشَّرِّ وَالخَيرِ فِتنَةً ۖ وَإِلَينا تُرجَعونَ

২৭১ সুরা জুমার, আয়াত : ৩০

২৭২ সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৪

প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[২৭৩]

নবি-জীবনের এই সায়াহ্নে এসে আমাদের সামনে দুটি বাস্তবতা—যে দুটি বাস্তবতা ইমানের মূলভিত্তি বরং আরও বেশি—প্রত্যাশিত হয়েছে : আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের বাস্তবতা, বান্দার দাসত্বের—যেটার ওপর তাঁর সৃষ্টি এবং যাতে সবাই সমান—বাস্তবতা।

* * *

২৭৩ সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও আহকাম

এই পর্যায়ে আমরা এখান থেকে এমন আরও কিছু বিষয় খুঁজে দেখব, যেগুলো নবিজির ওফাত এবং এর সংশ্লিষ্ট হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে—

০১. ইসলামে সৎ আমলই কেবল মর্যাদার ভিত্তি

নবিজির প্রেরিত শেষ সেনাবাহিনীর প্রধান উসামার বাবা জায়িদ ছিলেন গোলাম। উসামা মাত্র আঠারো থেকে বিশে পা দিয়েছেন; কিন্তু তার এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ একটি যুদ্ধে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ওপরে তাকে বাহিনীপ্রধান হিসেবে পাঠাতে নবিজিকে বারণ করেনি। যদিও এটা মুনাফিকদের সহ্য হচ্ছিল না। তারা এ নিয়ে বেশ মাতামাতি করছিল, বিস্ময় প্রকাশ করছিল। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা নিতান্তই সাধারণ। আর ইসলাম এসেছেও জাহিলি সীমাতিরিক্ত মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিভাজনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য।

সম্ভবত নবিজি উসামার মাঝে বিশেষ কিছু দেখেছিলেন, যা তাকে নবিজির কাছে অনন্য করে তুলেছিল, নবিজি তাকে বাহিনীর প্রধান করে পাঠান। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ছিল ভালোভাবে তার অনুসরণ করা, হোক না সে কুৎসিত হাবশি গোলাম।

এ কারণেই আবু বকর রা. তার হাতে খিলাফতের দায়িত্ব এলে তিনি প্রথমে যেই কাজটা করেন, তা হলো—উসামা রা.-এর বাহিনীকে প্রেরণ। আবু বকর রা. নিজ পায়ে হেঁটে উসামা রা.-এর বাহিনীকে বিদায় জানান। তখন উসামান রা. বাহনে সওয়ার। উসামা রা. তাকে বললেন—হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আপনি হয় সওয়ার হবেন, আর না হয় আমি নেমে যাব। আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর

শপথ! আমি নামতেও দেবো না, নিজেও আরোহণ করব না। কিছুক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় আমার পা ধূলিধূসরিত করতে পারি না!

উসামার বাহিনী পরিশেষে বিজয় নিয়ে ফিরে। এই বাহিনী প্রেরণ মুসলিমদের জন্য বিরাট উপকার বয়ে এনেছিল।[২৭৪]

০২. ঝাড়ফুঁক : বৈধতা ও গুরুত্ব

ঝাড়ফুঁক বৈধ। দলিল হলো *সহিহ বুখারি ও মুসলিম*-এর বর্ণনা—'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হলে মুয়াওয়াজাত পড়ে...'। সাহাবায়ে কিরামও কুরআনের আয়াতসহ বিভিন্ন দুআর মাধ্যমে 'রুকইয়াহ' করতেন। ইমাম মুসলিম রহ. উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণনা করেন—

> আমাদের মাঝে কেউ অসুস্থ হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডান হাতে মুছে দিতেন এবং বলতেন—হে মানুষের প্রভু, আপনি সমস্যা দূর করে দিন। আপনি তাকে শিফা দিন, আপনিই তো শিফাদানকারী। আপনার শিফাই প্রকৃত নির্ভেজাল শিফা।

ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. আম্মাজান আয়িশা রা. থেকে বর্ণনা করেন—

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হলে মুওয়াওয়াজাত পড়ে নিজের গায়ে নিজে ফুঁ দিতেন। তাঁর ব্যথা বেড়ে গেলে আমি পড়ে বরকতের উদ্দেশ্যে তাঁর গায়ে হাত মুছতে লাগলাম।

রুকইয়া বৈধ হওয়ার সবচেয়ে বড়ো দলিল কুরআনের এই আয়াত—

> وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرءانِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنينَ ۙ وَلا يَزيدُ الظّٰلِمينَ إِلّا خَسارًا.
>
> আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করি—যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গুনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।[২৭৫]

---

২৭৪ *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা :২২

২৭৫ সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৮২

রুকইয়ার বিনিময় জায়িজ

দুআ ও রুকইয়ার মাঝে পার্থক্য হলো—রুকইয়াতে অতিরিক্ত হাত দিয়ে মুছে দিতে হয় এবং (বিশুদ্ধ বর্ণনামতে, থুথু ছাড়া) ফুঁ দিতে হয়।

ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক, আবুস সাওর রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মতে, রুকইয়ার বিনিময় নেওয়াও জায়িজ।

তবে ইমাম হানিফা রহ. একটু মতপার্থক্য করেন। তার মতে, তালিমুল কুরআনের বিনিময় নেওয়া নাজায়িজ; কিন্তু রুকইয়ার বিনিময় গ্রহণ জায়িজ।[২৭৬]

রুকইয়ার বিনিময় বৈধ হওয়ার দলিল *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এর এই হাদিস—

> কিছু সাহাবায়ে কিরাম সফরে ছিলেন। তারা আরবের একটি মহল্লা অতিক্রম করার সময় তাদের কাছে আতিথ্য চাইলেন; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারি করায়নি। তারা তাদের বলল—আপনাদের মাঝে কি কোনো 'রাকি' (ঝাড়ফুঁককারী) আছে? কারণ, মহল্লার সর্দার (বিষাক্ত কিছু) দংশন করেছে, তিনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।
>
> সাহাবায়ে কিরামের একজন বললেন—হ্যাঁ, আছে। এরপর ওই সাহাবি অসুস্থ ব্যক্তির নিকট গিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে রুকইয়ার কাজ করলেন। লোকটি সেরে উঠলে তাকে ছাগলের একটি পাল দেওয়া হলো; কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এবং বলেন—আমি নবিজিকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করব।
>
> তিনি নবিজির নিকট এসে তা জানালেন এবং বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ! আমি কেবল সুরা ফাতিহা পড়েই রুকইয়া করেছি। নবিজি মুচকি হেসে বললেন—তুমি আবার কীভাবে জানলে এটা ঝাড়ফুঁক? এরপর বললেন—তুমি তাদের থেকে ছাগল গ্রহণ করো এবং এ থেকে আমার জন্যও একটি অংশ রেখো।

---

২৭৬ *শারহুন নববি আলা মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১৮

বৈধতার তিন শর্ত

তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে রুকইয়া বৈধ। এ ব্যাপারে ইমাম নববি, হাফিজ ইবনে হাজার প্রমুখ 'ইজমা' নকল করেছেন। অর্থাৎ তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে সবার মতেই রুকইয়া বৈধ—

- ০১. রুকইয়াটা কালামুল্লাহ অথবা আল্লাহর নাম ও সিফাতের মাধ্যমে হবে।
- ০২. আরবি ভাষায় হবে।
- অথবা স্পষ্ট মর্মধারণকারী অন্য কোনো ভাষায় হবে।
- ০৩. রুকইয়ার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই; বরং আল্লাহর শক্তিতে রুকইয়ার মাধ্যমে মানুষ সেরে ওঠে—এই বিশ্বাস রাখতে হবে।[২৭৭]

এইসব শর্ত বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। আউফ ইবনে মালিক আল আশজায়ি থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

> আমরা জাহিলি যুগে রুকইয়া করতাম। আমরা বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?
>
> তিনি বললেন—তোমরা রুকইয়ার শব্দাবলি আমার সামনে উপস্থাপন করো।
>
> রুকইয়াতে যতক্ষণ শিরকের কোনো কিছু থাকে না, ততক্ষণ এতে কোনো অসুবিধা নেই।

নবিজিকে জাদুকরণ এবং নবিজির রুকইয়া

ইহুদি লাবিদ ইবনুল আসাম নবিজিকে যেই জাদু করেছিল (*সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম*-এর বর্ণনায় যেমন আছে) এর থেকে সেরে উঠতে নবিজি এর রকইয়ায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। আলিমগণ বলেন—জুমহুর মুসলিম জাদুকে স্বীকার করেন। এবং অন্যান্য প্রমাণিত বিষয়ের যেমন প্রভাব রয়েছে, ঠিক জাদুরও বাস্তবতা ও প্রভাব রয়েছে—এ কথা মানেন। তার দলিল উল্লিখিত হাদিস। কুরআনেও জাদুর

---

২৭৭ *শারহুন নববি আলা মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৬৯; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৫২

বর্ণনা রয়েছে, যা শেখা হতো। আর বাস্তবতা ও প্রভাব রয়েছে, এমন জিনিসই শেখা হয়। কুরআনে এসেছে—

فَيَتَعَلَّمونَ مِنهُما ما يُفَرِّقونَ بِهِ بَينَ المَرءِ وزوجه

অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।[২৭৮]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল—এটা বাস্তবতা এবং একটা প্রভাব। দুটি কারণে কেউ কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবে—

- **এক.** জাদু যদি প্রমাণিত ও প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়ই হয়ে থাকে, তাহলে তা তো (যেমন কেউ কেউ মনে করে) তাওহিদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও কেবল আল্লাহর প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিবন্ধক।

- **দুই.** নবিজিকে জাদু করা হয়েছে। এটা তো (তাদের মতে) নবুয়তের মর্যাদায় কিছুটা কসুর ও সন্দেহ সৃষ্টি করে।

বাস্তবতা হলো, এখানে মূলত এ ধরনের কোনো প্রশ্ন তোলারই সুযোগ নেই। এরপরও প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, জাদুর বাস্তবতা ও প্রভাব রয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্যে এটা নয় যে, সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী। এটা তো অন্য আর দশটা জিনিসের মতোই। যেমন : আমরা বলি, বিষের প্রভাব রয়েছে, ওষুধের প্রভাব রয়েছে—এবং বাস্তবতা এটাই—কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্যে এটা হয় না যে, এগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভাব রয়েছে; বরং আমরা বলি, এর প্রভাব বিস্তার হয় আল্লাহর হুকুমে। জাদু নিয়েও এখানে একই কথা। জাদুর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَما هُم بِضارّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّهِ ۚ

তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না।[২৭৯]

---

২৭৮ সুরা বাকারা, আয়াত : ১০২

২৭৯ সুরা বাকারা, আয়াত : ১০২

এখানে আল্লাহ তায়ালা জাদুর স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রভাবকে না করেছেন। এদিকে আবার জাদুর প্রভাবেরও উল্লেখ রয়েছে; যা আল্লাহর অনুমতিতে কার্যকর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলব, নবিজিকে যেই জাদু করা হয়েছিল, এটা তাঁর বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গো প্রভাব বিস্তার করেছিল; কিন্তু তাঁর অন্তরে, মেধায়, বিশ্বাসে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। সুতরাং বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গো অন্য আর দশটা রোগ যেমন প্রভাব বিস্তার করে, জাদুও একইভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর এটা জানা কথা যে, মানবিক রোগব্যাধি এবং এ ধরনের যাবতীয় উপসর্গ থেকে মুক্ত না থাকা 'ইসমাতুর রাসুল' (নবিজির সংরক্ষণ)-এর পরিপন্থি নয়।

কাজি ইয়াজ বলেন, হাদিসে নবিজির স্মৃতিভ্রমের[২৮০] কথা এসেছে এটা তাঁর নবুয়তের কাজে নবুয়তের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে কোনো কসুর সৃষ্টি করে না। যেহেতু এ ব্যাপারে (অর্থাৎ নবুয়তে কসুর সৃষ্টিকারী যেকোনো বিষয় থেকে) নবিজির মুক্ত থাকার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। তবে কসুর দুনিয়াবি বিষয়াবলিতে—যেজন্য তাঁকে পাঠানো হয়নি এবং যার কারণে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও নয়—হতে পারে।

তিনি এসব ক্ষেত্রে অন্যান্য মানুষের মতো বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। সুতরাং এটা অসম্ভবের কিছু নয় যে, তাঁর এমন ভ্রম হবে—যার কোনো বাস্তবতা নেই। এরপর আবার তা কেটে যাবে।[২৮১]

প্রচণ্ড জ্বর হলে যেমন হয়, সবকিছু উলটপালট হয়ে যায়, এলোমেলো হয়ে যায়, নানান ভ্রম হয়। এটা মানবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এসব ক্ষেত্রে নবি-রাসুলসহ অন্য সব মানুষ সমান।

নবিজির আরও একটি মুজিজা

তবে জাদু সম্পর্কে নবিজি অবগত হওয়া এটা তাঁর অনন্য মুজিজা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সম্মান ও হিফাজতের অন্যরকম দলিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতে থাকলে—অসুস্থ হলে তাঁর অভ্যাসই ছিল দুআ করা—একসময় তিনি লাবিদের অনিষ্টকারী জাদু সম্পর্কে জেনে যান। জানার পর লাবিদ যেখানে জাদুর উপকরণগুলো রেখেছিল, সেখানে যান এবং তার সব কূটচাল লন্ডভন্ড করে দেন। হাদিসের ভাষায় পড়ুন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত—

---

২৮০ একটা বিষয় না করে তা করার কথা বলা ইত্যাদি।

২৮১ *শারহুস শিফা*, কাজি ইয়াজ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬৮-২৬৯; *শারহুন নববি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৪

লাবিদ ইবনুল আসাম নামে বনু জুরাইকের এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করে। এতে নবিজির স্মৃতিভ্রম শুরু হয়। তিনি যা করেননি বলতেন করেছেন। একদিন বা একরাতে তিনি আমার পাশে ছিলেন। তিনি তখন দুআ করেই যাচ্ছেন।

তারপর তিনি বললেন—আয়িশা, আমার মনে হচ্ছে আমি আল্লাহর নিকট যা জানতে চাচ্ছিলাম, সে সম্পর্কে জানতে পেরেছি। দুই ব্যক্তি আমার নিকটে এসে একজন আমার মাথার কাছে, আরেকজন আমার পায়ের কাছে বসল। একজন আরেকজনকে বলল—লোকটির কী হয়েছে? সে বলল তাকে জাদু করা হয়েছে।

—কে জাদু করেছে?

—লাবিদ ইবনে

—কী দিয়ে কীভাবে?

—চিরুনি ও চিরুনি করার পর ঝরে পড়া চুল দিয়ে, নর খেজুরের খোসার আবরণে।

—সেটা কোথায়?

— 'জারওয়ান' নামক কূপে।

এরপর নবিজি কিছু সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সেখানে গেলেন...এরপর তিনি এসে বললেন—আয়িশা, কূপের পানি যেন মেহেদির নির্যাস, তার খেজুরের মাথাসমূহ যেন শয়তানের মাথা!...

আমি বললাম—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি এটা বের করলেন না কেন?

তিনি বললেন—আল্লাহ তায়ালা আমাকে শিফা দান করেছেন। সুতরাং এখন আর আমি চাচ্ছি না যে, মানুষের মাঝে ফিতনা উসকে দেবো। এরপর নবিজির আদেশে তা দাফন করে দেওয়া হলো। (অর্থাৎ কূপ বন্ধ করে দেওয়া হলো।)

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, এই হাদিসটি যতটুকু না জাদুর কারণে নবিজির শারীরিকভাবে কষ্ট পাওয়ার দলিল, তার চেয়ে বড়ো দলিল হলো—

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যেই সম্মান দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে হিফাজত করেছেন, এর ওপর।

একটি প্রশ্ন

কেউ আবার প্রশ্ন করতে পারে—জাদুর যেহেতু বাস্তবতা ও প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে জাদু ও মুজিজার মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা হবে?

মুজিজাটি হয়ে থাকে কোনো নবির হাতে, তাঁর নবুয়তের কোনো দাবি ও চ্যালেঞ্জের সত্যায়নে; কিন্তু জাদুটা এমন নয়। কোনো জাদুকর এ কথা দাবি করে না যে সে নবি।[২৮২]

জাদুর পরিধি সীমাবদ্ধ। জাদুর বাস্তবতা আছে; যেমনটা আমরা পূর্বে বলেছি; কিন্তু সেটা জাদুর নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল অতিক্রম করতে পারে না। জাদুর মাধ্যমে মৌলিক বাস্তবতা পালটে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের জাদুকরদের জাদু সম্পর্কে ব্যক্ত করেছেন তার এই কথায়—

قالَ بَل أَلقوا ۖ فَإِذا حِبالُهُم وَعِصِيُّهُم يُخَيَّلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعىٰ

> মুসা বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হলো—যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে।[২৮৩]

আল্লাহ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন মুসা আ. যা দেখেছেন, তা কেবল ধাঁধা। অর্থাৎ জাদুকরদের রশিগুলো মূলত সাপ হয়ে যায়নি। তারা যা করেছিল, তা মুসা আ. ও উপস্থিত জনতার চোখো ধাঁধা লাগিয়েছে। এটাই কুরআনের আয়াত স্পষ্ট করেছে—

سَحَروا أَعيُنَ النّاسِ وَاستَرهَبوهُم وَجاءو بِسِحرٍ عَظيمٍ

> লোকদের চোখগুলো ধাঁধিয়ে দিলো ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহা জাদু প্রদর্শন করল।[২৮৪]

রশিগুলোকে যে তারা নাড়ছিল, সেটাকে সাপ বলে ভ্রম হচ্ছিল। এটা কেবল চোখের ধাঁধা। আল্লাহ তায়ালা এটাই বলছেন—

---

২৮২ *শারহুন নববি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৫
২৮৩ সুরা ত-হা, আয়াত : ৬৬
২৮৪ সুরা আরাফ, আয়াত : ১১৬

يُخَيَّلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنَّها تَسعىٰ

তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হলো, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছোটাছুটি করছে।[২৮৫]

তবে এসব কথা আমি আগে যে বলেছিলাম—জাদুর বাস্তবতা রয়েছে—এর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় না। একটু গভীর মনোযোগে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

মানুষের চোখে ধাঁধা লাগা এবং বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে না পারা—সেটা জাদুর প্রভাব। তবে এটা মনে রাখতে হবে, জাদুর প্রভাব কেবল শরীর, পঞ্চেন্দ্রিয়, বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সীমাবদ্ধ।

০৩. আবু বকরের মর্যাদার অনন্য বহিঃপ্রকাশ

নবিজির মৃত্যুকালীন অসুস্থতার যে আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি, সেখানে আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্বের চারটি দলিল পাওয়া যায়—

এক.

নবিজি যখন 'এক বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার চাকচিক্য এবং তার নিকট যা আছে—দুইটার যে কোনো একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা আছে, সেটাকেই গ্রহণ করেছে।'—এ কথা বলে তার বক্তব্য শুরু করলেন, আবু বকর রা. তখনই নবিজির কথার মর্মার্থ বুঝে ফেলেন। তাই তিনি 'আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন!' এ কথা বলে কাঁদতে শুরু করলেন। আবু বকর যা বুঝেছিলেন, অন্য কেউ তা বোঝেনি।

এই হাদিসের কোনো কোনো তুরুকে এসেছে, আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত—

> রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আবু বকর রা. যখন কাঁদতে শুরু করলেন, তখন আমি মনে বললাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে এবং সে ইখতিয়ার গ্রহণ করেছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে কাঁদার কী হলো!

---

২৮৫ সূরা ত-হা, আয়াত : ৬৬

তিনি বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, আমাদের মাঝে আবু বকর সে ব্যাপারে ভালো জানতেন।

দুই.

'মানুষের মাঝে নিজ মাল ও সোহবতের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ মাল ও সঙ্গ দিয়ে) আমাকে সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে যে, সে হচ্ছে আবু বকর।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূল্যবান কথা অন্য কারও ব্যাপারে বলেননি; কেবল আবু বকরের ক্ষেত্রেই বলেছেন।

তিন.

আয়িশা রা.-এর বর্ণনা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন—

তুমি তোমার ভাই ও বাবাকে গিয়ে বলো—আমি ডেকেছি। আমি কিছু লিখে দেবো। আমি ভয় করি, কোনো আশাবাদী (নিজের ব্যাপারে) আশা করবে, কোনো কথক (নিজের ব্যাপারে) বলবে—আমি (আবু বকরের চেয়ে খিলাফতের ব্যাপারে বেশি) উত্তম। অথচ আল্লাহ ও মুমিনরা আবু বকরকেই কেবল অধিক হকদার মনে করেন।[৩৮৬]

এ হাদিসটি নবিজির পরবর্তী খলিফা আবু বকর হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখে; কিন্তু আল্লাহর হিকমত অনুসারে নবিজি যে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্ধারিত কারও নাম বলে যাননি, খিলাফতের ব্যাপারটা যেন তাঁর পরে অনুসৃত সুন্নত হিসেবে দেখা না দেয়। তা না হলে যোগ্য হাকিমের যেই শর্তাবলি ছিল—তা বিচার করার ব্যাপারটা লীন হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অনুসৃত সুন্নত হিসেবে ধরে পরবর্তী খলিফারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো তাদের পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের ধারা অব্যাহত রাখবে। যাতে যোগ্য খলিফার শর্তাবলির নিশ্চয়তা থাকে না।)

চার.

আবু বকর রা.-কে নবিজির ইমামতিতে খলিফা বানানো। নবিজি বেশ ভালোভাবেই তাকে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। আয়িশা রা. এ কাজে বাধা দিতে গেলে তিনে তাকে দমিয়ে দেন।

---

৩৮৬ *সহিহ মুসলিম*

বিশুদ্ধ হাদিসসমূহে বর্ণিত আবু বকর রা.-এর এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যদি আমরা বলি—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে খিলাফতের ব্যাপারে তার উপযুক্ততাই সবচেয়ে বেশি, তাহলে ভুল হবে না। এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য সাহাবির, বিশেষ করে আলি রা.-এর মর্যাদায় ভাটা পড়বে না। আলি রা.-এর মর্যাদা আপন জায়গায় ঠিক। নবিজি তার ব্যাপারেই তো খাইবার যুদ্ধের সময় বলেছিলেন—'আমি আগামীকাল এই পতাকা তাকেই দেবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মুহব্বত করে।' এরপর সারা রাত সাহবায়ে কিরাম শুধু ওইটাই ভাবছিলেন, কে আগামীকালের সেই ব্যক্তিটি কে হবে? পরের দিন দেখা গেল, তিনি আলি।

নবিজির ইন্তেকালের পরপরই (বড়ো) কোনো ধরনের তর্কবিতর্ক, বাকবিতণ্ডা, পরস্পর ফাটল ধরা ছাড়াই খিলাফতের কাজ সমাধা হয়ে গেল। আবু বকর ও আলি প্রত্যেকেই একে অন্যের মর্যাদা স্বীকার করতেন। সুতরাং ওইসব ব্যক্তিদের পরস্পরে কোনো ফাটল না ধরা এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের আজ চৌদ্দ শ বছর পরে এসে 'তিনি উত্তম ছিলেন, নাকি তিনি'—এ বাকবিতণ্ডায় জড়ানো নিতান্তই অনর্থক, অযথা সময় নষ্ট করা। এবং মহান খলিফাদের ব্যাপারে বিদ্বেষ ছড়ানো।

০৪. কবরকে মসজিদ বানানোয় নিষেধাজ্ঞা

আমরা পূর্বে বর্ণিত হাদিসে দেখেছি, কবরকে মসজিদ বানানোর ব্যাপারে কতটা কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন নবিজি। আলিমগণ লিখেছেন—'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের কবরসহ অন্য যেকোনো কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন; এটা এজন্য যে, মানুষ যেন অত্যধিক সম্মান দেখিয়ে ফিতনায় নিপতিত না হয়। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, এ রকম বেশি সম্মান দেখাতে গিয়ে মানুষ কুফরিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মত।'

নবিজি যেই সুরতে নিষেধ করেছেন, সেটা হলো—কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং কবরের আশপাশ সালাতের স্থানে রূপান্তরিত হবে। অথবা কবরের নিকটে সালাত আদায় করে তাকে মসজিদ বানিয়ে ফেলা হবে। কবরের নিকট সালাত আদায়ের বিধান নিয়ে আলিমদের দুই ধরনের কথা রয়েছে—

- ০১. হারাম
- ০২. মাকরুহ

মাকরুহ কেন

যারা মাকরুহ বলেন, তারা বলেন—যখন কবরের নিকটে অর্থাৎ কবরকে সামনে রেখে সালাত আদায় করবে, তখন সেটা কঠিন মাকরুহ হবে; কিন্তু সর্বাবস্থায় সালাত সহিহ হয়ে যাবে। কারণ, হারাম হওয়া বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে না। গসবকৃত (বলপ্রয়োগে দখল করা ভূমি) জমিনে সালাত আদায় করলে যেই বিধান, এখানেও বিধান সে রকম।

ইমাম নববি রহ লেখেন—

> মুসল্লি বেড়ে যাওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়িনে ইজাম মসজিদে নববি সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং সেই সম্প্রসারণের পরিধি (দিনদিন) বেড়েই চলল; একসময় আয়িশা রা.-এর কামরাও—যেখানে নবিজি ও তাঁর দুই সাথি আবু বকর উমর শুয়ে আছেন—এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।
>
> সাহাবায়ে কিরাম নবিজির কবরের চারপাশে উঁচু দেওয়াল বানালেন; যাতে করে মসজিদ থেকে তা না দেখা যায়। তা না হলে সাধারণ মানুষ সালাত আদায় করতে গিয়ে ফিতনায় নিপতিত হবে। এরপর তারা আরও উত্তর-দক্ষিণে দুটি দেওয়াল নির্মাণ করে সেগুলোকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন। ফলে এটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। কবরকে সামনে রেখে সালাত আদায়ের সুযোগ আর থাকল না।[২৮৭]

০৫. মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত : নবিজির অনুভূতি

মৃত্যুর এই অন্তিম মুহূর্তে তার চিন্তা-অনুভব-অনুভূতি কেমন ছিল, তা আমরা আগে জেনেছি। সোমবার দিন মসজিদে আবু বকরের পেছনে সালাত আদায় করছেন। আয়িশা রা.-এর কামরায় থাকা পর্দাটি ঈষৎ সরিয়ে উঁকি দিলেন নবিজি। সাহাবায়ে কিরাম তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। নবিজি মুচকি হাসলেন। আবু বকর রা. মনে করলেন, নবিজি সালাতের জন্য বের হবেন। আবু বকর রা. সালাত পড়াবস্থায়ই একটু পেছনে সরে যেতে মনস্থ করলেন। মুসলিমরাও নবিজির উপস্থিতি দেখে খুশিতে তাদের সালাত ভেঙে ফেলার উপক্রম হলো। নবিজি তাদের ইশারা

---

২৮৭ *শারহুন নাবাবি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২-১৪

করে বললেন—তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করো। এরপর তিনি কামরায় ঢুকে পর্দা নামিয়ে দিলেন।

মৃত্যুর এই অন্তিম মুহূর্তে নবিজি যখন উম্মতের দিকে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন, তখন তিনি তাদের অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন। সাহাবায়ে কিরামকে সালাতে আল্লাহর সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যেই মুচকি হাসিটুকু উপহার দিয়েছিলেন, এটা তাদের প্রতি নবিজির প্রচণ্ড ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ, ভালোবাসা ও মূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, সাহাবায়ে কিরামের সাথে বিদায়ী দৃষ্টি বিনিময়ের ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি সত্যের যে আদর্শ তাদের সামনে রেখে গিয়েছেন, সে আদর্শের ব্যাপারে মনের প্রশান্তি চাইছিলেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবিজির চোখ জুড়ায়, হৃদয় প্রশান্ত হয়—এমন একটা দৃশ্য তাঁকে দেখিয়েছিলেন। এই মন জুড়িয়ে দেওয়া দৃশ্য তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণাকে অনেকটা উপশম করে তুলছিল। খুশি ও আনন্দরা তাঁর চেহারায় ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। এতে তিনি সেরে উঠছেন বলে সাহাবায়ে কিরামের ভ্রমও হলো। বিদায়ের আগে তারা ভাবতে পারেননি—এটাই নবিজির শেষ চাহনি; এরপর তিনি পরপারে পাড়ি জমানোর আয়োজন করবেন। তারা বুঝতে পারেননি—এটাই তাদের, বরং সব উম্মতের শেষ সেই দৃশ্য; যা বিদায়কালীন প্রতিশ্রুতি হিসেবে, হাউজে কাউসারের পাড়ে তাঁর ও উম্মতের মিলিত হওয়ার সেতুবন্ধন হিসেবে নবিজি তাঁর হৃদয় স্মৃতিপটে এঁকে রেখেছেন।

আল্লাহর হিকোতের দাবি ছিল—বিদায়বেলার সেই চমৎকার দৃশ্যটা হবে সালাত। আল্লার ইচ্ছে ছিল, সালাতই হবে সেই শেষ প্রতিশ্রুতি।

প্রিয় মুসলিম ভাই, যে প্রতিশ্রুতি ছিল নবি-জীবনের সর্বশেষ, যা দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন, যা দেখে তিনি মুচকি হেসেছিলে—আসুন, এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করি!

* * *



খিলাফতে রাশেদা
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

নবিজির পবিত্র জীবনের আলোচনা এবং তা থেকে আমাদের কী শিক্ষা ছিল, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর, লেখক বইয়ের শেষ দিকে এসে, এখানে ইসলামের মহান চার খলিফার খিলাফতপদ্ধতি, তাদের শাসনামলের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, সে সময়কার মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অবস্থা, তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন—এসবের ওপর আরোপিত অতিমাত্রার অভিযোগ, সমালোচনার সমালোচনা এবং এ থেকে আমাদের জন্য প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়ে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছেন।

আমরা ধারণা করি, এই অংশটুকু অধ্যয়নের মাধ্যমে সিরাহ অধ্যয়ন ও গবেষণায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির মাইলফলক স্পর্শ করতে আমরা আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে পারব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই আলোচনা থেকে পুরোপুরি উপকৃত হয়ে আমলে পরিণত করার তাওফিক দান করেন, আমিন!

খলিফাতুর রাসুল

আবু বকর রা.-এর খিলাফতকাল

খলিফা নির্বাচন

মুসলিমরা বনু সায়িদার সাকিফায় (ছাউনি বা তাঁবুতে) একটি বিশেষ আলোচনার জন্য একত্র হলো। সময়টা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরপরই। আলোচনারর বিষয় নির্ধারিত হলো—কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। নবিজির অবর্তমানে কে মুসলিমদের নেতৃত্ব দেবেন এবং তাদের সবকিছু দেখাশোনা করবেন। আলোচনা-পর্যালোচনা, মতবিনিময় ও মতামত পেশ করার পর সকলেই একমত হলেন। নবিজির পর তাঁর প্রথম প্রতিনিধি হবেন সিদ্দিকে আকবর রা.। যিনি রাসুলের অসুস্থকালীন তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং সালাতে মুসলিমদের নেতৃত্ব (ইমামাত) দিয়েছিলেন। যিনি ছিলেন রাসুলের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। গারে সাওরে নবিজির সঙ্গী।

আলি রা. খিলাফতের বিরোধিতা করেছিলেন

শীর্ষ সাহাবিগণের এই ঐকমত্যের (ইজমা) বিপক্ষে আলি রা.-এর ভিন্ন কোনো মত ছিল না। তবে আবু বকর রা.-এর কাছে বাইয়াত হতে তার একটু বিলম্ব হয়েছিল। আর এর কারণ ছিল—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মিরাস নিয়ে আবু বকর রা. ও নবিতনয়া ফাতিমাতুজ জাহরা রা. মাঝে সামান্য মতবিরোধ।[২৮৮]

---

২৮৮ বিস্তারিত দেখুন—ইবনে কাসির, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩০১

আবু বকর রা.-এর শাসনামলে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ :

এক. উসামা রা.-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ

নবিজির ইন্তেকালের পর আবু বকর রা. নবিজির অসমাপ্ত কাজগুলো প্রথমেই সমাপ্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি উসামা রা.-এর নেতৃত্বে রওনা হওয়া সেই বাহিনীকে পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন—যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুস্থতার খবর শুনে মদিনার নিকটে জু-খাসাব নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিল। তবে যেহেতু নবিজির ইন্তেকালের পরপর লোকেদের কিছু শ্রেণির ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছিল, তাই অনেকেই সেদিক লক্ষ্য করে এই বাহিনীকে অভিযানে না পাঠানোর ব্যাপারে মতামত দিচ্ছিল; কিন্তু আবু বকর রা. তাদের কথা কানে তোলেননি। এমনকি তিনি তাদের কথাও কানে নিলেন না, যারা বলছিল—উসামাকে পরিবর্তন করে এই বাহিনীতে অন্য কাউকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক। কেননা, এই বাহিনী নবিজি নিজে প্রস্তুত করেছিলেন।

আবু বকর রা. এই বাহিনীকে বিদায় দিতে পায়ে হেঁটে বের হয়ে গেলেন। আর তাদের সেনাপতি হলেন উসামা রা.। আবু বকর রা. ঘোড়ায় উঠবেন—এই চিন্তা করে উসামা রা. ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন।

কিন্তু ঘোড়া থেকে উসামাকে নেমে যেতে দেখে আবু বকর রা. বললেন—আল্লাহর কসম! তুমি নামবে না। আমি ঘোড়ায় চড়ব না। তাদের তিনি উপদেশ দিলেন—তারা যেন খেয়ানত না করে। ধোঁকা না দেয়। গনিমতের মাল চুরি না করে। শত্রুপক্ষের কাউকে নাক-কান কেটে বিকৃত করে হত্যা না করে। শিশু, নারী বা একেবারে বৃদ্ধকে হত্যা না করে। তাদের আরও উপদেশ দিলেন—

> তারা যেন খেজুর বাগান না পুড়িয়ে দেন। গাছ না কাটেন। খাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া যেন কোনো বকরি ও উট জবাই না করেন।

তাদের আরও বলেন—

> যখন তোমরা এমন কোনো সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, যারা গির্জায় উপাসনায় ব্যস্ত, তখন তাদের তাদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দেবে।

তিনি উসামা রা.-কে লক্ষ করে বলেন—

তোমার কী মতামত, উমরকে যদি (যুদ্ধে না গিয়ে) আমার কাছে থেকে যাওয়ার অনুমতি দাও—যাতে করে আমি মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত নিয়ে কাজ করতে পারি, তাতে কোনো সমস্যা আছে?

উসামা রা. বললেন—ফয়সালা আপনার হাতে।

তারপর উসামা রা. রোমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। এমন প্রতিটি গোত্রকেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনলেন, যাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছিল।

তার যুদ্ধযাত্রা দেখে প্রতিটি গোত্রের মনে এই ভীতি ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছিল—(নবির ইন্তেকালের কারণে যদি মুসলিমরা নির্জীব হয়ে যেত,) মুসলিমদের যদি কোনো শক্তি না-ই থেকে থাকত, তাহলে এই মুহূর্তে তারা রোমের বিপক্ষে এমন বাহিনী নিয়ে বের হতো না এবং উসামাও তার সেনাবাহিনী নিয়ে সেই রোমের পথ ধরত না, যেখানে তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে।

এরপর উসামা যুদ্ধাগ্রহী অন্যান্যদের সাথে সাথে লড়াই করেন। যুদ্ধরত সেইসব গোত্রের ওপর আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেন। তারপর তারা বিজয়বেশে ফিরে আসেন।[২৮৯]

দুই. জাকাত অস্বীকারকারী ও ইসলামত্যাগীদের বিরুধ্যে সৈন্য প্রস্তুত করা

আবু বকর রা. এগারোটি ঝান্ডা উঁচিয়ে ধরলেন। প্রত্যেকটি ঝান্ডা একেকটি বাহিনীর হাতে দিয়ে তাদের একেক দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর আবু বকর রা. নিজে জুল-কিসসা নামক এলাকার দিকে একটি পতাকা নিয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন। আলি রা. এ অবস্থা দেখে কসম খেয়ে আবু বকর রা.-কে পেছনে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালেন।

আলি রা. তার ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে আবু বকর রা.-এর উদ্দেশে বলতে লাগলেন—ইয়া খালিফাতার রাসুল, উহুদের দিন নবিজি যা বলেছিলেন, আমি আপনাকে তা-ই বলছি—আপনি আপনার তরবারি বিরত রাখুন। আপনি নিজে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার কিছু হয়ে গেলে মুসলিম জাতি বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে। আপনার পর তাদের আর কোনো খুঁটি দাঁড়াতে পারবে না।

---

২৮৯ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* থেকে সংক্ষেপ, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩০৪

এ কথা বলার পর আবু বকর রা. আরেকজনের হাতে ঝান্ডা দিয়ে পেছনে ফিরে আসেন।[২৯০]

তিন. খালিদ রা.-কে ইরাকের উদ্দেশে প্রস্তুত করা

সিদ্দিকে আকবর রা. খালিদ রা.-কে ইরাকের উদ্দেশে প্রস্তুত করলেন। তার সাথে পাঠালেন মুসান্না ইবনে হারিসা আস-শাইবানিকে। তারা বহু শহর জয় করে বিজয়বেশে গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে এলেন।

চার. রোমে আবু বকর রা.-এর আক্রমণের ইচ্ছে

সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে আবু বকর রোমে আক্রমণের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। কিছু সাহাবি তাকে সমর্থন দেওয়ার পর তিনি আলি রা.-এর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—আবুল হাসান, তোমার কী মতামত?

আলি রা. বললেন—আপনার সিদ্ধান্ত বরকতময়। আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনি বিজয়ী হবেন, ইনশাআল্লাহ।

আবু বকর রা. এ কথা শুনে অনেক খুশি হলেন। আল্লাহ তায়ালা সিদ্দিকে আকবর রা.-এর অন্তরকে এই মহান যুদ্ধের জন্য বড়ো করে দিলেন। তিনি লোকদের একত্র করে তাদের উদ্দেশে এক ভাষণ দিলেন। তাদের জিহাদের প্রেরণা দিলেন। গভর্নদের কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। মানুষ একত্র হতে লাগল। দলে দলে গোত্রসমূহ আসতে লাগল।

আবু বকর রা. অনেকগুলো ঝান্ডা উড়ালেন। গভর্নদের আমির নিযুক্ত করে একের পর এক বাহিনী পাঠালেন। আবু উবাইদা রা.-কে সব বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। যখনই কোনো আমির রওনা হতো, তিনি তাদের বিদায় দেওয়ার সময় তাদের আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। উপদেশ দিতেন উত্তম সঙ্গী হওয়ার। সময়মতো জামাতের সাথে সালাত আদায় করার। প্রত্যেকে যেন নিজের নফসকে সংশোধন করে। যাতে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সকল মানুষকে ঠিক করে দেন। তাদের আরও অসিয়ত করতেন, যেন শত্রুপক্ষের দূত এলে তাদের সম্মান

---

২৯০ আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ও আম্মাজান আয়িশা রা.-এর সনদে ইবনে কাসির *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়* বর্ণনা করেন—আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বিজয় দান করেন। ধর্মান্তরিতের মূলোৎপাটিত হয়ে যায়। জাজিরাতুল আরবের প্রতিটি জায়গায় ইসলামের স্থিতি ফিরে আসে। সকল গোত্রই জাকাত আদায় করতে স্বীকৃতি জানায়।

করা হয়। যেন শত্রুপক্ষের দূত তাদের কাছে অল্প সময় অবস্থান করে। যাতে করে দূত মুসলিম শিবির থেকে মুসলিমদের কোনো তথ্য না জেনেই বের হয়ে যায়।

মুসলিম বাহিনী রোমের উদ্দেশে রওনা হলো। ইয়ারমুকে এসে তারা একত্র হলো। মুসলিম বাহিনী আবু বকর রা.-কে খবর পাঠাল যে, রোমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক। তখন আবু বকর রা. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর নিকট চিঠি পাঠিয়ে তাকে শামের উদ্দেশ্যে রওনা হতে আদেশ করলেন। তাকে আরও আদেশ করলেন, যেন তিনি ইরাকে নিয়োজিত বাহিনীর অর্ধসংখ্যক সেনা নিয়ে যান আবু উবাইদা রা.-এর বাহিনীর সাহায্যে। খালিদ রা.-কে এটাও আদেশ করলেন, যেন ইরাকে অবশিষ্ট বাহিনীর দায়িত্ব মুসান্না ইবনে হারিসাকে দিয়ে আসেন। এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে আদেশ করলেন, শুধু শামে এসে শাম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. শামের মুসলিমদের কাছে পৌঁছে আবু উবাইদা রা.-কে এই বলে পত্র পাঠালেন—

> সালাত ও সালামের পর, আমার ও আপনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি ভয়ের দিনে নিরাপত্তার; দুনিয়াবি জিন্দেগিতে সকল অকল্যাণ থেকে মুক্তির।
>
> আমার কাছে আল্লাহর রাসুলের প্রতিনিধির (খলিফার) পত্র এসেছে। তিনি আমাকে আদেশ করছেন শামে এসে শামের সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়াতে; তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। আল্লাহর কসম! আমি এটার দাবি করিনি। আমি এটা চাইওনি। আপনি যে পদে ছিলেন, সে পদে আপনিই থাকবেন। আমরা আপনার অবাধ্য হব না। আর না আপনার বিরোধিতা করব। আপনাকে ছাড়া আমরা কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্তও নেব না।

খালিদ রা.-এর পত্র পড়ে আবু উবাইদা রা. বলতে লাগলেন—

> রাসুলের প্রতিনিধির সিদ্ধান্তের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করুন। আর আল্লাহ খালিদকে তার কর্মের ওপর সাধুবাদ দিন।

এদিকে সিদ্দিকে আকবর রা. আবু উবাইদা রা.-এর নিকট চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিতে বলেছেন—

> শামে আমি খালিদকে শত্রুর সাথে লড়াইয়ে নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি তার বিরোধিতা করো না। তার কথা শুনো। তাকে অনুসরণ

করো। ভাই, আমি তোমার বিপক্ষে তাকে পাঠাইনি। এজন্যও নয় যে, সে আমার কাছে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমি মনে করেছি, যুদ্ধে এই ধরনের নাজুক জায়গায় তার বিচক্ষণতা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের জন্য কল্যাণ ও শান্তির ফয়সালা করুন।

এরপর মুসলিম বাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হয়। তারা প্রচণ্ড সংঘাতময় ধারাবাহিক কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এই সংঘাত কিছুকাল অব্যাহত ছিল। সবশেষে মুসলিমদের বিজয় হয়। রোমানদের এত সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছিল, যার হিসাব করা ছিল যারপরনাই কঠিন। তাদের বিশালসংখ্যক সৈন্য বন্দিও হয়ে ছিল।

এই সময়ে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর কাছে চিঠি এলো—সিদ্দিকে আকবর রা. ইন্তেকাল করেছেন! তারপর উমরের কাছে খিলাফতের বাইয়াত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চিঠিতে আরও ছিল—

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপতিত্ব থেকে অপসারণ করা হয়েছে। আর বাহিনীর সেনাপতিত্বের ভার আবু উবাইদাকে দেওয়া হয়েছে।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. বিষয়টি নিজের মধ্যে গোপন রাখেন। যাতে করে মুসলিম বাহিনীর মাঝে হাঙ্গামা সৃষ্টি না হয়। এই খবর যখন আবু উবাইদার কাছে পৌঁছল, তখন তিনিও অন্যদের কাছ থেকে বিষয়টা গোপন রাখেন। আর তিনিও কাউকে একই কারণে জানাননি।[২৯১]

সিদ্দিকে আকবরের ইন্তেকাল

সিদ্দিকে আকবর রা. তেষট্টি বছর বয়সে জুমাদাল আখিরার সাত তারিখে, মঙ্গলবার, তের হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার খিলাফতকাল ছিল দুই বছর তিন মাস তিন দিন।

উমরকে সিদ্দিকে আকবরের খিলাফতের দায়িত্বপ্রদান

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রাসুলের কিছু বিচক্ষণ ও প্রবীণ পরামর্শদাতা সাহাবিগণের সঙ্গে সিদ্দিকে আকবর রা. পরামর্শ করলেন। তারা সকলে একমত হলেন যে,

---

২৯১ *তারিখুত তাবারি*, সংক্ষেপ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৩; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৪৩; ইমাম সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা* : ৬৭

তারপর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব উমরে ফারুক রা.-এর কাছে অর্পণ করা হোক। সিদ্দিকে আকবর রা.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তার পরবর্তী খিলাফতের দায়িত্বভার নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির কাছে অর্পণ করে উপযুক্ত সময়ে খলিফা নিযুক্ত করে যান।

ইমাম তাবারি, ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাউজি ও ইমাম ইবনে কাসির উল্লেখ করেছেন—আবু বকর রা. ভয় পেয়েছিলেন যে, তারপর হয়তো মুসলিমরা এমন মতবিরোধে লিপ্ত হতে পারে, যার পর তারা আর কোনো সিদ্ধান্তে একমত হবে না। তাই তার অসুস্থতা যখন অনেক বেড়ে গেল তখন মুসলিমদের ডাকলেন; যেন তারা তার পরবর্তী খলিফা খুঁজে নেন। তিনি চান, যেন এটা তার জীবদ্দশায় হয় এবং তার জ্ঞাতসারে হয়।

কিন্তু মুসলিমরা পরস্পর এ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেনি যে, কে এই অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্দিকে আকবরের প্রতিনিধিত্ব করবে। তাই তারা বিষয়টা তার কাছে ছেড়ে দিলো। তারা বলল—আমরা মনে করি, এটা আপনার সিদ্ধান্ত। আর তখনই সিদ্দিকে আকবর রা. বিশিষ্ট সাহাবিদের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথকভাবে পরামর্শ করতে লাগলেন। যখন তিনি উমরের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য দেখলেন। তখন তিনি মানুষের সামনে এসে তাদের জানালেন যে, তিনি তার পরবর্তী ও তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে কোনো ত্রুটি করেননি। তাদের জানালেন, তিনি মুসলিমদের প্রতিনিধি উমরকে নির্বাচন করেছেন। তখন সকলেই এক বাক্যে বলল—আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২৯২]

উমর রা.-এর খিলাফতের ভিত্তি

কেউ কেউ মনে করে, খলিফা নির্বাচনের এই পদ্ধতি নির্দিষ্ট একজন মানুষের অধীনে নির্বাচনের মতোই। যা সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে পরামর্শ সদস্যদের ওপর যে শুরা সিস্টেম নির্ভর করে, তার বহির্ভূত একটি সিস্টেম।

তবে বিষয়টি নিরীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখলে তাহলে আমরা বুঝতে পারব—উপর্যুক্ত পদ্ধতির মধ্যে পরামর্শক কমিটির সদস্যদের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে শাসক নিযুক্তকরণের একটি প্রমাণ রয়েছে। কেননা, সিদ্দিকে আকবর রা. তাদের জন্য উমরকে নির্বাচন করেছেন নেতৃত্বস্থানীয় সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করার পর। এবং সকলেই উমরকে নির্বাচন করেছেন। এবং সত্যায়ন করেছেন। তার পাশাপাশি

---

২৯২ বিস্তারিত দেখুন—*তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২৮; ইবনুল জাউজির *সিরাতে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.* : ৩৬

সিদ্দিকে আকবর রা.-এর উমরকে নির্বাচন করা এমনি ঘটে যাওয়া ও কোনো পূর্ব-স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত ছিল না; বরং তা সমবেত সাহাবিদের মধ্যে এক বক্তৃতার পর হয়েছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেছেন—তারা কি উমরকে মানবে এবং উমরের কথা শুনবে কি না। তারা সকলে এক বাক্যে বলেছিল—'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' এবং সকল মুসলিম সিদ্দিকে আকবরের ইন্তেকালের পর এই নির্বাচনের শুদ্ধতার ও বৈধতার ব্যাপারে একমত হয়েছে। সুতরাং এই নির্বাচন-পদ্ধতি ঐকমত্যের দলিল হয়ে গেল যে, গ্রহণযোগ্য শরয়ি শর্তের সাথে নির্বাচন ও চুক্তির মাধ্যমে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা হবে।[২৯৩]

উমরের নামে সিদ্দিকে আকবরের অসিয়তনামা

সিদ্দিকে আকবর রা. যখন দেখলেন উমরকে খলিফা নিবার্চিত করার ব্যাপারে সকলে একমত, তখন উসমান রা.-কে ডেকে অসিয়তনামা লেখান—

> বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
>
> এই অসিয়তনামা আল্লাহর রাসুলের খলিফা আবু বকর সিদ্দিকের পার্থিব জীবনের সর্বশেষ ও পরকালীন জীবনের সূচনা সময়ের। এটি এমন পরিস্থিতির অসিয়তনামা, যখন একজন কাফির ঈমান এনে মুমিন হয়ে যাচ্ছে। আর পাপা করে পাপাচারী হচ্ছে দৃঢ় বিশ্বাস লালনকারী মুমিন। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ওপর উমরকে নিযুক্ত করে যাচ্ছি।
>
> সুতরাং সে যদি ধৈর্য ধরে ও ইনসাফ করে, তাহলে তার ব্যাপারে এতটুকুই আমার জানাশোনা এবং এটাই আমার ধারণা।
>
> আর সে যদি অন্যায়-অবিচার করে এবং আদর্শ বিকৃত করে ফেলে, তাহলে অদৃশ্যের বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি কল্যাণেরই ইচ্ছা করেছি। আর প্রত্যেকে তার কর্মের ফল পাবে। যারা জুলুম করেছে, তারা অচিরেই জানতে পাবে—তারা কোন ঠিকানায় প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে।

তারপর তার অসিয়তনামার বক্তব্য লেখানো শেষ হলে উসমান রা. উপস্থিত লোকদের অসিয়তনামা পড়ে শোনালেন। সকলেই উমর রা.-এর কাছে বাইয়াত হলো। এ ঘটনা তেরো হিজরির জুমাদাল আখিরার ঘটনা।

---

২৯৩ *তাফসিরে ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৮

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

সিদ্দিকে আকবর রা.-এর খিলাফতের ইতিহাস থেকে অনেক আদর্শ ও মূলনীতি পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্তাকারে এখানে আমরা তা উল্লেখ করব—

০১. শূরা পদ্ধতি

সিদ্দিকে আকবর রা. খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন শূরার মাধ্যমে। এই শূরা-সদস্যেদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম। যাদের মধ্যে আছেন আলি রা.। আর এটা এ কথার ইঙ্গিত করে যে, রাসুলের পর কে হবে রাসুলের প্রতিনিধি—এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না। যদি কুরআন ও হাদিসের মধ্য এর কোনো নির্দেশ পাওয়া যেত, তাহলে শূরার কোনো সুযোগ থাকত না। আর সাহাবায়ে কিরামের এর কোনো সুযোগ থাকত না যে, কুরআন ও হাদিসের সীমা পার হয়ে তাদের মনমতো ও শূরার পদ্ধতিতে কারও ওপর একমত হয়ে খলিফা নির্বাচন করবে।

০২. পরামর্শপদ্ধতির গুরুত্ব

খলিফা নির্বাচন নিয়ে বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বনু সায়িদার সাকিফায় (ছাউনিতে) যে মতবিরোধ হয়েছিল, তা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। যা আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরামর্শসভার পরিবেশে সাধারণত হয়ে থাকে। যে সকল বিষয়ে শরিয়তের স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই, সে সকল বিষয়ে মতামত দেওয়া, বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করা, এক মতের ওপর অনড় থাকা, শর্ত-পালটা শর্ত, চুক্তি-পালটা চুক্তি করা—এ সবগুলোই শরিয়ত সমর্থিত বিষয় ও এতে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। কারণ, শরিয়ত যে সকল বিষয়ে চুপ রয়েছে, সে সকল বিষয়ে প্রকৃত সত্যের দিকে পৌঁছার একমাত্র উপায় হচ্ছে—অনেক মতামত দেওয়া। সকল মতামত নিয়ে বিষয়ভিত্তিক, স্বাধীন ও নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচন-পর্যালোচনা করা। আরও বড়ো বিপদ হতো, যদি সাহাবায়ে কিরামের নির্বাচনের আর কোনো অধিকার না থাকত। কোনো

একজনকেই নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হতো। যাকে ভোটের জন্য উত্থাপন করত এবং তার ব্যাপারে একমত না হলে আবার প্রত্যাহার করে নিত। আর তখন এই শুরা হতো একটি মিথ্যা শুরা। তার ব্যাপারে একমত হওয়ার বিষয়টি হতো বহিরাগত কোনো চাপে।

আশ্চর্য লাগে সেই সকল লোকদের ব্যাপারে, যারা ইসলামের শুরা সিস্টেমের সমালোচনা করে। এই সিস্টেমকে স্বৈরাচারী সিস্টেম বলে। এমনকি যদি তারা তাদের চোখের সামনে শুরার কার্যকর প্রতিফলন দেখে, তাহলেও অজ্ঞতাবশত হোক বা অজ্ঞতার ভান করে হোক, এ সিস্টেমকে ঝগড়া ও পরস্পরের লড়াইয়ের সিস্টেম বলে। তাহলে বলতে হয়—তাদের মাথায় যে শুরার সিস্টেম আছে, তা কীসের শুরা ও কোন ধরনের শুরা? তার আকৃতি-প্রকৃতি কী হবে? তা কেমন হওয়া উচিত?

০৩. আবু বকর ও আলি রা.-এর পারস্পরিক হৃদ্যতা

ধর্মান্তরিতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আলি রা. সিদ্দিকে আকবর রা.-কে উপদেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি নিজে লড়াইয়ে না যান। কারণ, ভয় ছিল—তার কিছু হয়ে গেলে মুসলিমদের ক্ষতি হয়ে যাবে। এটা স্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, আলি রা. সিদ্দিকে আকবর রা.-কে ভীষণ ভালোবাসতেন। সিদ্দিকে আকবর রা.-এর রাসুলের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট। মুসলিমদের নেতৃত্বদানে সিদ্দিকে আকবর রা.-এর যোগ্যতার ব্যাপারে ছিলেন পরিপূর্ণ আস্থাশীল। অনুরূপ আলি রা.-এর এ উপদেশ এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের দুজনের মধ্যে ছিল সহযোগিতা ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সুউচ্চ অবস্থান। সিদ্দিকে আকবর রা.-এর কাছে আলি রা.-এর বিলম্বে বাইয়াত হওয়ার ব্যাপারে এবং এই সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে যে সামান্য বিরোধ হয়েছিল—সে সম্পর্কে যে যা-ই বলুক না কেন, এসব কিছু উপর্যুক্ত বাস্তবতার সাথে কখনো সাংঘর্ষিক হতে পারে না। দুজনের মাঝে যে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক আছে, তা কদাকার করতে পারে না।

আর এ কথা সকলের জানা থাকা দরকার যে, আলি রা.-এর বাইয়াত বিলম্বে করা সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছিল। তিনি এটা হয়তো ফাতিমা রা.-এর আবেগ-অনুভূতির জায়গাকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে এমনটি করেছিলেন। কারণ, ফাতিমা রা. নিজের দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন যে, প্রতিটি মেয়ে যেমন তার বাবার উত্তরাধিকার হয়, তিনিও রাসুলের উত্তরাধিকার হবেন। আলি রা.-এর এই বিলম্ব সিদ্দিকে আকবর রা.-এর প্রতি বিদ্বেষবশত ছিল না।

অন্যথায় কীভাবে এমন বিদ্বেষ পোষণকারী সিদ্দিকে আকবর রা.-কে এমন ভালোবাসতে পারে, তার প্রতি সহমর্মিতা ও তার পক্ষে আত্মমর্যাদা দেখাতে পারে!

০৪. আবু বকরের বিস্ময়কর দৃঢ়তা

ধর্মান্তরিত গোত্রসমূহের বিপক্ষে সিদ্দিকে আকবর রা. যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে লড়ায়ের ময়দানে যে অসীম ও শানিত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, এবং বাহ্যিকভাবে প্রায়ই সকল সাহাবিই যে পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হয়ে ছিলেন, সেইসব বিষয়ে যদি কোনো মুসলিম চিন্তা করে, তাহলে অবশ্যই তার এ দৃঢ় বিশ্বাস হবে—এটা ছিল আল্লাহর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ফয়সালা। আল্লাহ তায়ালা এই উপযুক্ত সময়ে ও এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তিকেই।

আমাদের মধ্যে কেউ এ ধারণাও করতে পারবে না যে, সেই তুফানের মুখোমুখি হতে এবং তাকে প্রতিহত করতে সকল সাহাবির মধ্যে কেউ সিদ্দিকে আকবর রা.-এর চেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিল। এমনকি উমর রা.-এর মতো সাহাবি—যিনি সকল সাহাবিদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দৃঢ়তার অধিকারী হিসেবে পরিচিত—সেই উমর রা.-ও এই তুফানের সামনে সিদ্দিকে আকবর রা.-এর দৃঢ়তার মোকাবিলায় হীনম্মন্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুতরাং কে আছে, যে এই ঐশী ও বিস্ময়কর রহস্য দেখে, তারপর এই ইতিহাস ও ইতিহাসের পতাকাবাহীদের ও চরম ইনসাফপূর্ণ ও অমোঘ রহস্যের অধিপতির নিয়মের সমালোচনা করে?

০৫. উমরের খিলাফত কি অসিয়ত ছিল

অনেকে মনে করে, শুধু অসিয়ত ও খলিফা নির্বাচন করাই নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম। তাদের দলিল হলো—উমরের প্রতি সিদ্দিকে আকবরের খিলাফতের অসিয়তনামা।

কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং নেতা বা ইমাম নির্ধারণের বিষয়টি প্রথমে মুসলিম জনসাধারণের সামনে পেশ করতে হবে। তারপর মুসলিম জনসাধারণ কারও ইমাম হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন ঘোষণা করতে হবে। তারপর ইমাম নির্ধারণের বিষয়টি পূর্ণ হবে মুসলিম জনসাধারণের সমর্থনের মাধ্যমে। অর্থাৎ যদি শুধু আবু বকর রা. নিজে নিজেই উমরকে খিলাফতের অসিয়ত করে যেতেন, আর মুসলিমরা উমরের প্রতি সমর্থন না জানাত, তাহলে এই অসিয়তের কোনো মূল্য থাকত না। এখান থেকে আমরা জানতে পারি—যেমন ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি—উমরের

খিলাফতের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে একটি মশওয়ারার আওতায়। যেই মশওয়ারায় সাহাবায়ে কিরামের সকলে এ সমর্থন জানিয়েছেন, সিদ্দিকে আকবর রা. যাকে খলিফা নির্বাচন করবেন, তাকেই খলিফা নিযুক্ত করা হবে।

* * *

খলিফাতুর রাসুল

উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকাল

সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী

তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের নেতা। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আল ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আল ফারুক অর্থ হলো—সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। কেননা, তিনি সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতেন। যেদিন সিদ্দিকে আকবর রা. ইন্তেকাল করেন, সেদিন উমরের কাছে খিলাফতের বাইয়াত নেওয়া হয়েছে। তখন তার অনুপম আদর্শ, সংগ্রামী জীবন ও অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে শক্তি জুগিয়েছেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে অপসারণ

তার খিলাফতের প্রথম কাজ ছিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে ইয়ারমুকের ময়দানে সেনাপতিত্ব থেকে অপসারণ করা। তার জায়গায় আবু উবাইদাকে সেনাপতি নিযুক্ত করা। তিনি বাইতুল মাকদিসের গৌরবময় বিজয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে দশ দিন অবস্থান করেছেন। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। উমর রা. খালিদকে অপসারণ করায় খালিদ উমরকে তিরস্কার করেছিলেন। উমর জবাবে তাকে বলেন—খালিদ, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমার কাছে অনেক সম্মানিত, অনেক প্রিয়ভাজন।[২৯৪]

---

২৯৪ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮১; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড :৩, পৃষ্ঠা : ৪৩৫

এরপর এই বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা দূর করতে তিনি বিভিন্ন শহরে-বন্দরে ও নগরে-ভূখণ্ডে এ বার্তা পাঠালেন—

> খালিদের সাথে আক্রোশবশত, আর না বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমি তাকে অপসরণ করেছি; কিন্তু তাকে আমি অপসরণ করেছি মানুষের ওপর দয়া ও সহানুভূতিশীলতার কারণে। তার দ্রুত আক্রমণ ও তীব্র আঘাতের কারণে।[২৯৫]

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ছিলেন উমর রা.-এর খালাতো ভাই। উমরের শাসনকালেই তিনি হিমসে ইন্তেকাল করেন। উমর দিমাশক বিজয় করেন কিছুটা বলপ্রয়োগ ও সন্ধি করে। আর হিমস ও বালা-বাক্কা জয় করেন সন্ধি করে। বসরা ও আবিল্লাহ জয় করেন বলপ্রয়োগ করে। এসব বিজয় অর্জিত হয় হিজরি চৌদ্দ সনে। এ বছর সকল মুসল্লিকে বিশ রাকাত তারাবির সালাত একত্র করেন।

হিজরি পনেরো সনে শক্তি প্রয়োগে জর্দানের প্রায় অঞ্চলই বিজিত হয়। তবে জর্দানের তাবারিয়া নামক এলাকাটি সন্ধির ভিত্তিতে জয় করা হয়। এ বছরেই সংঘটিত হয়ে ছিল ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার যুদ্ধ। ঐতিহাসিক ইবনে জারির আত-তাবারি তার ইতিহাসগ্রন্থে বলেন—

> সে বছরেই সাদ রা. কুফাকে শহর হিসেবে গোড়াপত্তন করেছিলেন। সে বছরেই উমর রা. মন্ত্রণালয়-ব্যবস্থা ও পাবলিক মিনিস্ট্রি প্রথা প্রণয়ন করেন। ইসলাম অগ্রগামিতার ভিত্তিতে তার সময়ই নাগরিকের ভাতা চালু করে।[২৯৬]

ইরাকে প্রথম জুমআ

ষোলো হিজরিতে আহওয়াজ ও মাদায়িন শহর বিজিত হয়। সেখানেই ই-ওয়ান কিসরা নামক জায়গায় সাদ রা. জুমআ কায়েম করেন। এটাই ইরাকের মাটিতে সর্বপ্রথম জুমআ।

---

২৯৫ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮১; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৩৫

২৯৬ *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৯৮ ও ৬১৩

নিজেই বাহিনীতে থাকার ইচ্ছে ও সাহাবিদের বাধা

পারস্য ও রোমের সাথে লড়াইয়ে নিজে বের হওয়ার জন্য উমর রা. সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছিল আলি রা. আনহু। আলি রা. উমর রা.-কে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ—

> নিশ্চয়ই এ লড়াইয়ের জয়-পরাজয় কম হোক বেশি হোক, তা আল্লাহর সেই দ্বীন—যাকে আল্লাহ বিজয়ী করেছেন। আল্লাহর সেই বাহিনী—যাদের আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন ও সাহায্য করেছেন। তাই এ দ্বীন পৌঁছে গেছে সবখানে। তার সূর্য উদিত হয়েছে সব উদয়াচলে। আর নিশ্চয়ই কোনো বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক হলেন পুঁতির মালার মতো। যিনি পুঁতি গেঁথে মালা বানান। যদি মালা ছিঁড়ে যায়, তাহলে পুঁতি খুলে খুলে পড়ে যায়। একপর্যায়ে একেবারে শেষ হয়ে যায়। এরপর আর কখনোও সে মালা গাঁথা যায় না।
>
> সুতরাং আপনি হলেন আরবজাতির চালিকাশক্তি। আপনি আরব জাতির জীবন-চাকা ঘুরিয়ে দেন। আরব জাতিকে নিয়ে আপনি ঘুরে দাঁড়ান। তাদের মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেন। আপনার নেতৃত্বে তাদের আপনি যুদ্ধে নামিয়ে দেন। আপনি যদি নিজেই এই আরব ভূমি থেকে বের হয়ে যান যুদ্ধ করতে, তাহলে চারপাশের আরবরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আর তখন আপনার পর মুসলিমদের আর দেখভাল করার কেউ থাকবে না। সে সময় যুদ্ধের চেয়ে রেখে যাওয়া মুসলিমদের ইজ্জত-আব্রু এবং তাদের পরিবার-পরিজন বেশি উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[২৯৭]

এ বছরই সংঘটিত হয়েছে জালুলার যুদ্ধ। যে যুদ্ধে কিসরার ছেলে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে রিয়া নামক স্থানে। এই বছরই বিজিত হয় তিকরিত শহর। সেই বছরই উমর রা. বাইতুল মাকদিসের উদ্দেশে রওনা হন। বাইতুল মাকদিস জয় করেন। জাবিয়া শহরে তার সেই বিখ্যাত ভাষণ দেন। সেই বছরই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হয় কনসুরিন। সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয় হালব, আনতাকিয়া ও মানবাজ। এ বছরই রবিউল আউয়াল মাসে আলি রা.-এর পরামর্শে হিজরি ইতিহাস লেখা শুরু হয়। হিজরি সতেরো বছরে উমর রা. মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন। এই বছরকেই আমুর রিমাদাহ বা দুর্ভিক্ষের বছর বলা হয়। এই দুর্ভিক্ষে উমর রা.

---

২৯৭ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০৭; *নাহজুল বালাগাহ* : ২০৩

মানুষের জন্য আব্বাস রা.-এর ওসিলা ধরে আল্লাহর কাছে পানির জন্য প্রার্থনা করেছেন (ইসতিসকার সালাত আদায় করেছেন। তখন দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গিয়েছিল। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন—

> যখন উমর রা. ইসতিসকার সালাতে বের হলেন, তখন তার গায়ে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর মুবারক ছিল। আবার এই বছরই সন্ধির মাধ্যমে আহওয়াজ নামক শহর জয় করেন।[২৯৮]

আমওয়াসের মহামারি

আঠারো হিজরিতে শামে আক্রমণ করে এক প্রাণঘাতী মহামারি। যাতে আক্রান্ত হয়ে ছিল বহু মুসলিম সৈন্য। উমর রা.-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। তখন উমর রা. দ্বিতীয়বারের মতো শামে যাচ্ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলে প্রথমে সাহাবায়ে কিরাম মতবিরোধ করেন। তারপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. আগমন করলে তিনি তাদের জানান—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> যদি তোমরা শোনো যে, কোনো শহর মহামারি আক্রান্ত হয়েছে, তাহলে সেখানে যেয়ো না। আর যদি তোমরা সেই শহরে থাকা অবস্থায় সেখানে মহামারি আক্রান্ত করে, তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বের হয়ে হয়ো না।

এ কথা শুনে উমর রা. লোকদের নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। উনিশ হিজরিতে বলপ্রয়োগে কাইসারিয়া বিজিত হয়।

বিশ হিজরিতে বলপ্রয়োগে মিশর বিজিত হয়। কেউ কেউ বলেন—ইসকানদারিয়া ছাড়া পুরো মিশর সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়। আর ইসকানদারিয়া বলপ্রয়োগে জয় করা হয়। বিশ হিজরিতেই মাগরিব[২৯৯] বিজিত হয়।

এ বছরই রোমের বাদশাহ কাইসার মারা যায়। এ বছরই উমর রা. ইহুদিদের খাইবার ও নাজরান থেকে উচ্ছেদ করেছেন। একুশ হিজরিতে ইসকানদারিয়া ও নাহাওয়ান্দ বিজিত হয়। একুশ হিজরির পর অনারবদের আর কোনো ঐক্যের প্ল্যাটফরম অবশিষ্ট থাকেনি।

---

২৯৮ *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি : ১২৩

২৯৯ মাগরিব হলো উত্তর আফ্রিকার একটি বিরাট অঞ্চল। বর্তমানে মাগরিব আলাদা আলাদা পাঁচটি রাষ্ট্র মিলে—মৌরতানিয়া, মাগরিব, জাজায়ির বা আল জিরিয়া, তিউনিস, ও লিবিয়া।

বাইশ হিজরিতে বলপ্রয়োগে আজারবাইজান জয় করা হয়। কেউ কেউ বলেন, আজারবাইজান সন্ধির মাধ্যমে জয় করা হয়। দিনোর আর হামাদান জয় করা হয় বলপ্রয়োগে। পশ্চিমের ও রিয়্যের তারাবলুস ও বলপ্রয়োগে জয় করা হয়।

তেইশ হিজরিতে পারস্যের অন্যান্য শহর যেমন—রুমান, সিজিস্তান, ইস্পাহান এবং এগুলোর চারপাশ জয় করা হয়। তেইশ হিজরির শেষের দিকে উমর রা. হজ পালন করেন।

সায়িদ ইবনে মুসাইয়াব বলেন—

> যখন উমর রা. মিনা থেকে রওনা হলেন, তখন আবতাহে তার উট বসালেন। তারপর হেলান দিয়ে বসে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন—হে আল্লাহ, আমার বয়স বেড়ে গেছে। আমার শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। আমার প্রজারা আজ ছড়িয়ে পড়েছে বা আমার রাজত্ব আজ দিগ্বিজয়ী। আপনার কাছে আমাকে উঠিয়ে নেন। তবে নষ্টকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী অবস্থায় নয়। সেই বছরের জিলহজ মাস যখন অতিবাহিত হলো, তখনই উমর রা. ছুরিকাঘাতে শহিদ হন।[৩০০]

আসলাম রা.-এর সূত্রে ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন—

> উমর রা. এই বলে দুআ করতেন—হে আল্লাহ, আপনার রাস্তায় আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। আর আমার মৃত্যু আপনার রাসুলের দেশে দান করেন।

উমর রা.-এর হত্যাকাণ্ড

উমর রা.-এর মৃত্যু আবদুল মুগিরা নামের এক অগ্নিপূজারি দাসের হাতে হয়ে ছিল। যার উপনাম ছিল আবু লু'লু। উমরকে তার হত্যার কারণ হিসেবে বলা হয়—একবার সে উমর রা.-এর কাছে এসেছিল প্রয়োজনে। তার অভিযোগ ছিল—তার ওপর যে ট্যাক্স আছে, তা অনেক বেশি হয়ে যায়।

তখন উমর বলেছিলেন—এই পরিমাণ ট্যাক্স তোমার ওপর কোনো বেশি ট্যাক্স নয়।

---

৩০০ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৭; *তারিখুল খুলাফা* : ১২৪

তখন সে রাগান্বিত হয়ে এই বলতে বলতে চলে গেল—'আমি ছাড়া উমরের ইনসাফ সবাই পায়। আমি ছাড়া উমরের ইনসাফ সবাই পায়।' আর মনে মনে উমরকে হত্যার পরিকল্পনা করল।

সে একটি খঞ্জর নিয়ে সেটাকে বিষায়িত করে। তার জন্য এটা কঠিন ছিল না। কারণ, সে ছিল শিল্পকর্ম ও বিভিন্ন জিনিসপত্র বানানোয় দক্ষতার অধিকারী।

এক রাতে সে ঘাপটি মেরে মসজিদের এক কোনায় বসে রইল। উমর রা. তার অভ্যাস অনুযায়ী যখনই ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন, তখনই সে উমরকে তিনটি আঘাত করল। আঘাত খেয়ে উমর পড়ে গেলেন। এটা দেখে পাশে থাকা সাহাবিদের সে যাকেই তার কাছে পাচ্ছিল, তাকেই আঘাত করে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে একজন তার ওপর কাপড় নিক্ষেপ করলে সে আটকা পড়ে। আটকা পড়েছে দেখে সে নিজের খঞ্জর দিয়ে আত্মহত্যা করে।[৩০১]

উমরের হত্যার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের এটাই মতামত। হয়তো এর পেছনে সুদূরপ্রসারী ও চতুরমুখী ষড়যন্ত্র রয়েছে। যেই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছে ইহুদি, অগ্নিপূজারি ও নাস্তিকদের বিভিন্ন দলের হাত। এই হত্যাকাণ্ড ও এই অমার্জনীয় অপরাধ ট্যাক্স বেশি হওয়ায় ব্যক্তিগত কারণে ও ব্যক্তিগত আক্রোশের কোনো ফলাফল হওয়া অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। আসল কারণ সবচেয়ে ভালো আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

উমর রা.-কে যখন জানানো হলো—তার হত্যাকারী সেই আবু লু'লু, তখন উমর রা. বললেন—সকল প্রশংসা এক আল্লাহর; যিনি আমার মৃত্যু ইসলামের দাবিদার কোনো লোকের হাতে রাখেননি।

এরপর তিনি তার ছেলেকে বললেন—আবদুল্লাহ, দেখো, আমার কত টাকা ঋণ আছে।

তখন হিসাব করে দেখা গেল, তার ঋণ ছিয়াশি হাজার দিরহাম। তিনি বললেন—যদি উমরের পরিবারের সম্পদ এ ঋণ পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের সম্পদ থেকেই তা আদাই করে দাও। আর এতে যথেষ্ট না হলে বনি আদির কাছে চাও। এতেও যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে কুরাইশের কাছে চাও। তারপর

---

৩০১ বিস্তারিত দেখুন—*তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯০; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড :৭, পৃষ্ঠা : ১৩৭

বললেন—আর শোনো আবদুল্লাহ, তুমি উম্মুল মুমিন আয়িশার কাছে যাও। তাকে গিয়ে বলো—উমর তার দুই সহযাত্রীর সাথে সমাহিত হতে আবেদন করছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আম্মাজান আয়িশা রা.-এর কাছে গেলে আম্মাজান আয়িশা রা. সব শুনে বললেন—এই জায়গা আমার নিজের সমাধির জন্য রাখছিলাম; কিন্তু আজ আমি আমার ওপর উমরকে অগ্রাধিকার দেবো। এরপর যখন উমরকে খবর জানাল, তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

খলিফার জন্য শুরা গঠন

কিছু সাহাবি উমরকে বললেন—আপনার পর যাকে আপনি উপযুক্ত মনে করেন, তাকে আপনি প্রতিনিধি নির্বাচন করে যান। তখন তিনি ছয় সদস্যবিশিষ্ট এক শুরা গঠন করে দেন। সদস্য ছয়জন হলেন—উসমান ইবনে আফ্ফান, আলি ইবনে আবু তালিব, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, জুবাইর ইবনুল আউয়াম, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম; কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্দিষ্টভাবে নির্বাচন করা যাচ্ছিল না।

তিনি বলেছিলেন—আমি জীবিত থাকি বা মারা যাই, আমি মুসলিমদের খলিফা নির্বাচনের দায়িত্বভার নিতে পারব না। আল্লাহ যদি তোমাদের ব্যাপারে কল্যাণের ফয়সালা করেন, তাহলে এই ছয়জনের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের ব্যাপারে তোমাদের এক করে দেবেন। যেমনিভাবে তোমাদের এক করে দিয়েছিলেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষের ব্যাপারে তোমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর।

এভাবেই উমর হয়ে উঠলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি—যিনি সাহাবায়ে কিরামের ছয় সদস্যের এই শুরা গঠন করেন। যার নাম দেওয়া হয়েছিল আহলুশ শুরা বা শুরা কমিটি। খলিফা নির্বাচন ও খিলাফতের দায়িত্ব তাদের কাছেই অর্পণ করে যান। সুতরাং তারাই ছিলেন ইসলামি শাসন ইতিহাসের সবচেয়ে উচ্চ রাজনৈতিক উপদেষ্টা সভার ব্যক্তিবর্গ।

উমর রা. তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে তাদের বৈঠকে শুধু একজন কল্যাণকামী পরামর্শদাতা হিসেবে উপস্থিত হতে অসিয়ত করে গেছেন; নির্বাচনপ্রার্থী হিসেবে নয়। যেমন—তিনি আরও অসিয়ত করে গেছেন খলিফা নির্বাচনী পরামর্শসভা শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত এবং মুসলিমরা তাদের একজন নির্বাচিত

খলিফার ব্যাপারে এক হওয়া পর্যন্ত সুহাইব রুমি যেন তিন দিন মুসলিমদের ইমামতি করেন।

উসমান রা.-কে যেভাবে খলিফা নির্বাচন করা হলো

উমর রা. কর্তৃক নির্বাচিত উপদেষ্টারা একটি ঘরে একত্র হয়েছেন। খলিফা নির্বাচন নিয়ে তারা পরামর্শ করবেন। তালহা রা. দাঁড়িয়েছেন দরজায়। যেন কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

তাদের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচনের বিষয়টি তারা তিনজন অপর তিনজনের কাছে অর্পণ করলেন। জুবাইর রা. অর্পণ করলেন আলির কাছে। সাদ রা. করলেন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর কাছে। আর তালহা রা. করলেন উসমান রা.-এর কাছে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এবার আলি ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললেন—আপনাদের দুজনের মধ্যে যে খিলাফতের এই দায়িত্ব থেকে দূরে থাকবে, তাকেই আমরা এর দায়িত্বভার দেবো।

তখন দুজনই চুপ রইলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন—আমি আমার অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহকে ও ইসলামকে আমার ওপর সাক্ষ্য রেখে বলছি—আমি চেষ্টা করব তোমাদের মধ্যে যে বেশি উপযুক্ত, তাকে শাসনের দায়িত্বভার দিতে।

তখন তারা বললেন—ঠিক আছে।

তারপর তাদের প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে, তাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা উল্লেখ করে, তাদের সাথে কথা বলেন। তাদের প্রত্যেকের থেকে এক-একজন করে এ প্রতিশ্রুতি নেন—যদি তাকে শাসক বানানো হয়, তাহলে তিনি ইনসাফ করবেন। আর যদি অন্য কাউকে শাসক বা খলিফা বানানো হয়, তাহলে তাকে মানবেন। তার আনুগত্য করবেন।

তখন তাদের প্রত্যেকে বলেন—ঠিক আছে। এরপর শুরা সদস্যের সকলেই আলাদা হয়ে চলে যান।

এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. মানুষের সাথে আলি রা. ও উসমান রা.—দুজনের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগলেন। তারপর তিনি নেতৃস্থানীয়

লোকদের জমা করে বা আলাদা আলাদাভাবে তাদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন। তাদের সাথে, দুজন দুজন করে, একা একা ও একত্র করে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন। এমনকি পর্দার আড়ালে থাকা নারী, বিভিন্ন অফিসে-দফতরে থাকা তরুণ, মদিনায় আসা মুসাফির ও গ্রাম্য আরবদেরও তিনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—খিলাফতের জন্য কে বেশি উপযুক্ত। তিনি টানা তিন দিন তিন রাত লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন।

এত দীর্ঘ পরামর্শ করার পর তিনি মাত্র দুজন ব্যক্তিকে পেলেন—যারা উসমান রা.-এর অগ্রকারের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা হলেন আম্মার ইবনে ইয়াসির ও মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তারা আলি রা.-এর ব্যাপারে প্রথমে মত দিয়েছিলেন। অবশ্য তারপর জনসাধরণের মতের সাথে তারাও একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

এরপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. চতুর্থ দিনে আলি ও উসমান রা.-কে নিয়ে তার ভাগিনা মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমাতা রা.-এর বাড়িতে একত্র হলেন। তখন তিনি বললেন—আমি জনসাধারণের কাছে আপনাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। আমি এমন কাউকে পাইনি যে আপনাদের একজনকে আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তারপর তিনি তাদের নিয়ে মসজিদে নববিতে যান। আনসার ও মুহাজিরদের কাছে পত্র পাঠালে মসজিদে নববি লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে।

তারপর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. রাসুলের মিম্বরে উঠে কথা বললেন। এক দীর্ঘ দুআ শেষ করে তিনি বললেন—

লোকসকল, নিশ্চয়ই প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আপনাদের কাছে আপনাদের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি—আপনারা এই দুজনের এজনকে আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। হয়তো আলিকে অথবা উসমানকে। হে আলি, আপনি আমার কাছে আসুন। আলি রা. তার কাছে এলে তিনি তার হাত ধরে তাকে বলেন—আপনি কি আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসুলের জীবনাচার এবং আবু বকর ও উমরের কর্মের ওপর আমার হাতে বাইয়াত দেবেন?

আলি রা. বলেন—অবশ্যই; আমি আমার চেষ্টা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অবশ্যই বাইয়াত দেবো।

তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. আলি রা.-এর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন—

হে উসমান, আপনি আমার কাছে আসুন। উসমান কাছে এলে তার হাত ধরে তিনি বললেন—আপনি কি আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসুলের জীবনাচার, আবু বকর ও উমরের কর্মের ওপর আমার কাছে বাইয়াত দেবেন?

তিনি বললেন—হাঁ, দেবো।

তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. উসমান রা.-এর হাতে হাত রেখে মসজিদে নববির ছাদের দিকে মাথা তুলে বলতে লাগলেন—

> হে আল্লাহ, আপনি শুনে রাখুন। সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ, আপনি শুনে রাখুন। সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয়ই আমার কাঁধে অর্পিত দায়িত্ব আমি উসমানের কাঁধে তুলে দিলাম।

তখন লোকেরা মিম্বরের নিচে ভিড় করে বাইয়াত হতে লাগল। আলি রা. সর্বপ্রথম বাইয়াত হলেন। কেউ কেউ বলেন—তিনি সর্বশেষ বাইয়াত হয়েছেন।[৩০২]

* * *

৩০২ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার* সার-সংক্ষেপ, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৪৭

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

০১. খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে অপসারণের কারণ

আমরা জানতে পারলাম—উমর রা.-এর প্রথম কাজ ছিল যে, তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে সেনাপতিত্ব থেকে অপসারণ করেছেন। এই অপসারণ নিয়ে আধুনিক বহু লেখক-সাহিত্যিক, স্কলার ভুল করেছেন। তারা চেষ্টা করেছেন এই অপসারণের মাধ্যমে খালিদ রা.-এর অবস্থান খাটো করতে; কিন্তু এই অপসারণের ব্যাখ্যা উমর রা.-এর আমল ও খালিদ রা.-এর ব্যাপারে তার বক্তব্যে স্পষ্ট।

উমর রা. খালিদ রা.-এর ব্যাপারে যে প্রশংসা করেছেন, তাতেও এর ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাকে যা বলেছিলেন, আমরা ইতঃপূর্বে তা উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছিলেন—

> খালিদ, আল্লাহর কসম! তুমি আমার কাছে অনেক সম্মানিত। নিশ্চেই তুমি আমার কাছে অনেক প্রিয়।

তিনি মিশরবাসীর উদ্দেশ্যে এই অপসারণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এই বলে চিঠি লেখেন—

> আমি খালিদকে আক্রোশবশত বা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অপসারণ করেনি; কিন্তু তাকে আমি অপসারণ করেছি মানুষের প্রতি সহানুভূতির কারণে। তার ত্বরিত হামলা ও তীব্র আক্রমণের কারণে।[৩০৩]

উমর রা.-কে যখন খালিদ রা.-এর অসুস্থতার ব্যাপারে জানানো হলো, তখন খালিদ ছিলেন মদিনায়। আর উমর ছিলেন খালিদ থেকে তিন দিনের দূরত্বে। তখন এই তিন দিনের দূরত্ব কাটিয়ে এক রাতেই খালিদের কাছে পৌঁছে যান; কিন্তু ততক্ষণে খালিদ তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। উমর রা. তখন ইন্নালিল্লাহ পড়েন। তার

---

৩০৩ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮১

জন্য শোক প্রকাশ করেন। তার কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

এরপর নারীরা যখন কাঁদছিল, তখন উমরকে বলা হলো—আপনি কি শুনছেন না? আপনি কি তাদের কাঁদতে বারণ করবেন না?

তখন উমর রা. বললেন—আবু সুলাইমান, কেঁদে কেঁদে যদি ধূলি না ওড়ে ও আর্তনাদ না কমে, তাহলে নারীদের বাধা দিয়ে কী করব?

এরপর যখন উমর রা. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর জানাজায় বের হলেন। তিনি দেখলেন—একজন মাহরাম নারী খালিদের জন্য কাঁদছে।

তখন উমর বললেন—এই নারী কে?

তখন তাকে বলা হলো—ইনি তার মা।

উমর বললেন—তার মা! তার জন্য আফসোস লাগছে।

এ কথা তিনবার বললেন। তারপর বললেন—খালিদের মতো আর কারও জন্য কি নারীরা কেঁদেছে?[৩০৪]

০২. খালিদ রা.-কে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়

আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা অবশ্যই এটা বোঝা যায় যে, খালিদ রা. মদিনায় ইন্তেকাল করেছেন। তাতেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এটাই কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতামত।

তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত হলো—খালিদ রা.-এর ইন্তেকাল ও সমাধি হিমসে। এ মতকে ঐতিহাসিক ইবনে কাসির তার কালজয়ী গ্রন্থ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে* অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এটা প্রমাণিত আছে যে, উমর রা. খালিদকে অপসারণ করার পর খালিদ রা. উমরাহ করেন। তারপর সেখানেই রয়ে যান। তাতেই তিনি একুশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। যা-ই হোক, উমরের জবান খালিদ রা.-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল সব সময়। তার জীবদ্দশায় ও তার মৃত্যুর পরও।

---

৩০৪ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড :৭, পৃষ্ঠা : ৮১

ইবনে কাসির ঐতিহাসিক ওয়াকিদি থেকে বর্ণনা করেন—উমর রা. একবার দেখলেন, হিমস থেকে হাজিদের একটি কাফেলা আগমন করেছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের জানার কোনো খবর আছে?

তারা বলল—হ্যাঁ আছে; খালিদ মারা গেছেন।

এ সংবাদ শুনে উমর বললেন—ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তারপর বললেন—তিনি ছিলেন শত্রুর সামনে অটল-অবিচল ব্যক্তিত্ব, সৌভাগ্যবান চিত্তের অধিকারী। তবে উমরের প্রশংসা খালিদের ওপর দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় না। যেখানে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। যার যার মত অনুযায়ী সে কাজ করেছে।

যারা খালিদের ব্যাপারে উমরের অবস্থান এবং উমরের নিজের ব্যক্তিগত অবস্থানের কারণে খালিদের অবস্থানকে ছোটো করতে চায়, অথবা উমরের অবস্থানকে ছোটো করতে চায়, হায়! তারা যদি বিষয়টিকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করত! তারা যদি পার্থক্য করত সেই ইজতিহাদি অবস্থান—যেই অবস্থানে সর্বকালেই পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং সেই চিন্তাগত ও আদর্শিক অবস্থানের মাঝে—যেই অবস্থান থেকে সাহাবায়ে কিরাম সব সময় পবিত্র ছিলেন।

০৩. উমর ও আলি. রা.-এর আন্তরিকতা

উমর রা.-এর খিলাফত নিয়ে গবেষকদের সামনে যে জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তা হলো—উমর ও আলি রা.-এর মাঝে সেই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা—যা ছিল নির্মল, স্বচ্ছ, উৎকৃষ্ট। কেননা, আলি রা.-ই ছিলেন উমরের সকল সমস্যা ও সকল বিষয়ে সর্বপ্রথম উপদেষ্টা। আলি রা. উমরের কাছে যে প্রস্তাবই রাখতেন, উমর রা. সন্তুষ্টচিত্তে তা বাস্তবায়ন করতে লেগে যেতেন। এর একটি উদাহরণই যথেষ্ট পাঠকদের জন্য। তা হলো উমরের এই মন্তব্য—'যদি আলি না থাকত, তাহলে উমর শেষ হয়ে যেত।'

আলি রা. তার জীবনের প্রতিটি অজ্ঞানে ও সর্বাবস্থায় অন্যের কল্যাণ কামনায় তাড়িত হতেন। প্রিয় পাঠক, আপনি দেখেছেন—পারস্যের বিপক্ষে লড়াই করতে এবং নিজে নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়ার জন্য উমর রা. যখন আলি রা.-এর কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন আলি রা. তাকে উপদেশ দিলেন, যেন তিনি না যান। এই উপদেশ ছিল উমরের প্রতি ভালোবাসার। উমরের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধের।

উমরের প্রতি আলি রা. ছিলেন আকুণ্ঠ নিষ্ঠাবান। তিনি উমরকে আরও উপদেশ দিলেন—যেন তিনি আরবে নিজ জায়গায় থেকে অন্যকে দিয়ে যুদ্ধের কলকাঠি নাড়েন। তাকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন—তিনি যদি হিজাজ থেকে বের হয়ে যান, তাহলে পেছনে বিদ্রোহ হতে পারে। যা মুখোমুখি শত্রুর চেয়ে অধিক ভয়ানক হতে পারে।

কেমন হতো, যদি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করতেন যে, রাসুলের পর প্রতিনিধিত্ব হবে আলির? তাহলে আলি কি পারতেন রাসুলের এ আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে?

আলি কি পারতেন খিলাফতে তার অধিকার; বরং খিলাফতে তার গুরুদায়িত্বে তার সমর্থকদের এড়িয়ে যেতে?

এ ধরনের নিষ্ঠাবান ও গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে; বরং সাহাবায়ে কিরামের কি এ অধিকার থাকত যে, তারা আল্লাহর রাসুলের আদেশকে অগ্রাহ্য করবে? বরং এটা কি ধারণা করা যায় যে, আলিসহ সকল সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহর রাসুলের এ আদেশের বিপক্ষে এক হতে পারে?

০৪. খিলাফতে উমরের প্রধান কাজ কী ছিল

আবু বকর রা.-এর খিলাফত নির্দিষ্ট সময়ে হয়েছিল। যে সময়ে আবু বকর রা.-ই একমাত্র উপযুক্ত ছিলেন। অনুরূপ উমরের খিলাফতও একেবারে উপযুক্ত সময়ে ছিল যে, তখন উমরই একমাত্র উপযুক্ত ছিলেন খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের জন্য।

আবু বকর রা.-এর খিলাফতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল রাষ্ট্রে ইসলামের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। আল্লাহর রাসুলের ইন্তেকালের পর যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা ছেয়ে গিয়েছিল, সেই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পর মুসলিমদের মধ্যে নিশ্চয়তা ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনা ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

আর উমরের খিলাফতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ইসলামি বিজয়ধারা বিস্তৃত করা। বিজয়ধারা বিস্তৃত করে হিজাজের সীমানা পেরিয়ে পারস্য, শাম, ও মাগরিব বা পশ্চিমাঞ্চলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া। বিভিন্ন শহর নির্মাণ, পাবলিক মিনিস্ট্রি গঠন করা, পৃথিবীর বুকে একটি সভ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সুসংহত করা। এর পাশাপাশি এটাও প্রমাণ করা যে, বান্দাদের লালনপালনের ক্ষেত্রে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে তাদের জন্য

সকল কল্যাণ ও সুখের সকল উপকরণ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর সীমাহীন প্রজ্ঞা রয়েছে।

০৫. উমর ও উসমানের খিলাফতপদ্ধতির পার্থক্য

উসমান রা.-এর খিলাফতের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা তা-ই বলব, যা আমরা উমর রা.-এর খিলাফতের পদ্ধতি সম্পর্কে আগে বলেছি। অর্থাৎ উমরের খিলাফতের যে পদ্ধতি ছিল, একই পদ্ধতি ছিল তার খিলাফতের সময়ও।

তবে দুজনের খিলাফতের মধ্যে অন্য একটা পার্থক্য ছিল—আবু বকর রা. নিজেই উমরের কাছে খিলাফতের অসিয়ত করে গেছেন।

আর উমর রা. ছয় সদস্যকে নিয়ে গঠিত শুরার ছয়জনের একজনের কাছে অসিয়ত করে গেছেন। আর মুসলিমদের দিয়ে গেছেন তাদের স্বাধীনতা। তারা এই ছয়জনের মধ্যে থেকে যাকে চায়, তাকে গ্রহণ করতে পারবে।

পাঠক দেখেছেন, উসমান রা.-কে নির্বাচন করা হয়েছে এই ছয় সদস্যের মধ্য থেকেই। এবং তাদের পরামর্শক্রমেই। সাথে ছিল জনসাধারণ ও তাদের নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের পদ্ধতির সমন্বয়।

আলি রা. ছিলেন এই ছয়জনের একজন। উসমান রা.-এর কাছে তিনিই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়েছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা এটা আমরা স্পষ্ট জানতে পারি, উমর রা.-এর সময় পর্যন্ত নয়; বরং আলি রা.-এর শাসনকাল পর্যন্ত মুসলিমরা এক জামাত ও একতাবদ্ধ ছিল। খিলাফত বিষয়ে উসমান ও আলি—এ দুজনের মধ্যে কে বেশি হকদার, একজন মুসলিমের মাথায়ও এ প্রশ্ন কখনো আসেনি। তবে বাহ্যিকভাবে নির্ভুল শরয়ি পন্থায় খলিফা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শসভা, আলোচনা, মতামত প্রদান ও যুক্তির মাধ্যম গ্রহণ করা—এগুলো ছিল সময়ের দাবি।

অনেক চেষ্টা করেও, এই পুরো খিলাফতে রাশেদা সময়কালে এ ধরনের কোনো আলোচনা ও বিতর্ক পাবেন না যে, নবিজির পর কে খলিফা হবেন, এই বিষয়ে কুরআনে বা হাদিসে কোনো বক্তব্য আছে।

এই তিনজন খলিফার নির্বাচন-পদ্ধতি নিয়ে কোনো ভুলভ্রান্তি ও সমালোচনা হয়েছে, এটাও কেউ বলতে পারবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে কেন, কখন ও কোন ধরনের

সমস্যার কারণে নিজেদের ভেতর অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, এইসব আলোচনার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। এইসব প্রশ্ন ও তার উত্তর জায়গামতো আলি রা.-এর খিলাফতকাল এবং তার যুগে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা রচনার সময় উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

* * *

খলিফাতুর রাসুল

উসমান ইবনে আফফান রা.-এর খিলাফতকাল

মুসলিমদের তৃতীয় খলিফা

২৪ হিজরি সন। উমর রা.-এর নির্মম শাহাদাতের পর শুরার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত মোতাবেক উসমান রা. মুসলিমদের খলিফা নির্বাচিত হন। উপস্থিত মজলিসে নবিজির জামাতা আলি ইবনে আবু তালিবের নিজ উদ্যোগে উসমান রা.-এর হাতে হাত রেখে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ শুরু হয়।

মুসলিমদের বিজয়ধারা

উসমান রা.-এর খিলাফতের প্রথম বছর, হিজরি চব্বিশ সন, মুসলিমরা রাই শহর পদানত করেন। অবশ্য কিছুদিন পর আবার শহরটি মুসলিমদের বেদখল হয়ে যায়। সেখানকার লোকেরা নাক থেকে রক্ত পড়ার মতো একধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। উসমান রা. নিজেও এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যে কারণে তিনি হজ আদায়ে অপারগও হয়ে পড়েছিলেন। নিজের স্থলে তিনি আরেকজনকে হজ পালনের নির্দেশ দেন।

প্রশাসনে কর্মচারী রদবদল

এই বছরই উসমান রা. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কে কুফার গর্ভনর নিযুক্ত করেন। আর মুগিরা ইবনে শুবাকে তার স্থান থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

হিজরি পঁচিশ সনে উসমান রা. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-কেও কুফা থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার স্থানে গভর্ন বানান ওয়ালিদ ইবনে উকবা আবু মুয়িতকে।

ওয়ালিদ ইবনে উকবা আবু মুয়িত হলেন বিশিষ্ট সাহাবি। তিনি উসমান রা.-এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। আর এটাই উসমান রা. থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রথম কারণ। কেননা, তিনি প্রশাসনে তার নিজ বংশের লোক এবং নিজ আত্মীয়স্বজনকে অগ্রাধিকার দিতেন।

উন্নয়ন কাজে অগ্রগতি

ছাব্বিশ হিজরিতে উসমান রা. মসজিদে হারামে সম্প্রসারণের কাজ করেন। তিনি আরও কিছু জায়গা কিনে মসজিদে হারামের সাথে যুক্ত করেন।

সাতাশ হিজরিতে মুয়াবিয়া রা. কবরস আক্রমণ করেন। সে সময় সেনাবাহিনী নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেন। তাদের সাথে ছিলেন উবাদা ইবনে সামিত রা. এবং তার আনসারি স্ত্রী মালহানের মেয়ে উম্মে হারাম।

উম্মে হারাম তার বাহন থেকে দুর্ঘটনাক্রমে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। আর এতেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাকে ঘটনাস্থলের পাশেই সমাহিত করা হয়।

এই বাহিনীতে উম্মে হারামের অংশগ্রহণ করার একটি বিশেষ কারণ ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে তাকে এই বাহিনীর ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তার জন্য দুআ করেছিলেন—যেন তিনি এই বাহিনীর একজন সহযাত্রী হন।

সে বছরই উসমান রা. আমর ইবনুল আস রা.-কে মিশর থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার জায়গায় আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারাহকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।

সাতাশ হিজরিতেই আফ্রিকায় আক্রমণ অভিযান শুর করেন। আফ্রিকার পাহাড়-পর্বত উঁচুনিচু সব জায়গা মুসলিমরা জয় করে নেন। এই বছরই মুসলিমরা আন্দালুসেও বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেন। পুরো স্পেন তাদের অধিকারে চলে আসে। উনত্রিশ হিজরিতে বহু শহর বিজিত হয়। সেই বছরই উসমান রা. মুনাওয়ারার মসজিদে সম্প্রসারণ করেন। তার পরিধি বাড়ান। খোদাইকৃত পাথর দিয়ে বহুলাংশ পুনর্নির্মাণ করেন। পাথর দিয়ে পিলার বানান। সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি করান ছাদ। দৈর্ঘ্য একশ ষাট গজ এবং প্রস্থ একশ পঞ্চাশ গজ বৃদ্ধি করেন।

ত্রিশ হিজরিতে খুরাসানের বহু দেশ জয় করা হয়। এর কারণে ট্যাক্সও বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে সব দিক থেকে মুসলিমদের সচ্ছলতা আসতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে সকল দেশে মুসলিমদের জীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দান করেন।

কিবার সাহাবির ইন্তেকাল

বত্রিশ হিজরিতে অনেক সাহাবি মারা যান। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্বাস রা., আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এবং আবু দারদা রা.।

আবু দারদা ছিলেন শামে মুয়াবিয়া রা.-এর বিচার বিভাগের প্রধান। এই বছরই আরও মারা যান আবু জার রা., জুনদুবনু জুনাদা গিফারি রা. ও জায়িদ ইবনে আবদুল্লাহ রা.।

তেত্রিশ হিজরিতে আবদুল্লাহ সাদ ইবনে আবু সারহ হাবশা জয় করেন।

উসমান রা.-এর প্রশাসনিক পলিসি এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

এটা সবার জানা কথা যে, উসমান রা. গভর্নর ও সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বনু উমাইয়া গোত্রে তার আত্মীয়স্বজনকে বেশি কাছে টানতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যাকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করেন।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা বদলির পলিসিতে উসমান রা.-এর উদ্দেশ্য ছিল—তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাদের তিনি ভালো এবং যোগ্য মনে করেন, তাদের অন্য গোত্রের লোকেদের জায়গায় বসানো। এই পলিসি তার ওপর অনেক মানুষের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা টেনে এনেছিল। আর এটাই ছিল প্রখ্যাত ইহুদি আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সহযোগীদের সর্বপ্রথম ও কার্যকর সুযোগ।

এই সুযোগটাই আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সহযোগীরা ফিতনার উপায়-উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে দাবানলের মতো এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা জ্বালিয়েছিল ফিতনার এক ভয়াবহ আগুন। এই ভয়াবহ ফিতনার বর্ণনা দিয়েছেন ইবনে কাসির। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ—

কুফার সাধারণ জনগণ কুফার গভর্নর সায়িদ ইবনুল আস রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তার বিরুদ্ধে তারা সংঘবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। উসমান রা.-এর কাছে তারা একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। যারা উসমান রা.-এর প্রশাসনিক পলিসির ব্যাপারে তার সাথে কথা বলবে।

অর্থাৎ উসমান রা. যে অনেক সাহাবায়ে কিরামকে অপসারণ করে বনু উমাইয়া থেকে তার আত্মীয়স্বজনকে সাহাবায়ে কিরামের জায়গায় নিয়োগ দিয়েছেন, সেই বিষয়ে তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

উসমান রা.-এর কাছে এসে তারা তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে চলে যায়। এতে উসমান রা. কষ্ট পেয়ে সেনাপতিদের কাছে বার্তা পাঠান—তিনি যেন ওই লোকদেরকে তার কাছে উপস্থিত করেন। যেন তিনি তাদের সাথে আরও বিশদ আলোচনা করতে পারেন। তাদের আপত্তির জায়গাগুলো বের করে সেই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

গভর্নরদের পরামর্শ

এদিকে সে সময় তার কাছে শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রা., মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস রা., মাগরিবের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে মাদ ইবনে আবু সারহ, কুফার গভর্নর ও বসরার গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে আমির রা. উপস্থিত হন। তারা সকলেই তার কাছে উপস্থিত থাকায় তিনি তখন সমস্যার সমাধানে এবং মুসলিমদের ঐক্যের বিষয়ে কীভাবে তাদের এক পতাকার নিচে আনা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। প্রত্যেকেই তার মতামত পেশ করল। আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতামতের পর উসমান রা. এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রত্যেক গভর্নদের আপন জায়গায় বহাল রাখা হোক। আর বিদ্রোহীদের কিছু উপহার-উপঢৌকন ও সম্পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হোক। গভর্নদের আরও আদেশ দিলেন নতুন অভিযানের। তাই তারা আক্রমণের জন্য সীমানায় লোক পাঠানো আরম্ভ করলেন।[৩০৫]

সাবায়িদের প্রথম প্রচেষ্টা

এই পরামর্শের পরপরই মিশরে সাহাবি-পরিবারের সন্তানদের মধ্যে থেকে একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে লোকদের উসকানি দিতে থাকে। তার অনেক অবদানকে তারা অস্বীকার করতে থাকে।

আর এটা শুরু হয়েছিল মূলত আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অপপ্রচারের পর। সে প্রথমে ইয়ামান ছিল। সেখানে তেমন সুবিধা করতে না পেরে মিশরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে তারই মতো কিছু লোক পায়। যাদের মাধ্যমে সে ব্যাপক অরাজকতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করা শুরু করে। মদিনার উদ্দেশে আসা উমরাহকারীদের দলে প্রায়

---

৩০৫ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১৬৭; *তারিখুত তাবারি* : ৪/৩৩৩

ছয়শত যাত্রীর একটি দল পাঠায় সে। যাদের উদ্দেশ্য ছিল—মদিনার অভ্যন্তরে ফিতনা ও অস্থিরতা উসকে দেওয়া।

তারা যখন মদিনার কাছাকাছি আসে, উসমান রা. আলি রা.-কে আদেশ করলেন, যেন তিনি তাদের কাছে গিয়ে কথা বলে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে দেন। তখন আলি রা. তাদের কাছে গেলেন। তারা তখন জুহফায় অবস্থান করছিল। তারা আলি রা.-কে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করত এবং তার সম্মানে বাড়াবাড়ি করত। আলি রা.-এর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা লোকদের বিবেক নিয়ে খেলা করে তাদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির বীজ।

আলি রা. তাদের কাছে এসে তাদের তিরস্কার করেন এবং তাদের বকাঝকা করে তাদের ফিরিয়ে দেন। তখন তারা নিজেদের তিরস্কার করতে করতে ফিরে গেল। তারা বলছিল—এ-ই সেই লোক, যার কারণে আজ তোমরা খলিফার বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছ। তার বিরুদ্ধে আজ বিক্ষোভ করছ!

তারপর তারা যেখান থেকে এসেছিল, ব্যর্থ হয়ে আবার সেখানেই ফিরে গেল। তাদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ফিরে এসে আলি রা. তাকে জানান—তারা ফিরে গেছে। তারপর আলি রা. উসমান রা.-কে পরামর্শ দিলেন—তিনি নেন লোকদের মধ্যে একটি ভাষণ দেন। যেন তিনি তাতে লোকদের কাছে অজুহাত পেশ করেন। তিনি তার কিছু আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার পলিসি গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে যেন তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করেন। তিনি যেন ঘোষণা দেন যে, তা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন।

আলি রা.-এর পরামর্শ গ্রহণ

জুমআর দিন তিনি লোকদের সামনে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন—

> হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আপনার নিকট ফিরে আসছি। হে আল্লাহ, আমি আমার কর্মের সর্বপ্রথম প্রত্যাবর্তনকারী।

এ কথা বলে উসমান রা. কেঁদে ফেলেন। সকল মুসলিমরাও কাঁদতে লাগল। উসমান রা. আবার তাদের সামনে নিশ্চিত করেন—যে কারণে লোকেরা তার প্রতি ক্ষোভ জমিয়ে রেখেছে, তা থেকে তিনি ফিরে এসেছেন। এটাও নিশ্চিত করেন যে, অচিরেই মারওয়ান ও তার আত্মীয়স্বজনকে সরিয়ে নেবেন।

দৃশ্যপটে নতুন অতিথি

উসমান রা. লোকেদের একত্র করে জুমআর খুতবায় বক্তব্য দিয়েছিলেন আলি রা.-এর পরামর্শক্রমে। এটি কাজও করেছিল সুন্দরমতো; কিন্তু এই বক্তব্যের পরই উসমান রা.-এর কাছে একজন ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো—মারওয়ান। সে উসমান রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে তিরস্কার করল। তারপর বলল—

> যদি আপনি আপনার এই কথাগুলো সে সময় বলতেন, যখন আপনি নিজেকে প্রতিরোধকারী দুর্গ মনে করেছিলেন, তাহলে আমিই প্রথম ব্যক্তি হতাম, যে এ কথাই পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট। আমিই হতাম আপনার প্রথম সাহায্যকারী; কিন্তু আপনি কথাগুলো তখনই বলেছেন, যখন সমস্যাগুলো জটিলতার সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। অশান্তির বন্যা টিলার চূড়ায় পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কসম! ক্ষমাযোগ্য ভুলে অটল থাকা উত্তম সেই তাওবা থেকে, যা ভয় করে করা হয়। আপনি যদি চাইতেন, তাহলে দৃঢ়তার সাথে তাওবা করতেন। আর আমাদের সামনে ভুল স্বীকার করতেন না।

এরপর মারওয়ান উসমান রা.-কে জানাল যে, দরজায় একদল লোক উপস্থিত। উসমান রা. মারওয়ানের তিরস্কারে কিছুটা হতবিহ্বল ছিলেন। এর ওপর নতুন করে লোকেরা দরজায় সমাগত শুনে তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলেন। তাই নিজে সামনে না গিয়ে মারওয়ানকে দায়িত্ব দিলেন—তাদের সাথে মারওয়ান যেমন ভালো মনে করে, সেভাবে কথা বলার জন্য। আর এটাই ছিল উসমান রা.-এর দুর্ভাগ্য শুরু হওয়ার নতুন পর্ব।

মারওয়ান দায়িত্ব নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে সেই সকল লোকের সাথে এমন অরুচিকর ভাষায় কথা বলে—যা কিছু সময় আগে, মসজিদের বক্তব্যে নিভে যাওয়া ক্ষোভকে আবার নতুন করে জ্বালিয়ে দেয়।

সে তাদের বলেছিল—

> তোমরা এসেছ আমাদের রাজত্ব আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার দাবি জানাতে। এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আর শুনে রাখো, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, যদি তোমরা আমাদের লক্ষ্যবস্তু বানাও, তাহলে

তোমাদের ওপর এমন বিপদ আসবে—যা তোমাদের অসন্তুষ্ট করে ছাড়বে। তারপর তোমরা আর কখনো প্রশংসিত হবে না।'

আলি রা.-এর অসন্তোষ

আলি রা. যখন মারওয়ানের এসব উদ্ধত কথাবার্তা জানতে পারলেন, তিনি দেরি না করে সোজা উসমান রা.-এর কাছে চলে আসেন। আলি রা. প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উসমান রা.-কে বলেন—

মারওয়ানের ব্যাপারে কি আপনি এখনও সন্তুষ্ট হননি? মারওয়ানও কি আপনার ব্যাপারে এখনও সন্তুষ্ট হয়নি। আমি এই ভয় পাচ্ছি—না জানি সে আপনাকে আপনার দ্বীন ও আপনার বিবেক থেকে ঘুরিয়ে দেয়।

আল্লাহর কসম! মারওয়ান না তার দ্বীনের ব্যাপারে বিচক্ষণ, আর না তার নিজের ব্যাপারে বিচক্ষণ।

আল্লাহর কসম! আমি দেখতে পাচ্ছি—সে আপনাকে বিপদে ফেলে আপনার পদস্খলন করিয়ে ছাড়বে। এরপর আপনাকে আর সে রক্ষাও করতে পারবে না, করবে না। এইবারই শেষ। এরপর আমি আপনাকে তিরস্কার করতেও আর আসব না।

এ কথা বলে আলি রা. বের হয়ে চলে গেলেন। আলি রা. বের হয়ে যাওয়ার পরই পর্দার ভেতর থেকে উসমান রা.-এর স্ত্রী নায়িলা তার কাছে এলেন। তিনি আলি রা.-এর কথা শুনছিলেন। উসমান রা.-কে তিনি বললেন—আমি কি এই ব্যাপারে কিছু বলব, না চুপ থাকব?

উসমান রা. বললেন—না, তোমার কিছু বলার থাকলে চুপ না থেকে বলো।

তখন তিনি বলতে লাগলেন—আমি শুনেছি, আলি আপনাকে আর দ্বিতীয়বার কিছু বলতে আসবে না। আপনি মারওয়ানকে তার ইচ্ছেমতো অনুসরণ করেছেন।

উসমান রা. বললেন—তোমার কাছে কোনো পরামর্শ থাকলে তুমি আমাকে পরামর্শ দাও।

নায়িলা বলতে লাগলেন—আপনি শুধু এক আল্লাহকে ভয় করেন, যার কোনো অংশীদার নেই। আপনি আপনার পূর্বের দুই সঙ্গীর (আবু বকর ও উমর রা.) পথ

আঁকড়ে ধরেন। আপনি মারওয়ানের অনুসরণ যতদিন করবেন, সে আপনাকে শেষ কেরে দেবে। মারওয়ান তো এমন একজন মানুষ—আল্লাহর কাছে যার কোনো মর্যাদা নেই। আল্লাহর প্রতি তার কোনো ভয় নেই। কোনো ভালোবাসা নেই। সুতরাং আপনি আলির কাছে বার্তা পাঠান। তার কাছে সমস্যার সমাধান চান। কেননা, তার সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সে আপনা কথা অমান্য করবে না।

উসমান রা. পুরো বিষয়টি বুঝতে পারলেন। এজন্য তিনি আলি রা.-এর কাছে বার্তা পাঠালেন। কিন্তু আলি রা. তার কাছে আসতে অস্বীকার করেন। আলি রা. বলে দেন—আপনার জানা আছে, আমি বলে দিয়েছি যে, আমি দ্বিতীয়বার আর কিছু বলতে আসব না।

এই পরিস্থিতি ছিল সেই সমস্যার শূচনা, যা অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছিল। ফিতনার ও অস্থিতিশীলতার আগুন লাগিয়েছিল। এই ফিতনার মাধ্যমে অপস্বার্থ উদ্ধার করার পথ সুগম করেছিল।

সর্বপ্রথম ফিতনা ও উসমানের নির্মম হত্যা

উসমান রা. খিলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করেছেন বারো বছর। তার শাসনামলে তিনি কখনো কাউকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানাননি; বরং তিনি ছিলেন অনেক কুরাইশের কাছে উমরের চেয়ে বেশি প্রিয়। কেননা, উমর ছিলেন কুরাইশের কাছে কঠিন প্রকৃতির মানুষ। আর উসমান ছিলেন তাদের জন্য নরম প্রকৃতির। কুরাইশের সাথে তিনি যোগাযোগ রাখতেন সব সময়; কিন্তু এই কুরাইশরাই তার সাথে ভিন্ন আচরণ করতে লাগল, যখন তিনি তার আত্মীয়স্বজনকে ও তার বংশের লোকদের প্রশাসনে নিয়োগ দেওয়া শুরু করলেন।

যেমন—আমরা এর আগে স্পষ্ট করেছি, উসমান রা. সেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলতেন, যেই সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন; কিন্তু এ বিষয়টাই শেষ পর্যন্ত উসমান রা.-এর হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইমাম জুহরি থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন, জুহরি বলেন—

আমি সায়িদ ইবনে মুসাইয়াবকে বললাম, আপনি কি আমাকে একটু বলবেন কীভাবে উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। তার সাথে লোকদের কী হয়েছিল। ইবনে মুসাইয়াব বলেন—উসমান ছিলেন মজলুম। তাকে হত্যা করা হয়েছে। যারা তাকে হত্যা করেছেন, তারা জালিম অত্যাচারী। আর যারা তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসেনি,

তারা ছিল অপারগ, নিরুপায়, উপায়হীন। তারপর ইবনে মুসাইয়াব জুহরির কাছে রা.-এর হত্যার কারণ ও তাকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার একটা বর্ণনা দেন। আমরা তা সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উল্লেখ করছি।

ঘটনার বর্ণনা—

মিশরবাসী ইবনে আবু সুরাইহর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে এলে উসমান রা. সুরাইহর নিকট একটি চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি সুরাইহকে উপদেশ দিলেন এবং তাকে সতর্ক করে দিলেন; কিন্তু সুরাইহ উসমানের বিধিনিষেধ মানতে অস্বীকার করে। উলটো যারা অভিযোগ করতে গিয়েছিল, তাদের সাথে কঠিন ব্যবহার করে। তখন মিশরবাসী আবার উসমানের কাছে অভিযোগ করে।

তারপর বড়ো বড়ো সাহাবি যেমন—আলি, তালহা, ও আম্মাজান আয়িশা রা., তারা উসমান রা.-এর কাছে আবেদন করলেন, যেন ইবনে আবু সুরাইহকে পদচ্যুত করে তার জায়গায় অন্য কাউকে নিয়োগ করেন। তখন তিনি তাদের বললেন—আপনারা একজন লোককে বাছাই করেন; যাকে আমি ইবনে আবু সুরাইহর জায়গায় নিয়োগ দেবো। তখন তারা উসমান রা.-কে আবু বকর রা.-এর ছেলে মুহাম্মাদকে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলেন।

উসমান রা. মুহাম্মাদের ব্যাপারে একটি অসিয়তনামা লিখে দেন। যাতে আবু বকর রা.-এর ছেলেকে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তারপর আনসার ও মুহাজিরদের কিছুসংখ্যক লোক—যাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.-ও ছিলেন—মিশরের উদ্দেশে সেই অসিয়তনামা বাস্তবায়ন করার জন্য রওনা হন।

তারা যখন মদিনা থেকে তিন দিনের দূরত্বে পৌঁছল, তখন তারা একটি কালো দাসকে দেখতে পেল। যে একটি উটের ওপর ছিল। সে উটকে খুব জোরে আঘাত করছিল এবং তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছিল।

তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম সেই দাসকে থামান। তাকে জিজ্ঞেস করেন—কী হয়েছে তোমার? মনে হয় তুমি পালাতে চাচ্ছ, অথবা তুমি কাউকে খুঁজছ। সে বলল—আমি আমিরুল মুমিননের দাস। তিনি আমাকে মিশরের গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছেন। তাকে যখন বলা হালো—কার দাস তুমি?

তখন সে একটু তুতলিয়ে ইতস্তত করল। তারপর আবার বলতে লাগল—আমি আমিরুল মুমিনিনের দাস। এরপর সে বলল—আমি মারওয়ানের দাস। তারপর তার

আসবাবপত্র থেকে একটি চিঠি বের করল। তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা. তার সাথে থাকা সব আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যদের একত্র করল। তারপর তার সামনে চিঠি খুলে দেখতে পেল, তাতে লেখা আছে—

> যখন তোমার কাছে মুহাম্মাদ ও অমুক অমুক আসবে...তাদের হত্যা করো। মুহাম্মাদের চিঠি বাতিল করে দাও। আর তুমি তোমার কাজে অবিচল থাকো। যতক্ষণ না তোমার কাছে আমার কোনো নির্দেশনা আসে। আর তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে যে জুলুমের অভিযোগ করতে আসবে, তাদের বন্দি করে রাখো।

এরপর এই সাহাবিরা চিঠি নিয়ে মদিনায় ফিরে এলো। তারা বিজ্ঞ সাহাবিদের একটি দল একত্র করে তাদের চিঠি সম্পর্কে ও দাসের ঘটনা জানাল। এ ঘটনায় মদিনায় এমন কেউ বাকি রইল না, যে উসমান রা.-এর ওপর ক্ষিপ্ত হননি।

আলি রা. যখন এ অবস্থা দেখলেন, তখন তিনি বড়ো বড়ো বদরি সাহাবিদের একটি দলকে ডাকলেন; যাদের মধ্যে তালহা, জুবাইর, সাদ ও আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন। তাদের নিয়ে উসমান রা.-এর নিকট গেলেন। সাথে নিলেন চিঠি, সেই দাস ও উট।

আলি রা. উসমান রা.-কে বললেন—এই দাস কি আপনার?

উসমান বললেন—হ্যাঁ।

আলি রা. বললেন—এই উট আপনার?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

আলি রা. বললেন—তাহলে এই চিঠি আপনি পাঠিয়েছেন?

উসমান বললেন—না। তিনি কসম খেয়ে বললেন—এই চিঠি আমি লিখিনি। এই ব্যাপারে আমি কোনো আদেশও করিনি। এই ব্যাপারে আমার কোনো কিছু জানাও নেই।

তখন আলি রা. আবার জিজ্ঞেস করলেন—এই আংটি কি আপনার আংটি?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

তখন আলি রা. বললেন—কীভাবে আপনার অজান্তে আপনার দাস আপনার উট ও আপনার চিঠি নিয়ে বের হয়ে যেতে পারে?

তখন উসমান রা. আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন—আল্লাহর কসম! আমি এই চিঠি লিখিনি। এর ব্যাপারে আমি আদেশ করেনি এবং আমি এই দাসকে কখনো মিশরে পাঠাইনি।

তারপর তারা যখন চিঠি দেখল। দেখা গেল—এটা মারওয়ানের চিঠি। তাই তারা উসমান রা.-এর কাছে মারওয়ানকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে বললেন।

উসমান রা. তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন। মারওয়ান ছিল উসমান রা.-এর কাছেই। তার বাড়িতে। তাই উপস্থিত লোকেরা তার কাছ থেকে রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে গেল; কিন্তু তারা জানত যে, উসমান মিথ্যা কসম করে না। তবে তারা রাগান্বিত হয়েছিলেন। যেহেতু উসমান রা. মারওয়ানকে তাদের কাছে হস্তান্তর করেননি।

এ খবর মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে লোকেরা উসমান রা.-এর কাছে আসতে লাগল। তারা উসমান রা.-কে অবরুদ্ধ করে। তাকে পানি পর্যন্ত দেয়নি; কিন্তু যখন উসমান রা. ও তার পরিবারের প্রচণ্ড পিপাসা লাগল, তখন অবরোধকারীদের দিকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে বললেন—এমন কেউ কি নেই যে, আলির কাছে গিয়ে খবর জানাবে। জানালে তিনি আমাদের পানি পান করাবেন।

তখন আলির কাছে খবর পাঠালে আলি উসমানের কাছে তিন মশকভর্তি পানি পাঠালেন। এই তিন মশক পানি উসমান রা.-এর কাছে খুব কষ্টে পৌঁছে। আলি রা.-এর কাছে এ খবর যায় যে, লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে—যারা উসমানকে হত্যা করতে চায়।

তখন আলি বলে উঠলেন—আমরা কেবল উসমানের কাছ থেকে মারওয়ানকে চাই; কিন্তু উসমানকে হত্যা করতে দেওয়া যাবে না কিছুতেই। তখন তিনি হাসান ও হুসাইন রা.-কে বললেন—তোমরা তোমাদের তরবারি নিয়ে যাও। তোমরা উসমানের দরজায় পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকো। কাউকেই উসমানের কাছে পৌঁছতে দেবে না।

আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের মধ্যে থেকেও অনেকে উসমানের পাহারার কাজে নিয়োজিত হয়ে গেল; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জনতা উসমান রা.-এর দরজায় প্রচণ্ড ভিড় করতে লাগল। তারা উসামন রা.-এর কাছে পৌঁছতে চায় তাকে হত্যা করার জন্য; কিন্তু তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল হাসান ও হুসাইন এবং তাদের সাথে কিছু সাহাবি।

প্রচণ্ড এই ভিড়ের মধ্যে কিছু লোক উসমানের কাছে দেওয়াল টপকে ছাদের ওপর থেকে উসমান রা.-এর ওপর পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তরবারি দিয়ে উসমান রা.-কে আঘাত করতে থাকে। একপর্যায়ে তাকে হত্যা করে ফেলে।

হত্যার খবর আলি রা.-এর নিকট পৌঁছলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ছুটে এলেন। তিনি হাসান ও হুসাইনকে বললেন—তোমরা দরজায় থাকতে কীভাবে আমিরুল মুমিনিনকে হত্যা করা হয়েছে? তিনি হাসানকে থাপ্পড় মারেন। হুসাইনক বুকে আঘাত করেন। মুহাম্মাদ ইবনে তালহা ও জুবাইরকে বকাঝকা করতে লাগলেন। এভাবেই উসমান রা.-এর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। ফিতনার এমন ধারাবাহিকতার দরজা খুলে গিয়েছিল—যার চক্র প্রসারিত হয়েছে অনন্ত এক গন্তব্যের দিকে।

আলি রা.-এর খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ

উসমান রা.-এর হত্যার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে আলি রা. উসমান রা.-এর ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। লোকেরা আলি রা.-এর নিকট ছুটে এলো এবং তাকে বলল—আমাদের অবশ্যই একজন আমির দরকার। সুতরাং আপনি আমাদের কাছে আপনার হাত বাড়িয়ে দেন, আমরা আপনার কাছে খিলাফতের দায়িত্ব দেবো। আলি রা. তাদের বললেন—এটা তোমাদের দায়িত্ব নয়, এর দায়িত্ব হলো বদরি সাহাবিদের। সুতরাং যার ব্যাপারে বদরি সাহাবি রা. সন্তুষ্ট হবেন, তিনি খলিফা হবেন। এরপর দেখা গেল, বদরি সাহাবিদের সকলেই আলি রা.-এর নিকট ছুটে আসছে।

তারা তাকে বললেন—আমরা আপনার চেয়ে খিলাফতের উপযুক্ত আর কাউকে দেখছি না। আপনার হাত দেন আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হব। তারপর তারা সকলেই আলি রা.-এর নিকট বাইয়াত হলো। পরিস্থিতি আলি রা.-এর অনুকূলে আসা এবং তার বাইয়াতের বিষয়টি পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মারওয়ান ও তার ছেলে পালিয়ে গেল।

উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের তদন্ত

আলি রা. উসমান রা.-এর স্ত্রীর নিকট এলেন। তাকে উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উসমান রা.-এর স্ত্রী বললেন, আমি তাদের জানি না। দুজন লোক তার রুমে ঢুকে পড়েছিল—যাদের আমি চিনি না; কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, তাদের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ছিল।

আলি রা. এবার মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে ডেকে পাঠালেন। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর উপস্থিত হলে উসমান রা.-এর স্ত্রী যেই কথা বলেছেন, তাকে সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর বললেন—তিনি মিথ্যা বলেননি। আমি তার রুমে ঢুকেছিলাম; তবে আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি এবং আমি তাঁর কসম খেয়ে বলছি—উসমানকে আমি হত্যা করিনি; আর তাকে আমি বেঁধেও রাখিনি।

উসমান রা.-এর স্ত্রী বললেন—মুহাম্মাদ সত্য বলেছেন; কিন্তু তিনি লোক দুটিকে প্রবেশ করিয়েছেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির সোফিয়ার দাস কিনানা ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—উসমান রা.-কে হত্যা করেছে মিশরে বসবাসকারী একজন লোক। তার নাম আজকার আস্কর।

উসমান রা.-এর কিছু গুণ

ইবনে আসাকির আবু সাউর আল ফাহমি থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন—

আমি যখন উসমানের কাছে যাই, তখন তিনি ছিলেন অবরুদ্ধ। তিনি বললেন, আমার প্রতিপালকের কাছে আমি ১০টি জিনিস গোপন রেখেছি।

আমি আসরা যুদ্ধের বাহিনী প্রস্তুত করেছি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে তাঁর মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন। তারপর যখন সে মারা যায় তখন তিনি তাঁর আরেক মেয়ে বিবাহ দেন। যেদিন থেকে আল্লাহর রাসুলের কাছে ইসলামের বাইয়াত হয়েছি, তখন থেকে আমি না গানবাজনা করেছি, আর না তার তামান্না করেছি। আর না আমি আমার ডান হাত দ্বারা আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছি। আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে এমন কোনো জুমআ যায়নি, যে

জুমআয় আমি কোনো দাস আজাদ করিনি। তবে আমার কাছে যদি না থাকত, তাহলে পারতাম না। আমি কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি; না জাহিলি যুগে, আর না ইসলামি যুগে। আমি কখনো চুরি করিনি; না ইসলামে আর না জাহিলি যুগে। আল্লাহর রাসুলের যুগে আমি কুরআন সংকলন করেছি।

সঠিক মতামত হলো—উসমান রা.-এর হত্যা হয়ে ছিল পঁয়ত্রিশ হিজরির আয়্যামে তাশরিকের মধ্যবর্তী দিনগুলোতে।

* * *

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

০১. বিজয়ের অগ্রযাত্রা

উসমান রা.-এর শাসনকাল যে সকল বৈশিষ্ট্য ও অবদানে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো—ব্যাপকভাবে ইসলামের বিজয় ও ভূমি সম্প্রসারণ। এই সময়েই বিজয় হয়েছিল সমস্ত খোরাসান। বিজয় হয়েছিল আফ্রিকা। বিজয়ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল আরব থেকে সেই সুদূর স্পেন পর্যন্ত। উসমানের শাসনামলের এ যুগে আরও অনেক বড়ো বড়ো কাজ সমাধা হয়েছিল। যা করেছিলেন উসমান রা. নিজেই। কুরআনে কারিমের নির্ভরযোগ্য লেখ্যরীতির ওপর মানুষকে তিনি একত্র করেছিলেন। এর একমাত্র কারণ ছিল—মানুষের মুখে মুখে অনারবে কুরআনে কারিমের অংশগুলো ছড়িয়ে পড়া। যে কারণে কুরআনে কারিমের একাধিক পাঠপদ্ধতি এবং এটি নিয়ে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এ ছাড়াও মসজিদে নববিতে ব্যাপক সম্প্রসারণের কাজ উসমান রা.-এর খিলাফত আমলের অন্যতম অবদান।

এবং এটা কোনো সমস্যার বিষয়ে নয় যে উসমান রা. অধিকাংশ ইসলামি বিজয়ের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারা ও তার মতো অন্যান্য সেনাপতির ওপর নির্ভর করে ছিলেন। কারণ, ইসলাম এমন একটি ধর্ম—যা তার পূর্বের সমস্ত অনাচার মিটিয়ে দেয় এবং হয়তো ইবনে সারা তার এই বড়ো বড়ো মহান কাজের মাধ্যমে ইতঃপূর্বে কৃত সে সকল বিষয়ের কফফারা দিয়েছে। জানা যায়, ইবনে সারা পরবর্তী সময়ে হিদায়াতের ওপর অবিচল ছিল। আর সে ছিল ধার্মিকতার দিক দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ।

০২. তার রাজনৈতিক পলিসি

বনু উমাইয়্যা গোত্রের আত্মীয়স্বজনকে উসমান রা. তার গভর্নর, প্রাদেশিক সরকার ও সহকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করার কারণে যতই সমালোচনা হোক না কেন, তথাপি

আমাদের এটা জেনে রাখা উচিত—যা কিছু হয়েছে, তা ছিল উসমান রা.-এর ইজতিহাদ বা পারসোনাল পলিটিক্যাল পলিসি। উসমান রা. তার এই দৃষ্টিভঙ্গি বা পলিসির পক্ষে অনেক বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কিরামের সামনে কথা বলেছেন।

উসমান রা.-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই ব্যাপারে তার নিজের পক্ষপাত নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যা-ই হোক না কেন, আমাদের আলোচনা-পর্যালোচনা ও সেই ব্যাপারে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচনা যেন তার প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণ না হয়।

উসমান রা.-এর 'ইজতিহাদি ভুল'-কে যদি আমরা 'ভুল' হিসেবে ধরি, তথাপি এই ভুল যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয় যে, আল্লাহর রাসুলের কাছে উসমান রা.-এর ছিল সুউচ্চ মর্যাদা। ছিল ইসলামে অগ্রগামিতা। আমাদের যেন ভুলিয়ে না দেয় যে, তাবুকের দিন তার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুলের সেই ঐতিহাসিক মন্তব্য—'আজকের পর উসমান যা করবে, এর কোনো কিছুই উসমানের ক্ষতি করতে পারবে না।'

আমাদের এটাও জেনে রাখা উচিত—উসমান রা.-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের বিতর্ক এবং তার কাজের ওপর সাহাবায়ে কিরামের আপত্তি এক জিনিস এবং একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমালোচনা, তার মর্যাদাহানি করার মানসিকতা নিয়ে আমাদের চর্বিতচর্বণ একটি ভিন্ন জিনিস।

উসমান রা.-এর ওপর সাহাবায়ে কিরামের যে সকল আপত্তি, তা ছিল একটি চলমান সমস্যার সমাধান; তার পরিবর্তন ও সংস্কার। আর উসমান রা.-এর শাসনকালের এই ঘটনা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আজকের আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা—এটা কেবল সে সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে সস্তা বাড়াবাড়ি; যে সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল প্রশংসা করেছেন। তাদের ব্যাপারে কটু কথা বলতে নিষেধ করেছেন। বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদিনের ব্যাপারে।

যে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় জ্ঞানের আমানত রক্ষা করতে চায়, তার উচিত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা ও সেই ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে সেই সীমায় অবস্থান করা, যেই সীমা অবধারিতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন ইমাম তাবারি, ইবনুল আসির, ও ইবনে কাসিরের মতো বড়ো বড়ো লেখক ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক।

০৩. আবদুল্লাহ ইবনে সাবা

উসমান রা.-এর শাসনকালের শেষ দিকে ফিতনা আত্মপ্রকাশের হওয়ার সময় ইতিহাসের এই নাটকের মঞ্চে যে নামটি বারবার সামনে আসে, তা হলো—আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। এই ফিতনার আগুন সেই জ্বালিয়েছিল। সেই ছিল এর ইন্ধনদাতা। তার অবদানই এতে সবচেয়ে বেশি। আবদুল্লাহ ইবনে সাবার আসল পরিচয় হলো—সে ইয়ামান থেকে আগত একজন কট্টর ইহুদি।

সে উসমান রা.-এর শাসনকালে মিশর আসে। মিশরে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্রোহের জন্য উসকানি দিতে থাকে। আহলে বাইত এবং আলি রা.-এর প্রতি মিথ্যা ভালোবাসা ও অতিরিক্ত সম্মান দেখাতে থাকে। সে মানুষকে যা যা বলত, তার মধ্যে সে এই কথাগুলো বেশি বলত—

> মুহাম্মাদ কি আল্লাহর কাছে ঈসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ না? সুতরাং যদি আল্লাহর কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা নবির চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের কাছে আবার পুনরায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে নবি ঈসার চেয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বেশি অধিকার রাখে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের কাছে তার চাচাতো ভাই আলির অবয়বেই শুধু ফিরে আসতে পারে। যে আলি ছিল তাঁর নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত।[৩০৬]

ইয়ামানে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার এ সমস্ত কথাবার্তা কেউ গ্রহণ করল না; কিন্তু সে মিশরে তার এসব কথাবার্তার মাধ্যমে কিছু হতভাগা মানুষকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়। এরা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার কথায় প্রভাবিত হয়ে যায়। এরাই সেইসব প্রতারিত লোক, যারা মদিনায় রওনা হয়েছিল উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য; কিন্তু আলি রা. তাদের প্রতিহত করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আপনি হয়তো বুঝতেই পারছেন, উম্মতে মুসলিমা শিয়া-সুন্নি দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার সূচনা এই সময়ই হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণ হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবার হাতে। উমাইয়া এবং অন্যদের হাতে আহলে বাইত ও তাদের বংশধরদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছিল, এইসব কিছুর কথা বাদই দিলাম; কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—ইতিহাসের বাস্তবতায় এই দুই

---

৩০৬ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৬৭

ঘটনার যে ঘটনাই স্থান পাক না কেন, তার কোনো একটি যেন আমাদের অপরটির কথা ভুলিয়ে না দেয়।

০৪. উসমান হত্যায় আলি রা. কি সহযোগী ছিলেন

এই তৃতীয় খিলাফতের সময় আলি রা. ও উসমান রা.—এই দুজনের মাঝে যে সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কের বাস্তবতা আমাদের আরেকবার স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত। উসমান রা.-এর ব্যাপারে আলি রা. যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, সেই অবস্থানের বাস্তবতাও আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা উচিত। আপনি অবশ্যই দেখেছেন, আলি রা.-ই প্রথম আগে বেড়ে উসমান রা.-এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত দেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকও এ মত গ্রহণ করেছেন যেমন : ইবনে কাসিরও বলেন যে, আলি রা.-ই প্রথম উসমান রা:-এর হাতে বাইয়াত দিয়েছিলেন।

এরপর আপনি দেখেছেন যে, যখন দলবল নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মদিনায় এসেছিল মানুষকে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য, তখন আলি রা. উসমানকে কীভাবে এই কথা বলেছিলেন—'আমিই যথেষ্ট তাদের এই ষড়যন্ত্রের জন্য।' তখন আলি রা. তাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন এবং জুলফার নিকটে তাদের পেলেন। তাদের তিনি তিরস্কার ও বকাঝকা করে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তখন তারা নিজেদের তিরস্কার করতে করতে ফিরে যায়। তারা একে অপরকে বলছিল—'এই সেই লোক, যার কারণে আজকে তোমরা খলিফার সাথে যুদ্ধে নেমেছ। খলিফার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছ।'[৩০৭]

সুতরাং আলি রা. ছিলেন উসমান রা.-এর খিলাফতের সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোগী ব্যক্তি। উসমান রা.-এর বিপদের দিনে আলি রা. ছিলেন তার সর্বোত্তম সাহায্যকারী। খিলাফতের শেষ সময়ে সদুপদেশ দিতে গিয়ে আলি রা. উসমান রা.-এর ব্যাপারে যে কঠোরতা করেছিলেন, তা ছিল শুধুই উসমানের প্রতি ভালোবাসা ও একান্ত আত্মমর্যাদার কারণে।

সুতরাং প্রিয় পাঠক, আপনি জেনে রাখুন, আলি রা.-এর মতো একজন মহান মানুষ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি প্রতিটি বিশ্বাসীর চোখের তারা হতে পারেন। হতে পারেন অনুভূতি, মানবতা ও আবেগের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের শীতলতা। ভালোবাসার দলিল তো শুধুই সত্যনিষ্ঠ অনুসরণ ও অনুসরণে অবিচলতা।

---

৩০৭ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৭১

এই ছিল পূর্ববর্তী খলিফাদের ব্যাপারে আলি রা.-এর জীবনাচার এবং চরিত্র। সুতরাং আলি রা.-এর জীবনাচার যেন হয় আমাদের সর্বোত্তম মডেল। তার প্রতি আমাদের নির্ভেজাল ভালোবাসার সবচেয়ে বড়ো বচন।

* * *

খলিফাতুর রাসুল

আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর খিলাফতকাল

খিলাফতের বাইয়াত

আলি রা.-এর কাছে মানুষ খিলাফতের বাইয়াত দিয়েছে ৩৩ হিজরির জিলহজ মাসের মধ্যবর্তী সময়ে। উসমান রা.-এর হত্যার ঘটনার পরপরই। যেমন—আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম আলি রা.-এর কাছে খিলাফতের বাইয়াত দেওয়া থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, উসামা ইবনে জায়িদ, নুমান ইবনে বাশির, এবং হাসসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

খিলাফতজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

আলি রা.-এর খিলাফতকাল পুরোটাই ছিল বিভিন্ন ফিতনা, যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তির এক ধারাবাহিকতা। আলি রা.-এর খিলাফতের এই অস্থিতিশীল অবস্থা শুরু হয় জামাল যুদ্ধের মাধ্যমে। এরপরই সংঘটিত হয় সিফফিনের যুদ্ধ। তারপর আরও ঘটে সে সকল বাকবিতণ্ডা, মতানৈক্য, যেগুলো ছিল সাধারণ মুসলিম জনগণ এবং মুয়াবিয়া রা.-এর মাঝে।

এরপরই আবার শুরু হয়েছিল খারিজিদের ফিতনা। যার শেষ হয়ে ছিল আলি রা.-এর হত্যার মাধ্যমে। আমরা আলি রা.-এর খিলাফতকালের অবস্থা এবং এসব কিছুর বর্ণনা সামনে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি।

জামাল যুদ্ধের পটভূমি

শাস্তি বিধানে আলি রা.-এর পরিকল্পনা

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, উসমান রা.-এর হত্যার ঘটনা ঘটেছিল একদল বিদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী দলের হাতে। এর পেছনে ছিল কুচক্রী ইহুদিদের হাত। উসমান রা.-এর হত্যাকারীরা তাদের শত্রুতার স্বাদ চাখবে, তাদের পাপের সাজা ভোগ করবে, তারা মাথা নত করবে বিচারের জন্য ইসলামি সরকারের সামনে—এটাই ছিল স্বাভাবিক।

সেদিকে লক্ষ্য করেই মুসলিম জাতি, যাদের অগ্রভাগে ছিলেন আলি রা.—তারা এগিয়ে গিয়েছিলেন উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের থেকে বদলা নিতে। তবে যারা হত্যার বদলা নিতে তাড়াহুড়ো করছিল, আলি রা. তাদের একটু বিলম্ব করতে বলছিলেন। তার বক্তব্য ছিল—যে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজমান আছে, তা স্থিতিশীল হয়ে যাক আগে। তারপর তাদের বিচার হবে।

কারণ, আলি রা. মনে করতেন, নতুন খিলাফতের জরুরি বিষয়গুলো গোছানো হয়ে গেলে হত্যার বদলা নিরাপদে নেওয়া যাবে। ফিতনার উপকরণগুলো নিশ্চিন্তে মূলোৎপাটন করা যাবে।

এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত যে, উসমান রা.-এর হত্যাকারী ও তার বিদ্রোহীদের আলি রা. প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। তিনি তাদের ব্যাপারে অশুভ পরিণামের অপেক্ষা করতেন। তিনি আকাঙ্ক্ষা করতেন—যদি তাদের নাগাল পেতেন, তাহলে যত দ্রুত পারেন, আল্লাহ তায়ালার হক ও উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নেবেন;

কিন্তু পরিবেশ তার অনুকূলে ছিল না। তিনি যেমন আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, পরিবেশ ছিল তার উলটো।[৩০৮]

ঘটনার সারসংক্ষেপ

তালহা, জুবাইর ও তাদের সাথে ছিল আরও অনেক সাহাবি; যাদের মত ছিল—হত্যার তদন্ত ও তাদের থেকে দ্রুত বদলা নেওয়ার মধ্যেই পরিস্থিতির নিরাপত্তা ও ফিতনার উপশম হবে। তারা আলি রা.-এর কাছে প্রস্তাব করেছিল—হত্যার বদলা নিতে যত ধরনের সহযোগিতা লাগবে, তারা তার ওয়াদা দিচ্ছেন। তার সহযোগিতায় তারা বসরা ও কুফা থেকে যত সৈন্য লাগবে পাঠাবেন; কিন্তু আলি রা. তাদের কাছে এ পরিমাণ সময় চাইলেন, যেই সময়ে তিনি হত্যার দণ্ডবিধি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করে নিতে পারেন।[৩০৯]

এরপর যা হয়ে ছিল তা হলো—সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দুই পক্ষের প্রত্যেক পক্ষই উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নিতে উপযুক্ত পন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। তাই যারা হত্যার বদলা তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে চাচ্ছিল, তারা বসরায় একত্র হলো। তাদের মধ্যে ছিলেন আম্মাজান আয়িশা রা., তালহা রা., জুবাইর রা. এবং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একটি বিরাট জামাত। বসরায় একত্র হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যে ছিল উসমান রা.-এর হত্যার প্রতিশোধ এবং হত্যাকারীদের অবরোধ করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে বসরাবাসীকে উৎসাহিত করা। তখন আলি রা.-এর পক্ষ থেকে পরিস্থিতি ঠিক রাখার জন্য এবং মুসলিমদের ঐক্যের কালিমাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটি বাহিনী বসরার উদ্দেশে রওনা হয়। তারপর বসরার মাটিতে দু-পক্ষ মুখোমুখি হয়; কিন্তু তাদের কখনো এ উদ্দেশ্যে ছিল না যে, তারা লড়াই শুরু করে দেবে বা ফিতনার আগুন জ্বালাবে।

কা'কা ইবনে আমর আলি রা.-এর পক্ষ থেকে আম্মাজান আয়িশা রা.-এর নিকট দূত হিসেবে গেলেন। তিনি আম্মাজান আয়িশাকে বললেন—আম্মাজান, কোন জিনিস আপনাকে এ শহরে নিয়ে এসেছে?

আম্মাজান আয়িশা রা. বললেন—মানুষের মাঝে সংশোধন (আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে)।

---

৩০৮ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৩৪

৩০৯ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা : ২৩; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬

তারপর সে তালহা, জুবাইর রা.-এর প্রত্যেককেই একই প্রশ্ন করলেন। তারা দুজন উত্তর দিলেন—মানুষের মাঝে সংশোধন ছাড়া এখানে আর কোনো উদ্দেশ্যে আমরা আসিনি।...সকলেই এ ব্যাপারে একই কথা বলেছেন।

প্রথম মীমাংসা

আলোচনা-পর্যালোচনা করার পর সকলেই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, বিষয়টি আলি রা.-এর কাছে ছেড়ে দেওয়া হোক এ শর্তে যে, তিনি যেন কোনো ত্রুটি না করেন। সময় পাওয়াপাত্রই যেন উসমান রা.-এর হত্যার বদলা ও আল্লাহ তায়ালার দণ্ডবিধি কার্যকর করেন।[৩১০]

কিন্তু তারপর কী হলো!

আলি রা. যেই সমঝোতা ও ঐক্যের ঘোষণা করলেন এবং আগামীকাল তিনি রওনা হয়ে চলে যাবেন বলে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। সেই সময় ফিতনার উসকানিদাতাদের মধ্যে কিছু লোক একত্র হলো। যাদের মধ্যে ছিল আশতার নাখয়ি, শুরাইহ ইবনে আওফা ও আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। যে ইবনে সাওদা নামে পরিচিত। আরও ছিল সালিম ইবনে সালাবা, ইবনুল হাইসাম। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, এই হতভাগাদের মধ্যে একজন সাহাবিও ছিলেন না। যেমনটা ইবনে কাসির বলেছেন।

হত্যাকারীদের উদ্বেগ-ষড়যন্ত্র

সাহাবায়ে কিরামের সমোঝতা হয়ে গেল যখন, তখন তারা তাদের পরের অবস্থার ভয়াবহতা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করতে লাগল। তারা এটাও আলোচনা করতে লাগল যে, সাহাবায়ে কিরামের ঐক্য তাদের বিপদের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাদের মধ্যে একজন বলল—তাহলে আর দেরি কেন? আলিকেও উসমানের সাথে পাঠিয়ে দিই; কিন্তু চতুর আবদুল্লাহ ইবনে সাবা এই মতামতকে অসার বলে এই এ চক্রান্ত থেকে সতর্ক করে দিলো। তারপর সে বলল—তোমাদের মুক্তি একমাত্র মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়ার মধ্যে। সুতরাং যখন মানুষ একে অন্যের সাথে মিলিত হবে, তখন মানুষের মাঝে যুদ্ধ ও লড়াই বাধিয়ে দাও। তাদের একত্র হতে দিয়ো না। তোমাদের আশেপাশে অনেকে আছে—যারা নিজের রক্ষার জন্য লড়াই করবে।

---

৩১০ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৩৯

ষড়যন্ত্র শুরু

এরপর ফিতনার উসকানিদাতারা এ ব্যাপারে একমত হওয়ার পর ছড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় দিন আলি রা. সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন। আলি রা.-এরপর তালহা ও জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রত্যেকেই রওনা হওয়া হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে সমঝোতা ও ঐক্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সে রাত সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ লোকেরা ভালো করে কাটাল। উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের জন্য ছিল একটি কঠিন রাত।

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সঙ্গীরা এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেল—যে করেই হোক, মানুষের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে মানুষকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে হবে। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা ফজরের পূর্বেই উঠে গেল। তারা ছিল প্রায় দুই হাজার লোক। তাদের প্রত্যেক দলই তাদের নিকটে থাকা তাঁবুতে গেল। তারা অতর্কিতে হামলে পড়ল। তারা তাদের ওপর তরবারি নিয়ে হামলা করল। তখন প্রত্যেক দলই তাদের নিকটে থাকা তাদের স্বগোত্রের নিকট গেল তাদের বাঁচানোর জন্য। মানুষকে তারা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামার জন্য।

তারা বলতে লাগল—কুফাবাসী আমাদের ঘুম ভেঙে দিয়েছে। তারা আমাদের ওপর রাতে হামলা করেছে। তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। তারা ধারণা করছিল, এটা আলি রা.-এর একটি পরিকল্পিত হামলা। সংবাদটা আলি রা.-এর নিকটে পৌঁছলে আলি রা. বলতে লাগলেন—লোকদের কী হলো!

তখন তার চারপাশে যারা ছিল, তারা চিৎকার করে উঠল—বসরাবাসী রাতে আমাদের ওপর হামলা করেছে। তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। তখন তারা সকলেই অস্ত্র নিতে ছুটে গেল। বর্ম পরে ঘোড়ায় আরোহণ করল। অথচ তারা কেউ জানে না, প্রকৃত বিষয় আসলে কী? তারা জানে না, এর বাস্তবতা আসলে কী? ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক ছিল যে, যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে লেগে যাবে। ঘোড়সওয়াররা লেগে যাবে চূড়ান্ত যুদ্ধে।

আলি রা.-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বিশ হাজার। আর আম্মাজান আয়িশা রা. ও তার সাথে যারা ছিল, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। এ ছাড়া বাকি যারা ছিল, তারা ছিল ইবনে সাবার সহযোগী। আল্লাহ এদের সকলকে ধ্বংস করেন। তারা হত্যা থেকে বিরত থাকছিল না। আর আলি রা.-এর ঘোষণাকারী ডাকছিল এই

বলে—সাবধান, তোমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো। তোমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো; কিন্তু কেউ তার কথা শুনছিল না।

এই অস্থিরিতা ও লড়াইয়ের সময় যখন সেই মুখগুলো মুখোমুখি হতো—যারা একদিন বিশ্বাসের ছায়ায় এসে একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়েছিল। যারা আল্লাহর রাসুলের সহযাত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত—তারা আজ যখন এই পরিস্থিতিতে, তখন পাশ কাটিয়ে চলে যেত। যেই দিকেই হোক না কেন, প্রত্যেকেই অন্যের ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাকত।

আবার মীমাংসা চেষ্টা

ইমাম বাইহাকি যুক্ত করে আরও বলেন—

আমাদের কাছে আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আলকাজি থেকে হারব ইবনে আসওয়াদ আদ দুয়াইলি নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন—যখন তালহা ও জুবাইর রা.-এর সাথে আলি রা. তার সঙ্গীসহ মুখোমুখি হলেন এবং উভয়পক্ষই কাছাকাছি হলো, তখন আল্লাহর রাসুলের খচ্চরের ওপর আরোহণ করে আলি বের হলেন। তিনি ডাক দিয়ে বললেন—তোমরা জুবাইর ইবনে আওয়ামকে আমার কাছে ডেকে আনো। তখন জুবাইর ইবনে আওয়ামকে ডাকা হলো। তিনি এলেন।

দুজনের বাহনের গর্দান মুখোমুখি ছিল। আলি রা. বলতে লাগলেন—জুবাইর, আল্লাহর নামে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যেদিন আমরা অমুক অমুক জায়গায় ছিলাম, সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে? যেদিন রাসুল বলেছিলেন—হে জুবাইর, তুমি কি আলিকে ভালোবাসো না? তখন তুমি বলেছিলে—অবশ্যই আমি ভালোবাসি আমার মামাতো ভাইকে, আমার চাচাতো ভাইকে এবং এ ভালোবাসা আমার দ্বীনের জন্য।

আলি রা. বললেন—জুবাইর, আল্লাহর কসম! সাবধান! তুমি অবশ্যই তার প্রতি অত্যাচার করে তার সাথে লড়াই করছ না!

তখন জুবাইর রা. বললেন—অবশ্যই, আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শোনার পর থেকে আল্লাহর রাসুলের এ কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর আজ এখনই আমার এ কথা মনে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি কখনো আপনার সাথে লড়াই করব না। এরপর জুবাইর রা. যোদ্ধাদের কাতারের মধ্য দিয়ে নিজ বাহনে করে ফিরে গেলেন।

আয়িশা রা.-এর উট মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তার হাওদা পড়েছিল যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে বহুদূরে। তখন আম্মাজানের নিকট সালাম দিয়ে আলি রা. তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আসেন। আম্মাজান আয়িশা রা.-কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আম্মাজান, কেমন আছেন আপনি?

আম্মাজান বললেন—আমি ভালো আছি।

আলি রা. বললেন—আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেন।

তারপর লোকদের ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তারা আম্মাজান আয়িশা রা.-এর কাছে সালাম দিতে আসে। তিনি ঠিক আছেন কি না, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য।[৩১১]

* * *

৩১১ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৪১

সিফফিন যুদ্ধের পটভূমি

মুয়াবিয়া রা.-এর মনোভাব

আলি রা. কুফায় ফিরে গেলেন। কুফায়ই ছিল আলি রা.-এর খিলাফতের মূল কেন্দ্র। তিনি কুফায় ফিরে এসেই জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজলিকে পাঠালেন মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট।

তখন মুয়াবিয়া রা. ছিলেন শামের গভর্নর। তিনি খবর নিয়ে পৌঁছেন, আলি রা. মুয়াবিয়া রা.-কে আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি যেন মানুষের মাঝে যে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান, তাতে মনোযোগ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। মুয়াবিয়া রা.-কে তিনি আরও জানালেন যে, আনসার ও মুহাজির সকল সাহাবি আলি রা.-এর কাছে বাইয়াত দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে; কিন্তু মুয়াবিয়া রা. মনে করতেন, আলি রা.-এর বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়নি। যেহেতু বড়ো বড়ো সাহাবায়ে কিরাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিলেন। আর তার নিজের দৃষ্টিতে, তিনি ভাবতেন, পূর্ণ বাইয়াত কেবল তাদের সকলের উপস্থিতি ও বাইয়াতবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই হতে পারে। তাই আলি রা.-এর আহ্বান তিনি গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি বললেন—যতক্ষণ না উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের থেকে হত্যার বদলা নেওয়া হয়, ততক্ষণ তিনি বিরত থাকবেন। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হলে তারপরই কেবল মুসলিমরা তাদের নিজেদের জন্য একজন ইমাম নির্বাচন করবেন।

আলি রা.-এর নিশ্চয়তা

এদিকে আলি রা. এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, মদিনা যেহেতু নববি হিজরতের কেন্দ্রভূমি, সে হিসেবে বাইয়াতের ব্যাপারে মদিনাবাসীদের একমত হওয়ার মাধ্যমে বাইয়াত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মদিনাবাসীর একমত হওয়ার মাধ্যমে মদিনার বাইরে যারা বাইয়াত থেকে পিছিয়ে আছে, তাদের ওপরও এ বাইয়াত আবশ্যক হয়ে গেছে। আর উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নেওয়ার ব্যাপারে আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ইচ্ছুক। তিনি হত্যা বদলার নেওয়ার জন্য এমন কিছু প্ল্যান করছিলেন, যা হত্যার বদলা নেওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য সহায়ক হবে।

আবার যুদ্ধযাত্রা

আলি রা. তার প্লানমতোই এগিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু যখন তার নিকট সংবাদ এলো—মুয়াবিয়া রা. তার কাছে বাইয়াত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তখন আলি রা. মুয়াবিয়া রা.-কে রাষ্ট্রদ্রোহী, মুসলিম ও তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ ধরে নেন। তাই আলি রা. ৩৬ হিজরির রজবের বারোতম রাত্রে নাখলার উদ্দেশে বের হলেন।

আলি রা.-এর তার সাথে অনেক সাহাবি ছিলেন। তারা নাখলা নামক জায়গায় সেনাঘাঁটি স্থাপন করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে আলি রা. বসরায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আলি রা.-এর সাথে এসে মিলিত হলেন। আলি রা. তার সেনাবাহিনীকে শামের অভিমুখী করে মোতায়ন করলেন শামের অধিবাসীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য এবং মুসলিম জামাতের আনুগত্যে তাদের বাধ্য করার জন্য।[৩১২]

মুয়াবিয়া রা. যখন আলি রা.-এর আগমনের ব্যাপারে জানতে পারলেন, তখন তিনি শাম থেকে তার সৈন্যবাহিনীসহ নাখলার উদ্দেশে বের হলেন। তখন ফোরাত নদীর তীরে সিফফিন নামক একটি সমতল জায়গায় দু-পক্ষ মুখোমুখি হয়। দু-পক্ষের মধ্যে দুই মাস অথবা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে বহু চিঠি আদান-প্রদান চলে। একদিকে আলি রা. মুয়াবিয়া রা. ও তার সাথে থাকা সকলকে তার বাইয়াতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এবং মুয়াবিয়া রা.-কে এটা নিশ্চিত করছিলেন যে, উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের থেকে বদলা নেওয়াটা সময়মতোই বাস্তবায়িত হবে।

---

৩১২ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৫৪

অপরদিকে মুয়াবিয়া রা. এদিকে আহ্বান করছিলেন যে, সবকিছুর পূর্বে উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের তদন্ত করা হোক। কেননা, উসমান রা. ছিলেন তার চাচাতো ভাই। সুতরাং তিনি তার হত্যার বদলার সবচেয়ে উপযুক্ত দাবিদার। এই সময়ের মধ্যে দু-পক্ষের মাঝে কিছু কিছু খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে ছিল।

ফলাফল যখন শূন্য

এ অবস্থায় চলছিল দু-পক্ষ। একপর্যায়ে ৩৭ হিজরির মহররম মাস চলে এলো। মুয়াবিয়া রা. ও আলি রা.—দুজনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন তারা; যার সীমা ছিল এক মাস। তারা এই এক মাস সময় এ আশায় নির্ধারিণ করেছিলেন যে, দু-পক্ষ এই এক মাসের মধ্যে সমঝোতা করবে; কিন্তু এই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও কোনো লাভ হলো না। কেউ কোনো সমাধানে আসতে পারলেন না।

যুদ্ধ ঠেকানো গেল না

এ সময় আলি রা. একজনকে এ ঘোষণা করতে আদেশ করলেন—'শোনো শামবাসী, তোমাদের লক্ষ্য করে আমিরুল মুমিনিন বলছেন—তোমাদের আমি অনেক সময় দিয়েছিলাম, যাতে করে তোমরা সত্যের কাছে ফিরে আসার জন্য সত্য নির্ণয় করতে পার; কিন্তু তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও বিদ্রোহ থেকে ফিরে আসোনি। তোমরা সত্যের প্রতি সাড়া দাওনি। সুতরাং আমি তোমাদের সাথে দেওয়া সময়সীমা প্রত্যাহার করে নিলাম। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।'[৩১৩]

তখনই মুয়াবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা. তাদের বাহিনীকে ডানে-বামে মোতায়েন করলেন। আর এদিকে আলি রা. ওই রাতেই তার বাহিনীকে মোতায়ন করলেন। কুফার বাহিনীতে নিযুক্ত করলেন আশতার নাখয়িকে। আর বসরার অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত করলেন সাহাল ইবনে হুনাইফকে। আলি রা. তার সাথে থাকা সৈন্যবাহিনীর সকলকে এ আদেশ দিয়ে দিলেন—যেন তারা আগে বেড়ে কারও সাথে লড়াইয়ে না জড়ায়, যতক্ষণ না শামের বাহিনী আগে লড়াই শুরু করে। তারা যেন আহত ব্যক্তিদের সাথে সহজ আচরণ করে। পালিয়ে যাওয়া

---

৩১৩ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া:৭/২৬০

কোনো ব্যক্তির পিছু না নেয়। কোনো নারীর পর্দা যেন না খোলে। যেন নারীকে অপমান না করা হয়।

প্রথম দিন উভয়পক্ষ প্রচণ্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। দ্বিতীয় দিনও প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে তাদের মধ্যে। এভাবে এই প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে টানা সাত দিন; কিন্তু উভয়পক্ষের কেউ কারও ওপর জয় হচ্ছিল না; কিন্তু লড়াইয়ের মাত্রাটা শেষ দিকে মুয়াবিয়া রা. ও তার সাথে থাকা বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। আলি রা. বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। তখন মুয়াবিয়া রা. ও আমর ইবনুল আস রা.-এর মধ্যে প্রত্যেকেই এই পরিস্থিতি নিয়ে মশওয়ারা করলেন।

আমর ইবনুল আস রা. মুয়াবিয়া রা.-কে পরামর্শ দিলেন—যেন তিনি ইরাকবাসীকে আল্লাহর কুরআনের ফয়সালার দিকে আহ্বান করেন। মুয়াবিয়া রা. তার বাহিনীকে বর্শার ওপর কুরআন উঁচু করে রাখার জন্য আদেশ করলেন। এবং আদেশ করলেন যেন মুয়াবিয়া রা.-এর নামে এই ঘোষণা করে যে—এ হলো আল্লাহর কিতাব। যা আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে ফয়সালা করবে।

আলি রা.-এর বাহিনী বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল; কিন্তু যখন তারা এই দৃশ্য দেখল, তখনই আলি রা.-এর বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ বলছিল—আমরা আল্লাহর কিতাবের ফয়সালার আহবানে সাড়া দেবো। আর আরেক ভাগ বলছিল—আমরা লড়াই করেই যাব।

হয়তো তারা এ বিষয়টিকে কৌশল হিসেবে কুরআনের ফয়সালা গ্রহণ করছে—এমনটাই ছিল আলি রা.-এর মতামত; কিন্তু তার বাহিনীর মধ্যে ভিন্নমত পোষণকারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে আলি রা. বাধ্য হয়েছিলেন তাদের অনুসরণ করতে। তাই আলি রা. আসআস ইবনে কাইস রা.-কে মুয়াবিয়া রা.-এর কাছে পাঠালেন। যেন তিনি মুয়াবিয়া রা.-এর উদ্দেশ্য জেনে আসেন।

এই বিষয়ে মুয়াবিয়া রা.-কে জিজ্ঞেস করার পর তার উত্তর ছিল—আমাদের এবং তোমাদের উভয়পক্ষেরই আল্লাহর কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তির ওপর সন্তুষ্ট, আমরা যেন তাকে নির্বাচন করি এবং তোমরাও তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করো—যার প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট। সুতরাং তখন যেন আমরা এই দুই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করি যে, তারা কিতাবুল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী যে ফয়সালা দেবে, আমরা তাই গ্রহণ করব। সুতরাং তাদের সিদ্ধান্ত যা-ই হোক, আমরা উভয়পক্ষ তা মেনে নেব।

তখন শামবাসী আমর ইবনুল আস রা.-কে নির্বাচন করল এবং ইরাকবাসী আবু মুসা আশআরি রা.-কে নির্বাচন করল।

তারা দুজন এরই পরিপ্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চিঠি বিনিময় করল। চিঠি বিনিময়ের পর উভয়পক্ষ কথায় একমত হলো যে, এই সিদ্ধান্তকে রমাদান পর্যন্ত বিলম্বিত করা হোক। তারা এ ব্যাপারেও একমত হয়েছিলেন যে, উভয় ফয়সালাকারী তখন যেন দাওমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় মিলিত হয়, এরপর লোকেরা যার যার মতো চলে গেল।

যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন : সেনাবাহিনীর কোন্দল

আমিরুল মুমিনিন আলি রা. সিফফিন থেকে কুফায় ফিরে গেলেন। তখন তার বাহিনীর মাঝে ভয়াবহ বিভেদ ছড়িয়ে পড়েছিল। আলি রা. যখন কুফায় পৌঁছলেন, তখন তার বাহিনীর মধ্য থেকে একটি দল পৃথক হয়ে গেল যারা কুরআনের ফয়সালকে ভ্রষ্টতা মনে করত।

তারা হারওয়ারা নামক জায়গায় একত্র হলো। তারা ছিল প্রায় বারো হাজারের মতো। আলি রা. তখন তাদের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে পাঠালেন কথা বলার জন্য এবং তাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য; কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। তাই তাদের নিকট আলি রা. নিজে গেলেন। যখন আলি রা. তাদের নিকট গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের এই বিদ্রোহের কারণ কী?

তারা উত্তর দিলো—সিফফিনের দিনে আপনার ফয়সালা।

আলি রা. বললেন—কিন্তু আমি তো উভয়ই ফয়সালাকারীর ওপর এ শর্ত করে দিয়েছিলাম—যে বিধানকে কুরআন উজ্জীবিত করে, তারা যেন সেই বিধানকেই পুনর্জীবিত করে এবং কুরআন যে বিধানকে মিটিয়ে দেয়, তারা যেন সে বিধানকে মিটেয়ে দেয়।

তখন তারা বলল—আপনি আমাদের বলেন তো দেখি, আপনি কি হত্যার বদলার ক্ষেত্রে মানুষের বিচারকে ইনসাফ মনে করছেন?

আলি রা. বললেন—আমরা তো মানুষদের বিচারক বানাইনি; আমরা তো কেবল কুরআনকেই বিচারক বানিয়েছি। আর এই কুরআন তো দুটি রাস্তার মধ্যখানে লিখিত একটি রেখা। কুরআন সরাসরি কথা বলে না; বরং কুরআনের মাধ্যমে মানুষ কথা বলে।

তারা বলল—তাহলে কী জন্য আপনারা নিজেদের মধ্যে সময় নির্ধারণ করেছেন?

আলি রা. বললেন—যাতে করে অজ্ঞ লোক জানতে পারে, আর জ্ঞানী অবিচল থাকে। হয়তো আল্লাহ তায়ালা এই সময়সীমার মাধ্যমে উম্মতকে সংশোধন করে দেবেন।

এই আলোচনার পর তারা সন্তুষ্টচিত্তে আলি রা.-এর মতামতের দিকে ফিরে এলো। আলি রা. বললেন—তোমরা তোমাদের শহরে প্রবেশ করো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। তখন তারা সকলেই প্রবেশ করল।

যখন বেঁধে দেওয়া সময় শেষ হয়ে গেল, ৩৭ হিজরির রমাদান চলে এলো। আলি রা. তখন আবু মুসা আশআরি রা.-কে কুফাবাসী ও একদল সাহাবির নিকট পাঠালেন। এদিকে মুয়াবিয়া রা.-ও আমর ইবনুল আস রা.-কে শামবাসীর একটি দলের নিকট পাঠালেন। দু-পক্ষই দাওমাতুল জান্দালে একত্র হলো।

তারা দুজনই শুরুতেই আল্লাহর প্রশংসা করল। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। একে অন্যের প্রতি কল্যাণ কামনা করল। এরপর তারা এ ব্যাপারে একমত হলো যে, একজন লেখক ও একটি কাগজ আনা হোক। তারপর তাদের যে সকল বিষয়ে একমত হবে, তারা দুজনে তা লিখিয়ে নিক; কিন্তু তারা অবশেষে এ উম্মতের দায়িত্ব কার কাছে দেবে, তার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি।

কেননা, আবু মুসা আশআরি রা. সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন যে, আলি ও মুয়াবিয়া—দুজনকেই সসম্মানে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কেই খিলাফতের জন্য নির্বাচন করেন। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তখন উভয় ফয়সালাকারী এ ব্যাপারে একমত হলো যে, আলি ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম দুজনকেই সসম্মানে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। আর এ বিষয়টিকে মুসলিমদের পরামর্শের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক।

তারা একমত হয়ে নিজেদের জন্য যাকে নির্বাচন করবে, তিনিই পরবর্তী খলিফা হবেন। তারপর তারা দুজন দু-পক্ষের সমবেত মানুষের দিকে মনোযোগী হলেন। আবু মুসা আশআরি রা.-কে তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন—সমবেত লোকদের তারা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, সে বিষয় ঘোষণা করার জন্য।

আবু মুসা আশআরি রা. সামনে এলেন। আল্লাহর প্রশংসা করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়লেন। তারপর সমবেত লোকদের উদ্দেশে বললেন—লোকসকল, আমরা এ উম্মাহর সমস্যার সমাধান খুঁজেছি। উম্মাহর বিশৃঙ্খল, হৃদয়বিদারক অবস্থার সংশোধনের জন্য আমি ও আমর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো সিদ্ধান্ত দেখছি না। আর তা হলো—আলি ও মুয়াবিয়াকে সসম্মানে তাদের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।

এরপর আবু মুসা আশআরি রা. সরে গেলেন। তার জায়গায় আমর ইবনুল আস রা. এসে দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। তারপর বললেন—ইনি (আবু মুসা আশআরি) যা বলেছে, তা তোমরা শুনেছ। তিনি তার নেতাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। সুতরাং তিনি যেমন তার নেতাকে অব্যাহতি দিয়েছেন, আমিও তাকে অব্যাহতি দিয়েছি। আর আমি আমার নেতা মুয়াবিয়াকে আপন জায়গায় বহাল রাখলাম। কেননা, তিনি উসমানের অভিভাবক। তার রক্তের (হত্যার বদলার) দাবিদার। আর তিনিই মানুষের মধ্যে তার অবস্থানে সবচেয়ে উপযুক্ত।

লোকেরা এরপর প্রত্যেকেই যার যার শহরে চলে গেল। আর আমর ইবনুল আস ও তার সঙ্গীরা মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট গিয়ে তাকে খিলাফতের অভিবাদন জানাল। আর আবু মুসা রা. আলি রা.-এর বিষয়টি নিয়ে অনুশোচনায় পড়ে গেলেন। তাই তিনি মক্কায় চলে যান। আর ইবনে আব্বাস রা.-ও শুরাইহ ইবনে হানি আলি রা.-এর নিকট ফিরে গেলেন। তারপর তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানালেন।[৩১৪]

খারিজি ফিতনা ও আলি রা.-এর হত্যা

আলি রা. আবু মুসা আশআরি রা.-কে ও তার সাথে থাকা সৈন্যবাহিনীকে দাওমাতুল জান্দালে পাঠালেন। তখন খারিজিদের ফিতনা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। তারা আলি রা.-এর প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু করে। আলি রা.-এর কুরআনের ফয়সালা গ্রহণ করার কারণে স্পষ্টভাবে তাকে 'কাফির' বলতে শুরু করে। অথচ এরাই আলি রা.-এর সবচেয়ে বেশি গুণগ্রাহী ছিল।

তাদের সাথে আলোচনা এবং তাদের উদ্দেশ্যে আলি রা.-এর উপদেশ তাদের কোনো কাজে আসেনি। অবশেষে তাদের এতটুকু বলেছেন—'আমাদের ওপর

---

৩১৪ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*র সংক্ষেপ, খণ্ড :৭, পৃষ্ঠা : ২৮২-২৮৪

তোমাদের এ অধিকার রয়েছে যে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের মসজিদে আসতে বাধা দিতে পারব না। যতক্ষণ না তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। আমরা তোমাদের গনিমতের অংশ থেকে বঞ্চিত করব না, যতক্ষণ না তোমাদের হাত আমাদের হাতের সাথে থাকে। আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাদের সাথে লড়াই করবে।' এরপর আলি রা. মুয়াবিয়া রা.-এর সাথে লড়তে শামের উদ্দেশে বিরাট বড়ো বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন।

আলি রা. ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—তিনি দুই ফয়সালাকারীর ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ সময় আলি রা.-এর কাছে সংবাদ আসে যে, খারিজিরা জমিনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। ব্যাপক রক্তপাত করেছে। ডাকাতি করেছে। সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। হত্যা করেছে তাদের মধ্যে অনেক লোককে। যাদের তারা হত্যা করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল আল্লাহর রাসুলের সাথি খাব্বাব রা.-এর ছেলে আবদুল্লাহ ও তার স্ত্রীও।

তখন আলি রা. এবং তার সাথে যারা ছিল, তাদের ভয় হলো যে, তারা যদি শামে গিয়ে মুয়াবিয়ার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে হতে পারে—এ সকল খারিজিরা মুসলিমদের রেখে যাওয়া আত্মীয়স্বজন পরিবার-পরিজন ও বংশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তখন আলি রা.-এর সাথে থাকা সাহাবিরা এই ব্যাপারে একমত হলো যে, লড়াই যদি করতে হয়, তাহলে এ সকল খারিজিদের সাথেই আগে সকলে মিলে একযোগে লড়াই করতে হবে।

খারিজিদের সাথে যুদ্ধ

তখন আলি রা. তার সাথে যারা ছিল, তাদের নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি যখন মাদায়িনের কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন খারিজিরা ছিল নাহরাওয়ানে। আলি রা. নাহরাওয়ানে খারিজিদের কাছে দূত পাঠালেন এ বার্তা দিয়ে—

> তোমাদের মধ্যে যারা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছ, আমাদের কাছে তাদের অর্পণ করো। আমরা তাদের হত্যা করব। এরপর তোমাদের ছেড়ে দেবো। এরপর আমরা শামে ফিরে যাব। হয়তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কল্যাণকর অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারেন। যা তোমাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো হবে।

উত্তরে তারা আলি রা.-কে দূত পাঠাল এ বলে—

আমরা সকলই তোমাদের ভাইদের হত্যা করেছি। আমরা তোমাদের ও তাদের রক্ত বৈধ মনে করি।

তখন আলি রা. তাদের কাছে এসে উপদেশ দিলেন এবং তাদের বোঝালেন। বিভিন্নভাবে তাদের সতর্ক করলেন; কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তারা তাদের ষড়যন্ত্রের ওপরই অটল রইল। তারা আলি রা. যে তাদের সাথে আলোচনা ও তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়েছেন, তা কোনো কাজে আসেনি।

তারা তাদের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে দিলো—

তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও লড়ায়ের জন্য। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের জন্য।

লড়াইয়ের পূর্বে আলি রা. আবু আইয়ুব আনসার রা.-কে খারিজিদের জন্য নিরাপত্তার পতাকা উত্তোলন করার আদেশ দিলেন। এ কথা বলে দিতে আদেশ দিলেন—'যারা এই পতাকার নিচে আসবে, সে নিরাপদ। যে কুফা ও মাদায়িনে ফিরে যাবে, সে নিরাপদ।' তখন তাদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেল। তাদের মধ্যে প্রায় এক হাজার বাকি ছিল। যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রাসিবি।

খারিজিরাই প্রথম লড়াই শুরু করে। তাদের প্রায় সকলই নিহত হয়। বলা হয়—তাদের অধিকাংশ নিহত হয়েছিল। আর আলি রা.-এর বাহিনীর মধ্যে থেকে কেবল সাতজন নিহত হয়েছিল। এরপর আলি রা.-এর জন্য পরিস্থিতি পালটে গেল। আলি রা.-এর বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। ইরাকবাসীর অনেকে তার বিরোধিতা করে বসল। এদিকে শামের পরিবেশও আবারও নাটকীয়ভাবে ঘোলাটে হয়ে গেল।

তারা ডানে-বামে সব দিকে আক্রমণ করতে লাগল। ইবনে কাসির বলেন—তারা মনে করেছিল, দুই ফয়সালাকারীর সিদ্ধান্তের কারণে হয়তো পরিবেশ মুয়াবিয়া রা.-এর অনুকূলে। পাশাপাশি তারা এটাও জানত যে, শামবাসীর শক্তি যত বাড়বে, ইরাকবাসী ততই দুর্বল হবে এবং মনোবল হারিয়ে ফেলবে। তারা এটাও জানত যে, তাদের নেতা আলি রা. এই সময়ের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ইবাদতগুজার, সবচেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ, সবচেয়ে জ্ঞানী, আল্লাহর ভয়ে সবচেয়ে বেশি প্রকম্পিত; কিন্তু তারা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। তার পথ থেকে তারা সরে গেল।

একপর্যায়ে তিনি জীবনকে অপছন্দ করতে লাগলেন। মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। তিনি এ কথা বেশি বেশি বলতেন—সেই সত্তার কসম, যিনি প্রাণ সৃষ্টি করেছেন।

অবশ্যই এর রক্ত দিয়ে এটি রঞ্জিত হবে। (অর্থাৎ মাথার রক্ত দিয়ে দাড়ি রঞ্জিত হবে।) এই উম্মতের সবচেয়ে হতভাগাই তাকে আটক করবে।

আলি রা.-কে হত্যা

আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম ছিল খারিজিদের অন্যতম নেতা। সে কাতাম নামের এক পরমা সুন্দরীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। যার বাবা ও ভাই নাহওয়ারানের যুদ্ধে নিহত হয়ে ছিল। তাই কাতাম আবদুর রহমান ইবনে মুলজামের কাছে এ শর্ত করল যে, আলিকে হত্যা করতে পারলে সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত।

তখন আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম বলল—আল্লাহর কসম, আমি এ শহরে আলিকে হত্যা করার জন্যই এসেছি। সেই শর্তেই আবদুর রহমান কাতামকে বিবাহ করল। তার সাথে সংগম করল। এ বিয়ের পর কাতাম আবদুর রহমানকে আরও বেশি আলি রা.-কে হত্যার জন্য উসকানি দিতে লাগল।

চল্লিশ হিজরির রমাদান মাসের সতেরো তারিখে জুমআর রাতে আবদুর রহমান ও তার দুজন সহযোগী আলি রা. সাধারণত যে দরজা দিয়ে বের হন, তার সামনে লুকিয়ে রইল। আলি রা. তার স্বভাব অনুযায়ী ফজরের সালাতের জন্য মানুষদের ডাকার জন্য বের হলেন।

তখনই ইবনে মুলজাম অতর্কিতে আলি রা.-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরবারি দিয়ে আলি রা.-এর মাথার ওপর আঘাত করে। তখন মাথার রক্ত আলি রা.-এর দাড়ি বেয়ে পড়তে থাকে।

আলি রা. জেনে গিয়েছিলেন যে, ইবনে মুলজামই আঘাত করেছে। তখন আলি রা. তার সহযোগীদের বলতে লাগলেন, যদি আমি মারা যাই, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করো। আর যদি আমি বেঁচে যাই, তাহলে আমি জানি না তাকে কী করব।

এরপর যখন আলি রা. মৃত্যুশয্যায় পড়ে গেলেন, তখন তিনি বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জপতে লাগলেন। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া আর অন্য কিছু তিনি বলতেন না।

আলি রা. তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার খিলাফতের সময় ছিল তিন মাস কম পাঁচ বছর। ইবনে কাসিরের গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী আলি রা.-কে কুফার দারুল ইমারায় সমাধিত করা হয়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, আলি রা.-এর আত্মীয়স্বজনরা খারিজিদের ভয়ে গোপনে তার দাফন সম্পন্ন করে। তার সমাধির স্থান নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। বলা হয়—তার সমাধি জান্নাতুল বাকিতে স্থানান্তরিত করা হয়। অথবা অন্য আরও অনেক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন। ইবনে মুলজামকে হাসান রা. হত্যা করেছিলেন। তারপর তার মৃতদেহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন।[৩১৫]

* * *

৩১৫ *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ৫ পৃষ্ঠা : ১৩৩; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৭, ৩৮৫

আমাদের শিক্ষা ও উপদেশ

০১. খিলাফতের বিরোধিতা নয়, প্রধান দাবি বিচারের

যারা উসমান রা.-এর হত্যার বদলার দাবিতে তাড়াহুড়ো করছিল, তাদের ও আলি রা.-এর মাঝে কি মৌলিক কোনো বিরোধ ছিল?

আপনি হয়তো জানেন, উসমান রা.-এর হত্যার বদলা নেওয়া কখনোই মতবিরোধের বিষয় ছিল না। আয়িশা রা., তালহা, জুবাইর রা. ও তাদের সাথে আরও যারা ছিলেন, তাদের সকলের একটাই দাবি ছিল—এ সকল হত্যাকারীর ব্যাপারে শরয়ি দণ্ডবিধির বাস্তবায়নই আলির খিলাফতের ও তার শাসনকালের সর্বপ্রথম কাজ হোক।

আর আলি রা.-এর মত ছিল—আগে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে স্থিতিশীল করে পরিবেশ-পরিস্থিতি ঠিক করা হোক। এরপর উসমান রা.-এর হত্যার বদলা ধীরস্থিরতার সাথে ও বিচক্ষণতার সাথে একটি সুন্দর পদ্ধতিতে নেওয়া যাবে।

এই ছিল আলি রা.-এর মতামত এবং এই বিষয়ে তিনি আগ্রহী ছিলেন। এই মতামতের প্রতি অপর পক্ষও রাজি হয়েছিল।

এরই ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল। সকলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যারা এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করে মেনে নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা., তালহা রা. ও জুবাইর রা.। অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠার সাথে সকলেই এই ব্যাপারে একমত হয়েছিল—আলি রা.-এর কাছে বিষয়টি রাখা হোক। আলি রা.-ই হিকমত এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমাধান করবেন। যতক্ষণ প্রত্যেকে এ ব্যাপারে একমত থাকবে যে অবশ্যই হত্যাকারীদের বদলা নেওয়া হবে এবং তাদের ওপর ইসলামি দণ্ডবিধি কায়েম করা হবে। এরই ভিত্তিতে সকল পক্ষ এ ব্যাপারে একমত হলো—তারা নিজেদের ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়ে নিয়েছিল, সে দায়িত্ব থেকে তারা

সরে আসবে এবং সকলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল যে, প্রত্যেকে নিজের দেশে এবং নিজ ঘরে ফিরে যাবে।

০২. ষড়যন্ত্রের নীলনকশা

সিদ্ধান্ত তো হয়েই গিয়েছিল, তাহলে কোন জিনিস তাদের বাধা দিয়েছিল এই ঐকমত্য বাস্তবায়ন থেকে এবং তাদের সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ের পথে চলা থেকে? কোন জিনিস তাদের বারণ করেছিল আলি রা.-এর সামনে বিষয়টিকে অর্পণ করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সহযোগী হওয়া থেকে?

আপনি জানেন, যে জিনিসটি তাদের বাধা দিয়েছিল তা হলো সেই ষড়যন্ত্র, যার নীলনকশা এঁকেছিল ফিতনার নায়করা। তাদের অগ্রগামী ছিল ইবনে সাউদা, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা।

মুসলিমরা যখন আলি রা.-এর মতামতের ওপর একমত হয়ে গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সহযাত্রীরা ভয় পেয়ে গেল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল—মুসলিমদের কাতারে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে হবে এবং রাতের অন্ধকারে দুই পক্ষকে অতর্কিতে হামলা করতে হবে। তারা সশস্ত্রভাবে মুসলিমদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে, মুসলিমদের পালানোর আর কোনো পথ থাকবে না। যাতে করে মুসলিমদের একে অন্যের প্রতি যে আস্থা আছে, তা নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ফিতনার আগুন লেগে যায়। যাতে করে দু-পক্ষের প্রত্যেকেই এটা মনে করে যে, অপরপক্ষ ষড়যন্ত্র করে তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করেছে।

তারা ভাবতে থাকে—আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে, যেন মুসলিমরা পরস্পরের প্রতি এমন ধারণা করে যে, সমঝোতা ছিল নামেমাত্র এবং সন্ধি ছিল সামান্য লোকদেখানো। ইবনে সাবার এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হয়েছিল নিঃসন্দেহে; কিন্তু এ ধরনের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত জঘন্য এবং নিকৃষ্ট কাজ। যা ভালো কোনো মানবপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে হয় না; বরং হয় তা এক শয়তানি প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। এর ভিত্তি হলো পশ্চাৎপদ বিকৃত মন-মানসিকতা।

বিপরীতে এখানে অংশগ্রহণ করা সকল সাহাবায়ে কিরামের মন-মানসিকতা ছিল সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি থেকে মুক্ত। নিজেদের রক্ষার জন্য তাদের অতর্কিত হামলার প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। এ অতর্কিত হামলার ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এ ধারণা করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না যে, এটা একটি পরিকল্পিত হামলা। যার পরিকল্পনা করেছে অপর পক্ষ।

এ সবকিছু সত্ত্বেও আমরা দেখেছি—কোনো সাহাবায়ে কিরাম যখন অন্য সাহাবির মুখোমুখি হতেন এবং তাকে চিনে ফেলতেন, তখন প্রত্যেকে একে অন্যের ওপর হামলা করা থেকে বিরত থাকতেন এবং একে অন্যের কাছে অজুহাত ও অনুশোচনা পেশ করতেন।

সুতরাং এ ফিতনা সাহাবায়ে কিরামের কোনো অস্থিরতা থেকে সৃষ্টি হয়নি। দু-পক্ষের কোনো পক্ষ থেকেই হয়নি; বরং এ ফিতনার আগুন জ্বেলেছিল মুসলিম শিবিরে অনুপ্রবেশকারী শত্রুরা। তারা সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে এক নিন্দনীয় ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে তারা কোনো পার্থক্য করছিল না; বরং দুই পক্ষকেই ষড়যন্ত্রের শিকার বানাচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো—এর পরেও আপনি এই ফিতনা সম্পর্কে অনেক রচনা পাবেন; কিন্তু সেখানে এমন কিছু পাবেন না—যা ফিতনার মূল হোতাদের সম্পর্কে তথ্য দেবে এবং এসব ঘটনার ক্ষেত্রে ফিতনাবাজদের সেই মারাত্মক ছলচাতুরীর উদঘাটন করবে। আপনি এতটুকু পাবেন যে, প্রত্যেকেই ফিতনা বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাহ্যিক কিছু আলোচনা করেছে। এই ফিতনার হামলা ও জখমের শিকার এবং এর সমালোচনা ও অপবাদ সম্পর্কে দেখবেন—তারা বিস্তর আলোচনা করবে; কিন্তু আপনি দেখবেন—যারা এর ফিতনার কারিগর, তার রক্ষক এবং ফিতনার আগুনে ফুঁক দানকারীদের সম্পর্কে কোনো কথা, কোনো বাক্য এবং একটি শব্দও পাবেন না। উসমান রা.-এর হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে একেবারে আলি হত্যার শেষ পর্যন্ত—কোথাও পাবেন না। তাহলে এই স্টাইলে ফিতনার এই বিষয়গুলো নিয়ে লেখা এই রচনাগুলো কি হুবহু আরেকটি ষড়যন্ত্রের অংশ না?

০৩. আমরা কি সাহাবিদের দোষচর্চা করব

আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে যে, আলি রা. তার করণীয়-বর্জনীয় সকল কাজে ছিলেন একনিষ্ঠ। আমরা বিশ্বাস করি, উল্লিখিত সকল ঘটনায় নিজের প্রবৃত্তির এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের তিনি অনুসরণ করেননি। তার বিশাল জ্ঞানের ওপর এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তার আগের তিন খলিফার প্রত্যেকেই ছিলেন তার একমাত্র আস্থার জায়গা এবং প্রধান উপদেষ্টা। এদিকে লক্ষ্য করেই তিনি মানুষের বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন উসমান রা.-এর রা.-এর হত্যার পর। তিনি মুয়াবিয়া রা.-এর বিরোধিতা এবং তার মতের ওপর অবিচল থাকাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মনে করে নেন। এর ওপর ভিত্তি করেই দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর তিনি মুয়াবিয়া রা.-এর সাথে সে রকম আচরণ করেছিলেন। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিম,

আলিম-উলামা এবং মুসলিম জাতির ইমামদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি—আলি রা.-এর খিলাফতের বিরোধিতায় মুয়াবিয়া রা. বিদ্রোহী ছিলেন। আর আলি রা.-ই ছিলেন উসমান রা.-এর পরবর্তী খলিফা।

তবে আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না—যে ব্যক্তি বিদ্রোহী হয়, তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। তার দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার থাকে। যদিও অপর পক্ষের এ অধিকার থাকে যে, সে বিদ্রোহীকে সতর্ক করতে পারে। তাকে ভয় দেখাতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে তার সাথে লড়াইও করতে পারে; কিন্তু এ বিষয়টি অতীত হয়ে যাওয়ার পর এখন আমাদের এ অধিকার নেই যে, আমরা মুয়াবিয়া রা.-কে স্বাভাবিকভাবে না দেখে তাকে অন্যান্য সাহাবির চেয়ে খাটো চোখে দেখব। তার ব্যাপারে প্রচণ্ড শত্রুতামূলক অবস্থান গ্রহণ করব বা তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বেড়াব।

ইসলামি আকিদার ক্ষেত্রে আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, শরিয়তের মূলনীতি অনুযায়ী উসমান রা.-এর পর আলি রা.-ই খলিফা ও মুসলিমদের প্রতিনিধি। আর মুয়াবিয়া রা. তার মতের ওপর অটল থেকে তিনি তার ইজতিহাদ অনুযায়ী তিনি বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। ব্যস, এটুকুই। এরপর এর পুরো বিষয়টি এক আল্লাহর কাছেই সমর্পিত করে দেবো।

০৪. ষড়যন্ত্রের সকল কাজের কাজী—খারিজি

খারিজিদের অবস্থান এবং আলি রা.-এর পক্ষে তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের সমর্থন এবং তার পক্ষে লড়াই এবং এর পরবর্তী সময়ে আলি রা.-এর ব্যাপারে তাদের হঠকারিতা তাদের বিদ্রোহ এবং তার ব্যাপারে তাদের শত্রুতা—সবকিছু নিয়ে যখন কেউ আলোচনা-পর্যালোচনা করবে, তখন সেই এ ব্যাপারে একমত হবে যে, খারিজিরা ছিল চরম উদ্ধত ও চরমপন্থি।

এ কথা আপনার জানা আছে যে, ইসলাম তার চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেই মধ্যপন্থার মাপকাঠি হলো—জ্ঞান, কুরআন ও হাদিসের ইলম। সুতরাং যে ইসলামের মূল উৎস থেকে জ্ঞানার্জন করবে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করবে এবং ইসলামের দাবি অনুযায়ী চলবে; ইসলামের জ্ঞান এবং গুণের অন্বেষণ করবে, সে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

অধিকাংশ খারিজি ছিল গ্রাম্য, নির্বোধ ও কঠোর প্রকৃতির বেদুইন। সুতরাং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও মন-মানসিকতায় না ছিল ইলম, না ছিল আভিজাত্য আর না ছিল

তাদের ভেতর ভদ্রতা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের গ্রাম্য-মূর্খতা ও প্রাকৃতিক কঠোরতার শিকার হয়ে পড়েছিল। আর আলি রা.-কে কাফির আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের এ স্বভাব প্রকাশ পেয়েছিল কুরআনের ফয়সালাকে আলি রা.-এর গ্রহণ করার কারণে।

পরবর্তী সময়ে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে মানুষকে কাফির আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের এই অবস্থান আরও স্পষ্ট হয়ে যায়; বরং অধিকাংশ খারিজি যেকোনো গুনাহের অপরাধীকে কাফির বলতে অভ্যস্ত। তাদের এই চরমপন্থার নিদর্শন আমাদের সময় পর্যন্তও পৌঁছে গেছে। সামান্য বিষয়ের কারণে কাউকে তাকফির করা, কাফির আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা—এটা খারিজিদের চরমপন্থার চেতনাকে লালন করে। আর এই চরমপন্থা—যেমন আমরা বলেছি—জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং তা প্রতিষ্ঠিত হলো তাদের চরমপন্থি মূলনীতি ও চিন্তাচেতনার ওপর।

* * *



উপসংহার

নবিজির জানাজা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হয়েছে। এই তিনটি কাপড়ের মধ্যে কোনো কামিস ছিল না। কোনো ইমামাও ছিল না। যখন নবিজিকে কাফনের কাপড় পরানো হয়, তখন তাঁর দেহ মুবারক কবরের একপাশে খাটের ওপর রাখা হয়। লোকেরা কোনো ইমাম ব্যতিরেকেই দলে দলে আল্লাহর রাসুলের জানাজার সালাত আদায় করতে আসতে থাকে। তখন প্রথম আসেন আব্বাস রা.; তিনি এসে প্রথমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাজার সালাত আদায় করেন। তারপর বনু হাশিম, তারপর মুহাজির, তারপর আনসার সাহাবিরা। এরপর সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাজার সালাত আদায় করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান আয়িশা রা.-এর হুজরাখানার যে জায়গায় ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়।

নবিজির স্ত্রীগণ

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়জন স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেন। উম্মুল মুমিনিন সাওদা, আয়িশা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, উম্মে সালামা, জয়নব বিনতে জাহাশ, জুওয়াইরিয়া, সাফিয়া, মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আম্মাজান আয়িশা রা. ব্যতীত আর কোনো কুমারী নারী বিবাহ করেননি।

তাঁর সন্তানাদি

আল্লাহর রাসুলের তিন ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একজন কাসিম। তার নামেই নবিজি উপনাম গ্রহণ করেছিলেন 'আবুল কাসিম'। কাসিম রা.-এর জন্ম হয়েছিল নবুয়তের পূর্বে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই বছর।

আল্লাহর রাসুলের ছিল চার মেয়ে—জয়নাব, ফাতিমা, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম। রুকাইয়া দ্বিতীয় হিজরির রমাদান মাসে বদরের যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন। উম্মে কুলসুম মারা যান নবম হিজরির শাবান মাসে। তারা দুজনই একজন মারা যাওয়ার পর আরেকজন উসমান রা.-এর বিবাহবন্ধনে ছিলেন।

নবিজির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দানশীল। আর রমাদান মাসে তিনি আরও বড়ো দানশীল হয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর। তার চরিত্রও ছিল সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর হাত ছিল সবচেয়ে নরম। তাঁর সুগন্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি সুবাসিত। তাঁর আচরণ ছিল সবচেয়ে উত্তম আচরণ। আল্লাহর প্রতি তাঁর ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি নিজের জন্য রাগ করতেন না। নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না। তিনি শুধু তখনই রাগ করতেন—যখন আল্লাহর হুকুমাতের অসম্মান করা হতো। তখন হকের বিজয় হওয়া পর্যন্ত তাঁর রাগের সামনে কোনো কিছু দাঁড়াতে পারত না।

কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী। তিনি তাঁর পরিবারের প্রয়োজন পুরা করতেন। দুর্বলদের জন্য নিজের ডানা বিছিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে লাজুক। তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। আগ্রহ থাকলে খেতেন আর আগ্রহ না থাকলে খেতেন না।

তিনি হেলান দিয়ে খেতেন না। উঁচু কোনো জায়গায় রেখে খেতেন না। তিনি হালওয়া ও মধু পছন্দ করতেন। লাউ বা কদু তিনি খুব পছন্দ করতেন।

এক মাস, দুই মাস পার হয়ে যেত; কিন্তু অভাবে তাঁর কোনো ঘরে আগুন জ্বলত না। তিনি হাদিয়া খেতেন, সদকা খেতেন না।

তিনি নিজে নিজের জুতা সেলাই করতেন। নিজের কাপড় নিজে তালি দিয়ে পরতেন। তিনি রোগী দেখতে যেতেন। ধনী হোক গরিব হোক—যেই তাঁকে ডাকত, তার ডাকে সাড়া দিতেন।

তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার। যার ভেতরে ছিল খড়কুটো। দুনিয়ার ভোগসামগ্রীকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সকল জমিনের ধনভান্ডারের চাবি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন।

তিনি আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ছিলেন অধিক জিকিরকারী। সর্বদা চিন্তা করতেন। তাঁর অধিকাংশ হাসি ছিল মুচকি হাসি। তিনি রসিকতা করতেন; কিন্তু সঠিক কথাই বলতেন। তিনি তাঁর সাহাবিদের সাথে অন্তরঙ্গ হতেন। যেকোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন। তাঁকে দায়িত্ব দিতেন।

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে, আনাস রা. থেকে, আনাস রা. বলেন—

আমি আল্লাহর রাসুলের হাতের চেয়ে নরম কোনো রেশম স্পর্শ করে দেখিনি। আল্লাহর রাসুলের সুবাস থেকে অধিক সুবাস আমি কোনো দিন শুঁকিনি। আমি আল্লাহর রাসুলের সেবা করেছি দীর্ঘ দশ বছর। তিনি আমাকে কখনো উফ্‌ফ পর্যন্ত বলেননি। আমি করেছি এমন কোনো কাজে আমাকে বলেননি—'কেন তুমি এটা করেছ?' আমি কোনো কাজ না করলে কোনো দিন বলেননি—'কেন তুমি এটা করলে না?'

নবিজির রওজা জিয়ারত

নবিজির মসজিদ এবং তাঁর রওজা মুবারক জিয়ারত করা আল্লাহর নৈকট্যলাভের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম। এ ব্যাপারে আমাদের যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের সকল মুসলিমরা একমত। সে ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া ছাড়া আর কেউ ভিন্নমত পোষণ করেনি। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন—'তাঁর কবর জিয়ারত করা শরিয়তসম্মত নয়।' তবে ইবনে তাইমিয়ার এ মত শুদ্ধ নয়।

জিয়ারতের আদব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারত করার অনেকগুলো আদব আছে। যেগুলো অনুসরণ করা আবশ্যক। যদি আল্লাহ আপনাকে কখনো তাঁর রওজা মুবারক জিয়ারতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, তাহলে প্রথমেই তাঁর মুবারক মসজিদ জিয়ারত করার নিয়ত করে নিন। একেবারে দৃঢ়তার সাথে নিয়ত করুন।

এরপর আপনি তাঁর রওজা মুবারক জিয়ারতের নিয়ত করবেন। মদিনায় প্রবেশ করার আগেই আপনি গোসল করে নেবেন। কাপড়ের মধ্যে সবচেয়ে পরিপাটি ও

পরিচ্ছন্ন কাপড়টি পরিধান করবেন। মনে রাখবেন—আপনি কোথায় এবং কার সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছেন। মদিনার সম্মান এবং মহত্ত্ব কী, সেগুলো মনে আনার চেষ্টা করবেন।

এ কথা আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আপনি যে ভূখণ্ডে আছেন, মহান আল্লাহ তাঁকে কী পরিমাণ সম্মান দান করেছেন। কীভাবে তিনি এই ভূমিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।

এরপর আপনি মসজিদে নববিতে প্রবেশ করবেন। সেখানে প্রবেশ করে রাসুলের রওজা মুবারক এবং মসজিদে নববির মিম্বরের মাঝখানে তাহিয়্যাতুল মাসাজিদের নিয়তে দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেন। এরপর রওজা মুবারকের নিকটে যান; তবে রাসুলের রওজা মুবারকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে বিরত থাকবেন। জানালা ধরা থেকে বিরত থাকবেন। সেখানে শুয়ে পড়া বা গড়াগড়ি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। অনেক পাগল ও মূর্খ লোক এগুলো করে থাকে; আপনি এটা করবেন না; কেননা, এগুলো হলো বিদআত—যা হারামের কাছাকাছি। তাই আপনি বরং রওজা মুবারকের প্রায় চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে, রওজা মুবারকের যে দেওয়াল সামনে থাকবে, সে দেওয়ালের নিচের দিকে তাকিয়ে, চোখ বন্ধ করে মহব্বত, মহত্ত্ব, সম্মান অনুভব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এরপর হালকা আওয়াজে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম বলবেন; আর বলতে থাকবেন—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসুল। আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি আপনার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন। আপনার রবের পথে আহ্বান করেছেন প্রজ্ঞা দিয়ে, উত্তম উপদেশ দিয়ে। আপনি আল্লাহর ইবাদত করেছেন নিশ্চিত মৃত্যু আসা পর্যন্ত। আল্লাহ আপনার ওপর আপনার, পরিবারের ওপর, আপনার সাহাবায়ে কিরামের ওপর এমন অফুরান রহম করেন, যেমন আপনার প্রতিপালক ভালোবাসেন এবং তিনি যেমন চান।'

যেভাবে দুআ করবেন

এরপর কিবলার দিকে ফিরবেন। হালকা ডান দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন, যাতে করে রওজা মুবারকের সেই খুঁটির মাঝে থাকতে পারেন, যে খুঁটি কবরের প্রথম অংশ। এরপর বিনীত প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলবেন। এবং আপনি এটা ধারণা করবেন না যে, এটা আল্লাহর রাসুলের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ।

আর এটাও মনে করবেন না যে, দুআ কবরের দিকে ফিরে করা উচিত। কেননা, প্রার্থনা হলো আল্লাহকে সরাসরি সম্বোধন করা এবং আল্লাহকে সরাসরি সম্বোধন করার মাঝে আর অন্য কাউকে শরিক করা যায় না।

দুআ করার জন্য সব সময় আল্লাহর সামনে সবচেয়ে উত্তমভাবে মুখোমুখি হতে হয়; তাঁর কাছে প্রার্থনার জন্য কেবলামুখী হয়ে করাই উত্তম। যারা দুআর এই নিয়ম ও উত্তম পদ্ধতির বিরোধিতা করে, আপনি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আপনি বরং আপনার যা চাওয়ার তা এই বলে শুরু করবেন—'হে আল্লাহ, আপনি বলেছেন এবং আপনার কথাই সত্য। যদি তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে এরপর আপনার কাছে আসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, এরপর রাসুলুল্লাহ ও তাদের নিজেদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তাহলে অবশ্যই তারা আপনাকে পাবে তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু হিসেবে। আমি আপনার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনার নিকট আপনার সুপারিশ কামনা করি। সুতরাং আপনার নিকট আমি চাই যে, আপনি আমাকে মাগফিরাত দান করবেন; যেমন আপনি অবশ্যই করেছিলেন সেই ব্যক্তির জন্য—যিনি তার জীবদ্দশায় এসেছিলেন।'

এরপর আপনি বেশি বেশি দুআ করবেন আপনার দ্বীনি বিষয়ে; আপনার দুনিয়াবি বিষয়ে; আপনার ভাই-বোন-আত্মীয়দের জন্য এবং আপনার সকল মুসলিম ভাই-বোনের জন্য। যত পারেন তত বেশি বেশি দুআ করবেন।

আন্তরিক অনুরোধ

আর সেই মূল্যবান দুআর সময়, প্রিয় ভাই, আপনি আমাকে ভুলে যাবেন না! আপনার দুআয় খুবই সামান্য করে হলেও আপনি আমাকে স্মরণ করবেন। আমার জন্য আপনি বলবেন—'হে আল্লাহ, যেদিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সেদিনে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত জাতিকে একত্র করবেন, তখন আপনার অপরাধী বান্দা মুহাম্মাদ সায়িদ ইবনে রামাদানের ওপর আপনার ক্ষমার অনিন্দ্যসুন্দর পর্দা টেনে দেবেন। আপনার অনুগ্রহ ও কৃপায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করেন আপনার ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে। তাকে দান করবেন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লামের হাউজে কাউসারের সুপেয় পানি; যেদিন হাউজে কাউসারের নিকট দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি, আলোকিত চেহারা ও উজ্জ্বল চিত্ত নিয়ে। তিনি তাঁর সেই সকল সঙ্গীকে অভিবাদন জানাবেন—যাদের তিনি চিনেছিলেন এবং তাঁর সে সকল ভাইকেও

অভিবাদন জানাবেন, যাদের তিনি দেখেননি; কিন্তু তাদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। আপনি তাকে বিতাড়িত এবং বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।'

আপনি যেখানেই থাকেন, যে দেশের এবং আপনি যেই হন না কেন, আপনার কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার শুধু একটি অনুরোধ থাকবে—এই কিতাবটি যখন আপনার পড়া শেষ হবে, তখন আপনি আপনার এই ভাইয়ের জন্য দুআ করবেন। কেননা, আমার সামনে অনুপস্থিত, এমন কোনো ভাইয়ের পক্ষ থেকে আমার জন্য নেক দুআর প্রতি আল্লাহর কাছে আমার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আর কেউ নেই।

আমি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা জানাই এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করি যে, তিনি আমাকে এই কিতাব লিখে শেষ করার তাওফিক দান করেছেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাকে তাঁর প্রিয়নবি, প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত উত্তমভাবে আঁকড়ে ধরার তাওফিক দান করেন। তাঁর কাছে আরও চাই—তিনি যেন এই কিতাবে যেসব ভুলভ্রান্তি রয়েছে, তার অকল্যাণ থেকে আমাকে (এবং প্রিয় পাঠককেও) বাঁচান। এবং বইয়ে থেকে যাওয়া আমার ভুলত্রুটি এড়িয়ে যান; আমার ভুলের ব্যাপারে তিনি যেন আমার মনের নেক নিয়তকে ও আমার চেষ্টাকে কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশকারী বানান। আল্লাহ রহমত দান করুক আমাদের সরদার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। তাঁর পরিবার ও তাঁর সকল সাহাবির ওপর।

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * *

লেখক পরিচিতি

জন্ম

১৯২৯ সালে তুরস্কের সিরনাক প্রদেশের বুতান দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন ড. সায়িদ রামাদান আল বুতি। সিরনাক হলো আনাতোলিয়ার দক্ষিণপূর্ব দিকের একটি শহর। এটি তুরস্কের এমন এক শহর, একই সাথে যার সীমান্ত রয়েছে ইরাক ও সিরিয়ার সাথে। ড. সায়িদের পিতা মোল্লা রামাদান বুতি ছিলেন খুবই দ্বীনদার, পরহেজগার, বুজুর্গ ও সমকালীন বিখ্যাত আলিম।

হিজরত

শাইখ ড. সায়িদ শৈশবের প্রাথমিক সময় বুতান শহরেই কাটিয়েছেন; কিন্তু যখন মাত্র চার বছর বয়স তার, ১৯৩৩ সালে তিনি তখন পিতার সাথে সিরিয়ার দিমাশক শহরে হিজরত করেন। এরপর মাত্র ছয় বছর বয়েসে তিনি পুরো কুরআনে কারিম হিফজ করে ফেলেন।

লেখাপড়া

শাইখ ড. সায়িদ হিফজ সম্পন্ন করার পর তার প্রাথমিক লেখাপড়া 'মাহাদুত তাউজিয়্যাতিল ইসলামি'-তে সম্পন্ন করেন। এখানেই তিনি সেকেন্ডারি ডিগ্রিও নেন। এরপর ১৯৫৩ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরের আল আজহারে

কুল্লিয়ায়ে শরিয়া-তে ভর্তি হন। এবং এখান থেকেই ১৯৫৫ সালে তিনি মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

এরপর আবারও তিনি জামে আল আজহারে আরবি ভাষা ও সাহিত্য অনুষদে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ডিপ্লোমা শেষ করেন।

কর্মজীবন

পড়াশেষে তিনি ১৯৬০ সালে দিমাশক বিশ্ববিদ্যালয়ে কুল্লিয়য়ে শরিয়ার ডিন নির্বাচিত হন; কিন্তু ইলমপিপাসু সায়িদ তখনও শিক্ষকতার চেয়ে লেখাপড়ার প্রতিই বেশি মনোযোগী ছিলেন। ফলে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে আবারও পাড়ি জমান জামি আল আজহারে এবং সেখানে শরিয়া অনুষদে আবারও ভর্তি হন। তারপর শরিয়ার ওপর তিনি ডক্টরেট সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৬৫ সালে তিনি জামে আল আজহার থেকেই উসুলুশ শারিয়ার ওপরও ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

১৯৬৫ সালে তাকে দিমাশক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ল'-এর ইনস্টাক্টর নির্বাচিত করা হয়। এরপর ডেপুটি হয়ে একসময় তাকে ওই বিভাগের ডিনও করা হয়।

এই সময় তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তার বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ লেকচার শুরু করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি পরিচিতি পেতে থাকেন। এবং একসময় তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার মতো দেশগুলোতেও একজন মান্যবর ইসলামিক স্কলার হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন।

আরবি ও কুর্দি ছাড়াও তিনি ইংরেজি ভাষা চর্চা করতেন। ১৯৯১ সালে তিনি ফ্রান্সে অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে ঐতিহাসিক বক্তব্য দেন। ২০০৪ সালে তিনি দুবাই আন্তর্জাতিক সম্মাননায় শ্রেষ্ঠ ইসলামিক ব্যক্তিত্বের সম্মান লাভ করেন। ২০১২ সালে শ্রেষ্ঠ ৫০০ জন মুসলিম মনীষীদের তালিকায় তার অবস্থান ছিল ২৭তম।

অক্সফোর্ডের উচ্চ পরিষদের সদস্যসহ তিনি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থার বিভিন্ন পদের অধিকারী ছিলেন।

গ্রন্থাবলি

তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টি। 'পবিত্র কুরআনের পূর্ণ তাফসির', 'ফিকহুস সিরাহ', 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম'-সহ অনেক বিখ্যাত বইয়ের লেখক তিনি। এ ছাড়া তাসাউফশাস্ত্রের বিভিন্ন জটিল কিতাবের ব্যাখ্যাসহ তার অনেক অডিও-ভিডিও বয়ান ইন্টারনেটে লাখো শ্রোতা-দর্শককে বিমুগ্ধ করে রাখে এখনও।

জীবনযাপন

এত শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত হওয়ার পরও তিনি বাস করতেন প্রাচীন একটি বাড়িতে। ৮৪ বছর বয়সের বৃদ্ধ হয়েও তিনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতেন। অথচ চাইলে তিনি সামান্য ইঙ্গিতে পেয়ে যেতেন দামেশকের অভিজাত এলাকায় নিরাপত্তায় ঘেরা সুবিশাল বসতবাড়ি। এখানেই তার সাথে অন্য আলিম ও শাইখদের পার্থক্য। সিরিয়ার ধর্মমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনেকবার তার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, তিনি সাথে সাথে 'আমার দরকার নেই' বলে ফেরত পাঠিয়েছেন।

আরব বিশ্বের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও শাইখ হওয়ার পরও তার বিনয় ছিল প্রবাদবাক্যের মতো। তার সামসময়িক অন্য উলামায়ে কিরাম এবং তার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছাত্ররাও বলত, তিনি পূর্বসূরিদের রয়ে যাওয়া রত্ন। এ মানুষটি আজকের যুগের নয়। নইলে প্রজ্ঞা ও ইলমের আভিজাত্যের সাথে এমন নির্মোহ চরিত্র এত বিনয়ী ব্যবহার কীভাবে সম্ভব আজকের দুনিয়ায়!

শহিদি মৃত্যু

২১ মার্চ, ২০১৩। শাইখ সিরিয়ার মসজিদে বনু উমাইয়ায় দারস দিচ্ছিলেন। এই অবস্থায় মসজিদে বোমা হামলা করা হয়। এই হামলায়ই মহান শাইখ আল্লামা সায়িদ রামাদান আল বুতির শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। ২৩ মার্চ তাকে সিরিয়ার রাজধানী দিমাশকের মসজিদে বনু উমাইয়া আল কাবিরের পেছনে মুসলিম ইতিহাসের অনন্য বীর শহিদ সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। কী সৌভাগ্য তার! কী তার সম্মান! আল্লাহ তায়ালা তাকে শান্তিতে রাখেন, আমিন!

অনুবাদক পরিচিতি

ইবনে আফির। হিফজ ২০০৮। দাওরা প্রথম ২০১৮। দ্বিতীয়বার ২০১৯ দেওবন্দ। ইফতা ২০২০ নূরিয়া। অনূদিত বই 'কিতাবুজ জুহদ, আল জিহাদ ফিল ইসলামসহ আরও কয়েকটি বই প্রকাশের পথে।

অনন্ত অসীম পরকালের যাত্রায় দুনিয়া হলো এক অন্ধকার, পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথ। এই পথ নিরাপদে অতিক্রম করতে প্রয়োজন উপযুক্ত বাহন ও আলোর মশাল। 'ফিকহুস সিরাহ' মূলত আখিরাতের যাত্রাপথে আমাদের সেই বাহন ও আলোর মশালের মতোই।

আমাদেরকে সহজ ও সরল পথ দেখানোর জন্য এখানে বর্ণিত হয়েছে নবিজির আলোকিত জীবন, নবিজীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও নির্দেশনা। যা একজন মুসলিমকে শুধু আখিরাতের পথ-নির্দেশই নয়, দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় সফলতা কীভাবে স্পর্শ করবে, তারও পথ বাতলে দেয়।

এই বই আমাকে, আপনাকে এবং আমাদের সকলকে আলোকিত করবে, উজ্জীবিত করবে এবং আখিরাতের অনন্তর যাত্রায় আমাদের মুখে হাসি ফোটাবে, এমনই প্রত্যাশা।

লেখক-পরিচিতি : ড. শাইখ মুহাম্মাদ সায়িদ রামাদান বুতি। আরববিশ্বের প্রখ্যত আলিম ও ফকিহ। জন্ম তুরস্কে। দ্বীনি শিক্ষা ও দাওয়াতের স্বার্থে আমৃত্যু বসবাস করেছেন সিরিয়ার দিমাশক শহরে।

তিনি ছিলেন মসজিদে বনু উমাইয়ার সম্মানিত খতিব, দিমাশক বিশ্ববিদ্যালয়ে কুল্লিয়ায়ে শরিয়ার ডিন। তার রচিত গ্রন্থসংখ্যা ৬০ টি। তবে 'ফিকহুস সিরাহ' রচনার মাধ্যমে তিনি অনন্য উচ্চতায় সমাসীন হন। এটি আরববিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত, পঠিত ও সমাদৃত সিরাতের কিতাব।

ইহদিনা

Fikhus Sirah
Shayekh Said Ramadan Buti
Price BDT : 700

cover : faisal mahmud, 01843249893